আল-কুরআনে বিজ্ঞান

Scientific Indications in the Holy Quran

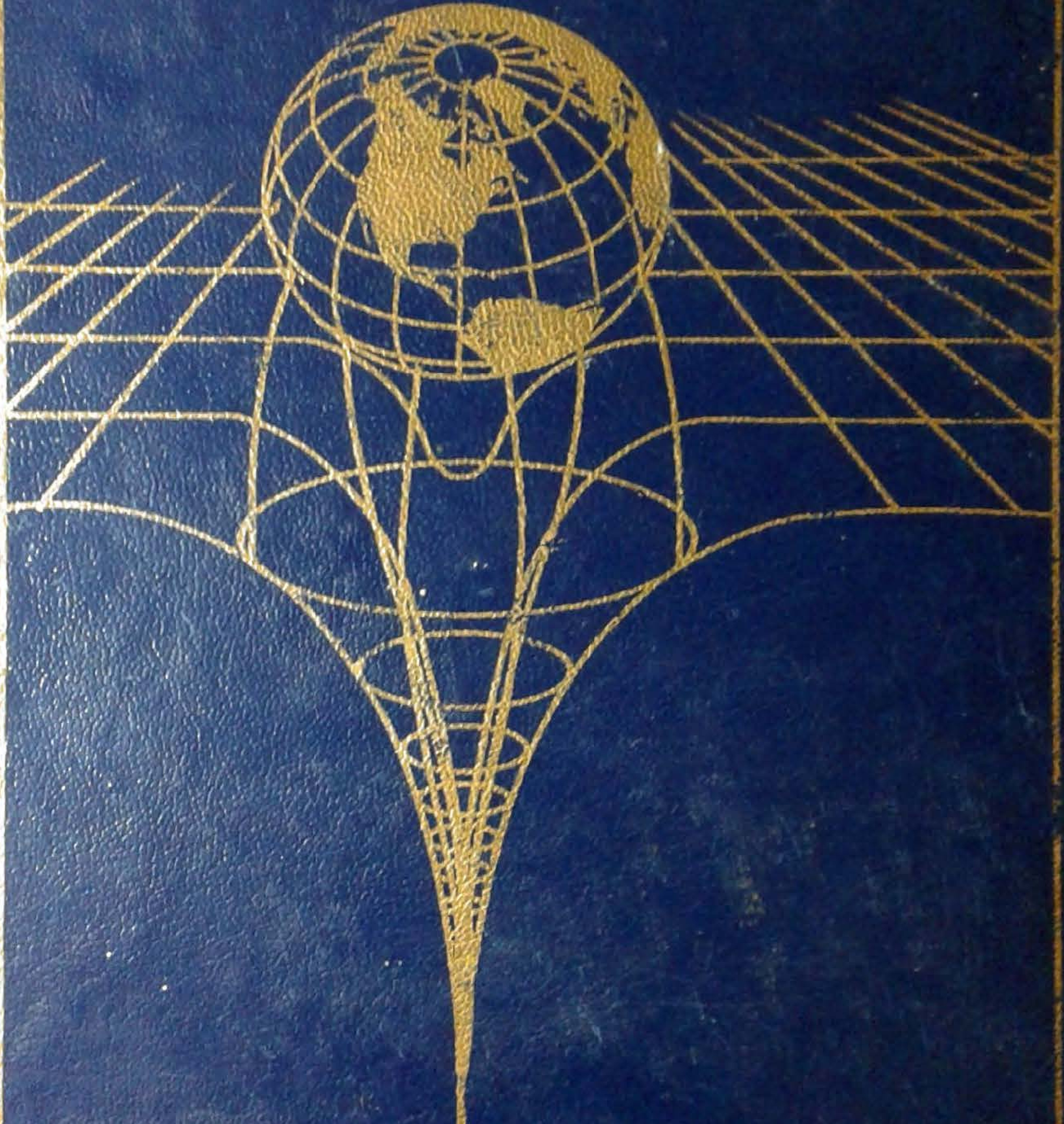

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.bjilibrary.com

আল-কুরআনে বিজ্ঞান

(Scientific Indications in the Holy Quran)

মূল

গবেষণা বিভাগ বোর্ড

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.bjilibrary.com

আল-কুরআনে বিজ্ঞান (Scientific Indications in the Holy Quran)
বোর্ড অব রিসার্চার্স কর্তৃক লিখিত
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে অনূদিত ও সম্পাদিত

গ্রন্থস্বত্ব ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সংরক্ষিত

অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ২৪৪
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২১৬২
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.১২২৮
ISBN : 984-06-0807-0

প্রকাশকাল
মুহাররম ঃ ১৪২৫
ফাল্গুন ঃ ১৪১০
মার্চ ঃ ২০০৪

প্রকাশক
শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১৩৩৩৯৪

কম্পিউটার কম্পোজ
নিউ হাইটেক কম্পিউটার
জি, পি, ক-৩৮, মহাখালী, ঢাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মেসার্স আল-আমিন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৮৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা

মূল্য ঃ ১৯৫.০০ (একশত পঁচানব্বই) টাকা মাত্র।

AL-QURANEY BIGGAN (Scientific Indications in the Holy Quran) : Written by a Board of Researchers in Engliah. Ttranslated and edited by a board sponsored by Islamic Foundation Bangladesh and published by Director, Translation and Compilation Dept., Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e Bangla Nagar, Dhaka-1207.
March 2004

Web Site : www.islamicfoundation-bd.org
E-mail : info@islamicfoundation-bd.org
Price : Tk 195.00; US Dollar 7.00

www.bjilibrary.com

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا
فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ (٢١ : ٣٠)

সামনের পাতা মহানিনাদ

যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম; এবং প্রাণযান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে; তবু কি তারা বিশ্বাস করবে না ?
–আল-কুরআন ২১ ঃ ৩০

সামনের পাতা

মাইকেল ফ্রী ম্যান কর্তৃক উদ্ভাবিত মহানিনাদের বিশেষ প্রভাব ভাবমূর্তি (ডায়ালগ–১ (১৯৮৪) পৃ. ১৭-এর সৌজন্যে)।

وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ (٤٥ : ٤)

পিছনের পাতা (ডিএনএ অণু)

তোমাদের সৃষ্টিতে এবং জীবজন্তুর বিস্তারে নিদর্শন রয়েছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্যে। – আল কুরআন ৪৫ ঃ ৪

পিছনের পাতা

জীবনের মূল নিয়ন্ত্রক অণু– ডিএনএ, জীবনের বংশানুক্রমিক নীল নকশা (ডায়ালগ–৩ (১৯৮৯), পৃ. ৫৪-এর সৌজন্যে)।

www.bjilibrary.com

কমিটির সদস্যবৃন্দ ও লেখকবর্গ

১. এম. আকবর আলী, এম এস সি (কলিকাতা)

২. এম. শমশের আলী, এম এস সি (ঢাকা), পি এইচ ডি (ম্যানচেস্টার), চেয়ারম্যান।

৩. মরহুম আবদুল কাদের চৌধুরী, এম এস সি (ঢাকা)।

৪. মরহুম এম. এ. জব্বার, এম এস সি (কলিকাতা)

৫. এম. ফেরদৌস খান, এম এস সি (ঢাকা), এম. এ (লণ্ডন)।

৬. এম. সালার খান, এম এস সি (আলীগড়) পি এইচ ডি (এডিনবরা)

৭. খোন্দকার এম. মান্নান, এম এস সি (ঢাকা), ডি, ফিল (অক্সফোর্ড)।

৮. ডাঃ গোলাম মুয়ায্‌যম, এমবিবিএস (কলিকাতা) ডিসিপি (লণ্ডন), ডি.প্যাথ (ইংল্যান্ড), এফ প্যাথ (ইংল্যান্ড)।

৯. মাওলানা মোঃ সালাহউদ্দিন, কামিল, এম এ (ঢাকা)।

অনুবাদকবৃন্দ

১. ডাঃ গোলাম মোয়ায্‌যম

২. জনাব মুহাম্মদ নুরুল আমিন জাওহার

৩. জনাব আবু মুহম্মদ

৪. জনাব আফতাব হোসেন

৫. জনাব শাহাবুদ্দীন খান

৬. জনাব আবদুল আউয়াল

সম্পাদক

অধ্যাপক এ. এফ. এম. আবদুর রহমান

www.bjilibrary.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রাক্ কথন	৭-১০
ভূমিকা	১১-১৮
মূলপাঠ	১৯-৬৩২
পরিশিষ্ট	৬৩৩-৬৬৯

www.bjilibrary.com

মহাপরিচালকের কথা

মেহেরবান আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়ই ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পবিত্র কুরআনে বিধৃত বিজ্ঞান সংক্রান্ত ইঙ্গিতসমূহ উদ্‌ঘাটনের কাজ হাতে নেয়। আল-কুরআন হচ্ছে একটি হিদায়েত বা দিক নির্দেশনা গ্রন্থ। আর মানবীয় কর্মতৎপরতার সকল পরিকল্পিত ক্ষেত্রই এই দিক-নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত।

কাজেই, কোন যুব মানস সাধারণভাবে জ্ঞান অর্জন সম্পর্কে আল-কুরআনের নীতি কী তা জানতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। আমরা ইতিমধ্যেই একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করেছি যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য প্রত্যক্ষ করবে। আমরা অনুভব করছি যে, আমাদের যুগের তরুণ-তরুণীরা যারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে পেশাগত জীবন গড়তে আগ্রহী তাদের অবশ্যই জানতে হবে যে, পবিত্র কুরআন আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিষয়ে গবেষণা করার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। খুব অল্প সংখ্যকই আছে যারা এই গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন। আবার প্রত্যেক মুসলমানের এটি উপলব্ধি করা কর্তব্য যে, জীব ও জড় পদার্থ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি।

এই উভয় প্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে গবেষণাপ্রসূত জ্ঞানকে মানবজাতির শান্তি ও কল্যাণে লাভজনকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এ ধরনের গবেষণামূলক অধ্যয়ন অধ্যয়নকারীর পক্ষে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির বিশালত্ব ও মহাপরিকল্পনা সম্পর্কে একটা যথাযথ উপলব্ধি লাভ করা সম্ভব হবে।

এ সকল ধারণা নিয়েই ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা বিভাগ থেকে **'আল-কুরআনে বিজ্ঞান'** (Scientific Indications in the Holy Quran) শীর্ষক একটা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি দেশের বেশ কয়েকজন প্রথিতযশা পণ্ডিত ব্যক্তিকে জড়িত করতে সক্ষম হয় যারা কয়েক বছর ধরে পরিশ্রম করে কাজটিকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যান। তাদের কাজের ফলাফলই ছিল গ্রন্থের প্রথম ইংরেজী সংস্করণ যা ১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয়।

ফাউন্ডেশন এ সকল পণ্ডিতবর্গকে সামান্য উৎসাহ ব্যতীত তেমন কিছু দিতে পারেনি। পণ্ডিতগণ তাদের কাজের পরিপূর্ণতা কিংবা উৎকৃষ্টতার দাবি করেন না। তবে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এই জনপ্রিয় ও সম্মানজনক প্রকাশনাটি অল্প সময়েই বাজার থেকে নিঃশেষ হয়ে যায়।

www.bjilibrary.com

গ্রন্থটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে উচ্চ প্রশংসা অর্জন করেছে ও ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি করেছে। এ প্রেক্ষাপটেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনা বিভাগ থেকে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত হয়। বর্তমান যুগের বিশেষত তরুণ মানস আল্লাহ্র সৃষ্টির মহত্ত্ব ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করতে উদ্যোগী হলেই এ প্রকাশনা কর্মটি সার্থক হবে।

ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে বইটির বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয় অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ। এ ধরনের গ্রন্থ অনুবাদ করার কাজ খুব সহজ নয়। দক্ষ অনুবাদকগণ অনুবাদ কর্মটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করেছেন। আমি এই সুযোগে আমাদের স্বনামধন্য পণ্ডিতগণকে ধন্যবাদ জানাই এবং অনুবাদকবৃন্দকে মুবারকবাদ জানাই। অনুবাদ পাণ্ডুলিপিটি সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক এ. এফ. এম. আবদুর রহমান।

পরিশেষে হৃদয় নিংড়ানো কৃতজ্ঞতা জানাই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র নিকট যিনি আমাদেরকে আংশিক হলেও তাঁর সৃষ্টির সীমাহীন মাহাত্ম্য তুলে ধরার তৌফিক দান করেছেন।

আমরা আশা করি, অত্র প্রকাশনার বাংলা সংস্করণটি ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুসন্ধানে অব্যাহতভাবে অবদান রাখবে এবং ইসলাম, মুসলিম উম্মাহ ও মানবজাতির সেবায় নিয়োজিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে।

আল্লাহ্ আমাদের প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক,
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.bjilibrary.com

প্রকাশকের কথা

'আল-কুরআনে বিজ্ঞান' শীর্ষক বইটি 'সাইন্টিফিক ইন্ডিকেশন্স ইন দি হোলি কুরআন'-এর বাংলা অনুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সাড়া জাগানো প্রকাশনা। ১৯৯০ সালে মূল বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর অল্পদিনে মধ্যে এর প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যায়। ফলে ১৯৯৫ সালে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণও বাজারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। সাড়া জাগানো এই গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনুবাদের ব্যাপক দাবি ও চাহিদার প্রেক্ষিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে গ্রন্থটি বাংলায় প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

গ্রন্থটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের চেষ্টায় আমরা কোন ত্রুটি করিনি। তারপরেও সুধীজনের নজরে কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদের অবহিত করার অনুরোধ রইল। আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দেব ইন্‌শাআল্লাহ্।

আজকের বইটির বাংলা সংস্করণ প্রকাশের সময় আমরা গবেষক, অনুবাদক ও সম্পাদকসহ অনুবাদকর্মের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মুবারকবাদ জানাই।

জ্ঞানের চর্চা ও বিকাশে সহযোগিতায় আমাদের এই প্রয়াস মহান আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করুন। আমীন!

শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.bjilibrary.com

ভূমিকা

পবিত্র কুরআন হচ্ছে পথ-নির্দেশনা গ্রন্থ। এই পথ-নির্দেশনা সমগ্র মানবজাতির জন্যে এবং মানব জীবনের সকল কর্মতৎপরতাই এর আওতাভুক্ত। বিজ্ঞান যেহেতু একটা গুরুত্বপূর্ণ মানবীয় তৎপরতা এবং মানবজাতির অগ্রগতি সাধনে আবশ্যকীয় বটে, স্বাভাবিকভাবেই এটা প্রত্যাশা করা হয় যে, কুরআনের পথ-নির্দেশনা বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলোতেও পরিব্যাপ্ত হবে। বিস্ময়ের কিছু নেই যে, পবিত্র কুরআন অত্যন্ত চমৎকারভাবেই তা করেছে। গ্রন্থটির মোট আয়াত সংখ্যার মধ্যে প্রায় এক-অষ্টমাংশই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে নিবেদিত হয়েছে। কুরআন আক্ষরিক অর্থে কোন বিজ্ঞান গ্রন্থ নয়; কাজেই, বিজ্ঞানের সকল নীতিই এর মধ্যে সন্নিবিষ্ট পাওয়া যাবে–এমন আশা করা যেতে পারে না। তবুও, প্রকৃত ঘটনা ও বিজ্ঞানের সূত্র নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে কুরআনের নিজস্ব ভঙ্গিমা রয়েছে। এটি বৈজ্ঞানিক সূত্রসমূহের মূল প্রতিপাদ্য তুলে ধরে এবং বেশ কিছু ঘটনা বা সত্য সম্পর্কে ইঙ্গিতধর্মী বক্তব্য প্রদান করে যাতে থাকে সর্বোচ্চ সংগঠন সূত্রসমূহ সম্পর্কে পরিষ্কার ইঙ্গিত। কুরআনের একটা বক্তব্য কোন একটা নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক বিষয়ে ব্যাপক কথা তুলে ধরে। একটা দৃষ্টান্ত বিষয়টা স্পষ্ট করে তুলতে পারে। ৩ ঃ ১৯১ আয়াতে আল্লাহ্ ইঙ্গিত করেছেন যে, প্রকৃতি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ও গবেষণাকারী মাত্রই বলে উঠবে ঃ "হে আমাদের প্রভু! এ সবের কোন কিছুই তুমি অযথা সৃষ্টি কর নাই! ...." কোন কিছুই বৃথা সৃষ্টি করা হয়নি–এই যে ঘোষণা, প্রকৃতপক্ষে, এটি একজন আধুনিক প্রতিবেশ বিজ্ঞানীর সর্বপ্রধান মৌলিক বিশ্বাসের বিষয়বস্তু যিনি উপলব্ধি করেন যে, এই মহাবিশ্বের একটা সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনা রয়েছে যাতে আমাদের বিঘ্ন সৃষ্টি করা উচিৎ নয়। প্রায় ৩ কোটি প্রকারের জীবদেহ রয়েছে। এ পর্যন্ত মাত্র ৫০ লক্ষের উপর গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। এ সকল ধরনের জীবদেহের অনেকগুলোরই কার্যগত উপযোগিতা কী তা আমরা জানি না। অবশ্য, অনেক সময়ই দেখা গেছে, এ সকল জীবদেহের জীবনধারায় মানুষ বিঘ্ন সৃষ্টি করে উচিৎ খেসারত দিয়েছে। এমনকি আমরা যদি নাও জানি কোন বিশেষ প্রজাতির জীবদেহের কাজ কী, তবুও এটি যাতে টিকে থাকতে পারে সেদিকে আমাদের সর্বাধিক দৃষ্টি রাখতে হবে। কেননা, এটি বিলুপ্ত বা উচ্ছেদ হলে তা প্রকৃতির সঠিক প্রতিবেশিক ভারসাম্য বিনষ্ট করতে পারে। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিবেশ বা বাস্তুসংস্থান বিজ্ঞানের পরিপূর্ণ ভিত্তি কুরআনের এই ঘোষণা/বক্তব্য ব্যতীত আর কিছু না যে, কোন কিছুই অযথা/বৃথা

www.bjilibrary.com

সৃষ্টি করা হয়নি। আরেকটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে, কোন কিছুর বিন্যাস ও সঠিক অনুপাতের প্রতি কুরআনের অঙ্গুলি নির্দেশ। কুরআনের ২৫ ঃ ২ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে বিন্যস্ত করেছেন সঠিক অনুপাতে।" প্রকৃতির গঠন-ভারসাম্য বৈশিষ্ট্যাবলি এবং বিভিন্ন বস্তুর মধ্যকার আপেক্ষিক অনুপাত সম্পর্কে কৌতুহলী যে কেউ উপলব্ধি করবেন যে, বিন্যাস ও সঙ্গতি সম্পর্কিত বিষয়গুলো বস্তু ও জীবসমূহের অস্তিত্বের প্রশ্নের সাথে সংযুক্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মানুষ বর্তমানে যে, আকার-আকৃতিবিশিষ্ট, তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনরূপ হলে পৃথিবীর অভিকর্ষ ক্ষেত্র এবং অন্যান্য পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে মানিয়ে চলতে পারত না। একটা নির্দিষ্ট দেহকাঠামোর ভিতরেও আবার বিভিন্ন অঙ্গ বা অংশ ভিন্ন ভিন্ন অনুপাত অনুসরণ করে থাকে। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে, এসব সঙ্গতি বা অনুপাত ফীবোনাচি সংখ্যা দ্বারা উপলব্ধি করা যেতে পারে। বিভিন্ন জিনিসের সঙ্গতিই কোন কিছুকে সৌন্দর্যের সুসামঞ্জস্যতা দান করে। কাজেই, সৃষ্টির সার্বিক মহাপরিকল্পনায় সঙ্গতি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক।

বৈজ্ঞানিক সত্যকে চক্ষু উন্মীলকভাবে উপস্থাপনে কুরআনের ভঙ্গিমার আরেকটি আকর্ষণীয় দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় ৯৬ ঃ ২ আয়াতে যাতে মাতৃ উদরে আলাক (যা আটকে থাকে) তথা জমাটবাঁধা রক্ত থেকে মানব সৃষ্টির কথা উল্লিখিত হয়েছে। সূরা আল-মু'মিনুন-এ ভ্রূণ স্তর থেকে ধাপে ধাপে মানব শিশু কীভাবে বেড়ে পূর্ণাঙ্গ মানবে পরিণত হয় তার উল্লেখ রয়েছে। এ সকল ধাপের কথা আল-কুরআনে বলা হয়েছে ৭ম শতকে (খ্রিস্টান সাল) যখন ভ্রূণতত্ত্ব বিজ্ঞানের উদ্ভাবনই ঘটেনি। ঘটনাচক্রে, ভ্রূণতত্ত্ব বিজ্ঞানের একটি সাম্প্রতিক শাখা যা বেশীর পক্ষে বিগত একশ বছরে গড়ে উঠেছে। এভাবে, বস্তুত এ এক অবাক করার মত ঘটনা যে, পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত মানব ভ্রূণের ধাপে ধাপে বৃদ্ধির বিষয়টি মাত্র সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। আল্লাহ্ মানুষকে তাঁর সৃষ্টি এবং এর উন্নয়ন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে বলেছেন যেন মানুষ জীববিদ্যার গভীরে প্রবেশ করতে পারে এবং জীবনের রহস্য উন্মোচন করতে পারে। আবার, জীববিজ্ঞান বিষয়ক ঘটনাবলীর পূর্ণাঙ্গ সুসম্পৃক্ত ধারার একটা সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ মানুষকে সকল বিস্তারিত দিক সহ চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়নের দিকে আহ্বান জানায় এবং সেই সঙ্গে আল্লাহ্ ও তাঁর সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে চিন্তা করতে তার মনে আবেদন সৃষ্টি করে। কাজেই, এ সকল বৈজ্ঞানিক ঘটনার উল্লেখমাত্রই সাড়ম্বরে এ ধারণা সমর্থন করে যে, আল্লাহ্র মহত্ত্বের উপলব্ধি তঁর সৃষ্টি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক উপলব্ধির সাথে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত। আমরা যাকে সৃষ্টিজগৎ বলে থাকি, তা আল্লাহ্রই এক প্রকার স্মারকচিহ্ন বা নিদর্শন। বিজ্ঞান মানুষকে এই স্মারকচিহ্নই বুঝতে সাহায্য করে। এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে, তা থেকে এটা স্পষ্ট

www.bjilibrary.com

হওয়া উচিত যে, প্রকৃতিরাজ্যে যে দক্ষ কুশলতা রয়েছে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণে কুরআনের নিজস্ব একটা ভঙ্গিমা আছে এবং এ ধরনের দৃষ্টি আকর্ষণীতে কুরআন সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে জ্ঞান আহরণের উপর।

যে জিজ্ঞাসাটা আজকের তরুণ-তরুণীদের মনে ঝড় তোলে তা হলো ঃ কেন শুরু (ইকরা বিসমে রাব্বিকাল্লাজী খালাক) থেকে কুরআনের শেষ আয়াত পর্যন্ত অত্যন্ত কড়া তাগিদ সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহর দুই-তৃতীয়াংশ অশিক্ষিত, অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকছে ? বস্তুত এটি একটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ প্রশ্ন যা সুগভীর গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন। এর উত্তর এ সত্যটির মধ্যে নিহিত থাকতে পারে যে, যদিও আমরা কুরআন তেলাওয়াত করে থাকি, আমাদের মধ্যে অনেকেই জ্ঞানের অভাবে এর অর্থ বুঝতে পারি না। আল্লাহ্ নিজেই ঘোষণা করেছেন যে, পবিত্র কুরআন "তাদেরই জন্য যারা চিন্তাশীল।" কুরআনের অন্যান্য স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শুধুমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিগণই তাঁর নিদর্শনাদি উপলব্ধি করতে পারেন। ঘটনাক্রমে, পবিত্র কুরআনে নিদর্শন হিসেবে উল্লিখিত অধিকাংশ প্রাকৃতিক ঘটনাই বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রকৃতির; যে কারণে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, ইল্ম বা জ্ঞান অন্য কোনভাবে বিশেষিত না হলে তা বিজ্ঞানেরই প্রতীক। ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানগণ আল-কুরআন থেকেই জ্ঞান অর্জনের প্রেরণা লাভ করতেন। জ্ঞানকে তারা পূর্ণাঙ্গ অর্থেই নিতেন এবং মানবিক ও বিজ্ঞান বিষয়সমূহ তারা সমন্বিতভাবেই অধ্যয়ন করতেন। জ্ঞানানুসন্ধানের কারণেই মুসলমানরা ক্ষমতা ও সম্মান লাভে সক্ষম হয়েছিলেন যদ্দারা তারা হাজার বছর ধরে বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করেন। এই গৌরব পরবর্তীকালে নষ্ট হয়ে যায় বেশ কয়েকটি কারণে। যাহোক, মুসলমান সভ্যতা থেকে যে শিক্ষা লাভ করা যায় তাহলো, সাধারণভাবে জ্ঞান এবং বিশেষভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অবশ্যই ধর্মের সাথে সাথেই চর্চা করতে হবে। বস্তুত কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী বিজ্ঞান অন্যান্য মানবিক কর্মতৎপরতার মতই ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যেখানে বিজ্ঞান আমাদেরকে শিক্ষা দেয় কীভাবে প্রকৃতি কাজ করে এবং এই শিক্ষা আমাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য উৎপন্ন দ্রব্য ও প্রক্রিয়া কাজে লাগাতে সক্ষম করে, তেমনি ধর্ম আমাদেরকে শিক্ষা দেয় সেই সকল মূল্যবোধ যা আল্লাহ্ আমাদেরকে চর্চা করতে বলেন যাতে জীবনের মূল্যবোধ ও উপযোগিতার দিকগুলো সুসমন্বিতরূপে সংমিশ্রণ ঘটানো যায়।

কাজেই, জীবনের আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলতে গেলে বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়ই প্রযোজন। বিজ্ঞান বস্তুগত জ্ঞান দান করে; ধর্ম সেই জ্ঞানকে ব্যবহারের মূল্যাবোধ শিক্ষা দেয়। ধর্ম মানুষকে আহ্বান জানায় সৃষ্টিজগৎ ও স্রষ্টা

www.bjilibrary.com

নিয়ে গভীরভবে চিন্তা করতে, বিজ্ঞান সৃষ্টিকে বুঝার মত ভাষা দান করে এবং সৃষ্টিই স্রষ্টার নিদর্শন হিসেবে কাজ করে। কাজেই, বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সতিকার অর্থে কোন বিরোধ নেই।

দুঃখজনকভাবে, আজ আধুনিক যুগের নর-নারীরা না জানে কুরআন জ্ঞান অর্জনের উপর কী রকম গুরুত্ব আরোপ করে, আর না জানে কুরআনের বক্তব্যকে বিজ্ঞানের তথ্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে। পবিত্র কুরআনে বিধৃত বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিতসমূহের ব্যাপারে এই যে অজ্ঞতা, এর কারণ হল এ সত্যটি যে, অনেকে কুরআন শুধু তেলাওয়াত করে থাকেন কিন্তু আরবী ভাষা সম্পর্কে ভাল জ্ঞান না থাকায় তারা কুরআনের আয়াতসমূহের অর্থ বোঝেন না; দ্বিতীয়ত, যারাও আরবী জানেন এবং কুরআনের আয়াতসমূহের অর্থ বোঝেন তারাও আবার বিজ্ঞানের মৌলিক সূত্রসমূহ সম্পর্কে অবহিত না থাকায় বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিতসমূহ ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারেন না। যারা ধর্মতাত্ত্বিক বলে নিজেদের পরিচয় দেন, তারা জনগণের সামনে কথা বলার সময় এ ধরনের আয়াত সম্পর্কে কিছুই বলেন না। তারা সাধারণত কবরে ও জাহান্নামের শাস্তি আর বেহেশতের পুরস্কার বিষয়েই বক্তব্য দিয়ে থাকেন। তরুণরা তাদের কথা শোনবার সময় বুঝতে পারে যে, এ সকল ধর্ম প্রচারক কোন কোনভাবে এ সময়ের সর্বাধিক আলোচিত সমস্যাসমূহ তথা মৌলিক শিক্ষা, দারিদ্র বিমোচন, সামাজিক অবিচার ইত্যাদি বিষয় এড়িয়ে যান, এ সকল বিষয় মোকাবিলার বৈজ্ঞানিক পন্থার কথা ত বলাই বাহুল্য। এভাবে, তরুণ সমাজের মাথায় একটা ভুল ধারণা ঢুকে যায় যে, বিজ্ঞানের সংস্কৃতি আর ধর্মের সংস্কৃতি একসাথে চলে না। তৃতীয় বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর বৈজ্ঞানিক পশ্চাৎপদতা এবং এমনকি জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণের সামগ্রীসহ আমদানীকৃত পণ্যের উপর নির্ভরশীলতা এ সকল তরুণের ইসলাম সম্পর্কিত ভুল ধারণায় আরো সমর্থন যোগায়। অথচ, এই বিজ্ঞান চর্চাই প্রথম যুগের মুসলমানদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মশাল বহন করার ক্ষমতা দান করেছিল এবং তাদেরকে বিশ্বের অপরাপর জাতির উপর নেতৃত্বের আসন লাভে সক্ষম করেছিল। এখন আবারও যথাযথভাবে কুরআনের মূল্যবোধ অনুসারে চর্চা করলে এই বিজ্ঞানই মুসলিম সমাজসমূহের মধ্যে পরিবর্তন আনার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে।

কাজেই, বিজ্ঞান ও কুরআনের মধ্যে যে কোন বিরোধ নেই এ বিষয়ে মুসলমান তরুণ সমাজকে একমত করানো এবং তাদেরকে বুঝানো যে, প্রকৃতি সম্পর্কে গভীরতর উপলব্ধি অর্জন স্রষ্টার প্রজ্ঞা ও ক্ষমতা সম্পর্কে গভীরতর উপলব্ধি লাভের পথ সুগম করতে পারে—এর জন্যে পবিত্র কুরআনে বিধৃত বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিতসমূহ বুঝা এবং অশিক্ষিতদের নিকট তা ব্যাখ্যা করা একান্তই

www.bjilibrary.com

আবশ্যক। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থখানি আল্লাহ্‌র অসীম মেহেরবানীতে এ দিকটাতেই নিবেদিত এক প্রচেষ্টা মাত্র।

গ্রন্থখানির জন্মের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে করছি। আমরা কয়েকজন তথা মরহুম এ কিউ চৌধুরী, জনাব ফেরদৌস খান, প্রফেসর মফিজুল মান্নান এবং আমি নিজে আলাদা আলাদাভাবে কুরআনের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যসম্পন্ন আয়াতসমূহ অনুসন্ধানের চিন্তা করছিলাম। আমাদের চিন্তা-ভাবনাসমূহ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তৎকালীন মহাপরিচালক জনাব আ.ফ.ম. ইয়াহ্‌ইয়াকে জানালে তিনি প্রায় উল্লসিত হয়ে উঠলেন এবং আমাদেরকে একত্রিত করার ব্যাপারে অনুঘটক হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেন। ইতোমধ্যে 'কুরআনে বিজ্ঞান' নামে ডা. মোঃ গুলাম মুয়াজ্জামের একখানি গ্রন্থ ইসলামি পাঠাগার রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত হয় (১৯৬৬ খ্রি.) এবং 'সাইয়েন্স ইন দ্য কুরআন' শীর্ষক আরেকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় (১৯৭২-৭৬ খ্রি.) যার লেখক প্রখ্যাত পণ্ডিত এম আকবর আলী যিনি 'মুসলিম কন্ট্রিবিউশন টু সাইয়েন্স' শীর্ষক মালিক লাইব্রেরী ঢাকা কর্তৃক বাংলায় কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থের প্রণেতা। আরেকখানি প্রয়াস উদ্ধৃত গ্রন্থ যার শিরোনাম 'দ্য বাইবেল, দ্য কোরআন এন্ড সাইয়েন্স' এবং লেখক প্রখ্যাত ফ্রেঞ্চ চিকিৎসক মরিস বুকাইলি ও এরই মধ্যে বাজারে চলে আসে। এম ফেরদৌস খানের একখানি পুস্তিকা যার শিরোনাম 'দ্য সাইয়িন্টিফিক ফাইন্ডিংস এন্ড দ্য হলি কোরআন' ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত হয় (১৯৭৪ খ্রি.)। এগুলোতে কুরআনের কিছু নির্বাচিত আয়াতের উপরই শুধু কাজ করা হয়েছে। এম আকবর আলীর গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক সত্যের সাথে জড়িত কুরআনের আয়াতের উল্লেখ রয়েছে এবং এটির ভাল উদ্ধৃতি মূল্য রয়েছে। কিন্তু আয়াতসমূহে উল্লিখিত ঘটনাবলির সাথে বৈজ্ঞানিক ঘটনাবলির সত্যিকার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কোন কোন ক্ষেত্রে দেয়া হয়নি। আবার বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিতের জন্য কুরআনের আয়াতসমূহ যতটুকু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে তা পুংখানুপুংখ এবং পরিপূর্ণ ছিল না। এভাবে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন তীব্রভাবে উপলব্ধি করে যে, বর্তমান গ্রন্থখানি সাধারণভাবে মুসলিম উম্মাহর সদস্যদের এবং বিশেষভাবে মুসলিম যুবসমাজের বিরাট কৌতূহল মিটাবে। ফাউন্ডেশন তখন তৎক্ষণাৎ 'সাইয়েন্স ইন আল কোরআন' নামে একটা প্রকল্প হাতে নেয়। প্রকল্পটি পরে গৃহীত হয় এবং বিজ্ঞানের শাখার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয় (যাদের নাম প্রথম পাতায় রয়েছে)। কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পড়ে আমার উপর যদিও ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজকে এ দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে পুরোপুরি যোগ্য মনে করিনি। তথাপি, ব্যাপারটি যেহেতু আমার জন্য প্রাজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে

www.bjilibrary.com

সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে এ বিষয়ে আরো বিজ্ঞ হওয়ার একটা বিরাট সুযোগ এনে দিল, তাই আমি এই চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করলাম যে, আমরা একটা দল হিসেবে দায়িত্ব পালনে আল্লাহ্‌র করুণা ও রহমত পাব। কাজটা সম্পন্ন করতে আমাদের কয়েক বছর লাগলো, যার কর্মপদ্ধতি ছিল এমন ঃ কমিটি সপ্তাহে তিনবার সভায় বসলো। আমরা কুরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আয়াতসমূহ নিয়মতান্ত্রিকভাবে পাঠ করলাম এবং কমিটি সদস্যগণের বিশেষজ্ঞতার প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে যে সকল আয়াতের বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য আছে বলে প্রতীয়মান হয় সেগুলো সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণকে বরাদ্দ করে দেয়া হল। তারা স্ব স্ব গৃহে আয়াতগুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন এবং যথাযথ বিবেচনার পর সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ কর্তৃক কুরআনের নির্দিষ্ট কোন আয়াতের বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিত তুলে ধরে একটি করে খসড়া নিবন্ধ তৈরি করলেন। এই নিবন্ধটি অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণের নিকট পাঠানো হয় যারা খসড়াটির উপর সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ প্রদান করেন। বেশ কয়েকবার এমনও ঘটেছে যে, শুধু যে অনেক খসড়া ব্যাপকভাবে সংশোধন করা হয়েছে তা নয়, বরং এমন কিছু কিছু খসড়া বাতিল করতে হয়েছে যেগুলো মাসের পর মাস কাজ করে তৈরি করা হয়েছিল। সদস্যগণ এ ধরনের প্রত্যাখানকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছেন এ কথা মনে রেখে যে, যুক্তির প্রাবল্য এবং কুরআনের অন্যান্য আয়াতের সাথে সুসঙ্গতিকে আমাদের চিন্তা ও বিবেচনার মানদণ্ড হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছিল।

প্রসঙ্গক্রমে, কিছু সতর্কবাণী রাখা জরুরী। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অবগত পবিত্র কুরআন পরম সত্যের উপর ভিত্তিশীল যা কুরআনেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই পরম সত্যে বিশ্বাসীগণ কুরআনকে আমাদের বৈজ্ঞানিক সূত্রের পরীক্ষা হিসেবে ব্যবহার করার ব্যাপারে সুস্বাগত, কিন্তু এর বিপরীতক্রমে নয়। ঘটনাক্রমে উল্লেখ্য যে, মরিস বুকাইলি তাঁর 'দ্য কোরআন, দ্য বাইবেল এন্ড সাইয়েন্স' গ্রন্থে ইতিমধ্যেই দাবী করেছেন ঃ "পবিত্র কোরআনে এমন একটি মাত্র আয়াতও নেই যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আক্রমণযোগ্য।" আমাদের বর্তমান গ্রন্থখানি এ দাবীকে পুরোপুরি সমর্থন করে। একটা প্রশ্ন আছে যা এ প্রসঙ্গে তোলা যেতে পারে, তাহলো ঃ যদি কোন আয়াত পাওয়া যায় যা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায় না তাহলে কী হবে ? এ প্রশ্নের জওয়াব রয়েছে এ সত্যের মধ্যে যে বিজ্ঞান সত্যের অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি গ্রহণ করে নিয়েছে। এ পদ্ধতিটা অবশ্য সীমাবদ্ধতামুক্ত নয়। তথাপি, একটা সম্ভাব্য রয়েছে যে, বাস্তবতার একটা অংশ থাকতে পারে যা আমাদের দৈহিক সীমাবদ্ধতার ঊর্দ্ধে উঠে এবং প্রয়োগকৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে এড়িয়ে যায়।

www.bjilibrary.com

কাজেই, সকল সত্যই বিজ্ঞানের স্বীকৃত/গৃহীত পদ্ধতির অধীন নাও হতে পারে। তথাপি, বিজ্ঞানীগণ কোন কিছুকে একেবারে খোলা ছেড়ে দিতে পারেন না এবং সত্যানুসন্ধানে তার একটা শুরু এবং একটা পদ্ধতি সমষ্টি থাকতেই হবে। যাহোক, তাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, কোন একটা নির্দিষ্ট আয়াতকে যদি আজকের বিজ্ঞান দ্বারা ব্যাখ্যা করা না যায়, তবে তারা বড় জোর যা বলতে পারেন তাহলো এই যে, আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বর্তমান স্তরে/পর্যায়ে উক্ত আয়াতটি বোধগম্য নয়। বিজ্ঞানের অধিকতর অগ্রগতি সম্ভবত ঐ আয়াতের উপর অধিকতর আলোকপাত করবে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, এই অগ্রগতি সত্যিই বিস্ময়কর। তথাপি, অবাক হতে হয় যে, মাত্র ৫০ বছর আগে আজকের দিনের গৃহস্থালী পণ্য রেডিও/ট্রানজিস্টর আবিষ্কার হয়নি। বিশেষ এই যে বিদ্যুতায়ন তা মাত্র শতাধিক বছর আগের কথা, মাত্র ৯০ বছর আগে মানুষ জানত না কীভাবে উড়তে হয়, ৬০ বছর আগেও জীবনের মহাপরিকল্পক অণু ডিএনএ ছিল অজ্ঞাত। এমনকি ৪০ বছর আগে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ নিক্ষিপ্ত হয়নি আর চাঁদে যাওয়া ত দূরের কথা। বিগত ১০০ বছরে মানুষ ভয়ঙ্কর রকম ব্যাপক কিছু মেনেছে তবে এতে তার এই উপলব্ধিই জন্মেছে যে তার জানার মত যা কিছু বাকি আছে তার সামান্য অংশ মাত্রই শুধু সে এ পর্যন্ত জানতে পেয়েছে। কাজেই, বর্তমান সময়কার বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কোন আয়াত বোধগম্য না হওয়ার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে যে, বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি ঐ সকল আয়াতের ব্যাপারে আরো উত্তমভাবে আলোকপাত করবে। আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা হলো যে, মানুষ বস্তু রহস্যের যতই গভীরে প্রবেশ করে এবং অধিকতর জ্ঞান আহরণ করে, কুরআনের বক্তব্যের উপর তার উপলব্ধি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়, যার প্রতি ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটার উৎপত্তিও হয়েছে পবিত্র কুরআনে বিধৃত খোদায়ী ঘোষণা থেকে যাতে বলা হয়েছে, 'এই গ্রন্থ সেই সকল লোকের জন্য যারা অনুধাবন করে'। বিজ্ঞান তথা জ্ঞানানুসন্ধান ব্যাপক অর্থে এই অনুধাবনকেই ত্বরান্বিত করে।

পরিশেষে, আরেকটা সতর্কবাণী করতে হয়। আমরা মোটেই ভান করছি না যে, পবিত্র কুরআনে বিধৃত বৈজ্ঞানিক ইতিঙ্গসমূহ সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি পূর্ণাঙ্গ। আমরা শুধু আমাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়ে কাজটা করার চেষ্টা করেছি মাত্র, যা অবশ্যই সীমিত এবং পাঠকবর্গের পক্ষেও উত্তম হবে এটা মনে রাখা যে, কোন বিষয়ে শেষ কথা বলা কঠিন ব্যাপার; আর আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞাও অসীম ও অফুরন্ত। আল্লাহ্‌র রহমতে আমরা তাঁর প্রজ্ঞার শুধু অংশবিশেষ তুলে ধরার সর্বোত্তম চেষ্টা করতে পারি মাত্র। কুরআনের আয়াতসমূহের সত্যিকার ব্যাখ্যা

www.bjilibrary.com

একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন যিনি এগুলো নাযিল করেছেন। সমাপ্তি ক্ষণে, আমরা আল্লাহ্র নাযিলকৃত কিছু আয়াতের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করার সুযোগদানের জন্য আল্লাহ্র নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। অত্র কর্তব্য কর্মটি সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করার জন্য আমাদের ধন্যবাদ প্রাপ্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তৎকালীন মহাপরিচালক জনাব এ এফ এম ইয়াহ্ইয়া এবং তাঁর উত্তরসূরীগণের। আমরা আরো ধন্যবাদ জানাই সেই সকল পণ্ডিতবর্গকে যাদের সাথে আমাদের কমিটি সদস্যগণ অনেক বিষয় স্পষ্ট করার জন্য আলোচনায় বসেছেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের যে সকল কর্মকর্তা কর্মচারী বর্তমান গ্রন্থখানি রচনার কাজের সাথে জড়িত বিষয়ে মাসের পর মাস ও বছরের পর বছর দীর্ঘক্ষণ ধরে আমাদের সাথে কাজ করেছেন তারাও ধন্যবাদার্হ। আমরা গভীরভাবে প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করতে চাই মাওলানা আবদুল জব্বার চাখারি, জনাব এ এন এম আবদুর রহমান, জনাব এম আবদুর রব এবং জনাব এম রুহুল আমিনের জন্য যারা বর্তমান গ্রন্থখানির কাজ সম্পূর্ণ করার ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

আমরা এই মোনাজাতের মাধ্যমে উপসংহার টানতে চাই "রাব্বি যিদনী ইলমা (ওগো প্রভু, আমার জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করে দাও)" যা আমাদের প্রভুই আমাদেরকে শিখিয়েছেন। আমরা বর্তমান গ্রন্থের কাজে আমাদের অনিচ্ছাকৃতভাবে থেকে যাওয়া ত্রুটিগুলোর জন্যেও আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

এম শমশের আলী
চেয়ারম্যান,
আল-কুরআনে বিজ্ঞান কমিটি,
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

www.bjilibrary.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

۱. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

১ ঃ ১ পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

'আর রাহমান' এবং 'আর রাহীম' শব্দদ্বয় সূরা ফাতিহার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আল্লাহ্‌র এ দু'টো গুণ আল-কুরআনে যথাক্রমে ৫৭ ও ৯৫ বার উল্লিখিত হয়েছে। কাজেই, কোন অনুসন্ধিৎসু মন এ দু'টো গুণের তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করবে এটাই স্বাভাবিক।

যেসব অগণিত দান ও নেয়ামতের মধ্য দিয়ে দয়াবান-মেহেরবান আল্লাহ্ তাঁর 'রহমত'-এর বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং তাঁর আলোচ্য গুণাবলির সত্যতা ও যথার্থতা প্রতিপন্ন করেছেন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট ঐ সব গুণাবলির কয়েকটিমাত্র নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

১. মাতৃগর্ভে মানুষের জীবনের ইতিহাস নিয়েই শুরু করা যায়। মাতৃগর্ভ নামক এই স্থানটি এক ধরনের তরল পদার্থের পরিপূর্ণ এক আবদ্ধপ্রায় কক্ষ বিশেষ। এটি এক অভিনব কলাকৌশলও বটে। যার মধ্যে আল্লাহ্‌র সীমাহীন করুণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কেননা, এতে রয়েছে তরল পদার্থে নিমজ্জিত ভ্রূণকে বহিঃস্থ আঘাত এবং ক্ষতিকর জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এই আদর্শ পরিবেশে ভ্রূণটি পুষ্টিপ্রাপ্ত হয় এবং গর্ভধারণকৃত ক্ষুদ্র ডিম্বাণু সুনির্দিষ্ট আকৃতিসহ বড় হয়ে একটি পূর্ণ শিশুতে পরিণত হয়। মাতৃগর্ভে শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়াই একটি শিশুর বেঁচে থাকা আরেক বিস্ময়। ৪ থেকে ৮ পাউন্ড ওজন বিশিষ্ট একটি শিশুর এক সংকীর্ণ পথে নিরাপদে ভূমিষ্ট হওয়াও আল্লাহ্‌র করুণাপূর্ণ কৌশলসমূহের আরেক দৃষ্টান্ত।

২. পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলাই পিতা-মাতার হৃদয়ে অপরিমেয় ভালবাসা সৃষ্টি করেন যা ব্যতিরেকে এই বিশ্বের এক অজানা-অচেনা পরিবেশে একটি শিশুর বেঁচে থাকার কথা চিন্তাই করা যায় না। এ ধরনের সন্তান স্নেহ-বাৎসল্য সকল জীবের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়।

www.bjilibrary.com

৩. একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েই তার জন্য প্রয়োজনীয় সর্বোত্তম আদর্শ পুষ্টি তার মায়ের বুকের দুধের মধ্যে আগে থেকেই প্রস্তুত অবস্থায় পায়।

৪. জন্মগ্রহণের সাথে সাথেই একটি শিশু আল্লাহ্‌র মেহেরবাণী হিসেবে বিনা ব্যয়ে প্রচুর পরিমাণে বায়ু, পানি (আর্দ্রতা), তাপ এবং আলো পেয়ে থাকে, যা ছাড়া পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব অসম্ভব হয়ে পড়ত। উল্লেখ্য যে, বায়ু অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আর্দ্রতা এবং কার্বন-ডাইঅক্সাইড-এর সঠিক অনুপাত বিশিষ্ট একটি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ মিশ্রণ, যা স্বাভাবিক জীবনের গতিপ্রবাহ ও কার্যক্রমের নিয়ামক। বাতাসের উপাদানসমূহের ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতিও আল্লাহ্ কর্তৃক প্রায় অপরিবর্তনীয়ভাবে রক্ষিত হয়ে থাকে যে প্রক্রিয়ায় ক্রিয়াশীল রয়েছে গাছ-পালা, মানুষ, জীবজন্তু এবং অতি ক্ষুদ্রদেহী অণুজীবের মধ্যকার স্বনিয়ন্ত্রিত চক্র।

৫. এছাড়া, আল্লাহ্ মানবদেহে বিভিন্ন আকারে বহু প্রতিরক্ষা বা নিরাপত্তা ব্যবস্থা দান করেছেন। সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক. অনমনীয় অথচ নরম চামড়ার আবরণী, যার রয়েছে বিস্ময়কর সৃষ্ট নব নব পুনর্নির্মাণ ও মেরামত ক্ষমতা এবং অসংখ্য সংজ্ঞাবহ স্নায়ু প্রান্তসীমা।

খ. চোখের পাপড়ির খোলা ও বন্ধ হওয়া এবং অশ্রু গঠন ক্ষমতা, যা বহিঃস্থ বস্তু বিদূরণ এবং চোখের কর্ণিয়াকে আর্দ্র রাখতে সহায়ক।

গ. চোখের উপরিস্থিত ভ্রূ, যা ধাঁধানো আলো থেকে চোখকে ছায়া দিয়ে রক্ষা করে।

ঘ. হাত ও পায়ের নখ, যা দৃঢ়তা দান করে।

ঙ. বৃদ্ধাঙ্গুলি, যার রয়েছে মুষ্টিবদ্ধ করার ক্ষমতা।

চ. মূত্রনালি এবং মলদ্বারস্থ গোলাকৃতির নিয়ন্ত্রক পেশী, যা মলমূত্রের বেগ ধারণের অক্ষমতা রোধ করে।

ছ. অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ প্রতিরোধে সঠিক মাপে রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা।

৬. দেহাভ্যন্তরস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যাবলি যথা ঃ হৃদপিণ্ড, যা রক্ত পাম্প করে; ফুসফুস, যা অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন-ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে এবং রক্ত পরিশোধন করে; ক্ষুদ্রান্ত্র, যা (খাদ্য) হজম করে এবং পুষ্টি শোষণ করে; যকৃৎ, যা প্রধানত ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদির বিষক্রিয়া রোধ করে; বৃক্কদ্বয়, যা রক্ত শোধন করে থাকে; এবং মস্তিষ্ক, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সচেতন প্রয়াস ছাড়াই দেহের ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃত কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে থাকে; এসবই আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র করুণার আরেক প্রমাণ।

৭. রোগ-ব্যাধি সৃষ্টিকারী জীবাণু এবং অন্যান্য ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্যে মানবদেহ ব্যবস্থার অভ্যন্তরে প্রতিরক্ষা বস্তুর উৎপাদনও আল্লাহ্‌র করুণার স্বাক্ষর বহন করে।

www.bjilibrary.com

৮. দয়াবান, মেহেরবান আল্লাহ্ই মেহেরবানী করে ফল, শস, শাকসব্জি, মাছ-মাংস ইত্যাদি আকারে মানবজাতির জন্যে, বস্তুত সকল জীবের জন্যেই হরেক রকম পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করেছেন।

৯. সূর্য আমাদের পৃথিবীর শক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সূর্য থেকে আগত বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বিকিরণসমূহের মধ্যে রয়েছে দীর্ঘ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, বেতার তরঙ্গ, বর্ণালীর প্রান্ত-বহির্ভূত রশ্মি, দৃশ্যমান আলো, হ্রস্বতর অতি বেগুনী রশ্মি এবং রঞ্জন রশ্মি। সূর্যের বহির্দেশীয় বায়ুমণ্ডল থেকে সৃষ্ট সৌর ঝড়ে রয়েছে স্থূলাণু আইওন ও ইলেক্ট্রোন, যা ঘন্টায় নয় লাখ মাইল বেগে পৃথিবীতে আঘাত হানে। কখনও কখনও সূর্যের পরিপার্শ্বস্থ সৌর কলংক এলাকায় এমন সুতীব্র ঘটনাবলি ঘটে যায় যাতে সূর্য দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। এ ধরনের দহনকালে বর্ণালির উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কণা, রঞ্জন-রশ্মি এবং অন্যান্য বিকিরণ পৃথিবীতে এসে পড়ে। যেসব মহাজাগতিক রশ্মি অবিরাম পৃথিবীর বহিঃস্থ বায়ুমণ্ডলে আঘাত হানে সেগুলো হচ্ছে সুতীব্র বেগে ছুটন্ত অণুসমূহের নিউক্লিয়াস। এগুলোর অধিকাংশের উৎপত্তি হয় সূর্য থেকে এবং সম্ভবত তারকা-বিস্ফোরণের কারণে। মহাজাগতিক রশ্মি যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপর ক্রিয়া করে, তখন মারাত্মক রঞ্জন-রশ্মি এবং অতি বেগুনী রশ্মি সৃষ্টিকারী সৌর কর্মকাণ্ড ছাড়াও এগুলো রঞ্জন রশ্মিও সৃষ্টি করে। রঞ্জন-রশ্মি 'পালসার' নামে এক ধরনের (আন্তঃ তারকামণ্ডলীয়) নিউট্রন তারকা বিপুল পরিমাণ প্রাণঘাতী রঞ্জন রশ্মি তৈরি করে। সৌর ঝড়, মহাজাগতিক রশ্মিমালা, অতি বেগুনী রশ্মি এবং রঞ্জন রশ্মির তীব্রতা পৃথিবীতে জীবনের জন্যে ভয়ঙ্কর প্রমাণিত হতে পারত, যদি না মেহেরবান আল্লাহ্র বিভিন্ন রশ্মি প্রতিরোধক বায়ুমণ্ডল তথা আয়নোস্ফেয়ারে স্বয়ং ক্রিয়া-কৌশলের ব্যবস্থা রাখতেন এবং পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের (ম্যাগনেটোস্ফেয়ার) সাহায্যে ইলেক্ট্রন ও আয়নের জন্যে এক ধরনের ফাঁদের ব্যবস্থা যদি না করতেন, যা দ্বারা এ সকল প্রাণঘাতী বিকিরণ এবং কণা আমাদের পৃথিবীতে এসে পড়া ঠেকানো যায়।

১০. অপর এক অনন্য সৃষ্টির মধ্য দিয়েও আল্লাহ্ তাঁর নিয়ামত প্রকাশ করেছেন। আর তা হলো পানি। জীবজগতের অস্তিত্বের ব্যাপারে পানির ভূমিকা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। সম্ভবত জলজ জীবের হিমায়িত হয়ে মারা পড়া থেকে রক্ষার ব্যাপারে পানি যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা খানিকটা ব্যাখ্যার দাবি রাখে। এটাই একমাত্র জানা পদার্থ যা তরল অবস্থায় ৪ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (সঠিকভাবে বলতে গেলে ৩.৯৮ সেন্টিগ্রেড কিংবা তারও কম) তাপমাত্রা থেকে ০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় এটি কঠিন বরফ অবস্থা ধারণ করে এবং তখনকার তুলনায় অধিক ঘন থাকে। ফলে, ০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড কিংবা

www.bjilibrary.com

তারও কম তাপমাত্রাবিশিষ্ট বরফখণ্ড পানিতে ভেসে থাকে। বলা যেতে পারে, এই বরফের পাতগুলোই আবার তাপ অপরিবাহীর ভূমিকা পালন করে, যে কারণে উদাহরণস্বরূপ, বরফপাতগুলোর উপরের বা বাইরের তাপমাত্রা দীর্ঘদিন ধরে হিমাঙ্কের নীচে থাকলেও সম্পূর্ণ হ্রদের পানি হিমায়িত হয়ে কঠিন পদার্থে পরিণত হয় না।

অপরদিকে, বরফ যদি পানির চেয়ে ভারী হত, তাহলে তা তলায় ডুবে যেত এবং সেখান থেকে ক্রমান্বয়ে উঁচু স্তূপে পরিণত হত। এভাবে, হিমমণ্ডলীয় হ্রদ, নদী, পুকুর ইত্যাদি অঞ্চলের এবং সুমেরু সাগর হিমায়িত হয়ে কঠিন বরফে পরিণত হত। পরিণামে, প্রায় সমস্ত জলজ জীবই হিমায়িত হয়ে মারা পড়ত। পানি হিমায়িত হয়ে বরফ আকারে পানির উপরে ভেসে থাকার যে অনন্য গুণ বা ধর্ম, তার মধ্য দিয়েই এমনকি প্রতিকূল হিমমণ্ডলীয় অঞ্চলেও জীবনের টিকে থাকা এবং সফলতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের অপার মহিমা প্রকাশ লাভ করছে। এভাবে, সৃষ্টিজগত নিয়ে গভীরভা⁻ চিন্তা করলে আল্লাহ্র করুণা ও দানের অগণিত দৃষ্টান্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Baqi. M. F. A.. Al-Mu'jamul Mufahras Il-Alfazil Quran 1364/1940, p. 307.

www.bjilibrary.com

٢- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১ ঃ ২ প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি জগতসমূহের লালন ও পালনকর্তা।

'রাব্বুল আলামিন'-এর অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ সমগ্র জগতসমূহের লালন ও পালনকর্তা। প্রচলিত অর্থে 'জগৎ' শব্দের বহুবাচনিক ব্যবহার করা হয়েছে উদ্ভিদ জগত, প্রাণী জগত, মানব জগত এবং বস্তুজগত বুঝাতে। বহুবাচনিক রূপ তথা জগৎসমূহ-এর ব্যবহারের তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের পরিচিত জগতের ভিতরে ও বাইরে আরো জগৎ রয়েছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আমাদেরকে এ সকল জগতকে দৈর্ঘ্য পরিমাপক এককের ভিত্তিতে শ্রেণী-বিন্যাস করতে সাহায্য করে।

এই পরিমাপক এককটি কত বিশাল কিংবা কত ক্ষুদ্র ? প্রোটনের মত মৌলিক কণার ক্ষেত্রে এই এককটি $১০^{-১৩}$ সেন্টিমিটার কিংবা তারও কম। অপরদিকে, এই বিশ্বের জ্ঞাত অংশের আকার হচ্ছে প্রায় $১০^{২৮}$ সেঃ মিঃ।[১] আজ পর্যন্ত জ্ঞাত আল্লাহ্‌ তা'আলার ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তম সৃষ্টির মধ্যে কী বিশাল ব্যবধান। এই বিশাল পরিমাপককে চারটি সুবিধাজনক ধরনের অংশ বা আকারে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন ঃ

১. প্রোটন থেকে বিশালাকার অণুর জগত।

২. বিশাল অণু থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগত (অর্থাৎ $১০^{-৫}$ সেঃ মিঃ থেকে $১০^{+৫}$ সেঃ মিঃ)।

৩. আমাদের গ্রহ পৃথিবী ($১০^{৯}$ সেঃ মিঃ)।

৪. আমাদের এই পৃথিবী থেকে বিশ্বজগতের জ্ঞাত অংশ (অর্থাৎ $১০^{৯}$ সেঃ মিঃ থেকে $১০^{২৮}$ সেঃ মিঃ)।

দৈর্ঘ্য পরিমাপকের উপরোক্ত ৪ ভাগে বিভক্তকরণ একতরফা বা বিধি বহির্ভূত হতে পারে। তবে, এ সকল অংশ চারটি ভিন্ন ধরনের জগতের প্রতিনিধিত্ব করে। মজার ব্যাপার হলো যে, বস্তুর দৈর্ঘ্য পরিমাপক বিভিন্ন অঞ্চলে

---

১. সংখ্যাটির অর্থ হলো ১ (এক)-এর পর ২৮টি শূন্য বসাতে হবে। অর্থাৎ ১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০। সংখ্যাটি কত বিশাল তা বুঝার জন্য চিন্তা করুন যে, এই দূরত্ব অতিক্রম করতে ৩×১০^{১০} সেঃ মিঃ/সেঃ (অর্থাৎ ১,৮৬.০০০ মাইল/সেকেন্ড) বেগে পরিভ্রমণকারী আলোর সময় লাগবে মোট ১ হাজার বছরেরও বেশী (১ বিলিয়ন = $১০^{৯}$ বছর)।

www.bjilibrary.com

ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করে থাকে। নিম্নে আলোচিত বিভিন্ন জগতের সহজাত বৈশিষ্ট্য থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার হবে ঃ

আকার-১ ভুক্ত জগতসমূহ ঃ অতি সূক্ষ্ম সৃষ্টি তথা মৌলিক কণা, পরমাণু-কেন্দ্র, অণু ইত্যাদি জগতসমূহের কথা বিবেচনা করা যাক। এই সব জগতের নিয়ম বিধান আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা সরাসরি বোধগম্য হয় না। এ জগতের গঠন-উপাদানসমূহ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু আমরা কেন দেখতে পাই না তা বুঝতে হলে পর্যবেক্ষণ ব্যাপারটা আসলে কী রকম তা অনুধাবন করা দরকার। আমরা যখন কোন বস্তু দেখি, তখন আলোক তরঙ্গ ঐ বস্তু থেকে ছড়িয়ে পড়ে এবং আমাদের চোখের মধ্যে প্রবেশ করে। এখন যদি একটা আলোকতরঙ্গ কোন বস্তুর উপর পতিত হয় এবং তা বস্তুটিকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন বা গ্রাস করে তাহলে স্পষ্টতই তা থেকে আলো ছড়িয়ে পড়তে পারে না। এভাবে, কোন বস্তু থেকে আলো ছড়িয়ে পড়তে হলে বস্তুটির আকার তার উপর আপতিত দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গের তুলনায় অবশ্যই বড় হতে হবে। একটি পরমাণুর আকার দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গের তুলনায় অনেক বড় বিধায় যখন কোন পরমাণুর উপর একটা আলোকতরঙ্গ এসে আপতিত হয় তখন এটা সমগ্র পরমাণুটিকেই ঢেকে ফেলে। ফলত এ থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হতে পারে না। আর এ কারণেই পরমাণু দৃষ্টিগোচর হতে পারে না। পরমাণু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হলে আমাদেরকে পরমাণুর আকার অপেক্ষা ক্ষুদ্র আলোকতরঙ্গ ব্যবহার করতে হবে।

কিন্তু এ সকল তরঙ্গ আমাদের চোখে দৃষ্টিগোচর হয় না। এগুলো হচ্ছে রঞ্জনরশ্মি কিংবা আরো বেশি শক্তিশালী গামা রশ্মি। দৃশ্যমান আলোকতরঙ্গের তুলনায় এই সব হ্রস্ব তরঙ্গ অনেক বেশী তেজস্বী। এ সকল তেজস্বী তরঙ্গের মাধ্যমে পরমাণু পর্যবেক্ষণে একটা সমস্যা রয়েছে। তাহলো কোন কণা সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে তথ্য সংগ্রহ করার অর্থ আমাদেরকে অবশ্যই ঐ কণার অবস্থান এবং গতিও নির্ণয় করতে হবে। কিন্তু, উদাহরণস্বরূপ ইলেক্ট্রনের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য যখন শক্তিশালী বিকিরণ ব্যবহার করা হয় (অর্থাৎ ইলেক্ট্রনটি কোথায় এবং এটি কী করছে অর্থাৎ এর অবস্থান ও গতি), তখন বিকিরণটির প্রবাহ ইলেক্ট্রনটিকে প্রবলভাবে ধাক্কা বা ঝাঁকুনি দেয় এবং এতে ইলেক্ট্রনটির অবস্থান ও গতি উভয়ই বিঘ্নিত হয়। বিচ্ছুরিত বা অপরিবর্তিত বিকিরণ অবশ্য ইলেক্ট্রনটির অবস্থান ও গতি সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রদান করে বটে, কিন্তু বিকিরণ প্রবাহ দ্বারা বিঘ্নিত না হলে ইলেক্ট্রনটির অবস্থান ও গতি যা থাকত, এই অবস্থান ও গতি তা নয়। কাজেই, যে সময়ে বিকিরণ প্রবাহ ইলেক্ট্রনে প্রবেশ করে তখনকার তথ্য সম্পর্কে খানিকটা অনিশ্চয়তা থাকে বৈকি। অবশ্য, ইলেক্ট্রনের

www.bjilibrary.com

অবস্থান ও গতির পরিমাপের অনিশ্চয়তা বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। বস্তুত, এ সকল অনিশ্চয়তার গুণফলের মান 'এইচ' (h) পর্যায়ের (প্ল্যাঙ্ক-এর স্বতঃসিদ্ধ ধ্রুবক)। এটি হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি নামে পরিচিত। এই সব কিছু এটাই স্পষ্ট করে তুলছে যে, শক্তিশালী বিকিরণ প্রয়োগ করে আমরা ইলেক্ট্রনের অবস্থা সম্পর্কে যে সত্য খুঁজে পাই তা শুধু আপেক্ষিক বা অপ্রকৃত সত্য মাত্র, আসল বা প্রকৃত সত্য নয়। প্রকৃত সত্য থেকে অপকৃত সত্য কতখানি ভিন্ন হবে তা নির্ভর করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ করার সময় সংশ্লিষ্ট বস্তুটিকে কতটা বিঘ্নিত বা বিক্ষুব্ধ করা হয়েছে তার উপর। ব্যাপারটা সূক্ষ্ম জগতের দার্শনিক দিক সম্পর্কে একটা গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেয় অর্থাৎ এ ধরনের জগতে পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা কার্যক্রমটাই একটা বিঘ্ন সৃষ্টিকারী ব্যাপার এবং প্রতিটি পদক্ষেপই পর্যবেক্ষণাধীন বস্তুর উপর ক্রিয়া করে। এটা এমন একটা ব্যাপার যা আজ পর্যন্ত বিশালতর বস্তুজগতে দেখা যায়নি। সত্যি বলতে কি, সূক্ষ্ম জগত 'কোয়ান্টাম মেকানিক্স' নামে ভিন্ন এক ধরনের বলবিদ্যা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যা বৃহত্তর পরিমাপের বস্তুর গতি নিয়ন্ত্রক প্রচলিত বলবিদ্যা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ক্ষুদ্র বস্তুর গতি সূত্র আর বৃহৎ বস্তুর গতি সূত্র নাটকীয়ভাবে পরস্পর থেকে ভিন্ন। ব্যাপারটা দৈর্ঘ্য পরিমাপের ভিত্তিতে বিভিন্ন জগতের শ্রেণী বিন্যাসের প্রতি অধিকতর সমর্থন যোগায় বটে।

আকার-২ ভুক্ত জগতসমূহ ঃ এ সব জগতের বস্তু সরাসরি আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। আমরা এগুলো দেখতে পাই এবং মজার ব্যাপার হলো, আমরা যখন এগুলো দেখি তখন আমরা এসবের উপর কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করি না, যা আমরা সূক্ষ্মতম বস্তুজগতের ক্ষেত্রে করে থাকি। কেন আমরা এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণাধীন বস্তুকে বিক্ষুব্ধ করি না তা একটি পিঁপড়াকে পর্যবেক্ষণের দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট করে তোলা যায়। পিপীলিকার আকার দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তুলনায় অনেক বেশী বড়। কাজেই, পিপীলিকা হতে আলো সহজেই ছড়িয়ে পড়তে পারে যে কারণে একটি পিপীলিকা সহজেই দৃশ্যমান হয়। সত্য বটে, পিপীলিকার উপর আপতিত (আলোক কণা) ফোটন পিপীলিকার উপর ঝাঁকুনি দেয় বৈকি, কিন্তু তা ইতিপূর্বে সূক্ষ্ম জগতের আচরণ সম্পর্কিত আলোচনাপর্বে বিবেচিত ইলেক্ট্রনের ভরের তুলনায় তেমন একটা ধর্তব্যের পর্যায়ে পড়ে না। যেহেতু পর্যবেক্ষণ কর্ম পর্যবেক্ষণকৃত বস্তুর অবস্থান ও গতির উপর কোন পরিবর্তন সূচিত করে না, তাই এ সকল জগতে পর্যবেক্ষক এখানকার কোন ঘটনায় প্রভাব বিস্তার করে না। অর্থাৎ পর্যবেক্ষক বা পরিমাপক পরিমাপকৃত বস্তুকে বিচলিত বা বিক্ষুব্ধ করে না। আবার, এ জগতসমূহে গতিবিদ্যা বিষয়ক আচরণ বর্ণনার জন্য প্রচলিত বল-বিদ্যাই নিখুঁতভাবে উপযুক্ত বলে মনে হয়।

www.bjilibrary.com

আকার-৩ ভুক্ত জগতসমূহ ঃ দৈর্ঘ্য পরিমাপক ভিত্তিতে জগতসমূহের শ্রেণী বিন্যাসে আমাদের এই পৃথিবী নামক গ্রহটিকে এক অনন্যসাধারণ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এমনটি করার কারণ এই যে, আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি মানুষ সহ বহু জীবের জীবন ও পরিবেশকে আল্লাহ্ বায়ুমণ্ডল, মাধ্যাকর্ষণীয় ক্ষেত্র এবং পৃথিবীর গতি ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল করে দিয়েছেন। পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণন এবং সূর্যের চারদিকে আবর্তনের কারণে আমরা একটা প্রমাণ সময় পাই। যথাযথভাবে ক্ষুদ্রতর বিভাগে পৃথিবীর ব্যাস আমাদেরকে দেয় দৈর্ঘ্যের মান। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান পৃথিবী পৃষ্ঠের সকল জীবনের জন্য এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পৃথিবীর ভূমি, পানি এবং বায়ু ব্যবস্থাসমূহ পৃথিবী নামক এই গ্রহস্থিত সর্ব আকারের প্রাণের অস্তিত্বের পক্ষে সূক্ষ্ম প্রতিবেশীয় ভারসাম্য স্থাপন করে। এই গ্রহটি তার নিজ আকার-আয়তনের তুলনায় বিশ্বজগতের বিশালতার ব্যাপ্তি কতটুকু তা বুঝতেও আমাদেরকে খানিকটা হলেও সাহায্য করে। এভাবে, অনেক দিক বিবেচনায়, পৃথিবী গ্রহটি নিজেই একটা জগত হিসেবে আখ্যায়িত হওয়ার মত যথেষ্ট বিশেষ মর্যাদাজনক স্থান অধিকারের দাবী রাখে। এ গ্রহটির গতি প্রচলিত বলবিদ্যা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যা আগে থেকে অনুধাবনযোগ্যও বটে।

আকার-৪ ভুক্ত জগতসমূহ ঃ এবার আমরা এসে পড়েছি বহু যোজন দূরে মহাকাশে এবং বহু ক্ষেত্রেই আমাদের আলোচ্য বিষয় বিশাল বিশাল দূরত্ব আর বিপুল ভরবিশিষ্ট তারকারাজি। এ ধরনের বস্তুর গতির ক্ষেত্রে নিউটনীয় পদার্থবিদ্যার সূত্র ও ধারণাসমূহ প্রয়োগ করা হয়ে থাকলেও গতির সঠিক বর্ণনার জন্য বিশেষ ও সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ উভয়ই এ বিষয়ে জড়িত। বিশাল বিশাল দূরত্বের কারণে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব মহাজাগতিক বস্তু সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয় সাধারণত বেতার সংকেতের সাহায্যে। আকার-৪ এর ব্যাপ্তি-বিস্তৃতি অত্যন্ত ব্যাপক হওয়ায় বিপুল সংখ্যক জগতকে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বস্তুত বিস্ময়কর বৈচিত্র্য সহ এ ধরনের বহু জগত (জীব ও জড়) মহাবিশ্বের অন্যত্র থাকতে পারে, যাদের আকার-আকৃতি আমাদের এই বিশ্বেরই অনুরূপ, কিংবা হতে পারে এ থেকে একেবারেই ভিন্নতর কিছু।

পৃথিবীটা সূর্য নামক নক্ষত্রেরই একটি গ্রহ। সূর্য নামক এই নক্ষত্রটি আবার ছায়াপথ নামক গ্যালাক্সির অন্তর্ভুক্ত এক সদস্য। আর, মহাবিশ্বে প্রায় ১০ কোটি ছায়াপথের সন্ধান এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

নক্ষত্রসমূহের রয়েছে সূর্যের সাথে তুলনীয় ধর্ম—তাদের ভর, উপরিভাগের তাপমাত্রা, আলোর তীব্রতা, স্থিতিশীল অবস্থায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বয়স (প্রধান ধারা অনুক্রমে) ইত্যাদি ক্ষেত্রে। আর সম্ভবত এ ধরনের নক্ষত্রের রয়েছে তাদের চারদিকে আবর্তনশীল গ্রহসমূহ যাদের বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর অনুরূপ। ছায়াপথ নামীয়

www.bjilibrary.com

গ্যালাক্সীর এক-চতুর্থাংশ গ্রহেরই এ ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একমাত্র আমাদের ছায়াপথেই যুগ্ম ও যৌগিক নক্ষত্র মিলে প্রায় দু'হাজার কোটি নক্ষত্র রয়েছে বলে প্রাক্কলন করা হয়।

ইতোমধ্যে শনাক্তকৃত বা আবিষ্কৃত ১০ কোটি গ্যালাক্সির কথা বিবেচনা করলে এবং সব ধরনের সীমাবদ্ধতার বিষয় মেনে নিলেও নিঃসন্দেহে ১০০ কোটি নক্ষত্রে প্রাণী আছে বলে যে হিসাব করা হয় তাকে খুবই সতর্কতাপূর্ণ হিসাব বলে মানতেই হবে।[১]

পৃথিবীতে প্রাণ-রসায়ন নির্ভর করে দু'টি জিনিসের উপর। এক, জটিল কার্বন (অঙ্গার) যৌগের উৎপাদন এবং দুই, দ্রাবক হিসেবে তরল পানির উপস্থিতি। অন্য নক্ষত্রসমূহের বাসযোগ্য গ্রহগুলোতে প্রাণ-রসায়ন পৃথিবীর মত হুবহু একও হতে পারে, কিংবা হতে পারে ভিন্ন রকম কিছুও। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মৌলিক প্রাণ-রসায়ন উপাদান হিসেবে সিলিকন তথা বালু কণা হতে পারে কার্বন বা অঙ্গারের বিকল্প, তেমনি তরল এমোনিয়া হতে পারে দ্রাবকের ভূমিকা পালনকারী ইত্যাদি।

বর্তমানে যেভাবে হিসাব করা হয় তাতে স্থিতিশীল অবস্থায় শত শত কোটি বছর আয়ু বিশিষ্ট (প্রধান ধারা অনুক্রমে) সূর্যের মত নক্ষত্রগুলোর অন্তত একটা করে এমন গ্রহ আছে যেখানে প্রাণের সঞ্চার ও বিস্তার লাভ ঘটেছে। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত আন্তঃতারকামণ্ডলীয় অঞ্চলে ফরমালডিহাইড এবং সেলুলোজ ইত্যাদির মত রাসায়নিক অণু সহ ৪০ টি বিভিন্ন ধরনের জটিল অণুর সন্ধান পাওয়া গেছে। বিশ্বজগতের অন্যত্রও যে প্রাণের উন্মেষ ঘটে থাকতে পারে, এটা তার এক জোরালো ইঙ্গিত বহন করে।

বিভিন্ন ধরনের জগতের উপর উপরোক্ত আলোচনা এ সত্যের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, আল্লাহ্ যদি নিজকে জগতসমূহের পালনকর্তা হিসেবে ঘোষণা না করে শুধু এই বিশ্বের পালনকর্তা ঘোষণা করতেন, তাহলে বিভিন্ন জগতের এইসব সূক্ষ্ম জটিলতা ও বৈশিষ্ট্যসমূহের তেমন কোন অর্থ থাকত না। বস্তুত বিভিন্ন ধরনের যেসব জগতকে আমরা দৈর্ঘ্য পরিমাপকের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস করেছি, যা কিনা একমাত্র মৌলিক জিনিস এবং যার পরিমাপে আমরা সক্ষম হয়েছি, সেগুলো সবদিক দিয়েই ভিন্ন। প্রত্যেক ধরনের জগতেরই রয়েছে নিজস্ব গঠন-কাঠামো, রয়েছে অনুসন্ধানী কৌশল এবং বলবিদ্যা। আর একমাত্র আল্লাহ্ই সকল জগতসমূহের সার্বিক তথ্যাদি অবগত আছেন।

উপরে আলোচিত বস্তুগত জগতসমূহ এবং তাদের শ্রেণীবিন্যাস ছাড়াও আধ্যাত্মিক জগতও এক বিস্ময় বটে। যাহোক, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যা

www.bjilibrary.com

কিছু অস্ত্র ও কলাকৌশল আমাদের হাতে রয়েছে তা দিয়েও আধ্যাত্মিক জগতকে সেভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয় যেমনটা সম্ভব জীবজগত ও জড় জগতের ক্ষেত্রে। হতেই পারে যে, বস্তুর উপর গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের জন্যে বর্তমানে যেসব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে তা আধ্যাত্মিক জগতের রহস্য উন্মোচনে একেবারেই অনুপযুক্ত। এ কারণেই আমরা আধ্যাত্মিক জগত সম্পর্কে তথ্যাদি দিতে বা বিস্তারিত আলোকপাত করতে পারছি না, যা শুধু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই অনুধাবন করা সম্ভব।

জগতসমূহের লালন-পালন ঃ এ পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন জগতের গঠন-কাঠামো আলোচনা করেছি মাত্র। এবার আসা যাক তাদের লালন-পালন প্রসঙ্গে। জগতটা ক্ষুদ্রই হোক আর বিশালই হোক, আল্লাহ্ সংশ্লিষ্ট জগতের সকল অধিবাসীকে লালন-পালনের চমৎকার আয়োজন করে রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে সূক্ষ্ম জগতের কথাই বিবেচনা করা যাক। বিপুল সংখ্যক অণুজীব আমাদের জীবন ও পরিবেশ বেষ্টন করে আছে। এদের মধ্যে এমনও অনেকগুলো আছে যাদের ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হত। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, আণুবীক্ষণিক ছত্রাক এত ক্ষুদ্রাকৃতির যে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদেরকে খালি চোখে দেখাই যায় না। এই সকল অণু-জীবকে অত্র আলোচনার শুরুতে উল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় পরিমাপকের মধ্যবর্তী একটা জগতে স্থান দেয়া যেতে পারে। এই সব জীব নানান প্রকৃতির এবং সে কারণে এদের খাদ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা ও পদ্ধতিও নতুন ধরনের। এদের কতক খাদ্য সংগ্রহ করে মাটি থেকে, কতক উদ্ভিদ দেহ থেকে আবার কতক খাদ্য সংগ্রহ করে প্রাণীদেহ থেকে। আর এরা সকলেই খাদ্য মজুদ করে থাকে। আল্লাহ্ এ সকল অণুজীবের মাধ্যমে গাছপালা এবং উন্নত প্রাণীদের লালন-পালনের ব্যবস্থাও করেছেন। এ সকল অণুজীবকে সৈন্যের সাথে তুলনা করা যায়—আল্লাহ্ তাদেরকে যুদ্ধ করার ক্ষমতা দিয়েছেন, দিয়েছেন বিস্তার লাভের ক্ষমতাও। এই বিস্তার যদি হয় ব্যাপকতর এবং তা কোন জীবনের জন্য যদি হয়ে দাড়ায় হুমকিস্বরূপ, তাহলে প্রকৃতিতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে এসব অণুজীবের সংখ্যাগত ভারসাম্যহীনতা রোধ করতে আল্লাহ্ জীব বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। সূক্ষ্ম-জগত থেকে এখন যদি আমরা পোকা-মাকড়, পক্ষীকুল, পশু, গাছপালা এবং মানুষের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাই, তাহলে জীবনের এ সকল উন্নত আকার বা স্তরের বিরাজমান বিস্ময়কর বৈচিত্র্যও সহজেই আমাদের নজর কাড়ে। প্রত্যেক আকারের প্রাণের রয়েছে নিজস্ব খাদ্য, নিজস্ব যোগাযোগ সংকেত, আছে নিজস্ব ঘরদোরের ধরন, আর বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা। তবে লক্ষ্য করার মত বিস্ময়কর ব্যাপারটা হলো যে, আল্লাহ্ কাউকেই খাদ্য, আশ্রয় আর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাহীন অবস্থায় রাখেন নি। সূক্ষ্ম

www.bjilibrary.com

জগতের অধিবাসীই হোক কি বৃহৎ জগতের, তাদের জন্যে রয়েছে জীবিকা অর্জনের উপায়; আর আল্লাহ্ই তাদের রিযিকদাতা।

অবশ্য, রাব্বুল আলামিন বলতে আমরা যদি আল্লাহ্ জীব জগতসমূহের লালন-পালনকর্তাই বুঝি, তাহলে কাহিনীটা অসম্পূর্ণই থেকে যায়। জগতের পালনকর্তা বলতে আসলে জীবন ও জড় উভয় জগতকেই বুঝায়। জীব জগতের লালন-পালনের ব্যাপারের সাথে আমরা পরিচিত হলেও জড়বস্তুর লালন পালনের বিষয়টি আমাদের কাছে খানিকটা অদ্ভুৎ লাগতে পারে। বাস্তব সত্য হলো যে, জড় বস্তুর টিকে থাকার ব্যবস্থা না থাকলে জীবের অস্তিত্ব বজায় রাখাই সম্ভব হতো না। আল্লাহ্ প্রাণের অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনে মৌলিক পদার্থসমূহের স্থিতিশীলতার ব্যবস্থা করেছেন। বস্তু নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের মধ্য দিয়ে এই স্থিতিশীলতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরমাণু যদি স্থিতিশীল না হত, তাহলে সৌরজগৎ ব্যবস্থাও স্থিতিশীল হত না। বস্তুর স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে আল্লাহ্ চারটি বলের প্রবর্তন করেছেন, যথা ঃ আণবিক বল, দুর্বল আণবিক বল, তড়িৎ-চৌম্বকীয় বল এবং মাধ্যাকর্ষণ বল। প্রথম তিন ধরনের বল ক্রিয়াশীল রয়েছে ইতিপূর্বে আলোচিত আকার-১ এবং আকার-২ ব্যাপ্তি জুড়ে আর চতুর্থ বল যদিও সর্বজনীন, এটি আকার-২, আকার-৩ এবং আকার-৪ এর অন্তর্ভুক্ত বৃহৎ বস্তুর মধ্যে ক্রিয়াশীল। মজার ব্যাপার হলো, সূর্য ও তার গ্রহসমূহ সমন্বয়ে যেমন বৃহৎ সৌর ব্যবস্থা অস্তিত্বমান রয়েছে, তেমনি রয়েছে নিউক্লিয়াস এবং এর চতুর্দিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান ইলেক্ট্রন নিয়ে সূক্ষ্ম সৌর ব্যবস্থার অস্তিত্ব। বৃহৎ সৌরজগত একটি আকর্ষণধর্মী মাধ্যাকর্ষণীয়, বিপরীতমুখী বর্গীয় বল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অর্থাৎ দু'টো বস্তুর মধ্যকার দূরত্বের বিপরীত বর্গের আনুপাতিক বল। সূক্ষ্ম সৌর ব্যবস্থাটি একটা আকর্ষণধর্মী বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় বল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত , যা Coulomb বল নামে পরিচিত। এ বলটিও একটি বিপরীত বর্গীয় বল। এ দু'টি জগত মাপের বিচারে বিশালভাবে আলাদা, এদেরকে নিয়ন্ত্রণকারী বলদ্বয় শক্তিতে আকাশ পাতাল ফারাক (বস্তুত মাধ্যাকর্ষণ বল বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় বলের তুলনায় $১০^{+৩৮}$ গুণ দুর্বল)। তথাপি, বলগুলোর দূরত্ব সাপেক্ষতা একই থাকছে। কী অপূর্ব বস্তু সংগঠন যাতে প্রমাণ করা যায় যে, সূক্ষ্মতম বিধৃতিও হতে পারে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি বস্তু যদি এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হয় কিংবা বস্তু যদি শক্তিতে এবং শক্তি যদি বস্তুতে রূপান্তরিত হয় তাহলে এই রূপান্তর প্রক্রিয়া এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে, আজ পর্যন্ত জানা মতে, সকল প্রকার জীব ও তাদের পরিবেশের সাথে খাপ খায় প্রকৃতির এমন প্রতিবেশিক ভারসাম্য সংরক্ষিত।

www.bjilibrary.com

অত্যন্ত মজার ব্যাপার যে, আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে জীব ও জড় উভয় প্রকারের নতুন নতুন জগত আবিষ্কৃত হচ্ছে। জানা যায় যে, চৌদ্দ শতাধিক বছর আগে আল্লাহ্ আল-কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে জগত শব্দটির বহুবচন ব্যবহারের মাধ্যমে এ ধরনের সমস্ত জগত সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন।

উপসংহারে এ কথা বলা যায় যে, জীব ও জড় বস্তুর বিভিন্ন ধরনের যে সকল জগতের কথা এ পর্যন্ত আলোচিত হল, সে সবই আল্লাহ্ কর্তৃক চমৎকার এক বিধানসমষ্টি প্রয়োগের মাধ্যমে পরিচালিত ও লালিত-পালিত হয়ে থাকে। বস্তুত আল্লাহ্ই জগতসমূহের লালন ও পালনকর্তা।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Barnard Lovell. In the Centre of Immensities 1971. Hutchinson, London.

www.bjilibrary.com

٣-الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

২ ঃ ৩ যারা (যারা আল্লাহ্কে ভয় করে) অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে ও তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে।

অদৃশ্যে বিশ্বাস ঃ এই সূরায় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন 'অদৃশ্যে' বিশ্বাসের বিরাট গুরুত্ব আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আল্লাহ্র নিকট থেকে হিদায়েত পেতে হলে তাকওয়ার পরেই অদৃশ্যে বিশ্বাস এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ আবশ্যকীয় শর্ত।

এ ধরনের বিশ্বাস কি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অযৌক্তিক ? বাস্তবে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। স্যার আর্থার এডিংটন তার বিখ্যাত ক্যামব্রিজ বক্তৃতামালায় দেখিয়েছেন যে, পদার্থবিদ্যার সকল মৌলিক সূত্র এবং ধ্রুবক স্পষ্টতই পূর্বানুমান নির্ভর মূলনীতি থেকে গৃহীত। বস্তুগত জগতের ব্যাখ্যায় এ সকল সূত্র অত্যন্ত সফল। কাজেই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 'যুক্তিতর্কের যুগেও বিশ্বাসের স্থান সর্বোচ্চেই রয়ে যায়। কেননা, যুক্তি হচ্ছে বিশ্বাসেরই অন্যতম ভিত্তি।

কিছু কিছু দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টা পরিষ্কার করা যাক্। কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা যাত্রাই শুরু করে আলোকরশ্মি বহনকারী ফোটন নামে এক অদ্ভুত কণার অস্তিত্ব কল্পনা করে। কণার কোন মাত্রা কিংবা বিদ্যুৎশক্তি নেই। অন্য কোন ভৌত বস্তুর মত এর কোন ধর্মও নেই। স্থির অবস্থায় এর ভর শূন্য আর চলন্ত অবস্থায় এর ভর অপরিমাপযোগ্য। বিজ্ঞানের যে শাখা এই অনুমানের গোড়াপত্তন করে সেটাকে মানব বুদ্ধিমত্তার অন্যতম বিরাট সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

ডি ব্রোগ্লি (De Broglie) অনুমান করেন যে, চলন্ত অবস্থায় সকল আণুবীক্ষণিক কণাকেই একটি তরঙ্গের সাথে যুক্ত করা যেতে পারে। এটাই বস্তু তরঙ্গ নামে পরিচিত। এটা যেহেতু একটা জটিল তরঙ্গ, এর কোন সাদৃশ্য বা উপমা নেই এবং এর প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে বস্তু নিরপেক্ষ। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, স্পন্দন সংখ্যা এবং গতিবেগ এই তিনটি রাশির যে কোন দু'টি পরিমাপের মাধ্যমে কোন তরঙ্গ সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত হয়। সুপরিচিত বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় এবং যান্ত্রিক তরঙ্গের এ সবগুলো রাশির ধ্রুবক পরিমাপ করা সম্ভব। কিন্তু বস্তু তরঙ্গের ক্ষেত্রে, কোন যন্ত্র দিয়ে স্পন্দন সংখ্যা এবং তরঙ্গ গতি কখনোই নির্ধারণ করা যায় না। বস্তুতরঙ্গ একটি গাণিতিক কৌশল, পর্যবেক্ষণ দ্বারা যাকে সঠিকভাবে বর্ণনা করা

www.bjilibrary.com

যায় না। তথাপি, এই বস্তুতরঙ্গে বিশ্বাস দ্বারা আণবিক ও পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার জটিল সমস্যাসমূহের সমাধান করা যায়। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, আধুনিক পদার্থবিদ্যায় বস্তুতরঙ্গ একটি বিশ্বাসের বিষয়বস্তু।

একটি চলমান কণা একটি তরঙ্গের ন্যায় আচরণ করে—এ হচ্ছে একটা বিশ্বাস। আর তরঙ্গ বলবিদ্যা এই বিশ্বাসেরই উপর ভিত্তিশীল। হেইসেনবার্গের অনিশ্চয়তা মূলনীতির বক্তব্য অনুযায়ী একটা কণার অবস্থান ও গতি একই সাথে সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না এবং এ সকল পরিমাপের অনিশ্চয়তার গুণফলও একটা নির্দিষ্ট ন্যূনতমের চেয়ে কম হতে পারে না। এই সর্বনিম্ন সীমার অস্তিত্ব প্রথমদিকে বিশ্বাসের বিষয় ছিল যার ফলে ধারণা করা হত যে, ক্রিয়ার ক্ষুদ্রতম একক আছে। এই বিশ্বাস পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা হলে ক্রিয়ার ক্ষুদ্রতম একক পাওয়া যায় ঃ $h=৬.৬৩ \times ১০^{-৩৪}$ joule-sec যা প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক নামে পরিচিত।[১]

আপেক্ষিকতাবাদে স্থানের সাথে সময়ের উপর নির্ভরশীল ফলাফলকে সংযুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু মতবাদটি স্বয়ং অনুমান নির্ভর। বিজ্ঞানী এবং গণিতবিদগণ আজ পর্যন্ত সকল পর্যবেক্ষকের সাধারণ বর্গীয় বৈশিষ্ট্যসমূহের আত্মমুখী প্রভাব দূর করতে সক্ষম হননি। আপেক্ষিকতাবাদ আবারো মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টার এক বিশাল বিজয় হিসেবে নিজেকে তুলে ধরে।

আধুনিককালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের 'একীভূত ক্ষেত্র মতবাদ' সম্পর্কিত ঘোষণার মধ্যেও বিশ্বাসের ভূমিকা স্পষ্ট বোঝা যায়। এই মহান বিজ্ঞানী তাঁর জীবনের শেষ ৩০ টি বছর ব্যয় করেছেন মহাকর্ষবল আর তড়িৎ-চৌম্বকীয় ক্ষেত্রকে একত্রে যুক্তকারী কোন বৃহত্তর সূত্র আছে কিনা তার সন্ধানে। তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তার এই বিশ্বাসের উপর স্থির ছিলেন যে, এ রকম একটা সূত্র আছেই। প্রফেসর ডঃ আবদুস সালাম সহ বিজ্ঞানীরা আংশিক সফলতা সহ এর উপর এখন পর্যন্ত কাজ করে যাচ্ছেন। সালামের গবেষণার বিষয়বস্তু হচ্ছে বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটা 'মহা সমন্বয় মতবাদ' খুঁজে বের করা। এ সবের মধ্যে রয়েছে ঃ মাধ্যাকর্ষণ, তড়িৎ-চৌম্বকীয়, দুর্বল আণবিক শক্তি ও শক্তিশালী আণবিক শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এ সকল দৃশ্যত বিচ্ছিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে সমন্বিত করার প্রচেষ্টা কেন ? মোটের উপর, এ সকল বলের সমন্বয় ছাড়াও তো প্রকৃতিকে বুঝতে আমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না। আসলে, এই সকল বলকে একটি বলে সমন্বিত করার অভিপ্রায় বিজ্ঞানীদের মধ্যে জন্মেছে এই বিশ্বাস থেকে যে, এ বলগুলো একটি একক

১. এই ধ্রুবককে স্পন্দনসংখ্যা দ্বারা গুণ করা হলে ফোটন নামক প্রতিটি আলো প্রবাহের সাথে সংশ্লিষ্ট ন্যূনতম শক্তির পরিমাণ পাওয়া যায়।

www.bjilibrary.com

সত্ত্বারই ভিন্ন ভিন্ন বহিঃপ্রকাশ মাত্র। বোঝা যায়, তড়িৎ-চৌম্বকীয় এবং দুর্বল আণবিক বলদ্বয়কে সমন্বিত করার ব্যাপারে সালামের প্রচেষ্টা ও সফলতার মূলে ছিল সূরা আল-মূলক-এর ৩য় ও ৪র্থ আয়াতদ্বয়ের প্রেরণা যা তাঁর মধ্যে সৃষ্টিজগতের শৃঙ্খলা ও সঙ্গতি সম্পর্কে অনড় বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে।

কাজেই, সূত্রসমূহের মধ্যে বিশিষ্ট কোন নমুনা অনুসন্ধানের২ অর্থই হলো আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকর্মের মহাপরিকল্পনায় বিশ্বাস। বস্তুত বিজ্ঞানের জগতে আরো বহু বিষয় আছে যেগুলোর ভিত্তি হলো 'বিশ্বাস'।

আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে উপরোক্ত আলোচনাগুলো জ্ঞানজগতে মানুষের অগ্রগতির পিছনে বিশ্বাসের ভূমিকার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। কাজেই, আল্লাহ্‌র দাবীকৃত 'অদৃশ্যে' বিশ্বাস অযৌক্তিক নয়। কেননা, অদৃশ্য বস্তু আমাদের বোধগম্যতার বাইরে থাকে আমাদের বর্গীয় সীমাবদ্ধতার কারণে। এখানে যা কিছু বলা হয়েছে তা এ বিষয়টির উপরই জোর দিচ্ছে যে, অদৃশ্যের বিশ্বাস বস্তুগত জগত সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নাও হতে পারে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. The Philosophy of the Physical Science, The University of Michigan Press, 1958.
2. The Structure of Scientific Revolutions, Encyclopaedia of Unified Science. The University of Chicago Press, 1974.

www.bjilibrary.com

١٩- أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي
آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ○

২ ঃ ১৯ অথবা তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ যে, আকাশে বৃষ্টির পানি ভরা মেঘপুঞ্জ, এর সাথে ভীষণ অন্ধকার, মেঘ গর্জন ও বিদ্যুতের ঝলকও রয়েছে; এরা বজ্রের গর্জন শুনে মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেয়, কিন্তু আল্লাহ্ এই অবিশ্বাসীদেরকে সকল দিক দিয়ে বেষ্টন করে নিয়েছেন।

বৃষ্টিভরা মেঘমালা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলীয় বাষ্পের পুঞ্জ যা বাতাসে ভেসে বেড়ায়। এ ধরণের মেঘমালা, যার সঙ্গে গর্জন ও বিদ্যুৎ চমকও থাকে তাকে 'cumulo nimbus' অথবা thunder-heads বলা হয়। এসব দেখতে বড় বড় পাহাড়ের মত-মেঘরাজি, যার বিস্তৃতি ১০ থেকে ১০০ বর্গমাইল এবং উচ্চতায় ৩০,০০০ থেকে ৪০,০০০ ফুট হয়ে থাকে। এই মেঘপুঞ্জ পৃথিবীর খুব নিকট থেকে অর্থাৎ প্রায় ৬৫০০ ফুট উপর থেকে শুরু হয়। এই বিরাট উচ্চতার বা গভীরতার জন্য এই মেঘপুঞ্জ অন্ধকারময় হয়। সূর্যের আলো মেঘমালায় প্রবেশ করে পানি ও বরফ কণায় প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়। ফলে খুব সামান্য আলো এই মেঘপুঞ্জ ভেদ করে পৃথিবীতে পৌঁছতে পারে। তাই এই পানিভরা মেঘপুঞ্জকে নিচ থেকে কালো দেখায়। এই মেঘপুঞ্জের অন্ধকার সর্বক্ষেত্রে একরূপ নয়; উপরের দিকে সামান্য অন্ধকার কিন্তু নিচের দিকে ক্রমেই এই অন্ধকারের গাঢ়ত্ব বাড়তে থাকে এবং সর্বনিম্নে গভীর অন্ধকারে পরিণত হয়। সুতরাং এই মেঘপুঞ্জের অভ্যন্তরে বিভিন্ন গভীরতার অন্ধকার এই মেঘপুঞ্জে আর একটি ব্যাপার ঘটিয়ে থাকে, তাহলো এতে বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চিত হয়ে থাকে। তবে এতে বিদ্যুৎশক্তি (electric charge) সম্পন্ন কণার সংখ্যা এবং মেঘমালার অভ্যন্তরে এদের গতির সঠিক পরিসংখ্যান জানা নেই। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে বিশেষ করে এই বিদ্যুৎশক্তির উৎস এবং বিদ্যুতায়িত এলাকা সম্পর্কে। সবচেয়ে প্রধান মতবাদ হলো–মেঘের অভ্যন্তরে বিদ্যুতায়িত কণাগুলো, ion capture, contact electrification, বরফ হয়ে যাওয়া (freezing) এবং drop break up পদ্ধতিতে থিতিয়ে যাওয়ার ফলেই বিদ্যুতায়িত হয়।[১] অন্য এক মত হলো–বিদ্যুতায়িত কণাগুলোর মেঘের অভ্যন্তরে উপরে ও নিচে ধাবিত হবার ফলে মেঘের মধ্যে বিভিন্ন শক্তির বিদ্যুতায়িত এলাকার সৃষ্টি হয়। অন্য আর একটি মতে বিদ্যুতায়িত কণা ও বৃষ্টির কণা বাতাসের প্রবল বেগে উঠানামা

করার ফলে মেঘপুঞ্জের হিমায়িত এলাকায় পৌঁছে গেলে পানির কণাগুলো বরফ কণায় পরিণত হয়। এই বরফে পরিণত হওয়ার সময় কণাগুলো ফেটে যায় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফ কণা ছিটকে পড়ে। এই বরফের ক্ষুদ্র কণাগুলো ধনাত্মক বিদ্যুৎ শক্তি বহন করে নিয়ে যায় এবং সেখানে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ এলাকা সৃষ্টি করে।

ধনাত্মক বিদ্যুৎ শক্তি সম্পন্ন ক্ষুদ্র বরফকণাগুলো হালকা উর্দ্ধগামী বায়ুর সাহায্যে মেঘপুঞ্জের উপরের দিকে উঠে যায়। আর ভারী ঋণাত্মক বিদ্যুৎসম্পন্ন বরফকণাগুলো মেঘপুঞ্জের নিচের দিকে অবস্থান করে। এর ফলে মেঘপুঞ্জের অভ্যন্তরে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎ এলাকা পৃথক হয়ে যায়। যখন এই বিপরীত বিদ্যুৎ শক্তি এতটা বৃদ্ধি পায় যে, মধ্যবর্তী বাতাস এই দুই শক্তিকে পৃথক করে রাখতে পারে না, তখন এক বিরাট অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এই দুই এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে সংঘটিত হয়। এই দু'য়ের মধ্যে অথবা এদের যে কোন একটা ও পৃথিবীর মধ্যে ভোল্টেজ পার্থক্য (শক্তির পার্থক্য) প্রায় ১০০ কোটি ভোল্ট পর্যন্ত হতে পারে। এই স্ফুলিঙ্গ মেঘপুঞ্জের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে অথবা এক মেঘমালা থেকে অন্য মেঘমালায় বা মেঘমালা থেকে পৃথিবীতে বিস্তৃত হতে পারে। এই স্ফুলিঙ্গগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলক। আকাশের বিদ্যুৎ চমক ও বজ্রপাত এই স্ফুলিঙ্গেরই বহিঃপ্রকাশ।

মেঘমালার এই বজ্রপাত প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টি করে (১০,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড); বাতাসের প্রবল সম্প্রসারণ (expansion) ঘটে এবং প্রচণ্ড শব্দ তরঙ্গ ভেসে আসে যা আমরা বজ্রধ্বনি হিসেবে শুনতে পাই।

সুতরাং বৃষ্টিভরা মেঘপুঞ্জে রয়েছে ঃ (ক) বিভিন্ন স্তরের অন্ধকার, এবং (খ) বিদ্যুৎ শক্তির সঞ্চয় যা একই সঙ্গে বিদ্যুৎ-চমক বা lightning এবং প্রচণ্ড বিস্ফোরণ যা আমরা বজ্রধ্বনি হিসেবে শুনতে পাই।

উপরে বর্ণিত মেঘমালা সৃষ্টির পদ্ধতি এবং বিদ্যুৎ চমক ও বজ্রপাতের আধুনিক আবহাওয়া বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যায় বক্ষ্যমাণ আয়াতের বর্ণনা মেঘের অন্ধকার, বজ্রপাত ও বিদ্যুৎ চমক ইত্যাদির পারস্পরিক সম্পর্ক বেশ ভালভাবে বোধগম্য হয়।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Encyclopaedia of Science and Technology, McGraw Hill, 1977, p. 688
2. World Book of Encyclopaedia, vol.7.1966, p. 432

www.bjilibrary.com

٢٠. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

২ ঃ ২০ বিদ্যুৎ চমক তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়। যখনই বিদ্যুতালোক তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় তখনই তারা পথ চলতে থাকে এবং যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তখন তারা থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করতেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

মানুষের দৃষ্টিশক্তি আলোর প্রতি সংবেদনশীল। এই আলো সাধারণভাবে দৃশ্যমান বর্ণালি হিসেবে পরিচিত যা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মাপে 3,800 Å থেকে 7,200 Å পর্যন্ত বিস্তৃত (1 Å = ১ এ্যাংস্ট্রোম = $১০^{-৮}$ সেঃ মিঃ)। আলোর প্রতি চোখের প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ করে রডোপসিন (রড) এবং আইডোপসিন (কোন্) নামে অক্ষি-গোলকের দু'টি কোষের রঞ্জক পদার্থ। রড ও কোন্‌সমূহ হচ্ছে আলোক গ্রহণকারী কোষ। এগুলোর উপর আপতিত আলোক সালোক-রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার কারণে একটা অনুভূতির সৃষ্টি করে। রডসমূহ রাত্রিকালীন দৃষ্টির ব্যাপারে খাপ খায় এবং অনুজ্জ্বল আলোয় কাজ করে। আর কোন্‌সমূহ উজ্জ্বল আলোয় কাজ করে এবং রঙের উপলব্ধির জন্য এগুলো দায়ী। এমন জীবজন্তু আছে যাদের দৃষ্টিশক্তি শুধুমাত্র দিনে কিংবা শুধুমাত্র রাতে কাজ করে। মানুষ এদিক থেকে ভাগ্যবান; রড এবং কোন্‌সমূহের তৎপরতায় মানুষ দিনে ও রাতে দেখতে পায়। রেটিনাস্থ কিছু সংখ্যক কোষ আলোক সংকেত গ্রহণ করে এবং রড ও কোন্ দ্বারা সৃষ্ট সংকেত মস্তিষ্কে পাঠিয়ে দেয় যেখানে একটি দর্শনীয় প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়।

চোখের স্ফটিকী অক্ষিপটের সামনেই আইরস বা চোখের কনীনিকা যার কেন্দ্রে রয়েছে একটি গোলাকৃতি রন্ধ্র যা চোখের মণি হিসেবে পরিচিত। কনীনিকার কাজ হলো, ক্যামেরার মধ্যচ্ছদার মত স্বয়ংক্রিয়ভাবে আলোর তীব্রতা অনুযায়ী চোখের মণির খুলে যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা। অল্প তীব্রতায় মণির ব্যাস বাড়ে আর মধ্যম তীব্রতায় সংকুচিত হয়। আলোর তীব্রতার সাথে দর্শন সংবেদনশীলতার গবেষণায় দেখা যায়, অত্যন্ত তীব্র আলোয় রড ও কোন্‌সমূহ সংবেদনহীন হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ চমকানি অকস্মাৎ অত্যন্ত তীব্র আলো সৃষ্টি করে এবং রড ও কোন্ সমূহ কাজ না করায় মানব দৃষ্টিশক্তি সাময়িকভাবে ঝাপসা হয়ে যায়।

www.bjilibrary.com

٢٢- الَّذِىۡ جَعَلَ لَكُمُ الۡاَرۡضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّاَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً
فَاَخۡرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزۡقًا لَّكُمۡ فَلَا تَجۡعَلُوۡا لِلّٰهِ اَنۡدَادًا وَّاَنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ۝

২ ঃ ২২ যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তার দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং জেনে শুনে কাকেও আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করিও না।

যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্যে শয্যারূপে সৃষ্টি করেছেন ঃ আমরা ভূপৃষ্ঠকে সমতলরূপে পাই; আর এই সমতল বিশিষ্টতার জন্যেই আমরা পৃথিবীপৃষ্ঠে আরামে শয়ন করতে এবং বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারি। এই একই ধারণা সূরা তাহা-র ৫৩ আয়াত এবং সূরা যুখ্‌রুফ-এর ১০ আয়াতেও বিধৃত হয়েছে এভাবে ঃ 'যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্যে বিস্তৃত গালিচারূপে সৃষ্টি করেছেন।' এ সকল আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, পৃথিবীপৃষ্ঠ সমতল অথচ ধারণাটি পৃথিবী গোলাকার-এ বৈজ্ঞানিক সত্যের সাথে অসমাঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়। নিম্নোক্ত আলোচনার মাধ্যমে এই আপাত বৈপরীত্যের মীমাংসা করা সম্ভব।

আমরা জানি, একটি ক্ষেত্র যত বড় হবে তার তলের বক্রতা তত কম হবে। পৃথিবী একটি বিশাল ক্ষেত্র যার ব্যাস প্রায় ৬,৪০০ কিঃ মিঃ (প্রায় ৪ হাজার মাইল)। আর আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পৃথিবীপৃষ্ঠের খুব সামান্য একটা অংশ নিয়েই শুধু কাজ-কর্ম করে থাকি। এই অংশটুকুকে সকল ব্যবহারিক কাজে সমতল ধরে নেয়া যেতে পারে। এই স্বল্প অংশের বক্রতার পরিমাণ উপলব্ধি করার মত নয়। এমনকি, পৃথিবীপৃষ্ঠের এক মাইলের মত বড় দূরত্বও পৃথিবীর কেন্দ্রে এক ডিগ্রীর ৭০ ভাগের এক ভাগের মত অত্যন্ত সামান্য কোণ সৃষ্টি করে মাত্র।

এই প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, সেই ক্ষেত্রের তলকে সমতল বলা হয় যার ব্যাসার্ধ সীমাহীন, অনন্ত।

আর আসমান হচ্ছে তোমাদের জন্যে শামিয়ানা স্বরূপ ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে বলছেন যে, আসমান নামে পরিচিত যে বায়ুমণ্ডল তা মানুষের মাথার উপরে এক প্রতিরক্ষামূলক এবং উপকারী আচ্ছাদন হিসেবে কাজ করে। কতগুলো গ্যাসের মিশ্রণ সম্বলিত এই বায়ুমণ্ডলের রয়েছে কয়েকটি স্তর এবং একটি স্থূলাণুকৃত স্তর পৃথিবীকে ঘিরে আছে।

www.bjilibrary.com

প্রথম স্তরটিকে বলা হয় ট্রপোস্ফেয়ার এবং এটা পৃথিবীপৃষ্ঠের উপরের দিকে ৮-১৬ কিঃ মিঃ (৫-১০ মাইল) পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরে প্রায় ৪ ঃ ১ অনুপাতের আয়তনে রয়েছে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের অণু; আছে জলীয় বাষ্প কার্বনডাই অক্সাইড (co_2). এবং অন্যান্য কিছু গ্যাস ও ধূলিকণা। গ্রীনহাউসের কাঁচের ছাদের মত রাত্রিবেলা ভূপৃষ্ঠের তাপ রক্ষায় কম্বলের কাজ করে থাকে। এই স্তরটি পৃথিবী কর্তৃক রাত্রিবেলা বিকিরণকৃত সুদীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অতিক্রম করে যাওয়া প্রতিরোধ করে। এটাই গ্রীন হাউস ইফেক্ট নামে পরিচিত।

বায়ুমন্ডলের পরের স্তরটি ট্রপোস্ফেয়ারের উপরে ৭০ কিঃ মিঃ (৪৪ মাইল) বিস্তৃত। এ স্তরের নাম স্ট্রাটোস্ফেয়ার। এ স্তরে রয়েছে ওজোন অণুর (o_3)একটি স্তর। এই ওজোন স্তর পৃথিবীর প্রায় ৩০ কিঃ মিঃ উপরে অবস্থান করে সূর্য থেকে আগত ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি এবং রঞ্জন রশ্মি থেকে সকল জীবকে রক্ষা করে থাকে।

স্ট্রাটোস্ফেয়ারের প্রায় ৩২০ কিঃমিঃ (২০০ মাইল) উপর পর্যন্ত এ্যানোস্ফেয়ার নামে পরিচিত এক বিশেষ স্থূলাণু স্তর। এ্যানোস্ফেয়ার হ্রস্ব বেতার তরঙ্গ প্রতিক্ষেপণের মাধ্যমে দীর্ঘ দূরত্বের বেতার যোগাযোগে আমাদের সাহায্য করে থাকে।

বিজ্ঞানীগণ সম্প্রতি বায়ুমন্ডলের উপরে ম্যাগনেটোস্ফেয়ার নামে আরেকটি স্তর আবিষ্কার করেছেন যা চৌম্বকীয় প্রতিরক্ষা বর্ম হিসেবে কাজ করে। সূর্য থেকে নির্গত ইলেক্ট্রন ও প্রোটনকে এই স্তরে আটকানো হয়ে থাকে। এই চৌম্বকীয় প্রতিরক্ষা ছাড়া আমাদের গ্রহের উপর এসে পড়া অজ্ঞাত বিকিরণের মাত্রা হত কয়েকগুণ বেশী, যা আজ আমরা জীবনের যে সকল রূপ বা আকার দেখতে পাই তার সবগুলোকেই ধ্বংস করে দিত। সূর্যের জ্যোতির্বলয় থেকে ইলেক্ট্রন ও প্রোটন আকারে পদার্থ ২০০০০০০ কেলভিন তাপমাত্রায় চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সৌরঝড় যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বহিঃস্থ এলাকায় এসে পৌছায়, তখন তার তাপমাত্রা থাকে প্রায় ১০০,০০০ কেলভিন। এভাবে ম্যাগনেটোস্ফেয়ার এ সকল উচ্চ তাপমাত্রাযুক্ত কণার এবং এদের বিকিরণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করে। সূর্যের দিকে ম্যাগনেটোস্ফেয়ারের ব্যাপ্তি প্রায় ৬৪ হাজার কিঃমিঃ.(৪০ হাজার মাইল) এবং তা ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে সূর্যের বিপরীতে অন্তত ৬x১০৬ কিঃমিঃ (৪০ লক্ষ মাইল) পর্যন্ত বিস্তৃত।[১]

আসমান এবং বায়ুমণ্ডল বহিঃস্থ আকাশমণ্ডলী সম্পর্কে যা কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা হল তা মাত্র এই বর্তমান শতকেই আমাদের জ্ঞানের আওতায়

১. গ্রন্থখানি বিশ শতকে লেখা বিধায় বর্তমান শতক বলতে বিশ শতককেই বুঝানো হয়েছে- অনুবাদক।

আসে। প্রকৃতিতে পর্যবেক্ষণকৃত এ সকল প্রতিরক্ষামূলক ও উপকারী প্রতিক্রিয়াগুলো স্বীয় সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্‌র অপরিসীম করুণার কথাই বলে। এগুলো ছাড়া মানুষ পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারত না। এ সবই কী নিছক দুর্ঘটনা, নাকি এগুলো পরম দয়াবান ও মেহেরবান আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের স্বাক্ষর বহন করে?

আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন এবং এভাবে তোমাদের জন্যে রিযিকের ব্যবস্থা করেন ফল-ফলাদি থেকে ঃ সকল গাছপালারই তাদের পরিপুষ্টি, বৃদ্ধিসাধন, বংশবৃদ্ধি এবং বস্তুত তাদের অস্তিত্বের জন্যে পানি অত্যন্ত মৌলিক প্রয়োজনীয় উপাদান। উদ্ভিদ কোষের অভ্যন্তরে সকল বিপাকীয় প্রক্রিয়াই ঘটে একটা জলীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং এর মাধ্যমেই মাটি থেকে বিভিন্ন খনিজ পুষ্টি শোষিত হয়ে থাকে, আর প্রস্তুত খাদ্যবস্তুসমূহ পরিবাহিত হয়ে থাকে উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। আয়াতটির অত্র অংশের তাৎপর্য পুরোপুরিভাবে অনুধাবন করতে হলে প্রকৃতিতে বিদ্যমান পানি চক্র এবং উদ্ভিদ কোষের কার্যক্রমে পানির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বুঝতে হবে। কেননা, এর ফলেই উৎপাদিত হয় উদ্ভিজ্জাত খাদ্যবস্তুসমূহ যেসবের কথা আলোচ্য আয়াতে 'ফল' আকারে মানুষের রিযিক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পরিপুষ্ট ফল উৎপাদনে যে প্রক্রিয়া পূর্ণতা লাভ করে, তা কয়েকটি মজার ধাপের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। পৃথিবী-পৃষ্ঠে পতিত বৃষ্টির পানির একটা অংশ মাটি চুইয়ে নিচে চলে যায় এবং ভূগর্ভস্থ বিশাল পানি ভান্ডারের সাথে মিলিত হয়। আমাদের চারপাশে যে সকল গাছপালা আমরা দেখতে পাই, এদের অধিকাংশেরই রয়েছে জটিল পানি শোষণ ও পরিবহন ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার শুরুটা হয় উদ্ভিদের শিকড়েই যেখানে লোহা, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, পটাশিয়াম এবং আরো অনেক আবশ্যকীয় উপাদানসহ পানি আস্রবণ প্রক্রিয়ায় মূলরোমের মাধ্যমে মাটি থেকে শোষিত হয়। এই শোষিত পানি ও অন্যান্য খনিজ উপাদানসমূহ সূক্ষ্ম পরিবাহীনলের একটি জটিল ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাণরস আকারে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পৌছে যায়। উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তরস্থ অতিরিক্ত পানি শেষ পর্যন্ত বায়ু প্রান্তীয় অংশ থেকে এর আণুবীক্ষণিক রন্ধ্রপথে নির্গত হয়ে চারপাশের বায়ুতে গিয়ে মেশে। উদ্ভিদ কর্তৃক মাটি থেকে শোষিত পানির অণুসমূহ অংশত ব্যবহৃত হয় এমন এক প্রক্রিয়ায় শর্করা তৈরিতে যা আজ পর্যন্ত পরীক্ষাগারে দেখানো সম্ভব হয়নি। সালোকসংশ্লেষণ নামক এই সুনিপুণ প্রক্রিয়ায় চিনির অণুর সাথে সঞ্চিত সুপ্ত শক্তির সংশ্লেষণ ঘটে এবং এ আকারে তাদের মিলন হয় সাধারণত কান্ডে (যেমন ইক্ষু), মূলে (যেমন গাজর), কন্দে (যেমন পেঁয়াজ) অথবা বীজে যেমন কলাই ও ভুট্টা)। এদিকে আবার চিনি সঞ্চয় করে রাখার জন্য তৈরী করে শর্করা অণু।

www.bjilibrary.com

উভয় পদার্থই বিভিন্ন রকম উদ্ভিজ্জ এনজাইম দ্বারা ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটায় এবং অসংখ্য রাসায়নিক যৌগ তৈরি করে। উদ্ভিদ আবার একই শক্তির উৎস তথা চিনিকে কাজে লাগিয়ে চর্বি এবং শত শত অন্যান্য দ্রব্যের সংশ্লেষণও ঘটায়, যা জমা করে রাখার উদ্দেশ্যে ফলের মধ্যে পাঠানো হয়।

উদ্ভিদ দেহাভ্যন্তরে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারের খাদ্য তথা আমিষের এই সংশ্লেষণও অংশত বৃষ্টির পানির উপর নির্ভরশীল। বৃষ্টি চলাকালে বিদ্যুতের চমক বায়ুমন্ডলীয় কিছু নাইট্রোজেনকে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করায়। এতে নাইট্রোজেনের যে সকল অক্সাইড উৎপন্ন হয় সেগুলো নাইট্রাস এবং নাইট্রিক এসিড আকারে বৃষ্টির পানির সাথে মাটিতে এসে মেশে। অতঃপর এগুলো মাটিস্থ খনিজ পদার্থের সাথে বিক্রিয়া করে নাইট্রাইট ও নাইট্রেটে রূপান্তরিত হয়। এই সর্বশেষ প্রক্রিয়াটি আবার অংশত মাটিস্থ অণু জীবের সহায়তায় সংঘটিত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, এক জাতের জীবাণুও শিম্বগোত্রীয় উদ্ভিদের মূলে বায়ুমন্ডলীয় নাইট্রোজেন লাগাতে সক্ষম যা পরবর্তীতে মাটিকে নাইট্রোজেনীয় পুষ্টি উপাদানে সমৃদ্ধ করে। উদ্ভিদ পানির সাথে এসব নাইট্রোজেনীয় উপাদান দ্রুত শোষণ করে নেয় এবং নতুন নতুন এমাইনো এসিড তৈরি করে যা উদ্ভিদ আমিষের পূর্ব উপাদান হিসেবে কাজ করে। ঘটনাক্রমেই, কুড়ি প্রকারের মত বিভিন্ন এমাইনো এসিডের বিভিন্ন রকম সংযুক্তি বা মিশ্রণের ফলে এ সকল আমিষের সংশ্লেষণ সম্পন্ন হয়। মজার ব্যাপার হলো যে, প্রাণীরা সাধারণ অজৈব নাইট্রোজেন যৌগ থেকে সরাসরি আমিষের সংশ্লেষণ করতে পারে না। বরং তারা তাদের আমিষ ভান্ডার গড়ে তোলার ব্যাপারে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল।

উদ্ভিদবিদ্যা মতে ফল মূলত ফুলের একটি গর্ভাধানকৃত ডিম্বাশয়, আর পরিভাষাটির সাধারণ সংজ্ঞায় সকল খাদ্যশস্য ও খোসাযুক্ত ভোজ্য ডাল এর অন্তর্ভুক্ত।

মজুদকৃত খাদ্যের প্রকৃতি এবং এর পুষ্টি মূল্য অনুসারে ফলকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে, যথা ঃ ১. শর্করাসমৃদ্ধ ফল যেমন ঃ খাদ্য শস্য, খেজুর ইত্যাদি, ২. আমিষসমৃদ্ধ ফল যেমন ঃ বাদাম, ডাল ইত্যাদি, এবং ৩. স্নেহসমৃদ্ধ ফল যেমন ঃ আফ্রিকার তালের তৈল ইত্যাদি। কোন কোন ফলের মধ্যে উপরোক্ত তিন শ্রেণীর খাদ্য ছাড়াও কিছু খনিজ পদার্থ এবং খাদ্য প্রাণ আছে যা আমাদের দেহের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বৃদ্ধি সাধন ও উন্নয়নে একান্ত প্রয়োজন।

উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না যে, মেহেরবান আল্লাহ অত্যন্ত মেহেরবানী পূর্বক উপরে উদ্ধৃত দু'টি সংক্ষিপ্ত লাইনে তাঁর সুনিপুণ ব্যবস্থাপনার দিকে মানব জাতির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন। তিনি বায়ুমন্ডল ও মৃত্তিকা সৃষ্টি করে মানুষের রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি খাদ্যের আকারে তথা

www.bjilibrary.com

চিত্তাকর্ষক রং, ক্ষুধা উদ্রেককারী সুঘ্রাণ, মিষ্টি স্বাদ ও আকৃতিবিশিষ্ট নানাপ্রকার সুমিষ্ট ফলফলাদির মাধ্যমে তিনি মানুষের রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন।

মানুষ কী তবে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে না!

٢٤- فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ○

২ ঃ ২৪ যদি তোমরা আনয়ন না কর, এবং কখনই করতে পারবে না, তবে সেই আগুনকে ভয় কর মানুষ এবং পাথর হবে যার ইন্ধন, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে।

(জাহান্নামের) আগুন যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর

জ্বালানি এমন এক বস্তু যা তাপশক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। দহনের মাধ্যমে রাসায়নিক শক্তি মুক্ত করা কিংবা পরমাণু বিভাজন অথবা একীভবনের দ্বারা আণবিক শক্তি মুক্ত করার মাধ্যমে তাপশক্তি উৎপাদিত হয়ে থাকে। আমাদের জ্ঞানের আওতাধীন যে পাথর তা শুধু দহন অযোগ্যই নয়, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে পাথরকে দহন নেভানোর কাজে লাগানো যেতে পারে। কাজেই, যে সকল পাথর জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হবে সেগুলোকে অবশ্যই এমন ধরনের হতে হবে যা উচ্চ তাপমাত্রায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হলে এর গঠন উপাদানগুলো আলাদা হয়ে যাবে। এভাবে মুক্ত উপাদান বা উপাদানগুলো তখন তাপ উৎপাদক রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে পরিবেশগত বস্তুর সাথে। আর এভাবেই, চুল্লির তাপমাত্রা বজায় থাকে। ব্যাপারটা পরিষ্কার করার জন্য আমরা ক্যালসাইট নামে (অর্থাৎ মার্বেল কিংবা চুনাপাথর) একটা সাদামাটা পাথর বিবেচনায় আনতে পারি। এটি প্রধানত ক্যালসিয়াম কার্বনেটের একটা প্রাকৃতিক রূপ। অবাধে উত্তপ্ত করলে এটি ৫৫০ সেঃ গ্রেঃ তাপমাত্রায় বিশিষ্ট হয়ে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং কার্বনডাই অক্সাইডে পরিণত হয়। ক্যালসিয়াম অক্সাইড ২৫৭০ সেঃ গ্রেঃ তাপে গলে যায় এবং আরো উচ্চ তাপমাত্রায় একে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে ফুটানো যায়। এর গঠন-উপাদান ক্যালসিয়াম ও অক্সিজেন পেতে হলে একে এমনকি আরো উচ্চ তাপমাত্রায় বিশ্লিষ্ট করতে হবে। এভাবে বেরিয়ে আসা ক্যালসিয়াম নিম্নতর তাপমাত্রায় অক্সিজেনের সাথে পুনরায় মিলিত হতে পারে, কিংবা অন্যান্য পদার্থের সাথে মিলিত হয়ে পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করতে পারে। আর এভাবেই ক্যালসিয়াম পরিবেশের তাপমাত্রা বজায় রাখে কিংবা বৃদ্ধি করে। চুনাপাথর বা মার্বেল হচ্ছে পাথরের সরল দৃষ্টান্ত। আরো অনেক জটিল

www.bjilibrary.com

গঠন-প্রকৃতি ও কাঠামোর পাথরও রয়েছে যেগুলো মার্বেলকে জ্বালানি হিসেবে কাজে লাগানোর জন্যে যে তাপমাত্রা প্রয়োগের প্রয়োজন তার তুলনায় অনেক বেশী উচ্চ তাপে তাদের গঠন-উপাদানে বিভক্ত হয়। কাজেই, এটা স্পষ্ট উপরোক্ত আয়াতে জাহান্নামের জ্বালানি হিসেবে পাথরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্য যে, কাফেররা যেন সচেতন হতে পারে তাদের শাস্তির জন্য দোজখের আগুনের তাপমাত্রা হবে চরম উচ্চ। একইভাবে ঐ উচ্চ তাপমাত্রায় মানবদেহ ভস্মীভূত হবে এবং জ্বালানির কাজও করবে।

٢٨- كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

২ ঃ ২৮ **তোমরা কীরূপে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার কর ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদেরকে জীবন্ত করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীবন্ত করবেন। পরিণামে তাঁর দিকেই তোমরা ফিরে যাবে।**

আয়াতটি বুঝার জন্য প্রথমে মানবজীবন সৃষ্টি এবং এর মধ্যে নিহিত প্রজন্ম সৃষ্টি ব্যবস্থার কৌশল ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কিছু কিছু বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন, এ্যামিবার মত সরল এককোষ বিশিষ্ট জীব থেকে বিবর্তন ধারার মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে প্রথম মানবের আগমন ঘটে। অণু-পরমাণু থেকে পৃথিবীতে প্রথম মানবের আগমনের ব্যাখ্যার ভিতরে অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ খোঁজা যেতে পারে। জীববিজ্ঞানীগণের অন্ধ বিশ্বাস মতে, জীবনের সবচেয়ে সুবিধাজনক সংজ্ঞা হলো এই যে, এটি এমন একটা স্তর যেখানে কোন কিছুর উদ্ভব ঘটে এবং তা নিজ থেকে অনুরূপ কোন কাঠামো তৈরী করতে সক্ষম। আমাদের আজকের জানা মতে, অণু স্তরে জীবনের যাত্রা শুরু হয় ডিএনএ (ডিঅক্সিরাইডনিউক্লিইক' এসিড) নামক একটি অত্যন্ত জটিল অণু এবং এনজাইমের সম্মিলিত রাসায়নিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। ডিএনএ-ই জীবনের মূল প্রেরণাবৃত্তি প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ ও উদ্ভূত করে। এনজাইমটি একটি অণুঘটক হিসেবে কাজ করে। কাজেই, ডিএনএ এবং এর রাসায়নিক ক্রিয়া অণুঘটক এনজাইমটির সৃষ্টি ব্যাখ্যা করা গেলে জীবনের উৎপত্তিরও ব্যাখ্যাদান সম্ভব।

অত্র আয়াতের আরেকটি ব্যাখ্যা নিহিত রয়েছে এই সত্যের মধ্যে যে, জন্মের আগে মানুষের কোন দৈহিক অস্তিত্ব নেই। পিতামাতা উভয়ের ডিএনএ-সম্বলিত গর্ভাধানকৃত ডিম্বাণুই মানুষের সর্ব প্রাথমিক অস্তিত্ব। পিতামাতার শুক্রাণু

www.bjilibrary.com

ও ডিম্বাণু পুষ্টি থেকে প্রাপ্ত অণু ও পরমাণু সমন্বয়ে গঠিত। সব খাদ্যই আবার পাওয়া যায় শাকসব্জি ও প্রাণীজগৎ থেকে। আমিষ, স্নেহ, শর্করা এবং খাদ্য প্রাণসহ সকল খাদ্য উপাদানই হচ্ছে পৃথিবী এবং এর পরিবেশের মধ্যে বিদ্যমান অজৈব ধাতু ও অণু থেকে প্রাপ্ত জৈব যৌগ। প্রাণীদেহের ব্যবহারের জন্য উদ্ভিদ কর্তৃক ধাতব কার্বন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, সালফার, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, কোবাল্ট ইত্যাদিকে জৈব কিংবা জৈবধাতবীয় অণুর আকারে রূপান্তরের কৌশল একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং খোদায়ী মেহেরবাণীরই বহিঃপ্রকাশ বটে। কাজেই, দেখা যাচ্ছে যে, মানবদেহের গঠন-উপাদান যে সকল অণু ও পরমাণু, তারা অজৈব ধাতু হিসেবে পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। এগুলোই উদ্ভিদ কর্তৃক একটা বিশেষ প্রক্রিয়ায় জৈব আকার লাভ করে। পিতামাতা যে খাদ্য গ্রহণ করে তা থেকেই উৎপন্ন হয় শুক্রাণু ও ডিম্বাণু, আর একটা ভ্রূণ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত শিশুতে পরিণত হয় তার মাতা কর্তৃক গৃহীত পুষ্টির দ্বারা। কাজেই, (প্রমাণিত হয় যে) সকল মানুষ জন্মের আগে ছিল প্রাণহীন আল-কুরআনের এ বক্তব্য সঠিক। কিছু কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন, একবার যদি ডিএনএ-র অস্তিত্ব কোথাও পাওয়া যায়, তাহলে সেখানে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই জীবনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। কিন্তু, কেউ কেউ যেমন বিশ্বাস করেন, প্রকৃতি থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিএনএ-র উদ্ভব হওয়া কি সম্ভব? ডিএনএ অণুর গঠন অত্যন্ত জটিল অথচ সংগঠিত। তাপীয় গতির দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী যে কোন অনিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়ার কারণে বিশৃংখলা বৃদ্ধি পায়। যখনই কোন ব্যাপারের পশ্চাতে উদ্দেশ্য সম্বলিত পরিকল্পনা থাকে, তখনি সেখানে শৃংখলা কাজ করে। কাজেই, যে আকারে ডিএনএ-কে আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই আকারে এর অস্তিত্বে আগমন শুধুমাত্র আল্লাহ্র করুণাতেই সম্ভব হয়েছে। তথাকথিত টেস্ট টিউব শিশু আসলে পিতা ও মাতার নিকট থেকে টেস্ট টিউবে সংগৃহীত যথাক্রমে শুক্রাণু ও পরিপক্ক ডিম্বাণুর টেস্ট টিউবেই গর্ভাধানের ফল ছাড়া আর কিছু নয়। মাতৃগর্ভের বাইরে এ ধরনের গর্ভাধান সামুদ্রিক জীবের মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়ম হিসেবেই বিদ্যমান। যদি গর্ভাধানকৃত মানব ডিম্বকটি সাফল্যের সাথে মাতৃগর্ভে স্থাপন করা যায়, তখন গর্ভধারণ সফল হতে পারে। কাজেই, টেস্ট টিউব শিশুর মধ্যকার প্রাণ বিজ্ঞানীগণের সৃষ্টি নয়।

পৃথিবীতে প্রথম জীবন কণিকার উদ্ভব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাথে আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের মিল লক্ষণীয়। অবশ্য বহু জিজ্ঞাসা আছে যা বৈজ্ঞানিক মতবাদসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারে না। এটা সত্য যে, পরমাণু ও অণুই জীব ও জড় উভয় বস্তুর গঠন-কাঠামোর সর্বশেষ বা চূড়ান্ত উপাদান। কিন্তু একটি জীবে কীভাবে পরমাণুর সম্মিলন জীবনের স্পন্দন আনে তা ব্যাখ্যা করা

www.bjilibrary.com

সম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে যে সকল পরমাণু ও অণু রয়েছে তার সবগুলোকে যদি বিজ্ঞানীরা একটা পাত্রে জড়ো করে তাতেই কোন জীবন সৃষ্টি হবে তা নয়। আমরা জানি না, কোথা থেকে আসে জীবনের এই স্ফুলিঙ্গ। মানুষ বস্তু ও চেতনার সম্মিলন। বিজ্ঞান শুধু জীবনের বস্তুগত দিকটারই ব্যাখ্যা দিতে পারে। বিজ্ঞানের বর্তমান প্রণালীর এটাই একটা সীমাবদ্ধতা যে, তা সবকিছুকে বস্তুগত দৃষ্টিকোণেই ব্যাখ্যা করে থাকে। মানবীয় গুণাবলী তথা চেতনা, বিবেক, ভালবাসা, স্নেহ ও আবেগ ইত্যাদি বিবেচনায় না আনলে মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা হয় না। বিজ্ঞান জীবনের এ সকল মৌলিক গুণাবলির ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম নয়।

কাজেই, বিশ্বাস করা কঠিন নয় যে গর্ভাধানের আগে মানুষের কোন অস্তিত্ব ছিল না, বরং সে ছিল প্রাণহীন অজৈব পরমাণু ও অণু মাত্র। অনুরূপভাবে, মানুষ মৃত্যুবরণ করলে পুনরায় যে মৌল উপাদানে পরিণত হয় তা তার আগে আগুনে ভস্ম করা হোক, কিংবা কবরে জীবাণুতে খেয়ে ফেলুক, আর বন্য প্রাণী ও পাখী কিংবা মাছের পেটেই যাক ঐ একই মৌল বস্তু-উপাদানসমূহ পুনরায় চক্রাকারে অন্য কোন জীবজন্তু কিংবা মানুষ তৈরি করতে পারে।

٢٩- هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ
فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝

২ঃ২৯ তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আকাশের দিকে মন সংযোগ করেন এবং তাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন; তিনি সব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

আয়াতটির প্রথমাংশের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ রয়েছে। কারণ, এটি সাধারণভাবে মানব জাতির নিকট এবং বিশেষভাবে মুসলমানদের নিকট বিরাট তাৎপর্যবহ। প্রথমত এই আয়াত মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তার বিশেষ ভূমিকার কথা বুঝাচ্ছে যার জন্যে আল্লাহ্ পৃথিবীতে সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়ত, এ আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন যে, পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে তার সবই মানুষের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। অর্থাৎ এটা স্পষ্ট যে, এ সকল জিনিসের কোন কিছুই খামাখা বা বৃথা মানুষের কোন উপকার ছাড়াই সৃষ্টি করা হয়নি। তৃতীয়ত যেহেতু আল্লাহ্ এবং একমাত্র আল্লাহ্ই সবকিছু পৃথিবীতে মানুষের জন্য সৃষ্টি

www.bjilibrary.com

করেছেন, মানুষের উচিত এসব কিছু আল্লাহ্‌র প্রতি সুগভীর কৃতজ্ঞতার সাথে ব্যবহার করা। এভাবে ব্যবহারের জন্যে মানুষকে এসব সম্পর্কে নিয়মতান্ত্রিক জ্ঞান এবং প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

আয়াতটি মানুষকে দান করেছে এক বিশেষ মর্যাদা, কুরআনের অন্যত্র যাকে আল্লাহ্‌র খলিফার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। মানুষকে আল্লাহ্‌র খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে হলে সমস্ত কিছু তার সেবায় ও কর্তৃত্বে থাকতে হবে। বিভিন্ন রং ও বর্ণ, স্বাদ ও চেহারা এবং আকৃতি-প্রকৃতি সহ নানা বৈচিত্র্য সম্বলিত জীব ও জড়বস্তুর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে তার দৈহিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আত্মিক পরিতৃপ্তি লাভ নিশ্চিত হতে হবে।

অত্র আয়াতটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করছে যে, পৃথিবীস্থ সকল জিনিসেরই উপযোগিতা রয়েছে মানুষের নিকট। ঘটনাক্রমে আধুনিক পরিবেশ বিজ্ঞানীগণ আমাদের মধ্যে বিশ্বাস জন্মাচ্ছেন যে, আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তার সবই দরকারি যাতে আমরা প্রকৃতির ঐকতানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাস করতে পারি। পৃথিবীতে অস্তিত্বমান সব কিছুই যে মানুষের কোন কোন কাজে লাগে এই সত্যটা আজ অধিক হারে সকলেই অনুধাবন করছেন এবং এটাকে স্বপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখছেন। আয়াতটির এই অর্থ পবিত্র কুরআনের অন্যান্য পরবর্তী আয়াত থেকে কিছু বাড়তি সমর্থন পায় যেখানে আল্লাহ্ স্পষ্টভবে ঘোষণা করেন ঃ **কোন কিছুই অযথা সৃষ্টি করা হয়নি** (আয়াত ৩ ঃ ১৯১)। এই ঘোষণাটি অনুধাবনের জন্যে পরে অন্য প্রসঙ্গে আমরা অনেকগুলো দৃষ্টান্তের উল্লেখ করব। আপাতত এতটুকু বলে রাখাই যথেষ্ট হবে যে, যদিও পোকামাকড়, পক্ষী, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী, সর্প ইত্যাদির অনেক জাতই দৃশ্যত অপ্রয়োজনীয় মনে হয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের সাহায্যে আমরা ধীরে ধীরে এদের অনেকগুলোর উপযোগিতা খুঁজে পাচ্ছি। আমাদের বর্তমান জ্ঞানভাণ্ডার সকল ক্ষুদ্র-বৃহৎ জীব-জীবাণুর উপযোগিতা বুঝার জন্যে একেবারেই অপ্রতুল।

আলোচ্য আয়াতটি মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্যে জ্ঞানচক্ষু উন্মোচনকারী হিসেবে বিবেচনা করা উচিৎ। কারণ, এটি সেই উম্মাহ যাদের অধিকারে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদ, যদিও সেগুলোকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর প্রযুক্তি তাদের হাতে নেই। চারপাশে যে সকল নানা প্রকার বস্তুসামগ্রী ছড়িয়ে আছে মুসলিম উম্মাহ যদি সেগুলোর উপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা অব্যাহত রাখে, তাহলে আল্লাহ্ পৃথিবীতে যে সকল জিনিস মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন সেগুলো তাদের জন্যে বয়ে আনবে এক সুখী, সমৃদ্ধিশালী ও কৃতজ্ঞ জীবন এবং তারা অনুভব করতে পারবে যে, তারা আল্লাহ্‌র খলিফা। এভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, অত্র আয়াত

www.bjilibrary.com

একজন মুসলমানের জন্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টাকে অবশ্য করণীয় কর্তব্য করেছেন যাতে সে মানুষের জন্যে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি থেকে পরিপূর্ণ ফায়দা তুলে নিতে পারে।

অতঃপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং সপ্ত আসমানে শৃংখলা এবং পূর্ণতা দান করলেন ঃ আয়াতটির এ অংশে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ আসমান সৃষ্টির দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। আগে ধারণা করা হত যে, আসমান একটি কঠিন গোলাকার গম্বুজ যা পৃথিবীকে আচ্ছাদন করে ঝুলে আছে আর এই গুম্বুজেই সেঁটে দেয়া হয়েছে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সহ অন্যান্য মহাজাগতিক বস্তুসমূহ। কিন্তু কঠিন পদার্থ দ্বারা গঠিত গম্বুজের এই ধারণাটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত ও সমর্থিত হয়নি। মহাজাগতিক বস্তুসমূহ কোন গম্বুজে সাঁটানো কিছু নয়, বরং সেগুলো মহাকাশে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় রয়েছে (আয়াত ২১ ঃ ৩৩; ৩৬ ঃ ৪০)। কাজেই, এখানে আসমান সৃষ্টির অর্থ মহাজাগতিক বস্তু সম্বলিত মহাকাশ ক্ষেত্রের সৃষ্টি অর্থাৎ এই বিশ্বজগত।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ মহাকাশকে সাতটি বিশাল অঞ্চলে ভাগ করতে প্রয়াস পেয়েছেন।[১] সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

প্রথম অঞ্চলে রয়েছে সূর্য ও পৃথিবী পরিবারের গ্রহসমূহ যথা–বুধ, শুক্র ও পৃথিবী। এই গোলকাকার অঞ্চলের ব্যাসার্ধ ৮ আলোক মিনিট।

দ্বিতীয় অঞ্চলে রয়েছে সৌরজগৎ, যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আমাদের বহিঃস্থ গ্রহসমূহ মঙ্গল, বৃহস্পতি, সপ্তর্ষিমণ্ডল, শনি, ইউরেনাস এবং প্লুটো। এই গোলকাকার অঞ্চলের ব্যাসার্ধ ৫ আলোক ঘন্টা।

তৃতীয় অঞ্চলে রয়েছে সূর্যের গোটাবিশেক প্রতিবেশী। এই গোলকাকৃতি অঞ্চলের ব্যাসার্ধ ২০ আলোক বর্ষ।

চতুর্থ অঞ্চলে রয়েছে ছায়াপথ, নক্ষত্রমণ্ডলী। আগে এটাকে সমগ্র বিশ্বজগৎ বলে মনে করা হত। কিন্তু এ পর্যন্ত প্রায় ১০ কোটির মত ছায়াপথ বা গ্যালাক্সির সন্ধান পাওয়া গেছে। আমাদের ছায়াপথটি মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা বন্ধনযুক্ত প্রায় ১০ হাজার কোটি ঘূর্ণায়মান তারকার এক সমাবেশ বিশেষ। এই গোলকাকার অঞ্চলের ব্যাসার্ধ ৫০ হাজার আলোকবর্ষ।

পঞ্চম অঞ্চলে রয়েছে ২০টির মত হালকা, ঢিলে-ঢালা গোছের বন্ধনযুক্ত একগুচ্ছ প্রতিবেশী গ্যালাক্সি। এটি একটি স্থানীয় ছায়াপথ গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। এই গোলকাকার অঞ্চলের ব্যাসার্ধ ২০ লাখ আলোকবর্ষ।

ষষ্ঠ অঞ্চলে রয়েছে এক গুচ্ছ স্থানীয় ছায়াপথ গোষ্ঠী। এটি স্থানীয় সুপার ক্লাস্টার যা বৃহৎ গুচ্ছ নামে পরিচিত। এটাই হচ্ছে বৃহত্তম মহাজাগতিক সৃষ্টিকর্ম।

www.bjilibrary.com

বৃহৎ গুচ্ছগুলোর মধ্যবর্তী বিশালায়তনের স্থানে আপেক্ষিকভাবে শূন্য স্থানের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই গোলকাকার অঞ্চলের ব্যাসার্ধ সাড়ে সাত কোটি আলোকবর্ষ।

সপ্তম অঞ্চল জুড়ে যা রয়েছে তাই আমাদের জ্ঞাত বিশ্বজগৎ। ছায়াপথের সকল বৃহৎ গুচ্ছই এর অন্তর্ভুক্ত। এর ভিতর আরো রয়েছে কোয়াসার তথা ছায়াপথ বহিঃস্থ বিকিরণ উৎসসমূহ যা সমস্ত মহাজাগতিক বস্তুর মধ্যে সর্বাধিক কৌতূহল উদ্দীপক। দুই হাজার কোটি আলোকবর্ষ পর্যন্ত বিশাল দূরত্ব জুড়ে এরা ছড়িয়ে আছে।

এই সপ্তম অঞ্চলটি মহাবিশ্বের সাথে রহস্যজনকভাবে যুক্ত বলে অনুমিত হয়। মহাজাগতিক বস্তুগুলোকে সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা ঃ ১. তারকারাজি, ২. গ্রহ-নক্ষত্র, ৩. উপগ্রহসমূহ, ৪. ধূমকেতুসমূহ, ৫. নীহারিকামণ্ডলী, ৬. ছায়াপথ, ৭. কোয়াসার।

তারকারা আবার সাত ধরনের, যেমন ঃ ১. বাদামী বামন তারকা, ২. প্রধান অনুবর্তী তারকা, ৩. প্রকাণ্ড হরিৎ তারকা, ৪. কম্পমান বা মিটিমিটি তারকা, ৫. শ্বেত বামন তারকা, ৬. নিউট্রন তারকা, এবং ৭. কৃষ্ণ গহ্বরসমূহ।

মহাবিশ্ব সমঘনত্ব বিশিষ্ট নয়, যা অবিরাম সৃষ্টি মতবাদের জন্য দরকার। দেখা যায় সূর্য, বুধ, শুক্র ও পৃথিবী সমন্বয়ে প্রথম অঞ্চলের ঘনত্ব ১.৪ গ্রাম/সিসি। অথচ, নিউট্রন তারকা, কৃষ্ণ গহ্বর ইত্যাদি সমন্বয়ে গঠিত চতুর্থ স্তরের ঘনত্ব $১০^{১৪}$ গ্রাম/সিসি-র চেয়েও বেশী। কাজেই, ঘনত্বের দিক দিয়ে অঞ্চলগুলোর কিছু কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

ডঃ মরিস বুকাইলি[৩] সপ্ত আসমানকে ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে, "সাত নম্বর মানে বহুত্ব ছাড়া আর কিছু না; কাজেই বহু আসমান আর বহু পৃথিবী রয়েছে। আমাদের পৃথিবীর মত মহাবিশ্বে আরো পৃথিবী পাওয়া যেতে পারে। এ এমন এক সত্য যা আমাদের সময়ে মানুষ কর্তৃক যাচাই করা হয়নি।"

মিশরীয় পণ্ডিত শেখ মোহাম্মদ আবদুহ[৪] আকাশমণ্ডলী এবং এর বিস্ময়কর গঠন কাঠামোর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সাধারণ মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের সাহায্য নিয়েছেন। তিনি বলেন, "আকাশমণ্ডলী হচ্ছে আপনার মাথার উপরিস্থিত যা কিছু আছে তাই। আসমান যা আকাশমণ্ডলী শব্দটি শ্রবণ করে আপনি ভাববেন মহাকাশের কথা যেখানে আছে সূর্য, চন্দ্র এবং আপন আপন কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান গ্রহ নক্ষত্ররাজি। এটাই সেই আসমান যা আল্লাহ্ নির্মাণ করেছেন অর্থাৎ উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন এবং তিনিই প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্রকে বলতে গেলে এক একটি ইঁটের মত করে বানিয়েছেন যা আপনারা আপনাদেরই চারপাশের ছাদ, গম্বুজ, কিংবা দেয়ালে দেখতে পান আর তিনিই প্রতিটি গ্রহকে তার প্রতিবেশীর (দের) সাথে

www.bjilibrary.com

সাধারণ মহাকর্ষ বলের দ্বারা বেঁধে দিয়েছেন ঠিক যেমন কোন ইমারতের প্রত্যেকটি অংশকে কিছু দ্রব্য স্থাপনের মাধ্যমে সুদৃঢ়ভাবে আটকানো হয়ে থাকে।"

কিছু কিছু ব্যাখ্যাকারী 'সাত' সংখ্যাটিকে 'বহু' হিসেবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। সেক্ষেত্রে আয়াতটির অর্থ দাড়ায়. "তিনি বহু আসমান (অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী) সৃষ্টি করেছেন।" একই সঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে আমরা লক্ষ্য করি যে, সম্ভবত মহাবিশ্বে আমাদের পৃথিবীর মত বহু বিশ্বই রয়েছে। এ ধরনের প্রতিটি বিশ্বেরই উপরে একটি করে আকাশ থাকবে। কাজেই, অনেক আকাশ রয়েছে এ কথা বলা যায়। অন্য কোন বিশ্ব তথা জীবের অস্তিত্বসম্পন্ন কোন গ্রহের, আমাদের গ্যালাক্সির অন্য কোন তারকার, ছায়াপথের আকাশেও সেই একই তারকামণ্ডলী থাকতে পারে, যা আমরা আমাদের আকাশে দেখতে পাই। কিন্তু ভিন্ন প্রেক্ষাপটের কারণে নক্ষত্রপুঞ্জও আলাদা হবে। এ কারণে, এ ধরনের জগতের আকাশ দেখতে ভিন্ন রকম হবে। মহান আল্লাহ্ এক ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ মহাপরিকল্পনার অধীনে সকল আসমানকেই মহাজাগতিক বস্তু, তারকা, নক্ষত্র, উপগ্রহ, ধূমকেতু, গ্রহাণুপুঞ্জ, ছায়াপথ এবং কোয়াসার দিয়ে সম্পূর্ণতা দান করেছেন।

আমাদের বোধগম্যতার মধ্যে মহাজাগতিক বস্তুসমূহের উৎপত্তি পরিশিষ্ট-১ এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তথ্য সূত্র ঃ

1. National Geographic, June, 1983
2. Appendix II
3. Maurice Bucaille : The Bible, The Quran and Science, North America Trust Publications, USA, 1978.
4. El-Kirdany A. A. S. The Glimpses of the Scientific Unattainable Marvels of the Quran, Cairo Edition p. 19. 1977.

www.bjilibrary.com

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۖ كُلُوا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

২ ঃ ৫৭ আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করলাম; তোমাদের নিকট মান্না ও সাল্‌ওয়া প্রেরণ করলাম। বলেছিলাম, 'তোমাদেরকে ভাল যা দান করেছি তা হতে আহার কর।' তারা আমার প্রতি কোন জুলুম করে নি, বরং তারা তাদের প্রতিই জুলুম করেছিল।

মান্না ও সাল্‌ওয়া ঃ পবিত্র কুরআনের তিন জায়গায় (আয়াত ২ ঃ ৫৭; ৭ ঃ ১৬০; ২০ ঃ ৪০-৪১) মান্না ও সাল্‌ওয়ার উল্লেখ রয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই 'আন্‌যাল্‌না' কিংবা 'নায্‌যাল্‌না' শব্দের ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, হযরত মূসা (আ)-এর নির্দেশনায় বিশুষ্ক মরুভূমিতে ইসমাঈলীদের দীর্ঘ সফরকালে তাদেরকে খোদায়ীভাবে এ সকল (খাদ্য) দ্রব্য সরবরাহ করা হয়েছিল। অধিকন্তু, অত্র আয়াতে ইসরাঈলীদেরকে প্রদত্ত উত্তম খাদ্য দ্রব্যাদি ভক্ষণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু পবিত্র কুরআনে এ দু'টি পুষ্টি উপাদানের উৎস সম্পর্কে আর কোন বিস্তারিত তথ্য দেয়া হয়নি। নিম্নোক্ত আলোচনায় এ দু'টি খাদ্যকে শনাক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

মান্না ঃ প্রতীয়মান হয় যে, মান্না শব্দটি হিব্রু শব্দ। মান-হু১ কিংবা আরবী শব্দ মান-হুয়া (অর্থ ঃ এটা কী ?) থেকে নেয়া হয়েছে, যা অনুমিত হয় যে, ইসরাঈলীরা কোন কিছু অপ্রত্যাশিতভাবে মাটির উপর দেখলে পরস্পরকে এভাবে বলত। পরবর্তীকালে, মান্না শব্দটি প্রতীকী গুরুত্ব পায় এবং মরু এলাকায় খাদ্যাভাব চলাকালে আপাত অলৌকিকভাবে উৎপাদিত কোন খাদ্যের ব্যাপারে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য এ নামে পরিচিত হত, বিশেষত ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহে আজও এগুলো মিষ্টান্ন প্রস্তুতে কিংবা রেচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানকালে এ নামটি নিম্নোক্ত কোন একটি উপকরণের ব্যাপারে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে ঃ

ক. ভোজ্য শৈবাল কিংবা পুষ্পল ছত্রাকের মত পুরো জীবদেহ; দ্বিতীয়টি হচ্ছে শৈবাল ও ছত্রাকের সমন্বয়ে গঠিত যা তারা পারস্পরিক উপকারের স্বার্থেই করে থাকে।

খ. গুল্ম কিংবা বৃক্ষ থেকে নিঃসৃত এক প্রকার রস যা নিম্নোক্ত কোনভাবে তৈরি হয়ে থাকে।

www.bjilibrary.com

১) সরাসরি মানুষের তৈরি ক্ষত দ্বারা; যেমনটি করা হয়ে থাকে মান্না এ্যাশ নামক (ফ্র্যাক্সিনাস ওরনাস) এক প্রকার মরু বৃক্ষের ছাল ছিদ্র করে বানিজ্যিকভাবে রস সংগ্রহকালে; কিংবা

২) অপ্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদ প্রাণরস হিসেবে, যা ছিটপোকা কিংবা কোকিড নামীয় এক প্রকার গোলাকৃতি জীবাণুর বিষ্ঠা হিসেবে পাওয়া যায়; এই পোকাগুলো উদ্ভিদরস খেয়ে বেঁচে থাকে; অথবা

৩) বৃক্ষের লাক্ষিক ক্ষরণ বা নিঃসরণ যা কীটপতঙ্গ কর্তৃক বৃক্ষদেহে ছিদ্র সৃষ্টির দ্বারা ঘটে থাকে।

প্রথমটি বাদে অন্যান্য নিঃসৃত পদার্থগুলো পাওয়া যায় ট্যামারিস্ক বৃক্ষের বিভিন্ন জাত থেকে। কাজেই মান্না শব্দটি নানা দ্রব্যের ব্যাপারেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ইসরাঈলীদের মান্নার পরিচয় বা বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় এমন পদার্থে যা নিম্নোক্ত তিনটি শর্ত পূরণ করে ঃ

১. এটাকে অবশ্যই হতে হবে এমন এক দ্রব্য যা সিনাই এবং এর আশেপাশে পাওয়া যায়। কেননা পবিত্র কুরআনের তাফসীরকারকগণ অত্র অঞ্চলকে দীর্ঘ দিন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানো ইহুদিদের দেশ হিসেবে মেনে নিয়েছেন। অথবা এটাকে হতে হবে এমন বস্তু যাকে সিনাই উপদ্বীপের আশপাশ হতে প্রবল বাতাস বয়ে নিয়ে এসে অত্র অঞ্চলে ফেলে দিয়েছে;

২. বস্তুটির পুষ্টিগুণ থাকতে হবে; এবং

৩. সিনাই উপদ্বীপের মরু অঞ্চলে এ সকল ঘটনা চলাকালে বিপুল সংখ্যক ইসরাঈলীর ক্ষুধা নিবারণ করতে সক্ষম এমন বিপুল পরিমাণে এটি উৎপদিত হতে হবে। কিছু কিছু বাইবেল বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের মতে, প্রায় বিশ লাখ ইহুদি সেখানে ছিল। তবে, কুরআনে এ ধরনের কোন তথ্য দেয়া হয়নি।

শৈবাল তত্ত্ব ঃ জানা যায়, রাত্রিবেলা যখন প্রচুর শিশিরপাত হয় এবং মাটি ভেজা থাকে, তখন ক্ষুদ্র নাশপাতি আকৃতির কোষ আকারে নস্টক নামীয় এক ধরণের নরম ও আঠালো শৈবাল অবিশ্বাস্য রকম দ্রুত বাড়ে। এই শৈবাল নরম ও আঠোলো হওয়ায় পরদিন সকালে সূর্যতাপে শিশির উবে গেলে এবং মাটি শুকিয়ে গেলে এরা অদৃশ্য হয়ে যায়। পরদিন রাত্রিবেলা আবার এদেরকে দেখা যায়। এ সকল জীবের এ ধরণের অদ্ভুৎ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বাইবেল বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ মান্না শনাক্ত করতে শৈবাল তত্ত্ব প্রয়োগ করেন যা তাওরাতে বর্ণিত হয়েছে এভাবে যে, মান্না রাতে মাটি ভোজা থাকাকালে বেড়ে ওঠে কিন্তু সূর্যতাপ এর উপর পতিত হলে শুকিয়ে যায় ও ঝাঁঝালো দুর্গন্ধ ছড়ায় (নিষ্ক্রমণ ১৬ ঃ

www.bjilibrary.com

১৩-২১)। নস্টকগুচ্ছে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে রয়েছে প্রচুর তেল। সম্প্রতি গবেষণায় দেখানো হয় যে, নস্টক বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন নিজ দেহে আটকাতে পারে। এভাবে এটি একটি নাইট্রোজেনসমৃদ্ধ বস্তুর উৎসে পরিণত হয় এবং কিছু পুষ্টিগুণ সৃষ্টি করতে পারে। এই মর্মে খবর প্রকাশিত হয় যে, ১৮৫৫[৩] সালে ভারতের মুম্বাই রাজ্যে কয়েক বর্গমাইল এলাকা জুড়ে এক জাতের নস্টক (এন, কলিনাস) জন্মেছে। অসম্ভব নয় যে, স্থানীয় লোকজন এটা আসমান থেকে পতিত হয়েছে বলে মনে করেছিল। শৈবাল গুচ্ছের এই বিলীয়মান প্রকৃতি এবং সিনাই উপদ্বীপের মত প্রধানত বিশুষ্ক এবং অনুপযোগী পরিবেশে এদের খুব বেশী পরিমাণে জন্মানোর অসম্ভাব্যতাই বনী ইসরাঈলের খাদ্য মান্না হিসেবে নস্টককে একটি দুর্বল যুক্তি হিসেবে প্রমাণ করে।

পুষ্পল ছত্রাক ঃ নামটি দ্বারা বুঝানো হচ্ছে ছত্রাক ও শৈবালের পারস্পরিক উপকারার্থে পরিপূর্ণ সমন্বয়ে একত্র বাস। সচরাচর এদেরকে গাছ, শিলা কিংবা পাথরের উপর আবরণ বা পাতার আকারে কিংবা অধিক শাখাবিশিষ্ট হালকা সবুজ থেকে ধূসর বর্ণের কাঠামো আকারে দেখা যায়। লেকানোরা গোত্রীয় কয়েক রকম পুষ্পল ছত্রাক পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার পাহাড়ের উপরে জন্মে এবং এতদঞ্চলের অনুর্বর সমতলভূমির বিশাল এলাকা জুড়ে এবং পাহাড়ে পাহাড়ে দেখা যায়। এগুলো অসমান, কুঞ্চিত এবং দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ১০ মি. মি. এবং ৬ মি. মি. পুরুত্ববিশিষ্ট খানিকটা চ্যাপ্টা দলা আকৃতির। দীর্ঘ খরার পর এরা কুণ্ডলী পাকিয়ে সংকুচিত হয় এবং এরা যে সকল বস্তুর উপর বেড়ে ওঠে তাতে আলগা হয়ে যায়। কখনও বা এরা মটরশুঁটির মত ছোট ছোট বলের আকারে দলা পাকায়। অত্যন্ত হালকা হওয়ায় এরা বাতাসের সাথে ভেসে বেড়ায় এবং কখনও কখনও বাতাসে ভাসতে ভাসতে ওরা বহু দূর পর্যন্ত চলে যায়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত এরা মাটিতে পতিত হয়ে কয়েক সেন্টিমিটার পুরু স্তর সৃষ্টি করে। এরা যেখানে যেখানে পতিত হয়, সেখানকার মানুষের নিকট এরা থাকে অপরিচিত এবং তারা যে অবস্থায় এদেরকে দেখতে পায় সেটা ছাড়া এদের অন্য কোন অবস্থার সাথে ঐ এলাকাবাসী পরিচিত থাকে না। আকাশ থেকে রহস্যজনকভাবে মাটিতে পতিত হওয়ায় বোধগম্যভাবেই মরুভূমির গোত্রীয় লোকেরা এদেরকে সত্যি সত্যি আসমান থেকে পতিত হয়েছে বলে মনে করত। বিষয়টিকে জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, এটি এমন একটি সজি উৎপাদন প্রক্রিয়া যাতে পুষ্পল ছত্রাক দেহের ছড়ানো ছিটানো অংশসমূহ অনুকূল পরিবেশে নতুন করে উদ্ভিদ আকারে জন্মাতে ও বেড়ে উঠতে সক্ষম। পুষ্পল ছত্রাকের এ রকম ব্যাপক বেড়ে ওঠার ঘটনা ১৮৫৪ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ চলাকালে ইরানে ঘটেছিল বলে জানা যায়। অভুক্ত-অনাহারী মানুষ তখন আনন্দ

www.bjilibrary.com

আর কৃতজ্ঞতায় আত্মহারা হয়ে ওঠে[৪ক]। ১৮৯১ সালে তুরস্কে একই রকম ঘটনা ঘটে 'বৃষ্টি খাদ্য'-এর আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে ঠিক এমন এক সময়ে যখন সেখানে কঠিন খরা আর দুর্ভিক্ষ চলছিল[৪খ]। লেকানোরা এসকুলেন্টা নামক এক জাতের পুষ্পল ছত্রাক বর্তমানে পরিদৃষ্ট হয় ইরানী মরুভূমি এবং দক্ষিণ সোভিয়েত, তুরস্ক ও উত্তর সিরিয়া হয়ে বিশাল কিরঘিজ প্রান্তর জুড়ে। সিনাই মরুভূমি, মিশর এবং উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা হয়ে খানিকটা এলাকা বাদ দিয়ে পুষ্পল ছত্রাকের এই জাত পুনরায় পাওয়া যায় আলজিরিয়া, মরক্কো এবং এটলাস পর্বতমালার দক্ষিণ ঢাল অঞ্চলে। যদিও বর্তমানে সিনাই উপদ্বীপে মান্না ছত্রাক আর দেখা যায় না তথাপি এটা অসম্ভব নয় যে, হযরত মূসা নবীর (আ) সময়কালে উক্ত অঞ্চলে এই ছত্রাকের অস্তিত্ব ছিল। এমনকি যদি ধরেও নেয়া হয় যে, এ সকল পুষ্পল ছত্রাক ঐ সময়ে সিনাই অঞ্চলে ছিল না, তথাপি আফ্রিকার মূল ভূখণ্ড থেকে এদের বাতাস দ্বারা বাহিত হয়ে অত্রাঞ্চলে স্থানান্তরিত হওয়া ছিল খুবই সম্ভব একটা ঘটনা। এ সকল পুষ্পল ছত্রাক জেলি সহযোগে খাওয়া হয় যা মরু অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ বা দুষ্প্রাপ্যতার সময় খাদ্যমানের যোগান দেয়। যাযাবর গোত্রগুলো তাদের আয়ত্বাধীন পুরো ভৌগলিক এলাকায় এই ছত্রাকের সাথে সুপরিচিত। এগুলো নানাভাবে রান্না করা যায়। কখনও কখনও একগাদা ছত্রাক গুঁড়ো করে রুটি সেঁকার জন্য এক ধরনের মিশ্রণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, এ ধরনের ছত্রাক ইসরাঈলীদের মান্নার অন্তত একটা অংশ ছিল 'বৃষ্টি খাদ্য' আকারে বিপুল পরিমাণে অকস্মাৎ আবির্ভূত হওয়া এবং এদের পুষ্টি মানের কারণেই এটা সম্ভব ছিল।

গুল্ম ও বৃক্ষের লাক্ষিক ক্ষরণ ঃ মহান পারস্য পণ্ডিত ও বিজ্ঞানী আল-বিরুনী (৯৭৩-১০৫০ খ্রিঃ) ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি এই বক্তব্য প্রকাশ করেন যে, মরু ঝোপ, উষ্ট্র কন্টক (আল হাগি মৌরোরাম) পত্র থেকে পাওয়া বা সংগৃহীত মান্না (ফার্সী গাযান জাবিন বা তারান জাবিন) বা বৃক্ষ নির্যাস আসলে এক প্রকার ক্ষুদ্র পোকার[৫] মাধ্যমে তৈরি হয়। এই ক্ষরণ-নির্যাস বৃক্ষ শাখায় ঘন হয়ে আটকে থাকে এবং কাপড়ের উপরে ঝাঁকানি দিয়ে এটি সংগ্রহ করা হয়। আলহাগি মান্না নামে এই স্যাকারিন জাতীয় বস্তুটিকে এক সময় আসমান থেকে বৃক্ষের উপরে পতিত সুমিষ্ট নির্যাস বলে মনে করা হত। সিনাই পার্বত্যাঞ্চলে এ রকম 'আসমানের রুটি' বা আসমান থেকে রুটি নাজিল হওয়ার একটি চাক্ষুষ বিবরণ প্রকাশিত হয় ১৪৫৮ সালে। এতে ব্রেইটেনব্যাচ লেখেন ঃ এটি ভোরে শিশির কিংবা তুষারের মত পড়ে এবং ঘাস, প্রস্তর এবং বৃক্ষপল্লবে গুটি গুটি আকারে ঝুলে থাকে। এটি মধুর মতই সুমিষ্ট[৬ক]। অতঃপর, ১৮২৩ সালে এহ্‌রেনবার্গ নামে এক জার্মান উদ্ভিদবিদ মান্নার এক ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। এতে

www.bjilibrary.com

তিনি মত প্রকাশ করেন যে, মান্না বিশেষ বিশেষ কিছু পোকা দ্বারা সৃষ্ট গুল্ম জাতীয় গাছের ছিদ্রপথে নিঃসৃত নির্যাস ছাড়া আর কিছু নয়[৬ঘ]। আল-বিরুনী আট শত বছর আগেই উষ্ট্র কন্টক নামে মরু ঝোপ সম্পর্কে এরূপ মত প্রকাশ করেছিলেন। গসিপেরিয়া মেনিফেরা নামে এই পোকা বা কীট সিনাই উপদ্বীপাঞ্চলে গুল্ম জাতীয় গাছের শাখা ছিদ্র করে মান্নার নির্যাস ক্ষরণের কারণ ঘটায়। এহরেনবার্গের গবেষণাপত্র প্রকাশের একশ বছর পর বোদেনহিমার ও থিওডোর কর্তৃক সিনাই উপদ্বীপে এক মান্না অভিযান সংগঠিত করেন। তাদের প্রাপ্ত ফলাফল ব্রেইটেনব্যাচ এবং এহরেনবার্গের মতকে নিশ্চিত করে যে, উপরে উল্লিখিত ক্ষুদ্র পোকা প্রধানত গুল্ম বৃক্ষে বাস করে যা সিনাই অঞ্চলেই জন্মে থাকে।[৬গ]

অপরাপর বিশেষজ্ঞগণ দেখিয়েছেন যে, এফিড নামীয় পোকা যা গাছে পরজীবী হিসেবে বাস করে, তাদের অতি সূক্ষ্ম মুখাংশসমূহ গাছের পরিবহনতন্ত্রের রসের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। এর চাপে গাছের ভিতরের তরল বস্তু এফিডের পরিপাকতন্ত্রের ভিতর দিয়ে এর দেহের পিছনের অংশের শেষ প্রান্তে এসে 'হানি ডিউ' অর্থাৎ সুমিষ্ট বৃক্ষ নির্যাসের ফোঁটা তৈরি করে।[৭] এই সুমিষ্ট বিষ্ঠা প্রথমে তরল থাকে কিন্তু পরে চটচটে আঠালো হয় এবং ঘন ও শক্ত হয়ে স্ফটিকী আকার ধারণ করে শাখা-প্রশাখার চারদিকে লেগে থাকে কিংবা সাদা দানার মত হয়ে মাটিতে পড়ে থাকে। সুমিষ্ট এই বৃক্ষ নির্যাসে থাকে বেশ কয়েকটি যৌগিক শর্করা, কিছু এমাইনো এসিড, ফসফরাস যৌগ আর অজৈব কণিকা। পোকা কর্তৃক সৃষ্ট গুল্মবৃক্ষের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে নিঃসৃত লাক্ষিক ক্ষরণের মধ্যে থাকে বিভিন্ন ধরনের শর্করা তথা সুক্রোজ, লেভুলোজ, গ্লুকোজ, ডেক্সট্রিন আর পানি।[৮] কাজেই, এ সকল বৃক্ষক্ষরণ এবং বৃক্ষরস খেয়ে বেঁচে থাকা পোকার সুমিষ্ট বিষ্ঠা ইসরাঈলীদের দৈনন্দিন খাবারের অংশ বিশেষ ছিল বলে বিশ্বাস করার কারণ আছে। অবশ্য পরিমাণগত দিক দিয়ে এ দু'ধরনের মান্না আর শৈবাল মান্নার স্তূপের মধ্যে তুলনা চলে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। মরুচারী বেদুঈনরা আজও গুল্ম মান্না সংগ্রহ করে থাকে-ভোরবেলা, সূর্যতাপে গলে যাবার কিংবা পিঁপড়া কর্তৃক খেয়ে ফেলার আগে যেমনটি উল্লেখ করেছেন বোদেনহিমার ও থিওডোর।

সালওয়া ঃ সালওয়া হচ্ছে কোয়েল, তথা গ্যালিফর্ম শ্রেণীর ফিস্যান্ট, তিতির এবং টার্কি জাতীয় এক প্রকার অতিথি পাখীর আরবী প্রতিশব্দ (কনটারানিক্স)।[৯] কোটারনিস ডালগারিস নামে এ জাতের একটি অতি পরিচিত অতিথি পাখি সমগ্র এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় পাওয়া যায়। পাখিটি একটি ছোট তিতির আকারের এবং ফিলিস্তিন এলাকায় এটি ব্যাপক সংখ্যায় বংশ বিস্তার ঘটায়।

www.bjilibrary.com

বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময়ে মার্চ মাসে এদের আকস্মিক আবির্ভাব ঘটে। শীতকালে এরা আফ্রিকার অপেক্ষাকৃত উষ্ণ এলাকায় পাড়ি জমায়। এটা একটা সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য যে, অতিথি পাখিরা তাদের দীর্ঘ ভ্রমণকালে অন্যান্য কৌশলের মধ্যে বাতাসের প্রবাহকেও কাজে লাগায়। অনুকূল বাতাসের সাহায্যে তারা আফ্রিকা থেকে হাজারে হাজারে, লাখে লাখে হঠাৎ করেই কখনও বা মাত্র এক রাতেই পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ফিরে আসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে বহু ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা মিশর ও ফিলিস্তিনে এ ধরনের দীর্ঘ ভ্রমণ স্বচক্ষে দেখেছেন বলে কথিত আছে।[১০]

কোয়েল পাখির এমন উড্ডয়ন পেশী আছে যেগুলোর রয়েছে দ্রুত সংকোচনের সাথে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা। এরা হঠাৎ করেই সজোরে খাড়াভাবে উপরের দিকে উঠে যেতে পারে। কিন্তু অক্সিজেন এবং অন্যান্য শক্তির জ্বালানী মাংশপেশীতে বহন করে নিয়ে যাওয়ার মত যথেষ্ট রক্তনালী এদের নেই। এ কারণে, এরা দীর্ঘক্ষণ উড়তে অক্ষম।[১১] বার কয়েক তাড়া করে ভয় দেখালে এরা ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে পড়ে এবং সহজেই হাত দিয়ে ধরা যায়। অসম্ভব নয় যে, ইসরাঈলীরা কোয়েল পাখিদের এই দৈহিক দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়েছিল।

আমিষ সমৃদ্ধ কোয়েলের মাংস শর্করা সমৃদ্ধ মান্না সহযোগে গঠন করত একটা চমৎকার সুষম আহার । কোয়েল পাখির সাথেই মান্নার আসার ব্যাপারটা এ ধারণাকেই সমর্থন করছে যে, আফ্রিকার মূল ভূখণ্ড থেকে প্রবল বাতাসের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে আসা শৈবালই ছিল মান্না, অন্তত আংশিকভাবে।

তথ্য সূত্র ঃ

1. Smith, W. Q., Dictionary of the Bible. 1876.
2. Moldenke, H. N. and Moldenke A. L., Plants of the Bible, Chronica Botanica Co. USA, 1952.
3. Smith, J. Bible Plants. Their History with a Review of the Opinions of Various Writers Regarding Their Identification, 1878.
4. (a) Brouk. B. Plants Consumed by Man. Academic Press. London. 1975.
   (b) Encyclopaedia Britannica.
5. Meyeroff, in Isis 37. pp. 31-36. 1947.

www.bjilibrary.com

6. (a) (b) (c). Keller, W., The Bible as History, Hodder & Stoughton, London. pp. 129-131. 1974.
7. Harrison S. G. 1951. Manna and Its Sources, Kew Bulletin, pp. 407-417. 1950.
8. Said, Hakim M., The potential of Herbal Medicines in Modern Medical Therapy, Hamdard Medicus, Vol. 26 (2), pp. 3-25, 1983.
9. Wortabet, J. and Porter H., Wortabet's Pocket Dictionary. Arabic-English, Beirut.
10. Ali, A. Y., The Holy Quran, Text, Translation and Commentary, Vol. 1. Sheikh Mohammad Ashraf, Lahore, 1938.
11. Peterson. R. T., The Birds, Time-Life International (Nederland). p. 49. 1968.

www.bjilibrary.com

٦٠- وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ
مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن
رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ○

২ ঃ ৬০ "স্মরণ করো, মূসা যখন নিজ জাতির জন্য পানির প্রার্থনা করল, তখন আমি বললাম, পাহাড়ের উপর তোমার হাতের লাঠি দ্বারা আঘাত কর। এর ফলে তা হতে বারটি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হল। প্রত্যেক গোত্র তার নিজের পানি গ্রহণের স্থান জেনে নিল। (তখন এই উপদেশ দেয়া হয়েছিল) আল্লাহ্‌র দেয়া রিযিক খাও, পান কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।

পৃথিবীর বাইরের আবরণ (ভূত্বক) তিন ধরনের শিলা দিয়ে তৈরি— আগ্নেয়, (igneous) পাললিক, (sedimentary) এবং রূপান্তরশীল (metamorphic)। আগ্নেয় স্তর সরাসরি 'মেগ্‌মা' (magma) বা গলিত সিলিকেটস (silicates) এর ঘনত্ব প্রাপ্তির ফল। জমাটবদ্ধ লাভা, বেসালট এবং গ্রানাইট এই দলভুক্ত। যখন আগ্নেয় শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে তলানি পড়তে থাকে তাই ক্রমে পাললিক শিলায় পরিণত হয়। শেইল (shale) বা কোমল শিলা পাললিক শিলার অন্তর্ভুক্ত। যখন প্রবল চাপের ফলে কর্দম স্তরে স্তরে জমাট বাঁধে তখনই এই কোমল শিলায় পরিণত হয়। কোমল শিলার অন্যান্য উদাহরণ হলো বেলে পাথর (sand stone) এবং চুনা পাথর (lime stone)। এগুলো আবার অসংখ্য সামুদ্রিক জীবের ক্যালসিয়াম সম্বলিত পরিত্যক্ত অংশ থেকেও তৈরি হয়ে থাকে। আগ্নেয় ও পাললিক শিলা প্রচন্ড তাপ ও চাপের ফলে রূপান্তর শিলায় পরিণত হয়। এমনিভাবে চুনা পাথর রূপান্তরিত হয়ে মার্বেল পাথরে পরিণত হয়।

পৃথিবীর বাইরের আবরণে পানি ঢুকতে পারার ভিত্তিতে ভূত্বক প্রবেশ্য এবং অপ্রবেশ্য (permeable and impermeable) হতে পারে। বালি এবং নুড়ি প্রবেশ্য, আর কাদামাটি এবং শক্ত পাথর অপ্রবেশ্য। বৃষ্টির পানি প্রবেশ্য মৃত্তিকা ও শিলার মাধ্যমে অপ্রবেশ্য শিলাময় গহ্বরে সঞ্চিত হয়ে খোলা, আবৃত অথবা বালুস্তরের নিচে জলস্রোতের সৃষ্টি করে। আবৃত জলস্রোতের আবরণ দূরীভূত হলেই পানির প্রবাহ প্রকাশ পায়।

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে পাথরে আঘাত করতে বললে তিনি আল্লাহ্ নির্দেশিত স্থানে আঘাত করায় বারটি পানির প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়ে পড়ে।

www.bjilibrary.com

٦١- وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ
لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ
أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ

২ ঃ ৬১ যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা! আমরা একই রকম খাদ্যে কখনও ধৈর্য ধারণ করব না। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর–তিনি যেন ভূমিজাত দ্রব্য শাক-সব্জি, কাঁকুড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ আমাদের জন্য উৎপাদন করেন।' মূসা বলল, তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তুর সাথে বদল করতে চাও ? তবে কোন নগরে অবতরণ কর। তোমরা যা চাও সেখানে তা আছে।'

শাক-সব্জি, শসা, গম, মসুর ও পেঁয়াজ ঃ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় উদ্ভিদ বিজ্ঞান কর্তৃক শনাক্তযোগ্য গাছপালার সরাসরি উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়াও আরো আঠারোটি দৃষ্টান্তে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে গাছপালা থেকে উৎপন্ন দ্রব্যাদি কিংবা গাছগাছালির গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র এই কিতাব প্রতীকী অর্থবিশিষ্ট আরো কয়েকটি গাছের দৃষ্টান্ত দেয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাদের পরিচয় আজও রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে।

জাতিগোষ্ঠীগত উদ্ভিদবিজ্ঞানের প্রমাণাদি এ সত্য প্রকাশ করে যে, উপরে উল্লিখিত আয়াতে যে পাঁচটি গাছগাছালির উল্লেখ করা হয়েছে, মূসা নবীর (আ) নেতৃত্বে ইসরাঈলীরা যখন দলে দলে দেশ থেকে বহির্গমন করে তখনি সেগুলো মিশরে ছিল। বিশুষ্ক ধূ ধূ মরুভূমিতে ভ্রমণকালীন সময়ে একই রকম মান্না ও সালওয়া (কোয়েল) খাবারের একঘেয়েমিতে তারা হাঁপিয়ে উঠেছিল এবং বিরক্তিতে হাপিত্যেশ শুরু করেছিল। মিশরের সুস্বাদু খাদ্যসম্ভারের প্রতি লালায়িত অথচ তা থেকে বঞ্চিত ইসরাঈলীরা মূসা নবীর (আ) নিকট অভিযোগ পেশ করে তাকে আল্লাহ্র নিকট দোয়া করতে বলল তিনি যেন নিচে আলোচিত পাঁচটি খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করেন ঃ

بقل -বাক্‌ল বা শাকসব্জি ঃ শব্দটি দ্বারা এমন এক বা একাধিক পাতা কিংবা সম্পূর্ণ লতাগুল্মকে বোঝানো হয়েছে যা রান্না করা এবং খাওয়া যায়। কিথ[১] ও মিগাহিদ[২] তাদের লিবিয়া ও সৌদি আরবের মরুভূমিতে পুষ্পোৎপাদন

www.bjilibrary.com

বিষয়ক বিবরণীতে বিকি-র অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন যা সাধারণভাবে ইংরেজীতে শাকসব্জি ও সালাদ (পর্তুলাকা লেরাসিয়া) হিসেবে পরিচিত। এটি মাটির উপরে লতিয়ে যাওয়া রসাল পত্রবিশিষ্ট ছোট গুল্মবিশেষ যা বিশ্বের উষ্ণ অঞ্চলগুলোতে বিশেষত অনুর্বর ও আংশিক উর্বর মরুভূমিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এর মাংসল পাতা মিশর সহ বিশ্বের অনেক অংশে সালাদ এবং চাটনি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্যান্য আরো অধিক পাতাবিশিষ্ট শাকসব্জির পাশাপাশি এটি মিশরে অবস্থানকালীন সময়ে ইসরাঈলীদের খাবারে সালাদের আইটেম হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল।

قثاء -ক্বিছ্ছা' বা শসা (কিউকামিস স্যাটিভাস) ঃ আরবী শব্দ ক্বিছ্ছা' অর্থ শসা, লাউ জাতীয় সব্জি পরিবারেরই এক সদস্যের নাম। এ গাছটির উৎপত্তি সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে কিছু জানা যায়নি। তবে ক্যান্ডলিও ধারণা করেন যে, সহস্রাধিক বছর আগে ভারতে এটির চাষ হত এবং অতঃপর তা পাশ্চাত্যে ছড়িয়ে পড়ে। মিশরে ১২শ রাজবংশের৪ শাসনামলে খ্রিষ্টপূর্ব ১৯৯১ সালের৫ দিকে ব্যাপক আকারে এটির চাষ করা হ'ত। শসার খাদ্যমান প্রধানত এটির শর্করা ও খাদ্যপ্রাণের মধ্যে নিহিত। ভক্ষণযোগ্য অংশে রয়েছে প্রায় ৯৫% ভাগ পানি, ০.৭ % ভাগ আমিষ, ০.১% ভাগ স্নেহ, ৩-৪% ভাগ শর্করা এবং ০.৪% ভাগ আঁশ। এটিকে একটি নিম্ন ক্যালরী যুক্ত খাবার হিসেবে গণ্য করা হয়।

فوم - ফুম বা রসুন (এলিয়াম স্যাটিভাম) ঃ স্টেইনগ্যাস৬-এর মতে, আরবী শব্দ ফুম বা তুম-এর অর্থ রসুন, গম কিংবা রুটি তৈরির অন্যান্য ভুট্টা অথবা মটর গাছ।

এ গাছটি মিশরের রাজবংশ শাসনপূর্ব আমলে (খ্রিঃ পূঃ ৩০০ সালের আগে) মিশরে পরিচিত ছিল। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের নিকটও এটির পরিচিতি ছিল। এতে রয়েছে প্রায় ৬৪% ভাগ পানি, ৭% ভাগ আমিষ, ০.২% ভাগ স্নেহ, ২৮% ভাগ শর্করা এবং ০.৮% ভাগ আঁশ। ঝাঁঝালো গন্ধের কারণে রসুন সাধারণভাবে একটা গন্ধবর্ধক উপাদান হিসেবে গণ্য হয়, নিজ গুণে সব্জি হিসেবে নয়। সক্রিয় প্রধান উপাদান এলিসিনের গুণে রসুনের মধ্যে জীবাণু নাশক গুণ বিদ্যমান।

بصل - গম (ট্রিটিকাম ডিকোকাম) ঃ গম উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যশস্য। ১২টি বিভিন্ন জাতের গম আছে যার মধ্যে এমার জাতীয় গমই (ট্রিটিকাম ডিকোকাম) চাষাবাদকৃত জাতের গমসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এটির চাষাবাদ করা হয়ে আসছে বলে

www.bjilibrary.com

জানা যায়। এই গমের প্রাচীনতম দানা খ্রিঃ পূঃ ৬৭৫০[৮] সালে পূর্ব ইরাকের উঁচু অঞ্চল জার্মোতে খনন তথা খননকৃত গর্তে পাওয়া যায়। অধুনা সকল বিশেষজ্ঞই একমত যে, এম্মার জাতের গম প্রাচীন মিশরে আবাদ হত। মিশরের পঞ্চম রাজবংশের শাসনকালে (খ্রিঃ পূঃ প্রায় ৩৫০০ সাল) দেয়ালে খোদাইকৃত শস্যাঙ্কন চিত্রে দেখা যায় যে, একজন কৃষক গমের শীষ কর্তন করছে।[৯] গমের দানা থেকে তৈরি হয় খাবার অথবা আটা যা রুটির প্রধান উপাদান। পুরো শস্য দানাটিতে আছে প্রায় ১৩% ভাগ পানি, ১১.৫% ভাগ আমিষ, ২% ভাগ স্নেহ, ৭০% ভাগ শর্করা, আর ২% ভাগ আঁশ।

আরবী শব্দ 'ফুম'-এর যে তিনটি বিকল্প অর্থ স্টেইনগ্যাস দিয়েছেন তার মধ্যে রসুন মিশরে ইসরাঈলীদের দ্বারা গন্ধবর্ধক উপাদান হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকবে, কিন্তু তাদের অন্যতম প্রধান খাদ্য আইটেম হিসেবে নয়। অপরদিকে, প্রাচীন মিশরের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যশস্যের আবাদ হিসেবে এবং সেই সাথে এর পুষ্টিগুণের কারণে গম ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। তৃতীয় বিকল্প হিসেবে আরবী শব্দ 'ফুম'-এর অর্থ মটর গাছ (বা শস্য) হওয়া প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে। কেননা, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া থেকে বিলম্বে চতুর্থ ও ৬ষ্ঠ শতকে আরব অভিযানকালে আবিসিনিয়ার ইথিওপিয়ায় এটির প্রচলন ঘটে।

عدس - মসুর ডাল (লেন্স এসকুলেন্টা) : সম্ভবত এই সুপরিচিত ডালটির উৎপত্তি হয় নিকটপ্রাচ্য কিংবা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই এটি চাষাবাদ হয় এবং প্রাচীন মিশরীয় ও গ্রীকদের নিকট এটি ছিল পরিচিত। পুরো বীজের মধ্যে রয়েছে প্রায় ১১.২% ভাগ পানি, ২৫% ভাগ আমিষ, ১% ভাগ স্নেহ, ৫৫.৪% ভাগ শর্করা এবং ৩.৭% ভাগ আঁশ। উচ্চ আমিষ উপাদানের জন্যে এটি ব্যাপকভাবে স্যুপ এবং ভাঁপে তৈরি খাদ্যে ব্যবহৃত হয়।

بصل - পেঁয়াজ (এলিয়াম সেপা) : ইরান, পাকিস্তান এবং আরো উত্তরের পার্বত্য দেশগুলোতে পেঁয়াজের উৎপত্তি বলে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতে প্রাচীন কাল থেকে পেঁয়াজের চাষ হয়। প্রাচীন মিশরে পেঁয়াজ জনপ্রিয় খাবার ছিল বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কেননা, খ্রিঃ পূঃ ৩২০০-২৭৮০ সালের মত সুপ্রাচীন কালে[১০] ও কবরগাহে এটির খোদাই করা চিত্র পাওয়া যায়। মমির মধ্যেও পেঁয়াজ পাওয়া গেছে। পিরামিড নির্মাতারা পেঁয়াজ খেত এবং তাদের ধর্মীয় ও শেষ কৃত্য প্রার্থনায় পেঁয়াজ ব্যবহৃত হত। বাইবেলেও পেঁয়াজের উল্লেখ রয়েছে। এতেও সেই একই পরিস্থিতির বিবরণ দেয়া হয়েছে, যাতে ইসরাইলীরা মিশরে অবস্থানকালে তারা যে পেঁয়াজ খেত সেকথা স্মরণ করে তারা তাদের কষ্টের ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করেছিল (সংখ্যা

www.bjilibrary.com

১১-৫)। তাজা শাকসব্জির তুলনায় পেঁয়াজ ছিল অপেক্ষাকৃত উচ্চ খাদ্যমান সম্পন্ন এবং আমিষ উপাদানের দিক থেকে মধ্যবর্তী আর ক্যালসিয়াম ও রিবোফ্লেভিন সমৃদ্ধ। পরিপুষ্ট পেঁয়াজে আছে ৮৬% ভাগ পানি, ১.৪০% ভাগ আমিষ, ১১% ভাগ শর্করা আর ০.৮% ভাগ আঁশ। দৃশ্যত মানানসই হরেক রকম যেসব খাদ্য মিশরে ইসরাইলীরা গ্রহণ করত, মশলাপাতি, শসা ও শাকসব্জি এবং সেই সাথে প্রধান খাবার গম ও ডাল খাদ্য তালিকায় থাকায় তা ছিল অত্যন্ত সুস্বাদু ও মজাদার।

পুরুষের জন্য ২৪ ঘন্টার খাদ্য তালিকায় প্রয়োজন হত ২৪০০-৬০০০ ক্যালরী। ক্যালরীতে এই পরিমাণ ভেদ ঘটত খাদ্য গ্রহণকারীর দৈহিক পরিশ্রমের উপর ভিত্তি করে- অর্থাৎ সে পরিশ্রমবিহীন বেকার, নাকি শ্রমিক, নাকি খেলোয়াড় তার উপর। শর্করাযুক্ত খাদ্যের ক্যালরীমান হচ্ছে ঃ ৫০০ গ্রামে ২০০ ক্যালরী অথচ প্রতি ১০০ গ্রাম আমিষ ও স্নেহজাতীয় খাদ্যে রয়েছে যথাক্রমে ৪০০ ও ৯০০ ক্যালরী। অবশ্য ক্যালরীর পরিমাণই মানবপুষ্টির উপযুক্ততা বিচারের একমাত্র বিষয় নয়। এমনকি ৩০০০ ক্যালরীর সবটাই যদি রুটি থেকে পাওয়া যায়, তাহলে তাতে মানুষের যথেষ্ট পুষ্টিবিধান হবে না। বিশেষ বিশেষ কিছু বস্তু মানুষের আবশ্যক যার মধ্যে রয়েছে খাদ্য প্রাণ এবং বিশেষত কিছু নির্দিষ্ট এমাইনো এসিড যেগুলো উদ্ভিজ্জ আমিষে দুষ্প্রাপ্য। শর্করা জাতীয় খাদ্য মান্না'য় রয়েছে সুক্রোজ, লেভুলোজ, গ্লুকোজ এবং ডেক্সট্রিনের মত চিনির প্রধান উপাদানসমূহ। এ সবই তাৎক্ষণিক শক্তির যোগান দেয়। অপরদিকে, তুলনামূলক বিচারে গমের রুটিতে যে শর্করা আছে হজমকালীন সময়ে প্রথমে তাকে ভেঙ্গে চিনিতে রূপান্তরিত করা দরকার হয়।

কলাই তথা মসুর ডালের আমিষের পুষ্টিমান উচ্চ (২৫%) বটে, তবে প্রাণীজ উৎসের আমিষের পুষ্টিমান তদপেক্ষা উচ্চ। আবার, এগুলো শাকসব্জির উৎস থেকে পাওয়া আমিষের তুলনায় আরো সহজে হজম ও শোষিত হয়। কোয়েল পাখির মাংসের মত উত্তম প্রাণীজ আমিষে সুষম এমাইনো এসিড মিশ্রণ ও স্নেহ রয়েছে, যে কারণে ডাল, শস্যদানা আর তৈলবীজের এক বিচক্ষণ মিশ্রণে একটি বিকল্প খাবার হতে পারে। এ কারণে, শুধু কোয়েলের মাংসই কলাই এবং গমের সম্মিলিত খাদ্য মানের তুলনায় আমিষের অনেক উত্তম উৎস হিসেবে বিবেচিত হবে।

মান্না ও সালওয়া-র সংমিশ্রণে যে মানের খাদ্য তৈরি হয় তাতে থাকে প্রয়োজনীয় শক্তির শর্করা এবং সেই সাথে সহজপাচ্য আমিষ, খাদ্যপ্রাণ এবং অপরিহার্য এমাইনো এসিড। এ কারণে, এই খাবার বিভিন্ন মসলা সহযোগে তৈরি ইসরাইলীদের পছন্দের খাবারের তুলনায় অনেক বেশী উন্নত মানের হওয়ার

www.bjilibrary.com

দাবী রাখে। ইসরাঈলীরা শুধুমাত্র খাওয়ার জন্য লালায়িত ছিল, অথচ গুণগত দিক দিয়ে তা ছিল তুলনামূলকভাবে নিম্ন খাদ্যমানসম্পন্ন। হযরত মূসা (আঃ)-এর ভাষায় -"তোমরা কি তাহলে উত্তমের বিনিময়ে অধমকেই বেছে নিচ্ছ?" - ইসরাঈলীদের তিরস্কারের মধ্য দিয়ে অত্র আয়াতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র অসীম প্রজ্ঞাই ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

তথ্য সূত্র ঃ

1. Keith H. G., Libyan Flora 2, Ministry of Agriculture and Agrarian Reforms, Libyan Arabic Republic, p. 791, 1965.
2. Migahid, A. M. Flora of Saudi Arabia 2, p. 815, 1978.
3. De Candolle, A., Origin of Cultivated Plants, New York (reprint 1959). 1882.
4. Purseglove, J. W, Tropical Crops Dicotyledons, Longman Group Ltd, 1968.
5. Encyclopaedia Britannica, vol. 6 p. 469, 1973.
6. Steingass, F., A. Learner's Arabic-English Dictionary, Beirut, 1972.
7. Purseglove, J. W., Tropical Crops Mononcots, Longman Group Ltd., London, 1972.
8. Brouk, B., Plants Consumed by Man, Academic Press, London.
9. Berlinger, M., Plants of the Bible in Their Natural Surroundings, 1969.
10. Purseglove, J. W., Tropical Crops, Monocotyledons, Longman Group Ltd., London, 1972.

www.bjilibrary.com

٧٤- ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ
الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهٰرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ۚ وَ
إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۗ

২ ঃ ৭৪ কিন্তু এরূপ নিদর্শনসমূহ দেখতে পাওয়ার পরও তোমাদের মন কঠিন হয়ে গিয়েছে- পাথরের ন্যায় কিংবা তা হতেও কঠিনতর। কেননা কোন কোনটি এমনও হয়ে থাকে যা হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়, কোন কোনটি বিদীর্ণ হয়ে যায় এবং তার মধ্য হতে পানি প্রবাহিত হয়। আর কোন কোনটি আল্লাহ্র ভয়ে কম্পিত হয়ে ভূপতিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে মোটেই অনবহিত নন।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তিন প্রকারের শিলার কথা উল্লেখ করেছেন (১) এক প্রকারের মধ্য থেকে পানির ধারা প্রবাহিত হয়; (২) আর এক প্রকার শিলার মধ্য থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়; এবং (৩) তৃতীয় প্রকার শিলা ভূত্বকের নীচে প্রোথিত থাকে।

যে ধরনের শিলা থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয় সে সম্পর্কে ২ ঃ ৬০ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে। যখন বৃষ্টির পানি প্রবেশ্য শিলার উপর পতিত হয়, ইহা স্বভাবতই সহজ এবং সরাসরি নিম্নগামী পথে প্রবাহিত হয়ে শেষ পর্যন্ত অপ্রবেশ্য শিলা এলাকায় প্রবেশ করে। অপ্রবেশ্য এলাকায় পানি সর্বনিম্ন স্তরে জমা হয়। সেখানে যদি প্রবল চাপ সৃষ্টি হয় তবে পানি পাথর বিদীর্ণ করে ঝর্ণা বা "আর্টেজীয়" কূপ সৃষ্টি করে। যদি পানির সরবরাহ স্থির বা অবিরাম হয় তবে ঝর্ণাধারাও স্থায়ী হয় নতুবা সাময়িক বা অবিরাম হয়ে থাকে। (২) দ্বিতীয় প্রকারের শিলাই বিদীর্ণ হয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়েছিল, যা এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

বেসাল্ট, গ্রানাইট, মার্বেল ইত্যাদি পাথর মনে হয় যেন আল্লাহর ভয়ে ভূত্বকের নীচে প্রোথিত থাকে। এগুলোই আল্লাহ্ বর্ণিত তৃতীয় প্রকারের শিলা। উপরে বর্ণিত তিন প্রকারের শিলার উদাহরণ বিভিন্ন ধরনের গুনাহ্গারদের কঠোর হৃদয়ের রূপক বর্ণনা বলা যায়- (ক) এক প্রকার, যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুশোচনা করে ক্রন্দন করে, (খ) দ্বিতীয় প্রকার, যারা কঠিন বিপদে পড়ে ক্রন্দন করে, আর

www.bjilibrary.com

(গ) তৃতীয় প্রকার, যারা কেবল ভয়ে ভীত হয়ে কম্পমান থাকে। কিন্তু মহাপাপীদের হৃদয় কঠোরতম শিলার চেয়েও কঠিন যা কোন অবস্থায়ই বিচলিত হয় না। আল্লামা ইউসুফ আলী এ ধরনের ব্যাখ্যাই দিয়েছেন কিন্তু বিভিন্ন প্রকার শিলার বৈজ্ঞানিক আলোচনা করেননি।

এ ব্যাপারে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে শিলার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ মানুষ খুব অল্পদিন হলো জানতে পেরেছে, অথচ এই তিন প্রকার শিলার কথা পবিত্র কুরআনে প্রায় চৌদ্দশ বছর পূর্বে নাযিল হয়েছে। এতে প্রমাণ হয় যে আল-কুরআন মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র বাণী।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Yusuf Ali, A. The Holy Quran.

www.bjilibrary.com

١١٧- بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

২ ঃ ১১৭ আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং যখন তিনি কিছু করতে সিদ্ধান্ত করেন শুধু বলেন 'হও', আর তা হয়ে যায়।

এ আয়াতের বিষয়বস্তু হচ্ছে বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহ্ সম্পর্কে সবচেয়ে মৌলিক ধারণা তুলে ধরা।

বিশ্বজগতের সৃষ্টি বিষয়টির অনুধাবন নিয়ে কিছু গভীর সমস্যা রয়েছে। এতে যে নৈপুণ্য ও ত্রুটিহীন দক্ষতা জড়িত তা গভীর চিন্তা ভাবনার দাবী রাখে। স্মরণাতীত কাল থেকে এই সুবিশাল বিশ্বজগৎ এবং যে পৃথিবীতে সে বাস করে তাকে বুঝার ব্যাপারে মানুষের মন ছিল কৌতুহলী। এই অনুসন্ধিৎসা বিভিন্ন সময়ে নানা পৌরানিক কাহিনীর জন্ম দিয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিশ্বজগতের উৎপত্তি সম্পর্কে জানার জন্য মানুষের অনন্ত অনুসন্ধান প্রচেষ্টা এক যুগান্তকারী সাফল্য প্রত্যক্ষ করে। আধুনিক ও উন্নত জ্যোতির্বিদ্যা প্রণালীর মাধ্যমে হাব্‌ল-এর সূত্র আবিষ্কৃত হয়। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ এবং জর্জ গ্যামো-র নৈপুণ্যের কারণে বিশ্বজগতের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসেবে বিখ্যাত 'বিগ-ব্যাঙ' (অর্থাৎ প্রচন্ড বিস্ফোরণ') মতবাদের আবির্ভাব ঘটে (আয়াত ২১ ঃ ৩০)।

অতি ক্ষুদ্রাকৃতিতে অগ্নিগোলকের এ রকম আদিমকালীন বিস্ফোরণের স্বপক্ষে সাক্ষ্য পাওয়া যায় উইলসন ও পেনজিয়াস-এর আবিষ্কার থেকে। ১৯৬৫ সালে এই বিজ্ঞানীদ্বয় ৩° ডিগ্রী কেলভিনের সমমানের তাপমাত্রায় মহাজাগতিক সূক্ষ্ম তরঙ্গের পশ্চাদ্ভূমি বিকিরণ আবিষ্কার করেন, যার জন্য তাদেরকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই সেই পশ্চাদ্ভূমি বিকিরণ যাকে প্রচন্ড বিস্ফোরণেরই একটি অবশেষ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। বিশ্ব জগৎ এবং মহাকাশের উৎপত্তি সম্পর্কে বিকল্প ব্যাখ্যা হিসেবে গুরুত্বের সাথে উপস্থাপিত স্থিতাবস্থা মতবাদ এজন্যই প্রত্যাখ্যাত হয় যে, তা এই পশ্চাদ্ভূমি বিকিরণের ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়।

১৯২৯ সালে হাব্‌ল একটি ছায়াপথের দূরত্ব এবং এর মন্দাকালীন গতিবেগের মধ্যে একটা সরলরৈখিক সম্পর্ক দেখতে পান। দূরত্ব যত বেশী, গতিবেগও ততই বাড়ে। আনুপাতিকতার ধ্রুবকটি হাব্‌ল-এর ধ্রুবক নামে পরিচিত। সরলরৈখিকতা থেকে সামান্য ভিন্নতার কারণে বিশ্ব জগতের অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লক্ষ্যণীয় ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত চলে আসে। বর্তমানে ৫৫ একক (কিঃ মিঃ/ সেঃ মেগাপার সেঃ)কে হাব্‌ল-এর ধ্রুবক হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

www.bjilibrary.com

খুলনা ৩০

তদনুযায়ী ১ হাজার ৯শত কোটি বছর আগে পৃথিবীর অস্তিত্ব ছিল না, ছিল না চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, তারা, ছায়াপথ অর্থাৎ কোন পৃথিবী বা আকাশমণ্ডলী।

সৃষ্টির সূচনালগ্নে বিপুল উত্তপ্ত ($১০^{৩২}$ ডিগ্রী কেলভিনের কম নয়) এবং অপরিসীম ঘনত্ববিশিষ্ট ক্রমান্বয়ে অদৃশ্যমান ক্ষুদ্রাকৃতির এক আদিম অগ্নিগোলক ছিল। বিগ-ব্যাঙ মতবাদ অনুসারে এই আদিমযুগীয় অগ্নিগোলকের প্রচন্ড এক বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকর্মের সূচনা হয়, আর সেই সাথেই সম্প্রসারণ ঘটে ঐ অগ্নিগোলকের। সম্প্রসারণ শুরু হতেই ব্যাপ্তি ও কালের বিবর্তন শুরু হয়ে যায়। প্রধানত ইলেকট্রন, প্রোটন, কিছু পরিমাণ ডিউটারন, হিলিয়াম এবং হাইড্রোজেন সমন্বয়ে গঠিত বস্তু প্রথমে স্থুলাণুকৃতি গ্যাসের ফুটকি সৃষ্টি করতে আরম্ভ করে। সম্প্রসারণের বলের কারণে ফুটকিগুলো পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে দূরে সরে যেতে আর স্বতন্ত্র ফুটকিগুলো নিজ নিজ মাধ্যাকর্ষণের কারণে সংকুচিত হতে থাকতো। দুটি বিপরীতমুখী বলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কারণে ফুটকিগুলোর ভিতর প্রচন্ড আলোড়নপূর্ণ গতির উদ্ভব হয়, এতে ফুটকিগুলো গোলাকৃতি, পেঁচানো ইত্যাদি বিভিন্ন আকার ধারণ করে।

বিশ্বজগতের বয়স যখন ছিল মাত্র ১ সেকেন্ড, তখন এর তাপমাত্রা ছিল $১০^{১০}$ ডিগ্রী কেলভিন এবং ঘনত্ব ছিল ১ গ্রাম/ সিসি। সেই মুহূর্তে যদি সম্প্রসারণের হার লক্ষ কোটি ভাগের একভাগ মাত্র কম হত, তাহলে বিশ্ব জগৎ কয়েক কোটি বছরের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যেত। আবার, সম্প্রসারণের হার যদি অনুরূপ ক্ষুদ্র পরিমাণে বেশী হত, তাহলে সম্প্রসারণের মাত্রা এমন বিশালতায় পৌঁছাত যে, কোন মাধ্যাকর্ষণীয় সীমার ব্যবস্থা সম্ভব হত না। যেটাই হোক না কেন, বিশাল বিশাল গ্রহ নক্ষত্র সমন্বিত কোন মহাকাশ এবং জীবনের সকল সৌন্দর্যমন্ডিত কোন পৃথিবীর অস্তিত্ব সম্ভব ছিল না। এ থেকে বিশ্বজগতের উদ্গাতার নৈপুণ্য এবং অভ্রান্ত দক্ষতাই প্রতিষ্ঠিত হয় যাঁর প্রতি যে কেউ বিমুগ্ধচিত্তে সিজদায় অবনত হতে বাধ্য।

মহাবিশ্বের বয়স যখন ১০ থেকে ১০০ সেকেন্ড তখন মহাবিশ্বের অধিকাংশ হিলিয়াম পরমাণুর পিন্ডিভূত অংশ তথা নিউক্লিয়াস তৈরি হয়। যদি ঐ সময় হিলিয়াম নিউক্লিয়াস তৈরি প্রক্রিয়ায় মহাবিশ্বের সমস্ত প্রোটন শোষিত হয়ে যেত তাহলে মহাবিশ্বের থাকত শুধু বলতে গেলে ডিউটারিয়াম অথবা হিলিয়াম নিউক্লিয়াস, থাকত না কোন হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস (অর্থাৎ প্রোটন)। এর ফলাফল হত মারাত্মক। কারণ, সূর্য ও তারকায় আণবিক প্রক্রিয়া ডিউটারিয়াম নয়,হাইড্রোজেন নির্ভর। ডিউটারিয়াম যদি হত প্রধান ফল, তাহলে তারকারাশি হাইড্রোজেন বোমার মত বিস্ফোরিত হয়ে যেত।

www.bjilibrary.com

তাপমাত্রা ৩০০০° ডিগ্রী কেলভিনে নেমে আসলে প্রোটন ও ইলেক্ট্রন থেকে হাইড্রোজেন অণু তৈরি হয়। প্রধানত হাইড্রোজেন অণু এবং সেই সাথে কিছু পরিমাণ হিলিয়াম সমন্বয়ে গঠিত বস্তু ফুটকি তৈরি শুরু করে। এগুলো পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে উড়তে থাকে। বিগ ব্যাঙ বা প্রচন্ড নিনাদের ১০^১০ বছর পর এই পর্যায়ে এসে ফুট্কি আকারে ভাসমান পদার্থ মাধ্যাকর্ষণ বল দ্বারা ঘনীভূত হয় এবং প্রথমে আদি ছায়াপথ ও পরে ছায়াপথের জন্ম দেয় যাতে পঁচিশ কোটি বছর সময় লাগে। ছায়াপথের আণবিক গ্যাস আর ধূলিকণা থেকে সৃষ্টি হয় তারকামন্ডল। তারকাস্থ পদার্থ ঘনীভূত হয়ে আসলে ঘূর্ণায়মান সৌর নীহারিকা সংকুচিত হয়ে তৈরি করে আদি সূর্য আর বহিস্থ বৃত্তাকার পরিবেষ্টক জন্ম দেয় গ্রহ-নক্ষত্র আর উপগ্রহের। এতে সময় লাগে পঁচাত্তর কোটি বছর।

মাধ্যাকর্ষণীয় সংকোচনের কারণে সূর্যের অভ্যন্তর ভাগ ১৫×১০^৬ ডিগ্রী কেলভিনের মত উত্তপ্ত হয়। এত উচ্চ চাপ ও তাপমাত্রায় সূর্য একটি গলন চুল্লির কাজ করে। এই তাপমাত্রায় ২টি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস একীভূত হলে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন সম্বলিত একটি ডিউটারিয়াম নিউক্লিয়াস তৈরি হয়। পরবর্তীতে ডিউটারিয়াম নিউক্লিয়াস আরেকটি সাধারণ হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসের সাথে একীভূত হয়ে হিলিয়ামের আইসোটোপে পরিণত হয় যার মধ্যে থাকে দু'টি প্রোটন আর একটি নিউট্রন। পরিশেষে, এ ধরনের দুটি হিলিয়াম আইসোটোপ একীভূত হয়ে একটি সাধারণ হিলিয়াম নিউক্লিয়াস গঠন করে একীভবন প্রক্রিয়ায়। ভরের ক্ষুদ্র একটা অংশ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় যাকে আইনস্টাইনের বিখ্যাত সূত্র $E=mc^2$ অনুযায়ী E আকারে প্রকাশ করা হয়। এখানে E হচ্ছে বহির্গত শক্তি, m হচ্ছে শক্তিতে রূপান্তরিত ভরের পরিমাণ এবং c হচ্ছে আলোর গতি। বহির্গত শক্তিই সূর্যকে উজ্জ্বল রাখে। সৌরশক্তিই আমাদের সকল খাদ্য ও শক্তির ভিত্তি এবং বস্তুত উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্যে এটি অত্যাবশ্যকীয়।

একটি করে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস যুক্ত করে একটার পর একটা অধিকতর ভারী নিউক্লিয়াস তথা নিওন, ম্যাগনেশিয়াম, সিলিকন ইত্যাদি তৈরি করা যায়। একীভবন প্রক্রিয়াগুলোতে দু'টি হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের একীভবনের একটি বেরিলিয়াম নিউক্লিয়াস তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু বেরিলিয়াম নিউক্লিয়াস অস্থিতিশীল হওয়ায় প্রকৃতি এটি তৈরি করা থেকে এড়িয়ে যায়। বেরিলিয়াম উৎপাদনকারী একীভবন ক্রিয়ায় তারকাস্থিত সমস্ত হিলিয়াম দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যেত আর তৎপরবর্তী বিক্রিয়ায় কার্বন, অক্সিজেন প্রভৃতি তৈরি হত। এ ধরনের

www.bjilibrary.com

বিক্রিয়াগুলোতে যে দ্রুততার সাথে শক্তি নির্গত হয় তাতে তারকাঝড়ের মত তারকাগুলো বিস্ফোরিত হত। বস্তুত ফ্রেড হোয়লি হিসেব করে দেখান যে, তারকা বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে যখন প্রক্রিয়াটি শেষ হত, ততক্ষণে কার্বন তৈরি হয়ে থাকত। এভাবে মহাবিশ্বে থাকত বিশাল বিপুল পরিমাণে কার্বন, কিন্তু থাকত না সালফার, সিলিকন, লোহা প্রভৃতির মত ভারী মৌলিক পদার্থ। প্রয়োজনের খাতিরেই বেরিলিয়ামকে হতে হত অস্থিতিশীল। কিন্তু তাতে আরেক সমস্যা দেখা দিত। বেরিলিয়াম থেকে যদি কার্বন তৈরি না হত, তাহলে কার্বন তৈরি হত কীভাবে? হিলিয়াম নিউক্লিয়াস একীভবনের মাধ্যমে কার্বন তৈরি হতে পারত। তবে সম্ভবত এ প্রক্রিয়াটি হত অত্যন্ত কম। হোয়লির হিসেব মতে এ সম্ভাব্যতা বাড়াতে হলে একটা অণুনাদী বিক্রিয়া ঘটা প্রয়োজন। আর এই বিক্রিয়ার জন্যে কার্বন নিউক্লিয়াসকে একটা বিশেষ উত্তেজিত অবস্থায় থাকতে হবে। এই অবস্থার সন্ধান করা হয়েছিল এবং দেখা গেল কার্বন নিউক্লিয়াসে সঠিক শক্তিতে এমন একটা উত্তেজিত অবস্থা বিরাজ করে।

সূর্য সৃষ্টির সাথে সাথেই পৃথিবী সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয়। আর বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে একে বর্তমান আকারে আনা হয়। সাড়ে চারশ কোটি বছর আগে আন্তঃতারকামণ্ডলীয় গ্যাস ও ধূলিকণা সমন্বয়ে গঠিত একটি অনুজ্জ্বল, রক্তিম-উত্তপ্ত ঘূর্ণায়মান গোলক হিসেবে পৃথিবীর যাত্রা শুরু। তাপমাত্রা কমে এলে পৃথিবী তরল অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। পরবর্তীকালে ১০০ কোটি বছরের মত পরে এর কোন কোন অংশে কঠিন আস্তরণের সৃষ্টি হয়। বিদ্যুৎ চমকানি আর অগ্নি-উদগীরণ চলতে থাকে হর হামেশা। আর অগ্নিময় গ্রহটিকে ঘিরে থাকে এক বাষ্পীয় বায়ুমণ্ডল। পৃথিবীপৃষ্ঠ ঠাণ্ডা হয়ে এলে বাষ্পীয় জলকণা ঘনীভূত হয় এবং ভারী বর্ষণ শুরু হয়। বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্টি হয় নদী, হ্রদ, সাগর ও মহাসাগর। তখন পর্যন্ত জীবনের উন্মেষ না ঘটায় পৃথিবীপৃষ্ঠ পরিণত হয় পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি, আগ্নেয়গিরি আর প্রবহমান লাভাক্ষেত্রে পরিপূর্ণ এক ধূ-ধূ মাঠে। পৃথিবীর আয়ন স্তর কঠিন হবার পর পরবর্তী ৩০০ কোটি বছর সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। পরে উষ্ণ সাগরগুলোতে জীবন সৃষ্টি হয়। এ ছিল অত্যন্ত আদিম যুগীয় ঘটনা। প্রথমে সৃষ্টি হয় এক কোষী জীব, তারপর আসে সাগর জলের শেওলা এবং অমেরুদণ্ডী প্রাণী। সর্বপ্রাথমিক মেরুদণ্ডী প্রাণী আদিম যুগীয় ধরনের এক প্রকার মাছের উন্মেষ ঘটতে সময় লাগে তৎপরবর্তী আরো একশ মিলিয়ন বা দশ কোটি বছর। ভূমিতে উদ্ভিদ জন্মানো শুরু হলে অমেরুদণ্ডী প্রাণীরাও সেখানে হানা দিতে থাকে এবং সেখানে তাদের সংখ্যা

www.bjilibrary.com

বাড়তে থাকে। জমিতে খাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকতে সক্ষম এমন প্রাণীরা সংখ্যায় বেড়ে যায়। এভাবে জলজ প্রাণীদের আধিপত্যের সমাপ্তি ঘটে।

এরই মধ্যে পৃথিবীপৃষ্ঠ ভেঙ্গে কয়েকটি ঠাণ্ডা, কঠিন এবং প্রায় একশো কিলোমিটার পুরু প্লেইটে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং এস্থেনোস্ফেয়ার নামে এক উষ্ণ, অপেক্ষাকৃত প্লাস্টিক ধরনের অংশত গলিত অঞ্চলের উপর ভাসতে শুরু করে। পৃথিবী আজও সেই অবস্থায়ই আছে। এই খণ্ড বা চাকতিগুলোর আবরণ স্তরের সঞ্চালন গতি মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা তাড়িত হয়ে ঘুরতে থাকে। এটি প্লেইট টেকটোনিক্স নামে পরিচিত। এ সময়ের মধ্যে এই গতিবেগ বেশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মহাদেশীয় চাকতিগুলোর মধ্যে সংঘর্ষের কারণে বিশালায়তন ভাঁজ বিশিষ্ট পার্বত্যাঞ্চল গড়ে ওঠে। আর এভাবেই সমাপ্তি ঘটে সামুদ্রিক প্রাণীদের আধিপত্যের এবং সেই সাথে ইউরোপ ও এশিয়ায় উদ্ভব হয় সুউচ্চ পর্বতমালার।

পরবর্তী ১৪ কোটি বছরকে বলা যায় সরীসৃপের যুগ। এ সময়কালে সরীসৃপরা সংখ্যায় ও আকারে বড় হয়। পাখী ও স্তন্যপায়ীদের তখন আবির্ভাব ঘটে, তবে তারা দৃষ্টির অগোচরেই রয়ে যায়। অধিকাংশ সময়ে দৈত্যাকার সরীসৃপ ডাইনোসর ভূমিতে বসবাসকারী জীবজগতের উপর আধিপত্য চালায়। এ সময়কালে প্লেইট টেকটোনিক্স -এর কারণে রকি, আন্দিজ, পানামা শৈলশিরা পর্বতের আবির্ভাব ঘটে।

বিগত সাড়ে ছয় কোটি বছরে পৃথিবীতে স্তন্যপায়ী প্রাণীর বৃদ্ধি ঘটে বিপুল সংখ্যায়। গত এক লক্ষ বছর ধরে মানব প্রজাতি পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করে আছে। মহাদেশীয় প্লেইট টেকটোনিক্স-এর কারণে অভ্যুদয় ঘটে হিমালয় এবং আলপস পর্বতমালার। আর পৃথিবীর শক্তিশালী গতিবেগের কারণে মহাদেশসমূহ এবং সাগরগুলো বর্তমান আকার-আকৃতি গ্রহণ করে।

এতসব যুক্তি এটাই প্রমাণ করছে যে, একীভবন প্রক্রিয়ায় ডিউটারিয়াম নিউক্লিয়াস প্রধান সৃষ্ট বস্তু না হওয়ায় বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে (ভারী নিউক্লিয়াসসমূহের বেরিলিয়াম নিউক্লিয়াসকে এড়িয়ে চলা) পৃথিবীর সংশ্লেষণ ও সৃষ্টি কোন প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা নয়। এগুলো মহাবিশ্বকে তার অস্তিত্বে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে এক মহাপরিকল্পনারই অংশমাত্র। উপরোক্ত যুক্তিগুলো আরো প্রমাণ করে কীভাবে দৃশ্যত ছোটখাট ব্যাপার মহাবিশ্বের সার্বিক মহাপরিকল্পনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাড়ায়। বস্তুত আল্লাহ্ই মহাবিশ্বের মহাপরিকল্পক।

www.bjilibrary.com

١٦٤- إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي
الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۖ وَّتَصْرِيفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ
الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

২ ঃ ১৬৪ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের পরিবর্তনে, যা মানুষের হিত সাধন করে তা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল জলযানসমূহে, আল্লাহ্ আকাশ হতে যে বারিবর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীব-জন্তুর ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে।

অত্র আয়াতে আল্লাহ্র বহুবিধ নিদর্শনের প্রতি বিশেষভাবে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। যেমন ঃ

ক. আসমান ও যমিনের সৃষ্টি;

খ. দিন ও রাতের প্রভেদ;

গ. মানব কল্যাণে সাগরবক্ষে যাতায়াতকারী জাহাজ;

ঘ. আল্লাহ্ আসমান থেকে যে বারিবর্ষণ করান, যা মৃত ধরিত্রীকে পুনর্জীবিত করে এবং তাতে সব রকমের জীবজন্তুকে ছড়িয়ে দেন;

ঙ. বায়ুর (দিক) পরিবর্তন; এবং

চ. আসমান ও যমিনের মধ্যবর্তী স্থানে (ভাসমান) অনুগত মেঘমালা।

ক. আসমান ও যমিনের সৃষ্টি ঃ পৃথিবী এবং আকাশমণ্ডলী সৃষ্টির ব্যাপকভাবে গৃহীত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলো সূরা বাকারার ১১৭ নং আয়াতে এবং পরিশিষ্ট-২ এ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। সেখানে মহাবিশ্বের উদ্দেশ্যপূর্ণ সৃষ্টিতে আল্লাহ্র মহত্ত্ব সম্পর্কে চিন্তার উদ্রেককারী চিহ্ন বা নিদর্শনের কথা আমরা বিস্তারিতভাবেই তুলে ধরেছি। মহাবিশ্বের অসংখ্য বস্তু ও কাঠামোর মধ্যে রয়েছে একক ছায়াপথ থেকে শুরু করে সুবিশাল এমন সব গুচ্ছ যেগুলোর প্রতিটির মধ্যেই রয়েছে প্রায় পাঁচ শত ছায়াপথ।

www.bjilibrary.com

মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রতিটি পর্যায়েই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের রহমতের প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশ্বজনীনভাবে স্বীকৃত ও গৃহীত 'বিগ ব্যাঙ' তথা 'বজ্রনিনাদ' মতবাদ বলছে যে, একটি ভীষণ ঘন, অতি উত্তপ্ত এবং অতিমাত্রায় ক্ষুদ্র আদিম অগ্নিগোলকের অকস্মাৎ বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে মহাবিশ্বের যাত্রা শুরু। বিস্ফোরণের পর সৃষ্টির সর্বপ্রাথমিক পর্যায়ে মহাবিশ্বে ছিল ফোটন সাগরে নিমজ্জিত অদ্ভুত সব কণিকা আর প্রতি কণিকা। সম্প্রসারণের হার যদি প্রকৃত হারের তুলনায় সামান্য কম বা বেশী হত, তাহলে তারকামণ্ডলী ও সৌরব্যবস্থা গড়ে ওঠার বহু আগেই নক্ষত্রের বিস্ফোরণ ঘটে যেত। কিভাবে মহাবিশ্ব ৩০০০° কেলভিন তাপমাত্রার মত ঠাণ্ডা অবস্থায় নক্ষত্রের অভ্যন্তরে নিউক্লিয়াসের সংশ্লেষণের ফলে হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে শুরু করে ভারী মৌলিক পদার্থ উৎপাদিত হয় তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। একীভবন বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সংঘটিত নিউক্লিয়াস সংশ্লেষণের এই প্রক্রিয়ায় বেরিলিয়াম উৎপাদন এড়িয়ে যায়। কেননা, অন্যথায় তারকা বিবর্তনের পথে না এগিয়ে নাক্ষত্র বিস্ফোরণ ঘটে যেত। নিউক্লিয়াস সংশ্লেষণের এই প্রক্রিয়ায় মহাবিশ্বের মাত্র ২৫%-৩০% ভাগ পদার্থ হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে রূপান্তরিত হয়। যদি ঐ সময়ে মহাবিশ্বের সব ফোটন শোষিত হত, তাহলে কোন গ্রহ-নক্ষত্র কিংবা সূর্যও থাকত না। কারণ এ সবের মধ্যকার আণবিক প্রক্রিয়া হাইড্রোজেনভিত্তিক। সৃষ্টির আদিতে সংঘটিত বিগব্যাঙ বা বজ্রনিনাদের (t) সময় = 0) অবশিষ্টাংশ সম্প্রতি দু'জন আমেরিকান পদার্থ বিজ্ঞানী ২.৭৬ ডিগ্রী কেলভিন হিসেবে শনাক্ত করে বিগ ব্যাঙ মতবাদের যথার্থতা ও সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করেন যা মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনার (আয়াত ২১ ঃ ৩০) সাথে অত্যন্ত চমৎকারভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উইলসন ও পেন্‌জিয়াস কর্তৃক আবিষ্কৃত এই মহাজাগতিক ক্ষুদ্র তরঙ্গ, পশ্চাদ্ভূমি বিকিরণ সত্যিই মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র অন্যতম নিদর্শন যা এই সৃষ্টি জগতের এক বিস্ময়কর প্রমাণ উপস্থাপন করে।

পৃথিবী সৌরজগতের নয়টি বৃহৎ গ্রহের অন্যতম। বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্যণীয় যে, বিভিন্ন দূরত্বে সূর্যের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান অন্য সব গ্রহগুলোর মধ্যে পৃথিবীই একমাত্র গ্রহ যার মধ্যে জীবনের উন্মেষ ঘটা ও সমৃদ্ধি লাভের অনুকূল অবস্থা বিরাজ করে। একমাত্র পৃথিবীরই তাপমাত্রা নাতিশীতোষ্ণ, যে কারণে এখানে জীবনের ধারা চলমান থাকে। একমাত্র পৃথিবীতেই রয়েছে পানি, মানুষ, গাছপালা ও প্রাণীসহ জীবনের অস্তিত্ব, বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্যে উপযোগী একটি ভারসাম্যপূর্ণ বায়ুমণ্ডল। আমাদের সৌর পরিবারের অন্য কোন গ্রহেই জীবনের জন্য অপরিহার্য ও আবশ্যকীয় সকল অবস্থা ও শর্তাদি পাওয়া যায় না। বিপরীতপক্ষে, আমাদের পৃথিবী বাদে অন্যান্য গ্রহগুলোর বায়ুমণ্ডলে রয়েছে

www.bjilibrary.com

জীবনের বেড়ে ওঠা ও স্থায়িত্বের পক্ষে ক্ষতিকর ও প্রতিকূল এমোনিয়া, মিথেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, হিলিয়াম ইত্যাদি গ্যাস।

উপরোক্ত সবগুলো আলোচনা মহাবিশ্ব এবং মনব বসতির জন্য পৃথিবী নামক গ্রহটির সৃষ্টিতে মহান আল্লাহ্ যে সূক্ষ্ম-সতর্ক পরিকল্পনা, করুণাপূর্ণ সুদক্ষতা আর উদ্দেশ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন সে কথাই জোরালোভাবে ও পটুতার সাথে তুলে ধরছে। বস্তুত আল-কুরআনের ঘোষণা মতে, এগুলো প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিবর্গের জন্যে নিদর্শন স্বরূপ।

খ. দিন ও রাতের প্রভেদ ঃ এখানে আল্লাহ্ দিবাভাগ ও রাত্রিকালীন সময়ের পার্থক্য তুলে ধরেছেন। দিবাভাগ হচ্ছে সেই সময় যখন সূর্য দিকচক্রবালের উপরে অবস্থান করে, আর নৈশকাল হচ্ছে সেই সময় যখন সূর্য দিকচক্রবালের নিচে অবস্থান করে। দিবা ও নৈশকালীন সময়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে সূর্যের উপস্থিতি আর অনুপস্থিতি। রাত্রির আগমনে কর্মতৎপরতার ধারা বদলে যায়। দিনের কর্মতৎপরতাগুলো ধীর হয়ে আসে আর রাতের কর্মতৎপরতার জন্যে বিশেষ বিশেষ কৌশল ব্যবহৃত হয়। সূর্য অস্তমিত হয়, চন্দ্র ও তারকারাজির আলো বেরিয়ে পড়ে। দিনের প্রাণীগুলো খাদ্যের সন্ধান বন্ধ করে আশ্রয়ের সন্ধান শুরু করে; অপরদিকে, রাতের প্রাণীরা খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে আসে। দিনে পাখিরা নীড়ে ফিরে যায়, আর রাতের পাখিরা বের হয়ে পড়ে। প্রধানত প্রাকৃতিক উৎস থেকে আলো ও তাপ আসা বন্ধ হয় এবং আলো ও তাপের জন্য কৃত্রিম উৎসকে কাজে লাগানো হয়। সবুজ গাছপালা কর্তৃক সালোক-সংশ্লেষণ থেমে যায় এবং গাছপালার অভ্যন্তরে নতুন ধরনের কর্মতৎপরতা শুরু হয়। সাগর সমীরণ দিক পরিবর্তন করে। এভাবে দেখা যাচ্ছে, দিবসের অবসানে এবং রাতের আগমনে সমগ্র কর্মতৎপরতার ধারাই পরিবর্তিত হয়ে যায়।

দিবাভাগ ও রজনীকালের মধ্যে দীর্ঘতার দিক দিয়েও পার্থক্য আছে। স্থান-কাল ভেদে দিন ও রাতের দৈর্ঘ্যের প্রভেদ ঘটে অর্থাৎ পৃথিবী পৃষ্ঠের অংশে এবং বছরের দিনভেদে এই পার্থক্য সূচিত হয়।

পৃথিবীর রয়েছে দু'ধরনের গতি ঃ ১) নিজ অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণনের আহ্নিক গতি, এবং ২) সূর্যের চতুর্দিকের কক্ষপথে পরিক্রমণের বার্ষিক গতি। এই বার্ষিক অক্ষীয় গতির কারণে সূর্য বছরের বিভিন্ন দিনে পৃথিবীর আকাশে বিভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করে বলে মনে হয়। পৃথিবীর এই ঘূর্ণন পথ কিংবা সূর্যের দৃশ্যত বার্ষিক পরিক্রমণ পথ এক বিশাল বৃত্ত, যা ক্রান্তিবৃত্ত নামে পরিচিত। আবার পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারদিকে আহ্নিক এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলী গতির কারণে সূর্য নিরক্ষ রেখার (গগন ক্ষেত্রের সাথে নিরক্ষ রেখার ছেদ তলের বিশাল

www.bjilibrary.com

বৃত্ত) সমান্তরাল ছোট ছোট বৃত্তাকারে ঘোরে বলে মনে হয়। এই সব ক্ষুদ্র বৃত্তের আকার এবং আকাশে সূর্যের আপাত অবস্থান (ক্রান্তিবৃত্ত) তথা বছরের বিশেষ দিনের উপর নির্ভর করে। এ সকল ছোট ছোট বৃত্ত দিগ্‌বলয়কে অসমান অংশে ছেদ করে (চিত্র-১)।

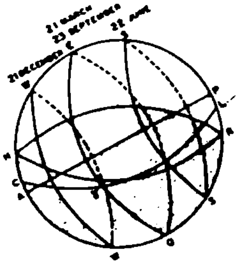

চিত্র-১ অয়ন ও বিষুব

HR = দিগ্‌বলয়, EQ = গাগনিক নিরক্ষরেখা

CL = ক্রান্তিবৃত্ত, P = মেরু, PA = মেরু অক্ষরেখা,

SS = গ্রীষ্মকালীন অয়ন, WW = শীতকালীন অয়ন, কৃষ্ণাভ অংশ = দিগ্‌বলয়ের নিম্নাংশ।

বিভিন্ন স্থানে দিগ্‌বলয় বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কাজেই ক্ষুদ্র বলয়ের অংশের দৈর্ঘ্য যার উপর দিগ্‌বলয়ের উপরিভাগে সূর্য থাকে বলে মনে হয় (অর্থাৎ দিবাভাগের দৈর্ঘ্য) দিগ্‌বলয়ের নিচের অংশ থেকে ভিন্ন (অর্থাৎ নৈশকালীন সময়)। আর এইসব দৈর্ঘ্য পৃথিবী পৃষ্ঠের অংশ এবং বছরের দিনের (অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ) উপর নির্ভর করে। মরু অঞ্চলে সূর্য ৬ মাস দিগবলয়ের উপরে আর বাকী ৬ মাস দিগ্‌বলয়ের নিচে অবস্থান করে।

প্রতি বছর দু'টো দিন আছে যখন দিবাভাগ আর নৈশকালীন সময়ের দৈর্ঘ্য সমান থাকে। কর্কট ক্রান্তি ও মকর ক্রান্তি নামে দুই বৃহৎ বৃত্ত বিষুবীয় বিন্দু নামে দু'টি বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করে। সূর্য এ দুই বিন্দুতে অবস্থান করে যথাক্রমে ২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে। তাই, এই দুইদিন সূর্য গাগনিক নিরক্ষরেখা বরাবর অবস্থান করে বলে মনে হয় এবং এর দৈনন্দিন পরিক্রমণ পথ (যা সব সময় গাগনিক নিরক্ষরেখার সমান্তরাল হয়ে থাকে) হয় গাগনিক নিরক্ষরেখাই। আর দিবাভাগে সূর্য দিকচক্রবালের উপরে গাগনিক

www.bjilibrary.com

নিরক্ষরেখার অংশে অবস্থান করে আর রাতে অবস্থান করে দিকচক্রবালের নিচে। কিন্তু গাগনিক নিরক্ষরেখা এবং দিকচক্রবাল বিশাল বৃত্ত পরস্পরকে ছেদ করে। কাজেই দিকচক্রবালের উপরে গাগনিক নিরক্ষরেখার অংশ নিচের অংশের সমান। সে কারণে এই দু'দিন দিবাভাগ আর রাতের দৈর্ঘ্য সমান।

দিবাভাগ এবং নৈশকালীন সময়ের আরেক ধরনের পরিবর্তন আছে যা সাময়িক। যে কোন সময়ে দিবাভাগের পরেই আসে রাত্রি, আবার রাতের পরেই আসে দিন। আর এই সাময়িক পরিবর্তন চলতেই থাকে।

পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারদিকে এর আহ্নিক গতিই সাময়িক পরিবর্তনের কারণ তথা আহ্নিক গতিই পর্যায়ক্রমে দিন ও রাতের আগমন ঘটায়। ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর উপরে অবস্থান করি বলেই আমরা এই গতির কথা ভুলে যাই। আর ধারণা করি, সূর্যই বুঝি ঘুরছে। পৃথিবীর চারদিকে সূর্যের এই আপাত ঘূর্ণনকালে সূর্য পালাক্রমে দিকচক্রবালের উপরে ও নিচে অবস্থান করে। এইভাবে পালাক্রমে সূর্যের দিকচক্রবালের উপরে ও নিচে অবস্থান অর্থাৎ সূর্যের আপাত ঘূর্ণন হিসেবে দৃশ্যমান দিন ও রাতের আবির্ভাব (পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণন) চলতে থাকে।

এই সাময়িক পরিবর্তনকে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায় যে, পৃথিবী সূর্যকে এক স্থানে স্থির রাখে। পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে এর প্রতিটি বিন্দুই সূর্যের দিকে প্রতিভাত হয় এবং কিছুক্ষণের জন্যে সে অবস্থায়ই থাকে। আবার পৃথিবীর বক্রতলের কারণে ঐ বিন্দু সূর্যের আড়ালে চলে যায় এবং কিছুক্ষণ সে অবস্থায়ই থাকে। যে সময় ধরে কোন স্থান সূর্যের দিকে প্রতিভাত অবস্থায় থাকে সেটাই ঐ স্থানের দিবা ভাগ এবং যে সময়ের জন্য স্থানটি সূর্যের আড়ালে থাকে সেটাই স্থানটির নৈশকাল। এভাবে পৃথিবীর ঘূর্ণনের সাথে সাথে দিন ও রাতের সাময়িক পরিবর্তনও চলতে থাকে।

সূর্যের নিজের গতি থাকলেও কোন স্থানে দিবাভাগ এবং নৈশকালের উপর সূর্য কোন প্রভাব ফেলে না। কেননা সূর্য যেখানেই থাকুক না কেন, এটি সবসময়ই একই ভাবে তার তাপ ও আলো বিকিরণ করে থাকে। দিন ও রাতের এ সকল পরিবর্তনের মধ্যে প্রজ্ঞাবানদের চিন্তার জন্য নিদর্শন রয়েছে।

গ. মানব কল্যাণে সাগরে চলাচলকারী জাহাজ ঃ আয়াতের এ অংশটুকু সাগর বা নদীপথে চলাচলকারী জাহাজ বা নৌকার বিষয় তুলে ধরছে যার দ্বারা মানুষ উপকার পেয়ে থাকে।

বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ নানাভাবে এ অংশের ব্যাখ্যা করেছেন। এ সকল ভিন্নতর ব্যাখ্যার মধ্যে তেমন সাংঘাতিক কিছু না থাকলেও এগুলোর মধ্য দিয়ে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ফুটে উঠে।

www.bjilibrary.com

যাহোক আয়াতটির এ অংশে দু'টি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। যথা- এক. নদী/ সাগর বক্ষে নৌকা বা জাহাজের চলাচল, এবং দুই. এ থেকে প্রাপ্ত সুবিধা বা উপকার। জাহাজ বা নৌকার চলাচলের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সমস্যাগুলো হচ্ছে ঃ ১. পানিতে ভেসে থাকা; ২. চলাচল করা; ৩. সাগর-মহাসাগরের বিশালতায় দিক খুঁজে পাওয়া।

এটা সুবিদিত যে, বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ধরনের জাহাজ/ নৌকা ছিল বা আছে। প্রাচীনকালে সাগরবক্ষে চলাচলকারী অর্থাৎ সমুদ্রগামী জাহাজ ব্যবহার করত ফিনিশীয়, মিসরীয়, গ্রীক, রোমক, চীনা, স্ক্যানডিনেভীয়রা। দাঁড়, পাল কিংবা উভয়টি দ্বারা এগুলো চালিত হত। সাধারণভাবে নৌকা হিসেবে পরিচিত ছোট খোলা জলযান পাল, দাঁড়, দীর্ঘ দণ্ড, বৈঠা প্রভৃতি দ্বারা চালিত হত এবং এখনও হয়। আরবীয় তরণী ঢাও এবং চীনা তরণী জাংক-এর মত কিছু কিছু জলযান সাগরেও চলত। এখনও চলে। এসব জাহাজ/ নৌকার সবই ছিল কাঠের তৈরী।

উনিশ শতকের শুরুর দিকে পালতোলা জাহাজের স্থান দখল করে বাষ্পীয় জাহাজ। আর এ শতকেরই পরবর্তীকালে কাঠকে হটিয়ে দিয়ে ইস্পাত তার স্থান করে নেয়।

আল-কুরআন স্থান, কাল কিংবা আকার-আকৃতি বা ধরনের উল্লেখ না করেই সাধারণ পরিভাষায় সাগরে নৌকা বা জাহাজের উল্লেখ করেছে।

নদী বা সাগরে নৌকা বা জাহাজের চলাচল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে তার পানিতে ভেসে থাকার ক্ষমতার উপর। যে অদ্ভুত গুণ বা বৈশিষ্ট্যের কারণে কোন ভারী বস্তুর বিশেষ একটা আকৃতি দান করা হলে কোন হাল্‌কা মাধ্যমে ভাসতে পারে তাকে বলা হয় প্লবতা, অর্থাৎ কোন অঘনীভূত বস্তু তথা তরল ও গ্যাসের ভিতর আংশিক কিংবা পূর্ণ নিমজ্জিত কোন বস্তুর উপর ঐ অঘনীভূত বস্তুর উর্ধ্বমুখী চাপ কিংবা উপরের দিকে ঠেলা দিয়ে উর্ধ্বে তুলে ধরার ক্ষমতা। অঘনীভূত বস্তু তথা তরল ও গ্যাসের এই আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ ধর্মের কারণেই আমরা পানিতে নৌকা বা জাহাজকে ভাসতে দেখি। যতদূর জানা যায় গ্রীক দার্শনিক আর্কিমিডিস খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সর্বপ্রথম অঘনীভূত বস্তুর এই ধর্মের ঘোষণা দিয়ে বলেন যে, প্লবতা বা প্লবমান শক্তি কোন ভাসমান বস্তুর ওজনের সমান, আর এই ওজন আবার ঐ বস্তুর নিমজ্জিত অংশ দ্বারা অপসারিত অঘনীভূত বস্তুর ওজনের সমান। এটিই আর্কিমিডিসের সূত্র নামে পরিচিত।

বিজ্ঞানীদের মতে, প্লবমান শক্তিসমূহ বস্তুর নিমজ্জিত অংশের সর্বত্র সর্বতলে সমকোণে ধাক্কা মেরে বস্তুটিকে তরল পদার্থের বাইরে নিয়ে যেতে চায়। এদেরকে সমন্বিতভাবে একটি উর্ধ্বমুখী শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা যায় যা

www.bjilibrary.com

অপসারিত তরল পদার্থের ভরের কেন্দ্রের ভিতর দিয়ে কাজ করে। এই স্থানটি প্লবতার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। প্লবতার এই কেন্দ্রটি আবার বস্তুর পানিতে নিমজ্জমান অংশের আকৃতির উপর নির্ভর করে এবং তা পানি অপসারণের মাধ্যমে জলমগ্ন বস্তুটি যে গভীরতায় নিমজ্জিত হয় তার দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। এই অপসারণের পরিমাণ আবার নির্ভর করবে বস্তুটির আকার বা আকৃতির উপর এবং গঠনাকৃতির[২] উপর ভিত্তি করে জাহাজ বিভিন্ন গভীরতায় ভাসে।

জাহাজের কাঠামোর উপর বিভিন্ন বল কাজ করে। এদের কতকগুলো স্থির প্রকৃতির আবার কতকগুলো গতিশীল। জাহাজ জুড়ে ওজন আর উল্লম্বের মধ্যে যে পার্থক্য ঘটে, তার কারণে কাজ করে স্থির বল আর জাহাজের উপর পানির ধাক্কা, জাহাজ বরাবর ঢেউ বয়ে যাওয়া এবং ঘূর্ণায়মান বা চলমান যন্ত্রাংশ দ্বারা সৃষ্টি হয় গতিশীল বল।[৩] ঢেউয়ের ভিতর দিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়ার সময় প্লবতার বন্টনের পার্থক্যের কারণে বক্র গতিতে পার্থক্য হয়। সর্বাধিক পার্থক্য ঘটে তখন, যখন জাহাজ এমন ঢেউয়ের মধ্যদিয়ে অতিক্রম করে যার শীর্ষ থেকে শীর্ষের দৈর্ঘ্য জাহাজটির দৈর্ঘ্যের সমান।[৪]

বিশেষত জাহাজের ডিজাইনে ভাসমানতার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হচ্ছে স্থিতিশীলতার স্তর যা সমান। প্লবতার বল যদি অভিকর্ষের কেন্দ্র বরাবর কাজ করে, তাহলে বস্তুটি থাকবে ভারসাম্যপূর্ণ বা সমভার অবস্থায়। তরল পদার্থের মধ্যে নিমজ্জিত কোন কঠিন বস্তু ততটা দ্রুত স্থিতিশীল সমভার অবস্থায় আসে না। কেননা তরল পদার্থের সামান্য সংক্ষেপণসাধ্যতা বস্তুর অভ্যন্তরীণ ছিদ্রস্থ উচ্চ সংক্ষেপণসাধিত গ্যাসের উপস্থিতি অথবা এর সাথে লেগে থাকা বুদবুদের ভিতরকার উচ্চ সংক্ষেপণসাধ্য গ্যাসের উপস্থিতি এবং বস্তুটি ও তরল পদার্থের লক্ষণীয় সম্প্রসারণ গুণঙ্করসমূহ বস্তুটিকে দ্রুত এ অবস্থায় আসতে দেয় না। অবশ্য, যদি তরল পদার্থটির তুলনায় বস্তুর গড় ঘনত্ব কম হয়, তবে এটি আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় পানিতে ভাসবে। আর্কিমিডিসের সূত্র অনুযায়ী উল্লম্বের তুলনায় বস্তুটির ভাসমানতার স্তর ও অবস্থান নির্ধারিত হবে। মেটাসেন্টার নামে জাহাজের একটা বিন্দু আছে যার অবস্থান কেন্দ্রের উপরে থাকে। এই বিন্দুটি অবশ্যই অভিকর্ষ কেন্দ্রের উপর থাকবে, কেননা তাতে এতদুভয় জাহাজটিকে স্বাভাবিক অবস্থানে রাখতে চায়। আর যদি এটা নিচে হয়, তাহলে জাহাজটি অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে এবং ডুবে যায়। কাজেই অভিকর্ষ কেন্দ্রের উপরে মেটাসেন্টারের উচ্চতাই (মেটাসেন্ট্রিক উচ্চতা) একটি নির্দিষ্ট উল্লম্বতলে স্থিতিশীলতার মাপ।[৫]

www.bjilibrary.com

আগেই বলা হয়েছে, নদী বা সাগরে বিভিন্ন পদ্ধতিতে নৌকা/ জাহাজ চালানো হত। শত শত বছর ধরে সাগরে জাহাজ চলত দাঁড়ের সাহায্যে, আর পালে আটকানো বাতাসে। উনিশ শতকের শুরুর দিকে সমুদ্রযাত্রায় সফলভাবে বাষ্প শক্তিকে প্রয়োগ করা হয়। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের পরেই আসে টারবাইন অর্থাৎ বাষ্পীয় ঘূর্ণন যন্ত্র। সামুদ্রিক জাহাজে ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহারের আগে এই উভয় প্রকার শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ার অনেক উন্নতি সাধিত হয়। ১৯৭০ -এর দশকে আণবিক শক্তি ব্যবহারের পরীক্ষাও সম্পন্ন হয়।

সাগরে চলাচল করতে গিয়ে নাবিকেরা সচরাচর যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তাহলো গন্তব্যে পৌছার জন্য সঠিক দিক কীভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে। যতদূর জানা যায়, প্রাচীনকালে নাবিকরা সূর্য আর তারকার উপর ভিত্তি করে দিক নির্ণয় করত। আরব নাবিকরা ভারত মহাসাগরে চলাচলের ক্ষেত্রে তাদের পথের নিশানা খুঁজে পাওয়ার জন্য অনেকটা উন্নত কৌশল উদ্ভাবন করে, যেমনটি তারা করত শত শত বছর ধরে মরুভূমিতে চলাচলের ক্ষেত্রে। সমতল ভূমিতে স্বল্প দূরত্বে চলাচলে তেমন একটা অসুবিধা না থাকলেও দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণের ক্ষেত্রে পৃথিবীর আকার ও আকৃতি নাবিকদের মহাসংকটে ফেলে দেয়। ফলে, তারা অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ইত্যাদি বিষয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় জ্ঞানের উন্নয়ন ঘটায়। পৃথিবী পৃষ্ঠের উপরে যে কোন দুটি বিন্দুর মধ্যে স্বল্পতম দূরত্ব বলতে ঐ দুই বিন্দুর মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া বিশাল বৃত্তের বৃত্তচাপকে বুঝায়। নাবিকরা তাদের ছেড়ে যাওয়া নৌবন্দর আর তাদের গন্তব্যের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া মহাবৃত্তকে অনুসরণ করে। নাবিকদেরকে তাদের গন্তব্য পথের দিক নির্দেশনা আঁকার ক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য ছক, মানচিত্র, নকশা ইত্যাদি তৈরি করা হয় যাতে অনেক হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন। নৌযুদ্ধের কথা বলাই বাহুল্য। দূরবর্তী দেশসমূহের সাথে বাণিজ্য এবং সমুদ্রপথে পৃথিবীকে জানার জন্য ভ্রমণ করতে গিয়ে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ মোকাবিলায় জ্যোতির্বিজ্ঞান গড়ে ওঠার পক্ষে প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আছে যা নাবিকদের মোকাবেলা করতে হত তা হলো সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার স্রোত কীভাবে উত্তম উপায়ে আগে থেকে অনুমান করা যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পানি শক্তি বিজ্ঞান এ সমস্যার সমাধান করে দেয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞান তত্ত্বের সাথে স্রোত পরিমাপের সুবিজ্ঞ সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যবহারিক স্রোত-ছক বানাতে হয়। অনুমানের সর্বাধিক সঠিক পদ্ধতি নির্ভর করে সমন্বয়পূর্ণ বিশ্লেষণের উপর যাতে চান্দ্র দিবস, সৌর দিবস, চন্দ্র ও সূর্যের ক্রমান্বয়ে অবস্থান পরিবর্তনের পার্থক্য ইত্যাদি বিবেচনায় আনা হয়।

বর্তমান শতকের অর্থাৎ বিংশ শতকের, (কেননা গ্রন্থখানি বিংশ শতাব্দীতে লেখা- অনুবাদক) প্রথমার্ধে এসে নৌবিজ্ঞানের পরিপূর্ণ রূপান্তর ঘটে।

www.bjilibrary.com

১৯৩৯-৪৫ সালে প্রায় সব বিমান ও জাহাজই তাদের পথ খুঁজে নিত কম্পাসের সাহায্যে, মানচিত্র দেখে, এবং সাগরের উপর দিয়ে সুদীর্ঘ আকাশপথে চলাচলকালে মাঝে মাঝে বেতার সংবাদ শুনে। রাডার আবিষ্কারের ফলে নাবিকের দৃষ্টিশক্তিও গেল বেড়ে। কারণ, এতে সে দেখতে পেত কুয়াশার ভেতরে কিংবা রাতের অন্ধকারে ঠিক ততটাই যতটা সে দেখত পরিষ্কার দিনে। সত্তরের দশক থেকে আসে আরেক নতুন ব্যবস্থা। এতে পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী উপগ্রহ থেকে ছোট কম্পিউটারের সাহায্যে জাহাজের অবস্থান হিসেব করে বের করা যায়।

ঘ. আল্লাহ্ আসমানস্থ যা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করান এবং মৃত ধরিত্রীকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং পৃথিবীতে সবরকম জীবজন্তু ছড়িয়ে দেন ঃ অত্র আয়াতে পানি বলতে আকাশে ভাসমান মেঘের মধ্যকার পানিকে বুঝান হয়েছে। বৃষ্টির ফোঁটার সৃষ্টি হওয়া এবং পৃথিবীপৃষ্ঠে বৃষ্টিপাত হওয়ার মধ্যে আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট বেশ কয়েকটি শক্তি ক্রিয়াশীল।

মেঘ হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁটার আকারে আকাশে ভাসমান পুঞ্জীভূত ও ঘনীভূত বাষ্পের নাম। এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁটা বাতাসের উর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী প্রবাহের ধাক্কায় মেঘের অভ্যন্তরে উঠানামা করে। নিম্নমুখী প্রবাহকালে বড় ফোঁটাগুলো দ্রুততর বেগে পড়ে এবং ছোট ছোট ফোঁটাগুলোর সাথে ধাক্কা খায় ও তাদের সাথে মিলে গিয়ে ধীরে ধীরে আকারে ও ওজনে বৃদ্ধি পায়। শেষে ফোঁটাগুলো এত ভারী হয় যে, উর্ধ্বমুখী প্রবাহের সাথে উপরে না উঠে বরং বৃষ্টির ফোঁটার আকারে পৃথিবীতে পতিত হয়।

আরেকভাবেও বৃষ্টির সৃষ্টি হতে পারে। মেঘের উপরের ঠান্ডা অংশের ফোঁটাগুলো জমে গিয়ে বরফের স্ফটিকে পরিণত হয়। এ ধরনের কয়েকটি স্ফটিক একসাথে মিলিত হয়ে তুষার ফলক গঠন করে। অপেক্ষাকৃত ভারী হওয়ায় তুষার ফলক মেঘের ভিতর দিয়ে নিচে পড়ে যায় এবং নিচের উষ্ণ বাতাসের ভিতর দিয়ে পড়তে পড়তে গলতে থাকে। অবশেষে মাটিতে পৌঁছে যায় বৃষ্টির ফোঁটার আকারে।

বৃষ্টিপাত কিংবা শিলাপাতের আরো দু'টি পদ্ধতি আছে, যথা ঘূর্ণিঝড় বিষয়ক এবং পর্বত সম্বন্ধীয় পদ্ধতি। একটি উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ আর একটি ঠান্ডা বায়ুপ্রবাহ যখন ঘূর্ণিঝড় দ্বারা একটা সম্প্রসারিত ক্ষেত্রে ক্রমশ একত্রিত হয় ও পরস্পরের সংস্পর্শে আসে, তখন এর ফলে তাপমাত্রা কমে যেতে পারে এবং অবশেষে বৃষ্টি বা শিলাপাত হয়। পর্বত সম্বন্ধীয় পদ্ধতিতে কোন এলাকার বায়ু যদি উপরের দিকে উঠে যায় এবং পর্বতের মত কোন বাধার সম্মুখীন হয় তখন বৃষ্টিপাত ঘটতে পারে।

www.bjilibrary.com

এখানে উল্লেখ্য যে, আসমান থেকে পতিত হওয়া বৃষ্টির ফোঁটা নাইট্রোজেনের অক্সাইড মাটিতে বহন করে নিয়ে আসে। এই সকল অক্সাইড আবার তৈরি হয় বিজলী চমকানোর কারণে। নাইট্রোজেন অক্সাইড পানির সাথে বিক্রিয়া ঘটিয়ে নাইট্রিক ও নাইট্রাস্ এসিডের মিশ্রণ তৈরি করে। সাধারণত সবুজ গাছপালা আমিষ ও অন্যান্য বস্তু তৈরির জন্য এই নাইট্রোজেন (নাইট্রেট আকারে) মাটি থেকে শোষণ করে নেয়।

আল্লাহ্ কর্তৃক আকাশ থেকে যে পানি বর্ষিত হয় তা দিয়ে বেশ কিছু প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে যা নিম্নোক্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দু'টি ঘটনার মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় ঃ ক- মৃত ধরিত্রীর পুনরুজ্জীবন ও খ- সকল প্রকার জীবজন্তুর বংশ বিস্তার।

ক. মৃত ধরিত্রী অর্থ বিরামহীনভাবে পানি সরবরাহের অনুপস্থিতির কারণে সৃষ্ট খরার ফলে গাছ-পালা তরুলতা শস্য ফসলাদির আবাদবিহীন ভূমি। পৃথিবীর জীবন ফিরে আসার অর্থ বৃষ্টি পরবর্তী পৃথিবীতে সংঘটিত সকল ভৌতিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন। এ সকল পরিবর্তনের ফলে বীজের অঙ্কুরোদগম হয়, গাছ-পালা বেড়ে ওঠে এবং তাদের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। বৃষ্টির পানির প্রাপ্যতা মাটির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্যের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ পি এইচ (pH-হাইড্রোজেন কনিকার কেন্দ্রীভবন), মাটির কার্যক্রম, গাছ-পালা ও জীবজন্তু, মাটির গঠন, আকৃতি এবং রন্ধ্রবহুলতা যার উপর নির্ভর করে বীজের অঙ্কুরোদগম এবং বীজ মূলের মাটির ভিতরে প্রবেশের উপযোগী বা অনুকূল মৃত্তিকা পরিবেশ। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, অন্যান্য উপাদানের পাশাপাশি অন্যতম মৌলিক উপাদান যা পৃথিবীকে আবাদি রূপ দেয় তা হচ্ছে পানি। বিশ্বের বৃষ্টিপাতের রেকর্ড অত্যন্ত বিস্তৃত এক সীমার মধ্যে উঠানামা করে বা এর কমবেশী হয়। আর্দ্র অঞ্চলগুলোতে ভারী বৃষ্টিপাত হয় এবং এসব এলাকা সবুজ গাছ-পালার আবাদে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে পৃথিবীর মরুভূমিগুলোতে বৃষ্টিপাত বিক্ষিপ্ত ও পাতলা এবং বছরের পর বছর বৃষ্টিহীনতায় সেখানে দীর্ঘ খরা দেখা দেয়। বর্ষণের উপস্থিতিতে বিরান বালুময় এলাকায় দীর্ঘদিনের ঘুমন্ত বা সুপ্ত বীজে অঙ্কুরোদগম হয়, ডালপালা, পত্র পল্লব মুকুলিত ও পুষ্পিত হয় এবং নতুন বীজ উৎপাদন করে যা মাটিতে সুপ্ত অবস্থায় থাকে পরবর্তী বৃষ্টিপাতের আগ পর্যন্ত। এভাবে প্রাণ ফিরে পায় মরুময় পৃথিবী। দৃঢ়, শক্ত আবরণ থাকায় বীজ দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার অস্তিত্ব বজায় রাখে এবং বেড়ে উঠার মত বাইরের সঠিক ও উপযুক্ত পরিস্থিতি না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকে। মাটি থেকে শোষণ প্রক্রিয়ায় বীজ তার আবরণের মাধ্যমে পানি শুষে নেয় এবং তার প্রাণশক্তিকে পুনঃ সঞ্জীবিত ও সক্রিয় করে। শ্বসনক্রিয়া দ্রুত

www.bjilibrary.com

বৃদ্ধি পায় এবং বিয়োজন ও শ্বসন এনজাইমের সমন্বয় ও সক্রিয়করণের ফলে সঞ্চিত খাদ্য সরবরাহ বেড়ে যায়। বীজের অভ্যন্তরস্থ জটিল খাদ্য উপাদানসমূহ বিশিষ্ট হয়ে এর শক্তি বেরিয়ে পড়ে এবং ভ্রূণের কোষগুলো স্ফীত ও বিভক্ত হতে শুরু করে। নতুন অঙ্কুরিত চারার প্রথম অংশটি হচ্ছে সদ্য গজানো মূল যা মাটিতে প্রবেশ করে এবং পানির জন্য মাটির ভিতরে ঢুকে যায়। বৃষ্টির পানির তৎপরতায় ক্ষয়িষ্ণু আবাদি মাটির উপরে একটা নতুন স্তর গঠন করে যাতে থাকে প্রচুর পরিমাণে পানি সহযোগে উচ্চ মানের উপকারী পদার্থ এবং উদ্ভিদের পুষ্টি উপদান যা গাছের শিকড় দ্বারা শোষিত হয়ে থাকে। মাটিতে পানির অভাব হলে অঙ্কুরোদগম ধীরগতি লাভ করতে কিংবা বাধাগ্রস্ত হতে পারে, যা নির্ভর করে বীজ এবং চার পাশের ভেজা মাটির কণার সাথে যোগাযোগের মাত্রার উপর। যেসব উদ্ভিদের পুনরুজ্জীবন বীজ ছাড়া অন্য মাধ্যমে ঘটে, যেমনটি ঘটে থাকে কিছু কিছু ঘাষের ক্ষেত্রে, তাদের ভূগর্ভস্থ স্থায়ী অঙ্গই বীজের ভূমিকা পালন করে থাকে এবং বৃষ্টির পরে ঠিক সেভাবেই কাজ করে যেমনটি করে থাকে বীজ।

মাটির উপরের স্তরে বৃষ্টির ফোঁটার পতনের ভৌতিক প্রভাবেও কিছু কিছু বিক্ষুব্ধ বা উত্তেজিত বীজ মাটির উপরের স্তরে চলে আসতে বাধ্য হয়। এখানে প্রচুর অক্সিজেন পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কুরোদগম শুরু করে। এভাবে ভারী বর্ষণ এক অর্থে বীজের ঘুম ভাঙ্গায় যা অনাবৃষ্টিকালীন সময়ে সুপ্ত অবস্থায় ছিল। ফলে, এতদিনকার বিশুষ্ক, অনুর্বর মাটিতে অসংখ্য চারাগাছ গজিয়ে উঠে।

খ. মাটির উপর বারিপাত এবং ফলত উদ্ভিদ জগতের পুনরুজ্জীবনের সাথে বিভিন্ন প্রাণীর জৈবিক কর্মতৎপরতার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে। বীজের অঙ্কুরোদগমের পাশাপাশি লক্ষ লক্ষ ডিম ও গুটি ফেটে যায় এবং বের হয়ে আসে পূর্ণ বয়স্ক গুবরে পোকা, ভিমরুল, পিঁপড়া, ঝিঁ ঝিঁ পোকা, পঙ্গপাল ইত্যাদি এবং ছড়িয়ে পড়ে তাদের নিজ নিজ শিকারভূমিতে। এদের জীবনকালও সমাপ্ত হয় শীঘ্রই। তবে এরা রেখে যায় ডিমের নতুন সরবরাহ যাতে পরবর্তী অনাবৃষ্টি চলাকালে তাদের বংশধারা অব্যাহত থাকে। বৃষ্টির পানিতে সয়লাব হয়ে গেলে ক্ষণস্থায়ী জলাশয়ের সৃষ্টি হয় যা কোলা ব্যাঙ, সোনা ব্যাঙ সহ বহু ধরনের জলজ প্রাণীর জন্মস্থানে পরিণত হয়। অবশেষে গাছপালা বড় হয়ে চূড়ান্তপর্বে বন-জঙ্গল গড়ে তোলে, যা প্রকৃতির জীবজন্তুর জন্যে আশ্রয় কেন্দ্রের ভূমিকা পালন করে। শিকারি পাখিরা গাছের মগডালে বাসা বাঁধে। তার নিচেই থাকে বানরেরা আর উজ্জ্বল রং বিশিষ্ট পাখির দল। ভূমিতে বাস করে প্রায় সকল চতুষ্পদ জীবজন্তু ও সব ধরনের সরীসৃপ এবং চিত্যাবাঘসহ অন্যান্য বিড়াল জাতীয় পশুরা ভূমি আর নিচু গাছপালার মধ্যে চলাফেরা করে। এ সকল জীবজন্তুর সকলেরই বসতি তাদের আলাদা আলাদা জীবনপদ্ধতি ও শিকারের ধরনের সাথে বেশ মানানসই।

www.bjilibrary.com

সকল প্রাণীই 'খাদ্য ধারা' নামে এক চিরন্তন নিয়মে তাদের প্রাথমিক পর্যায়ের খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। আর এ খাদ্য ধারা প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদনকারী হিসেবে উদ্ভিদ দিয়েই শুরু হয়।

বৃষ্টির বর্ষণের সাথে অন্য আরেকটা ঘটনার যে ধারার সূচনা হয় তা হলো পাহাড় ও উপত্যকার পূর্ণ বর্ধনশীল সবুজ চারণভূমিতে পরিণত হওয়া। এতে বন্য তৃণভোজী প্রাণী সহ গরু-মহিষ, ছাগল-ভেড়া, হরিণ ইত্যাদি আকৃষ্ট হয়ে খাদ্যের সন্ধানে সেখানে দলে দলে স্থানান্তর করে। বিষয়টি অন্যান্য আরো বহু প্রকার লতাগুল্মভোজী প্রাণী এবং আদিমযুগীয় মানুষের বেলায় খাটে যারা তাদের খাদ্যের জন্য অংশত বনের গাছ-পালার উপর নির্ভর করত।

আবার বৃষ্টির ফলে ঝরণাগুলো পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে পাহাড় থেকে জলপ্রপাতের মত বেগে ধাবিত হয়ে নদীতে গিয়ে মিশে যায় এবং অবশেষে তাদের পথ পরিক্রমণ সাগরে গিয়ে সমাপ্ত হয়। বহু প্রকার মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর স্থানান্তরিত হয়ে উপযুক্ত প্রজনন ক্ষেত্রে চলে যাওয়া অন্যান্য কারণে পাশাপাশি নদীতে জলবিষয়ক পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল।

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন জীবজন্তু প্রাণীজগতের ২৭টি গোত্রভুক্ত দশ লক্ষাধিক বর্গের (species) অন্তর্গত সকল প্রকার পশুর মধ্যে অল্প কয়েকটা দৃষ্টান্ত মাত্র।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বৃষ্টি থেকে শুরু করে মৃত (প্রায়) পৃথিবীর সবুজ আবাদে পুনরুজ্জীবন এবং এর সাথে সকল পশুর প্রতিবেশিক বিভাজনের সম্পর্ক-এসব কিছুই অনুপম স্রষ্টার অসীম প্রজ্ঞারই নিদর্শন বিশেষ, যদি আমরা অনুধাবন করতে পারি।

গ. বায়ুর পরিবর্তন ঃ বায়ু প্রবাহের অর্থ প্রবহমান বা গতিশীল বাতাস, আর এই গতি সৃষ্টি হয় বায়ু চাপের পার্থক্যের ফলে। বাতাস উচ্চ থেকে নিম্ন বায়ুচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। বায়ু প্রবাহের গতি বায়ুচাপের পার্থক্যের মাত্রা দ্বারা নির্ধারিত হয়।

স্থানের বিচারে বায়ু প্রবাহের পরিবর্তনকে দু'ভাবে প্রকাশ করা যায় যথা-সাগরের বায়ু এবং ভূমি বায়ু। কোন কোন বায়ুপ্রবাহ অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত যেমন ট্রেড উইন্ড্‌।

সাগরের বায়ু ঃ নিম্ন আপেক্ষিক তাপ এবং পানির চেয়ে অধিক শোষণ ক্ষমতা সম্পন্ন ভূখন্ড দিবাভাগে সূর্যতাপে সাগরের তুলনায় অধিক উত্তপ্ত হয়। ফলে, সন্ধ্যার দিকে ভূমির উপরের বায়ু অধিক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং সাগরের উপরকার অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা বাতাসের উচ্চ চাপে উপরের দিকে উঠে যায়। ঠান্ডা বাতাস সাগর থেকে ভূমির দিকে প্রবাহিত হলে তখন তাকেই বলা হয় সাগর বায়ু।

www.bjilibrary.com

ভূমি বায়ু ঃ ভূমি বায়ু উত্তম তাপ শোষক আবার উত্তম তাপ বিকিরকও বটে। রাত্রিবেলা সাগরের তুলনায় ভূমি অধিক তাপ হারায়। ভূ-ভাগের তাপমাত্রা সাগরের তুলনায় নিচে নেমে গেলে ভূভাগের অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা বাতাসের চাপ সাগর উপরিস্থ উষ্ণতর তাপমাত্রার হালকা বাতাসকে তাড়া করে। কাজেই, এভাবে ভূ-ভাগের উপরিস্থ ঠান্ডা বাতাস সাগরের দিকে প্রবাহিত হলে একেই বলা হয় ভূমিবায়ু।

ট্রেড উইণ্ড বা ট্রেড বায়ু প্রবাহ ঃ বিষুব রেখা বরাবর পৃথিবীপৃষ্ঠের সর্বাধিক উত্তপ্ত অঞ্চল অবস্থিত। নিরক্ষীয় শান্ত বলয় নামক অত্র অঞ্চলের বায়ু এর দু'পাশের ৩০° উত্তর ও দক্ষিণ এলাকার যা অক্ষ দ্রাঘিমাংশ নামে পরিচিত, বায়ু অপেক্ষা উষ্ণ ও হালকা হওয়ায় অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা বাতাসের উচ্চ চাপের ধাক্কায় উপরে উঠে যায়। উষ্ণ বায়ু উপরে উঠে গেলে উভয় মেরু থেকে উচ্চ চাপ বিশিষ্ট অন্যান্য বায়ু প্রবাহিত হয়ে ঐ বায়ুর স্থান পূর্ণ করে। একে বলা হয় 'পোলার ক্যাপ' বা মেরু অঞ্চলীয় টুপি। এ সকল অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা, ভারী বায়ুর প্রবাহ উত্তর থেকে দক্ষিণে ধাবিত হওয়ার কথা। কিন্তু পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে এ বাতাস উত্তর গোলার্ধে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে বিষুব রেখার দিকে আর দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে বিষুব রেখার দিকে প্রবাহিত হয়। এ সকল বায়ু প্রবাহকেই বলা হয় ট্রেড উইন্ড।

বায়ু প্রবাহের পরিবর্তনের বেশ কিছু উপকারিতা সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যেই অবগত হয়েছি। বায়ু প্রবাহের সাথে তা ক- মেঘমালাকে বিভিন্ন স্থানে বয়ে নিয়ে যায় যার ফলে বিস্তৃত অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়; খ- দূষিত বায়ু বয়ে নিয়ে ছড়িয়ে দেয় এবং তদস্থলে তাজা ও বিশুদ্ধ বায়ু নিয়ে আসে; গ- পুষ্পরেণুকে পরাগধানী থেকে গর্ভমুন্ডে বহনের মাধ্যমে পরাগায়নে সাহায্য করে যা শেষ পর্যন্ত বর্ধিত ফল উৎপাদন করে; এবং ঘ- বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রায় এক ধরনের ভারসাম্য আনে।

অধিকন্তু, বায়ুপ্রবাহের মৌসুমী ঋতুগত পরিবর্তনও আছে। এভাবে, সাইবেরিয়ায় শীতকালে একটা এলাকা জুড়ে উচ্চ চাপ সৃষ্টি হয়। এ এলাকা থেকে শুষ্ক বায়ু উত্তর-পূর্ব দিক থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। এটাই শীতকালীন মৌসুমী বায়ু নামে পরিচিত। গ্রীষ্মকালে সূর্য যতই উত্তর দিকে হেলতে থাকে দক্ষিণ এশীয় ভূ-ভাগ উত্তপ্ত হয়ে উঠে এবং নিম্নচাপের একটা অঞ্চল এখানে সৃষ্টি হয়। জলীয় কণাপূর্ণ বাতাস তখন ভারত মহাসাগর থেকে এই নিম্নচাপের কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হতে থাকে। এ বায়ু যতই হিমালয়ের ঢালু

অঞ্চল হয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে, ততই তা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ঠান্ডা হতে থাকে। এতে মেঘের সৃষ্টি হয় যার ফলে ভারী বর্ষণ হয়। এটাই 'বর্ষা' হিসেবে পরিচিত।

অধিকন্তু, মানুষ আল্লাহ্ প্রদত্ত উদ্ভাবনী শক্তির বলে স্মরণাতীতকাল থেকে বায়ু শক্তিকে বায়ুকল এবং পালের সাহায্যে নৌকা ও জাহাজ চালনাসহ নানাভাবে তার প্রয়োজন পূরণের কাজে লাগিয়ে আসছে।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বায়ুপ্রবাহের প্রাত্যহিক এবং মৌসুমী পরিবর্তনসমূহের মধ্যে আল্লাহ্র বেশ কিছু নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে। আমরা যতই এগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করব ততই আমাদের জ্ঞানের গভীরতা বাড়বে।

ঘ. আসমান-জমীনের মধ্যবর্তী অনুগত মেঘমালা ঃ আবহাওয়া বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন ধরনের মেঘ শনাক্ত করেছেন এবং এগুলোকে নিচে সংক্ষিপ্তাকারে দশটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে বর্ণনা করা হ'ল ঃ

১. অলক মেঘ ঃ এ সকল মেঘ ফিসফিসানির মত শব্দ করে। এরা দেখতে বরফ স্ফটিকের পাখনার মত। মেঘের উপরে অনেক উচ্চতায় এরা গঠিত হয়। এদের কতক পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে দশ মাইলের মত উচ্চতায় গঠিত হয়ে থাকে।

২. অনুভূমিক মেঘ ঃ সাধারণত এ ধরনের মেঘ মাটি থেকে মাত্র কয়েকশ' ফুট উপরে গঠিত হয়। এরা হালকা-পাতলা, কুয়াশার মত। ভোর বেলা কিংবা অন্তিম সন্ধ্যায় যখন বাতাস স্থির থাকে তখন এ ধরনের মেঘ দেখা যায়।

৩. পুঞ্জ মেঘ ঃ এগুলো দেখতে সুন্দর পুঞ্জীভূত সাদা মেঘ। গ্রীষ্মকালে এরা আকাশে ভেসে বেড়ায়। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে মাইলখানেক উপর দিয়ে এরা পরিভ্রমণ করে এবং মাটিতে দ্রুত ধাবমান ছায়া ফেলে। মধ্য বিকেলে সূর্য যখন সর্বাধিক উষ্ণ থাকে, তখন এরা আকার ও সংখ্যায় বেড়ে যায় এবং এদের শীর্ষদেশ কয়েক মাইল পর্যন্ত উচ্চতায় উঠে যায়। সন্ধ্যাবেলা এরা অনুভূমিক মেঘের স্তরে মিশে অদৃশ্য হয়ে যায়।

৪. জলদ মেঘ ঃ এগুলো হচ্ছে ঘন ধূসর বর্ণের বর্ষণ মেঘ। এদের গঠন প্রকৃতি আকারবিহীন। বর্ষণ মেঘের নিচের দিকে অর্ধাংশ থাকে জলকণায় ভারী যা কখনও কখনও বৃষ্টির ফোঁটায় পরিণত হয়ে নিচে পতিত হয়।

উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন ধরণের মেঘকে আবার সংযুক্ত আকারেও দেখা যায়। সংযুক্ত মেঘকে সাধারণত তাদের উচ্চতানুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস করা হয়ে থাকে।

www.bjilibrary.com

৫. **উচ্চপুঞ্জ মেঘ** গোলাকার, মহাতরঙ্গময়, সাদা কিংবা ধূসরাভ। এগুলো ছোট্ট ছোট মেঘপুঞ্জের ঘন সন্নিবিষ্ট রূপ। আট থেকে বিশ হাজার ফুট উচ্চতায় এদের দেখা যায়।

৬. **উচ্চ অনুভূমিক মেঘ** দেখতে পুরু, ধূসর নীলাভ পাতের ন্যায়। মাটি থেকে সাড়ে ছয় হাজার থেকে বিশ হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থান করে।

৭. **ঘন অনুভূমিক মেঘ** বিশ হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত বরফ স্ফটিকে গঠিত এক প্রকার পাতলা সাদা পাতের মত মেঘ।

৮. **অলকপুঞ্জ মেঘ** হচ্ছে ঘন মেঘমালার ভিতর-গঠিত এক টুকরা মেঘ যা দেখতে সাগর তীরস্থ বালুকারাশির ঢেউয়ের মত। বিশ হাজার ফুট উচ্চতায় এই মেঘ গঠিত হয়।

৯. **পুঞ্জ বর্ষণ** মেঘকে বজ্রমস্তকও বলা হয়ে থাকে। এরা প্রকান্ড, ফুলকপি আকৃতির যা সব মেঘ স্তরেই ছড়াতে পারে।

১০. **অনুভূমিক পুঞ্জ** মেঘ হচ্ছে সেই সব বিন্দু বিন্দু মেঘ যা পৃথিবী পৃষ্ঠের কাছাকাছি থেকে শুরু করে সাড়ে ছয় হাজার ফুট উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে থাকে।

বিভিন্ন আকার, আকৃতি এবং বাহ্যিক অবয়ব বিশিষ্ট এইসব নানা ধরনের মেঘের চলাফেরা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ভৌতিক বিধান অনুযায়ী সংরক্ষিত। অনুভূমিকভাবে এ সকল মেঘকে বাতাস যতদূর তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে ততদূর পরিভ্রমণ করে, আবার খাড়াভাবে এগুলো পৃথিবী পৃষ্ঠের কাছাকাছি থেকে শুরু করে প্রায় দশ মাইল পর্যন্ত বিভিন্ন উচ্চতায় উপরে উঠতে পারে। এই উচ্চতারও বাইরে বাতাস এত হালকা যে তা মেঘের কণা ধারণ করতে পারে না।

তথ্য সূত্র ঃ

1. Van Nostrand's Scientific Encyclopaedia,
2. L. G. Taylor, The Principles of Ship Stability. p. 12, 1977 edition.
3. E. A. Stoke, Reeds Ship Construction for Marine Students, p. 13, 1973.
4. Ibid, p. 17.
5. Van Norstrand's Scientific Encyclopaedia.
6. Hansbury Brown, (ed.) Man and the Stars, p. 81-82, 1978.
7. Encyclopaedia Americana.

www.bjilibrary.com

١٦٨- يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ
اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

২ ঃ ১৬৮ হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

উপরে বর্ণিত আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে পৃথিবীতে যেসব হালাল খাদ্যবস্তু রয়েছে তা আহারের অনুমতি দান করেছেন। যেহেতু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা আর জীবন ধারণের জন্য মানুষের খাদ্য গ্রহণ অত্যাবশ্যক তাই ইসলামে খাদ্যবস্তুর গ্রহণ সম্পর্কে নীতিমালা রয়েছে। হালাল খাদ্যবস্তু সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট অনেক আয়াত রয়েছে (আয়াত ৫ ঃ ৫-৬, ৫ ঃ ৯১)।

শাক্-শব্জি ও ফলমূল (আয়াত ২ ঃ ২২), মাছ অথবা সামুদ্রিক খাদ্যদ্রব্য (আয়াত ৬ ঃ ১৪১, ১৬ ঃ ৬৯) গ্রহণে ইসলামে কোন প্রকার বিধি-নিষেধ নেই। হালাল-হারামের বিধান মূলত প্রদান করা হয়েছে জীব-জন্তুর মাংস সম্পর্কে। হালাল জীব-জন্তু ও পাখীর মাংস আহার করা প্রসঙ্গে ইসলাম বিস্তারিত নীতিমালা দিয়েছে।

এখানে 'পবিত্র' শব্দটি দ্বারা 'স্বাস্থ্যকর' ও 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন' বুঝানো হয়েছে। পচা বা দূষিত খাদ্য পবিত্র নয়। এতে বুঝা যায় যে, 'পবিত্র' শব্দটি দ্বারা আল্লাহ্ চান যেন আমরা কেবলমাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য আহার করি, যা আমাদের শরীরের পুষ্টির জন্য সহায়ক হবে।

١٧٢- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ
تَعْبُدُوْنَ ○

২ ঃ ১৭২ হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে আমি যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা হতে আহার কর এবং আল্লাহ্‌র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত কর।

উপরে বর্ণিত আয়াতে এটা প্রমাণ করে যে, একজন খাঁটি মুসলমানকে মাংস ও অন্যান্য খাদ্য গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং সে কেবলমাত্র ঐ খাদ্য-বস্তু আহার করবে যা তাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। এ বিষয়ে সূরা বাকারার ১৬৮ নম্বর আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

١٧٣- إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

২ ঃ ১৭৩ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর মাংস এবং যার উপর আল্লাহ্র নাম ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ নাফরমান কিংবা সীমালংঘনকারী নয় তার কোন পাপ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা বাকারার ১৬৮ ও ১৭২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন, সব হালাল ও পবিত্র দ্রব্য খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এই আয়াতে আল্লাহ্ কতকগুলি হারাম খাদ্য-বস্তুর কথাও উল্লেখ করেছেন, যেমন–

মৃত জন্তু ঃ মৃত জন্তু বা পাখী খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হারাম। এতে বৈধ যেসব পশু ও পাখী রয়েছে তার মৃতদেহও হারাম করা হয়েছে। এটা পুরোপুরি বিজ্ঞানভিত্তিক ও স্বাস্থ্যবিধিসম্মত। কোন পশু মারা গেলে এর মৃত্যুর কারণ জানা খুবই দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। হয়ত বিষক্রিয়া, টক্সিন অথবা এনথ্রাক্সের মত ভয়াবহ সংক্রামক রোগের জীবাণুতে আক্রান্ত হয়েও তা মারা যেতে পারে। এ ধরনের মৃত জন্তুর মাংস খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হওয়াই স্বাভাবিক। পশুর মধ্যে এনথ্রাক্সের জীবাণু সংক্রমণধর্মী এবং এনথ্রাক্সে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া পশুর দেহ স্পর্শ বা বহন করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ; এতে মানুষের দেহেও এই ঘাতক জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে।

রক্ত ঃ রক্ত বলতে এখানে প্রবাহিত রক্ত যা কোন জন্তুর গলা কেটে যবেহ্ করার পর প্রবাহিত হয় (দ্র. আয়াত ৬ ঃ ১৪৫) তা বোঝানো হয়েছে। প্রবাহিত রক্তে বিষাক্ত বিপাকীয় পদার্থ, টক্সিন ও রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব থাকতে পারে। খাদ্যে এসব পদার্থ থাকা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এ ছাড়াও এটা বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে যে, প্রবাহিত রক্ত ও এর ক্ষতিকর উপাদানসমূহ অপসারণ করা হলে তা মাংসকে স্বাস্থ্যোপযোগী করে থাকে।

শূকরের মাংস ঃ কুরআনের আয়াত দ্বারা শূকরের মাংস নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সূরা আনআমের ১৪৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন যে, শূকরের মাংস হারাম। কারণ, এর মধ্যে 'অপবিত্র' এবং দূষিত উপাদান রয়েছে। এর পক্ষে নিম্নোক্ত বৈজ্ঞানিক কারণগুলি ছাড়া আরো অনেক কারণ থাকতে পারে, যা ভবিষ্যতে জানা যেতে পারে ঃ (ক) শূকরের মাংসে Trichiniasis নামক এক প্রকার পরজীবী সংক্রমণ বাহিত হয়। এই পরজীবীর নাম Trichinella spiralis যা মানবদেহে বসবাসকারী সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতির গোল ক্রিমি।

www.bjilibrary.com

কাঁচা অথবা অল্পসিদ্ধ করে রান্না করা শূকরের মাংসে দলবদ্ধভাবে এই ক্রিমির শুক্কীট জীবিত রয়ে যায়, যা হতে মানুষ ক্রিমি দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই শুক্কীট দেহের বৃহদান্ত্রে বৃদ্ধি লাভ ও বংশ বিস্তার ঘটায়; এবং এক সপ্তাহের মধ্যে নতুন শুক্কীটের জন্ম দেয় যা শরীরের প্রবহমান রক্ত দ্বারা মাংসপেশী ও দেহকোষে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে তারা দেহের বিভিন্ন স্থানে প্রদাহ ও অন্যান্য জটিলতা সৃষ্টি করে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ লোক এই রোগে আক্রান্ত। কোন উপসর্গ না থাকায় এদের অধিকাংশই অনাবিষ্কৃত রয়ে যায়। তবে সংক্রমণের মাত্রা নির্ভর করে আহারকৃত মাংসে কিরূপ Trichinae -এর সংখ্যা বিদ্যমান তার উপর। এক হিসেব অনুযায়ী শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে Trichinasis দ্বারা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২ কোটি। প্রাপ্ত তথ্যে আরো জানা যায়, মানবদেহে এই রোগের সংক্রমণের আধিক্যের কারণে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। উপসর্গ পাওয়া রোগীদের মধ্যে মৃত্যুর হার শতকরা ৫ ভাগ হতে ৪০ ভাগ পর্যন্ত হতে পারে। তবে, তা নির্ভর করে রোগ ধরা পড়ার পর কত তাড়াতাড়ি তার উপযুক্ত চিকিৎসা শুরু করা হয়েছে তার উপর। অন্ত্রনালীতে অন্যান্য ক্রিমির সংক্রমণরোধে প্রতিষেধক থাকলেও Trichinella দ্বারা সংক্রমণে এসব প্রতিষেধকের কার্যকারিতা যৎসামান্য এবং এ রোগের কোন সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা ব্যবস্থাও অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি। দেহের ভেতর মাংসপেশী ও কোষকলায় একবার Trichinae প্রবেশ করতে পারলে তা দূর করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। রোগের শেষ পর্যায়ে উপসর্গভিত্তিক চিকিৎসা এক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে। জটিল পর্যায়ে হৃদযন্ত্র বা শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হয়ে সাধারণত এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা মারা যায়। বস্তুত ক্রিমি হৃদপিণ্ড ও ঝিল্লি কোষে আক্রমণ করে মায়োকার্ডিয়াক হৃদরোগ সৃষ্টি করতে পারে এবং তাতে শ্বাস-ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার বিভিন্ন মাংসজাত খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে শূকরের মাংসকে অনুমোদন দেয় না যদি না তা দ্রুত হিমায়িত করা বা কমপক্ষে ২০ দিন ১৫° সেলসিয়াস বা তার কম মাত্রায় সংরক্ষণ না করা হয়। এই তাপমাত্রায় Trichina জীবাণু ধ্বংস করতে সক্ষম। লক্ষণীয় বিষয়টি হলো, উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র এই ভয়াবহ রোগ প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছে। তাই Trichiniasis দমনের একমাত্র পথ হলো শূকরের মাংস পরিহার করা।

খ) Taenia solium নামক আরো এক ধরনের ফিতা ক্রিমিও সংক্রমিত শূকরের মাংস দ্বারা বিস্তার লাভ করে।

গ) শূকর স্বভাবগতভাবেই নোংরা।

তথ্যসূত্র ঃ

1. The World Book of Encyclopaedia, Vol-vii p. 279, 1966.

www.bjilibrary.com

١٨٤- أَيَّامًا مَّعْدُودٰتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ۚ فَمَنْ تَطَوَّعَ
خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ۚ وَأَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

২ ঃ ১৮৪ **সিয়াম নির্দিষ্ট কয়েক দিনের। তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। এটা যাদেরকে অতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করা। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে তা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসু যদি তোমরা জানতে।**

প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ইসলামী ক্যালেন্ডারের নবম মাসে অর্থাৎ রমজান মাসে সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সিয়াম পালন ফরয করা হয়েছে। রমজান মাসে এই রোজা রাখার (আরবী প্রতিশব্দ সিয়াম) অর্থ হলো ঃ রোজা রাখার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পানাহার, ধূমপান বা যৌন সঙ্গম থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা। তবে অসুস্থ বা সফরে থাকা অবস্থায় তাদেরকে রোজা পালন করতে হবে না। কিন্তু সুস্থ হওয়ার বা সফর থেকে বাড়ী ফেরার পর ঐ নির্ধারিত দিনগুলোর পরিবর্তে সমান সংখ্যক দিন রোজা পালন করতে হবে। এই রোজা আল্লাহ্ পাকের বিশেষ রহমত। বর্ণিত আয়াতটির ঠিক পরবর্তী আয়াতে (আয়াত ২ ঃ ১৮৫) তিনি এই ছাড়ের বিষয়টি দ্বিতীয়বার ঘোষণা করেছেন "আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং তোমাদের জন্য ক্লেশকর কিছু চান না।"

তাই রোজাদার ব্যক্তির কষ্ট লাঘব করার উদ্দ্যেশ্যেই এরূপ ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অসুস্থতার সময় রোজা না রাখার অনুমতি প্রদানের যৌক্তিক কারণ হতে পারে যে কোন রোগী দিনব্যাপী পানাহার বর্জন করলে তা ঐ রোগীর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। কোন কোন রোগে রোগীকে কিছু সময় পর পর নিয়মিত খাদ্য, পানীয় ও ঔষধ গ্রহণ করতে হয় যেমন মারাত্মক ডায়রিয়া বা আমাশয়, জটিল এপেনডিসাইটিস, ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া, জটিল মেনিনজাইটিস, টাইফয়েড জ্বর, ডায়াবেটিস মেলিটাস ও জটিল পেটের পীড়া ইত্যাদি। ডায়রিয়া ও আমাশয় উপবাসের কারণে রোগীর শরীরে পানি শূন্যতা ও ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্যহীনতা দেখা দিতে পারে। মারাত্মক ডায়াবেটিস রোগে রোজার কারণে

www.bjilibrary.com

হাইপোগ্লাসেমিয়া কোমা (রক্তে চিনির মাত্রাতিরিক্ত স্বল্পতার কারণে অচেতন হয়ে পড়া) দেখা দিতে পারে। উচ্চ মাত্রার জ্বর ও বমিভাব হয় এমন রোগে তরল পানীয় গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়ে। সুতরাং রোজাদারের অসুস্থতায় এই ধরনের রেয়াত সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাজনিত কারণে উত্তম। তবে, সামান্য ডায়াবেটিসের বেলায় কোন ব্যক্তির রোজা রাখতে অসুবিধায় পড়ার কথা নয়। কিছু কিছু জটিল প্রদাহে দীর্ঘ মেয়াদী এন্টিবায়োটিক কার্যকর; সেসব রোগী কেবলমাত্র রাতের বেলায় ঔষধ সেবন করে রোজা পালন করতে পারে।

বিশেষ কষ্টকর নয় এমন হালকা অসুস্থতা যেমন মৃদু ঠাণ্ডা, খোস-পাচড়া, Trauma, মাথাব্যথা ইত্যাদি রোগীদের রোজার মাসে অসুস্থতার অজুহাতে রোজা পরিত্যাগ করা মোটেও যুক্তিযুক্ত নয়। অসুস্থতার কারণে রোজা পালন বা ভাঙ্গার বিষয়টি সম্পূর্ণ অসুস্থ ব্যক্তির উপর নির্ভর করে।

সফরের সময় রোজা না রাখার ওজরটিও সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। কারণ, সফরের সময় একজন রোজাদার পর্যাপ্ত খাদ্য (বিশেষ করে সেহ্‌রী), বিশ্রাম ও ঘুমের (স্বাভাবিক স্বাস্থ্য রক্ষায় অপরিহার্য) সুযোগ-সুবিধা নাও পেতে পারে। তাই এমন কষ্ট ও অসুবিধা দূর করার জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাঁর অপার রহমতের বরকতে সংক্ষিপ্ত সফরের সময় (১৫ দিনের কম) বাড়ী হতে দূরে (৪৮ মাইল দূরে) গেলে তাঁর জন্য ঐ সময় রোজা পালন থেকে বিরত থাকার অনুমতি প্রদান করেছেন। তবে, হালকা অসুস্থতার মত আরামদায়ক ভ্রমণ ও বিদেশে অবস্থানকালে যেখানে রোজা রাখা বিশেষ কোন কষ্টের ব্যাপার হবে না, তখন রোজা পরিত্যাগ করা যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচিত হবে না। কিন্তু সকল সফরের ক্ষেত্রেই রোজাদার ব্যক্তির রোজা রাখা বা না রাখা তার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্ বলেছেন, 'আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর যদি তোমরা জানতে'।

কোন কোন ব্যক্তি মনে করেন মাসব্যাপী রোজা পালনের ফলে শরীরে পুষ্টিহীনতা দেখা দিতে পারে যাতে রোজাদারের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু রমজান মাসের রোজা পালনকে উপবাস মনে করা ঠিক নয়। এটি এক মাসের জন্য খাদ্য গ্রহণের সময়সূচীর পরিবর্তন ঘটায় মাত্র এবং একজন রোজাদার যদি রাতের বেলায় সুষম খাদ্য গ্রহণ করে তবে তার স্বাস্থ্যহানির কোন আশংকা থাকে না।

বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ্ পাক স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, রমজানের রোজা মানবজাতির জন্য কল্যাণকর। আমরা এখনো রমজানের রোজার স্বাস্থ্যগত

www.bjilibrary.com

ও আধ্যাত্মিক সব উপকার সম্পর্কে জ্ঞাত নই। ঢাকা ও রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯৫৮-১৯৬৫ সালে রমজান মাসে রোজা রাখার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালিত হয়। তাতে সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নোক্ত স্বাস্থ্যগত সুবিধাদি খুঁজে পাওয়া যায় ঃ

(১) শতকরা ৮০% ভাগ রোজাদারের শরীরের ওজন কোন ক্ষতিকর প্রভাব ছাড়া ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। এই ধরনের ওজন হ্রাস স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। কারণ দেখা গেছে মেদবহুল রোগীর চিকিৎসা পদ্ধতিতে এ ধরনের প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে এই ধরনের রোগীদের রমজান মাসে রাতের বেলায় এবং বছরের অন্যান্য সময় অতি ভোজন ও চর্বিযুক্ত আহার থেকে বিরত থাকতে হবে।

(২) পাকস্থলীর মাত্রাতিরিক্ত অম্লরস রমজান মাসে মাসব্যাপী রোজা পালনের কারণে হাইপো এবং হাইপারক্লোরিড্রিয়া পরিবর্তিত হয়ে স্বাভাবিক এসিডিটিতে (আইসোক্লারিড্রিয়া) পরিণত হয়। রোজা রাখার কারণে পাকস্থলীতে অম্লরসের পরিমাণ কমে যায় (রাতে আহারের পর রোজা রাখা অবস্থায় খুব সকালে খালি পেটে স্বাভাবিকভাবেই গ্যাষ্ট্রিক এ্যাসিডের মাত্রা সর্বনিম্ন হয়ে থাকে); রমজান মাসের রোজা অতিমাত্রায় এ্যাসিডিটি নিঃসরণ রোধে সহায়তা করে যা পেপটিক আলসার সৃষ্টিকারী উপাদানসমূহের অন্যতম।

(৩) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত দেশের মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে পেপটিক আলসার তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এর কারণ হতে পারে দুটি (১) রমজান মাসে মুসলমানদের নিয়মিত রোজা পালন, এবং (২) তাদের খাদ্য তালিকায় এ্যালকোহল না থাকা। উত্তর নাইজেরিয়ার জারিয়ায় অবস্থিত উসাসা হাসপাতালের ডাঃ ই টি হেস ১৯৬০ সালে লিখেছেন, পেপটিক আলসার প্রসঙ্গে অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, এক জাতির আচার-আচরণে বসবাসকারী আফ্রিকানদের মধ্যে এই রোগের ঘটনা সম্পূর্ণ শূন্যের কোঠায়। ক্লীভ (Cleave) আরো জানিয়েছেন স্থানীয় জাভা ও মালয় মুসলমানদের তুলনায় ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় বসবাসকারী চীনা অধিবাসীদের মধ্যে পেপটিক আলসারের রোগীর সংখ্যা অনেক বেশী।

এসব ঘটনা থেকে এটা প্রমাণিত হয়, রমজানের রোজা রাখার কারণে গ্যাষ্ট্রিক এ্যাসিড ক্ষরণের স্বল্পতা এবং হাইপার এ্যাসিডিটির সাধারণ পর্যায়ে নেমে আসার কারণে মিশরীয় গ্রামবাসী, উত্তরাঞ্চলীয় নাইজেরীয়বাসী, জাভা ও মালয় মুসলমানদের পেপেটিক আলসার হওয়ার ঘটনা খুবই কম।

www.bjilibrary.com

তথ্যসূত্র ঃ

1. Muazzam. M. G. and Khaleque. K. A., Effects of Fasting in Ramadan, J. Trop. Med and Hyg. 62, 292, 1959.
2. Muazzam, M. G. and Ali, M. N. Effects of Ramadan Fasting on Body Weight. The Medicus, 34, 134, 1967.
3. Khaleque. K. A., Muzzam, M. G. and Ispahani, P., Further Observations on the Effects of Fasting in Ramadan, J. Trop. Med. and Hyg. 63, 247, 1960.
4. Muazzam, M. G., Ali M. N. and Husain, A. Observations on the Effects of Ramadan Fasting on Gastric Acidity, The Medicus, 25, 228, 1963.
5. Cleave, T. L. Peptic Ulcer, 1st edn, John Wright & Sons Ltd, Bristol, 1962.

www.bjilibrary.com

١٨٥- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۚ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۚ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

২ ঃ ১৮৫ রমজান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে তারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে। এবং কেউ পীড়িত থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তা চান না এই জন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে এবং তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করবার কারণে তোমরা আল্লাহ্র মহিমা ঘোষণা করবে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

উপরোক্ত বিষয়গুলো সূরা বাকারার ১৮৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আলোচিত হয়েছে।

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

২ ঃ ১৮৭ ... আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণ রেখা হতে উষার রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয় ...।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন, রমজান মাসে রোজাদারদের জন্য আহার ও পানীয় বৈধ করা হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ সুবহে সাদেকে উষার শুভ্র রেখা রাতের অন্ধকার হতে সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর না হয় অর্থাৎ সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত। পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে, কোন একটি স্থান এমন অবস্থায় আসে যখন সূর্য দিক্-চক্রবালের অনেক নিচে অবস্থান করলে সূর্যালোক সরাসরি ঐ স্থানে পৌঁছাতে পারে না; সূর্যালোক ভূমণ্ডলের মেঘপুঞ্জ, ধূলিকণা ইত্যাদিতে প্রতিফলিত হয়ে আকাশকে আলোকিত করে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এটাকে উষা বা

www.bjilibrary.com

উষার গোধূলি বলা হয় যতক্ষণ উষার সূচনা হয় না। জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ হিসাব করে দেখেছেন, যখন সূর্য দিকচক্রবালের ১৮° ডিগ্রী বা তার নিচে অবস্থান করে তখনই তা সম্ভব। সুতরাং উষা এমন এক সময় শুরু হয় যখন সূর্য দিগন্তের ১৮° ডিগ্রী নিচে অবস্থান করে।

সুবহে সাদেক বা উষার সময়কাল নির্ণীত হয় দিগন্ত রেখার ১৮° ডিগ্রী নীচে সূর্য অতিক্রম করতে যে সময় প্রয়োজন তার উপর। এটা নির্ভর করে ঐ স্থানের বিষুব রেখার অবস্থান ও সূর্যের পরিক্রমণের উপর অর্থাৎ পৃথিবীতে ঐ স্থানের অবস্থান ও বছরের ঐ দিনটির উপর। উষা নিরক্ষরেখায় সবচেয়ে কম সময়ের জন্য হয়ে থাকে। কারণ সূর্যের আহ্নিক গতিপথ এখানে দিগন্ত অতিক্রমণ করে ডান কৌণিকভাবে এবং সূর্য-রশ্মি খাড়াভাবে পতিত হওয়ায় দূরত্ব কম হয়ে থাকে। তাই বিষুবীয় দিনগুলিতে নিরক্ষরেখায় উষা ১ ঘণ্টা ১২ মিনিট স্থায়ী হয় অর্থাৎ সূর্যোদয়ের ১ ঘন্টা ১২ মিনিট পূর্বে উষা শুরু হয়।

উত্তর অক্ষাংশের ৩০° ডিগ্রীর নিকটবর্তী স্থানসমূহে মার্চ মাসে উষা স্থায়ী হয় ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট এবং জুন মাসে ১ ঘন্টা ২৫ মিনিট। বাংলাদেশে রমজান মাসে সূর্যোদয়ের ১ ঘন্টা ২০ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত পানাহার করা যেতে পারে।

'রাত্রির কৃষ্ণ রেখা হতে উষার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত না হয়' আয়াতটি দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে তা উপলব্ধি করা খুবই কষ্টকর। তবে যতটুকু বুঝা যায়, উষার শুভ্রতা ধীরে ধীরে রাতের অন্ধকারের সাথে মিশে একাকার হয়ে যায় এবং এমন এক সময় উপস্থিত হয় যখন উভয়ের মধ্যে তেমন লক্ষণীয় কোন পার্থক্য দেখা যায় না। কিন্তু উপরের বর্ণনা মতে জ্যোতির্বিজ্ঞানে উষার শুরুর সময়ে যদিও তখন পূর্বাকাশের নক্ষত্রগুলি অদৃশ্য হতে থাকে কিন্তু পশ্চিমাকাশে এ ধরনের নক্ষত্রগুলি তখনো দেখা যায়। তাই তাত্ত্বিকভাবে এমন এক সময় উপস্থিত হয় যখন উর্ধ্বাকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলীর নক্ষত্রগুলির দৃশ্য ও অদৃশ্যের ব্যবধান খুবই ক্ষীণ থাকে যেমন দুটি সুতা পাশাপাশি অবস্থান করে।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইউসুফ আলী বলেছেন, যারা প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত তারা উষার সৌন্দর্য সম্পর্কে ভালই জানেন। প্রথমে পূর্ব দিগন্তে শুভ্র আলোর রেখা দেখা দেয়, তারপর একটি কৃষ্ণ বর্ণ সবকিছু ছাপিয়ে উঠে। এ অবস্থানকে অনুসরণ করে অতি মনোরম ঈষৎ রক্তিম শুভ্র আভা যা স্পষ্টত রাতের আধার থেকে পৃথক। এটাই প্রকৃত ফজরের (উষার সময় এবং এর পরই রোজার উপবাস শুরু করতে হয়) সময়। শুভ্র ও কৃষ্ণ রেখা সম্পর্কিত আয়াতটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার জন্য আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Parker, G. W, Elements of Astronomy.

2. Ali, Allama Yusuf, The Holy Quran, p. 74, 1977.

www.bjilibrary.com

١٨٩- يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ

২ ঃ ১৮৯ লোকে আপনাকে নতুন চাঁদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বলুন, এটা মানুষ এবং হজ্জের জন্য সময় নির্দেশক।

বর্ণিত আয়াতটি দ্বারা নতুন চাঁদকে মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এবং হজ্জের তারিখ ও সময় নির্ধারণের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় চাঁদকে বর্ষপঞ্জি তৈরির ভিত্তি হিসেবে গ্রহণের জন্য নির্দেশ করা হয়েছে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতিটি মুহূর্ত, বিভিন্ন সময়ের ব্যবধান ও সময়কাল ইত্যাদি সুস্পষ্টভবে বোঝানোর জন্য বর্ষপঞ্জির প্রয়োজন হয়ে থাকে। এর জন্য সর্বাগ্রে সময়ের একক নির্ধারণ করতে হবে। মৌলিক একক নির্ধারণের ক্ষেত্রে এমন সময় হতে হবে যা সবার জন্য চেনা সহজ। বর্ষপঞ্জি নির্মাণে তিনটি একক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এসব হলো ঃ সৌর দিবস, চান্দ্র মাস এবং ক্রান্তীয় বর্ষ। এই তিনটি একক সৌর জগতের তিনটি আলাদা কার্যাবলির সাথে সম্পর্কিত।

একটি দিবস, আরো স্পষ্টভাবে বললে বলতে হয় একটি সৌর দিবসের অর্থ হলো পৃথিবীর গতিপথে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণের সময়কাল। চান্দ্রমাস চন্দ্রের সাথে সম্পর্কিত এবং সূর্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চন্দ্র দ্বারা পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করার সময়কাল বোঝায়। তাই চাঁদের পর পর দুটি সুস্পষ্ট পর্যায়ের সময়কে যদি এক মাস ধরা হয় (অর্থাৎ দুটি পর্যায়ক্রমিক নতুন চাঁদ) তাতে দেখা যায় যে, এই সময়কাল (অর্থাৎ চান্দ্র মাস) কখনো ২৯ দিন আবার কখনো ৩০ দিন হয়ে থাকে এবং গড়ে ২৯.৫০ দিন না হয়ে তা ২৯.৫৩০৬ দিন হয়ে থাকে। তাই পূর্ণ দিবস দ্বারা মাসকে পূর্ণ করা যায় না।

সময়ের তৃতীয় একক হলো ক্রান্তীয় বর্ষ যা পৃথিবীর সূর্যের চারদিকে ঋতুর সাথে সম্পর্কিত থেকে একবার প্রদক্ষিণ করাকে বোঝায়। ঋতু পরিবর্তন, রাতের বেলায় নক্ষত্রের পরিবর্তিত অবস্থান এবং দিনের বেলায় সূর্য পরিক্রমণের পথের ভিন্নতা দেখে তা বোঝা যায়।

একটি ক্রান্তীয় বর্ষের মধ্যে সৌর দিবসের সংখ্যা ও চান্দ্র মাসের সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা নয়। এভাবে একটি ক্রান্তীয় বর্ষে ৩৬৫.২৪২২২টি সৌর দিবস ও ১২.৩৬৮৩ চান্দ্র মাস হয়ে থাকে। তাই, যেহেতু এক বছরে দিবসের সংখ্যা ও চান্দ্র মাসের সংখ্যা কোনটিই যথাযথভাবে বছরের সাথে মিলে যায় না। যদিও পার্থক্যের অংশ খুবই সামান্য কিন্তু শত শত বছরের ব্যবধানে এর সমষ্টি ভয়ানক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। তাই এই ক্ষুদ্র বিভ্রান্তির বিষয়েও দৃষ্টি দেয়া খুবই

www.bjilibrary.com

জরুরী। খ্রিস্টপূর্ব ৪৬ সালে জুলিয়ান ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করা হয়। তাতে এক বছরে দিনের সংখ্যা ছিল ৪৫৫ দিন।[১] এরপর ১৫৮২ সালে সকল রোমান ক্যাথলিক দেশগুলিতে জুলিয়ান ক্যালেন্ডার হতে বছরে ১০ দিন কমিয়ে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের সূচনা করা হয়। এরপর ১৭৫৭ সালে ইংল্যান্ডে 'আমাদের ১১ দিন ফিরিয়ে দাও'–এই শ্লোগান তুলে ২রা সেপ্টেম্বরকে ১৪ই সেপ্টেম্বর ধরে এই ক্যালেন্ডার সংশোধন করা হয়।

উপরোক্ত আয়াতের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে কেবলমাত্র চাঁদের উপর ভিত্তি করে বর্ষপঞ্জি তৈরি করা যেতে পারে। এ ধরনের একটি চান্দ্র বর্ষপঞ্জিতে সবগুলি একক যেমন সৌর দিবস, চান্দ্র মাস এবং ১২টি চান্দ্র মাসে একটি চান্দ্র বছর হয়ে থাকে। হিজরী ক্যালেন্ডার এমনি একটি বর্ষপঞ্জি এবং মুসলিম দেশসমূহে এটি ব্যবহার করা হয়। একটি স্বাভাবিক হিজরী ক্যালেন্ডারে ১২টি চান্দ্র মাস থাকে যাতে এর একমাস অন্তর কোন মাস ৩০ দিনের এবং কোন মাস ২৯ দিনের (চান্দ্র মাসের সূচনা নতুন চাঁদ উঠার সাথে সাথে হয়ে থাকে) হয়। চান্দ্র মাসের গড় সময়সীমা ২৯.৫৩ দিন, যেখানে হিজরী মাসের সময়কাল ২৯.৫০ দিন। এতে বছরে ক্যালেন্ডারের সাথে চাঁদের হিসেবে যে ব্যবধান হয় তা ০.৩৬ দিন (৮ ঘন্টা ৩৮ মিনিট) যা খুব শীঘ্রই চোখে পড়ে এবং নতুন চাঁদ উঠার সাথে মাস আরম্ভ হয় না। এই সমস্যা দূর করার জন্য হিজরী ক্যালেন্ডার ৩০ বছরের চক্রে বিভক্ত হয়; প্রতি চক্রের প্রথম ১৯ বছরের প্রতি দ্বাদশ মাস ২৯ দিনে এবং পরবর্তী ১১ বছরের দ্বাদশ মাস ৩০ দিনে হয়ে থাকে। এই সহজ কৌশল অবলম্বনের কারণে হিজরী ক্যালেন্ডারের গড় মাসে সময়সীমা ২৯.৫০ দিন হতে বাড়িয়ে ২৯.৫৩০৫৬৬ দিন করা হয়েছে, যা প্রকৃত চান্দ্র মাসের সময়সীমা হতে .০০০০৩৩ দিন বা ৩ সেকেন্ড কম হয়ে থাকে। এর ফলে, চাঁদের সাথে ক্যালেন্ডারের হিসেবে পুরো ১ দিন ব্যবধান হতে ২৫০০ বছরের প্রয়োজন পড়ে। অন্যদিকে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে ১ দিনের ব্যবধান হতে ৩৩০০ বছরে প্রয়োজন হয়[২]।

মানুষ সৌর ক্যালেন্ডার পরিবর্তন করে থাকে হিসেবের প্রয়োজন অনুসারে যা সাধারণ মানুষের নিকট অপরিহার্য নয়। কিন্তু চান্দ্র ক্যালেন্ডারের ক্ষেত্রে নতুন চাঁদের উপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের নিকট সহজে বোধগম্য হয়। নতুন চাঁদ উঠার সাথে সাথে চান্দ্র মাস শুরু হয় এবং চাঁদের ক্রমপর্যায়ে চান্দ্র মাসের দিন বাড়তে থাকে। তাই বলা যায়, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন একটি সরল বর্ষপঞ্জি দান করেছেন যা সহজেই দেখা ও বুঝা যায়। সহজবোধ্যতার কারণেই এই ইসলামী ক্যালেন্ডারের গ্রহণযোগ্যতা সর্বজনীন। চান্দ্র ক্যালেন্ডারে

www.bjilibrary.com

ঋতুর আগমনের কোন নির্ধারিত মাস নেই। তাই বছরের সব ঋতুতেই ঘুরে ঘুরে রমজান মাসের আগমন হয়ে থাকে। সাধারণত হিজরী বছর সৌর বছর থেকে গড়ে ১১ দিন কম হয়ে থাকে। ফলে, ৩৩ বছরের ব্যবধানে চান্দ্র মাসের সাথে ঋতুর মিল হয়ে থাকে। যদিও আধুনিক জীবন যাপনের বিভিন্ন প্রয়োজনে চান্দ্র মাসের উপযোগিতা কম, কিন্তু বিভিন্ন ধর্মীয় উদ্দেশ্য যেমন- রোজা রাখা, হজ্জ পালন করা ইত্যাদি কাজে চান্দ্র মাস খুবই সন্তোষজনকভাবে কার্যকর। এখানে চান্দ্র মাসের একটি সুবিধা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাহলো পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মুসলমানরা গ্রীষ্ম ও শীত উভয় ঋতুতেই ঘুরে ফিরে রোজার মাস পেয়ে থাকে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Brown, H. Man and Stars, Oxford University Press, 1972.
2. Brandt I.C. and Maran, S.P. New Horizon of Astronomy, W.H Freeman and Company, 1972.

www.bjilibrary.com

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً -٢١٣

২ ঃ ২১৩ প্রথম দিকে সমস্ত মানুষ একই উম্মতভুক্ত ছিল।

এখানে এক উম্মত বলতে একই মতাবলম্বী এবং জাতি ছিল বলে ধরা যায়। আর জাতি অর্থ ধরলে মানুষ যে এক জাতি তাও ধরা যায়।

বৈজ্ঞানিকদের মতে দুনিয়ার সকল মানুষ একই প্রজাতির মানব গোষ্ঠী যাকে বিখ্যাত বিজ্ঞানী Linnaeus হোমো সেপিয়ান্স (Homo sapiens) নাম দিয়েছেন। প্রথম দিকে হয়তো মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনসংখ্যার বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। ধীরে ধীরে ছোট ছোট দল নতুন নতুন এলাকা দখল করে। এ সবের বহু দল বা জনগোষ্ঠী হয়ত অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। এই সমস্ত পৃথক পৃথক জনগোষ্ঠীতে জিনস (genes-জীবকোষের মৌলিক উপাদান বিশেষ) এর বিবর্তন (mutation) ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত অধিকতর যোগ্য বংশগুলোই টিকে থাকে যাদের জীবকোষে বিশেষ বিশেষ জৈব উপাদান (genetic trait) সংরক্ষিত হয়।

এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, জেনেটিক্সের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এদের মধ্যে সন্তান প্রজনন সম্ভব এবং এরা প্রজনন ক্ষমতাসম্পন্ন বংশধর জন্ম দিতে পারে। তা সত্ত্বেও মানব জাতির বিভিন্ন প্রজন্মে আকৃতিগত যথেষ্ট প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। মানুষের আকার, গায়ের রং, চুলের গড়ন, শরীরের বিভিন্ন অংশে লোমের অবস্থান, মাথার খুলির আকার এবং নাক-ঠোঁট ইত্যাদিসহ চেহারার বিভিন্নতা ইত্যাদিতে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। নৃবিজ্ঞানীগণ (anthropologists) এই সমস্ত পার্থক্যের ভিত্তিতে মানব জাতিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করার চেষ্টা করেছেন।

অনেকগুলো সমপ্রকৃতির জনগোষ্ঠীকে একটি বর্ণ বা জাতি বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই শ্রেণীর প্রধান বর্ণগুলো হলো ককেশীয় (কোকড়ান চুল, সরু নাক এবং সাদা চামড়া), নিগ্রো (পশমের মত চুল, প্রশস্ত নাক এবং কাল চামড়া), মঙ্গোলীয় (খাড়া চুল, কিছুটা প্রশস্ত নাক এবং হলুদ বা পিঙ্গল বর্ণের চামড়া) এবং অষ্ট্রেলেশীয় (Australoid) (কুঞ্চিত চুল, কিছুটা প্রশস্ত নাক এবং পিঙ্গল বর্ণ)। তবে এদের মধ্যে আরও অনেক শ্রেণী বিভাগ এবং মধ্যবর্তী শ্রেণীও করা হয়েছে।

মানব জাতির ক্রম বিকাশ (evolution) ঘটেছে জিনের পরিবর্তন (mutation), নির্বাচন (selection), চিরস্থায়ী স্থান পরিবর্তন (migration) এবং ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য (geographical isolation) ইত্যাদি সামগ্রিক

www.bjilibrary.com

প্রতিফলনের ফসল, যার ফলে বিভিন্ন এলাকার মানুষের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। গত ৫০০ বৎসরে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের স্থান পরিবর্তনের পূর্বে বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে বিশেষ কতগুলো বৈশিষ্ট্য দেখা যেতো। বর্তমানে সামুদ্রিক ব্যপ্তি বা পাহাড়ের উচ্চতা মানুষের স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারে না। ভ্রমণ ও যোগাযোগ দূরত্বের বাধা দূর করে ফেলছে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ বন্ধনের ফলে সংশ্লিষ্ট জাতির মৌলিক জেনেটিক পার্থক্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে চলেছে।

১৯০৩ সালে আমেরিকার শরীর বিজ্ঞানী উইলিয়াম সি বয়েড রক্তের জিনের ভিত্তিতে মানব জাতির শ্রেণী বিভাগ করার প্রস্তাব করেন। ইতিপূর্বে ১৯০০ সালে ল্যানডস্টেইনার তিনটি allelic genes এর ভিত্তিতে রক্তের চারটি গ্রুপ A. B. AB এবং O আবিষ্কার করেন। মানুষের রক্ত পরীক্ষা করে বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে সম্পর্ক বুঝা সম্ভব হয়েছে। এইসব পরীক্ষার ভিত্তিতে নৃতাত্ত্বিক বা প্রাথমিক যুগের মানুষের ইউরোপ ও এশিয়ায় এবং পরবর্তীতে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় ব্যাপক স্থান পরিবর্তনের সন্ধান পেয়েছেন।

যদিও মানব প্রজাতিকে (Homo sapiens) বিভিন্ন উত্তরাধিকারযোগ্য চিহ্নের (traits) মাধ্যমে বিভক্ত করা যায় তবুও মানব জাতির বিভিন্ন গোষ্ঠী বা গ্রুপের মধ্যে অমিল থেকে মিলই বেশী। সব মানুষের সম্পূর্ণ তুলনীয় তন্ত্র ও অঙ্গসমূহ এবং শারীরিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বিরাজমান, আর তাদের রাসায়নিক প্রক্রিয়া প্রায় সম্পূর্ণ এক ধরনের। সকল গোত্র বা বর্ণের মানুষের মধ্যেই ২৩ জোড়া ক্রোমোজম এবং একই প্রকার রক্তের গ্রুপ রয়েছে। মানুষ তার নিকটবর্তী উত্তরসূরী (বানর, শিমপাঞ্জি, গরিলা প্রাইমেটদের primates) থেকে পৃথক তাদের তুলনামূলক বড় আকারের মগজ, ছোট ছেদনকরী দাঁত, সোজা হয়ে হাটবার ক্ষমতা, যন্ত্র ব্যবহার এবং কথা বলার সামর্থের কারণে। সকল রকমের মানুষের মধ্যে সন্তান প্রজনন সম্ভব এবং বিভিন্ন জাতির মানুষের মিলনে জন্মগ্রহণকারী সন্তান সম্পূর্ণ প্রজনন শীল। গোটা পৃথিবীর সকল মানুষ জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একটি মাত্র জাতি।

তথ্যসূত্র ঃ

1. The New Encyclopaedia Britannica 2 : 1143. 1980.

www.bjilibrary.com

٢١٩- يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۡ
وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ ؕ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذٰلِكَ
يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۙ

২ ঃ ২১৯ লোকেরা আপনাকে (হে নবী) মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বলে দিন, এ দুটোতেই বড় পাপ (অকল্যাণ) রয়েছে এবং মানুষের জন্য কিছু উপকারিতাও আছে, কিন্তু উভয় কাজের পাপ তাদের উপকারিতা থেকে অনেক বেশী।

এই আয়াতে মদের জন্য আল-খাম্‌র (الخمر) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীস থেকে জানা যায় যে, এতে সব রকম নেশাকর বস্তুকেই ধরা হয়েছে। এর আরবী মূল শব্দ ইয়াখমুর (يخمر) যার অর্থ ঢেকে ফেলা বা কমিয়ে ফেলা। মদকে আল-খাম্‌র বলা হয় এই জন্য যে এটা মস্তিষ্কের কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে বাধা দেয় বা কমিয়ে দেয়। সাধারণত এতে শুধু মদকেই বুঝানো হত কারণ মহানবী (সা)র সময়কালে আরব দেশে মদই একমাত্র নেশাকর পানীয় হিসেবে প্রচলিত ছিল। তবে সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর থেকে উদ্ধৃত মহানবী (সা)-এর বিখ্যাত হাদীসে এই শব্দের পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন, "সব রকম নেশাকর দ্রব্যই খামর এবং সর্বপ্রকার খামরই নিষিদ্ধ বা হারাম।" অবশ্য বর্তমান আলোচনায় আমরা প্রথমে শুধু মদের ক্ষতিকর কথাই বলব পরে লটারি ও বাজিধরার ন্যায় জুয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

উপরের আয়াতে মদ ও জুয়ায় অনেক পাপ রয়েছে বলা হয়েছে। পাপ মানেই আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করা এবং আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করলেই মানুষের অকল্যাণ হয়। এছাড়া এই আয়াতে পাপের সঙ্গে উপকারের তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে পাপ বলতে মদ ও জুয়ার মাধ্যমে যে ক্ষতি হয় সে কথাই বলা হয়েছে।

মদ ও জুয়ার যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে এবং এ দুয়ের মাধ্যমে যে প্রচুর সামাজিক অপরাধমূলক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে তা সবাই জানে। কিন্তু অনেকেই জানে না যে গবেষণায় মানবদেহে মদের কত ব্যাপক অপকারের কথা আবিষ্কৃত হয়েছে। মদ ও জুয়ার অপকারিতা বেশী। তবে আল্লাহ্ সত্য বলেন তাই এর উল্লেখ করেছেন এবং বলে দিয়েছেন যে এদের অপকার অনেক বেশী।

মদ পান করলে খুব শীঘ্রই তা রক্তে চলে যায় ও কিছু ক্যালোরির যোগান দেয়, শ্বাস-প্রশ্বাসের মাত্রা বৃদ্ধি করে এবং রক্তবাহী শিরা প্রসারিত হয়। মদে শরীরের কর্মশক্তি যা বাড়ায় তা নগণ্য। এতে কোন পুষ্টি সাধন হয় না, আর অন্যান্য প্রভাব শরীরের কোন কাজেই লাগে না। তবে পানীয় হিসাবে নয় এর বাইরে মদ বা এলকোহলের কিছু উপকারী ভূমিকা রয়েছে যেমন ঃ

(১) পরিশ্রুত পানিতে ৭০ % এলকোহল মিশিয়ে ভাল জীবাণু প্রতিরোধক বা এন্টিসেপটিক তৈরি করা যায় এবং তা ইনজেকশন প্রয়োগের পূর্বে চামড়া জীবাণুমুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। অপারেশনের পূর্বে একজন শল্য চিকিৎসক এই ৭০% এলকোহল মিশ্রিত পানি দিয়ে হাত ভিজিয়ে নেন, তাতে হাত তাড়াতাড়ি শুকায় এবং জীবাণু মুক্ত হতে সাহায্য করে। (২) টিংচার আইওডিন (এলকোহলে দ্রবীভূত আইওডিন) সার্জারীর পূর্বে চামড়া জীবাণুমুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।

(৩) এলকোহল অনেক রাসায়নিক নির্যাস বের করতে সাহায্য করে। অনেক রাসায়নিক দ্রব্য এলকোহলে সহজে গলে যায়। তাই এই এলকোহল নানা প্রকার সুগন্ধি প্রস্তুত করতে ও লেবরেটরিতে রি-এজেন্টস তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

(৪) রি-এজেন্ট হিসাবে এলকোহল রসায়ন ও প্রাণরসায়নে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

(৫) এলকোহল পচন রোধ করতে সাহায্য করে বলে সংরক্ষণকর (preservative) দ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

পানীয় হিসাবে এলকোহল তথা মদের অপকারিতা অনেক যা গবেষণায় প্রমাণিত। এর সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে মস্তিষ্কের উপর, এবং উচ্চ মানবীয় গুণ বিশিষ্ট শক্তি প্রথম প্রভাবিত হয়। সকল ঔষধ বিজ্ঞানীরা (pharmacologists) একমত যে মস্তিষ্কের উপর মদের প্রভাব মোটেই উপকারী নয় বরং সব সময় ক্ষতিকর। এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে মদ একটি নেশাকর বস্তু এবং উদ্দীপ্তকারী নয়।[২] মদের নেশা সৃষ্টিকারী এবং অবসাদ দানকারী প্রভাব মস্তিষ্কের উপর সরাসরি কার্যকর হয়। একে প্রাথমিকভাবে উত্তেজক বস্তু বলে মনে হয়। এরূপভাবে নানা কর্মকান্ড এবং অতিরিক্ত কথা বলা আসলে নেশাকারীকে এক ভুল ধারণা দেয় যার কারণ তার উচ্চতর মানবীয় ধৈর্য ও প্রজ্ঞার অভাবে তার নিম্নস্তরের মনোবৃত্তিগুলো বিকাশ লাভ করে। দুই বা তিন আউন্সের এক ডোজ হুইস্কি (৪০% এলকোহল) পানের ফলে মনোনিবেশ, মনোযোগ, স্ফূর্তিশক্তি, যুক্তিদানের ক্ষমতা কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতা ইত্যাদি নষ্ট হয় এবং সময় জ্ঞান ও মস্তিষ্কের সঙ্গে কর্মকান্ডের সম্পর্ক বিনষ্ট হয়। যেহেতু তার মনের ও বিবেকের ক্ষমতা হ্রাস পায়, নিজের দোষ দেখতে পায় না, নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় তাই নেশাকারী যে কোন কাজের

www.bjilibrary.com

সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে বেখেয়াল হয় এবং যেখানে বিচার শক্তি ও ভাল-মন্দ বুঝে কাজ করার প্রয়োজন হয় সে সময় তা করতে পারে না। যদি রক্তে মদের পরিমাণ ০.১৫% (১৫০ মিঃ গ্রাঃ) বা তার বেশী হয় তাহলে নেশাকারীর গাড়ী চালানো পথচারীর জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক।

(২) নিউম্যান এবং ফ্লেচার[৪] ৫০ জনের দৃষ্টিশক্তির উপর মদের প্রভাব পরীক্ষা করে দেখেছেন। রক্তে ০.১১৫% বা তার বেশী পরিমাণ মদের উপস্থিতির ফলে সবারই দৃষ্টিশক্তির হ্রাস পাওয়ার প্রমাণ দিয়েছে। গোল্ডবার্গের[৫] মতে মদপানে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায় বলেই মদ্যপানকারীদের গাড়ী চালনায় বেশী সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি লিখেছেন মদ্যপানে দৃষ্টি শক্তির উপর সেরূপ প্রভাব পড়ে যা চোখের সামনে একটি ঘোলা কাচ রাখলে যেরূপ হয়ে থাকে অথবা গোধুলি বেলায় কালো চশমা পরে বা অন্ধকারে গাড়ী চালালে যেরূপ অবস্থা হয়। কোন বস্তুকে পরিষ্কার বুঝতে হলে উজ্জ্বল আলোর প্রয়োজন হয় এবং স্বল্প আলোতে কোন বস্তুকে স্পষ্ট করে দেখাই যায় না। যখন কোন ব্যক্তির চক্ষু উজ্জ্বল আলোতে ঝলসে যায় তার পক্ষে স্পষ্ট করে দেখতে একটু সময় লাগে। আর মদ্যপানকারীর বেলায় এই অবস্থায় অনেক বেশী সময় লাগে।

(৩) যদিও ৭% মদ পানিতে মিশিয়ে পান করলে হিস্টামিন জাতীয় বস্তু বা গ্যাস্ট্রিক রস ক্ষরণের ফলে সাময়িকভাবে পাকস্থলীর হাইড্রোক্লোরিক এসিডের ক্ষরণ বৃদ্ধি পায়[৬]। এর চেয়ে বেশী পরিমাণে (১৫-২০%) পান করলে পাকস্থলীর বিভিন্ন রসের ক্ষরণ হ্রাস পায় এবং এর ক্ষতিকর প্রভাবে পাকস্থলীর প্রদাহ দেখা দিতে পারে। এক সঙ্গে বেশী মদ্যপানে প্রায়ই বমি হয়ে থাকে।[৭] এছাড়া বার বার অল্প পরিমাণে এবং ধীর গতিতে পান করার ফলে পাকস্থলীতে অতিরিক্ত এসিড উৎপন্ন হয় (hyperchlorhydria) যা পেপটিক আলসার বা পাকস্থলীর ঘা সৃষ্টিতে সাহায্য করে এবং এই রোগ মদ্যপান চালু রয়েছে এমন সব দেশেই বেশী।[৮]

(৪) গ্রোনম্যান লক্ষ্য করেছেন যে ২ থেকে ৩ আউন্স হুইস্কি পানে নাড়ীর গতি ৫% থেকে ১০% বৃদ্ধি পায়। রক্তচাপ এবং শরীরে রক্ত প্রবাহও (হৃদপিন্ডের ধমনিতে নয়) বৃদ্ধি পায়।[৯]

(৫) পান করা মদের ৯০% থেকে ৯৫% যকৃতে অক্সিডাইজ (oxidized) হয়[১০] এবং মদ (ethyl alcohol) যকৃতের স্বাভাবিক কার্যকারিতা নষ্ট করে[১১]। ডানকান লক্ষ্য করেছেন যে প্রতি কেজি ওজনের ইঁদুরকে ৩ গ্রাম এলকোহল দিলে, যা ৬০ কেজি ওজনের একজন মানুষকে ১০০ প্রুফ হুইস্কির ১৮ আউন্স দেওয়ার সমান। ইঁদুরের যকৃতের গ্লাইকোজেনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। বর্তমানে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, alcoholic fatty liver বা

www.bjilibrary.com

hepati steatosis (যকৃতে অতিরিক্ত চর্বি জমা হওয়া)-এর প্রধান কারণ মদ্যপান এবং খাদ্যে শর্করাজাত উপাদানের অভাব বা অপুষ্টির জন্য নয়[১৩,১৪]। যকৃতের উপর মদের সরাসরি প্রভাব ইঁদুরের মধ্যেও প্রমাণিত হয়েছে।[১৫] এই fatty liver শেষ পর্যন্ত সিরোসিস (cirrhosis) রোগে পরিণত হতে পারে এবং কোন কোন সময় রক্তের শিরায় fat embolism হয়ে হঠাৎ অজ্ঞান হওয়া এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে।

(৬) মস্তিষ্কে এলকোহল পৌছালে, মস্তিষ্ক থেকে শরীরের স্বেচ্ছাক্রীয় মাংশপেশির প্রতি নির্দেশ প্রেরণে বাধার সৃষ্টি করে এবং এর ফলে ক্রটিপূর্ণ পেশি সঙ্কোচন ঘটে থাকে। এই ধরণের বাধা, ভারী আওয়াজে কথা বলা, দাঁড়াতে অক্ষমতা এমন কি স্বেচ্ছা মাংসপেশি সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে যেতে পারে। মস্তিষ্কের নির্দেশ পালনে বিলম্ব এই ক্ষতির অন্যতম নিদর্শন। মস্তিষ্কে মদের উপস্থিতি মাংসপেশিকে নির্দেশ মানতে বিলম্বিত করে। ফর্বস প্রমাণ করেছেন যে রক্তে মদের পরিমাণ ০.১০% থেকে ০.২০% হলে মস্তিষ্কের নির্দেশ পালনে ১০ থেকে ৩০% বেশী সময় লাগে। একটি মোটর গাড়ী যদি ঘন্টায় ৩০ মাইল বেগে চলে তবে প্রতি সেকেন্ডে ৪৪ ফুট দুরত্ব অতিক্রম করে। তাই মস্তিষ্কের নির্দেশ মানতে যদি এক সেকেন্ডের এক ভগ্নাংশও দেরী হয় তা হলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা প্রচুর।

(৭) ব্রাসেলস[১৬] লিখেছেন, মদ এক প্রকার বিষ এবং স্থানীয়ভাবে উত্তেজক (irritant)। প্রচলিত ধারণার বিপরীতে মদ মোটেই উদ্দীপক (stimulant) নয় যদিও মদ্যপানের আপাত উত্তেজনাকে উদ্দীপক বলে ধারণা করা হয়। মেক্সিকোর ডঃ কুয়ারন (Cuaron) ১৭ প্রকাশ করেছেন যে তার দেশের অধিকাংশ হিংসাত্মক অপরাধ যেমন আক্রমণ, নরহত্যা, চুরি, নারী নির্যাতন এবং সম্পদের ক্ষতিসাধন ইত্যাদির জন্য বিষের রাজা মদই প্রধানত দায়ী। ফোরেল (Forel)[১৮] লিখেছেন, "অভিজ্ঞতা বলে যে, যেসব দেশে মদ্যপানের অভ্যাস রয়েছে সে সব দেশে অর্ধেক থেকে দুই তৃতীয়াংশ অপরাধ, আত্মহত্যা, মানসিক বৈকল্য, মৃত্যু, দারিদ্র্য, যৌন অপরাধ, যৌন ব্যধি এবং পরিবার ধ্বংস ইত্যাদি বিরাট অংশের জন্য দায়ী মদ। সুইজারল্যান্ডের ১৫টি বড় শহরের হিসাব থেকে জানা যায় যে, পুরুষ আত্মহত্যাকারীর এক তৃতীয়াংশ এবং বিশ বৎসরের অধিক বয়সী পুরুষের মৃত্যুর এক দশমাংশের জন্য মদই প্রধানত দায়ী।

(৮) মদ্যপানের সবচেয়ে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হলো এই যে, এটা একটি এমন বদঅভ্যাস সৃষ্টিকারী নেশাকর জিনিস যা প্রচুর পরিমাণে পান করার ইচ্ছা জাগ্রত করে এবং অল্প পরিমাণে সন্তুষ্ট থাকা অত্যন্ত কঠিন। বলতে গেলে মদের কোন নিরাপদ পান-মাত্রা (dose) নেই এবং মদ্য পানের শেষ পরিণতি মদ্যপ

www.bjilibrary.com

রোগী হয়ে যাওয়া যাকে বলে chronic alcoholism। এই রোগের সংজ্ঞা হলো স্বভাবের বিকৃতি সাধন যার ফলে মদ্যপায়ী ঘন ঘন মদ্যপান করতে থাকে যা ক্রমে সাধারণভাবে স্বাভাবিক পান-মাত্রাকে অতিক্রম করে এবং তার সামাজিক , আর্থিক ও শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়।১৯ সুতরাং মদ্যপ বা মাতাল (alcoholic) সেই ব্যক্তি যে তার মদ্যপানের উপর থেকে স্বীয় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে অথবা মদ পান না করে থাকতে পারে না যার মধ্যে অত্যধিক মদ্য পানের কুফল প্রকাশ পায়।

(৯) **অসামাজিক আচরণ ঃ** মদ মানুষের মানসিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নষ্ট করার ফলে মানুষ অসামাজিক আচরণ করে বলে প্রাচীন রোমক বুদ্ধিজীবীরাও জানতেন। বিখ্যাত রোমক দার্শনিক 'সেনেকা'[২০] লিখেছেন-মাতাল অবস্থা সকল পাপের ইন্ধন যোগায় এবং সকল পাপকাজের বাহ্যিক প্রকাশ হয়। যে লজ্জা মানুষের পাপ প্রবৃত্তি গোপন করে সেই লজ্জাকেই মদ দূর করে দেয়। অধিকাংশ মানুব নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকে পাপ করতে লজ্জা পায় বলে, ভাল কাজ করতে মন চায় বলে নয়। সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, সন্ত্রাসের জন্য মদের প্রভাব খুবই উল্লেখযোগ্য।[২১]

(১০) **মদ ও মানসিক ব্যাধি ঃ** মদ্যপান মানসিক রোগের অন্যতম প্রধান কারণ। দীর্ঘ কাল ধরে প্রচুর মদ্য পানের অভ্যাস হঠাৎ বন্ধ করলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে আবল-তাবল কথা বলতে থাকে যার বৈজ্ঞানিক নাম delirium tremens. অবশ্য এটা দীর্ঘ চিকিৎসার মাধ্যমে আরোগ্যযোগ্য। এতে অনেক সময় অলীক ও ভীতিপ্রদ জন্তু-জানোয়ার দেখে রোগী ভয় পায় এবং খুব শোরগোল করে। বারবার এরূপ হলে মানসিক অবনতি, বুদ্ধিবৃত্তির হ্রাস এবং স্মৃতিশক্তিহীনও হতে পারে।২২

(১১) **মৃত্যুহার ঃ** Tashira ও Lipscombe[২৩] রিপোর্ট করেছেন যে, ক্যালিফোর্নিয়াতে মদ্যপানে মৃত্যুর হার স্বাভাবিক মৃত্যুহার থেকে আড়াই গুণ বেশি। তারা বয়স্ক লোকদের মধ্যে ৯% দুর্ঘটনায় মৃত্যুর তুলনায় মদখোরদের দুর্ঘটনায় মৃত্যুহার দেখতে পেয়েছেন ২৫%। Dahlgren[২৪] মদ্য পানের ফলে পানিতে ডুবে দুর্ঘটনায় ও আত্মহত্যায় মৃত্যুর সংখ্যা বেশী লক্ষ্য করেছেন। Kessel ও Grossman[২৫] আত্মহত্যার হার মদ্যপানকারীদের মধ্যে ৮০ গুণ বেশী পেয়েছেন।

(১২) **মদ্যপানের নেশার চিকিৎসা তেমন সন্তোষজনক নয়।** মদের নেশা দূর করার জন্য কয়েক বছরব্যাপী চিকিৎসায়ও ভাল ফল পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে মদ্যপান ছেড়ে দেওয়া যথেষ্ট নয়। কারণ মদের নেশা প্রায়ই পুনঃ পুনঃ দেখা দেয়।[২৬]

www.bjilibrary.com

উপরের বর্ণনা প্রমাণ করে যে, উপকারিতার তুলনায় মদের অপকারিতা অনেক বেশী।

একই আয়াতে (আয়াত ২ ঃ ১১৯) মদের সঙ্গে জুয়ার প্রসঙ্গও উল্লেখ করা হয়েছে। জুয়া বলতে সাধারণভাবে কোন বিষয়ে কোন সুযোগ গ্রহণ করে সুবিধা লাভ করাকে বুঝায়। আর সীমিতভাবে বলা যায় যে জুয়া হলো সামান্য কিছুর বিনিময়ে হঠাৎ প্রচুর লাভ করার প্রচেষ্টা। দার্শনিক ও মনস্তত্ত্ববিদগণ বলেছেন যে জুয়া মানুষের দুটি মৌলিক স্বভাবকে আকর্ষণ করে, যেমন– লাভ করার আকাংখা ও অনিশ্চয়তার রোমাঞ্চ।

মদের মত জুয়াতেও অকল্যাণ নিহিত রয়েছে। জুয়ার কিছু কল্যাণ রয়েছে, যেমন–

(১) জুয়াড়ি সামান্য পুঁজি বিনিয়োগ করে বিনা মেহনতে প্রচুর টাকা উপার্জন করতে পারে।

(২) সে নেহায়েত ভাগ্যগুণে আয় করে।

(৩) কেউ কেউ সামান্য পরিমাণ টাকা বাজি ধরে জুয়া খেলাকে চিত্তবিনোদন বলে মনে করে।

প্রাচীন কাল থেকেই নানাভাবে জুয়ার মাধ্যমে আর্থিক লাভ করার প্রচেষ্টা সব দেশেই চলে আসছে যদিও কেউ কেউ তার প্রচণ্ড বিরোধিতাও করেছে। বর্তমানে প্রায় সব দেশেই জুয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন রয়েছে। প্রচুর আর্থিক ক্ষতি এবং ঝগড়া বিবাদ ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রতিরোধের জন্য আইনের প্রয়োজন। কারণ প্রাচীন কাল থেকেই জুয়ার ইতিহাস নানা ঘটনা ও দুর্ঘটনার সাথে সম্পর্কিত।[২৭]

জুয়ার ক্ষতিকর দিক যে অনেক বেশী তা নিম্নের বর্ণনা থেকে বুঝা যাবে ঃ

(১) যদিও কোন জুয়াড়ি কখনও কখনও ভাল আর্থিক লাভ করতে পারে, তবে শেষ পর্যন্ত সে ক্ষতিগ্রস্তই হয়ে থাকে। জুয়াড়ি মাঝে মাঝে জিতে, তবে প্রায়ই হারে।

(২) মদ্যপানের মত জুয়াখেলাও একটি বদ অভ্যাস সৃষ্টিকারী সামাজিক অপরাধ। অষ্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েল্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী মিঃ কেনা ((Kenna)[২৮] ঘোড় দৌড়ে সপ্তাহে কয়েক শিলিং বাজি ধরে এমন অংশ গ্রহণকারী এবং একই রাতে হাজার হাজার পাউন্ড নিয়ে জুয়া খেলে ব্রিটানির এ ধরনের জুয়াড়িদের মধ্যে গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন। তিনি বলেন, জুয়া সম্পর্কে এখনও যথেষ্ট জানা যায়নি। কেন মানুষ জুয়া খেলতে প্রবৃত্ত হয় এবং জুয়ার নেশা আর চিত্তবিনোদনের মধ্যে সীমারেখা কোথায় তাও নির্ধারণ সম্ভব নয়। যথেষ্ট গবেষণা করলে দেখা যাবে যে, জুয়ার নেশা মদের নেশার মতই একটা শারীরবৃত্তিক মানসিক রোগ। এ কথা সবাই জানে যে, মদ্যপানের মত জুয়াও এমন এক নেশা সৃষ্টি করে যে যথেষ্ট আর্থিক লোকসান হওয়া সত্ত্বেও জুয়া না খেলে কোন জুয়াড়ি বসে থাকতে পারে না।

www.bjilibrary.com

(৩) মদখোরদের মত জুয়াড়িরা প্রায়ই শারীরিক ও মানসিকভাবে লাঞ্ছিত হয় যখন তাদের নেশার ঝোঁক কম থাকে।

(৪) জুয়ায় হেরে প্রচুর লোকসানের ফলে অনেক স্বচ্ছল এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত পরিবার গরীব হয়ে পড়ে।

(৫) অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণে জুয়াড়ির পারিবারিক জীবন অসুখী হয় এমনকি ভেঙ্গেও যেতে পারে।

(৬) জুয়া খেলার জন্য টাকার অভাব হলে জুয়াড়ি টাকার জন্য তহবিল তসরুফ, চুরি, ধোঁকাবাজি এবং নানারূপ অপরাধমূলক কাজের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে।

(৭) কোন যোগ্যতা ছাড়াই যে জুয়াড়ি ভাগ্য বলে প্রচুর অর্থ অর্জন করে সে সমাজের সেই সব লোক যারা সৎ জীবন যাপনের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করে তাদের জন্য একটি খারাপ নমুনা।

(৮) জুয়ায় বা লটারিতে বিরাট অংকের অর্থ লাভ করা আর একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ধোঁকা দিয়ে অনেক লোকের টাকা আত্মসাত করার মত অপরাধ।

(৯) সরকারি বা কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লটারির ব্যবস্থা মানুষের পরোপকারের মত মহৎ গুণের সৃষ্টি করে না। বরং এতে মানুষকে লাভের জন্য, অর্থ লাভের প্রায় অসম্ভব প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করে স্বীয় আত্মপ্রতারণার শিক্ষা দেওয়া হয়।

সুতরাং মদ ও জুয়া খেলায় কোন কল্যাণ নেই, তার চেয়ে অকল্যাণ যে অনেক বেশি কুরআনের বর্ণনায় তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র

1. Badri, M. B. Islam and Alcoholism, American Trust Publications, p. 3, 1976.
2. Harger. R. N. The Pharmacology and Toxicology of Alcohol, J. Amer. Med. Asoc. Vol. 167 (August), p. 2199, 1958.
3. Hebbelinck, M., The Effects of a Moderate Dose of Alcohol on a Series of Functions of Physical Performance in Man. Arch, Intem. Pharmacodyn. Therapy. Vol. 120, p. 402, 1959.
4. Newman, H, and Fletcher, E, Effect of Alcohol on Vision. Am. J. M. Sc, 202, 723. 1941.
5. Goldberg. L. Alcohol and Road Traffic. Kugelbergs Bektryckeri, Stockholm, p. 92. 1951.
6. Beazell. J. M. and Ivy, A. C. Influence of Alcohol on Digestive Tract, Quart, J. Stud. Alcohol; 1 : 45, 1940.

www.bjilibrary.com

7. Newman, H. W., Emetic Action of Ethyl Alcohol. Am. Med, Assoc. Arch Int. Med. 94:417, 1954.
8. Cleave. T. L. Peptic Ulcer, John Wright and Sons, Ltd. 1962.
9. Gronman. A. Influence of Alcohol on Circulation, Quart. J. Stud. Alcohol; 3 : 5. 1942.
10. Thompson, G. N. Alcoholism, Thomas, Springfield, 1956.
11. Josephson, B. and Asplund, A. G. Effect of Acute Alcohol Poisoning on Liver Functions, Svenska Lak, 45: 1564, 1948, abstracted, Quart, J. Stud. Alcohol, 9:614, 1949.
12. Forbes, G. Effect of Alcohol on Psycho-Motor Reactions on Possible Index of Degree of Alcoholic Intoxication, Medico-legal J. 15-23, 1947.
13. Cammermeyer, J. and Gjessing, R. Acta Med. Scand 139: 358, 1951.
14. Durlacher, S. H. Meier, J. R. Fishers R. S, and Levith, W. V. Am, J, Path. 30: 633, 1954.
15. Leiber, C. S., Jones, D. P. Medesion, J. and De Carti, L. M. Trans, Assoc, Auner phycns, 76: 289, 1963.
16. Brussel, J. A., Alcohlism, Collier's Encyclopaedia, Vol. 1, p. 347, New York, 1956.
17. Cuaron, A. Q., Morning News, Dhaka, 27.6.60, 1960.
18. Forel, A.A.M.J., Insanity, 57:297, 1900.
19. Keller, M. and Efron, V, Quart, J. Stud, Alcohols, 16: 619, 1955.
20. Seneca, L. A. (4Bc-65 A. D.). Classics to Alcohol Literature, Seneca's Epistle LXXXIII: On Drunkenness, Quart. J. Stud. Alcohol., 3:301.
21. Spain, D. M., Bradess, V. A, and Eggston, A. A. Alcohol and Violent Death, J. Am. Med, Assocs, 146:334, 1951.
22. Hulton, I. E. Mental Disorders in Modern Life. William Heinemann Ltd. London, 1940.
23. Tashira, W, and Lipscombe, W, R. Quart, J, Stud, Alcohol, 24: 50C, 1963.
24. Dahlgren, K. G., Acta, Psychiat, Seand, 26: 297, 1951.
25. Kessel, N. and Grossman, G., Pront M. J. 2:1671, 1961.
26. Edwards, G., Hosp. Med 2:272, 1967.
27. Walley, H. R., Gaming and Gambling, Collier's Encyclopaedia. Vol. 8. p. 562, New York, 1956.
28. Kenna, Morning News, July, 30th, Dhaka, 1960.

www.bjilibrary.com

٢٢٢- وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۙ
وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۚ
إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ○

২ ঃ ২২২ (হে নবী) লোকেরা আপনাকে স্ত্রীলোকের ঋতু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, এটি একটি অসুস্থতা বিশেষ। সুতরাং এ সময়ে নারীদেরকে একলা ছেড়ে দাও এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের সঙ্গে মিলিত হবে না। যখন তারা পবিত্র হয়ে যাবে তখন আল্লাহ্‌র হুকুম মতো তাদের সঙ্গে মিলিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবাকারী এবং পবিত্রতা পছন্দকারীদেরকে ভালবাসেন।

প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের প্রতি মাসে ৫-৭ দিন পর্যন্ত জরায়ুর রক্তক্ষরণকে মেয়েদের ঋতুস্রাব বলা হয়, যা গর্ভকালীন অবস্থায় বন্ধ থাকে। যদিও এটি একটি স্বাভাবিক নিয়ম তবুও ঋতুস্রাব, প্রস্রাব বা মলত্যাগের মত নিরাপদ বা বিপদমুক্ত নয়। কুরআনের বর্ণনা মতে ঋতুস্রাব একটা মৃদু অসুস্থতা বিশেষ যা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সমর্থিত।

(১) বিখ্যাত স্ত্রীরোগবিশারদ উইলফ্রিড শ'[1] লিখেছেন, "ঋতুস্রাবের সময় বিশেষ করে তলপেটে সামান্য অসুস্থতা বোধ হতে প্রায়ই দেখা যায়।" কোন কোন কুমারী মেয়ের প্রথম ঋতুস্রাবের সময় প্রচুর ব্যথা হয় এবং কারো কারোর বেলায় সারা জীবনই ঋতুকালীন সময়ে কিছু ব্যথা অনুভব করেন।

(২) ডাঃ জোয়ান গ্রাহাম[2] লিখেছেন, " যেহেতু ঋতুস্রাবের সময় রোগ বিস্তার এবং রোগজীবাণু সংক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে তাই একে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বা স্বাস্থ্যসম্মত বলা যায় না।"

(৩) ডাঃ ক্যাথারিন ডাল্টন[3] একজন বৃটিশ মহিলা ডাক্তার। বিটিশ যুক্তরাজ্যে তিনি ১৯৫৯-৬১ সালে হাসপাতাল, হোস্টেল এবং জেলখানায় যুবতী মহিলাদের কর্মকাণ্ডের উপর ঋতুস্রাবের প্রভাব নিয়ে গবেষণা চালান। তাঁর গবেষণার ভিত্তিতে তিনি বৃটিশ মেডিক্যাল জার্নালে পাঁচটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, ঋতুস্রাব শুরুর পূর্বে এবং স্রাবের সময় মেয়েদের শারীরিক সুস্থতা এবং যোগ্যতা যথেষ্ট হ্রাস পায়। ডাঃ ডাল্টন আরো লক্ষ্য করেন যে, এ সময় উদাসীনতা, অমনোযোগিতা, খেলাধুলায় আগ্রহের অভাব এবং বেশী কথা বলার প্রবণতা ২৬% থেকে ৩৬% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। যেসব মেয়ে স্বভাবত

অপরাধপ্রবণ, এ সময় তাদের অপরাধ করার প্রচেষ্টা আরো বৃদ্ধি পায়। তিনি আরো লিখেছেন, ৬ষ্ঠ গ্রেডের ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়স্ক ১১ জন বালিকাকে ক্লাস মনিটর নিযুক্ত করা হয়েছিল যারা অপরাধের শাস্তি দেওয়ার অধিকারী ছিল। লক্ষ্য করা গেছে যে, এই মনিটরগণ তাদের ঋতুস্রাবের সময় তাদের শাস্তি দেওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তারা স্রাবের সামান্য পূর্বে এই শাস্তির পরিমাণ বাড়ায় এবং স্রাবের পুরো সময় আরো বাড়ায় এবং ঋতুর পর আবার স্বাভাবিক হয়।

উপরের গবেষণালব্ধ ফলাফল দেখে ডাঃ ডাল্টন প্রশ্ন তুলেছেন যে, যদি ঋতুর সময় সকল মহিলাদের এ ধরনের প্রতিক্রিয়া সত্যি হয় তাহলে মেয়েদেরকে বিশেষ করে শিক্ষিকা, ম্যাজিস্ট্রেট এবং প্রশাসকের পদে তাদের নিযুক্তি কতটুকু যুক্তিসঙ্গত।

(৪) যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়ের ডাঃ আরডেলি[৪] ৭২৯ জন হাঙ্গেরীয় মহিলা ক্রীড়াবিদের উপর তাদের ঋতুস্রাবের প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, টেনিস এবং নৌকা বাইছ প্রতিযোগিতাকালে তাদের ক্রীড়ার মান ঋতুস্রাবের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।

উপরে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে, কুরআনে ঋতুস্রাবকে 'অসুস্থতা বিশেষ' বলা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং এই সময় সকল মহিলাদের উচিত শারীরিক পরিশ্রম ও জীবাণু সংক্রমণ থেকে সাবধান থাকা।

ঋতুর সময় আল্লাহ্ তা'আলা যৌন মিলন নিষিদ্ধ করেছেন, এটাও চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে যুক্তিসঙ্গত।

ঋতুস্রাবের সময় জরায়ুর মুখ, যা অন্য সময় মিউকাস জাতীয় জিনিষ দিয়ে বন্ধ থাকে, খুলে যায় যেন স্রাবের রক্ত বের হতে পারে। স্রাবের পর জরায়ুর ভেতরের দেয়ালে যে অতিরিক্ত কোষ বৃদ্ধি হয় তা গর্ভধারণ না হলে নষ্ট হয়ে রক্তের আকারে বের হয়। গর্ভধারণ করলে কোন স্রাব হয় না।

ঋতুর সময় যেহেতু জরায়ুর মুখ খোলা থাকে, তখন যৌন মিলন হলে, বাইরে থেকে রোগজীবাণু প্রবেশ করার আশঙ্কা থাকে।তাছাড়া যদি যৌন পথে পূর্ব থেকেই রোগ জীবাণু থেকে থাকে তাহলে সেই জীবাণু জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। এই জীবাণু প্রবেশ ভীষণ ক্ষতির কারণ হতে পারে এই জন্য যে, জরায়ুর দুপাশের ফেলোপিয়ন টিউবের মাধ্যমে জরায়ুর সঙ্গে পেটের ভিতরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। ফলে যদি স্ত্রীর যোনিপথে জীবাণু সংক্রমণ থাকে যেমন গনোরিয়া ও সিফিলিস, তবে যৌন মিলনের ফাঁকে সেই রোগ জীবাণু জরায়ুর দুই ফেলোপিয়ান টিউব দিয়ে তলপেটে প্রবেশ করে মহিলাদের মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করতে পারে, যেমন এন্ড্রোমেট্রাইটিস, সালপিনজাইটিস,

www.bjilibrary.com

পেরিটোনাইটিস এবং পেলভিক সেলুলাইটিস ইত্যাদি। যদি ঐ মহিলা ট্রাইকোমোনা ভেজাইনালিস (Trichomona vaginalis) নামক পরজীবীর আক্রমণে লিউকোরিয়া রোগে আক্রান্ত থাকে তবে যৌন মিলনের কালে পুরুষ যৌন সাথীর মূত্রনালীতে একই রোগ ট্রাইকোমোনাল ইউরেথ্রাইটিস (trichomonal urethitis) হতে পারে। এছাড়া রোগাক্রান্ত পুরুষ ঋতুস্রাবের সময় যৌন মিলনে সহজেই নারীকে যৌন রোগে সংক্রমিত করতে পারে।

একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত যে, যৌন মিলন একটি উত্তেজনাপূর্ণ ব্যাপার। তাই সে সময় যথেষ্ট স্বাস্থ্যবিধিসম্মত নিয়ম পালন করা সম্ভব হয় না। আর ঋতুর সময় যেহেতু স্রাবের জন্য জরায়ুর দেয়াল উন্মুক্ত থাকে এবং জরায়ুর মুখও খোলা থাকে তখন যৌন মিলনে নারী দেহে রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা খুব বেশী।[৫]

ডাঃ গ্রাহাম বলেছেন, ঋতুস্রাবের সময় যৌন মিলন নিষিদ্ধ হওয়ার প্রধান কারণ মনঃস্তাত্ত্বিক নয় বরং স্বাস্থ্যবিধি সম্মত। এছাড়া স্রাবের সময় রক্ত বের হতে থাকে সে সময় যৌন মিলন কুরুচির পরিচায়ক এবং তা কোন ভদ্রোচিত কাজ নয়। সুতরাং সুরুচির স্বার্থেও এ সময় যৌন মিলন নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

ইসলামে স্রাবের রক্তকে অপবিত্র ঘোষণা করেছে কিন্তু ঋতুমতী মহিলাকে নয়। সে সময় শুধু যৌন মিলন নিষিদ্ধ কিন্তু তাই বলে তাদেরকে অপবিত্র মনে করা উচিত নয়, যেমন কোন কোন সমাজে তেমন করা হয়।

সুতরাং এ ব্যাপারে কুরআনের সকল বিধি-বিধান বৈজ্ঞানিক ও স্বাস্থ্য বিধিসম্মত।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Shaw. W., Text Book of Gynaecology, Churchill, London, p. 106, 1948.
2. Graham, J., Any Wife or Any Husband, Heinemann, London, p. 44, 1955.
3. Dalton, K., Porit, Med. J., 1:148, 1959.
4. Erdelyi, G. T., Time, New York, p. 40, Dec, 12, 1960.
5. Muazzam, M. G., Quran-e-Biggan, Adhunik Prokashani, Dhaka, p. 81, 1981.

www.bjilibrary.com

٢٢٣- نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ
وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ

২ ঃ ২২৩ তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের কৃষিক্ষেত্রের মত, তোমাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে যেভাবে তোমরা ইচ্ছা কর নিজেদের ক্ষেতে গমন কর এবং তোমাদের আত্মার জন্য (ভাল কাজ) পূর্বেই প্রেরণ কর (নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করো) ....।

ভূমিকর্ষণ হিসাবে স্ত্রীগণ ঃ এই আয়াতে স্ত্রীগণকে স্বামী কর্তৃক ভূমিকর্ষণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

একজন কৃষকের নিকট চাষের জমি অতি মূল্যবান সম্পদ। কারণ এটা তার জীবিকার ব্যবস্থা করে এবং তদ্বারা মানসিক শান্তি লাভ হয়। সেই জমিতে সে যখন ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা চাষাবাদ করতে পারে কিন্তু যদি সে সাবধান না হয় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তা হলে জীবনে দুঃখ নেমে আসবে। জমিতে বীজ বপনের পূর্বে তাকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে যেমন জমি চাষ করা, জমির আগাছা দূর করা, প্রয়োজনীয় পানি সেচ দেয়া এবং সার প্রদান করা ইত্যাদি। নতুবা জমির উর্বরতা নষ্ট হবে এবং খুব কম ফসল উৎপন্ন হবে।

একজন ভাল চাষী তখনই জমিতে বীজ বপন করে যখন জমিকে সেজন্য পুরোপুরি তৈরি করা হয় এবং উপযুক্ত বা যথাসময়ে সে বীজ বপন করে। কারণ সে জানে যে শীতকালে গ্রীষ্মকালের ফসল হবে না।

এমনিভাবে একজন স্বামী যৌনমিলনের পূর্বে জেনে নেবে যে স্ত্রী শারীরিক ও মানসিকভাবে এ জন্য প্রস্তুত কিনা অর্থাৎ বীজ গ্রহণে রাজী কিনা। স্ত্রী যখন অপবিত্র অবস্থায় অর্থাৎ ঋতুমতী থাকে বা অসুস্থ থাকে অথবা সন্তান প্রসবের পর স্রাব (নেফাস) বন্ধ হওয়া পর্যন্ত যা প্রায় ৪০ দিন হতে পারে। এই সব বিষয়ে সাবধান হয়ে স্বামী যেভাবে বা যখন ইচ্ছা যৌন মিলনে লিপ্ত হতে পারে।

এ বিষয়ে আল্লামা ইউসুফ আলী তাঁর কুরআনের তাফসীরে লিখেছেন –

"যৌন জীবন কোন লজ্জাজনক কাজ নয় অথবা এটাকে অবহেলা করাও উচিত নয়, আবার এতে বাড়াবাড়িও করা ঠিক নয়। এটাকে চাষীর জমি চাষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এটা তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সে বীজ বপন করে ভাল ফসল তুলবার নিয়তে, তবে সে চাষ করার ব্যাপারে নিজস্ব সময় ও পদ্ধতি অবলম্বন করে। সে অসময়ে বীজ বপন করে না, অথবা এমনভাবে চাষাবাদ করে

www.bjilibrary.com

না যাতে জমির উর্বরতা হ্রাস পায়। সে বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ এবং বাড়াবাড়ি করে না। মানুষের জীবনে এই ব্যাপারে পরস্পরের প্রতি একে অন্যের দায়িত্ববোধ থাকতে হবে। আর সবার উপরে মনে রাখতে হবে যে, এই যৌন জীবনেরও একটি আধ্যাত্মিক দিক রয়েছে। আমাদের আত্মার কথা কখনও ভুললে চলবে না এবং মনে রাখতে হবে যে, আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

٢٢٨- وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ۭ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ

২ ঃ ২২৮ যে সব স্ত্রীলোককে তালাক দেওয়া হয়েছে তারা যেন তিন মাসিক ঋতু পর্যন্ত নিজেদেরকে বিরত রাখে। আল্লাহ্ তাদের গর্ভে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করা তাদের উচিত নয়, যদি সত্যিই আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি তাদের বিশ্বাস থাকে।

ইদ্দত ঃ এই আয়াত অনুযায়ী একজন তালাকপ্রাপ্ত মহিলা তিন ঋতুস্রাব পর্যন্ত অপেক্ষা করে তবে অন্য বিবাহ করতে পারবে। এটা নিশ্চয়ই (নিঃসন্দেহে) বৈজ্ঞানিক যাতে মহিলার পুনর্বিবাহের পর সন্তান প্রসব হলে সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে কোন মতবিরোধ সৃষ্টি না হয়। ইসলাম সন্তানের প্রকৃত পিতৃত্বের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় বিভিন্ন কারণে বিশেষ করে উত্তরাধিকারের ব্যাপারে।

গর্ভধারণ করলে নারীর ঋতুস্রাব বন্ধ হয় যাকে আমেনোরিয়া (amenorrhoea) বলে। এটাই গর্ভধারণের সর্বপ্রথম চিহ্ন। যাদের ঋতুস্রাব যথাসময়ে না হয়, যখন তখন বা অনিয়মিত হয় অথবা একেবারে স্রাব বন্ধ হওয়ার কাছাকাছি বয়স তাদের বেলায় স্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া আর নিয়মিত স্রাব হয় এমন নারীদের মত একার্থবোধক নয়। কোন যুবতী তার ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার পূর্বে অথবা কারো স্বাভাবিকভাবে স্রাব বন্ধ অবস্থায় যেমন সন্তান প্রসবের পর অথবা জন্মনিরোধ বড়ি সেবন বন্ধ করার পরও গর্ভধারণ হতে পারে। এছাড়া গর্ভের প্রথম অবস্থায় গর্ভ নষ্ট না হয়েও রক্তস্রাব হতে পারে (যা placenta বা 'ফুল' গঠিত হওয়ার সময় হতে পারে) তবে তা ঋতুস্রাব নয়[১]। এ ধরনের স্রাবের জন্য লোকেরা একে গর্ভ নাই বলে মনে করতে পারে। তাই ইসলামী আইনে পর পর তিন ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করলে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর গর্ভধারণ নাই এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকবে না এবং তার পরবর্তী স্বামীর সন্তানের পিতৃত্বের ব্যাপারে কোন দ্বিধা থাকবে না। আর গর্ভ থাকলে মহিলাকে সন্তান প্রসব পর্যন্ত অপেক্ষা

www.bjilibrary.com

করতে হবে তা হলেও সন্তানের পিতৃত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন থাকবে না। তিন মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করলে মাঝে মাঝে সামান্য রক্তপাত হলেও গর্ভ থাকলে তার অন্যান্য লক্ষণ ধরা পড়ে যাবে। এছাড়া তিন ঋতুকাল অপেক্ষা না করলে প্রথম স্বামীর সন্তানের উপরও দ্বিতীয় স্বামীর সন্তান হতে পারে যাকে superfecundation বা superfactation বলা হয় যদিও তা খুব কমই হয়ে থাকে। সুতরাং ইসলামী বিধান পালন করলে এসব সমস্যা থাকবে না। মিশ্রবর্ণের বিয়েতে সাদা বা কালো বাচ্চা নিয়ে কোনরূপ আইনগত সমস্যারও সৃষ্টি হবে না।

নারী গর্ভধারণ করেছে কিনা, প্রথম অবস্থায় সেই নারী ছাড়া এ বিষয়ে আর কেউ সঠিকভাবে বলতে পারে না, তাই আল্লাহ্ সত্য গোপন করতে তালাকপ্রাপ্তা নারীকে নিষেধ করেছেন। এসব নিয়ে ডাক্তারী পরীক্ষাদি করাও বেশ ঝামেলা। আর গর্ভ বেশীদিনের হলে তাকেও গোপন করতে পারবে না। তাড়াতাড়ি বিবাহের জন্য কোন মহিলা তার গর্ভধারণ গোপন করতে পারে তাই আল্লাহ্ এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন এবং মিথ্যা বলায় বড় গুনাহ বলে ঘোষণা করেছেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা সৃষ্টি বন্ধ করা।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Clayton , S. G., Lewis, T.L.T, and Pinker, G.m Obstetrics, 13th edn., Arnold p. 45, 1980.
2. Muazzam M. G., Quran-e-Bigyan, Adhunik Prakashani, Dhaka, 1981.

www.bjilibrary.com

٢٣٣. وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ

২ ঃ ২৩৩ যে পিতা চায় যে তার সন্তান পূর্ণ সময়কাল দুধ সেবন করুক, তখন মায়েরা নিজেদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বছর কাল দুধ সেবন করাবে।

আর যদি তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে অন্য কোন মেয়েলোকের দুধ সেবন করাবার ইচ্ছা করে থাক তবে তাতে তাদের কোন দোষ হবে না, অবশ্য যদি নিয়ম মত মূল্য ধার্য করে তা আদায় করা হয়।

মায়ের দুধ পান করার সময়কাল ঃ সকল স্তন্যপায়ী জন্তুর বেলায় নবজাতকের জন্য মায়ের স্তনে দুধ তৈরি হওয়ার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটে। মানুষ সহ সকল স্তন্যপায়ী জীবের বেলায় সন্তানদের বেশ কিছু দিন পর্যন্ত একমাত্র খাদ্যই হচ্ছে মায়ের দুধ। কিন্তু ৭ম শতাব্দীর আরবে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মায়েরা সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানো অসম্মানজনক মনে করতো যেমন এই কিছু দিন পূর্ব পর্যন্ত আধুনিক সমাজেও মনে করা হতো। নকল খাদ্যের তুলনায় মায়ের বুকের দুধে অনেক উপকার রয়েছে যা সম্প্রতি চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ অনুধাবন করে স্তন্য দুধ পান করাবার জন্য তাকিদ দিচ্ছেন। সন্তান প্রসবের পর মায়ের স্তনে দুধ তৈরি হয় একে lactation বলে। সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায় দুধ তৈরি বন্ধ থাকে কারণ প্লাসেন্টা (Placenta)-র ইস্ট্রোজেন, হাইপোথেলামাস এবং পিটুইটারী গ্রন্থির সম্মুখভাগের উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে। সন্তান প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রভাব দূর হয়ে যায় এবং প্রোল্যাকটিন মারফত স্তনে দুধ তৈরি হয়। তবে প্লাসেন্টা (জরায়ুর ফুল) জরায়ু থেকে পৃথক হয়ে বের হয়ে যাওয়ার বা অকেজো হবার পূর্বে নয়। স্তনে দুধ সৃষ্টি শুরু হলে দুধের প্রবাহ শিশুর চোষণ বা স্তনের বোটাকে উত্তেজিত করার মাধ্যমে জারি থাকে। হাইপোথেলামাস গ্লাণ্ডের স্নায়ুর মাধ্যমে শিশুর স্তন চোষার দ্বারা প্রোল্যাকটিন, গ্রোথ হরমোন এবং ACTH (adrenocoricotrophic hormone) তৈরি হয় এবং যৌন হরমোনসমূহ (gonadotrophins) তৈরি বন্ধ হয়ে যায়। যদি স্তনের বোটা রীতিমত উদ্দীপিত হতে থাকে তাহলে চার বৎসর পর্যন্ত স্তন্য দুধ প্রবাহ জারি থাকতে পারে।[১]

স্তনের বোটা থেকে দুধ স্তনের দুধের নালীর চারপাশের myoepithelial কোষগুলোর কুঞ্চনের ফলে বের হয় যার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিটোসিন এর প্রভাব

www.bjilibrary.com

যা স্তনের বোটার উদ্দীপনের ফলে হাইপোথেলামাস ও পিটুইটারী গ্লাণ্ডের সম্মুখভাগ থেকে প্রবাহিত হয়। অক্সিটোসিনও সন্তান প্রসবের পর জরায়ুকে বিশেষভবে কুঞ্চিত করে এবং এর জন্য স্তন্যপান বা স্তন মর্দন সাহায্য করে। এই কুঞ্চনের ফলে যে ব্যথা হয় তা শিশুর স্তন চুষার ফলে কমে। তবে এই কুঞ্চন জরায়ুর ভিতরের রক্ত ও জরায়ুর ফুল বের করতে এবং জরায়ুকে আবার স্বাভাবিক আকারে ফিরে যেতে সাহায্য করে।

সন্তান প্রসবের পর প্রথম কয়েকদিন স্তন থেকে শুধু এক রকম আঠালো পদার্থ colostrum বের হয়, কিন্তু তবুও শিশুকে যথারীতি স্তন চুষতে দিতে হবে যাতে শিশু ও মায়ের মধ্যে স্নেহের বন্ধন গড়ে উঠে এবং দুধ প্রবাহিত হতে সাহায্য করে, আর শিশুও স্তন চুষতে শিখে।[২] কলোষ্ট্রাম এক প্রকার পাতলা, হলদেটে দুধের মত পানীয় যাতে প্রায় ২০% পর্যন্ত আমিষ (protein) থাকে যার উল্লেখযোগ্য অংশই হলো রোগ প্রতিরোধমূলক গ্লোবিউলিন (immunoglobulin = Ig) যাতে মায়ের রক্তের এন্টিবডি (antibodies) গুলি বর্তমান থাকে। এতে দুধের চেয়ে বেশী খনিজ পদার্থ, অল্প চর্বিজাতীয় ও শর্করা জাতীয় পদার্থ থাকে। তাই এই কলোষ্ট্রাম নবজাত শিশুর জন্য অত্যন্ত উপকারী।[৭] কিছুদিন পূর্বেও কৃত্রিম খাদ্যের ব্যাপক প্রচলন ছিল যার জন্য দায়ী ছিল ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপনের প্রবল প্রভাব এবং ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্য যারা হবু পিতা মাতাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও উপদেশ দিতে পারতেন তাদের অনীহা। এর জন্য সামাজ ও ব্যক্তিগত জীবন ধারণ পদ্ধতির পরিবর্তনও দায়ী। কারণ আধুনিক জীবনে কৃত্রিম খাদ্য পরিবেশন বেশী সহজ বলে মনে করা হতো। তবে বর্তমানকালে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মায়ের বুকের দুধ শিশুর জন্য সর্বোত্তম পুষ্টিকর খাদ্য এবং এতে শিশুকে রোগজীবাণু, বিশেষ করে পেটের অসুখ এবং হাইপার সেন্সিটিভিটি জাতীয় রোগ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। জীবাণু সংক্রান্ত রোগ থেকে মুক্ত থাকার কয়েকটি প্রক্রিয়া রয়েছে। যেমন ঃ মায়ের Ig A এবং lysozymes হয় জীবাণুকে মেরে ফেলে অথবা তাদেরকে অন্ত্রের গায়ে লেগে থাকতে বাধা দেয়; মায়ের দুধের lactoferrum খনিজ লৌহ দ্রুত রক্তে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। ফলে রোগজীবাণু নিজেদের বংশ বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট লৌহকণা পায় না এবং মায়ের দুধ উপকারী lactobacillus bifidus জীবাণুকে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে। কিন্তু ক্ষতিকর অন্যান্য জীবাণুকে বংশবৃদ্ধি করতে বাধা দেয় যদিও এসব গরুর দুধ পান করলে যে ক্ষারক (alkaline) পরিবেশ সৃষ্টি হয় তাতে সহজে বৃদ্ধি পায়। মায়ের দুধের IgA hypersensitivity রোগ সৃষ্টিতে বাধা দেয় এবং গরুর দুধের প্রোটিন এর -এন্টিবডি তৈরি হওয়াও রোধ হয়।

www.bjilibrary.com

আধুনিক বিজ্ঞান এখন মায়ের দুধের উপকারিতার কথা জোর দিয়ে বলছে। অথচ ৭ম শতাব্দীর পবিত্র কুরআনে শিশুকে মায়ের দুধ পান করাতে হুকুম দেওয়া হয়েছে।

মায়ের দুধের আরো অনেক উল্লেখযোগ্য উপকারিতা রয়েছে। স্তন্যপান শুধু যে শিশুকে সর্বোত্তম পুষ্টি সরবরাহ করে তাই নয় বরং এটা মা ও শিশু উভয়ের মধ্যে একটা আরামদায়ক সম্পর্ক সৃষ্টি করে যা পরস্পরের জন্য কল্যাণের কারণও বটে। স্তন্যপান করিয়ে মায়ের যে আনন্দ লাভ হয় তার জন্য মা শুধু সন্তানের প্রয়োজনেই সময়মত দুধ পান করায় না বরং মাও স্তন্যপানের দুর্লভ মুহূর্তটির অপেক্ষায় থাকে। এর ফলে সবচেয়ে বড় ফায়দা হলো এই যে, মা তার শিশুর মায়ায় পড়ে যায়। এমনিভাবে মা ও শিশুর সম্পর্ক নিকট হয় এবং মা প্রথম মাসগুলোতে সন্তান থেকে আলাদা থাকতে চায় না এবং মায়ের অবিরাম উপস্থিতি শিশুকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয় এবং শিশুর প্রাথমিক জীবনে মায়ের প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহানুভূতি পেতে সাহায্য করে।

শিশুর মানসিক উন্নতির জন্যও স্তন্যপানের উপকারিতা রয়েছে। মনোবিজ্ঞানী ও মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, অনেকের মানসিক ব্যাধি এবং শিশু অপরাধের মূল কারণ হলো শিশুকালের নিরাপত্তার এবং ভালবাসার অভাব। শিশু মায়ের কোলে ও বুকে নিরাপদ মনে করে এবং মায়ের শরীরের কোমল স্পর্শ পেয়ে পুলক অনুভব করে।

গরুর দুধে শিশুর হজম ক্ষমতার বেশি চর্বি-জাতীয় বস্তু থাকে। তাই গরুর দুধ যথেষ্ট পাতলা করে দেওয়া উচিত যাতে সব প্রয়োজনীয় উপাদানের পরিমাণ সঠিক মানে চলে আসে। এছাড়া দুধ ফুটানো বা প্যাস্টোরাইজ করলে ভিটামিন সি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। মায়ের দুধ শিশুর প্রয়োজনের জন্য সুষম যাতে থাকে যথেষ্ট পুষ্টি, ভিটামিন এবং প্রতিরোধমূলক আমিষ। এতদ্ব্যতীত মায়ের দুধের তাপ শিশুর জন্য আদর্শ। এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, স্তনের সৌন্দর্য রক্ষার জন্যও তার স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড করাই উত্তম।[২]

গর্ভাবস্থায় অনেকগুলো এমাইনো এসিড প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত হয় বিশেষ করে হিসটিডিন ও থ্রিওনীন।[৩] গোটা গর্ভকালেই থ্রীওনীন নিষ্কাশন ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে, আর হিসটিডিন নির্গমণ চার মাসে সর্বোচ্চ পরিমাণে উপনীত হয় এবং এরপর শেষ পর্যন্ত একই পরিমাণে নির্দিষ্ট থাকে।[৪] স্তন্যপান কালে এসবের নির্গমণের পরিমাণ খুব শীঘ্র হ্রাস পায় এবং শেষ পর্যন্ত গর্ভ-পূর্ব অবস্থারও নিম্নে নেমে যেতে পারে।[৫]

www.bjilibrary.com

গর্ভপাত (abortion) হলে ৪ থেকে ৫ সপ্তাহ (গড়ে ২২-২৩ দিন) পর ঋতুস্রাব শুরু হয় এবং প্রথম ঋতুতেই ডিম্ব ক্ষরণ হয় (ovulution) প্রায় ৭৫-৮০% ক্ষেত্রে। কিন্তু স্বাভাবিক সন্তান প্রসবের পর ডিম্ব স্ফুটন ও ঋতুস্রাব হওয়া স্তন্য পান সময়ের উপর নির্ভরশীল।যে সব মায়েরা স্তন্য পান করায় না তাদের ঋতুস্রাব ৬-৮ সপ্তাহ পর শুরু হয় এবং তিন মাসের মধ্যে ৯০% মহিলার যথারীতি স্রাব হয়ে থাকে। কিন্তু স্তন্যদানকারী মায়েদের বেলায় আরও দেরিতে হয়। স্তন্যদান ও ডিম্ব স্ফুরণ একটি অন্যটির বিপরীত। এর কারণ হতে পারে যে, prolactin এবং gonadotrophins এক সঙ্গে নিঃসৃত হতে পারে না অথবা prolactin গোনাডোট্রোফিন নিঃসরণে বাধা দেয়। এমনও ধারণা করা হয় যে, স্তন্যদানকারী মহিলাদের ডিম্বকোষ (ovary) প্রতিরোধমূলক। স্তন্যদানে ওভারির ইস্ট্রোজেন তৈরী বাধাপ্রাপ্ত হয় বলেই এ সময় জরায়ুর আকার স্বাভাবিক হতে সাহায্য করে। মোটকথা স্তন্যদান করলে ঋতুস্রাব দেরিতে শুরু হয়।১

স্তন্যদান গর্ভধারণ বিলম্বিত করে। কারণ অনেকের বেলায় স্তন্যদানের সময়কাল ২ বছর পর্যন্ত চলতে পারে। খুব অল্প সংখ্যক মহিলার (১০-৩০%) ক্ষেত্রে ঋতুস্রাব ৩-৬ মাসের মধ্যেই শুরু হতে পারে। স্তন্যদানকারী মহিলার ঋতুস্রাব হলেও প্রথম দিকে স্রাব খুব অনিয়মিত হয় এবং প্রায় ৬০% ক্ষেত্রে প্রথম ঋতুতে ডিম্ব স্ফুরণ হয় না। এসব তথ্যাদি সত্ত্বেও এ কথা সত্য যে, স্তন্যদান করলে সন্তান ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। এটা এখন সর্বজন স্বীকৃত যে শিশুকে বুকের দুধ পান না করালে ঋতুস্রাব ও গর্ভধারণ শীঘ্র হয়ে থাকে। যদি গর্ভনিরোধ পদ্ধতি অবলম্বন না করা হয় তবে স্তন্যদানকারী মায়েরা৭-১০% ক্ষেত্রে যারা স্তন্য দান করে না তাদের ৭৫% ৬-৭ মাসের মধ্যে আবার গর্ভ ধারণ করে থাকে।

সুতরাং দুই বছর পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়াবার কুরআনের নির্দেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পরিবার পরিকল্পনায় সাহায্য করে। তাছাড়া মায়ের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যও কমপক্ষে তিন বছর সময় লেগে যায়। দেরিতে হলেও আধুনিক সমাজ আবার স্তন্যপানে ফিরে আসছে যা মা ও শিশু উভয়ের জন্য কল্যাণকর।

ইসলাম-পূর্ব আরব সমাজে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মায়েরা তাদের সন্তানদের জন্য দুধ-মায়ের ব্যবস্থা করতেন। আমাদের মহানবী (সা)-কেও দুধ-মা বিবি হালিমার স্তন্য দুগ্ধ পান করিয়েছেন। যদি পিতা-মাতা উভয়ে রাজি হয় তবে ইসলাম এতে সম্মতি দেয়। এ ব্যবস্থাতে শিশুর কোন স্বাস্থ্যগত অকল্যাণের আশঙ্কা নেই। কারণ যে মায়ের বদলে দুধ-মায়ের স্তনের দুধই পান করবে যা সবদিক দিয়ে একই মানের হবে।

www.bjilibrary.com

অবশ্য যদি কোন কারণে বিশেষ করে স্তনের রোগের জন্য বা দুধ-মায়ের অভাবে কৃত্রিম খাদ্য দেওয়া হয় তাতে কোন গুনাহ্ হবে না। তাছাড়া ৩-৪ মাস বয়স হলে শিশুকে কিছু বাড়তি খাদ্যও দিতে হবে কারণ তখন শুধু মায়ের দুধ যথেষ্ট নয়। মায়ের দুধ পর্যাপ্ত না হলে পানি মিশিয়ে অবশ্যই গরুর দুধ বা ছাগলের দুধ দিতে হবে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Jeffocoate, N. (Sir), Principles of Gynaecology, 4th edn, p. 119-123, Betterworths, London and Boston, 1975.
2. Clayton S. G. Lewis, T. L.T. and Pinker. G. Obstetrics, 13th edn. Arnold, p. 473, 1980.
3. Wallraff, E. B., Brodie, E. C. and Borden, A.L.J, Clin Invest, 29:1542, 1950.
4. Rullinger, V., Miller, S., Andrecovitz, M.E. And Perdue, G. M., Prow Soc. Exp. Biol. New York 86:108, 1954.
5. Thompson, R.H.S. and King. E.J., Biochemical Disorders in Human Disease. 1st edn. 104, 581, J.H. Churchill, London, 1957.

www.bjilibrary.com

٦- هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا
هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

৩ ঃ ৬ তিনিই তো তোমাদের মায়ের গর্ভে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে তোমাদেরকে রূপ দান করেন। মহান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নাই। তিনি মহান ও মহাজ্ঞানী।

উপরের আয়াতে মানব আকৃতির ক্রমবিকাশের দুটি প্রধান জৈব বৈশিষ্ট্যের দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছে-গর্ভধারণ ও বিভিন্ন মানুষের বৈচিত্র্যপূর্ণ আকৃতি দান ও প্রকৃতির নিদর্শন যা আল্লাহ্‌র নির্দেশে মাতৃগর্ভে সংঘটিত হয়।

যখন পিতার একটি ক্ষুদ্র শুক্রকীট মায়ের ডিম্বে প্রবেশ করে তখনই একটি মানব শিশুর সৃষ্টি শুরু হয়। এই শুক্রকীট ও ডিম্বের মিলন (fertilization) থেকে যে সৃষ্টি শুরু হয় তার ফলে শুধু যে মানব জাতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে তাই নয় এতেই রয়েছে মানুষের লিঙ্গ ও ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য। মানব সৃষ্টির প্রথম মাসে সংমিশ্রিত ডিম্বাণুতে এক আশ্চর্যজনক পরিবর্তন ঘটে। প্রথমে দুটি কোষে এবং পরে ক্রমাগত বিভক্ত হতে হতে একটি হাত, পা, মাথা, হৃৎপিণ্ড ও শরীর সহ একটি ক্ষুদ্র মানব শিশুর রূপ নেয়।[১]

দ্বিতীয়ত মহান সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি কৌশলে মায়ের জরায়ুতে যে অপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয় যার মাধ্যমে নবজাতকের আকৃতি, প্রকৃতি এবং আঙ্গুলের ছাপ পর্যন্ত এমনভাবে নির্ধারিত হয় যে, প্রতিটি মানুষের তাবৎ স্বকীয়তা ও ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠে। প্রাণ-রসায়ন বিদ্যা এ বিষয়কে শুধু স্বীকারই করে না বরং এই অলৌকিক কর্মকাণ্ডের প্রমাণ ও যুক্তি পেশ করে থাকে। প্রথমত মায়ের ডিম্বে পিতার শুক্রকীট প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই নবজাতকের লিঙ্গ নির্ধারিত হয়ে যায় যদিও তার বাহ্যিক অঙ্গ প্রকাশিত হয় অনেক পরে। মানুষের প্রতিটি কোষে ৪৬টি ক্রোমোজম রয়েছে-২২ জোড়া সাধারণ 'জিন' এবং এক জোড়া লিঙ্গ নির্ধারক জিন, মোট ২৩ জোড়া।[২] একজন পুরুষের লিঙ্গ নির্ধারক জিন হলো xy আর নারীর জিন xx । পুরুষের ক্ষেত্রে যত শুক্র কীট তৈরি হয় তার অর্ধেক x জিন, আর বাকি অর্ধেক y জিন। আর নারীর সব ডিম্বই একটি x জিনওয়ালা। সুতরাং পুরুষের শুক্রকীটের অর্ধেক x এবং বাকি অর্ধেক y (আয়াত ৫৩ ঃ ৪৫-৪৬)।

www.bjilibrary.com

যখন একটি ডিম্ব y জিনওয়ালা শুক্রকীট দ্বারা গর্ভাধান হবে তা হলে যে শিশু ভূমিষ্ঠ হবে তার লিঙ্গ হবে পুরুষ (xy)। আর যদি x জিনওয়ালা শুক্রকীট হয় তবে শিশু হবে মেয়ে (xx)। এই x অথবা y জিনওয়ালা শুক্র কীটের চয়নের ব্যাপারে মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ নাই এবং সন্তান পুরুষ না মেয়ে হবে সেটা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ই নির্ধারণ করেন।

মানব প্রকৃতির বাস্তব প্রকাশ লিঙ্গ-নির্ধারক কোষে আলাদা আলাদা এককে অবস্থান করে যাকে ১৯০৯ সালে বিজ্ঞানী জোহানসেন (Johannsen) জিন (gene) নামকরণ করেন। প্রত্যেক স্বাভাবিক ক্রোমোজম তার নির্দিষ্ট সংখ্যক 'জিন' ধারণ করে, আর যেহেতু সব ক্রোমজোমই জোড়ায় জোড়ায় থাকে তাই প্রতিটি 'জিনের একটি সাথী থাকে এবং এর একটি পিতা এবং একটি মাতা থেকে গৃহীত। যখন উভয় জিন সমমানের হয় তখন তাদের প্রভাব সমানভাবে প্রতিফলিত হয়। প্রায়ই একটি জিন অন্য জিনের তুলনায় শক্তিশালী হয় এবং অপর দুর্বল জিনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যদিও একটি শিশু তার অর্ধেক জিন পায় বাবা থেকে আর বাকি অর্ধেক মা থেকে–তবে সেও বাবা মায়ের প্রত্যেকের অর্ধেক জিন পায় সবটা পায় না। এখন বাবা-মায়ের জিনের কোন অংশ সন্তান পাবে তা আল্লাহ্র ইচ্ছায় নির্ধারিত হয় (যা প্রাণ-রসায়নবিদগণের নিকট আকস্মিক)। এটাও আকস্মিক বা নেহায়েত লটারির মত যে কোন শিশু তার পিতা-মাতার বা পূর্ব পুরুষদের যে কোন জিনের উত্তরাধিকারী হতে পারে। অবশ্য এও আল্লাহ্রই বিধান। শিশু কোন বিষয়ে বাপের ও কোন দিকে মায়ের প্রকৃতি পেতে পারে, কেউ এর মাঝামাঝি আবার কেউ এর কোনটি নাও পেতে পারে।

যদিও উত্তরাধিকার খুবই রহস্যময় বলে মনে হয় তবুও প্রতি মানব শিশুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তার মাতৃগর্ভেই সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত হয়। তাই প্রত্যেকে তার আকৃতি, আকার, রং এবং অন্যান্য বিষয়ে সম্পূর্ণ আলাদা এবং যে কোন দুইজন সবদিক দিয়ে একরূপ হয় না। এটা খুবই বিস্ময়কর যে হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ পর্যন্ত বিভিন্ন লোকের বিভিন্নরূপ। তাই একে মানুষের পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার বহু বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যে কোন বর্ণের (race) লোকের মধ্যে কতগুলো মিল দেখা যায়। এইরূপ বিভিন্নতার বৈচিত্র্যের মধ্যেও যে মিল রয়েছে তাতে মহান আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান।

www.bjilibrary.com

কোন কোন সময় গর্ভস্থ ভ্রূণে বিভিন্ন প্রকার জন্মগত দোষ দেখা দিতে পারে- যেমন জন্মগত হৃদপিণ্ডের রোগ, ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক, অতিরিক্ত আঙ্গুল ইত্যাদি। কোন কোন কোষে জীবন ধারণ সম্ভব। আবার কোন কোন কোষে জীবন ধারণ অসম্ভব। কিন্তু এসবই মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যদিও এসবের কোন কোনটি মাতৃগর্ভে থাকতেই আলট্রাসোনিক scanning -এর মাধ্যমে জানতে পারা যায়। তবে এ সকল বিভিন্নতাও আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত।

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, মানব শিশু মাতৃগর্ভে আল্লাহ্র ইচ্ছামত বিভিন্ন রূপ জিন সংযোজনের সম্ভাবনার মধ্যে যে কোন রূপ লাভ করে থাকে। মানব সৃষ্টির এই রহস্যাবৃত ও বৈচিত্র্যময় সম্ভাবনাসমূহ প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞ। সুতরাং মহান আল্লাহ্ তাঁর অসীম ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা বলে সৃষ্টি করেন যদিও তা আমরা বুঝতে সক্ষম নাও হতে পারি।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Moore, Keith, L., The Developing Human, 3rd edition, W. B. Saunders Co., pp. 1-91, 1982.
2. Welch, C.A. et al., Biological Science, Molecules to Man, Blue Version, Revised edition, Noughton Mifflin Co., Boston, p. 425, 1968.

www.bjilibrary.com

٢٧- تُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

৩ ঃ ২৭ তুমি রাতকে দিনের মধ্যে শামিল করে দাও আবার দিনকেও শামিল করে দাও রাতের মধ্যে। তুমি জীবন্ত জিনিস মৃত জিনিস থেকে বের কর এবং মৃত জিনিস বের কর জীবন্ত জিনিস থেকে এবং তুমি যাকে চাও বেহিসাব রিযিক দান কর।

দিবা-রাত্রির পরিবর্তন ঃ আমরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করি যে, সন্ধ্যা বেলায় রাত দিনের মধ্যে প্রবেশ করে এবং প্রভাতে দিন রাতের মধ্যে প্রবেশ করে। এই দিবা-রাত্রির আবর্তন নিম্নলিখিত কারণে ঘটে ঃ

(১) পৃথিবীর নিজস্ব কক্ষপথে দৈনিক আবর্তন যা আল্লাহ্‌র নির্দেশে সংঘঠিত হয়।

(২) পৃথিবীর প্রায় গোলাকার আকৃতি এবং তার চারিদিকের বায়ুমণ্ডল (atmosphere) যা আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি।

পৃথিবীর দৈনিক আবর্তনের ফলে দিবা রাত্রির পরিবর্তন সাধিত হয়। এ বিষয় ২ ঃ ১৬৪ আয়াতের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পৃথিবীর আকৃতি এবং বায়ুমণ্ডলের জন্য দিবা রাত্রির পরিবর্তন ধীরে ধীরে হয় যাতে কিছুটা সময় লাগে যাকে আমরা গোধূলি বলি।

গোধূলির সময় সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে একটা হালকা ও কোমল আলো কিছুক্ষণের জন্য চারদিকে বিকীর্ণ হয়, আবার প্রভাতে সূর্যোদয়ের (সুবহে সাদেক) প্রাক্কালেও একই অবস্থা হয়ে থাকে। এর কারণ হল সূর্যকিরণ বায়ুমণ্ডলে পড়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় বিভক্ত হয়ে পৃথিবীতে পৌঁছে। সূর্য দিগন্তের ১৮° ডিগ্রী নীচে চলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই গোধূলি বর্তমান থাকে।

এই গোধূলি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়কালের হয়ে থাকে। মেরু প্রদেশে বছরের বিভিন্ন সময়ে এর সময়কাল বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের হয়। তবে বিষুবরেখার আশে-পাশের সময়কাল প্রায় সমানই থাকে। পৃথিবীর উর্ধ্বে সূর্যের গতিপথ বিষুব রেখার উপর প্রায় অপরিবর্তিত থাকে এবং সূর্য দিগন্তের ১৮° ডিগ্রী নীচে নামার সময় তেমনই অপরিবর্তিত থাকে। গোধূলির সময়কাল বিষুব রেখার উপরে প্রায় এক ঘন্টা জারি থাকে। বিষুব রেখার উত্তর ও দক্ষিণে সূর্যের গতিপথ

www.bjilibrary.com

পরিবর্তিত হয় যার ফলে গোধূলির সময়কাল বেশ কম হয়। মেরু এলাকায় গ্রীষ্মকালে সূর্য দিগন্তের নীচে নামে না। উত্তর মেরু অঞ্চলের ঠিক দক্ষিণে গ্রীষ্মকালীন সূর্য কখনো ১৮° ডিগ্রীর নীচে পর্যন্ত নামে না। যার ফলে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সারারাত গোধূলি থাকে।[১]

একথাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, পৃথিবীর যে কোন স্থানে গোধূলি সারা বৎসর একই সময়ে শুরু হয় না এবং এর জন্য দায়ী সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর বাৎসরিক আবর্তন। পৃথিবী তার বাৎসরিক আবর্তনকালে বিভিন্ন স্থানে সূর্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে অবস্থান করে এবং তাতে রাত ও দিনের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন হয়। বছরে দুই দিন ২১ শে মার্চ এবং ২৩ শে সেপ্টেম্বর দিবা রাত্রির সময় কাল এক সমান হয়ে থাকে। উত্তর গোলার্ধে ২২ শে জুন সবচেয়ে দীর্ঘ দিন এবং সবচেয়ে ছোট রাত আবার দক্ষিণ গোলার্ধে; ২২শে ডিসেম্বর সবচেয়ে ছোট দিন এবং সবচেয়ে বড় রাত। এর ফলে এসব এলাকায় গোধূলির সময়কাল কম বেশী হয়।

জীবিত ও মৃতের আবর্তনশীল পরিবর্তন ধারা–এই আয়াতাংশের সঠিক ব্যাখ্যার জন্য 'জীবিত' ও 'মৃত' এই দুটি শব্দের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি জানা প্রয়োজন। জীবিত বলতে এমন জীবকে বুঝায় যা স্বয়ং অজৈব অণু-পরমাণু দিয়ে তৈরি –যা এমন জীবকোষ সৃষ্টি করে যার মধ্যে এক প্রাণ বাহন রয়েছে এবং যার ফলে সে যাবতীয় জৈব কর্মকাণ্ড (metabolic activities) পরিচালনা করতে সক্ষম। মৃত বলতে এমন বস্তু বুঝায় যা অজৈব অণুর সমষ্টি যার মধ্যে জীবনের লক্ষণসমূহ পুষ্টি এবং বংশ বৃদ্ধি ইত্যাদি অবর্তমান। একমাত্র মহান আল্লাহ্ই একটি অজৈব অণুর মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে প্রাণ ফুঁকে দেন। তবে এই বিষয়টি এখনও আমাদের জ্ঞান-সীমার বাইরে। বর্তমান আলোচনায় জৈব ও অজৈব বস্তু কিভাবে আবর্তন করে সে বিষয়টি স্থান পাবে। এই বস্তুর আবর্তন একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া যার বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হচ্ছে ঃ

পৃথিবীর একটি অংশ যাকে 'বাইয়োস্ফিয়ার' (biosphere) বলা হয় যার মধ্যে রয়েছে সমুদ্র, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ গভীরতা সহ মহাদেশগুলোর উপরিভাগ এবং বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন ভাগ। গাছপালা তাদের প্রয়োজনীয় জীবকোষের মধ্যস্থ মৌলিক উপাদানগুলো অজৈব অবস্থায় গ্রহণ করে বা সংগ্রহ করে তারপর সেগুলোকে বিভিন্ন জৈবরূপে পরিবর্তন করে এবং তাদের কোষগুলোই প্রাণীর জন্য খাদ্যে পরিণত হয়। গাছপালাও জীবন শেষ হলে সকল জৈব অণুগুলো আবার অজৈব অণুতে পরিণত হয় যাকে জৈব বস্তুর ধাতুকরণ পদ্ধতি বলা হয়। এটা কাঠকে চুলায় জ্বালানো বা জঙ্গলে আগুন লেগে পুড়ে

www.bjilibrary.com

যাওয়ার মাধ্যমে, প্রাণী ও বৃক্ষ জগতের শ্বাস-প্রশ্বাসে ঘটে থাকে। এর জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হয় গাছপালা ও প্রাণীদেহের পচন, জীবাণু কর্তৃক সকল জৈব কোষের ধ্বংস, পচন এবং অক্সিডেশন পদ্ধতির। বস্তুর আবর্তনে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো সকল জীবের ৯৮% বস্তুই ধাতব বস্তু।

কার্বন (Carbon) ঃ সবুজ পাতা সৌর শক্তিকে ফটোসিনথেসিস পদ্ধতিতে রাসায়নিক শক্তিতে পরিবর্তিত করে। যখনই গাছ এই শক্তি ব্যবহার করে তার শ্বাস ক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হয় যা বাতাসে বা পানিতে প্রবেশ করে। গাছপালা প্রাণীদেহের খাদ্য এবং সব জীব মৃত্যুর পর তাদের শরীরে জীবনব্যাপী সংগৃহীত কার্বন ত্যাগ করে।

পানি (H2o) ঃ প্রাণীজগত ও মানুষ পানি পান করে, আর উদ্ভিদ জগত মাটি থেকে পানি সংগ্রহ করে। সকল জীবই কিছু পানি তাদের জীবকোষে সংগ্রহ করে যা পরে কোষের ক্ষয়ের ফলে আবার প্রকাশ পায়। মোটকথা সব জীব যত পানি গ্রহণ করে তার সবটাই বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে, উদ্ভিদ জগত পাতার মাধ্যমে আর প্রাণী জগত শ্বাস ক্রিয়ার মাধ্যমে, গাত্র থেকে বাষ্পায়িত হয়ে এবং প্রাণীর বর্জ্য পদার্থের সঙ্গে এই ক্রিয়া সাধিত হয়।

নাইট্রোজেন (Nitrogen) ঃ গাছপালা মাটি থেকে নাইট্রোজেন জাতীয় পদার্থ অথবা প্রাকৃতিক নাইট্রোজেন গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন জীবাণুর সহায়তায় নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ তৈরি করে। এগুলোই গোটা প্রাণীজগতের জন্য নাইট্রোজেনের উৎস হিসেবে কাজ করে। বৃক্ষজগতের বিপরীতে প্রাণীকুল প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন ঘটিত রাসায়নিক বস্তু বর্জ্য পদার্থ হিসাবে নির্গত করে এমোনিয়া (ammonia), ইউরিক এসিড (uric acid) এবং ইউরিয়া (urea)-র আকারে।

ক্যালসিয়াম (Calcium) ঃ প্রাকৃতিক জগতে শিলারাশির মধ্যে ক্যালসিয়াম ঘটিত যৌগিক পদার্থ খুব বেশী পরিমাণে থাকে যা দ্রবীভূত অবস্থায় প্রাণী কর্তৃক পানির সঙ্গে গ্রহণ করে থাকে। ভূমিতলের বৃক্ষরাজি মাটি থেকে ক্যালসিয়াম ধাতু সংগ্রহ করে। এই ক্যালসিয়াম প্রাণীর হাড় ও শামুকের শক্ত বহিরাবরণ এবং বৃক্ষরাজি তাদের কোষের দেয়াল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। যখন প্রাণী ও বৃক্ষ মরে যায় তখন তাদের হাড় ও বহিরাবরণ মাটিতে জমা হয় অথবা সমুদ্র, হ্রদ এবং বিভিন্ন জলাশয়ের তলদেশে জমা হয় এবং পরে মাটির সঙ্গে মিশে যায়।

ফসফরাস (Phosphorus) ঃ এটা জৈব প্রাণীসমূহ অজৈব ধাতু হিসাবে গ্রহণ করে। জীবের জীবন্ত কোষে ফসফরাস তীব্র শক্তিসম্পন্ন ফসফেইট যৌগিক

www.bjilibrary.com

পদার্থ এবং নিউক্লিক এসিড (nuclic acids) রূপে সংগৃহীত হয়। জীবকোষের মৃত্যু হলে এটা আবার অজৈব ফসফরাস হিসেবে ফসফেইট জাতীয় যৌগিক পদার্থ গঠন করে। এই প্রক্রিয়াকে হাইড্রোলাইসিস (hydrolysis) বলা হয়।

সালফার (Sulpher) ঃ এটা জীব কোষের প্রধান অংশ হিসাবে এমাইনো এসিড, সিসটিন, মিথিওলিন এবং কিছু কো-এনজাইম রূপে অবস্থান করে। এগুলো পৃথিবীর বাইরের আবরণে প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং জীবজগতের নিকট প্রধানত দ্রবনীয় সালফেট রূপে গৃহীত হয়। বৃক্ষরাজি কর্তৃক তৈরি জৈব সালফার যৌগিক বস্তু, প্রাণী ও বৃক্ষ জগতের ক্ষুদ্র জীবাণুর পুষ্টিসাধন করে যারা মৃত প্রাণী ও বৃক্ষকে তার ক্ষুদ্র অণু পরমাণুতে পরিণত করে যার ফলে নির্গত হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস বাতাসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়।

ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium) ঃ এটা সবুজ বৃক্ষরাজির 'ক্লোরোফিল' অণুর অংশবিশেষ যা মাটি থেকে সংগৃহীত হয় এবং পরবর্তীতে তৃণভোজী প্রাণীর জীবকোষে তাদের খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে প্রবেশ করে। গাছপালা ও প্রাণী দেহ থেকে ম্যাগনেসিয়াম আবার মৃত্যুর পর মাটিতে ফিরে আসে।

উপাদানের অংশবিশেষ (Trace elements) ঃ দস্তা (জিঙ্ক), কপার (তামা), 'মলিবডেনাম' ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ খুব সামান্য মাত্রায় জীবকোষের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া ও প্রক্রিয়ায় অবশ্য প্রয়োজন হয়। এগুলো প্রধান প্রধান খাদ্যে ভেজাল হিসাবে এবং ধূলাবালির মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। এদের আগমন ও নির্গমন অন্যান্য প্রয়োজনীয় ধাতুর মতই যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

এতে বুঝা যায় যে, কুরআনের 'মৃত থেকে জীবিত এবং জীবিত থেকে মৃত' করার ঘোষণা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। সমস্ত মৌলিক পদার্থ অজৈব যা প্রাণী বা বৃক্ষ জগতে গিয়ে জৈব কোষের অংশে পরিণত হয়। আর প্রাণীর মৃত্যু এবং বৃক্ষরাজী ধ্বংস হলে সেইসব মৌলিক পদার্থ আবার মাটি এবং আবহাওয়ায় মিশে যায়।

তথ্যসূত্র ঃ

1. World Book of Encyclopaedia. Vol. 12, p. 342, 1966.

www.bjilibrary.com

٤٠- قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ۖ
قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ○

৩ ঃ ৪০ তিনি (জাকারিয়া আ) বল্লেন, হে প্রভু! আমি কী করে একজন পুত্র সন্তান লাভ করব যেখানে আমি ইতিমধ্যেই খুব বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি আর আমার স্ত্রী হল বন্ধ্যা ? (তাঁকে উত্তরে) বলা হল ঃ এমনই (হবে)। আল্লাহ্ যা চান তাই করেন।

হযরত জাকারিয়া (আ)-র বৃদ্ধ বয়সে পুত্র সন্তান লাভ ঃ হযরত জাকারিয়া (আ) পুত্র সন্তানের জন্য প্রার্থনা (দোয়া) করেন (আয়াত ৩ ঃ ৩৮)। এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফেরেশতা প্রেরণ করে তাঁকে জানালেন যে, আল্লাহ্ তাঁর দোয়া কবুল করেছেন এবং তিনি একটি পুত্র সন্তান লাভ করবেন যার নাম হবে ইয়াহইয়া। হযরত জাকারিয়া (আ) ফেরেশতার এই ঘোষণায় অবাক হয়ে গেলেন। কারণ তিনি ভেবেছিলেন যে, তাঁর পক্ষে কোন সন্তান লাভ সম্ভব নয়। তাই তিনি বলে উঠলেন, "হে আমার প্রভু! বৃদ্ধ বয়স এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, এ অবস্থায় আমি কী করে পুত্র সন্তান লাভ করব ?" তখন তাঁকে বলা হল যে, তাই হবে কারণ এটাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা।

এ কথা সত্য যে, পুরুষের পক্ষে সন্তান জন্মদানের কোন বয়সের সীমারেখা নেই এবং অনেক বৃদ্ধ তাদের যুবতী বা কমবয়সী স্ত্রীদের মাধ্যমে সন্তান লাভ করেন। বিজ্ঞানীদের মতে বৃদ্ধ ব্যক্তিও স্ত্রী সঙ্গমে সক্ষম এবং তার বীর্যে যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক শুক্রকীট থাকে তবে তার পক্ষে সন্তান জন্ম দান সম্ভব। এই আয়াতে হযরত জাকারিয়া (আ)-র কত বয়স ছিল তা বলা হয়নি। সুতরাং আমরা সহজেই মেনে নিতে পারি যে, তিনি বৃদ্ধ হলেও সন্তান জন্মদানে সক্ষম ছিলেন। হ্যাভলক[১] লিখেছেন, "পুরুষ মানুষের মধ্যে বার্দ্ধক্যেও যৌন ক্ষুধা ও যৌন সঙ্গমের সামর্থ্য বজায় থাকে।" তিনি আরও বলেছেন, "এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না যে পুরুষের মধ্যে মেয়েদের রজোনিবৃত্তি (menopause)-র মত কোন অবস্থা হয় কিনা। যদি তেমন অবস্থা থেকেও থাকে তবে তা খুবই অস্পষ্ট, আর বাস্তব সত্য তো এই যে, শুক্রকীট তৈরি ও নির্গমনের কোন শেষ সময় নির্ধারিত নেই এবং বার্ধক্যেও তা বজায় থাকতে পারে। একটি প্রতিবেদনে ১০৩ বছর বয়সেও পুরুষের এরূপ ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

স্ত্রীলোকদের বেলায় রজোনিবৃত্তি (ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া) সাধারণত ৪৫-৫৫ বছর বয়সে হয়ে থাকে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ৪৫-৫০ বছর বয়সে

www.bjilibrary.com

শুরু হয় এবং দুই-তিন বছর পর সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়।[২] তাই রজোনিবৃত্তি হলে কোন নারী সন্তান গর্ভে ধারণ করতে পারে না।

উপরের বিবরণ থেকে বুঝা গেল যে, হযরত জাকারিয়া (আ)-র পক্ষে সন্তান উৎপাদন সম্ভব ছিল।

কিন্তু কুরআনে তার তাঁর স্ত্রীর কোন বয়সের উল্লেখ নেই, সুতরাং তাঁর বয়স সন্তান উৎপাদনের বয়স সীমা ৫৫ বছরও হতে পারে। যদি তাই হয় তবে তাঁর গর্ভধারণ করা কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়।

হযরত জাকারিয়া (আ)-এর নিকট এ বিষয়টা অসম্ভব বিবেচিত হয়েছিল। তার কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে তাঁর স্ত্রী বন্ধ্যা ছিলেন। এই বন্ধ্যাত্ব একটা অস্পষ্ট অভিব্যক্তি, কোনরূপ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ছাড়া এই বন্ধ্যাত্বের ধারণা নেহায়েত অনুমানও হতে পারে। যদি কোন মহিলা বিবাহের পর কয়েক বছরেও সন্তান ধারণ না করে তবে তাকে সাধারণভাবে বন্ধ্যা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এমন বহু ঘটনা রয়েছে যেখানে বিয়ের ১০/১৫ বছর পরও মহিলা গর্ভবতী হয়েছে। এ ধরনের মহিলাদেরকে সমাজে বন্ধ্যা বলেই ধরা হয়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর আম্মা যেহেতু বিয়ের বহু বৎসর পরও সন্তান ধারণ করেন নি তাই তাঁর স্বামী এবং পরিবারের লোকজন ভেবেছিলেন যে, তিনি বন্ধ্যা। এ ছাড়া স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে সম্পূর্ণ সুস্থ স্বামী ও স্ত্রীরও অনেক সময় সন্তান হয় না যার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

নারীর পূর্ণ বন্ধ্যাত্বের অনেকগুলো কারণের মধ্যে নিম্নের কয়েকটি কারণ উল্লেখযোগ্য ঃ

ক) ডিম্বস্ফূরণ ব্যতীত ঋতুস্রাব যা এড্রিন্যাল গ্রন্থির দোষে এবং ভিটামিন B12 এর অভাবে হতে পারে। মেয়েদের বন্ধ্যাত্বের প্রায় শতকরা ৪%-এর জন্য দায়ী।

(খ) তলপেটের প্রদাহের (pelvic adhesious) ফলে যদি সেখানে বিভিন্ন অঙ্গ এমনভাবে জড়িয়ে যায় যার ফলে প্রস্ফুটিত ডিম্ব ফেলোপিয়ান টিউবে যেতে ব্যর্থ হয়।

(গ) প্রদাহ অথবা অস্বাভাবিক কুঞ্চনের (spasm) ফলে উভয় ফেলোপিয়ান টিউব সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বন্ধ হয়ে গেলে।

(ঘ) শুক্রকীট বা জাইগোট (zygote=ডিম্ব ও শুক্রকীট মিলিত হলে) গ্রহণে জরায়ুর অপারগতা ও অক্ষমতা।

(ঙ) জরায়ুর সৃষ্টি না হওয়া।

www.bjilibrary.com

(চ) যোনিপথ এবং জরায়ুর নিম্নভাগ যদি অতিরিক্ত স্রাবে, অতিরিক্ত অম্লযুক্ত এবং শক্ত হাইমেন (যোনি পথের পরদা) থাকার ফলে শুক্রকীট গ্রহণ করতে অক্ষম হয়।

(ছ) শুক্রকীটের বিরুদ্ধে Spermazyintinin বা Spermatozoa-immobilization এন্টিবডি (প্রতিরোধক) তৈরি হলে। এরূপ প্রতিরোধক বন্ধ্যা নারীদের মধ্যে পাওয়া যায়, অথচ কোন কুমারী এবং গর্ভধারণে সক্ষম নারীর মধ্যে পাওয়া যায় না।

(জ) জরায়ুর টিউমার যেমন লিওমাইয়োমা ও এডিনোমাইওসিস হলে।

(ঝ) সহবাসের ব্যর্থতা ঘটলে, ইত্যাদি।

সুতরাং গর্ভধারণ সম্পূর্ণভাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে। তাই বর্তমান আয়াতের আলোচনায় এ কথা বললেই যথেষ্ট যে মহান আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ)-এর জন্মের নির্দেশ কার্যকর করেন যদিও তা আমাদের অসম্পূর্ণ শারীরবিদ্যা (physiology)র জ্ঞানে অসম্ভব না হলেও খুবই অনন্য ঘটনা। যে কোন বিরল ঘটনা যা সাধারণত ঘটে না তাও আল্লাহ্ ইচ্ছা করলেই হতে পারে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Ellis. H., Psychology Sex 8th edn., PAN Vooks Ltd. London, pp. 255-271, 1962.
2. Jeffcoate, N. (Sir), Principles of Gynaecology, 4th edn. Butterworths, London and Boston, pp. 119-123, 1975.

www.bjilibrary.com

٤٧- قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ
مَا يَشَآءُ ؕ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

৩ ঃ ৪৭ তিনি (বিবি মরিয়াম) বল্লেন, ঃ হে প্রভু! আমার কী করে সন্তান হবে কারণ কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শও করেনি? তিনি (ফেরেশ্‌তা) জবাব দিলেন ঃ এটাই হবে, কারণ আল্লাহ্ যা চান তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোন কাজ করার ফায়সালা করেন, তখন তিনি শুধু বলেন, 'হও' অতঃপর তা হয়ে যায়।

কুমারী মাতার গর্ভে হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম ঃ ফেরেশতা কর্তৃক তাঁর (মরিয়মের) গর্ভে পুত্র সন্তান হওয়ার সংবাদে বিবি মরিয়ামের অবাক হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। কোন নারীকে কোন পুরুষ স্পর্শ পর্যন্ত না করলেও (যৌন সঙ্গম) সন্তান গর্ভে ধারণ করতে পারে এমন কথা সব সময়ই অসম্ভব বলে ইয়াহুদিরা হযরত ঈসা (আ)-এর শুধু মায়ের সন্তান হিসাবে কখনই মেনে নেয়নি। কিন্তু এই আয়াতে আল্লাহ্ স্পষ্ট করে ঘোষণা করছেন যে, হযরত ঈসা (আ) কুমারী মাতার গর্ভেই জন্মেছেন আল্লাহ্‌র বিশেষ নির্দেশে যেহেতু আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে যে কোন জিনিস সৃষ্টি করতে সক্ষম। কুরআনের ভাষায় ঈসা (আ)-এর জন্ম সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র একটি নিদর্শন (sign) এবং মুসলমানগণ তাঁর এই অলৌকিক জন্ম স্বীকার ও বিশ্বাস করেন। এ ধরনের কুমারী মায়ের সন্তান জন্মদান মানুষের বেলায় আমাদের জ্ঞান অনুযায়ী অসম্ভব এবং বর্তমান বিজ্ঞানের আলোকেও এর সঠিক ব্যাখ্যা দান সম্ভব নয়। তবে এই বিষয়ে মানুষের জ্ঞান ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে এবং বর্তমানে বিজ্ঞানীরা পুরুষ ছাড়া শুধু স্ত্রী জাতীয় প্রাণীর সন্তান উৎপাদনের ব্যাপারে কিছুটা বুঝতে সক্ষম হচ্ছেন। তাছাড়া, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতা'আলা যখনই কিছু সৃষ্টি করেন তখনই তাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন (laws)ও প্রয়োগ করেন। যদি আমরা পুরুষ ছাড়া সন্তান উৎপন্ন হওয়ার খবর নেই তবে দেখতে পাই যে এই বিশাল সৃষ্টি জগতে কুমারী মাতার গর্ভে জন্ম (virgin birth) বা পিতা ছাড়া জন্মের (parthenogenesis —parthos= virgin; genesis=origin) ঘটনা ঘটে থাকে।

প্রাণী এবং উদ্ভিদ জগতে প্রধানত পুরুষ ও স্ত্রী জাতির যৌন মিলনে নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি হয়। এর জন্য পুরুষ ও নারীর যৌন কোষ (sex cell বা gametes) এর মিলন প্রয়োজন হয়। তবে কোন কোন সময় প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে যৌন মিলন ছাড়াই নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এই অযৌন

www.bjilibrary.com

(asexual) সৃষ্টি সাধারণত এক কোষ বিশিষ্ট উদ্ভিদ ও প্রাণীর (যেমন হাইড্রা, প্লাজমোডিয়া ও এমিবা) মধ্যে ঘটে থাকে। তবে এ সবকে পার্থেনোজেনেসিস বলা হয় না।

এ কথা স্বীকৃত যে প্রাণীর বেলায় একটি পূর্ণতাপ্রাপ্ত (matured) ডিম্ব কোষে (ovum) নতুন প্রজন্মের সৃষ্টির সকল প্রয়োজনীয় মাল মশলাই মওজুদ থাকে। কোন কোন সময় কোন কোন প্রাণীর বেলায় এবং বিশেষ অবস্থায় একটি স্ত্রী ডিম্ব কোন শুক্রকীট কর্তৃক উজ্জীবিত না হয়েও নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করে থাকে যাকে স্বাভাবিক বা প্রকৃতিগত কুমারী জন্ম (parthenogenesis) বলা হয়। এই অবস্থা নিম্নস্তরের প্রাণী, বিশেষ করে আর্থ্রোপেড (arthropeds) প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়। সুতরাং পার্থেনোজেনেসিস হল যৌন মিলনের বিকল্প প্রজনন পদ্ধতি, যখন শুক্রকীটের মিলন ছাড়াই শুধু ডিম্ব থেকে নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি হয়। এ ধরনের প্রক্রিয়া দেখার জন্য গবেষণাগারে ডিম্বকে শুক্রকীটের বদলে নানারূপ যান্ত্রিক রাসায়নিক, জৈব-রাসায়নিক পদ্ধতিতে যেমন খোঁচা দিয়ে, বিভিন্ন প্রকার উত্তেজক পদার্থের সাহায্যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন এবং নানারূপ তেজস্ক্রিয় রশ্মি ইত্যাদির সাহায্যে উজ্জীবিত করা যেতে পারে[১]।

প্রত্যেক প্রজাতির জীবকোষে এক নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রমোজোম থাকে। যৌন জীবকোষ সৃষ্টির বেলায় এইসব জীবকোষ দুইভাগে ভাগ হবার সময় মেইওসিস (meiosis) অথবা রিডাক্শন ডিভিশন (reduction division)-এর মাধ্যমে ক্রোমোজোমের সংখ্যাও অর্দ্ধেক থাকে একে হেপলয়েড সংখ্যা (haploid numbers) বলা হয়। প্রজননের সময় পুরুষ ও নারীর যৌন কোষের মিলনে যে 'জাইগোট (zygote) তৈরি হয় তাতে উভয়ের অর্দ্ধেক সংখ্যক ক্রোমোজোম একত্রিত হয়ে আবার সেই প্রজাতির পূর্ণ সংখ্যক ক্রোমোজোমে পরিণত হয় (2 haploid= 1 diploid)

প্রাকৃতিক জগতে নিম্নস্তরের প্রাণীর স্বাভাবিক কুমারী জন্মের বেলায় ডিম্বকোষ বিভক্ত না হয়ে তাতে পূর্ণ সংখ্যক (diploid number) ক্রমোজোমই বর্তমান থাকে এবং সেই ডিম্বকোষ থেকেই নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি হয়। অন্য এক প্রকার কুমারী জন্মের বেলায় ডিম্বের 'রিডাকশন ডিভিশন' ঘটে থাকে (monoploid ডিম্ব) এবং এই ডিম্বকোষ ও যৌন প্রযুক্তি হোক বা না হোক (fertilization) ক্রমে নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করে থাকে।

মনোপ্লয়েড (বিভক্ত) ডিম্বের সন্তান যৌন প্রযুক্তি না হলে পুরুষ হয় আর যৌন প্রযুক্তির পর (diploid) হলে নারী সন্তান হয়। এ ধরনের বংশ বৃদ্ধির উদাহরণ মৌমাছি, পিঁপড়া, বোলতা জাতির প্রাণীর মধ্যে দেখা যায়। এদের

www.bjilibrary.com

মধ্যে যৌন মিলন ও যৌন মিলন ছাড়া, উভয় প্রকারের প্রজনন ঘটে থাকে[২]। অন্য এক প্রকার পোকা যেমন thrips এবং পানির পোকা Rotifera প্রজাতির মধ্যে পুরুষ প্রজাতি দেখাই যায় না। এদের মধ্যে সাধারণত কুমারী জন্মের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি হয়।(৩) মৌচাকে রাণী মৌমাছি কুমারী জন্মের মাধ্যমে পুরুষ মৌমাছি জন্ম দেয়। আবার এরা যৌন প্রযুক্তি সম্পন্ন ডিম্বও প্রসব করে যা থেকে তাদের কর্মী বাহিনী (workers) ও নারী মৌমাছির জন্ম হয়।

১৯০০ ঈসায়ী সালে কিছুসংখ্যক বিজ্ঞানী কৃত্রিম কুমারী জন্ম দেওয়ার জন্য পরীক্ষা চালান অনেকগুলো মেরুদন্ডহীন প্রাণীর উপর। গত কয়েক দশক পূর্বে (১৯৬০ সালের দিকে) ব্যাঙ ও খরগোসের ডিম্বকে কৃত্রিম উপায়ে উজ্জীবিত (যৌন মিলন ছাড়া) করা সম্ভব হয়েছে। এদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভ্রূণ পর্যন্ত হয়েছে এবং খুব অল্পসংখ্যক ক্ষেত্রে খরগোসের নতুন বাচ্চা জন্ম দেয়া সম্ভব হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ম্যেরিল্যান্ডের বেল্টস্‌ভিল কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে গবেষকগণ কিছু নতুন টার্কির ডিম কুমারী জন্ম বলে প্রমাণ পেয়েছেন। যদিও এসব ডিম্ব থেকে পূর্ণ বাচ্চার জন্ম সংখ্যা খুব কম, তবে একটির বেলায় কুমারী জন্মপ্রাপ্ত টার্কি প্রায় ১৬১ দিন বেঁচেছিল[৪]।

খরগোস ছাড়া অন্য কোন মেরুদন্ডী প্রাণীর বেলায় কুমারী জন্ম দেখা যায় নি। মানুষের বেলায়ও কোন কুমারী জন্মের বৈজ্ঞানিক তথ্য জানা নাই। তবে খরগোসের বেলায় কুমারী জন্ম (পার্থেনোজেনেসিস্) সম্ভব হওয়ায় এ কথা বলা যায় যে, স্বাভাবিক ক্রমোজোম বিভক্তি ছাড়া শুক্রকীট সন্তান উৎপাদনে খুব সামান্যই সাহায্য করে থাকে। তবে এ কথার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, নতুন প্রজন্মের দু'দিকের সামঞ্জস্য (symmetry) শুক্রকীটের ডিম্বে প্রবেশের দিক ও স্থানের উপর নির্ভরশীল। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে যথেষ্ট রকমফের হবার সুযোগ রয়েছে। কারণ প্রথম স্তরের ব্লাসটোমিয়ার (Blastomere) এর যথেষ্ট নিজস্ব শক্তি রয়েছে (totipotent) যার ফলে সে বিভক্ত হয়ে দু'টি বাচ্চা তৈরী করতে পারে যেমন এক ডিম্বের জোড়া বাচ্চা (uniovular twins)[৫]।

সুতরাং যেহেতু মেরুদন্ডী প্রাণীতেও কুমারী জন্ম সম্ভব তাই একথা ভাবতে কোন অসুবিধা নেই যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, নিম্ন জাতের প্রাণীতে ব্যবহৃত কুমারী জন্মের নিয়ম (law of parthenogenesis) হযরত ঈসা (আ)-এর কুমারী জন্মের জন্য ব্যবহার করেছেন। যেহেতু প্রাথমিক স্তরের ব্লাসটোমিয়ার টোটিপোটেনট বলে একই ডিম্বে জোড়া সন্তান সৃষ্টি করতে পারে, এবং একটি মনোপ্লয়েড (monoploid) ডিম্ব, যৌন প্রযুক্তি ছাড়াই নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করতে

www.bjilibrary.com

সক্ষম হয়, তা হলে বিবি মরিয়মের ডিম্বের ২৩টি ক্রোমোজমও বিভক্ত হয়ে হযরত ঈসা (আ)-এর কুমারী জন্ম সম্ভব করেছে। সুতরাং যদিও মানুষের বেলায় কুমারী জন্ম সম্ভব হয়নি তবুও এ যে জীব জগতে সম্ভব তা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য এ কথা আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয় কিভাবে মহান আল্লাহ্ বিবি মরিয়মের ডিম্বকে উজ্জীবিত করেছিলেন যার ফলে একটি পুরুষ মানব শিশুর জন্ম সম্ভব হয়েছিল। কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও প্রমাণ ছাড়া একটি আন্দাজ করা যেতে পারে যা নেহায়েতই একটি কল্পনা মাত্র। পাক কুরআন ও বাইবেলের মতে পুরুষের বেশে ফেরেশতাকে দেখে বিবি মরিয়াম চমকে উঠেছিলেন। যদি রঞ্জন রশ্মি (radiation) কুমারী জন্মের জন্য ডিম্বকে উজ্জীবিত করতে পারে, তবে ফেরেশ্তা যেহেতু নূর বা আলোর সৃষ্টি তাহলে সেই ফেরেশ্তার উপস্থিতির ফলে কোনরূপ রশ্মি বিবি মরিয়মের ডিম্বকে উজ্জীবিতও করতে পারে। এ হবে একটি অলৌকিক ব্যাপার তবে আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের বর্তমান জীব-রাসায়নিক সীমিত জ্ঞানের আলোকে বিবি মরিয়মের গর্ভে হযরত ঈসা (আ)-এর কুমারী জন্ম ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Bealy. R.A., Parthenogenesis and poly-ploidy in Mammalion Development. Cambridge Univ, Press, 1957.
2. Meyer, D.E, and Buchanan, R., Biological Sciences, 2nd ed., 1968; An Inquiry into Life, 474 Harcourt, Brace and World, Inc. New York.
3. Storer T.I., Usinger, R.L., Stebbins, R.C. and Nybakken, J. W., General Zoology, TMH edition : Tata Mcgraw Hill Publishing Co, Ltd, New Delhi, 199, 1975.
4. Miller, W. B., and Leth, C, High School Biology BSCS Green Version, 2nd ed., Rand Mcnally Co., Chicago, 603, 1963.
5. Warcick, R. and Williams, P. L. Gray's Anatomy, 35th edn, Longman, p. 22, 1973.

www.bjilibrary.com

٨٣- أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ○

৩ ঃ ৮৩ তারা কী চায় আল্লাহ্‌র দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন? - যখন আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে! আর তাঁর দিকেই তারা প্রত্যানীত হবে।

ইচ্ছায় হোক, কী অনিচ্ছায় হোক আল্লাহ্‌র নিকট মাথা নত করা ঃ আমাদের জ্ঞান মতে, আমরা জানি যে, আকাশমন্ডলী ও জমিনে নিম্নোক্ত শ্রেণীর বস্তু ও জীব রয়েছে ঃ

১. জড় পদার্থ, যথা– পরমাণু, অণু এবং এগুলো দ্বারা তৈরি বস্তুসামগ্রী।

২. জড় অবস্তুগত জিনিস যথা– বিভিন্ন আকারে বিরাজমান শক্তি এবং প্রকৃতির নানান রকম বল।

৩. জৈব পদার্থ যথা– মানুষ সহ উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল।

কুরআন আরো দু'ধরনের সত্ত্বার কথা বলে যথা– জ্বীন ও ফেরেশতা যা আমরা সাধারণ বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় ব্যক্ত করতে পারি না।

উপরে উল্লিখিত বস্তু ও সত্ত্বার মধ্যে ইলেকট্রনের মত সূক্ষ্মতমই হোক আর তারকা কিংবা নীহারিকার মত বিশালই হোক সকলেই আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বা নির্ধারিত প্রাকৃতিক আইনানুযায়ী তাদের স্ব স্ব কার্যক্রম পরিচালনা করে। বিভিন্ন আকারের শক্তি এবং প্রাকৃতিক বলের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে, যেগুলো আল্লাহ্‌র নির্দেশিত আইন অনুসারে কাজ করে।

শ্রেণী, প্রকৃতি এবং প্রকার ভেদ যাই হোক না কেন, সকলকেই এসব আইন মান্য করতে হবে এবং এরা কেউই এসব আইন লংঘন করতে জানে না, যে কারণে এমন দৃষ্টান্ত থাকতে পারে, যেখানে প্রাকৃতিক আইন লঙ্ঘিত হয়েছে বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে তা নয়।

যেহেতু সকল আইনই আল্লাহ্‌র জানা, সব কাজ এ সকল আইন অনুসারেই সম্পন্ন হচ্ছে এবং এ ধরনের কোন আইনের আপাত লঙ্ঘনও স্রষ্টা কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত বিশাল এক পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই চলছে, সেহেতু বুঝতে হবে যে, কোন আপাত লঙ্ঘনের মধ্য দিয়েও বিশেষ কোন কাজ সম্পাদিত হচ্ছে।

www.bjilibrary.com

উদাহরণস্বরূপ পদার্থের নিউক্লিয়াসের ভিতরস্থ কণাসমূহের (তথা প্রোটন ও নিউট্রন) মধ্যে বিদ্যুৎ কণা বিনিময়ের কথাই বিবেচনা করা যাক। ভর ও শক্তির সম্পর্ক বিষয়ক সূত্র তথা $E=mc^২$ থেকে আমরা জানি যে, একটি বিদ্যুৎ কণা বা মেস্‌ন (meson) তৈরির জন্যে প্রাপ্যতায় পরীক্ষাগারে বেগ বর্ধকের মধ্যে মেস্‌ন তৈরি করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, বাইরের কোন অতিরিক্ত উত্তেজনা ছাড়াই নিউক্লিয়াসে শক্তি সরবরাহ করা হয় কিভাবে। দৃশ্যত $\Delta E=$ ১৪০ মেভ পরিমাণে শক্তি সংরক্ষণ সূত্রের লংঘন করা হচ্ছে। এই লংঘনকে শুধু এভাবেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, এই শক্তি লংঘন এত মাত্রাতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ঘটে যা আমরা পরিমাপ করতে পারি না।

এই সংক্ষিপ্ত সময়ে ঘটমান প্রক্রিয়া এবং শক্তি সংরক্ষণ লজ্ঘনকে বলা হয় কার্যকর ক্ষমতাসম্পন্ন। মজার ব্যাপার হলো যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জগতের অন্যতম আইন এই শক্তি সংরক্ষণ-এর লজ্ঘন কোন এলোপাতাড়ি বা বিশৃংখলভাবে ঘটে না। শক্তি সংরক্ষণ লজ্ঘন সংঘটিত হয় $\Delta E\ \Delta tzh$ (প্ল্যাঙ্ক-এর ধ্রুবক) সূত্র অনুযায়ী, যা সূক্ষ্মতর জগত সম্পর্কে হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তা মতবাদের এক ধরনের প্রকাশ; সূত্র থেকে এই ধরনের ভ্রান্তিও একটা সূত্রানুযায়ী ঘটে থাকে। আল্লাহ্‌র নির্ধারিত আইনের ধারার বাইরে কোন কিছুই ঘটতে পারে না।

বরফে পরিণত হলে পানির ঘনত্ব হ্রাস পাওয়াকে প্রকৃতির অনিয়ম বা বিশৃংখলা মনে হতে পারে। সাধারণভাবে ঠান্ডা হলে যে কোন তরল পদার্থের ঘনত্ব বাড়ে এবং শেষ পর্যন্ত জমাট বাঁধনে ঘনত্ব সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে পানি যার ঘনত্ব ৪° সেঃ গ্রেঃ তাপমাত্রায় বরফে পরিণত হলে এর ঘনত্ব সর্বনিম্নে পৌছে যায়। বরফে রঞ্জন রশ্মি এবং নিউট্রনের বিচ্ছুরণ বা অপবর্তন বিষয়ক পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, বরফের রয়েছে স্ফটিকী গঠন যাতে প্রতিটি অক্সিজেন পরমাণু অন্য চারটি অক্সিজেন অণুর দ্বারা চতুষ্কোণাকারে ঘেরাও অবস্থায় থাকে (চিত্র-২)। অন্যান্য কঠিন গঠন কাঠমো বিশিষ্ট বস্তুর তুলনায় ভিন্নভাবে দুটি একটি উন্মুক্ত গঠন কাঠামো যা বরফের নিম্ন ঘনত্বের কারণ[১]। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, এই বিশৃংখলা বা অনিয়মও একটা নিয়ম মেনে চলে। মানুষ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর প্রভূত কল্যাণের জন্যেই আল্লাহ্ এ নিয়মের প্রবর্তন করেছেন।

আমাদের জ্ঞাত যত জীব রয়েছে তার মধ্যে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনানুযায়ী উন্নত কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে একমাত্র মানুষেরই রয়েছে উচ্চমান সম্পন্ন বুদ্ধিমত্তা এবং ইচ্ছা ও কর্মসম্পাদনের স্বাধীনতা। তাদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশিত বিধান অনুধাবন করে তারা সচেতনভাবেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব উপলব্ধি করে এবং স্বেচ্ছায় সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে।

www.bjilibrary.com

কিন্তু যারা বুদ্ধিবৃত্তিক এবং বস্তুগত ব্যাপারে আল্লাহ্ কর্তৃক মঞ্জুরকৃত স্বাধীনতার ভ্রান্ত প্রয়োগ করে এবং খারাপ কাজের মাধ্যমে তাদের অন্তরে রোগ এবং স্বভাবে বিকৃতির জন্ম দিয়েছে, তারা নির্বোধ এবং এত উদ্ধত যে তারা কথায় কান দেয় না, কিন্তু তারাও স্রষ্টার বিশাল পরিকল্পনার অধীন।

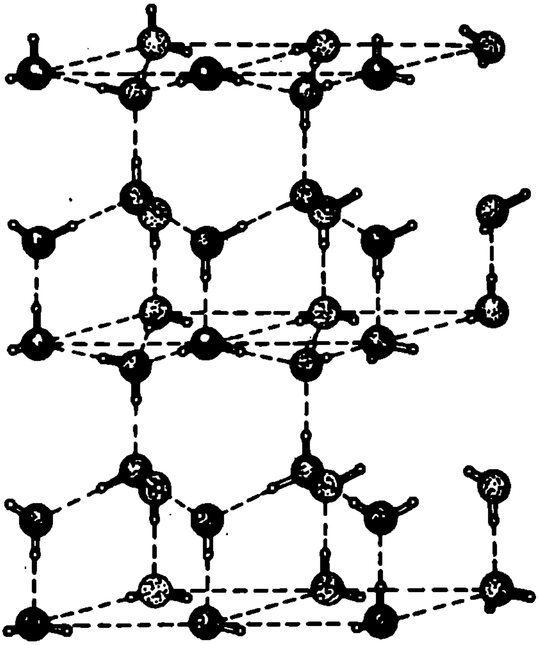

চিত্র-২

বরফ স্ফটিকের অণুর গঠন। এই চিত্রে পানির অণুর গঠন অবাধ। পানির অণুতে প্রতিটি অক্সিজেন-অক্সিজেন অক্ষ বরাবর একটি করে প্রোটন আছে। এরা দু'টি অক্সিজেন পরমাণুর মধ্যে হয় একটির নয়ত অন্যটির কাছাকাছি (Pauling-এর মতানুসারে)।

মানসিকভাবে অনিচ্ছুক হলেও অসৎ কর্মশীলরা আল্লাহ্র ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ না করে পারে না। তার দেহের প্রতিটি কোষ, দেহাভ্যন্তরস্থ সকল দৈহিক কার্যাবলি, তার শারীরিক উন্নতি এবং শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু- সবকিছুই আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী প্রাকৃতিক বিধান অনুসারেই ঘটে থাকে। অর্থাৎ তার উদ্ধত

www.bjilibrary.com

মন ছাড়া তার সমগ্র সত্ত্বা আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে। অসৎ কর্মশীল লোকের পক্ষে তাকে প্রদত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহারের কারণেই উদ্ধত আচরণ করা সম্ভব।

এভাবে উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, মহাবিশ্বের সকল সৃষ্টিই ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, আল্লাহ্ নির্ধারিত প্রাকৃতিক বিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করে থাকে। কিন্তু চিন্তা ও কর্মে মানুষকে সীমিত স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে এবং এভাবেই সে সৃষ্টির সেরা জীব (আশরাফুল মখলুকাত) হিসেবে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হয়েছে। এই স্বাধীনতার কারণে মানুষ তার যেরকম ইচ্ছা সেরকম জীবন পদ্ধতি বেছে নিতে পারে। কিন্তু সীমিত জ্ঞানের কারণে, তার পক্ষে কোন ভ্রান্ত জীবন পদ্ধতি বেছে নেয়ার প্রবণতা থাকা স্বাভাবিক। কাজেই, আল্লাহ্ তাঁর সীমাহীন করুণা আর প্রজ্ঞার মাধ্যমে আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছেন এবং তাঁর নবীগণের মাধ্যমে একটা দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা দান করেছেন যাতে আমরা আমাদের স্বাধীনতাকে প্রয়োগ করতে পারি।

তথ্য সূত্র ঃ

1. Pauling. L., The Nature of Chemical Bond and the Structure of Molecules and Crystals, Oxford Pub, Co. 3rd, Ed, p. 465, 1969.

www.bjilibrary.com

١٣٧- قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ○

৩ ঃ ১৩৭ তোমাদের পূর্বে বহু বিধান গত হয়েছে, সুতরাং তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যাশ্রয়ীদের কী পরিণাম!

সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতি ঃ অত্র আয়াতে কুরআন অতীতের জনগণের বিভিন্ন ধরনের জীবন পদ্ধতির উল্লেখ করে মু'মিনদেরকে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে স্বচক্ষে দেখতে বলা হয়েছে তাদের পরিণাম ফল যারা তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নির্ধারিত আইন ও বিধানাবলি অস্বীকার করেছিল অর্থাৎ সেগুলো অনুসরণ করেনি। আরো অনেক আয়াতেই বিশ্বাসীদেরকে বিশ্বপরিভ্রমণের তাকিদ দেয়া হয়েছে। যেমন আয়াত ৩ঃ১৩৭; ৬ঃ৬,১১; ১২ঃ ১০৯; ১৬ঃ৩৬; ২২ঃ৪৬; ২৭ঃ৬৯; ৩০ঃ৯, ৪২; ৩৫ঃ৪৪; ৪০ঃ২১; ৪৭ঃ১০। বর্ণিত উদ্দেশ্য হচ্ছে অতীতকে জানা এবং যারা আল্লাহ্‌র বাণী অনুসরণ করেনি তাদের কী পরিণতি হয়েছিল তা অবলোকন করা।

এ আয়াতগুলো কোন বিশেষ জনগোষ্ঠী, দেশ কিংবা সময়কালের কথা বলে না। মজার ব্যাপার হলো যে, ফারটাইল ক্রিসেন্ট (Fertile Crescent) হিসেবে জনপ্রিয় এবং পরিচিত ভূখণ্ডটি অনেক সভ্যতার উত্থান ও পতন প্রত্যক্ষ করেছে। এগুলোর কোন কোনটির কথা কুরআনে বিশেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এসব দৃষ্টান্ত আরবদের নিকট সহজে বোধগম্য ছিল। মিসর থেকে একটা রেখা টানা হলে তা যদি ভূমধ্যসাগর বরাবর নিয়ে যাওয়া যায়, আরো এগিয়ে ফিলিস্তিনী অঞ্চলসমূহ এবং সিরিয়া ঘুরে দজলা ও ফোরাত স্পর্শ করে মেসোপটেমিয়া হয়ে পারস্য উপসাগরে পৌছা যায়, তাহলেই এই অর্ধচন্দ্র (Crescent) হয়ে গেল। প্রায় চার হাজার বছর আগে ফারটাইল ক্রিসেন্ট (অর্থাৎ প্রাচীন সভ্যতা অধ্যুষিত অর্ধচন্দ্রাকৃতি অঞ্চল) নামের আরবীয় মরুভূমির চার ধারের এই অঞ্চল বহু সভ্যতাকে বুকে ধারণ করেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে, প্রস্তর যুগ থেকে শুরু করে গ্রীসীয়-রোমক সংস্কৃতি পর্যন্তকার সকল সভ্যতার কেন্দ্রভূমি এখানেই অবস্থিত।

মিসরের বিশাল বিশাল পিরামিড আর মেসোপটেমিয়ার বৃহদাকার মন্দির যার সাথে রয়েছে সুউচ্চ চূড়া এবং জিগুরাস এসব কিছুই এতদঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার প্রমাণ। প্রাচীন মিসর শাসন করত ফেরাউন রাজবংশ। আর দজলা ফোরাতের মধ্যবর্তী মেসোপটেমিয়া শাসন করত সুমার এবং আক্কাদ রাজাগণ। কিন্তু কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী পৃথিবীর সকল জাতির লোকদের

www.bjilibrary.com

মধ্যেই নবী-রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল (আয়াত ৫ ঃ ৫১; ১০ ঃ ৪৭; ১৩ ঃ ৭; ১৫ ঃ ১০; ১৬ ঃ ৩৬; ১৭ ঃ ১৫; ২৬ ঃ২০৮; ২৮ঃ ৫৯; ৩৫ঃ২৪; ৩৫ঃ৩৭)।

সুতরাং পৃথিবীর যে কোন যায়গায় বসবাসকারী একজন মুসলমানের জন্য এর অর্থ হবে যে, বিশেষত কুরআনে উল্লিখিত জাতিগুলো সহ অন্যান্য স্থানের জনগণের পাশাপাশি সে তার নিজ দেশের জনগণের একটি অংশ।

আল-কুরআন বিশ্বাসীদেরকে বলছে যে, তারা যেন নবী-রাসূলগণের প্রচারিত আল্লাহ্‌র বাণী অস্বীকারকারীদের পরিণতি অবলোকন করে। কুরআনের বর্ণনামতে, যেহেতু সকল জাতির নিকট নবী প্রেরিত হয়েছিলেন, সকল নবীর বক্তব্য এবং যে জাতির প্রতি তারা প্রেরিত হয়েছিলেন তাদের সকলেরই অত্র আয়াতের তাৎপর্য পুরোপুরি অনুধান করার কথা। তবে অতীত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ। আমরা সব ঘটনা জানি না।

এমনকি আমরা যদি শুধুমাত্র কুরআন উল্লিখিত নবীগণের মধ্যেই আমাদেরকে সীমিত রাখি তথাপিও সমস্যা থেকে যায় যে, তাদের সকলের উপর নাযিলকৃত ওহী কি ছিল তা আমাদের জানা নেই। এমনকি তওরাত (তোরাহ্) যবুর (সামস) এবং ইঞ্জিল (বাইবেল) ছাড়া অন্য কোন প্রক্ষিপ্ত কিংবা অনির্ভরযোগ্য আকারেও আল্লাহর ওহী বা প্রত্যাদেশ আমাদের হাতে নেই। হযরত ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব (আ) এবং তাদের গোত্রের নিকট নাযিলকৃত কিতাব বা ওহী যার কথা কোরআনের ৩ঃ৮৪ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে তাও আমাদের হাতে নেই।

শুধু একটা বিষয়ই আমাদের জানা যে, সকল নবীই শুধু যে শির্‌ক তথা অংশীবাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়েছেন তা নয় বরং তারা সব রকম দুষ্কর্মের বিরুদ্ধেই ছিলেন। আল্লাহ্‌র বাণী প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতি বলতে যদি ধরা হয় পরিপূর্ণ ধ্বংস, তাহলে অংশীবাদিতাকেই একমাত্র কারণ ধরে নেয়া কঠিন। কেননা, অনেক প্রাচীন অংশীবাদী জাতি আজও টিকে আছে। কাজেই অন্য আরো কারণ থাকতেই হবে।

কুরআনে বর্ণিত নবী-রাসূল এবং তারা যে সকল জাতির মধ্যে আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করে গেছেন তাদের কর্ম তৎপরতার বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, যারা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে ঃ ১) হযরত নূহ (আ) এবং হযরত লূত (আ)-এর জাতি, ২) সাদ জাতি, ৩) ছামূদ জাতি, ৪) মাদিয়ান জাতি। এ সকল জাতি অংশীবাদিতা ছাড়াও আরো বিভিন্ন দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়েছিল যা কুরআনে বিধৃত হয়েছে। এ সকল দুষ্কর্মের মধ্যে নৈতিক স্খলন বহু জাতির পতনের কারণ ছিল এবং এখনও বর্তমান, যা ইতিহাস থেকে জানা যেতে পারে।

www.bjilibrary.com

যাহোক অতীত সম্পর্কে জানতে হলে ইতিহাসের আশ্রয় নিতেই হয়, অথচ ইতিহাস কোন কোন দেশের ক্ষেত্রে খ্রি: পূ: ২০০০ থেকে ৩০০০ সালের পিছনে যায় না। এ সময়েরও পিছনের তথা প্রাগৈতিহাসিককালের কথা জানতে হলে একমাত্র ভরসা প্রত্নতত্ত্ব (archaelog) তথা মানুষের অতীতকালের দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে গবেষণা শাস্ত্র (আরকাই (archai) = প্রাচীন জিনিসপত্র, লোগোস (logos) = বিজ্ঞান, মতবাদ)। প্রত্নতত্ত্বের প্রধান লক্ষ্য হল বস্তুগত অবশেষকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে অন্যান্য সূত্র তথা লিখিত দলিলপত্র ও অন্যান্য বস্তুগত দ্রব্যাদি থেকে সম্পূরক হিসেবে কি জানা যায় সে তথ্য বের করে আনা।

বিগত এক শতাব্দী ধরে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীর প্রত্নতত্ত্ববিদগণ 'উর্বর অর্ধচন্দ্র; তথা ফারটাইল ক্রিসেন্ট দেশগুলোতে প্রাপ্ত প্রাচীন নিদর্শনাদি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বিধৃত বিবরণসমূহকে কতটা সমর্থন করে তা খতিয়ে দেখার জন্য ঐসব দেশে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত ফলাফল বাইবেল/ কুরআনের বিবরণাদিকে যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গিতে বুঝতে বেশ সহায়ক হয়েছে। বিভিন্ন আধুনিক ও উন্নত কলাকৌশলের সাহায্যে অধিকতর অনুসন্ধানে আরো বেশী নির্ভুলভাবে অধিক তথ্য ও তত্ত্ব বেরিয়ে আসবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

আধুনিক প্রত্নতত্ত্বে পদার্থ ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নানা শাখায় ব্যবহৃত অনেক আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে, যথা ঃ ১) পদার্থ বিদ্যা- তেজস্ক্রিয় ডেটিং এবং বায়ুমন্ডলীয় ফটোগ্রাফীর জন্যে, ২) রসায়নশাস্ত্র-রাসায়নিক ডেটিং এবং প্রত্নতাত্ত্বিক রসায়নের জন্যে, ৩) ভূতত্ত্ববিদ্যা, ৪) আবহাওয়া বিজ্ঞান এবং প্রত্নজীববিদ্যা, ৫) জীবাশ্মবিজ্ঞান (ফসিল অবশেষ), ৬) খনিতত্ত্ব, ৭) ভূ-কালনির্ঘন্ট, ৮) বৃক্ষকাল নির্ঘন্ট (গ্রোথ রিং গণনা করে বৃক্ষের উৎপত্তির তারিখ বা বয়স নির্ণয়) এবং অন্যান্য। এই সকল প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকালে প্রাপ্ত বিভিন্ন বস্তুর তারিখ সঠিকভাবে নির্ণীত হয়ে থাকে। তেজস্ক্রিয় কার্বন ডেটিং দ্বারা প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলোতে সন্ধানকৃত হাড়গোড়; কাঠ এবং ছাইয়ের মধ্যে তেজস্ক্রিয় কার্বনের (কার্বন ১৪) পরিমাণ পরিমাপ করে ঐ বস্তুর মোটামুটি বয়স নির্ণয় করা যায়। পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা গবেষণার by product এই তেজস্ক্রিয় কার্বন ডেটিং প্রত্নতাত্ত্বিক কাল নির্ঘন্টের বহুলাংশে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এনেছে। যদিও এটি একবারে নির্ভুল নয়, তথাপি এটি প্রত্নতত্ত্বে একটা নতুন দিক সংযোজন করেছে এবং কাল নির্ঘন্টকে চল্লিশ হাজার বছর পিছন পর্যন্ত সম্প্রসারণ করেছে। এছাড়া পটাশিয়াম-আর্গন কাল নির্ণয় পদ্ধতি এবং তাপালোক পদ্ধতিতে বয়স নির্ণয় পদ্ধতিও আজকাল প্রয়োগ করা হচ্ছে। পটাশিয়াম-আর্গন কাল নির্ণয় পদ্ধতি অন্তত ২০ লাখ বছর কিংবা সম্ভবত তারও বেশী আগেকার পূর্ব আফ্রিকায় মানুষের প্রাচীনতম ধ্বংসাবশেষ ও

www.bjilibrary.com

তার শিল্পকর্মকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব করেছে। হাড়গোড়ের ফ্লোরিন উপাদানের বিশ্লেষণ হাড়-হাড্ডির বয়স নির্ণয়ে সহায়ক প্রমাণিত হয়েছে।

মাত্র সাম্প্রতিককালে মিশর ও ইরাকের মত কিছু কিছু মুসলিম দেশ সেখানে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কাজে হাত দিয়েছে। কিছু কিছু প্রচেষ্টা ইসলামের প্রাথমিক যুগেই চালানো হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। বলা হয়ে থাকে, খলিফা মু'আবিয়া (৬৬১-৬৮০ খ্রিঃ) শাদ্দাদের রাজপ্রাসাদ হিসেবে জনপ্রিয়ভাবে পরিচিত প্রাসাদ এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন, যাকে কুরআনে (আয়াত ৮৯ ঃ ৭) সুউচ্চ স্তম্ভবিশিষ্ট ইরানের নগরী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক যে, অতীত সম্পর্কে জানার জন্য পৃথিবী পরিভ্রমণে কুরআন বার বার নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও এমনকি কুরআনে উল্লিখিত বিষয়সমূহ জানার জন্য কোন প্রচেষ্টাই চালানো হয়নি। অত্র আয়াত এ কথাই বলছে যে, মুসলমানদেরকে অতীতকে জানার চেষ্টা করতেই হবে। এটা তারা করতে পারে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিশেষত প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে।

١٩٠- إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي
الْأَلْبَابِ ۝

৩ ঃ ১৯০ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকের জন্য।

আসমান ও যমিনের সৃষ্টি ঃ কুরআনের এই আয়াতটি দু'ভাগে ভাগ করে বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথম অংশ তথা "আসমান ও যমিনের সৃষ্টিতে" কুরআনের ২ ঃ ১৬৪ আয়াতের প্রসঙ্গে ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

দিন ও রাতের প্রভেদ ঃ দ্বিতীয় অংশ তথা "দিবস ও রজনীর পার্থক্যের মধ্যে" ২ ঃ ১৬৪ আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

١٩١- الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

৩ ঃ ১৯১ যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব নিরর্থক সৃষ্টি কর নি, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে অগ্নিশাস্তি হতে রক্ষা কর।

www.bjilibrary.com

এ আয়াতটির দু'টি দিক রয়েছে। যথা ঃ ক) আয়াতটিতে উল্লিখিত উচ্চারণসমূহের তাৎপর্য এবং খ) যে ধরনের লোকেরা এরূপ উচ্চারণ করে থাকে।

এখন প্রথম বিষয়টির প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক্। বস্তুত উপরে উদ্ধৃত উচ্চারণটি আধুনিক বাস্তু সংস্থান বিদ্যার ভিত্তিস্বরূপ যা জীবন ও পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্রমান্বয় বিস্তার ও প্রসারে মানুষ শিখতে শুরু করেছে যে, প্রকৃতিতে জীবন ও বস্তুর বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় এমন কিছু নেই যা প্রয়োজনাতিরিক্ত কিংবা পরিত্যক্ত। প্রথমত আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সত্য ও বিজ্ঞতার উপর ভিত্তিশীল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ন্যূনতম নীতি বা সূত্র ক্রিয়াশীল রয়েছে, অর্থাৎ আলোকবিজ্ঞানে ন্যূনতম পথ, বলবিদ্যায় ন্যূনতম শক্তি মতবাদ ইত্যাদি। সবকিছুর মধ্য দিয়েই সৃষ্টির গতানুগতিক ও সুবিন্যস্ত আকারের কথা ফুটে উঠে। দ্বিতীয়ত সব রকমের জীব ও জড় বস্তুর মধ্য দিয়ে এক মহাপরিকল্পনার ছাপ বিমূর্ত হয়ে উঠে যা মানুষকে তার স্বীয় ব্যবস্থার ভিতরের ও বাইরের জিনিসের প্রকৃতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। রোগজীবাণুর কথাই ধরা যাক। কোন জীবাণুঘটিত রোগে আক্রান্ত হলে আমরা ভাবি, জীবণুরা সত্যিই এক জঘন্য উপদ্রব বিশেষ। আমরা উপলব্ধি করি না যে, এসব জীবাণুর অনেকগুলো এমন আছে যাদের ছাড়া আমাদের অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়ত। নাইট্রোজেন স্থাপন এবং আমাদের অনেক খাদ্যসামগ্রী উৎপাদনে জীবাণুর ভূমিকা সুপরিচিত। কিছু সংখ্যক রোগের জন্মদানকারী জীবাণু এবং ভাইরাস বাদে অন্য যেগুলোর বিরুদ্ধে মানব দেহ ও অন্যান্য জীবন যথাযথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে-অণুজীবেরা প্রকৃতির সূক্ষ্ম বাস্তুসংস্থান রক্ষায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

অধিকন্তু, আজকাল জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং তথা বংশগতি নিয়ন্ত্রক প্রকৌশল বিদ্যা বিষয়ে অনেক কথা বলাবলি হচ্ছে। কিন্তু এর বর্তমান আকারে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অর্থ আমরা যা চাই তা উৎপাদনে এ সকল জীবাণুকে ব্যবহার করা। কাজেই, আল্লাহ্ যদি একটি জীবাণুকে একটা জটিল পরীক্ষাগার বানিয়ে থাকেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু থাকতে পারে না।

বস্তুত জীব ও জড় আকারের বৈচিত্র্য এক কথায় বিস্ময়কর। জীব জগতে লক্ষ্য করা যায় যে, কিছু কিছু জীববর্গ দেখতে অত্যধিক বিশ্রী, আবার কিছু কিছু আছে যারা দেখতে সুশ্রী। কতক দিনে চলাফেরা করে আর কতক রাতে, কতক বিশেষ গন্ধ ছড়ায় আবার কতক মেজবান এবং কতক মেহমানের মত আচরণ করে। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো যে, কেউই কর্মহীন নয়। আরো বিস্ময়কর, এসব বর্গের দৈহিক ও জৈবিক কার্যকলাপ শুধুমাত্র বাঁচা ও মরার জন্যে নয়, বরং এসব ক্রিয়াকর্ম অন্য দিক দিয়ে অপরাপর জীবের অস্তিত্বের সাথে যুক্ত। আমাদের

www.bjilibrary.com

জ্ঞানের বর্তমান স্তরে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতে এই আন্তঃনির্ভরশীলতার বিষয়ে আমরা পুরোপুরি পরিচিত নই। এভাবে, আমরা যদি বিশেষ কোন প্রকার বর্গকে জ্ঞানের অভাব কিংবা বাছবিচারহীন কর্মকাণ্ড দ্বারা ধ্বংস করি, তাহলে পরিণামে অন্য কিছু বর্গের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং বাস্তুসংস্থান ভয়াবহভাবে বিঘ্নিত হয়। সুতরাং যদি কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন জীব কোন সমস্যা সৃষ্টি করে, তখন এদেরকে অবশ্যই ধ্বংস নয় নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

জীবনের আকার আকৃতির বৈচিত্র্যেরও কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে। যেমন– কোন এক বর্গকে প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে চলার ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক বর্গের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে হতে পারে। সম্প্রতি বিশ্বে জ্বালানী সংকটের মুখে অনেকেই ভাবছেন যে, আমরা মানুষেরা সম্ভবত অনেক উপকার পেতে পারি যদি আমরা বুঝি কিভাবে অণুজীবেরা তাদের শক্তি উৎপাদন, শক্তি সঞ্চয় ও ব্যবহার এবং শক্তি সংরক্ষণ ইত্যাদি সমস্যার সমাধান করে। আরো সম্প্রতি, যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীগণ আশা করছেন যে, তারা ক্যাঙ্গারু ইঁদুরের খাদ্য ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে খাদ্য সংরক্ষণ সমস্যার সমাধানের উপায় খুঁজে বের করবেন, যদিও তীক্ষ্নদন্ত প্রাণীরা (ইঁদুর) খাদ্য ধ্বংসকারী হিসেবে কুখ্যাত।

যুক্তরাষ্ট্রের কিছু কিছু ছত্রাকঘটিত রোগ বিশেষজ্ঞ ক্যাঙ্গারু ইঁদুরের উপর গোপন পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করে ভাবতে শুরু করেছেন যে, ক্যাঙ্গারু ইঁদুরের খাদ্য ব্যবস্থাপনার উপর বিস্তৃত গবেষণা চালানোর মধ্য দিয়ে আমাদের খাদ্য সংরক্ষণ সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। ইঁদুরেরা কর্তনকৃত শস্যদানা, শীষ ইত্যাদি তাদের গর্তের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে রাখে। এতে বাতাসের প্রবাহ এবং তাপমাত্রার ভিন্নতা সৃষ্টি হয় যা ঐ শস্যদানার উপর এক ধরনের ছত্রাক জন্মাতে সাহায্য করে। ঐ ছত্রাক মাইকোটক্সিন নামক এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থ উৎপাদন করে যা গোবরে পোকা কর্তৃক শস্য দানাগুলোকে এলোপাতাড়ি ছড়িয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে কীটনাশকের কাজ করে। শস্যবীজ এখানে সেখানে নিয়ে ইঁদুরেরা শুধু অন্যান্য কিছু কিছু ছত্রাকের বেড়ে ওঠা ত্বরান্বিতই করে না, তা নিয়ন্ত্রণও করে থাকে যেগুলো শস্যবীজ সরবরাহকে ধ্বংস করে। ক্যাঙ্গারু ইঁদুরের শিল্পগত বুদ্ধিমত্তার মধ্যে জৈবিক নিয়ন্ত্রণ নামে পরিচিত প্রযুক্তি রয়েছে। সম্প্রতি প্রযুক্ত অন্য জীবদেহের সাহায্যে কীট দমন পদ্ধতির প্রতিফলন দেখা যায়। অতএব, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে কোন কিছুই উদ্দেশ্যবিহীন নয়। জীবজগত থেকে মাত্র গুটি কয়েক দৃষ্টান্তই এখানে পেশ করা হলো। এবার বস্তু জগত থেকে দু'একটা দৃষ্টান্ত আলোচনা করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, প্রকৃতির চারটি বলের কথাই চিন্তা করি। এগুলো হচ্ছে ঃ মাধ্যাকর্ষণ বল, দুর্বল আণবিক বল, তড়িৎ-চুম্বকীয় বল এবং শক্তিশালী আণবিক বল। দুর্বল এবং তড়িৎ-চুম্বকীয়

www.bjilibrary.com

বলের তড়িৎ-দুর্বল বলে একীভূত করণে প্রফেসর সালাম, ওয়েনবার্গ এবং গ্লাশোর সফল প্রচেষ্টার প্রেক্ষিতে এবং বর্তমানে চারটি বলের সবগুলোকে একটি একক বলে একীভূত করার প্রচেষ্টার প্রেক্ষিতে ভাবতে অবাক লাগে কেন আল্লাহ্ বলের চারটি ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দুর্বল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কি প্রয়োজন ছিল ? হ্যাঁ, এর জবার অংশত পাওয়া যাবে তারকামণ্ডলীর শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে। দুর্বল ক্রিয়া-প্রতিক্রয়ার কারণে 'বেটা'র ধ্বংস ঘটে থাকে যা এমন একটা প্রক্রিয়া যাতে হয় একটা নিউট্রন, একটা প্রোটন, একটা ঋণাত্মক ইলেক্ট্রন এবং একটা এন্টি নিউট্রিনোতে রূপান্তরিত হয়, নতুবা একটা প্রোটন, একটা নিউট্রন, একটা ধনাত্মক ইলেকট্রন এবং একটা নিউট্রিনোতে রূপান্তরিত হয়। এই প্রক্রিয়াতেই সৌর শক্তি প্রদানকারী আমাদের সূর্যের শক্তি মুক্ত হয়ে পৃথিবীতে চলে আসে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, দুর্বল বল না থাকলে এ ধরনের কোন প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থাও থাকত না। বস্তুত এক মহাশক্তিধর আল্লাহ্ই পারেন এরকম এক দুর্বল বল উৎপাদন করতে।

আবার, পর্যাবৃত্ত ছকের দিকে দৃষ্টি দিলে লক্ষ্য করা যায় যে^{৮}, Be (বেরিলিয়াম-৮) অস্থিতিশীল। কিন্তু কেন ? এটা কি প্রকৃতির এক দুর্ঘটনা। নাকি কোন সযত্ন পরিকল্পনা ? প্রমাণ করা যায় যে, যদি বেরিলিয়াম-৮ স্থিতিশীল হত, তাহলে আমরা আজ এখানে থাকতাম না (দ্রঃ আয়াত ২ ঃ ১১৭)। কাজেই, এমনকি বেরিলিয়ামের অস্থিতিশীলতাও মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য স্রষ্টার অসীম হেকমত বা প্রজ্ঞারই প্রকাশ। আপাতত যা সামান্য ব্যাপার সেটাও স্রষ্টার মহাপরিকল্পনায় সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্পষ্টতই মহাবিশ্বে দিন দিন আরো বেশী অনুসন্ধান চালানোর সাথে সাথে মানুষের পক্ষেই উচ্চারণ করা সম্ভব, 'প্রভু, তুমি এসব কিছু উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সৃষ্টি কর নি' (আয়াত ৩ ঃ ১৯১)।

এখন দেখা যাক্, কোন্ ধরনের লোকেরা এ রকম উচ্চারণ করতে পারে। স্পষ্টতই কোন অজ্ঞ-মুর্খের পক্ষে এ ধরনের উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। বস্তুত আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনের আরেক আয়াতে ঘোষণা করেছেন যে, শুধুমাত্র জ্ঞানবান ব্যক্তিরাই আমার নিদর্শন বুঝতে পারে। অর্থাৎ আমরা শুধু এ ধরনের উচ্চারণ করতে পারব যখন আমরা চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা জ্ঞানের অধিকারী হব। আমাদের উচিত সদাসর্বদা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ্কে স্মরণ করা–দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে এবং এভাবেই তাঁর মহিমা কীর্তন করা। এ ধরনের চিন্তার আগমন ঘটতে পারে বিজ্ঞানের এক সক্রিয় সংস্কৃতি থেকে যা মুসলমানদের এক সময় ছিল যখন তারা মানব ইতিহাসের গৌরবময় শিখরে আরোহন করেছিল। কিন্তু তারপর বহুদিন ধরে মুসলিমগণ বিজ্ঞানচর্চা থেকে দূরে রয়েছে এবং আল্লাহ্র সৃষ্টি রহস্য নিয়ে

www.bjilibrary.com

চিন্তা-ভাবনা বাদ দিয়েছে। এভাবে, উপসংহারে মন্তব্য করা যায় যে, উক্ত আয়াতের তাৎপর্য মুসলমানদের পক্ষে শুধুমাত্র তখনি পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে যখন তারা নিজেদেরকে জোরালোভাবে বৈজ্ঞানিক কর্মতৎপরতায় নিয়োজিত করবে এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির গোপন রহস্য উন্মোচন করতে চেষ্টা করবে। তখন, একমাত্র তখনই তারা আল্লাহ্‌র নিকট মাথা নত করে বলতে পারবে : 'হে প্রভু, তুমি এসব কিছু উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সৃষ্টি করনি' (আয়াত ৩ : ১৯১)।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

৪ : ১ হে মানুষ ! তোমাদের রব্‌কে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একটি নাফ্‌স্ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকেই তার জুড়ি সৃষ্টি করেছেন তারপর এই উভয় থেকে বহু সংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রীলোক সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন ......।

এই আয়াতে আল্লাহতা'আলা মানব সৃষ্টির প্রাথমিক ঘটনাবলি প্রকাশ করেছেন। এতে বলা হয়েছে যে, মানুষকে একটি নাফ্‌স থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং গোটা মানবজাতি এই নাফ্‌স থেকে সৃষ্ট একই বংশ।

এখানে নাফ্‌স্ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার আভিধানিক অর্থ আত্মা, মানুষ বা প্রাণী সত্ত্বা। তবে সাধারণভাবে এখানে নাফ্‌স্ বলতে প্রথম মানব হযরত আদম (আ)-কে বুঝায় বলে ধারণা করা হয়। পরে একই নাফ্‌স্ বা হযরত আদম (আ) থেকে তাঁর স্ত্রীকে সৃষ্টি করেন। হযরত আদম (আ) থেকে বিবি হাওয়ার সৃষ্টি সাধারণভাবে আমাদের জ্ঞানের বহির্ভূত। যদি আদম ও হাওয়াকে একই উৎস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে ধরা হয় তাহলে বিষয়টা অনেকটা বোধগম্য হয়ে যায়। বাইবেলে হযরত আদম (আ)-এর পাজরের হাড় থেকে বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন বলা হয়েছে যা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু প্রথম নর ও নারীকে একই উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করে তাদের মাধ্যমে গোটা মানব জাতির সৃষ্টি হয়েছে ধরা হলে কোনই অসুবিধা নেই এবং কুরআনের আয়াতে এই দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশ পাচ্ছে।

সমগ্র মানবজাতি যে একই নর ও নারী থেকে উৎপন্ন এই কুরআনী ধারণা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত। জীবতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বিভিন্ন জাতি, বংশ ও বর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মানব জাতি একটি প্রজাতি (species) যার নাম দেওয়া হয়েছে হোমোসেপিয়েন্‌স্ (homo-sapiens)। এনাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিষ্ট্রি

www.bjilibrary.com

হেমাটোলজি, জেনেটিক্‌স্‌ ও ভ্রূণ তত্ত্ব ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে তথাকথিত সভ্য জাতি এবং অসভ্য বনবাসী মানুষ একই প্রকার। তাই যদিও আদি নর ও নারীর সৃষ্টি আজও বিজ্ঞানীদের নিকট রহস্যময় তবুও সকল মানুষ যে একই মাতা-পিতার বংশধর তাতে কোন সন্দেহ নাই।

একই নাফ্‌স্‌ থেকে আদম ও হাওয়ার সৃষ্টি আমরা বুঝি না। তবে যদি হযরত আদম (আ) প্রথম নাফ্‌স্‌ হন তবে তাঁর শরীর থেকে তাঁর স্ত্রী বিবি হাওয়ার সৃষ্টি বোধগম্য নয়। মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি সাপেক্ষে ভবিষ্যতে হয়তো এ বিষয়ে আরো আলোকপাত সম্ভব হতে পারে।

শুধু মা থেকে হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের মত আদম (আ)-এর শরীর থেকে বিবি হাওয়ার সৃষ্টির একটি সম্ভাবনা ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য তুলে রাখা যায়। আমরা জানি অনেক সময় কোন মানব শিশুর শরীরে তার যমজ (twin) ভাই বা বোন টিউমার আকারে (যেমন টেরাটোমা) থেকে যেতে পারে। যেসব টিউমারে হাড়, মাংস ইত্যাদি শরীরের বিভিন্ন অংশ পাওয়া যায় কিন্তু তাতে আজ পর্যন্ত কোন পূর্ণাঙ্গ মানব শিশু পাওয়া যায়নি। পার্থেনোজেনেসিসের মত একটিবার সৃষ্টিকর্তা কি আদম (আ)-এর শরীরে বিবি হাওয়াকে টেরাটোমা আকারে সৃষ্টি করে শরীরের কোন অংশে রেখে দিয়ে পরে তা কেটে বিবি হাওয়ার জন্ম দিয়েছেন কিনা আল্লাহ্‌ই জানেন। কিন্তু এ কল্পনা যথেষ্ট নয়। কারণ নবজাত শিশু হাওয়াকে লালন পালন কে করল? যা হোক এ কথাই উত্তম যে আমাদের বর্তমান জ্ঞানে হযরত আদমের (আ) শরীর থেকে বিবি হাওয়ার সৃষ্টি বোধগম্য নয়। দু'জনই একই প্রকার জিন্‌স্‌ ও উৎস থেকে সৃষ্ট ধরলে বুঝতে কষ্ট হয় না।

٢٣- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ
وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىْۤ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ
وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ وَاَنْ
تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

৪ ঃ ২৩ (বিবাহের জন্য) তোমাদের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে তোমাদের মা, তোমাদের কন্যা, ভগ্নি, ফুফু, খালা, ভাইঝি, ভাগ্নী, এবং তোমাদের সেইসব 'মা' যারা তোমাদেরকে বুকের

www.bjilibrary.com

দুধ পান করিয়েছে, আর তোমাদের দুধ বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা, তোমাদের স্ত্রীদের কন্যাগণ যারা তোমাদের ঘরে লালিত পালিত হয়েছে, সেইসব স্ত্রীর মেয়েরা যাদের সাথে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে; কিন্তু যদি বিবাহ হলেও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত না হয়ে থাকে তবে তাদের সঙ্গে বিবাহে তোমাদের কোন দোষ হবে না। আর তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীগণ এবং একই সঙ্গে দুই বোনকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। কিন্তু পূর্বে (এই আয়াত নাজিলের পূর্বে) যা হয়ে গেছে তা ছাড়া। বস্তুত আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।

নিষিদ্ধ বিবাহ ঃ মানব জাতির শুরুতে যখন তাদের সংখ্যা ছিল খুবই কম এবং বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় আবদ্ধ ছিল তখন নিজেদের রক্ত সম্পর্কীয়দের মধ্যেই বিবাহের প্রচলন ছিল। মানুষ বিভিন্ন সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে আরো উন্নত হওয়ার পর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ বন্ধনের প্রচলন হয় যদিও কোন কোন গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ রক্ত সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ প্রথা চালু রয়ে যায়। উপরের আয়াতে নির্দিষ্ট কতকগুলো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

এখানে মা, বোন, মেয়ে, ফুফু, খালা, ভাতিজি, ভাগ্নী-ই শুধু নয় বরং রক্ত সম্পর্ক ছাড়াও কিছু ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ করা হয় যার প্রধান কারণ নৈতিক ও সামাজিক পবিত্রতা। এ ব্যাপারে আমাদের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে ঘনিষ্ঠ রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ হওয়ার বৈজ্ঞানিক যুক্তি এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

যে কোন জনগোষ্ঠীতে মাঝে মাঝে ক্ষতিকর মিউটেশন (mutation) দেখা দেয়। 'জিনে'র (gene) এই বিবর্তন অনেক সময় সুপ্ত (recessive) থাকে তাই সহজে প্রকাশ পায় না। অনেক সময় এ সব সুপ্ত পরিবর্তন পরবর্তী প্রজন্মে হঠাৎ করে দূর হয়ে যায়। কিন্তু একই বংশে বিবাহের ফলে একইরূপ সুপ্ত জিন বিবর্তনের মিলন হলে এই সমস্ত ক্ষতিকর প্রভাব বংশধরদের মধ্যে দেখা যায় যাকে বংশানুক্রমিক বিষন্নতা (depression) বলা যায়। যত ঘনিষ্ট রক্ত সম্পর্কের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে তত বেশী এই বংশানুক্রমিক দোষযুক্ত সন্তান জন্ম লাভ করার আশঙ্কা থাকবে।[১]

ইউরোপের কোন কোন রাজ পরিবারে নিজ বংশে বিবাহ করার রীতি চালু থাকার ফলে, মানসিক দুর্বলতা, হিমোফিলিয়া এবং মস্তিষ্ক বিকৃতি জাতীয় রোগ বংশানুক্রমে দেখা যেতো।[২]

www.bjilibrary.com

অপরপক্ষে রক্ত সম্পর্কহীন পিতা মাতার সন্তানদের মধ্যে উন্নত প্রজন্মের প্রমাণ রয়েছে। এসব উন্নতির মধ্যে আকার, মানসিক উৎকর্ষতা, শারীরিক বৃদ্ধির হার, প্রজনন ক্ষমতা, ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। বর্তমান সভ্য জগতে কুরআনে বর্ণিত ঘনিষ্ঠ রক্ত সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ্ নিষিদ্ধ হওয়া মানব জাতির উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য করবে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Gale. J. S. Population Genetics. Blackie and Sons Ltd. Glasgow, p. 32, 1980.
2. Rechardson. W. N. and Stubbs. T. H. Evolution. Human Ecology and Society. Mcmillan Publishing Co. Inc. New York, 1976.

www.bjilibrary.com

٤٣- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ
وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

৪ ঃ ৪৩ হে তোমরা যারা ঈমান এনেছো! নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামাযের কাছেও যেও না যে পর্যন্ত না তোমরা কী বলছ তা সঠিকভাবে জানতে পার। অনুরূপভাবে শারীরিক অপবিত্র অবস্থাতেও নামাযের কাছে যাবে না যতক্ষণ না গোসল করে নেবে.....।

এখানে আল্লাহ নেশাগ্রস্থ বা মাতাল অবস্থায় যখন সে কী বলে তা জানতে পারে না, নামায না পড়তে বা মসজিদে যেতে নিষেধ করেছেন। ইসলামে নামাজ বান্দাহ ও আল্লাহ্‌র মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করে। সুতরাং এ সময় নামাযী কুরআনের যে সব আয়াত ও দোয়া পাঠ করবে তা বুঝে শুনে পাঠ করবে এটাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু যদি কেউ নেশাগ্রস্থ বা মাতাল হয় তখন সে কী বলে তা সে জানে না এবং এতে তার বুঝবার বিচার শক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

এই নিষেধাজ্ঞা মদ নিষিদ্ধ হওয়ার কর্মসূচির অংশ ছিল যা দ্বারা মানুষকে মদপান থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। মদ হারাম করার পূর্ণ পদ্ধতি সূরা ২ ঃ ২১৯ আয়াতের আলোচনার সময় বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا
ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ

৫ ঃ ৪. তোমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস, সেই সব জন্তু যা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে যবেহ্ করা হয়েছে, যে সব প্রাণী গলায় ফাঁস পরে, আঘাত পেয়ে বা উপর হতে পড়ে গিয়ে অথবা শিংয়ের আঘাতে মরে গিয়েছে এবং কোন হিংস্র প্রাণী যার অংশ বিশেষ খেয়ে ফেলেছে তবে যদি তাকে জীবিত পেয়ে জবাই করা হয় তবে হারাম নয়। এবং যে প্রাণীকে কোন বেদিতে বলি দেওয়া হয়েছে (তাও হারাম) এবং হারাম করা হয়েছে লটারির তীর মেরে ভাগ করা গোশ্‌ত্। এ সবই ফাসেকী।...

www.bjilibrary.com

এই আয়াতে বিভিন্ন প্রকারের গোশ্‌ত হারাম ঘোষিত হয়েছে যা মৃত প্রাণী, রক্ত এবং শূকর মাংস সম্পর্কে ২ ঃ ১৭৩ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। অবশিষ্ট প্রক্রিয়াগুলো সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল ঃ

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে নিহত প্রাণীর গোশ্‌ত হারাম। এর প্রধান কারণ হলো– এ কথা ঘোষণা করা যে যেহেতু সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এবং প্রাণীগুলোও আল্লাহ্‌র তাই এইসব প্রাণী হত্যা করার অধিকার অবশ্য কারো নেই। সৃষ্টিকর্তা নিজে হালাল প্রাণী জবাই করে (আল্লাহ্‌র নামে) তার গোশ্‌ত খেতে অনুমতি দিয়েছেন তাই আল্লাহ্‌র নামে জবাই করা প্রাণীর গোশ্‌ত্ হালাল। কিন্তু কল্পিত দেব-দেবী বা পীর দরবেশদের প্রাণীর উপর কোন অধিকার নেই তাই তাদের নামে প্রাণী হত্যা করা জুলুমের পর্যায়ে পড়ে, তাই হারাম করা হয়েছে।

গলায় ফাঁস লেগে নিহত প্রাণীর গোশ্‌ত হারাম। গলা টিপে বা শ্বাস রোধ করে হত্যা করাও একই কথা। এর ফলে প্রবাহিত রক্ত বের হতে পারে না। এই রক্ত বের হওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে ২ ঃ ১৭৩ আয়াতে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করলে, অতিরিক্ত co_2 গ্যাস রক্তে জমা হয়ে ক্ষতিকর রাসায়নিক বস্তু সৃষ্টি করে। এ ছাড়া জবাই না করার ফলে প্রবাহিত রক্তের ক্ষতিকর যৌগিকসমূহ (componds) এবং রোগ-জীবাণু থাকলে তাও বের হতে পারে না। সুতরাং শ্বাসরুদ্ধ করে নিহত প্রাণী বা পাখীর গোশ্‌তে ক্ষতিকর পদার্থ এবং রোগ-জীবাণুসমূহ থাকে বলে উত্তম বা উন্নত মানের গোশ্‌ত পাওয়া যায় না। এরূপ মাংস বেশী দিন ফ্রিজে রাখাও নিরাপদ নয়।[১] হত্যার পর গলা কেটে দিলেও সকল প্রবাহিত রক্ত আর বের করা সম্ভব হয় না।

পিটিয়ে বা মারাত্মক আঘাতে নিহত প্রাণীর গোশ্‌ত–

এটা একটা নিষ্ঠুর পদ্ধতি যেমন লাঠি দিয়ে পিটিয়ে, মুগুর বা কুড়াল দিয়ে আঘাত করে, বুলেট বা ইলেকট্রিক শক্ দিয়ে হত্যা করা সবই অতি অমানবিক। তাছাড়া জবাই না করে কঠিন আঘাতে নিহত প্রাণীর প্রবাহিত রক্ত বের হয় না বলে সেই অসুবিধা থেকেই যায়, কারণ প্রবাহিত রক্ত বের করতে হলে, মস্তিষ্কে অক্সিজেনের অভাব, হৃৎপিণ্ডের কম্পন স্বাভাবিক এবং শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়াও চালু থাকতে হবে। গলাকাটা (জবাই করা) প্রাণীর মাংস কুঞ্চন হতে থাকে। কারণ মস্তিষ্ক অক্সিজেন চায় বলে মাংস কুঞ্চিত হয়ে অক্সিজেন-পূর্ণ রক্ত পাঠাতে চেষ্টা করে। এইসব কুঞ্চনের ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশের রক্ত শিরা থেকে বের করা সম্ভব হয় যা প্রবাহিত রক্তে মিশে হৃৎপিণ্ডে যায় এবং সেখান থেকে মস্তিষ্কে পাঠাতে চেষ্টা করে। কিন্তু গলার বড় বড় রক্তবাহী ধমনি কেটে যাওয়ার ফলে সেই রক্ত আর মস্তিষ্কে পৌঁছায় না। মাংস কুঞ্চন (convulsions) হলেই বুঝা

www.bjilibrary.com

যাবে যে প্রাণী বেহুশ হয়ে গেছে।[২] যেহেতু জবাইর ফলে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয় বলে প্রাণী সঙ্গে সঙ্গে বেহুশ হয়ে যায়। তাই জবাই করা প্রাণী রক্ত ক্ষরণে কোন ব্যথা অনুভব করে না। এই মাংস কুঞ্চন (convulsions) উন্নতমানের গোশ্‌ত সরবরাহে সাহায্য করে। কিন্তু তাতে গোশ্‌ত্‌ ব্যবসায়ীদের জন্য ক্ষতিকর। কারণ কসাইখানায় এই কুঞ্চন বন্ধ হওয়া পর্যন্ত কসাইদের অপেক্ষা করতে হবে এবং প্রাণী সম্পূর্ণ স্থির হলে তার চামড়া ছাড়ানো শুরু করা যাবে। এইটুকু সময় বাঁচাবার জন্য লোভী মাংস ব্যবসায়ীরা জবাই করার সঙ্গে সঙ্গে মেরুদন্ডের ভিতরের প্রধান স্নায়ু.... spinal cord-কে ছুরি ঢুকিয়ে কেটে দেয় যার ফলে মাংস কুঞ্চন হয় না এবং সব প্রবাহিত রক্তও বের হয় না।[২] এরূপভাবে জবাই করা আর বলি দেওয়া একই কথা যা ইসলাম হারাম করেছে এবং স্বাস্থ্য বিধি অনুযায়ী গোশ্‌ত্‌ নিম্নমানের হয়।

সুতরাং, মুসলমানদের জবাইয়ে প্রাণীর মাংস কুঞ্চন হতে দেওয়া হয় যাতে সব প্রবাহিত রক্ত বের হয়ে যেতে পারে। এ সম্পর্কে মহানবী (সা)-র স্পষ্ট নির্দেশ এই যে জবাই করার পর প্রাণী সম্পূর্ণরূপে স্থির না হওয়া পর্যন্ত যেন চামড়া ছাড়াতে শুরু না করে।

মুগুর বা হাতুড়ি দিয়ে হত্যা করলেও একই অবস্থা হয় অর্থাৎ প্রবাহিত রক্ত বের হবে না। আধুনিক ইলেকট্রিক শকে প্রাণী হত্যার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কৃষি বিভাগের মাংস পর্যবেক্ষণ বিভাগ (Meat inspection branch) ১৯৫৩ সালে নিম্নরূপ মন্তব্য করেন ঃ–

"ফেডারেল মাংস পরীক্ষকদের অধীনে ইলেকট্রিক শকে হত্যা করার পদ্ধতি বহু বছর পূর্বে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার ফলে অনুমোদনের অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। এসব গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, ইলেকট্রিক শকে নিহত শূকর মাংসে এমন সব পরিবর্তন দেখা যায় যা কোন কোন রোগের প্রভাব থেকে আলাদা করা সম্ভব হয় না।[৩]

১৯৫৫ সালে ডেনমার্কের বিচার বিভাগের একটি সার্কুলারে বলা হয়েছে, 'ইলেকট্রিক শক দিলে মাংসে রক্তক্ষরণ হয়, পরিপাকতন্ত্রে রক্তপাত হয়, মেরুদন্ড ও কাঁধের হাড় ভেঙ্গে যায়। মাংসের মধ্যে অতিরিক্ত রক্ত মাংসকে সহজে পচনশীল করে এবং স্বাদ নষ্ট করে দেয়। এ সমস্ত ইলেকট্রিক শক্ প্রাপ্ত প্রাণীর বেলায় মাংসের অতিরিক্ত রক্ত বের করার প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হয়।[২]

১৯৫৮ সালে বৃটিশ সরকার আইন করে ইলেকট্রিক শকে প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ করে। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, এর ফলে বৃটিশের বেকন (শূকর মাংস) ব্যবসা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।[৩] এছাড়া ইলেকট্রিক 'শক' মাংসে সহজে

www.bjilibrary.com

পচন ধরতে সাহায্য করে। এর কারণ ইলেকট্রিক শকে মাংসে লেকটিক এসিড এর পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে মাংসে রোগ জীবাণু সহজে স্থান করে নিতে পারে।৩

যদি এক আঘাতে মস্তক আলাদা করা হয় (যেমন হিন্দুদের পশু বলি দেওয়ার পদ্ধতি) তাতে হঠাৎ করে স্বেচ্ছাধীন মাংসে তীব্র কুঞ্চন হয় এবং মাংস থেকে অনেক প্রয়োজনীয় পুষ্টি বের হয়ে যায়, আর লেকটিক এসিড বৃদ্ধি পায়। বলি দিলে যেহেতু সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীর হৃৎপিন্ড ও ফুসফুস থেমে যায় তাই দুষিত বস্তুসহ প্রবাহিত প্রচুর রক্ত বের হতে পারে না বলে মাংস নিম্নমানের হয়। আর শরিয়তের দৃষ্টিতেও তা নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

সুতরাং সব রকম কঠিন আঘাতে প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধকরণ সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসঙ্গত।

যদি কোন প্রাণী কোন একটি উচ্চতা থেকে পড়ে গিয়ে মরে যায় তবে তা ঘটে আঘাত পেয়ে, ঘাড় ভেঙ্গে (শিরদাড়া) গিয়ে, বেহুশ হয়ে গিয়ে আর যদি পানিতে পড়ে যায়, তবে ডুবে মারা যাবে। এরূপ মৃত্যু কঠিন আঘাতে মৃত্যুর মত হবে, আর ডুবে গেলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবে, যা ইসলামে নিষিদ্ধ।

যদি দুটি প্রাণী লড়াই করে নিজেদের মধ্যে অথবা মানুষ ইচ্ছে করে যদি লড়াই লাগিয়ে দেয় এবং এর ফলে একটির আঘাতে অন্যটি মারা যায় তাহলে সেই মৃত প্রাণীর গোশ্‌তও হারাম। এভাবে কোন প্রাণীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হলে এর গোশ্‌ত পূর্বে বর্ণিত বর্ণনা অনুযায়ী কঠিন আঘাতে নিহত বলে হারাম গোশ্‌তের অন্তর্ভুক্ত হবে।

যদি কোন হিংস্র প্রাণী কামড় দিয়ে কোন প্রাণীর অংশ বিশেষ খেয়ে ফেলে এবং এর ফলে ঐ প্রাণীটি মৃত্যুবরণ করে তবে সেই প্রাণীর গোশ্‌তও হারাম। তিনটি কারণে এটা যুক্তিসঙ্গত ঃ

(১) আক্রমণকারী প্রাণীর কোন বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত প্রাণী মারা যেতে পারে,

(২) আক্রান্ত প্রাণী বাঁচবার প্রচেষ্টায় অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তার মাংসে প্রচুর লেকটিক এসিড জমা হতে পারে; এবং

(৩) জবাই না করায় তার শরীর থেকে সকল প্রবাহিত রক্ত বের হতে পারে না।

কিন্তু যদি সেই আক্রান্ত প্রাণী বেঁচে যায়, তাহলে সেই প্রাণীকে জবাই করে তার গোশ্‌ত খাওয়া হালাল। যেহেতু প্রাণীটি তখনও জীবিত- তাতে বুঝা যায় যে আঘাতটি খুব সম্প্রতি ঘটেছে। তা ছাড়া আক্রান্ত পঙ্গু প্রাণীটি খাদ্যাভাবে মরে

www.bjilibrary.com

যাবে অথবা অন্য কোন হিংস্র প্রাণী তাকে হত্যা করবে। এরূপ অবস্থায় সেই আহত প্রাণীকে জবাই করে তার গোশ্‌ত খাওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

এবার মুসলমানদের জবাই পদ্ধতি যা অবিকল ইয়াহুদিদের জবাই পদ্ধতির অনুরূপ- চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আলোচনা করা যাক। ইয়াহুদিদের পশু জবাই পদ্ধতিকে 'সেচিতা' বলা হয়।

ডাঃ লর্ড হোর্ডার এম ডি বলেন, 'আমি যত্ন সহকারে 'সেচিতা'র নিয়মগুলি লক্ষ্য করে দেখেছি যে এতে খুব সহজে এবং অল্প সময়ে পরিচ্ছন্নভাবে পশুর গলার সকল রক্তবাহী ধমনী ও শিরা, শ্বাসনালী ও খাদ্যনালীসহ সকল নরম বস্তুকে কেটে দেওয়া হয়। এর ফলে পশুটি সঙ্গে সঙ্গে বেহুশ হয়ে যায়। এর চেয়ে ব্যথামুক্ত এবং স্বল্প সময়ে মৃত্যু সম্ভব নয়। জবাইর পর কয়েক সেকেন্ড প্রাণীটি কোন নড়াচড়া করে না। তারপর তার শরীর কুঞ্চিত হয় যা প্রায় এক মিনিট স্থায়ী হয় এবং তারপর থেমে যায়।[৪]

এই বিবৃতির ব্যাখ্যা খুবই স্পষ্ট। খুব ধারাল ছুরি দিয়ে খুব অল্পসময়ে গলার সমস্ত রক্তবাহী শিরা ও ধমনি কেটে দেওয়ার ফলে, ত্বরিৎ প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে রক্তের চাপ খুব কমে যায় এবং প্রাণী সম্পূর্ণভাবে বেহুশ (syncope) হয়ে পড়ে। জবাইর অল্পক্ষণ পর প্রাণীটি যে প্রায় ৯০ সেকেন্ড পর্যন্ত প্রবলবেগে নড়াচড়া করে তা 'এপিলেপটিকদের' মত (অজ্ঞান অবস্থায়) যার কারণ মস্তিষ্কের রক্ত শূন্যতা (cerebral ischemia with complete anoxaemia) ।

প্রাথমিক বেহুশ অবস্থাতেই প্রাণীটি সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয় এবং কোন ব্যথা অনুভব করে না। জবাইর পদ্ধতি ও তার প্রভাব সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বুঝা যায় যে, জবাই ছাড়া বর্তমানে প্রচলিত আর কোন উপায়ে হত্যার চেয়ে কম ব্যথা দিয়ে প্রাণী হত্যা সম্ভব নয়।

ডাঃ লিওনার্ড হিল এম ডি, এফ আর এস, পরিচালক ফলিত শারীর বিজ্ঞান বিভাগ (Applied physiology), ন্যাশনাল ইনস্‌টিটিউট অব্‌ মেডিকেল রিসার্চ, ইউকে, বলেন, 'জবাইর পর প্রাণীর বেহুশ অবস্থায় প্রবল কুঞ্চন ও নড়াচড়ার ভুল অর্থ করা হয়ে থাকে। অজ্ঞলোকদের নিকট যে কোনরূপ নড়াচড়া বিশেষ করে যেসব উদ্দেশ্যমূলক বলে মনে হয়, সবই ব্যথার প্রতিফল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। অথচ আমরা জানি যে গলা থেকে মাথা কেটে পৃথক করে ফেলার পরও প্রাণীদেহ এ ধরনের নড়াচড়া করে থাকে যদিও প্রাণীটি তখন মৃত। জবাইর পর গলার কেরোটিড ধমনী বিভক্ত হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চলন বন্ধ হয়ে যায় তা আমি কোনরূপ অজ্ঞান না করে বাছুর ও ছাগলের জবাইও পরীক্ষা করে দেখেছি। উভয় ক্ষেত্রে 'কেরোটিড' ধমনী কেটে দেওয়ার

www.bjilibrary.com

ফলে মস্তিষ্ক সংলগ্ন কেরোটিড-এর রক্তচাপ জবাইর দু-এক সেকেন্ডের মধ্যেই প্রায় শূন্য হয়ে যায় অর্থাৎ মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হলে কেউ কেউ ধারণা করেন যে, carotid ধমনীদ্বয় কর্তিত হলেও vertebral artery (মেরুদন্ডের ভিতরকার ধমনীদ্বয়) দুটির মাধ্যমে যথেষ্ট রক্ত মস্তিষ্কে প্রবেশ করে প্রাণীর জ্ঞান রক্ষায় সাহায্য করতে পারে কিনা এবং তার ফলে ব্যথা অনুভব করা সম্ভব কিনা। কিন্তু তাও সম্ভব নয়। মানুষ এবং শূকর ও ঘোড়া-গাধার মত গরু, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি তৃণভোজী (ruminant) হালাল প্রাণীর vertebral arteries মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না, এরা মাথার মাংসে রক্ত সঞ্চালন করে।[৫] এ ছাড়া এ সমস্ত জবাইকৃত প্রাণীর মাংসে বা অন্ত্রে কোন রূপ রক্তপাত বা জখমের (bruise) চিহ্নও পাওয়া যায় না।[২] সুতরাং মুসলিম ও ইয়াহুদিদের জবাই পদ্ধতি সবচেয়ে মানবীয় (humane) এবং সবচেয়ে কম ব্যথায় প্রাণী হত্যা বলে বিবেচিত হয়।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Muzzam, M. G. Qurane Biggan (Science in Quran), (in Bengali), 1st edn. Rajshahi, pp 81-84, 1967.
2. Khan, G. M. Al-Dhabeh, Slaying Animals for Food in the Islamic Way, 1st edn, Ta Ha Publishers, London, p. 33, 1982.
3. Callow, E. H. Food Hygiene, Cambridge, p. 42, 1952.
4. Horder, Lord, Statement in Support of Jewish Method of Slaying Animals, 1950.
5. Hill, Leonard, Statement of Director, Dept. of Applied Physiology, NIMR, UK quoted by Khan, G. M. 1982.

www.bjilibrary.com

٦- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

৫ ঃ ৬ হে তোমরা যারা ঈমান এনেছো ঃ যখন তোমরা নামাযের জন্য উঠ তখন তোমাদের মুখমণ্ডল, কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধৌত কর এবং মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা দুটিও (ধৌত কর)।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য অঙ্গ ধৌত করা ঈমানদারদের জীবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। অযু বা গোসলের জন্য ব্যবহৃত পানিও পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ হতে হবে যার স্বাদ, গন্ধ এবং রং অবিকৃত থাকবে। উপরের আয়াতে অযুর চারটি ফরজের উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর সব কয়টিই স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্মত। এ ছাড়া অযুতে কব্জি পর্যন্ত দুই হাত ধোয়া, কুলি করা, দাঁত মিসওয়াক করা, কান ও নাকের বহির্ভাগ পরিষ্কার করাকে মহানবী (সা) তাঁর সুন্নাত হিসেবে অনুসরণ করতে বলেছেন।

১। **মুখমন্ডল ধৌত করা ঃ** সব ঋতুতেই মুখ ধোয়ার অভ্যাস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন এবং শরীর ও মনের সতেজতা (ক্লান্তি হরণ) আনয়নকারী। মুখমন্ডল ও দুই হাত শরীরের সবচেয়ে বেশী আবরণ মুক্ত অংশ। তাই এগুলোতে সহজেই ধূলা-বালি ও রোগ জীবাণু লাগতে পারে। আর মানুষের ত্বকে বিশেষ করে লোমকূপের গোড়ায় এবং ঘর্মগ্রন্থির মুখে স্ট্যাপলিলোকক্কাই, স্ট্রেপটোকক্কাই, কলিফর্ম ইত্যাদি ক্ষতিকর রোগ জীবাণু থাকতে পারে। হাতের আঙ্গুলের ডগার মাধ্যমে বিশেষ করে চুলকানোর পর আঙ্গুল, নাক, কানসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে এসব জীবাণু বিস্তার লাভ করে। এ ছাড়া অপরিষ্কার হাত খাদ্য ও পানীয়কেও জীবাণুযুক্ত করতে পারে। তবে সুস্থ ত্বক এ সমস্ত জীবাণুর জন্য এক স্বাভাবিক প্রতিরোধক। কিন্তু ত্বকে সামান্যতম ক্ষত হলে তার মাধ্যমে এসব জীবাণু দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে এবং এর ফলে পাঁচড়া, ফোঁড়া, কারবাংকল, সেলুলাইটিস, সেপটিকেমিয়া, পায়োমিয়া ইত্যাদি রোগ হতে পারে।

সুতরাং, প্রথমে হাত ধুয়ে পরে মুখমন্ডল ধৌত করলে এসব রোগ থেকে সহজেই মুক্ত থাকা সম্ভব। এ ছাড়া এ সঙ্গে চোখের ভ্রু-যুগল, চোখের পাতা,

গোঁফ, দাঁড়ি, যা সহজেই ময়লাযুক্ত হতে পারে তাও হাত মুখ ধোয়ার মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে যায়। মুখমন্ডল অপরিষ্কার থাকলে রোগ জীবাণু সহজেই মুখে প্রবেশ করতে পারে। মুখমণ্ডলের ঘাম, ময়লা ও জীবাণু ত্বকের সঙ্গে সেঁটে থাকতে সাহায্য করে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে নামাযের পূর্বে অযুর মাধ্যমে হাত ও মুখমন্ডল ধৌত করা সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য বিজ্ঞানসম্মত।

যদি কেউ দিনে পাঁচ বার অযু করে তবে তার হাত ও মুখমন্ডলের মাধ্যমে রোগ জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা খুব কম থাকে।

(২) দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধোয়া ঃ স্বাভাবিক কাজ কর্মের জন্য শরীরের এই অংশটুকু প্রায়ই খোলা থাকে যার ফলে এ অংশে ময়লা ও রোগ জীবাণু লাগতে পারে। সুতরাং, অযুর সময় দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধোয়া ও (ফরজ) স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্মত।

(৩) মাথা মাসেহ করা ঃ ভিজা হাতে মাথা মাসেহ করতে হয়। আর মাথা ও চুল অনেক সময় উন্মুক্ত থাকে যার ফলে চুলের মধ্যে ময়লা ও রোগ জীবাণু জমা হতে পারে। সুতরাং ভিজা হাতে মাথা মাসেহ করলে সে সব দূর করা সম্ভব। তাই এটাও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্মত। মাসেহ ফরজ কিন্তু সেই সঙ্গে ভিজা হাতের পেছন দিয়ে ঘাড় মুছে নেওয়াও নবীজীর সুন্নাত। এ ছাড়া ঘুম থেকে উঠে বা কর্মক্লান্ত হলে ভিজা হাতে ঘাড় মাসেহ করলে মুখমণ্ডল বেশ সতেজ লাগে।

(৪) টাখনু পর্যন্ত দুই পা ধৌত করা ঃ দুই পা সবচেয়ে বেশী খোলা থাকে বিশেষ করে গ্রীষ্ম প্রধান দেশে। এর ফলে এই অংশ খুব ময়লা ও জীবাণুযুক্ত হতে পারে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পা থাকলে জামায়াতে নামাজ পড়ার সময় ময়লা বা রোগ জীবাণু ছড়াতে পারে না। সুতরাং অযুর সময় পা ধোওয়াও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্মত।

খুব বেশী শীত পড়লে বার বার অযু করতে গিয়ে পা ধুতে হয়। এটা কষ্টকর বলে নবীজী (সা) দিনে একবার অযু করে চামড়ার মোজা পরে নিয়ে ২৪ ঘন্টার মধ্যে অযুর সময় মোজার উপর মাসেহ করার অনুমতি দিয়েছেন। এতে যে উদ্দেশ্যে পা ধৌত করা হয় সেই উদ্দেশ্যই সাধিত হয় তাই এটাও বিজ্ঞানসম্মত।

এভাবে দেখা যায় যে, অযুর চারটি ফরজ কাজই স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্মত।

www.bjilibrary.com

١٧- لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

৫ ঃ ১৭ নিশ্চয়ই তারা কুফরী করেছে, যারা বলেছে ঃ মরিয়ম পুত্র মাসিহ্ই আল্লাহ'। (হে মুহাম্মদ) বলে দিন, আল্লাহ যদি মরিয়ম পুত্র মাসিহ্ এবং তাঁর মা এবং সমগ্র পৃথিবীতে যা আছে সব কিছু ধ্বংস করতে চান তবে তাঁর এই ইচ্ছা হতে তাঁকে বিরত রাখতে সমর্থ এমন কে আছে? আল্লাহ্ তো আসমান ও যমীন এবং তার মধ্যে অবস্থিত সকল জিনিসেরই মালিক; তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন। এবং আল্লাহ্ সমস্ত বস্তুর উপরই শক্তি সম্পন্ন।

এখানে মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ) একজন মানুষ ছিলেন। তাই তাকে স্বয়ং আল্লাহ্ মনে করা কুফরী, যেমন অনেক কাফের জাতি তাদের মানুষরূপী তথাকথিত দেব-দেবতাদেরকে স্বয়ং ঈশ্বর বা ভগবান বলে থাকে। তারা কাউকে আবার ভগবান মানুষ রূপে পৃথিবীতে এসেছেন বলে দাবী করে। এসব দাবী যে মিথ্যা তাই এই আয়াতে বলা হয়েছে।

আল্লাহ্ এখানে যুক্তি দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন যে এই মহাবিশ্বের সবকিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ্। অথচ ঈসা (আ) বা মরিয়মের এই সৃষ্টির উপর কোন কর্তৃত্বই ছিল না। শুধু তাই নয় পৃথিবী ও মহাবিশ্বের সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ মানুষের কর্তৃত্বের বাইরে। তাই মানুষ ঈসা (আ) কে আল্লাহ্ বা সৃষ্টিকর্তা (বা তাঁর সন্তান) মনে করা কুফরী, আহাম্মকি ও বেওকুফি মাত্র। এ নেহায়েত অজ্ঞতার প্রমাণ।

আল্লাহ্ পৃথিবীসহ, সমগ্র মহাবিশ্বের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্ত্রণকারী এবং পৃথিবীসহ মহাবিশ্বের সব এলাকা আল্লাহ্র রাজ্য বলেও ঘোষণা করেছেন।

কারো রাজ্য বলতে বুঝা যায় যে সেই এলাকায় কেবল তাঁরই হুকুম ও বিধান চলে। কুরআনের আসমান বলতে সকল মহাকাশ ও তার মধ্যে যা আছে সবই বুঝায়, যেমন তারকারাজি, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহসমষ্টি, পালসারস্, কৃষ্ণ গহ্বর (black-holes), নেবুলা, ছায়াপথসমূহ, কুয়াসারস (quasars) ইত্যাদি

সবগুলোর সমষ্টিকেই বুঝায়। এর কিছু কিছু মানুষ জানতে ও বুঝতে পেরেছে এবং মানুষের অজানা যে কত কিছু রয়েছে তা মানব কল্পনার বাইরে। এ সমস্ত কিছু একমাত্র তাঁরই দেওয়া নিয়মে চলে যার উপর মানুষের কিছু মাত্র নিয়ন্ত্রণ নেই। সুতরাং মহাকাশ বা মহাশূন্য শুধুই আল্লাহ্‌র রাজ্য।

এমনিভাবে এই গোটা পৃথিবীটা আল্লাহ্‌রই রাজ্য। সৃষ্টি জগতের নিয়ম কানুন (laws of nature) যা মানুষ জানতে পেরেছে এবং যা জানতে পারেনি তার সবই আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে। পৃথিবীর সাতটি স্তর রয়েছে, যেমন ঃ

(১) inner solid core, (2) outer liquid core, (3) mantle (4) plastic, partially molten region (asthenosphere), (5) cold, rigid region (lithosphere), (6) crust (যার গভীরতা ভূমিতল থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার এবং সমুদ্র তল থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার), এবং (৭) বায়ুস্তর (atmosphere)। এসব স্তরের যাবতীয় জৈব ও অজৈব বস্তু আল্লাহ্‌র দেওয়া আইনের অধীন এবং একমাত্র তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। সুতরাং পৃথিবীও একমাত্র আল্লাহরই রাজ্য।

এছাড়া পৃথিবীর বায়ু মন্ডল (atmosphere) এর উর্ধ্বে রয়েছে পৃথিবীর ionosphere' যা সূর্যের X-ray এবং ultra-violet radiation থেকে সৃষ্ট। আইওনোস্ফিয়ারের উর্ধ্বের এলাকার নাম magnetosphere সেখানে দ্রুত গতিশীল ইলেকট্রন ও প্রোটন আটকা পড়ে এবং অভ্যন্তর ভাগে এর সীমা ইলেকট্রন, প্রোটন, অণু ও পরমাণুর সংঘর্ষে সৃষ্ট বাধা দ্বারা সীমাবদ্ধ। আর এর বহির্ভাগের নাম magnetosphere ওখানে পৃথিবীর চুম্বক শক্তির শেষ সীমা। এ সবই আল্লাহ আইনের অধীন। তাই মহাকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী এলাকাও আল্লাহরই রাজ্য।

৯০- يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

৫ ঃ ৯০ হে তোমরা যারা ঈমান এনেছো! (জেনে রাখ) মদ, জুয়া, পাথর ও তীর সবাই নাপাক শয়তানী কাজ। সুতরাং তোমরা এসব পরিহার কর যেন তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার।

মদ ও জুয়ার ক্ষতিকর দিকগুলো সূরা বাকারার ২১৯নং আয়াতের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ ধরনের পাথরে বলি দেওয়াও শয়তানী, আর তীর ছুড়ে গোশ্‌ত ভাগ করার নিয়ম জাহেলী যুগের এক ধরনের জুয়া হিসেবে প্রচলিত ছিল যা এই আয়াতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَ النُّوْرَ ۖ

৬ ঃ ১ প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন, আর উৎপত্তি ঘটিয়েছেন আলো ও অন্ধকারের।

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক মতবাদসমূহ ২ ঃ ১১৭, ২ঃ ১৬৪ আয়াত এবং পরিশিষ্ট-১ ও ২-এ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ঐ প্রসঙ্গে দেখানো হয়েছে যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির প্রতিটি স্তরেই সৃষ্টির পিছনে একজন মহাপরিকল্পক না থাকলে প্রকৃতিতে অন্য কোন কিছু সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয় লক্ষ্য করে বিস্ময়াভিভূত হতে হয়। অত্র আলোচনায় অন্ধকার ও আলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা হবে এবং এসব থেকে সৃষ্ট জগৎ যে কত ব্যাপক উপকার বা সুফল লাভ করে তাও আলোচনা করা হবে।

আলো ও অন্ধকারের উৎপত্তি এবং প্রকৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে দেসকারটিস, নিউটন, ফ্রেসনাল ও ইয়ং এর মত স্বনামধন্য পদার্থ বিজ্ঞানীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ১৮৭৩ সালে বিদ্যুৎ ও চৌম্বকীয় সূত্র সমূহ সংযুক্ত করে বিখ্যাত ম্যাক্সওয়েলের সূত্র উপস্থাপন করা হয় যা আলোক তরঙ্গের সকল ধর্মবিশিষ্ট এক ধরনের তরঙ্গের সৃষ্টি করে এবং এই বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ আলোর গতিতে চলে। পরবর্তীকালের পরীক্ষা-নিরীক্ষা একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেয় যাতে এটা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গের পূরো বর্ণালীটাই দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ক্ষুদ্র তরঙ্গ, বেতার তরঙ্গ, অবলোহিত, দৃশ্যমান আলো, অতিবেগুনী, হ্রস্ব গামা (γ-Rays) রশ্মি ও রঞ্জনরশ্মি (X-Rays) সহযোগে গঠিত। আমাদের চক্ষু বর্ণালীর শুধুমাত্র দৃশ্যমান অংশের প্রতিই সংবেদনশীল। ১৯০৪ সালে প্ল্যাঙ্ক প্রস্তাব করলেন যে, আলোকশক্তি শোষিত কিংবা নিক্ষিপ্ত হয় অসংলগ্ন প্রণালীতে। আলোর ক্ষেত্রে শক্তির পরিমাণগত ধারণা (অর্থাৎ ফোটন, যা আজ আলোর কণা হিসেবে আমাদের নিকট পরিচিত) কৃষ্ণ বস্তু বিকিরণ, আলোক বিদ্যুৎ, কম্পটন ও রামান প্রভাবের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়। আলোর এই দ্বৈত প্রকৃতি (অর্থাৎ তরঙ্গ প্রকৃতি ও কণা প্রকৃতি) সম্পর্কিত এই পটভূমিকামূলক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে ১৯১৩ সালে বিজ্ঞানী বোহ্‌র (Bohr) তার বিখ্যাত পরমাণু মডেল উপস্থাপন করেন যা প্রথমবারের মত আলোর নিক্ষেপণ ও শোষণ গুণগতভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়। এই মডেল মতে পরমাণু একটা ক্ষুদ্র সৌরজগতের মত দেখতে যাতে ইলেক্ট্রন নিউক্লিয়াস এক পরমাণু কেন্দ্রের চারধারে কতগুলো সুবিধাজনক কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে। কোন কক্ষে যদি কোন

www.bjilibrary.com

শূন্যস্থান থাকে, তাহলে পূরণকৃত কক্ষপথ থেকে ইলেক্ট্রন কিছু কিছু নিয়ম মেনে শূন্য কক্ষপথে লাফ দিতে পারে। নিম্ন কক্ষপথ থেকে উচ্চ কক্ষপথে এ ধরনের বৈদ্যুতিক লম্ফ আলোক কণার শোষণ ঘটায়। আর যদি ইলেক্ট্রন উচ্চ কক্ষপথ থেকে নিম্ন কক্ষপথে লম্ফ দেয়, তাহলে একটা অলোক কণা বেরিয়ে আসে। আলোকের উৎসের পূর্ণ অনুপস্থিতি কিংবা বস্তু কর্তৃক আলোর শোষণের ফলে অন্ধকার সৃষ্টি হয়। বৈদ্যুতিক প্রবাহ কিংবা অন্য কোন মাধ্যম যথা উত্তাপ প্রবাহ কিংবা অন্য কোন মাধ্যম দ্বারা পরমাণুকে উত্তেজিত করা হলে পরমাণু নিম্ন কক্ষপথ থেকে উচ্চ কক্ষপথে লম্ফ দেয় যাতে উত্তেজিত পরমাণু তৈরি হয়। উত্তেজিত পরমাণু থেকে ইলেক্ট্রন যখন নিম্ন কক্ষপথে লম্ফ দেয় এবং প্রাপ্ত শক্তি অবমুক্ত করে তখন আলোক সৃষ্টি হয়। বোহ্‌র উপস্থাপিত পরমাণুর এই সাদামাটা চিত্র শীঘ্রই সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত বিস্তারিত তথ্যাদি এবং উদ্ভূত অস্থায়ী নিয়মসমূহকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়। Schrodinger সর্বাধিক ব্যাপকভাবে গৃহীত পরমাণু মডেল উপস্থাপন **করেন যাতে বোহ্‌র-এর সুবিধাজনক কক্ষপথসমূহ স্থিতিশীল বস্তুতরঙ্গ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় এবং তিনি শক্তির পরিমাণ নির্ধারণের ধারণাটি অন্তর্ভুক্ত করে নেন। ব্রোগলি (Broglie)** কর্তৃক ইতিপূর্বেই বস্তু-তরঙ্গের ধারণাটি উত্থাপিত হয়েছিল। এই মডেলের সাহায্যে পদার্থবিজ্ঞানের আলোর শোষণ ও উৎপাদন বিষয়ক শাখা তথা পারমাণবিক বর্ণালী বীক্ষণের সকল পরীক্ষাধীন ফলাফল ভালভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। এই পুনর্বিন্যাসকৃত মডেলে বোহ্‌র-এর পারমাণবিক মডেলকে একেবারেই গড়পড়তা চিত্র হিসেবে দেখা গেল এবং সকল অস্থায়ী বিধান ছিল স্বয়ংক্রিয় ফলাফল মাত্র। পারমাণবিক ও আনবিক বর্ণচ্ছটা সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর সমাধান হয় অন্য একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। আর তা হচ্ছে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা। হাইজেনবার্গ, ডিরাক এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীগণ একই ফলাফল পেলে এই সমাধানে পৌঁছা যায়। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার গাণিতিক সংগঠন একেবারে নৈর্ব্যক্তিক, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ দু'টি প্রক্রিয়া একত্রে মিলিত হয়ে একটা অভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গি গড়ে উঠে ১, ২।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বড় বড় তাত্ত্বিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আলো আজও সর্বাধিক রহস্যময় বিষয় হিসেবে রয়ে গেছে। আলোর দ্বৈত প্রকৃতি অর্থাৎ যে গুণের কারণে আলো কোন কোন ক্ষেত্রে তরঙ্গ প্রকৃতি প্রকাশ করে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কণা প্রকৃতির প্রকাশ ঘটায়- এই দ্বৈতাবস্থা কীভাবে সহাবস্থান করে বোঝা মুশকিল। আপেক্ষিকতাবাদ মতে, আলোর গতিই সর্বোচ্চ এবং কোন কিছুই এই সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম নয়। আবার, আলোর গতি শূন্যস্থানে স্থির বা অপরিবর্তনীয়। কোন বস্তুগত পদার্থই তার স্থির অবস্থার ভর শূন্যে পরিবর্তন না করে অলোর গতিতে পৌঁছতে পারে না। আলোকশক্তি বহনকারী রহস্যময় কণা

www.bjilibrary.com

ফোটনের ভর স্থির অবস্থায় শূন্য এবং গতি আলোর গতির সমান। হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসসমূহ যখন সংযুক্ত হয়ে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস গঠন করে, তখন আইনস্টাইনের বিখ্যাত ভর শক্তি সম্পর্কীয় সূত্রানুযায়ী প্রচন্ড পরিমাণ শক্তি অবমুক্ত হয় যা ঐ সূত্র অনুসারে ভর পার্থক্য এবং আলোর গতির বর্গের গুণদলের সমান। পারমাণবিক একীভবন প্রক্রিয়া তথা পারমাণবিক বোমার ক্ষেত্রেও এই একই সূত্রানুযায়ী শক্তি অবমুক্ত হয়ে থাকে।

কীভাবে তারকারাজি (সূর্য আমাদের নিকটতম তারকা) বিপুল পরিমাণ আলোকশক্তির বিচ্ছুরণ (অর্থাৎ $E=Mc^2$ যেখানে, E=শক্তি, M= ভর এবং C= আলোর গতি– অনুবাদক) ঘটিয়ে লক্ষ কোটি বছর ধরে আলোক বিকিরণ করছে তা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। তারকার ভিতরে হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসসমূহ পরস্পরের সাথে একীভূত হয়ে কিছু মধ্যবর্তী পদক্ষেপের মাধ্যমে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস তৈরি করে। হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের ভর গঠনকারী হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের চেয়ে কম। ভরের এই পার্থক্যই পূর্বে উল্লিখিত ভর শক্তি সম্পর্ক সূত্রানুযায়ী বিপুল পরিমাণ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এ থেকেই সৃষ্টি হয় বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় শক্তি যা আমাদের এই গ্রহ তথা পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। সূর্য যেহেতু পৃথিবীর নিকটতম তারকা, দিনের বেলা সূর্য থেকে আগত বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় বর্ণালীর দৃশ্যমান অংশ প্রাধান্য বিস্তার করে। দূরবর্তী তারকারাজি থেকে প্রেরিত আলো রাতের দৃশ্যমানতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। হাইড্রোজেন ব্যবহারের বর্তমান হার বজায় থাকলে বিজ্ঞানীগণের বিশ্বাস, সূর্য আগামী শত শত কোটি বছর ধরে আলো দিতে থাকবে।

তড়িৎ-চৌম্বকীয় বর্ণালীর দৃশ্যমান অংশ যা আমাদের নিকট আলো হিসেবে পরিচিত, অনুপম দর্শন অনুভূতির সৃষ্টি করে। দর্শন অনুভূতি হচ্ছে আল্লাহ্‌র দান। আলোর উপস্থিতিতেই উদ্ভিদ সালোক সংশ্লেষ ঘটায়। এই প্রক্রিয়ায় ক্লোরোফিল (উদ্ভিদের সবুজ অংশসমূহ) আলোর উপস্থিতিতে বায়ুমন্ডল থেকে শোষিত কার্বনডাই অক্সাইড (Co_2) এবং মাটি থেকে শোষণকৃত পানি দ্বারা শর্করা ও পানি উৎপাদন করে। সালোক- সংশ্লেষ প্রক্রিয়া বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন ও কার্বনডাই অক্সাইডের ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে। শর্করা বিভিন্ন একক ও যৌগ শর্করাসমৃদ্ধ উপাদান আকারে গাছের মূল, কান্ড, পাতা ও ফলে জমা হয়। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবী নামক এই গ্রহে জীবনের টিকে থাকা ও উন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সালোক সংশ্লেষ একটা অনুপম প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে। আলোর অন্যান্য আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুফল আছে যা জীব জগৎ উপভোগ করে থাকে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীগণ লক্ষ্য করেছেন যে, উদ্ভিদে ফুল ফোটা এবং ফলোৎপাদন একটা নির্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্ত আলোর পরিমাণের ব্যাপারে খুবই

সংবেদনশীল। জীব বিজ্ঞানীগণও লক্ষ্য করেছেন যে, কিছু কিছু পাখি যৌন সঙ্গম করে সর্বাধিক সৌর তাপ থাকাকালীন সময়ে। আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন জলজ প্রাণীকুলকে দূরবর্তী বস্তু দেখতে সহায়তা করে যাতে তাদের জলে চলাচল ত্বরান্বিত হয়। পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন এমন এক প্রক্রিয়া যা দ্বারা পানির ভিতর কোন বস্তু থেকে ছড়ানো আলো পানির ভিতরে পূর্ণ প্রতিফলন ঘটায়, এতে আলো প্রতিসারিত হয়ে বাইরে চলে যায় না, গেলে আলো পানির উপরিতলে ক্রটিপূর্ণ কিংবা উচ্চতর কোণে প্রবেশ করত। কিছু কিছু অণুর কারণে আলোর গতিপথের দিকে (মেরুকরণকৃত) আলোর তীব্রতার অসামঞ্জস্যপূর্ণ বন্টন পর্যবেক্ষণ করে বামমুখী এবং ডানমুখী অণুর পার্থক্য করা সম্ভব যেগুলো বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে আলাদা হয়ে থাকে। জোনাকি এবং আলোকপোকা যে জীব প্রজ্জ্বলন (তাপহীন নীলাভ আলো) দেহ থেকে নিষ্ক্রমণ করে থাকে তা যৌন সঙ্গমার্থে অপর লিঙ্গকে আকৃষ্ট করার ব্যাপারে জৈবিক সুবিধা দিয়ে থাকে।

বিজ্ঞানীগণ ত্বড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালীর দৃশ্যমান এবং অপর অংশকে মানব জাতির সেবায় কাজে লাগিয়েছেন। লেসার (বিকিরণের উত্তেজিত নিষ্ক্রমণ দ্বারা আলো গুণিতকরণ) রশ্মি অর্থাৎ বর্ণালীর দৃশ্যমান অংশের এক ধরনের অত্যন্ত তীব্র অথচ চিকন আলোক স্তম্ভ নিখুঁত-নির্ভুল শল্য চিকিৎসা যথা চোখের ছানি দূর করা, নিখুঁতভাবে ধাতু কর্তন, তার যোগাযোগ তথা আধুনিক যুদ্ধ বিগ্রহে অস্ত্র ইত্যাদিতে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। সৌর বিজ্ঞানীগণ বায়ুমন্ডল উত্তপ্তকরণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, হিমায়িতকরণ, রান্না বান্না এবং হাইড্রোজেন জ্বালানী উৎপাদনে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সৌরশক্তি সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। বিশেষভাবে নকশাকৃত পাইপে সূর্যালোকে উত্তপ্ত পানি শীতের দেশগুলোতে কক্ষ গরম করার কাজে লাগানো হয়। দৃশ্যমান আলো থেকে ফটোভোল্টাইক নামে পরিচিত এক ধরনের যন্ত্র দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে। বিশেষ ধরনের হিমায়নযন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুতের পরিবর্তে সূর্যালোককে হিমায়নের বিকল্প শক্তির উৎস হিসেবে কাজে লাগানো যেতে পারে। সৌর চুল্লিতে জ্বালানি ছাড়াই সূর্যালোকের সাহায্যে খাবার রান্না করা যেতে পারে। ফ্রেস্‌নাল লেন্স দ্বারা সূর্যালোককে ঘণীভূত করে পানিকে তার গঠন উপাদান অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে বিভক্ত করা যেতে পারে। হাইড্রোজেন যখন দহনক্রিয়ায় অংশ নেয়, তখন এটি পানিতে পরিণত হয়। কাজেই, হাইড্রোজেনই হচ্ছে সবচেয়ে অক্ষতিকর এবং দূষণমুক্ত জ্বালানি। এক প্রকার শেওলাও পানি থেকে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে হাইড্রোজেন উৎপাদন করতে পারে (বাইওফটোলাইসিস বা জীবালোক সংশ্লেষণ নামে পরিচিত একটি প্রক্রিয়া)। হাইড্রোজেন ভবিষ্যতের একটি সম্ভাবনাময় জ্বালানি।

www.bjilibrary.com

বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বর্ণালীর অদৃশ্যমান অংশও মানবজাতির সেবা করে যাচ্ছে। বেতার যন্ত্র এবং ক্ষুদ্র তরঙ্গের সাহায্যে বেতার ও তার যোগাযোগ সম্ভব করা হচ্ছে। ইনফ্রারেড তরঙ্গ রান্না বান্না এবং বাতজ্বরের চিকিৎসায় প্রয়োগ করা হচ্ছে। এক্স-রে বা রঞ্জনরশ্মি চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোগ নির্ণয় এবং ধাতু, সংকর ও মূল্যবান পাথরের ত্রুটি বা ভেজাল নির্ণয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। জৈব বা উদ্ভিজ্জ পরিপুষ্টির আবশ্যকীয় উপাদান বিশ্লেষণ রঞ্জন রশ্মি ও স্ফুরজ্যোতির দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। রঞ্জনরশ্মির বিচ্ছুরণ কৌশল অনেক স্ফটিকের গঠনকাঠামো উদঘাটন করেছে। তাদের মধ্যে ডিএনএ (ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিয়িক এসিড) এবং প্রোটিনের গঠন আণবিক এবং পারমাণবিক স্তরে জৈব রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়া অনুধাবন করা সম্ভব করে তুলেছে। আবার রঞ্জনরশ্মির বিচ্ছুরণ কৌশল ওষুধ তৈরির নকশা ও নিয়ন্ত্রণ করতে প্রয়োগ করা হয়। রঞ্জন ও গামা উভয় রশ্মিই ক্যানসার নিরাময়ে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। গামারশ্মি ক্যামেরায় মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্থির ও চলমান দৃশ্য ধারণ করে চিকিৎসা ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় ত্বরান্বিত করে থাকে। বিজ্ঞানীগণ লক্ষ্য করেছেন যে আলোর বেগ, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং স্পন্দন সংখ্যা শূন্য স্থানে স্থির থাকে। আলোর এই ধর্ম স্বল্প দৈর্ঘ্য এবং নভোমন্ডলীয় দূরত্ব ও সময় মাপার সর্বাধিক নির্ভুল মানদন্ড প্রদান করে। বর্তমানে দৈর্ঘ্য মাপার প্রাথমিক মানদন্ড হচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রতীক মিটার বা আন্তর্জাতিক ওজন ও পরিমাপ ব্যুরো কর্তৃক প্যারিসের সন্নিকটস্থ Saures-এ সংরক্ষিত আছে। এই আদর্শ মিটার হচ্ছে একটি দন্ডের উপর স্বর্ণখচিত দু'টি নির্দিষ্ট বিন্দুর মধ্যকার দূরত্ব; দন্ডটি ৯০% ভাগ প্লাটিনাম এবং ১০% ভাগ ইরিডিয়াম ধাতুর তৈরী এবং এটি ০ ডিগ্রী সেঃ গ্রেঃ তাপমাত্রা এবং ৭৬ সেঃ মিঃ পারদে রাখা হয়। যদিও এই সংকরটির পুড়ে ক্ষয় হওয়া কিংবা বাহ্যিক অবস্থার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ন্যূনতম, তথাপি ১৯৬০ সালে বিজ্ঞানীগণ ক্রোমিয়াম ৮৬ (Kr^{86}) আইসোটোপ থেকে বিচ্ছুরিত একটি নির্দিষ্ট বেগুনী তরঙ্গকে প্রাথমিক দৈর্ঘ্য মানদন্ড হিসেবে গ্রহণে সম্মত হন। বর্তমানে নমুনা ১ মিটার- ২০ ডিগ্রী সেঃ গ্রেঃ ৩ তাপমাত্রায় অবমুক্তি থেকে শূন্যস্থানে বিচ্ছুরিত ক্রোমিয়াম ৮৬-এর বেগুনী তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ১৬৫০৭৬৩.৭৩ গুণ। ১৯৬৪ সালে সময়ের মান নির্ধারণ করা হয় পারমাণবিক ঘড়ির ভিত্তিতে যা একটি বিশেষ স্পন্দন সংখ্যার আলো বিচ্ছুরিত করে এবং চিরদিন অপরিবর্তিত থাকে। এর জন্য, Cs^{133} দ্বারা বিচ্ছুরিত বিশেষ তরঙ্গের অনুরূপ স্পন্দন সংখ্যাকে মান সময় হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এক সেকেন্ড মান সময় Cs^{133} নির্গত তরঙ্গের ৯১৯২৬৩১৭৭০ যার স্পন্দনের সময়ের সমান। বিশাল নভোমন্ডলীয় দূরত্বসমূহ শূন্যস্থানে আলোর গতিকে একক ধরে নিয়ে মাপা হয়।

www.bjilibrary.com

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এক আলোকবর্ষ হচ্ছে এক বছরে আলো যে দূরত্ব অতিক্রম করে যা ৯.৪৬০৫৩ × $১০^{১৩}$ সেঃ মিটারের সমান এবং এক পারসেক সমান ৩.২৬ আলোক বর্ষ।

অন্ধকার দৃশ্যত সামান্য গুরুত্বপূর্ণ মনে হলেও আমাদের এই গ্রহে জীবন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা রক্ষায় এর রয়েছে সুদূরপ্রসারী প্রভাব। নিজ অক্ষে পৃথিবীর ঘূর্ণন ২৪ ঘন্টায় পৃথিবীর সকল অংশেই রাত ও দিন বয়ে আনে, শুধুমাত্র মেরু অঞ্চল বাদে। পৃথিবীর যদি আহ্নিকগতি না থাকত, তাহলে এর এক পাশ সূর্যের দিকে উন্মুক্ত থাকত এবং অন্যপাশ ঢাকা থাকত অন্ধকারে ছয় ছয়টি মাস। প্রায় ১২ ঘন্টা সূর্যতাপের পর অন্ধকারের আগমনে আলোক সংশ্লেষণ বন্ধ হয়ে যায় যাতে বায়ুমন্ডলে কার্বনডাই অক্সাইডের অভাব এবং অক্সিজেনের আধিক্য না ঘটে, যা জীবনের জন্য অনুকূল বায়ুমন্ডলীয় ভারসাম্য রক্ষায় প্রয়োজন। ৬ মাস দীর্ঘ দিন ও রাত চরম জলবায়ুগত অবস্থা এবং আলোক সংশ্লেষণে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করত যাতে জীবনের পক্ষে টিকে থাকা এবং উন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ত। রাতের আঁধার দিবাকালীন প্রাণীকুলের জন্য বিশ্রামের সুযোগ এনে দেয়।

এ সকল আলোচনা থেকে আল্লাহ্ আলো ও অন্ধকার প্রদানের মাধ্যমে প্রকৃতিতে চমৎকার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। আলো কর্মের উদ্দীপনা জাগিয়ে এই গ্রহে জীবনের বৃদ্ধি ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। মানুষ তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের পুরো বর্ণালীকে এর নানাবিধ বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে নিজের কাজে লাগিয়েছে। রংধনুর রং, ঘনবনের পত্ররাজির ভিতর দিয়ে চক্‌চক্ করা পুকুরের ঢেউ খেলানোর দৃশ্য এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের প্রাকৃতিক কবিতা আলোর মোহনীয়তা ও মহিমার সাক্ষ্য বহন করে। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, আলোকে প্রদান করা হয়েছে বেশ কয়েকটি মজার মজার বৈশিষ্ট্য যা সকল জৈব জীবনের ভিত্তি গঠন করে। আর এ কারণে বস্তুতই আলো ঘোষণা করছে ঃ সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌রই, যিনি আলো ও আঁধার সৃষ্টি করেছেন।

তথ্য সূত্র ঃ

1. Heitler, W., Elementary Wave Mechanics, Oxford University Press, 1961.
2. Dirac, P. A. M., Quantum Mechanics, Oxford University Press, 1935.
3. Driscold, Walter, G., Handbook of Optics, Mc Graw Hill, Inc. pp. 11-5, 1978.

www.bjilibrary.com

٢- هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا

৬ ঃ ২ তিনিই তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর একটি সময় নির্দিষ্ট করেছেন।

বিজ্ঞানীগণ প্রদত্ত জীবনের সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ জীবন হচ্ছে এমন একটা প্রক্রিয়া বিশেষ যাতে রয়েছে কার্বন ভিত্তিক অণুর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে একটার পর একটা রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া যা দ্বারা বস্তুকে একটা পদ্ধতির মধ্যে নেয়া হয় এবং ঐ পদ্ধতির বৃদ্ধি ও বংশানুক্রম রক্ষায় সহায়তা দিতে বস্তুকে ব্যবহার করা হয়। আর এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বর্জ্য বাইরে নিক্ষেপ করা হয়। মানবদেহ গঠনকারী কোষসমূহ চার ধরনের প্রধান জৈব পদার্থের উপস্থিতির কারণে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সেগুলো হচ্ছে ঃ শর্করা, স্নেহ, কোষ প্রাণকেন্দ্রীয় এসিড, এবং আমিষ; আর সাথে রয়েছে অজৈব বস্তুর এক বিন্যাস। জীবনের উৎপত্তি বা উন্মেষ সম্পর্কিত সমস্যার আধুনিক বিষয়টাই হচ্ছে কেমন করে এ সকল জৈব বস্তু অস্তিত্ব লাভ করল তা নির্ধারণ করা। বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে, পৃথিবীর প্রাথমিক যুগের ইতিহাস চলাকালীন সময়ে পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিবেশে প্রাকৃতিকভাবে যে সকল রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া সংঘটিত হয়, সেগুলোই জীবনের প্রথম স্পন্দনের উন্মেষ ঘটিয়ে থাকবে। পৃথিবীর আদিযুগীয় বায়ুমণ্ডল ছিল প্রধানত মিথেন (CH_4) এবং তৎসঙ্গে কিছু এমোনিয়া, হাইড্রোজেন আর জলীয় বাষ্প দ্বারা গঠিত। বিজ্ঞানীগণ ধারণা করেন যে, আদিযুগীয় বায়ুমণ্ডলের উপস্থিতিতে সাগরে প্রাকৃতিকভাবে সংঘটিত বজ্রপাত, সূর্য থেকে আগত অতিবেগুনী রশ্মি কিংবা মহাজাগতিক রশ্মিসমূহের ক্রিয়ায় এমাইনো এসিড (২৩ টি আমিষের স্তর গঠন করে) এবং জৈব বস্তুর আরো কিছু আনুষঙ্গিক বস্তু তৈরির মধ্য দিয়ে এবং সেই সঙ্গে কিছু জৈব বস্তু সৃষ্টির দ্বারা জীবনের যাত্রা শুরু। এটাই primary broth তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত যা জোরালো সমর্থন লাভ করে যখন ১৯৫৩ সালে এস এল মিলার একটি পানির পাত্রে হাইড্রোজেন, এমোনিয়া, মিথেন এবং জলীয় বাষ্পের একটি মিশ্রণ শক্তিশালী বৈদ্যুতিক চার্জের ভিতর দিয়ে চালিয়ে বেশকিছু এমাইনো এসিড উৎপাদন করেন।[১]

খুব শীঘ্রই এই প্রাথমিক সৃষ্টিশালা প্রকল্পের ব্যাপারে সাংঘাতিক আপত্তি উত্থাপিত হয়। এমাইনো এসিড সৃষ্টি আমিষ ও ডিএনএ উৎপাদনের ব্যাখ্যা দিচ্ছিল না। ডিএনএ-র কেন্দ্রীয় প্রাণকেন্দ্রে থাকে বংশ বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবার সংকেতসমূহ। ক্রিক এবং ওয়াট্সনের প্রচেষ্টার কারণে ১৯৫৮ সালের মধ্যে

ডিএনএ-র পারমাণবিক গঠন-কাঠামো জানা যায়। শীঘ্রই এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, নতুন আমিষ তৈরির প্রথম ধাপ ছিল ডিএনএ-র উপর আরএনএ (রিবনিউক্লিয়িক এসিড) নামে এক বিশেষ আকারের সংবাদবাহকের উৎপাদন যার মধ্যে রয়েছে একটা সুনির্দিষ্ট আমিষ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি। কোষ প্রাণ কেন্দ্রে রয়েছে একটার পর একটা সাজানো এমাইনো এসিড, যাদের প্রতিটিই স্বল্পদৈর্ঘ নিউক্লিয়িক এসিডের সাথে আটকানো। সংবাদবাহক আরএনএ এসে যখন উপস্থিত হয়, স্বল্প দৈর্ঘ্য আরএনএ অনুসমূহ তখন সংবাদবাহক অণুর উপরে যথাযথ স্থানে নিজেদেরকে আটকে রাখে এবং এভাবেই এমাইনো এসিডের সঠিক অনুক্রম ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত হয় যা একটা নির্দিষ্ট আমিষ তৈরির জন্যে দরকার।

ডিএনএ-র পারমাণবিক গঠন এত জটিল যে, অনেক বিজ্ঞানী অবিশ্বাস করলেন যে, আদিমযুগীয় সৃষ্টিশালায় ডিএনএ-র সৃষ্টি সম্ভব হতে পারে, যেখানে ডিএনএ-র বিভিন্ন গঠন উপাদানের পানিতে সংযুক্ত হওয়া ছিল একেবারেই অসম্ভব। বার্নালই সর্বপ্রথম এ ধারণা দেন যে, জীবনের প্রথম স্পন্দন সৃষ্টিতে কাদামাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[২] রাসায়নিকভাবে কাদামাটি স্তরে স্তরে সজ্জিত বালুকণার পাত দ্বারা গঠিত, যাতে প্রতিটি পাতের মধ্যে বায়ু চলাচল ও পানি প্রবাহের জন্য রয়েছে যথেষ্ট ফাঁকা স্থান। কাদামাটির বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র তাদের ভিতর দিয়ে চলাচলকারী যে কোন যৌগের উপর কিছু বিশেষ প্রভাব ফেলে থাকতে পারে।[৩]

সম্প্রতি নাসার (ন্যাশনাল এরোনটিক্যাল স্পেস অথরিটি) বিজ্ঞানীগণ ধারণা দেন যে, কাদামাটি আমিষ ও ডিনএনএ তৈরিতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। মাটির জাফরি ইলেক্ট্রন আকারে শক্তি জমা করে রাখতে এবং জোয়ার ও ভাটা চলাকালে সম্ভবত সিক্ততা ও শুষ্কতার চক্র দ্বারা সৃষ্ট চাপের মুখে সেই শক্তি অবমুক্ত করতে পারে।[৪] অবমুক্ত শক্তি তখন রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাতে প্রস্তুত থাকে। কাজেই, নাসা বিজ্ঞানীগণের মতে, মাটির রয়েছে শক্তি জমা করে রাখার এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অনুঘটকের কাজ করার অনুপম ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য যা সারি সারি ইমারতকে সংযুক্ত করে আমিষ ও ডিএনএ-র উপক্রান্ত তন্তুতে পরিণত করে। যদিও এ ব্যাপারে শেষ কথাটা এখনও বলা হয়নি, আশা করা যায় যে, আরো অনুসন্ধান এ বিষয়টিকে অধিকতর স্পষ্ট করে তুলবে। বিজ্ঞানীগণ আজ বিশ্বাস করেন যে, জীবনের প্রথম স্পন্দনের উদ্ভব তখনি হয়, যখন জটিল এমাইনো এসিড আর ডিএনএ-র সংবাদবাহক আদিমযুগীয় সেই সৃষ্টিশালায় স্তরে স্তরে সাজানো মাটির ভিতর দিয়ে অতিক্রম করে যায়। সর্বাধিক নাটকীয় ঘটনাটি

www.bjilibrary.com

ছিল জড় থেকে জীবনে উন্নতির আদিম ব্যাপারটি, যা স্পষ্টতই ঘটে যায় সাগর সৈকতের সূর্য-স্নাত কাদামাটিতে। এমিবার মত সরলতম এককোষী জীবদেহের সৃষ্টিতে কাদামাটি যে ভূমিকা পালন করে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাথে কুরআনের বক্তব্যের মিল রয়েছে। ডিএনএ- আমিষ চক্র আনবিক স্কেলে আধুনিক স্বয়ংক্রিয় সমাবেশ লাইনের মতই, যে প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণই স্ব-উৎপাদনী টেপে (ডিএনএ) নিয়ন্ত্রিত। মানবদেহে এই প্রক্রিয়া প্রতিটি কোষেই চলতে থাকবে যাতে কোন ভুল-ত্রুটি ছাড়াই কমপক্ষে দু'হাজার বিভিন্ন আমিষ উৎপাদিত হতে পারে। কেননা, একটি মাত্র ভুলও স্বাভাবিকভাবেই মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে। যে সংগঠন ও প্রক্রিয়ায় আমিষের সংশ্লেষণ ঘটে তা লক্ষ্য করলে যে কেউ বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়তে বাধ্য। যাহোক, সকল সৃষ্টির মহত্তম মানব সৃষ্টি, যাব সাথে জড়িয়ে আছে জটিল জৈবরাসায়নিক ক্রিয়া-এমিবার সৃষ্টি থেকে বহু দূরের ব্যাপার। অনুপম স্বয়ংক্রিয় সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সমৃদ্ধি প্রথম মানব ডিএনএ-র সৃষ্টি এর পিছনে কোন উদ্দেশ্য, গন্তব্য এবং পরিকল্পনা ব্যতিরেকে সম্ভব হত না। বস্তুত এসব কিছু শুধুমাত্র তখনই ঘটতে পারে যখন এসব কিছু ঘটাবার জন্যে কোন মহাপরিকল্পনাকারী থাকেন।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Bernal J. D. Science in History; Vol. 3, Penguin, p. 986. 1969.
2. Bernal J. D. The Physical Basis of Life, Routledge and Kegan Ltd. London. 1952.
3. Alexander George, Reader's Digest. pp 34-38. January. 1983.
4. News Week. p. 50, April 15. 1985.

www.bjilibrary.com

٦- أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ
نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن
تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ○

৬ ঃ ৬ **তারা কি দেখে না যে, তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি; তাদেরকে দুনিয়ায় এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেমনটি তোমাদেরকেও করিনি এবং তাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম আর তাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত করেছিলাম; অতঃপর তাদের পাপের দরুণ তাদেরকে বিনাশ করেছি এবং তাদের পরে আরেক মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছি।**

অত্র আয়াতটি ৩ ঃ ১৩৭ আয়াতের পুনরাবৃত্তি বিশেষ এই অর্থে যে, এটি বিশ্বাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অতীত ইতিহাসের দিকে যাতে তারা দেখতে পায় যে বহু ক্ষমতাধর ও সমৃদ্ধিশালী জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে তাদের পাপের কারণে।

আয়াতটিতে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়নি কোন্ জাতি গোষ্ঠীগুলোকে ধ্বংস করা হয়েছিল কিংবা তাদের পাপের প্রকৃতি যার জন্য তাদেরকে ধ্বংসের মুখে পড়তে হয়েছিল। আজ আমাদের কাছে জ্ঞাত যে ইতিহাস তাতে লেখা রয়েছে বহু ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক জাতির কথা যাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। শুধুমাত্র ফারটাইল ক্রিসেন্ট (Fertile Crescent) নামে গুটিকয়েক প্রাচীন আরব দেশের কথা আল কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে যা আমরা ৩ ঃ ১৩৭ আয়াতে আলোচনা করেছি।

এ আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী এটাই প্রত্যাশিত যে, মুসলমানগণ জ্ঞান রাখবে প্রাচীনকালের জাতিসমূহের ইতিহাস এবং তাদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে, আর সচেতন হবে যে কারণে আল্লাহ্ নারাজ হয়েছিলেন যার পরিণতিতে তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

١١- قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ○

৬ ঃ ১১ **বল, 'পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ, যারা সত্যকে অস্বীকার করেছে।**

এ বিষয়টি ৩ ঃ ১৩৭ আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

٣٨- وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْأَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ
أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ ثُمَّ إِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ○

৬ ঃ ৩৮ ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখি উড়ে না যা তোমাদের মত একটা উম্মত নয়। কিতাবে কোন কিছুই আমি বাদ দেই নি; অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাদের সকলকেই একত্রিত করা হবে।

'সম্প্রদায়' বলতে কিছু অভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন 'জীবদল' কে বুঝায়। হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা প্রাণীদের স্থানান্তর, বৃদ্ধি, বংশবৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন সম্প্রদায় নামে জীবনের জটিল সম্পর্ক-জাল সৃষ্টি করেছে। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বহু বর্গীয় জীবদেহ যারা জল এবং স্থলে নির্দিষ্ট পরিবেশে সম্পর্ক স্থাপন ও যোগাযোগ করে থাকে।

কিন্তু কুরআনের আলোচ্য আয়াতটি স্পষ্টতই সেই সকল ব্যক্তির সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছে যারা একটি প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত, পৃথিবীতে হামাগুড়ি দেয় কিংবা হাঁটে অথবা বাতাসে উড়ে বেড়ায়। সরলতম সম্প্রদায় হচ্ছে এক জোড়া সঙ্গী। বৃহত্তর সম্প্রদায়গত ইউনিট হচ্ছে সেই সকল জনসংখ্যা যারা কম বেশী জটিল সামাজিক ব্যবস্থায় সংগঠিত। জীবনের পরিবেশ অনুকূল হলে জীবসদস্য গুণিত হয় এবং শীঘ্রই একটা জনসংখ্যা গঠন করে। কোন পরিবেশে এর সদস্য সংখ্যা কত হবে তা নির্ভর করে কয়েকটি বিবেচ্য বিষয়ের উপর। যথা ঃ কোন্ সময় থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি শুরু হয়, খাদ্যের পরিমাণ, প্রাপ্ত যায়গা বা স্থান, এবং শিকারজীবী প্রাণীর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি। সম্প্রদায়গুলো আণুবীক্ষণিক জীবাণুই হোক কিংবা ইঁদুরই হোক অথবা হোক না মানুষ, সকলের জন্যেই একই বিধান খাটে। পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ, পূর্ণ বয়স্কা নারী, শিশু এবং কিশোর-কিশোরী নিয়ে গঠিত হয় মেরুদণ্ডী প্রাণীকুলের সামাজিক কাঠামো। সামাজিক আচরণ আর যোগ্যতা-সক্ষমতার দ্বারা শ্রম বিভাজন প্রতিষ্ঠা করা হয় যার মাধ্যমে নির্ধারিত হয় দলের নেতা, পথ প্রদর্শক, শান্ত্রী এবং অভিভাবক। মানব সমাজেও একই রকম কাঠামো দেখা যায়, তবে তা একদম দৈবিক নয়, বরং সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তিশীল। একজন সৈন্য, একজন রাজনীতিক, একজন শিক্ষক, একজন চিকিৎসক, একজন প্রকৌশলী, একজন শিল্পী এবং আমাদের সমাজের অপরাপর সকল বিশেষজ্ঞ বাহ্যিকভাবে দেখতে একে অপরের মত হলেও তারা ভিন্ন ভিন্নভাবে আচরণ করে থাকে। দল গঠনের দ্বারা অনেক

www.bjilibrary.com

উপকার বা সুবিধা সৃষ্টি করা হয়। দলীয় কার্যক্রম নারী ও পুরুষকে বংশবৃদ্ধির জন্যে পরস্পরের সান্নিধ্যে আনে এবং বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির সুযোগ করে দেয়। আর এ সবের মোট ফলাফল হিসেবে আশ্রয়, নিরাপত্তা, খাদ্য, পানি ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা পূরণে দলের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। কোন সমাজকে যদি একটা একক সত্তা হিসেবে টিকে থাকতে হয়, তাহলে একে দৃষ্টি, স্পর্শ এবং সম্ভবত স্বাদ এই তিন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যাতে এর সদস্যদের কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়।

পোকামাকড়ের মধ্যে সামাজিক সংগঠনের ক্রমবিকাশের সমস্যা প্রাণী আচরণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক মনোমুগ্ধকর। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উইপোকারা তাদের মধ্যকার বিশেষ শ্রেণীর দলীয় প্রচেষ্টা দ্বারা বাসা তৈরি করে, এদের বিশেষ বিশেষ কর্মের উপর পুরো দলের টিকে থাকা নির্ভর করে। সমাজের সদস্য জন্মদানকারী স্ত্রী উইয়ের রয়েছে বৃহদাকার পেট। কর্মীরা হচ্ছে বন্ধ্যা পুরুষ আর বিভিন্ন আকারের স্ত্রী উই তাদের আকার অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করে, যেমন ঃ খাদ্য সংগ্রহ, আশ্রয় তৈরি ও মেরামত কিংবা ছোটদের দেখাশুনা করা। সমাজের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সৈনিকদের রয়েছে আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক কৌশল তথা কামড় মারার জন্য বড় বড় জোরালো চোয়াল এবং এমনকি রাসায়নিক বস্তুসমূহ যা ছাড়লে বিষাক্ত গ্যাসের মত কাজ করে।

মৌমাছিরা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষক দলবদ্ধ আচরণের প্রদর্শনী করে থাকে। মানব সমাজের মত তাদেরও রয়েছে শ্রম বিভাজন–এটা সুবিদিত। মৌমাছিদের এই দিকটা সকলেই অবহিত এবং মৌরাণী, পুং-মধুপ, শ্রমিক মৌমাছিও পরিচিত নাম। আমরা তাহলে এ সকল বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করব না, আমরা বরং মৌমাছিদের মধ্যে যোগাযোগের পদ্ধতিগত দিকটিতে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। মানব সমাজসমূহ বিভিন্ন স্বীকৃত ভাষায় যোগাযোগ করে থাকে। মৌমাছিদের সদস্যরাও একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে থাকে তবে তা নাচের ভঙ্গিমায় যাতে থাকে দু'টি বিষয়ের তথ্যাদি যথা ঃ ১. কোন খাদ্যের অস্তিত্ব, এবং ২. ঐ খাদ্যের ঠিকানা। মৌমাছি যদি সোজা চলে এবং তারপর ঘড়ির কাঁটার দিকে মোড় নেয়, অতঃপর আবার সোজা চলে এবং খানিকবাদে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে মোড় নেয়–যা চিত্র ৩ক-তে পরিকল্পিতভাবে দেখানো হয়েছে, তাহলে এই নাচের অর্থ হলো আশপাশে খাদ্য আছে। এই নাচ ভঙ্গিমায় খাদ্য কোন্ দিকে রয়েছে তা নির্দেশ করা হয় নিম্নোক্ত পন্থায়। মৌমাছি তার নাচের দ্বারা সূর্যের দিকের সাথে তুলনা করে খাদ্যের দিক নির্দেশ করে। সূর্যের দিক নির্দেশ করা হয়েছে মৌচাকের দেয়াল থেকে সোজা উপরের দিকে একটা খাড়া বা উল্লম্ব রেখার মাধ্যমে। নর্তক যদি খাড়াভাবে উপরের দিকে উঠে

www.bjilibrary.com

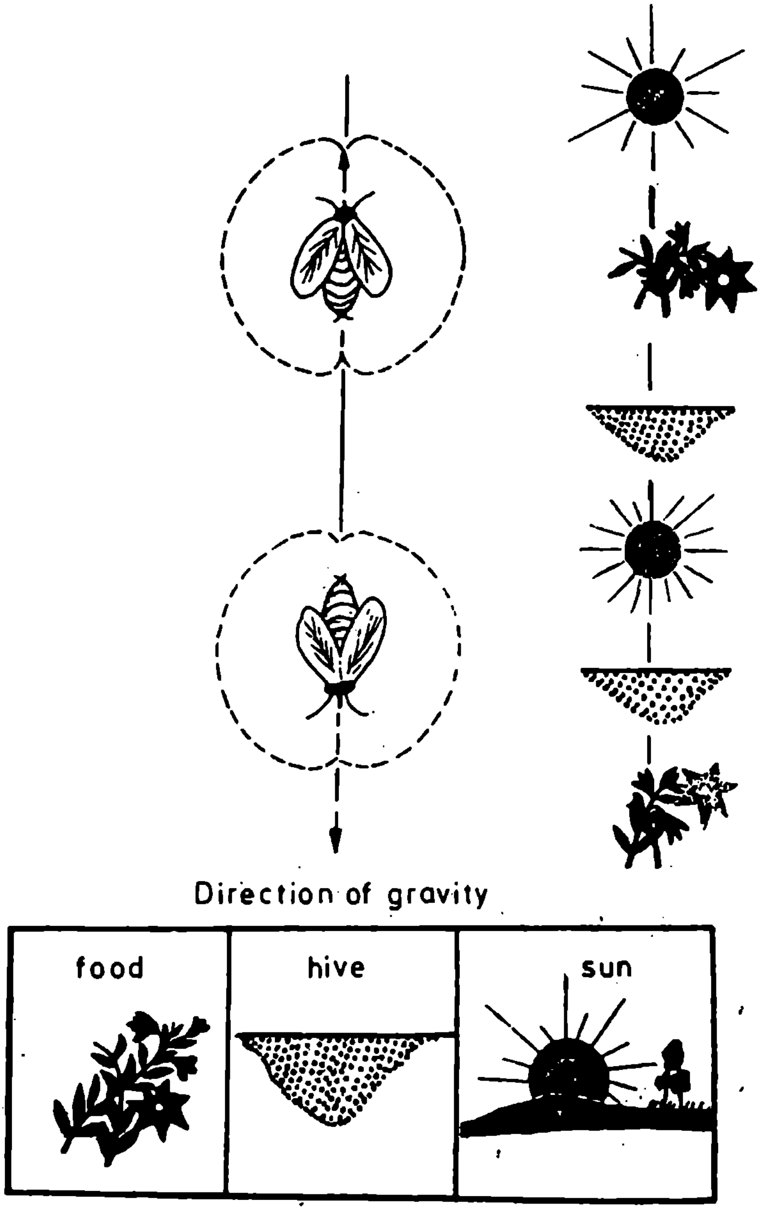

চিত্র ৩ (ক).

www.bjilibrary.com

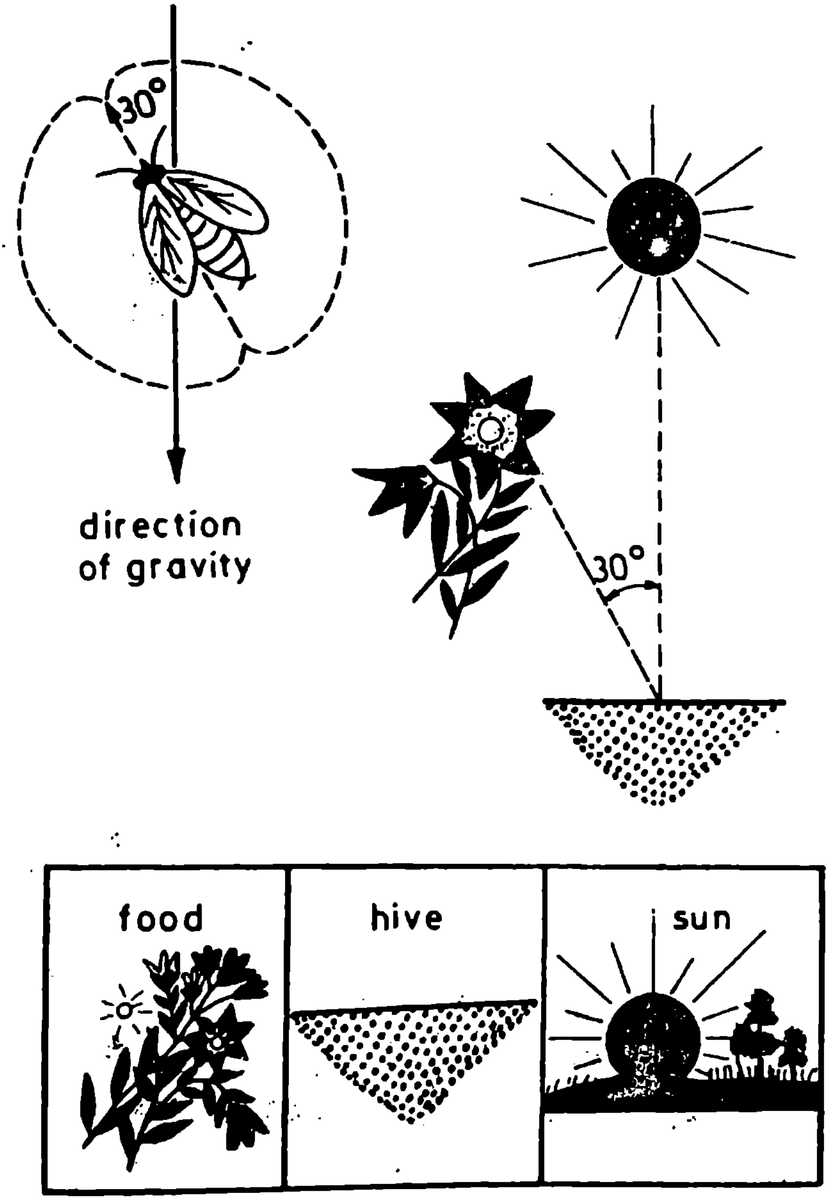

চিত্র ৩ (খ).

www.bjilibrary.com

যায় তার অর্থ সূর্য যেদিকে খাদ্যের স্থানও সেদিকে। খাদ্যের উৎস যদি সূর্যের ৩০° ডিগ্রী বাম বরাবর হয়, তাহলে নাচও হবে উল্লম্ব রেখার বাম বরাবর ৩০° কোণে। চিত্র ৩ খ।

অন্য মৌমাছিরা নর্তনশীল মৌমাছিটাকে দেখে এবং উল্লম্ব তথা সূর্যের অবস্থানের দিকের তুলনায় এর অবস্থানকে পর্যবেক্ষণ করে। অন্য মৌমাছিরা আরো অনুভব করে যে, উল্লম্বটি হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণের দিক। নর্তনশীল মৌমাছিটি যখন উড়ে চলে যায়, অন্য মৌমাছিরা তখন খাদ্যের সন্ধানে সূর্যের অবস্থানের তুলনায় একটা নির্দিষ্ট কোণে যাত্রা শুরু করে নাচের মধ্য দিয়ে যে দিকটি নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু সূর্যকে কোন বাধা যখন আড়াল করে রাখে তখন মৌমাছিরা কী করে? উদাহরণস্বরূপ, আকাশে মেঘ থাকতে পারে কিংবা সূর্য পাহাড়ের পিছনেও থাকতে পারে। এটি এবং এ ধরনের আরো সমস্যারও সমাধান আছে। অধিক বিস্তারিত জানার জন্য ভন ফ্রিস্-এর গ্রন্থসমূহের সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে যাতে রয়েছে মৌমাছির আচরণের উপর বিশাল গবেষণা কর্মের ফলাফল।

ঘটনাক্রমে, সূরা নাহ্‌ল-এ (আয়াত ১৬ ঃ ৬৯) আল্লাহ্ মৌমাছিদের নির্দেশিত পথের কথা উল্লেখ করেছেন যে পথে চলতে তিনি তাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। মৌমাছির উপর পরিচালিত গবেষণাসমূহ এ সকল নির্দেশিত পথ সম্পর্কে খানিকটা আলোকপাত করেছে যা মৌমাছিদের নাচশৈলী বা ভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

এভাবে, আলোচ্য আয়াতে প্রাণীজগতের সংঘ বা সম্প্রদায়গত দিকের যে ইঙ্গিত করা হয়েছে মৌমাছিরা তার এক চমৎকার দৃষ্টান্ত। মানব পরিবারের বাইরে সংঘবদ্ধ আচরণের আরেক দৃষ্টান্ত হচ্ছে পিপীলিকা। পিপীলিকাদের সুশৃঙ্খল চলাচল কে দেখে নি, দেখে নি তাদের খাদ্য বিনিময় পদ্ধতি, তাদের শ্রম বিভাজন এবং বর্ষাকালের জন্য খাদ্য মজুত নীতি লক্ষ্য করে তাদের প্রশংসা করে নি? শ্রম বিভাজন এবং পিঁপড়া পরিবারের সাংগঠনিক স্তর কাঠামো এক বিস্ময় বটে। ঠিক মানুষের মতই, মা-পিঁপড়া সন্তানদের লালন পালন করেন; একইভাবে পিঁপড়া-রাণী তার বংশধরদের মধ্যে প্রথম প্রজন্মের প্রতি থাকেন নিবেদিতপ্রাণ। তিনি তার মুখ থেকে স্নেহপদার্থ সম্বলিত লালা তরুণ শুঁয়ো-পোকার মুখে নিক্ষেপ করেন আর তারা দ্রুত বড় হয়ে যায়। প্রথম প্রজন্মের কর্মীরা (কর্মী কিংবা সৈন্য) পক্ষবিহীন, স্বাভাবিকভাবেই সন্তান জন্মদানে অক্ষম। স্ত্রী-পিঁপড়া মাটি খুঁড়ে পথ করে এগিয়ে যায় মাটির উপরিতল পর্যন্ত এবং তারা খাদ্যের সন্ধানে বের হয়। পক্ষবিশিষ্ট পুরুষরা রাণীদের সাথে প্রথম এবং একমাত্র বৈবাহিক আকাশ ভ্রমণে যৌন সঙ্গমের পর অন্যত্র আশ্রয় নেয় এবং কয়েকদিনের মধ্যে মারা যায়। তারা এটি রাণীর নিকট নিয়ে আসে এবং রাণী তার শক্তি

www.bjilibrary.com

পুনরুদ্ধারের পর ডিম পাড়ার কাজ অব্যাহত রাখে। ক্রমান্বয়ে কর্মীরা ছোটদের দেখাশুনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। শেষ পর্যন্ত রাণী ডিম পাড়ার মেশিনে পরিণত হয়ে যায় আর কর্মীরা তাদের পেট থেকে খাবার 'উগরাইয়া' রাণীর উদর ঠেসে ভর্তি করে দেয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, পিঁপড়াদের সংঘগত অস্তিত্ব সত্যিই মানব সমাজের মতই একটা সমবায় প্রক্রিয়া বিশেষ।

পিঁপড়েরা চমৎকারভাবে সমবায়ী উদ্যোগের শক্তি প্রদর্শন করে যখন তারা তাদের নিজেদের আকারের তুলনায় অনেক বড় আকারের কোন খাদ্যশস্য বহন করে নিয়ে যায়। এটি এবং এর সাথে তাদের চরিত্রের আরো অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ তাদের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক জীবনের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্ট এবং অত্র আয়াতে উল্লিখিত বিভিন্ন আকারের জীবের মধ্যে মানুষের অনুরূপ সম্প্রদায়গত আচরণের আরেকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে।

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ

৬ ঃ ৫০ বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান?

দৃষ্টিশক্তি আল্লাহ্‌র এক বিরাট দান। যার দৃষ্টিরূপ দর্শনাঙ্গ আছে তিনি দেখতে পান, দূর থেকে কোন জিনিসকে চিনতে বা বুঝতে পারেন এবং তাদের নিজ নিজ রঙ, আকার-আকৃতি ও আয়তনের প্রভেদ নির্ণয় করতে পারেন এবং দুনিয়ার সৌন্দর্য ও মহিমা উপভোগ করতে সক্ষম হন। অধিকন্তু, তারা তাদের পথ দেখতে পান এবং ফলে দৃঢ় পদে চলাফেরা করতে এবং কাঙ্খিত গন্তব্যে পৌঁছতে পারেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, তারা তাদের চারপাশে বর্তমান প্রচুর প্রাকৃতিক আলো নিজ সুবিধা বা উপকারার্থে ব্যবহার করতে পারেন।

অপরদিকে, একজন অন্ধ ব্যক্তি অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি বঞ্চিত কোন লোক সম্পূর্ণ অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকেন। তার চারপাশের আলো, রঙ এবং সৌন্দর্য সবই বৃথা। কেননা, এসব কিছু তার অভিজ্ঞতার বাইরের জিনিস। তিনি দেখতে পান না এবং প্রতিটি পদক্ষেপেই তিনি প্রতিবন্ধী।

এটা স্পষ্ট যে, একজন অন্ধ ব্যক্তি এবং একজন চক্ষুষ্মান লোক কখনও সমান হতে পারে না; তাদের মধ্যে অপরিমেয় ফারাক বিদ্যমান।

'অন্ধরা কি চক্ষুষ্মানদের সমান হতে পারে' বক্তব্যটির উপমেয়তা হিসেবে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপ বক্তব্য রয়েছে ৪০ ঃ ৫৮ আয়াতে (যারা অন্ধ আর যারা চক্ষুষ্মান তারা সমান নয়)। এখানে একজন অন্ধ লোককে সেই ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে যিনি আধ্যাত্মিক দীপ্তি তথা আল্লাহ্‌র যে আলো বা নূর

www.bjilibrary.com

সমগ্র বিশ্বময় ছড়িয়ে আছে তা অনুধাবন ও ব্যবহার করতে অক্ষম। এভাবে সে আল্লাহ্‌র হেদায়েত লাভ এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সাধন করতে সক্ষম হয় না। অপরদিকে, আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দারা তাদের ঈমান ও নেক আমলের গুণে আধ্যাত্মিক নূর গ্রহণ করার ক্ষমতা সৃষ্টি করেন যা তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিশক্তির জন্ম দেয়। তারা প্রতিটি জিনিসকে সঠিক দৃষ্টিতে দেখেন, 'সোজা পথ' বেছে নেন ও অনুসরণ করেন এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হন।

٦٣-قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

৬ ঃ ৬৩ বল, 'কে তোমাদেরকে ত্রাণ করে স্থলভাগের ও সমুদ্রের আঁধার হতে?'

অত্র আয়াতে স্থল ভূভাগ এবং সাগরে, অন্ধকারের সাথে সংশ্লিষ্ট বিপদাপদ ও দুর্দশাসমূহের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ ধরনের অন্ধকার ও তৎসংশ্লিষ্ট দুর্দশার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

১. রাত্রির ব্যাপক-বিস্তৃত অন্ধকার স্থল ও জলভাগ উভয়কেই ঢেকে ফেলে এবং বিশেষ করে ঘন অন্ধকার হয় যখন চাঁদ দেখা যায় না। দুষ্কৃতকারীরা রাতেই অধিক সক্রিয় থাকে এবং এর ফলে বেশ কিছু বিপদাপদ রাতেই ওৎ পেতে থাকে। অধিকন্তু, যথেষ্ট সতর্ক না হলে অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলার ঝুঁকিও রয়ে যায়।

২. স্থলভাগ ও সাগরের উপর দিয়ে চলাচলরত ঘন, কালো মেঘ মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারে। এ কারণে হতে পারে ধ্বংসাত্মক বন্যা, বজ্রপাতে ঘটতে পারে জীবন ও সম্পদের হানি এবং শিলাবৃষ্টি ডেকে আনতে পারে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি।

৩. স্থলে ও সাগরে ঘন কুয়াশা জমে কখনও কখনও দৃষ্টিশক্তি কয়েক ফুটের মধ্যে সীমিত করে ফেলতে পারে এবং ঘটাতে পারে বার বার দুর্ঘটনা, মুখোমুখি সংঘর্ষ এবং চলার পথ থেকে বিচ্যুতি। এ রকম পরিস্থিতিতে সাগরবক্ষে চলমান জাহাজ এবং স্থলভাগে চলাচলকারী পথচারী ও যানবাহনের জন্য রয়েছে ভয়াবহ বিপদের হাতছানি।

৪. সামুদ্রিক ঝড়-ঝঞ্ঝা মেঘ সাথে নিয়ে যখন সাগর ও স্থলভাগের উপর দিয়ে প্রবল বেগে বয়ে যায়, তখন সাগরের জাহাজ ও স্থলভাগের গাছপালা ও ঘরবাড়ি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে তছনছ করে দেয় এবং সেই সাথে ঘটায় ব্যাপক প্রাণহানি।

www.bjilibrary.com

৫. ভূপৃষ্ঠস্থ গভীর খাদসমূহের অন্ধকারে অসতর্ক সফরকারীর জন্য রয়েছে ভয়াবহ বিপদ। তাছাড়া, এ ধরনের অন্ধকার গহ্বরের তলায় থাকতে পারে জমে থাকা ক্ষতিকর বিষাক্ত গ্যাস।

৬. গভীর সাগরের আঁধার মানেই ডুবে মারা পড়ার বিপদ।

৭. সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালা সাগরবক্ষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে যার নিচেই থাকে গভীর অন্ধকার। এসব তরঙ্গ নৌকা ও জাহাজকে প্রচন্ড শক্তিতে আঘাত করে এবং ধাক্কা মেরে পানির নিচে তলিয়ে দেয়।

৮. ভূগর্ভের গভীরে আঁধারেরই রাজত্ব যেখানে উৎপত্তি হয় বড় বড় বিপর্যয়ের। কারণ সেখানে ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বিভিন্ন প্রকারের এবং মাত্রার বিপর্যয় স্থলভাগ ও সাগরের অন্ধকারের সাথে যুক্ত ও সম্পৃক্ত এবং একমাত্র আল্লাহ্‌ই আমাদেরকে তাঁর করুণায় এ সকল বিপর্যয় থেকে বাঁচিয়ে রাখেন।

٧٣- وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ

৬ ঃ ৭৩ তিনি যথানুপাতে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।

বুদ্ধিমান ব্যক্তিসত্ত্বাসহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বত্রই সঠিক অনুপাতের চিহ্ন বিদ্যমান। আমাদের পৃথিবীতে বুদ্ধিমান জীব সৃষ্টি ও তার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বের সকল প্রাত্যহিক ঘটনা বা বিষয়াবলী এবং নভোমণ্ডলীর দৃশ্য গুটিকয়েক প্রাকৃতিক নিয়ম এবং ধ্রুবক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্দেশিত হচ্ছে, যেমন– মৌলিক পদার্থের কণার ভর এবং তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল মৌলিক বলগুলোর শক্তি। অনেক ক্ষেত্রে বরং একটা সূক্ষ্ম ভারসাম্য বিরাজ করছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, পারমাণবিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সাথে জড়িত রয়েছে শক্তিশালী আনবিক বল ও বৈদ্যুতিক বলের ভারসাম্য। প্রথমটি দু'টি প্রোটনকে আকর্ষণ করে, আর পরেরটি তাদেরকে বিকর্ষণ করে। আমরা এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাথে যেভাবে জড়িত তাতে এই ভারসাম্য ক্ষুরের মত পাতলা আর চাকুর মত ধারালো বলে প্রতীয়মান হয়। শক্তিশালী আনবিক বল যদি হত সামান্য কিছুটা দুর্বল, তাহলে পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ কণাসমূহ যুক্ত হয়ে পরমাণুর প্রাণকেন্দ্র তৈরি করতে পারত না। মাত্র এক ধরনের পরমাণুই পাওয়া যাবে, অর্থাৎ সাধারণ হাইড্রোজেন পরমাণু (যার নিউক্লিয়াসে একটি প্রোটন থাকে) এবং অন্যান্য মৌলিক পদার্থ যথা কার্বন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন যেগুলো ব্যতীত জীবনের

অস্তিত্বই সম্ভব হত না। অপরদিকে, শক্তিশালী আনবিক বলটি যদি আরো সামান্য খানিকটা শক্তিশালী হত, তাহলে মহাবিশ্বের সমস্ত হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হত এবং আর কোন হাইড্রোজেন থাকত না। আমাদের নিকট হাইড্রোজেন অপরিহার্য দু'ভাবে ঃ হাইড্রোজেন জীবকোষ গঠনকারী গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং এটা হচ্ছে সেই জ্বালানী যা সূর্য ও অন্যান্য তারকাকে কোটি কোটি বছর ধরে দীপ্তিমান রাখছে।

পরমাণু অভ্যন্তরস্থ কণাসমূহের বাস্তব ভরও গুরুত্বপূর্ণ। যদি প্রোটোনসমূহের ভর পরমাণুতে প্রদক্ষিণরত ইলেক্ট্রনসমূহের তুলনায় এক হাজার আটশত ছত্রিশ গুণ ভারী না হত তাহলে রসায়ন বিজ্ঞান হত ভিন্ন রকম; বিশেষ করে জীবনের জন্য অপরিহার্য অণুসমূহ (যেমন আমিষ ও ডিএনএ) স্থিতিশীল হত না। পৃথিবী যদি শতকরা মাত্র কয়েক পয়েন্ট সূর্যের আরো কাছাকাছি হত, তাহলে এর অবস্থা হত শুক্র গ্রহের ন্যায় অর্থাৎ বায়ুমন্ডলের পুরু আবরণের অভ্যন্তরে এক আগুনে সেঁকা উত্তপ্ত বস্তু। আর যদি মাত্র শতকরা একভাগ অধিক দূরবর্তী হত তাহলেই পৃথিবী স্থায়ীভাবে হয়ে পড়ত বরফে আচ্ছাদিত, ঠিক মঙ্গল গ্রহের মত।

যদি মহাবিশ্ব সৃষ্টি প্রক্রিয়া চলাকালীন প্রথম সেকেন্ডে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ হার তুচ্ছ ও সামান্যতম মাত্রায় কম হত, তাহলে এখানে কোন জীবের ক্রমবিকাশ ঘটার বহু পূর্বেই মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে যেত। বিপরীত পক্ষে, যদি ঐ সম্প্রসারণ হার একেবারেই সামান্যতম মাত্রায় বেশী হত, তাহলে সম্প্রসারণ এত ব্যাপক মাত্রায় ঘটত যে, এখানে মাধ্যাকর্ষণীয়ভাবে আবদ্ধ কোন ব্যবস্থা (তথা ছায়াপথ, তারকা ইত্যাদি) গড়ে উঠতে পারত না। এভাবে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সঠিক অনুপাতেই সৃষ্টি করেছেন।

৭৫- إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ○

৬ ঃ ৯৫ আল্লাহ্ই শস্যবীজ ও আঁটি অঙ্কুরিত করেন, তিনিই প্রাণহীন থেকে জীবন্তকে নির্গত করেন এবং জীবন্ত থেকে প্রাণহীনকে নির্গত করেন; এই তো আল্লাহ্, সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাবে?

শস্যবীজ ও শক্ত খেজুরবিচির পল্লবিত হওয়া ঃ আলোচ্য আয়াতটিকে দু'টি অংশে বিভক্ত করে বিবেচনা করা যেতে পারে; যথা ঃ ১. বীজের অঙ্কুরোদগম এবং ২. মৃত থেকে জীবিত এবং জীবিত থেকে মৃত হওয়ার প্রাকৃতিক চক্র।

www.bjilibrary.com

১. এ অংশে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ প্রকৃতিতে বিদ্যমান শিল্প নৈপুণ্যের একটা দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন যাতে এমন এক প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল যা আমাদের নিকট দৃশ্যত খুবই সাদামাটা মনে হয়, যেমন অঙ্কুরোদগমে বীজের ফেটে বিভক্ত হয়ে যাওয়া। বীজের আবরণ, একটি ভ্রূণ বা জায়মান চারাগাছ এবং অঙ্কুরোদগম প্রক্রিয়া চলাকালে সমাবেশের জন্য বীজপত্র কিংবা এন্ডোস্পার্ম নামে একটা কলায় সংরক্ষিত প্রচুর পুষ্টি উপাদান নিয়ে বীজ গঠিত। মূল বৃক্ষ থেকে আলাদা হবার পর বীজস্থ ভ্রূণকে নিজ থেকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া শুরু করার জন্য ভিতর ও বাইরের উভয় রকম অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত একটা সময়, কখনও কখনও ঘুমন্ত অবস্থায় অপেক্ষা করতে হয়।

খুবই অসাধারণ পরিস্থিতিতে কিছু কিছু বীজের ভাল থাকার সম্ভাবনা অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যেতে পারে। প্রাচ্যদেশীয় পদ্মফুল (নেলামবিয়াম নুসিফেরা) দীর্ঘায়ুতার দিক থেকে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে যার বীজ কার্বন-১৪ সন তারিখ পরীক্ষার প্রমাণানুযায়ী সফলতার সাথে কয়েক শতাব্দী যাবৎ সুপ্ত অবস্থায় টিকে ছিল। ১৯৫১ সালে টোকিওর নিকটবর্তী একটা পীট কয়লা খনি থেকে উদ্ধারকৃত এ রকম তিনটি বীজ বিশেষজ্ঞ কর্তৃক বিশেষ যত্নের পর অঙ্কুরোদগম ঘটিয়েছে এবং তাদের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ফুল উৎপাদন করেছে।[১] কিন্তু এ রেকর্ডটিও ভঙ্গ করেছে সুমেরু অঞ্চলীয় লুপাইন (লুপিনাস আর্কটিকাস) বীজ ১৯৬৭ সালে; কানাডার উকোনের এক জমাটবাঁধা গর্তে এই বীজ পাওয়া যায়, কার্বন ডেটিং তথা সন তারিখ পরীক্ষায় যার বয়স কমপক্ষে দশ হাজার বছর। এ সকল বীজের মধ্যে একটি নমুনা বীজ ৪৮ ঘন্টার মধ্যে অঙ্কুরোদগম ঘটায়।[২]

বীজের ঘুমন্ত বা সুপ্ত অবস্থার সর্বাধিক সাধারণ কারণের মধ্যে রয়েছে ভ্রূণের দৈহিক অপূর্ণাঙ্গতা এবং বীজাবরণের পক্ষে পানি এবং কখনও কখনও অক্সিজেনের সাথে অভেদ্য হয়ে পড়া। দৃষ্টান্তস্বরূপ খেজুর বিচির রয়েছে বিশেষভাবে কঠিন ও প্রস্তরবৎ আবরণ এবং একমাত্র তখনই অঙ্কুরোদগম ঘটায় যখন বীজাবরণস্থ বাধাদায়ক রাসায়নিক পদার্থসমূহ বৃষ্টিপাতের দরুন ধীরে ধীরে চুইয়ে বা নিষ্কাষিত হয়ে যায় যা মরুভূমিতে অনেকদিন পর পরই শুধু ঘটে থাকে।

অধিকাংশ বীজই অত্যন্ত শুষ্ক, যার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে পানির পরিমাণ থাকে মোট ওজনের মাত্র ৫% থেকে ২০% ভাগ। কাজেই, বিপাক ক্রিয়ার জন্য অপরিহার্য পানি শোষণ না করা পর্যন্ত বীজের অঙ্কুরোদগম সম্ভব নয়। পানি শোষণ বলতে বুঝায় বিভিন্ন বস্তু তথা কাঠ, শিরিস আঠা এবং সেলুলোজের দিকে পানির অণুর চলাচল বা প্রবাহ, শেষোক্তটি হচ্ছে উদ্ভিদ কোষ প্রাচীরের উপাদান।

পানি শোষণ দ্বারা সৃষ্ট স্থিতিশক্তিগত চাপ বিস্ময়করভাবে উচ্চমাত্রার হতে পারে। পানি শোষণকারী বীজের আকার তাদের মূল আকারের তুলনায় অনেকগুণ বেড়ে যেতে পারে, যার ফলে বেশ চাপ সৃষ্টি হয়ে বীজাবরণ ফেটে যেতে পারে। অধিকাংশ বীজ থেকে প্রথম যে দেহবস্তু বের হয় তাহলো ভ্রূণ মূল যা ধনাত্মকভাবে জিওট্রপিক অর্থাৎ মাটির ভিতরের দিকে বাড়ে এবং চারা গাছকে মাটির সাথে আটকে রাখে ও পানি শোষণ করে। এরপর গজায় অঙ্কুর যা ঋণাত্মকভাবে জিওট্রপিক অর্থাৎ মাটি থেকে উল্টোদিকে বেড়ে উঠে। অঙ্কুরোদগমকালে বীজের অভ্যন্তরে জমাকৃত খাদ্য হজম হয় এবং বর্ধনশীল অংশগুলোতে পরিবাহিত হয়।

ঘটনাক্রমে, অত্র আয়াতে যে দু'টি বীজের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো সুপ্তাবস্থার দুই প্রান্তসীমার প্রতিনিধিত্বমূলক। শস্য বীজটি প্রতিনিধিত্ব করে খাদ্যশস্য দানার, যার রয়েছে অত্যন্ত পাতলা বীজাবরণ এবং ন্যূনতম সুপ্তাবস্থার সময়কাল, আর ভারী ও কঠিন দেয়াল বিশিষ্ট খেজুর বিচিটি সুপ্তাবস্থায় থাকে দীর্ঘ সময় ধরে।

২. দৃশ্যত একটি মৃত বীজ থেকে অঙ্কুরোদগমকে কখনও কখনও একটা নতুন উদ্ভিদের জীবনের সূচনা হিসেবে দেখা হয়। আবার বীজ গঠনের অর্থ একটি উদ্ভিদের জীবন-ইতিহাসের সমাপ্তি। এ বিষয়টি ২ঃ ২৮ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

সুপ্তাবস্থা কিংবা আপাত মৃত্যুর ব্যাপারটা অন্যান্য উদ্ভিদ দেহেও লক্ষ্য করা যায়। যেমন– উষ্ণ জলবায়ুর সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া বৃক্ষরাজির ভূগর্ভস্থ কিংবা বায়ুস্থিত কান্ড। ড্যাফোডিল ও টিউলিপ গাছের কন্দ এক ধরনের শীত নিদ্রায় যাবার আগেই তাদের পাতা ও ফুল হারায়। একই অবস্থা পাতাঝরা গাছের, যেগুলো শরৎকালে যখন তাদের বিপাক ক্রিয়াদি সর্বনিম্ন স্তরে নেমে যায় তখন তাদের সমস্ত পাতা ঝরায়। বসন্তের আবহাওয়ার আগমনে নতুন কর্মতৎপর বার্তা বয়ে আনে যাতে নতুন নতুন কুঁড়ি ও মুকুলে ভরে উঠে বৃক্ষরাজি যা পূর্ণ উদ্যমে চলতে থাকে পরবর্তী শীতকাল না আসা পর্যন্ত। কেননা, শীতকালের আগমনে সজীবতা হারিয়ে বৃক্ষরাজি হয়ে পড়ে নির্জীব। আর এভাবেই পূর্ণ হয় জীবন থেকে মৃত্যু এবং মৃত্যু থেকে জীবনের প্রাকৃতিক চক্র।

তথ্য সূত্র ঃ

1. Went. F. W. The Plants. Time-life international (Netherland). p. 94, 1968.
2. Raven. R. H. Biology of Plants, 3rd ed. Worth Publishers inc, New York, p. 529. 1981.

www.bjilibrary.com

٩٦- فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ
ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ○

৬ ঃ ৯৬ তিনিই উষার উন্মেষ ঘটান, তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত আর গণনার জন্য সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন, এই সবই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিরুপণ।

ভূপৃষ্ঠের যে কোন স্থানে (মেরু অঞ্চলসমূহ বাদে) রাত ও দিনের আবির্ভাব ঘটে পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারদিকে আহ্নিক গতির কারণে। এই ঘূর্ণন চলাকালে যে কোন মুহূর্তে পৃথিবীর অর্ধাংশ সূর্যালোকে আলোকিত থাকে এবং যে সময়কাল ধরে এ অংশ আলোকিত থাকে তাকে ঐ অংশের দিন বলা হয়। একই সাথে, পৃথিবীর অপর অর্ধাংশ কোন সূর্যালোক পায় না, যার ফলে আঁধারে নিমজ্জিত থাকে। আর যে সময়কাল ধরে ঐ অংশ অন্ধকার থাকে তাকে ঐ অংশের রাত বলা হয়। ঘূর্ণন যেহেতু চলতে থাকে সেহেতু একই স্থানে পর্যায়ক্রমে রাত ও দিন আসে। রাত্রি থেকে দিবসে সংক্রমণ এবং এর বিপরীত ক্রম ঘটে ক্রমান্বয়ে, আকস্মিকভাবে নয়।

সূর্যরশ্মি যখন ক্রমান্বয়ে রাতের অন্ধকার ভেদ করতে থাকে এবং বলতে গেলে আঁধার কেটে ফেলে তখনই ঘটে ভোরের আবির্ভাব। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লাহ্ পৃথিবী ও সূর্যকে যে সকল শক্তির অধীন করে দিয়েছেন সেগুলোর কারণেই ঊষা আসে। অন্য কথায়, আল্লাহ্ই রাতের আঁধার কেটে ভোরের আগমন ঘটান।

দিবসের ক্লেশকর খাটুনির পর রাতে অন্ধকারের আবরণে ব্যাপক নিরবতা-নিস্তব্ধতা নেমে আসলে আমরা বিশ্রাম গ্রহণ করি। আমরা ঘুমিয়ে পড়ি এবং পরদিন সকাল বেলায় পরিপূর্ণ সজীবতার সাথে জেগে উঠি, ক্লান্তি তখন একদমই থাকে না। এর ফলে, আমরা নতুন উদ্যমে আগামী দিনটির মোকাবিলা করতে সক্ষম হই। কাজেই, আমরা বলতে পারি যে, আল্লাহ্ রাত্রি বানিয়েছেন আমাদের বিশ্রাম, উদ্যম পুরুদ্ধার আর শান্তি-স্বস্তির সময়কাল হিসেবে।

সূর্য ও চন্দ্র সময় গণনার জন্য ঃ আয়াতটির এ অংশে আল্লাহ্ বলছেন যে, সূর্য ও চাঁদকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কাজকর্মের সময় গণনার সুবিধার্থে। সময়ের তিনটি প্রাকৃতিক ইউনিট বা একক আছে, যথা ঃ দিন, মাস ও বছর। দিন ও বছর পরিমাপ করা হয় সূর্যের আপাত গতির দ্বারা আর মাস গণনা করা হয়ে থাকে চাঁদের আপাত গতির দ্বারা। এক সৌর দিবস হচ্ছে সেই পরিমাণ

www.bjilibrary.com

সময় যা সূর্যের সাপেক্ষে পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারদিকে একবার আবর্তন করতে প্রয়োজন হয়। অন্য কথায়, একটি নির্দিষ্ট উল্লম্ব বিন্দুকে সূর্যের আপাত ক্রম পরম্পরায় অতিক্রমণের জন্য যে সময় লাগে সেই সময়। এই সময়টা হতে পারে দু'টি পরপর সূর্যোদয়ের মধ্যকার সময়, কিংবা সূর্যাস্তের অথবা মধ্যাহ্ন রেখা অতিক্রমণের সময়। বৈজ্ঞানিকভাবে সৌর দিবস বলতে সূর্যের পরপর দু'টি নিম্ন গমন মধ্যকার সময়কালকে বুঝায় অর্থাৎ কুবিন্দু বিশিষ্ট অংশে সূর্যের মধ্যাহ্নরেখা অতিক্রমণ। ধ্রুবতারার সাপেক্ষে পৃথিবীর আবর্তনকালকে বলা হয় নাক্ষত্র দিবস। এক নাক্ষত্র দিবস সৌর দিবস অপেক্ষা চার মিনিট ছোট এবং শুধুমাত্র জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক উদ্দেশ্যেই এটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সৌর দিবস আবার দু'টি প্রাকৃতিক অংশে বিভক্ত, যথা ঃ দিবাভাগ এবং নৈশভাগ। যে সময়কালে সূর্য দিগন্ত রেখার উপরে অবস্থান করে তা হচ্ছে দিন আর যে সময় ধরে সূর্য দিগন্ত রেখার নিচে থাকে তা-ই রাত। সাধারণভাবে মানুষ দিবাভাগে কাজকর্ম করে এবং নৈশকালীন সময়ে বিশ্রাম নেয়। দিনকে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সময় মাপার জন্য কৃত্রিমভাবে ঘন্টা, মিনিট ও সেকেন্ডের মত উপবিভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে।

সূর্য যেহেতু ক্রান্তিবৃত্ত বরাবর বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গতিতে পরিক্রমণ করে বলে মনে হয়, সেহেতু একটা কল্পিত সূর্য আছে বলে ধরে নেয়া হয় (মান সূর্য নামে), যা বিষুবরেখা বরাবর একই গতিতে চলে বলে অনুমিত হয় এবং প্রকৃত সূর্যের সারা বছরের গড় গতির সমান। মান সূর্যের পরপর দু'টি পরিক্রমণ তুঙ্গীর মধ্যকার সময়কাল মান দিবস হিসেবে পরিচিত। মান সূর্য অনুযায়ী পরিমাপকৃত সময় মান সময় হিসেবে পরিচিত।

চাঁদও একটি বিশিষ্ট সময় নিয়ন্ত্রক। চাঁদের কলা অবশ্যম্ভাবীরূপে অধিকাংশ ধর্মীয় কর্ম তৎপরতা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সূর্যের সাপেক্ষে চন্দ্রের কোন একটা নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে শূন্যমন্ডলীতে প্রদক্ষিণ করতে করতে পুনরায় ঐ একই আপেক্ষিক অবস্থানে আসতে যে সময় লাগে অর্থাৎ পর পর দু'টি নতুন চাঁদের মধ্যবর্তী সময়কে (কিংবা অন্য কোন কলা) যাজকীয় মাস বলা হয়ে থাকে। যাজকীয় বা চান্দ্র মাস গড়পড়তা ২৯ দিন ১২ ঘন্টা ৪৪ মিনিট ২.৮ সেকেন্ড দীর্ঘ হয়ে থাকে। এটা আমাদের পঞ্জিকা মাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। চন্দ্রের নাক্ষত্র মাস বলতে বুঝায় সেই সময়কে যা চাঁদের শূন্যমন্ডলে একটি নির্দিষ্ট তারকা পার হয়ে ঘুরে পুনরায় সেই একই তারকার নিকট চলে আসতে প্রয়োজন হয়। এটি গড়পড়তা ২৭ দিন ৭ ঘন্টা ৪৩ মিনিট এবং ১১.৫ সেকেন্ড দীর্ঘ।

সময়ের তৃতীয় এককটির হিসাব হচ্ছে বছর। এটি সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর আবর্তন গতি কিংবা রাশিচক্রের তারকাগুলোর মধ্যে সূর্যের আপাত গতি

www.bjilibrary.com

ভিত্তিক। এটি চিহ্নিত হয় ঋতু পরিবর্তন দ্বারা এবং রাতের আকাশে তারকাবাজির পরিবর্তনশীল নকশা এবং দিবাভাগে সূর্যের চলার গতিপথের পরিবর্তন দ্বারা। কোন ধ্রুবতারার সাপেক্ষে সূর্যের চারদিকে একবার প্রদক্ষিণ পূর্ণ করতে পৃথিবীর যে সময় লাগে তাকে বলা হয় নাক্ষত্র বর্ষ এবং মহাবিষুবীয় সময়কালকে (বসন্তকালে যখন দিন-রাত্রি সমান থাকে, অর্থাৎ ২১শে মার্চ) বলা হয় অয়নবৃত্তীয় বছর। এ দু'ধরনের বছরের মধ্যকার পার্থক্য ২০ মিনিট।

লক্ষ্য করা যায় যে প্রায় ১২টি যাজকীয় চান্দ্র মাসে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে একবার পূর্ণ প্রদক্ষিণ করে অর্থাৎ ১২টি যাজকীয় চান্দ্র মাসে প্রায় এক নাক্ষত্র বছর হয়। আসলে বার চান্দ্র মাস (১২ যাজকীয় চান্দ্র মাস) এক নাক্ষত্র বছর অপেক্ষা ১১ দিন কম।

এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্ সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন সময় গণনার জন্যে।

৯৭- وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ○

৬ ঃ ৯৭ **তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন যেন তাদ্বারা স্থলভাগ ও জলভাগের অন্ধকারে তোমরা পথ খুঁজে পাও; জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেছি।**

বাতিঘর হিসেবে তারকারাজি ঃ

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন যে, আসমানে তারকারাজি স্থাপন করা হয়েছে যেন তারা পথ দেখাতে পারে তাদেরকে যারা তারকারাজিকে চিনে এবং সঠিক পথ নির্দেশ করে তাদেরকে যারা সাগর ও মরুভূমির বিশালতা ও অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলে। এই নির্দেশনা যন্ত্রপাতি ও ছকের সাহায্যেও লাভ করা যায়, আবার এগুলো ছাড়াও পাওয়া যেতে পারে।

যন্ত্রপাতি ও ছকের সাহায্য ছাড়া ঃ পৃথিবীর যেহেতু নিজ অক্ষের চারদিকে আবর্তনশীল অক্ষটি যা উভয় দিকেই সম্প্রসারিত হবে ধরে নেয়া হয়, ভূ-গোলকের দু'টি বিন্দুতে ছেদ করে বলে মনে হয় যার একটি হচ্ছে উত্তর মেরু এবং অপরটি দক্ষিণ মেরু। পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে যদিও সমগ্র আকাশই আবর্তনশীল মনে হয়, এ দু'টি মেরু কিন্তু স্থির থাকে; কাজেই, কেউ যদি মেরু কী তা চেনে, তার পক্ষে উত্তর ও দক্ষিণ দিক জানাও সম্ভব। কিন্তু মেরুদ্বয়

যেহেতু কাল্পনিক বিন্দু মাত্র, সে কারণে তাদের সঠিক অবস্থান জানা সম্ভব নয়। এ মেরুদ্বয়কে জানা সম্ভব যদি সেখানে বা তার কাছাকাছি কোন তারকা থাকে। উত্তর মেরুর নিকটে মেরু থেকে প্রায় এক ডিগ্রী দূরে আলফা উরসাই মাইনরিস নামে একটি দ্বিতীয় স্তরের তারকা রয়েছে। এটি জনপ্রিয়ভাবে পোলারিস অর্থাৎ ধ্রুবতারা বা মেরু তারকা হিসেবে পরিচিত যা উত্তর গোলার্ধের যে কোন স্থান থেকে দৃষ্টিগোচর হয়। এই তারকাটি উরসা মাইনর বা ছোট ভল্লুক গ্রহপুঞ্জের লেজের ঠিক উপর বরাবর অবস্থিত। কাজেই গ্রহপুঞ্জটি এবং এই তারকাটি যারা চেনে তারা সহজেই উত্তর দিক এবং তা থেকে অন্য সবদিক চিনে নিতে পারে। দক্ষিণ মেরুতে এ ধরনের কোন তারকা নেই। তবে ক্রাক্স তথা দক্ষিণ ক্রস নামে পরিচিত একটি গ্রহপুঞ্জ এমনভাবে অবস্থিত যে, এর দীর্ঘতর হাতটি দক্ষিণ মেরুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। কাজেই, দক্ষিণ গোলার্ধের লোকদের জন্য এই গ্রহপুঞ্জটি দক্ষিণ দিক নির্ণয়ে দিক নির্দেশ করে এবং এথেকে অন্যান্য দিকেরও সন্ধান দেয়।

অন্য আরেকটা বিষয়ও সুস্পষ্ট। ভূমন্ডলীয় আকাশ যেহেতু আবর্তনশীল বলে মনে হয়, দৃশ্যত এর উপর আটকানো তারকাসমূহ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে বলে অনুমিত হয় এবং একই তারকার দল নির্দিষ্ট কোন স্থানে অবস্থান করে। এভাবে বিটা টাউরি (আল নাথ), বিটা জেমিনোরিয়াম (পোলাক্স), বিটা লিওনিস (ডেনেবোলা) তারকাগুচ্ছ সপ্তর্ষিমন্ডল এবং এ ধরনের আরো তারকাসমূহ মোটামুটি ঢাকা (বাংলাদেশ) বা এর আশপাশ দিয়ে বছরের বিভিন্ন দিনে ও সময়ে অতিক্রম করে যায়। একটা আলাদা তারকা নির্দিষ্ট একটা স্থান দিয়ে বিশেষ একটা দিনে এবং বিশেষ একটা সময়ে অতিক্রম করে। এভাবে বিটা জেমিনোরিয়াম প্রতি বছর ২৮শে মে সকাল ৯টায় মধ্যাহ্নরেখা পার হয়ে যায়। সাগর কিংবা মরুভূমির বিশালতায় বা অন্ধকারে শুধু যা করতে হবে তাহলো তার গন্তব্যের অবস্থানের দিক জানার জন্য তারকার দিকে তাকাতে হবে। তার যদি জানা থাকে তার গন্তব্যের উপর দিয়ে কোন্ দিকে কোন্ তারকা অতিক্রম করে তাহলে তাকে শুধু ঐ তারাগুলোর অতিক্রমণ দিক জানতে হবে (যা তিনি ধ্রুবতারা পর্যবেক্ষণ করে পাবেন) এবং একটা তারা মাথার উপরে না আসা পর্যন্ত ঐদিকে চলতে থাকতে হবে এবং তাহলেই তিনি তার গন্তব্যে পৌঁছে গেলেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, কেউ যদি তারকা চিনে, তাহলে তারকাই তাকে সাগর ও মরুভূমির অন্ধকার ও বিশালতায় গন্তব্যের সন্ধান দেবে।

যন্ত্রপাতি ও ছকের সাহায্যে ঃ সাগর ও মরুভূমির অন্ধকার ও বিশালতায় যন্ত্রপাতি ও ছকের সাহায্যে নিজের অবস্থান খুঁজে নেয়ার অন্যান্য আরো পদ্ধতি রয়েছে যা থেকে দিক নির্দেশনা পাওয়া যেতে পারে।

www.bjilibrary.com

মেরুর উচ্চতা পর্যবেক্ষণের স্থানের অক্ষাংশের সমান একথা সবারই জানা। কাজেই, একটা কোন পরিমাপকের সাহায্যে মেরুর উচ্চতা তথা পর্যবেক্ষণ স্থানের অক্ষাংশ পাওয়া যেতে পারে। তবে মেরুর অবস্থান জানাটাই দুরূহ। ধ্রুবতারা কিন্তু মেরুতে থাকে না, থাকে মেরু থেকে এক ডিগ্রী দূরে। এই এক ডিগ্রী মানে ভূপৃষ্ঠের উপর বিশাল বিস্তৃত এলাকা। কাজেই কোন স্থানের সর্বোচ্চ বিন্দু দিয়ে অতিক্রমকারী তারকার বিষুব লম্ব (তথা বিষুব রেখা থেকে ঐ তারকার কৌণিক দূরত্ব) লক্ষ্য করে অক্ষাংশ পাওয়া যায়। এভাবে ঐ স্থানের অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায়। দ্রাঘিমাংশ পরিমাপ করা হয় গ্রিনউইচের মধ্য দিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ রেখা থেকে এবং কোন তারকার গ্রিনউইচ এবং পর্যবেক্ষণস্থান অতিক্রমণের মধ্যে সময়ের যে পার্থক্য হয় তা দিয়েই দ্রাঘিমাংশ বের করা হয়। এ দু'টো সময়ের পার্থক্যকে যখন কৌণিক পরিমাপে রূপান্তরিত করা হয় তখন ঐ স্থানের দ্রাঘিমাংশ পাওয়া যায়। এর জন্যে দরকার একটা গ্রীনিচ মান সময় দানকারী ঘড়ি আর এমন একটা বর্ষপঞ্জি যা থেকে একটা নির্দিষ্ট তারকার পর্যবেক্ষণ স্থান এবং গ্রিনউইচ উভয় জায়গার মধ্যাহ্ন অতিক্রম করার সময় পাওয়া যায়।

আরো একটা পদ্ধতি আছে যা দ্বারা স্থলভাগ, সাগর কিংবা আকাশের কোন নির্দিষ্ট স্থানের অবস্থান নির্ণয় বা শনাক্ত করা যায়।

এ পদ্ধতিতে নিম্নোক্ত পরিভাষাগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে ঃ

১. ডেড্-রেকনিং পজিশন ঃ গতিবেগ, অতিক্রমণ বা প্রদক্ষিণকালীন সময়ের দৈর্ঘ এবং অতিক্রমণের দিক বা দিকসমূহ বিবেচনা করে যে অবস্থান পাওয়া যায় তা-ই ডেড-রেকনিং পজিশন বা অবস্থান হিসেবে পরিচিত।

২. জিওগ্রাফিক্যাল বা ভৌগোলিক অবস্থান ঃ কোন এক মুহূর্তে নির্বাচিত তারকার ঠিক নিচে অবস্থিত ভূ-পৃষ্ঠের বিন্দুই ঐ তারকার ভৌগোলিক অবস্থান হিসেবে পরিচিত।

৩. এ্যাজিউম্ড বা অনুমিত অবস্থান ঃ ডেড্ রেকনিং-এর নিকটবর্তী একটা অবস্থান যা সম্ভাব্য অবস্থান হিসেবে অনুমিত হয় তা-ই অনুমিত অবস্থান হিসেবে পরিচিত।

পুরো কার্যক্রম সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ সমন্বয়ে গঠিত ঃ

১. একটি অনুমিত অবস্থান (ধরা যাক জাহাজের) ডেড্-রেকনিং কিংবা অন্য কোন পদ্ধতিতে নির্বাচন করা যেতে পারে।
২. একটি তারকা (বা অন্য কোন মহাজাগতিক বস্তু) নির্বাচন ও এর উচ্চতা পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং পর্যবেক্ষণের সময় লিখে রাখতে হবে।

www.bjilibrary.com

৩. প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে তারকার দিগ্‌বলয় তথা ঐ তারকার ভৌগোলিক অবস্থানের চাপ নির্ধারণ করতে হবে। অনুমিত অবস্থানে ঐ তারকার হিসাবকৃত উচ্চতা বের করতে হবে।

৪. পর্যবেক্ষণকৃত ও হিসাবকৃত উচ্চতাসমূহ তুলনা এবং মিনিটে বৃত্তচাপের পার্থক্য পরিমাপ করতে হবে। তারপর চাপের সাথে সমকোণে অবস্থান লাইন (গ্রীষ্ম লাইন) আঁকতে হবে।

৫. দ্বিতীয় আরেকটা তারকার ব্যাপারে একই রকম কার্যপ্রণালী অনুসরণ করতে হবে। দু'টি গ্রীষ্মলাইনের ছেদবিন্দুই (অবস্থান লাইনসমূহ) জাহাজটির সঠিক অবস্থান।

প্রশ্ন করা হতে পারে, তারকাসমূহ দৃষ্টিগোচর না হলে কীভাবে নৌচলাচল করা হবে। আল্লাহ্ মানুষকে অন্যান্য আরো কার্যপদ্ধতি দান করেছেন যা ঐ ধরনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

٩٩- وَهُوَ الَّذِيٓ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا
مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ
دَانِيَةٌ وَجَنَّٰتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَٰبِهٍ ۗ انظُرُوٓا إِلَىٰ ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ
لَأٓيَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

৬ ঃ ৯৯ তিনিই আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তাদ্বারা আমি সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উত্থান করি; অতঃপর তাথেকে সবুজ পাতা উদগত করি, পরে তাথেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করি, এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করি। আর আঙ্গুরের উদ্যান সৃষ্টি করি এবং যায়তুন ও দাড়িম্বও; এরা একে অন্যের সদৃশ ও বিসদৃশও; লক্ষ্য কর এর ফলের প্রতি যখন এগুলো ফলবান হয় এবং এর পরিপক্কতা প্রাপ্তির প্রতি। মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য এর মধ্যে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন।

আল-কুরআনের এই অংশে, ইউসুফ আলী[১] যেমন বর্ণনা করেছেন, আক্ষরিক অর্থে এটি এত সুস্বাদু এবং আধ্যাত্মিক অর্থে এমন নিগূঢ় বা প্রগাঢ় খোদায়ী

www.bjilibrary.com

করুণাসমূহ যা নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করে সুবিধাজনকভাবে অধ্যয়ন করা যেতে পারে ঃ

১. আল্লাহ্ কর্তৃক আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ, ২. সকল প্রকার সবুজ গাছপালা ও শস্য ফলাদির বেড়ে উঠা, ৩. ঘন শস্যগুচ্ছের উৎপাদন, ৪. শীষ থেকে খেজুর গুচ্ছ ঝুলে থাকা, ৫. আঙ্গুর বাগান, ৬. জলপাই, ৭. দাড়িম্ব ফল, ৮. এসবের প্রতিটি প্রকারগতভাবে একই রকম কিন্তু জাতে ভিন্ন ভিন্ন, ৯. পক্ক ফল চক্ষুর জন্য তৃপ্তিদায়ক বা নয়ন জুড়ানো, এবং ১০. একটা অনুস্মারক যে, এ সকল প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে ঈমানদারদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।

আসমান থেকে বৃষ্টি ঃ

১. আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের বিষয়টি ২ ঃ ১৬৪ আয়াতের আলোচনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২. **সবুজ গাছপালা ঃ** বিষয়টি বৃষ্টিপাতের উপকারক প্রভাব সম্পর্কিত যার ফলে সবুজ গাছপালা বেড়ে উঠে। 'নাবাতা' = শব্দটি দ্বারা সাধারণভাবে গাছপালা বুঝান হয়ে থাকে যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সকল সবুজ উদ্ভিদ যাদের রয়েছে সবুজ তন্তুরঞ্জক ক্লোরোফিল বা পত্রহরিৎ যা তাদেরকে নিজেদের জন্য শর্করা জাতীয় খাবার তৈরি করতে সক্ষমতা প্রদান করে। তবে গাছপালার মধ্যে এমন কিছু ফলও অন্তর্ভুক্ত যারা পত্রহরিৎ বঞ্চিত, যেমন ছত্রাক ও অণুজীব। পৃথিবীর সবুজ বেষ্টনী বা আবরণের মধ্যে বেড়ে উঠা এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করে পানির বা আর্দ্রতার উপর যা অঙ্কুরোদগমের জন্য অপরিহার্য উপাদান এবং যা সালোক সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে এবং নতুন কুঁড়ি ও পল্লব উৎপাদন ত্বরান্বিত করে। উদ্ভিদ জগৎ অত্যন্ত বিশাল ও বিস্তৃত যাতে রয়েছে বৃক্ষরাজির মোট সাড়ে তিন লক্ষ বর্গ (species)। বিশাল এই উদ্ভিদ জগতকে ব্যাপক অর্থে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা ঃ সপুষ্পক উদ্ভিদ এবং অপুষ্পক উদ্ভিদ যারা অন্যান্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করে থাকে। সবুজ উদ্ভিদ আকার-আকৃতি ও গঠন-কাঠামোর দিক থেকে বহু প্রকারের হয়ে থাকে– আণুবীক্ষণিক এককোষী শৈবাল ক্লোরেলা থেকে শুরু করে ক্যালিফোর্নিয়াস্থ ১৭০ মিটার উচ্চতা ও ১১ মিটারের অধিক ব্যাস বিশিষ্ট সপুষ্পক উদ্ভিদ রেড্উড পর্যন্ত। মাশরুম বা ব্যাঙের ছাতা এবং রুটির ছাতার মত ছত্রাক আর আণুবীক্ষণিক অণুজীবের সবুজ তন্তুরঞ্জক ক্লোরোফিল না থাকায় শর্করা তৈরি করতে পারে না। এরা মৃত এবং পচনশীল বা ক্ষয়িষ্ণু জৈব বস্তু খেয়ে জীবন ধারণ করে কিংবা ধ্বংসকারক বা ক্ষতিকর কীট হিসেবে জীবদেহের উপর নির্ভর করে। এ সকল অসবুজ উদ্ভিদের বৃদ্ধিও আর্দ্রতার উপর নির্ভরশীল যা বৃষ্টিপাতের পর বৃদ্ধি পায়।

www.bjilibrary.com

৩. গুচ্ছ বা ঝাড় শস্যদানা ঃ দানাদার শস্য বা খাদ্যশস্য তৃণ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং মানুষ ও গৃহপালিত জীবজন্তুর খাদ্যের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। এগুলোর মধ্যে থাকে প্রধানত শর্করা এবং সেই সাথে কিছু আমিষ এবং খানিকটা খনিজ লবণ ও খাদ্য প্রাণ। তথাকথিত এই দানাদার শস্য আসলে তৃণ পরিবারের বৈশিষ্ট্যমূলক ফল যার বীজাবরণ ফলের দেয়ালগাত্রের সাথে মিশে থাকে। দানা বিশিষ্ট শস্যের অধীনে অসংখ্য প্রকার শস্য রয়েছে যার মধ্যে আছে গম, চাল, বার্লি, জোয়ার, ভুট্টা, জই ও রাই প্রধান। অত্র আয়াতে ঝাড় শস্যদানার উল্লেখ অত্যন্ত যথাযথ। কেননা, খাদ্যশস্যের শীষে শস্যদানার বিশেষ বৈশিষ্ট্যমূলক ঘন বাঁধন বা বিন্যাসের কারণে এটাই স্বাভাবিক।

৪. খেজুর ঃ আরবীয় খর্জুর বৃক্ষ (ফিনিক্স ড্যাক্টিলিফেরা) এক ধরনের ফলের গাছ। মধ্যপ্রাচ্যে সুপ্রাচীনকাল থেকে তথা কমপক্ষে খ্রিঃপূঃ তিন হাজার সাল থেকে এর চাষাবাদ হয়ে আসছে বলে রেকর্ড আছে। খেজুর গাছের গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক এবং উত্তর আফ্রিকা, আরব, ইরাক এবং ইরানের অধিবাসীদের বেশ বড় অংশ বেঁচে থাকার জন্য এর ফলের উপর প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। পুরুষ ও স্ত্রী খেজুর গাছ আলাদা এবং চাষীকে প্রতি ৫০ থেকে ১০০ স্ত্রীগাছের জন্য একটি মাত্র পুরুষ গাছ লাগাতে হবে। পুরুষ হোক কী স্ত্রী হোক, একটা ফুলের গুচ্ছে থাকে এক শতাধিক সরু সরু শীষ দ্বারা আবৃত শাখা যা ফুলগুলোকে কুঁড়ি অবস্থায় নিরাপদে রাখে। কৃত্রিম পরাগায়নের মাধ্যমে ফলের মোট বা ঝাঁকের উন্নয়ন সাধন সম্ভব। অধিকাংশ চাষী শীষ থেকে ফুল-পূর্ব শাখাসমূহ বের হওয়ার সময় পুরুষ ফুলের গুচ্ছ কেটে স্ত্রী ফুলের থোকাপূর্ণ শাখাগুলোর ভিতর লাগিয়ে দিয়ে এটা করে থাকে। খেজুর গাছ চারা লাগানোর ৪-৫ বছর পর থেকে ফল ধরা শুরু করতে পারে এবং ১৫ বছর পর পরিপূর্ণ ফল ধরে এবং ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত ফল দেয়া অব্যাহত রাখে। একটা ভাল ফল গুচ্ছে ৪০টির মত সূত্র থাকে, যার প্রতিটিতে থাকে ২৫-৩৫টি খেজুর। পাকা ফলের ভারে এ রকম ঘন ও ভারী থোকা স্বাভাবিকভাবে গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে যা না ফাটা পর্যন্ত চোখের জন্যেও আনন্দদায়ক। গাছ প্রতি গড়পড়তা বার্ষিক ১০০ পাউন্ড ফল হয় যা ভাল গাছের ক্ষেত্রে ১৫০ পাউন্ড পর্যন্ত হয়ে থাকে।[৩] প্রায় হাজার জাতের খেজুরকে মোটের উপর তিনটি বড় বড় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা ঃ ১. নরম খেজুর যাতে ৬০% চিনি বা শর্করা থাকে যা প্রাকৃতিকভাবে সংরক্ষণের জন্য যথেষ্ট। ইরাকে এই খেজুর ব্যাপকভাবে জন্মানো হয় এবং চাপ প্রয়োগে সঙ্কুচিত করে বিদেশে রপ্তানী করা হয়ে থাকে। ২. মধ্যম বা অর্ধ-শুষ্ক খেজুর যা নরম কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে সংরক্ষণের মত যথেষ্ট শর্করা বা চিনি যাতে থাকে না। এগুলো দ্রুত শুষ্ক হয় না এবং সাধারণত গাছ থেকেই

www.bjilibrary.com

সতেজ অবস্থায় খাওয়া হয়। ৩. শুষ্ক খেজুর যা একদম শক্ত এবং এমনকি পাকা অবস্থায়ও আঠালো নয়। এগুলোকে গাছেই শুকাতে দেয়া হয় এবং গাছে যখন ফল থাকে না তখন জমা করে রাখা যায়। খেজুর উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহে এ ধরনের খেজুরের উচ্চ মূল্য রয়েছে। এ সকল খেজুরের প্রধান পুষ্টি মূল্য রয়েছে এর উচ্চ হারে চিনি বা শর্করা উপাদানে যার পরিমাণ নরম খেজুরে ৬০% ভাগ থেকে কোন কোন শুকনো খেজুরে ৭০% ভাগ পর্যন্ত হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে কিছু পরিমাণ এ-১, বি-১ এবং বি-২ খাদ্যপ্রাণ এবং নিকোটিনিক এসিডও রয়েছে।

৫. আঙ্গুর বাগান ঃ ভিটিস ভিনিফেরা (vitis vinifera) এবং এর অনেক জাতই মরুদ্রাক্ষা, মদ্যদ্রাক্ষা এবং শুষ্ক করে রাখার মত জাত তথা কিশমিশ, মনাক্কা এবং সুলতানার উৎস। প্রাচীন কাল থেকে আঙ্গুর অন্যতম চাষাবাদকৃত গাছ যা প্রাচীন মিশরে ছয় সহস্রাধিক বছর ধরে পরিচিত। প্রচুর চিত্রকর্মে ও প্রাচীন মিশরের কবরস্থানসমূহে এর প্রতিনিধিত্বমূলক অঞ্চলে যা স্বপ্রমাণিত যেখানে মদ্য প্রস্তুতের বিভিন্ন পদ্ধতি পূর্ণরূপে চিত্রিত হয়েছে। বিভিন্ন জাতের আঙ্গুরকে যে সকল ভাগে ভাগ করা যায় তাহলো ঃ মদ্য আঙ্গুর, মরু আঙ্গুর, ঘরে বা বাইরে জন্মানো আঙ্গুর, কালো বা সাদা কিংবা শুকনো আঙ্গুর। মরু আঙ্গুরের রয়েছে বিশেষ স্বাদ, রসালোতা ও ঘ্রাণ এবং এগুলো অম্বর-সবুজ থেকে নীলাভকৃষ্ণ রঙের হয়ে থাকে। মদ্য-আঙ্গুরের মধ্যে কোন কোন জাত হলুদাভ সবুজ, কতকগুলো লালচে কালো, নীলাভ-কালো কিংবা সবুজ যাদের আবার 'সাদা'ও বলা হয়ে থাকে। শুষ্ক আঙ্গুরের মধ্যে রয়েছে মনাক্কা যা আঙ্গুর গাছেই শুকানো হয়, ছোট ছোট বিচিবিহীন সুলতানা এবং ছোট ছোট কালো ফলজাত থেকে প্রাপ্ত কিশমিশ। আঙ্গুর গাছ লতানো কিংবা বেয়ে উঠা ধরনের গাছ যাতে খুঁটি বা মাচায় ভর দিয়ে বেড়ে উঠার ব্যবস্থা করতে হয়। ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহে ব্যাপক দ্রাক্ষাক্ষেত রয়েছে কেননা অত্রাঞ্চলে আঙ্গুর গাছের বৃদ্ধি এবং ফলোৎপাদনের পক্ষে রয়েছে সহায়ক জলবায়ুগত পরিবেশ।

৬. জলপাই ঃ মানুষ এবং সভ্যতার ক্রম বিকাশের ধারায় জলপাইয়ের (অলিয়া ইউরোপিয়া) মত অন্য কোন বৃক্ষই এত ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত নয়। মধ্যপ্রাচ্যের মানুষের কাছে জলপাই সমৃদ্ধি, খোদায়ী রহমত, সৌন্দর্য, প্রাচুর্য আর শক্তির প্রতীক। এ গাছের ফল প্রাচীনকাল থেকেই শুধু ফল হিসেবেই নয়, বরং ভোজ্য তেলের উৎস হিসেবেও গুরুত্ব লাভ করে আসছে। এর তেল বাতিতেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাছাড়া প্রলেপ হিসেবে এবং চিকিৎসা ও সৌন্দর্যবর্ধক হিসেবে আরো অনেক উদ্দেশ্যে ব্যবহার হয়। ভোজ্য তেল হিসেবে জলপাইয়ের ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে প্রধানত রান্নাবান্নার কাজে, সালাদের উপাদান হিসেবে এবং মাছ টিনজাত করার কাজে। ফল প্রথমদিকে থাকে সবুজ এবং পরে পাকলে

www.bjilibrary.com

ঘন নীল বা লালচে বেগুনী রং ধারণ করে। পরিপুষ্ট হলে ফল সাধারণত লবণাক্ত পানিতে জারিত করা হয়। বিভিন্ন খাবারে জলপাইয়ের ব্যবহার অনেক, বিশেষত ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহের আঞ্চলিক রান্নাবান্নায়। গৃহে যত্নের সাথে পরিচর্যা করা হলে জলপাই পূর্বতন জাত বা বংশের গাছের তুলনায় অধিকতর বড় আকারের এবং উচ্চ মাত্রার তৈল উপাদান সমৃদ্ধ ফল দিয়ে থাকে।

৭. **দাড়িম্ব (পিউনিকা গ্রানাটাম)** ঃ প্রাচীনকালে মেসোপটেমিয়া ও মিশরে দাড়িম্বর কদর ছিল অত্যন্ত উঁচুদরের। ইয়াহুদী রাজা হযরত সোলায়মান (আ)-এর এক পরিপূর্ণ দাড়িম্ব বাগান ছিল বলে কথিত আছে। দাড়িম্ব বা ডালিম একটা শক্ত, ঘন বহিরাবরণ বিশিষ্ট জামফল বিশেষ, যা শক্ত বৃত্তাংশ দ্বারা আবৃত এবং যার ভিতরভাগ কয়েকটি আলাদা অংশে বিভক্ত থাকে। প্রতিটি অংশে গোলাপী কিংবা রক্তিম অম্ল-মিষ্ট শাঁসে বসানো থাকে বেশ কিছু সংখ্যক বীজ। পক্ক ফল উজ্জ্বল কমলা-লাল রং ধারণ করে। বীজের রস ঠান্ডা পানীয় তৈরিতে এবং এক প্রকার মদ তৈরিতেও ব্যবহৃত হয় এবং বিপুল সংখ্যক বীজের কারণে ডালিম উর্বরতার প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

৮. **সদৃশ অথচ ভিন্ন** ঃ একই বর্গীয় সকল সদস্য অন্য সকল বর্গের সদস্য থেকে শনাক্তযোগ্যরূপে আলাদা হয়ে থাকে যাতে বিভিন্নতার ধারাবাহিকতায় ছেদ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সদৃশ সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট প্রতিটি বর্গের অভ্যন্তরে সম্প্রদায় বা জাতের মধ্যে কিছু পরিমাণে ভিন্নতা থাকে যা সচরাচর প্রাকৃতিক কিংবা কৃত্রিম উপায়ে সমগোত্রীয় বংশ বৃদ্ধির ফল। বিভিন্ন বংশ বা জাতকে তাদের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চিরস্থায়ী করা যেতে পারে যদি না তাতে অন্য বর্গীয় বংশগতি বিষয়ক কোন বস্তুর মিশ্রণ ঘটে যায়। এভাবে খাদ্যশস্য, খেজুর, আঙ্গুর, জলপাই এবং ডালিমের আলাদা আলাদা বর্গ পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র। অথচ তাদের প্রত্যেকের বর্গীয় শ্রেণী-বিন্যাসের ভিতরে বিভিন্নতা রয়েছে; এর প্রতিটি জাত আবার ফলদানের সময় আকার, ফলের উৎপাদন এবং পরিপক্ক হতে যে সময় লাগে তা দিয়ে চিনতে পারা যায়। ফলবান গাছের মধ্যে বিভিন্ন বর্গ কিংবা জাতের ফলের রসের এবং ফল ও বীজের মধ্যকার তেলের উপাদানের মধ্যেও আবার আকার, আকৃতি, রং, সার বা ঘনত্ব, স্বাদ ও ঘ্রাণের বিভিন্নতা ঘটে থাকে।

৯. **পক্ক ফল** ঃ পাকা ফলে যে আকর্ষণীয় রঙ বৈচিত্র্য দেখা যায় তা উদ্ভিদ কোষ রসে একক বা যুক্তভাবে বিভিন্ন অনুপাতে বিদ্যমান বিভিন্ন উদ্ভিদ তন্তুরঞ্জক বস্তুর উপর নির্ভরশীল। পত্রহরিৎ হচ্ছে সেই তন্তুরঞ্জক যা কিছু কিছু জাতের আঙ্গুরে সবুজ রং দিয়ে থাকে। তবে এটি উদ্ভিদে যে হাজার হাজার তন্তুরঞ্জক পাওয়া যায় তন্মধ্যে অন্যতম মাত্র।

www.bjilibrary.com

ক্যারোটিনয়েড নামে পরিচিত দ্বিতীয় আরেক ধরনের তন্তুরঞ্জক লেবু-হলুদ থেকে শুরু করে টমেটো পর্যন্ত লাল রঙের কমপক্ষে ৬০ ধরনের যৌগের মধ্যে পাওয়া যায়। তৃতীয় আরেক রং পরিবার রয়েছে যারা তৈরি হয় এন্থোসিয়ানিন তন্তুরঞ্জক দ্বারা যাদের রং গাঢ়তার দিক থেকে একেবারে ফিকে লাল থেকে টকটকে লাল পর্যন্ত হয়ে থাকে। এন্থোসিয়ানিন গ্রুপের রংগুলো কোষরসের অম্লতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তারা অম্লে লাল, নিরপেক্ষ অবস্থায় বেগুনী এবং ক্ষারীয় মাধ্যমে নীল, খাঁটি লাল রং অত্যন্ত দৃষ্টি আকর্ষক এবং পাখি ও মানুষসহ স্তন্যপায়ীদের আকৃষ্ট করে। কাজেই, এটা কোন সমাপতন নয় যে, অধিকাংশ পাকা ফলের রঙেই লালের এত আধিক্য ও প্রভাব। ধরে নেয়া যায়, বীজ ছড়িয়ে দেয়ার কাজে সহায়তার জন্যেই এ সকল রঞ্জক পদার্থ পাখি ও জীবজন্তুকে আকৃষ্ট করতে সাহায্য করে। ফল পাকার সাথে রঙের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে উদ্ভিদ এই সংকেতই দেয় যে, ফল ভক্ষণের জন্য প্রস্তুত। পাখি, অন্যান্য জীবজন্তু এবং মানুষ কর্তৃক ফল ভক্ষণ বীজের বিস্তার ও উদ্ভিদ জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার একটা মাধ্যম বিশেষ।

১০. কুরআনের এই অংশে সুস্পষ্ট প্রাকৃতিক বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যা সচরাচর আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় এবং সেই সাথে আমাদেরকে গভীর পর্যবেক্ষণ করতে বলা হয়েছে সর্বশক্তিমানের করুণার বিষয়ে। সবুজ গাছপালা ও পরিবেশ সৃষ্টিতে, শস্যদানা এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদনে বৃষ্টির গুরুত্বের উপর জোর দেয়া হয়েছে। উপরে প্রদত্ত দৃষ্টান্তসমূহের উপর গভীরভাবে চিন্তা করলে, বিশেষ করে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে, কীভাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি ফল বর্গ অসংখ্য জাতসহ মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করেছেন এবং পাকা ফলসমূহের আকর্ষণীয় রং শুধু যে তারা ভোগের জন্য প্রস্তুত সেটারই ইঙ্গিত করে তা নয় বরং এ প্রক্রিয়ায় তাদের বর্গকে চিরস্থায়ী করার জন্য তাদের বীজকেও ছড়িয়ে দেয়া হয়। সত্যিই আল্লাহ্র এ সমস্ত নিদর্শন মু'মিন পুরুষ ও নারীকে আহবান করে তারা যেন আল্লাহ্র দান নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করে এবং তাঁর প্রদত্ত রিযিকের জন্য কৃতজ্ঞ থাকে।

তথ্য সূত্র ঃ

1. Yusuf Ali. A., The Holy Quran_Text, Translation and Commentary. p. 318, 1938.
2. Raven. P. H. and Evert. R. F., Biology of Plants. 3rd ed., Worth Publishers Inc. New York. p. 341, 1981.
3. Masefield, G. B., Wallis, M., Harrison, S. G. and Nicolson. B. E. The Oxford Book of Food plants, Oxford University Press, p. 106, 1969.

www.bjilibrary.com

١٠١- بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ؕ

৬ ঃ ১০১ তিনিই আস্‌মান ও যমীনের স্রষ্টা।

এ আয়াতটি ২ ঃ ১১৭ ও ২ ঃ ১৬৪ আয়াতদ্বয়ের আলোচনায় বিবেচনা করা হয়েছে।

١١٩- وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ؕ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ○

৬ ঃ ১১৯ তোমাদের কী হয়েছে যে, যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয়েছে তা তোমরা আহার করবে না? যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বিবৃত করেছেন, তবে তোমরা নিরুপায় হলে তা স্বতন্ত্র। অনেকে অজ্ঞানতাবশত নিজেদের খেয়াল-খুশী দ্বারা অবশ্যই অন্যকে বিপথগামী করে; তোমার প্রতিপালক সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

আল্লাহ্ এ আয়াতে আল্লাহ্‌র নামে নিহত জন্তুর গোশত খাওয়ার হুকুমের যথার্থতা প্রতিপন্ন করছেন যেহেতু তিনি নিষিদ্ধ খাদ্য সম্পর্কে ইতিপূর্বেই বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন যা ২ ঃ ১৭৩ আয়াতের আলোচনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

١٣٩- وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰى أَزْوَاجِنَا ۚ
وَإِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءُ ؕ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ؕ إِنَّهُ حَكِيمٌ
عَلِيمٌ ○

৬ ঃ ১৩৯ এবং তারা বলে ঃ এই জন্তুগুলির গর্ভে (পেটে) যা কিছু আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্ধারিত (রক্ষিত) এবং আমাদের

www.bjilibrary.com

স্ত্রীদের জন্য এটা নিষিদ্ধ। কিন্তু যদি বাচ্চাটি মৃত প্রসব হয় তবে তা নারী পুরুষ সবাই খেতে পারবে। এইসব কথা যারা রচনা করেছে এর প্রতিফল আল্লাহ্ অবশ্যই তাদেরকে দেবেন, নিঃসন্দেহে তিনি বিজ্ঞ এবং সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল।

এখানে জাহেলী যুগে আরবদের মধ্যে খাদ্য সম্পর্কে বহু কুসংস্কারের একটি যা আল্লাহ্ একে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করেছেন।

ওরা কোন মানত করা প্রাণীর বেলায় ঘোষণা করত যে এই প্রাণীর পেটে যে বাচ্চা আছে তা শুধু পুরুষরাই খাবে মেয়েরা এর অংশ পাবে না। কিন্তু যদি মৃত বাছুর প্রসব করে বা প্রসবের পর মরে যায় তবে তা নারী পুরুষ উভয়েই খেতে পারবে।

বলাবাহুল্য এটা একটা হাস্যকর ও নিন্দনীয় সংস্কার যা নিষিদ্ধ হওয়াই যুক্তি সঙ্গত। তাই আল্লাহ এই আয়াতে তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

١٤١- وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۭ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ
وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ڮ وَلَا تُسْرِفُوْا ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝

৬ ঃ ১৪১ তিনিই লতা ও বৃক্ষ উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট খাদ্যশস্য, যায়তুন ও দাড়িম্বও সৃষ্টি করেছেন– এরা একে অপরের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন এসব ফলবান হয় তখন এদের ফল আহার করবে আর ফসল তুলবার দিনে এসবের জন্য দেয় কর প্রদান করবে এবং অপচয় করবে না, কারণ, তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।

অধিকাংশ বৃক্ষেরই দৃঢ় খাড়া কান্ড থাকে যা শাখাপ্রশাখা ও পাতার ভার বহন করে। কিন্তু কতক গাছের আবার থাকে দুর্বল কান্ড যা শাখা-প্রশাখার ভার সচরাচরের মত সোজাভাবে বহন করার মত যথেষ্ট দৃঢ় নয়। স্বাভাবিকভাবেই, এ সকল গাছ মাটির উপর নুইয়ে বা লুটিয়ে থাকে। কিন্তু জীবন ধারণার্থে আলোতে পৌছবার জন্য এদেরকে অন্যান্য অনুষঙ্গী গাছের প্রত্যেকের সাথে বিশেষ পন্থায় অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ গাছের উপর নির্ভর করে কিংবা তার উপর ভর দিয়ে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হয়। শেকড় গেড়ে মাটি থেকে নিজকে উপরে

www.bjilibrary.com

তোলার পর এরা কুন্ডলী পাকাতে পারে কিংবা যে গাছের উপর ভর দিয়ে উঠছে সেটারই মাথায় উঠে যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এ কাজে আকর্ষি, কাঁটা বা আঙটা নামে পরিচিত বিশেষায়িত অঙ্গের সহযোগিতা গ্রহণ করে। এ ধরনের গাছ চাষাধীন থাকলে গাছের অভ্যাসের উপর ভিত্তি করে খুঁটি, মাচা এবং বিভিন্ন প্রকারের জাফরি কার্বন চালনি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর গাছের মধ্যে রয়েছে আঙ্গুর গাছ, বিভিন্ন প্রকার শিম, মটর, অনেক জাতের লাউ ইত্যাদি। যেসব গাছের নিজের ভার বহন করার মত দৃঢ় কান্ড আছে তাদের মাচার দরকার হয় না।

বিভিন্ন প্রকার শস্য ঃ এঞ্জিওস্পার্ম তথা সপুষ্পক উদ্ভিদ আমাদের খাদ্যের প্রধান উৎস। দু'টি উদ্ভিদ পরিবার আমাদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বহ। এদের প্রথমটি হচ্ছে তৃণ পরিবার; আর আমাদের সকল খাদ্যশস্যই এ পরিবারের সদস্য যার উপর মানবজাতির অধিকাংশই তাদের প্রধান খাদ্যের জন্য সর্বদাই নির্ভর করে এসেছে। এ পরিবারের প্রধান প্রধান সদস্যের মধ্যে রয়েছে ঃ গম, বার্লি, ধান, এবং ভুট্টা। এরা হচ্ছে শর্করা প্রদানকারী সুবিধাজনক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। অন্য যে পরিবারটির উপর মানুষ ব্যাপকভাবে নির্ভর করে সেটি হচ্ছে মটর পরিবার। এটি ডাল প্রদান করে থাকে যা উচ্চ আমিষ উপাদানের কারণে মূল্যবান। অধিকন্তু নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে গোলাপ পরিবার গুরুত্বপূর্ণ যা আপেল, নাশপাতি, কুলবরই, চেরী, খুবানি, বাদাম, পীচ (জাম জাতীয় ফল বিশেষ) ইত্যাদি ফল প্রদান করে থাকে। সরিষা পরিবার দেয় বাঁধাকপি ও ওলকপি (শালগম) জাতীয় সব্জি এবং সরিষাদানা ও মূলার মত হরেক রকম শাকসব্জি। গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে তাল-খেজুর পরিবার গুরুত্বপূর্ণ যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে খেজুর, নারিকেল, সাগু, তাল, সুপারি এবং পাম অয়েল ইত্যাদি। এ সকল পরিবার বা গোত্র ছাড়াও আরো কিছু গোত্র রয়েছে যেমন বেগুন গোত্র যা চোখে পড়ার মত হরেক জাতের খাদ্যশস্য দিয়ে থাকে যথা ঃ আলু, টমেটো, এবং মরিচ। আর কমলা গোত্রীয় সদস্যদের মধ্যে রয়েছে সাইট্রাস ফলসমূহ যা 'সি', ভিটামিন সমৃদ্ধ। সপুষ্পক উদ্ভিদের আরো কিছু গোত্র রয়েছে যা খাদ্যশস্য হিসেবে চাষাবাদ করা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'ভিটাসি' গোত্রীয় আঙ্গুর, 'ওলিয়াসি' গোত্রীয় জলপাই 'কনভোলভুলাসি' গোত্রীয় মিষ্টি আলু এবং 'পিউনিক্যাসি'গোত্রীয় দাড়িম্ব ফল বা ডালিম।

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ আল্লাহ্ প্রদত্ত অফুরন্ত রিযিকসমূহের মুষ্টিমেয় কয়েকটি হাতে গোনা দৃষ্টান্ত মাত্র।

জলপাই, দাড়িম্ব সদৃশ অথচ ভিন্ন ঃ এ বিষয়টি ৬ ঃ ৯৯ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

١٤٥- قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ
مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ
اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৬ ঃ ১৪৫ (হে মুহাম্মদ) বলুন যে আমার নিকট যে অহী এসেছে তাতে এমন কোন কথা পাই না যা খাদ্য বস্তুকে হারাম ঘোষণা করে তবে যদি মৃত প্রাণী হয়, প্রবাহিত রক্ত কিংবা শূকরের মাংস হয় তবে তা নিষিদ্ধ। কারণ সেটা নাপাক জিনিস অথবা যদি সেটা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো নামে হত্যা করা হয় তবে তাও নিষিদ্ধ। তবে কোন ব্যক্তি যদি নিতান্ত বাধ্য হয়ে খায়, কোনরূপ নাফরমানির ইচ্ছা ছাড়া এবং প্রয়োজনের বেশী (পেট পুরে) না খায় তবে নিশ্চয়ই তোমাদের রব্‌ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

হালাল প্রাণী যবেহ্‌ করার পদ্ধতিতে যে সব প্রকারের হত্যা নিষিদ্ধ এবং যে সব খাদ্য হারাম যেমন মৃত প্রাণীর রক্ত, শূকরের মাংস এবং বলি দেওয়া প্রাণী ইত্যাদি সম্পর্কে ২ ঃ ১৭৩ আয়াতের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই আয়াতে রক্ত বলতে যে প্রবাহিত রক্ত বুঝায় তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। সুতরাং যবেহ্‌ করার সময় যে রক্ত বের হয় তাই হারাম। এতে বুঝা যায় যে গোশ্‌ত ও বিভিন্ন অংশে (যেমন ফুসফুস, যকৃৎ, প্লিহা ইত্যাদি) রক্ত থেকে গেলে তা হারাম হবে না।

٤- وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ○

৭ ঃ ৪ কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি! আমার শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছিল রাত্রিতে অথবা দ্বিপ্রহরে যখন তারা ছিল বিশ্রামরত।

অত্র আয়াতে আল কুরআন এমন সব শহরের কথা বলছে যেগুলোকে রাতের বেলায় কিংবা মানুষ যখন বিকেল বেলায় বিশ্রামরত থাকে সে সময়ে ধ্বংস করা হয়েছিল।

www.bjilibrary.com

কোন্ কোন্ শহর ধ্বংস করা হয়েছিল, ধ্বংসপ্রাপ্ত সেই লোকেরাই বা কারা কিংবা কী কারণে এই শাস্তি নেমে এসেছিল– এসব কিছুরই উল্লেখ করা হয়নি। অবশ্য ঐ সূরায় জাতি এবং শহর-নগর ধ্বংসের কারণ হিসেবে বিভিন্ন অপরাধের উল্লেখ রয়েছে। যথা ঃ– ১. হযরত নূহ (আ)-এর আমলে (আয়াত ৭ ঃ ৬৪) প্লাবন দ্বারা; ২. আদ জাতির ধ্বংস (আয়াত ৭ ঃ ৬৫) নেমে এসেছিল ঝড়-ঝঞ্ঝা দ্বারা (আয়াত ৫৪ ঃ ১৯, ৬৯ ঃ ৬-৭); ৩, ছামূদ জাতি ধ্বংস হয়েছিল (আয়াত ৭ ঃ ৭৮) ভূমিকম্প এবং তৎসঙ্গে ঘূর্ণিবাত্যা দ্বারা (আয়াত ৫৪ ঃ ৩১); ৪. হযরত লূতের (আ) জাতি ধ্বংস হয়েছিল গন্ধক বৃষ্টি ও ভূমিকম্প দ্বারা (আয়াত ৭ ঃ ৮৪, ১১ ঃ ৮২); এবং ৫. মাদিয়ানবাসী (আয়াত ৭ ঃ ৯১) ভূমিকম্প দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

যেহেতু যে সকল স্থান হযরত নূহ (আ) এবং হযরত লূত (আ)-এর এলাকা হিসেবে মনে করা হয়ে থাকে সে সকল স্থান বাদে অন্য কোথাও ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালানো হয়নি, সেহেতু কুরআনে উল্লিখিত এ সকল ঘটনাবলীর স্থান এবং ধ্বংসের মাত্রা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না।

ভূতত্ত্ববিদগণের মতে, নূহ (আ)-এর সময়কার প্লাবনটি পারস্য উপসাগরের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে চারশ' মাইল দীর্ঘ এবং একশ' মাইল প্রস্থ বিশিষ্ট এলাকা গ্রাস করেছিল। মানব বসতির চিহ্ন আছে এমন ভূ-স্তরের বয়স হিসেব করে তারা মনে করেন যে, সেই মহাপ্লাবন সংঘটিত হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব চার হাজার সালের দিকে।[১]

হযরত লূত (আ)-এর কওমের ধ্বংসকৃত শহরের নাম সূরা নজমের ৫৩ আয়াতে বলা হয়েছে 'আল মু'তাফিকা' যা হিব্রুতে 'মাহ্‌বেকা' এবং বাইবেলে 'সডোমি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

সম্প্রতি লূত (আ)-এর জাতির শহর হিসেবে পরিচিত সডোম ও গোমোর্‌রাহ্ শহরে ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালানো হয় এবং বর্তমানে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছা গেছে যে, এ সকল শহরে ডেড্‌সী তথা মৃত সাগরের যে অংশে ধীরে ধীরে পানি বাড়ছে তার নিচে রয়েছে এবং তাদের ধ্বংস সম্পন্ন হয়েছিল খ্রিঃ পূঃ ১৯০০ সালের দিকে এক মহা ভূমিকম্পের দ্বারা যার সাথে ছিল বিস্ফোরণ, বিদ্যুতের চমকানি, প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রবাহ এবং প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড।[৩]

খ্রিঃ পূঃ ৭১৫ সালের সার্গোনীয় শিলালিপিতে উল্লেখ রয়েছে যে, পূর্ব ও মধ্য আরবের জাতিসমূহের মধ্যে ছামূদ ছিল আসিরীয়দের অধীন। ছামূদের পতন হয়েছিল সম্ভবত আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ড বিস্ফোরণের কারণে। যার ফলে আরবে 'হার্‌রা' নামে কমবেশী ব্যাপক-বিস্তৃত লাভাক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছিল।[৪]

এগুলো ছাড়াও ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান বহু হারানো শহর সম্পর্কে তথ্যাদি দিয়ে যাচ্ছে। এ সকল হারিয়ে যাওয়া শহরের মধ্যে সুপরিচিত কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ বেবিলন ও নিনেভেহ, পাকিস্তানের হরপ্পা ও মহেনজোদারো, ইতালীর পমপেই,

শ্রীলঙ্কার পলুন্নারুয়া, এশিয়া মাইনরের হিট্টিট্‌স-এর রাজধানী হেলুসাস, মায়াসের (গুয়াতেমালা ও ইউকাতান উপদ্বীপ) চিচেন-ইত্‌বা, ইনকাসের উরবাম্বার মাকচু পিয়েচা। পাকিস্তানের মহেনজোদারো এবং ইতালীর পমপেই বাদে এ সকল শহরের ধ্বংসের কারণ আজও জানা যায়নি।

পুরুষ, নারী এবং শিশুদের অসম বা এলোমেলোভাবে জড়ানো কঙ্কাল, তরবারি কিংবা কুঠারের আঘাতে কাটাচিহ্ন– মহেনজোদারোতে আবিষ্কৃত এ ধরনের নিদর্শনাদি প্রমাণ করে যে, শহরটি আক্রান্ত হয়েছিল এবং মানুষকে সতর্ক না করেই তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। শহরটিকে সামরিক আক্রমণ দ্বারা কব্জা করে পরে ধ্বংস করে দেয়া হয়।৫

৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ শে আগস্ট ভিসুভিয়াসের এক ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাতের দ্বারা পমপেই শহর ধ্বংস হয়েছিল । মহান রোমক বিজ্ঞানী ঐতিহাসিক প্লাইনীর ভাগ্নে প্লাইনী দ্য ইয়ংগার এ ঘটনার একটা সুস্পষ্ট ও চিত্রবৎ বিবরণ দিয়েছেন। প্লাইনী দ্য ইয়ংগার ঐ সময় পম্‌পেই থেকে অল্প দূরে মিসেনামে ছিলেন। তিনি লেখেন ঃ ২৪ শে আগস্ট বিকেল প্রায় ১টার দিকে আমার মা চাইলেন যে আমার মামা (প্লাইনী) যেন লক্ষ্য করেন, আকাশে একটা অস্বাভাবিক আকার ও বাহ্যরূপ বিশিষ্ট মেঘ দেখা যাচ্ছে। মেঘটি ভিসুভিয়াস পর্বত থেকে উত্থিত হয়েছিল। এটি এই মুহূর্তে সাদা আবার পরের মুহূর্তে কালো এবং দাগ বিশিষ্ট দেখাচ্ছিল। যেন ঐ মেঘের সাথে ছিল মাটি আর অঙ্গার। এরপর সেই অঙ্গার ঘন থেকে আরো ঘন হয়ে নিচে পড়তে শুরু করল এবং তারপর ঝামাপাথরও পড়লো।"

জুনিয়র প্লাইনী এবং তার মা ক্ষতিগ্রস্ত হননি কিন্তু তার মামা প্লাইনী ঘটনাটা দেখতে গিয়ে ধোঁয়াচ্ছন্ন এবং ছাই-ভস্মে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যান। ভেঙ্গে পড়া ভবনের নিচে পম্‌পেই ভিলার দেয়ালে তিনি বিধ্বস্ত হন যা অষ্টাদশ শতকে (১৭৮৪ খ্রি.) ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ মাটি খুঁড়ে বের করেন। কেউ একজন দেয়ালে লিখে দিয়েছিলেন ঃ 'সডোম গোমোর্‌রাহ।'৬

তথ্যসূত্র ঃ

1. Keller. W., The Bible as History, p. 51.
2. A Short Encyclopaedia of Islam.
3. Keller, W., The Bible as History, p. 95.
4. A Short Encyclopaedia of Islam.
5. The Epic of Man, Time-Life International (Netherland) N. V., p. 85, 1963.
6. Cottrel, L. Lost Cities, p. 147-152.

www.bjilibrary.com

١٠- وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ
قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

৭ ঃ ১০ আমি তো তোমাদেরকে দুনিয়ায় কর্তৃত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং এতে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি; তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে থাক।

এই আয়াতে উল্লিখিত কর্তৃত্ব বস্তুতই অত্যন্ত চিন্তা উদ্রেককারী। এ প্রসঙ্গে একটি মজার প্রশ্ন হলো যে, এই কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার আসনটি কোথায়। ব্যাপারটা যে তাই এ সত্য থেকেই তা স্পষ্ট হয় যে, মাত্র একশ বছর আগেও মানুষ উড়তে জানত না, আর আজ মানুষ শুধু যে পৃথিবীর চারদিকে মাত্র কয়েক ঘন্টায় ঘুরে আসছে তা নয়, সে আন্তঃগ্রহ ভ্রমণেও পাড়ি জমাচ্ছে। মাত্র ৫০ বছর আগেও মানুষ নির্দিষ্ট কোন জীবাণুর কীভাবে মোকাবিলা করতে হয় জানত না আর আজ সেই একই জীবাণুকে মানুষ মানব জাতির কল্যাণে কাজে লাগাচ্ছে। এত অল্প সময়ে এত কিছু ঘটনা ঘটে গেছে। এ সমস্ত ঘটনাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ মানুষকে প্রাকৃতিক সম্পদ মানবজাতির সেবায় কাজে লাগানোর বেশী বেশী ক্ষমতা দান করেছেন। এই কর্তৃত্ব অবশ্য জ্ঞান থেকেই উৎসারিত। কেননা, জ্ঞানই হচ্ছে শক্তি। এভাবেই আল্লাহ্ জ্ঞানকে কর্তৃত্বের ভিত্তি বা পীঠিকা করেছেন এবং মানুষকে জ্ঞান অর্জনের আদেশ দিয়েছেন। এর সাথে রয়েছে এ সত্য যে, আল্লাহ্ আদম (আ)-কে যে জ্ঞান দান করেছিলেন সে জ্ঞানই তাকে ফেরেশতাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিল এবং মানুষকে বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র খলিফা বা প্রতিনিধি। [illegible]ই, আল্লাহ্‌র খলিফা হিসেবে পৃথিবীতে কাজ করতে হলে এবং প্রকৃতিকে জয় করতে হলে মানুষকে তার সাধ্যমত জ্ঞান তালাশ করতে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য সেই জ্ঞানকে উপকারী কাজে লাগাতে হবে। আল্লাহ্‌র ভয়েই মানুষকে জ্ঞানের ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে দূরে থাকতে হবে। মানুষ যতই বেশী বেশী জ্ঞানের তালাশ করতে থাকে ততই সে আবিষ্কার করে কত বিচিত্রভাবে আল্লাহ্ মানুষের রিযিকের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। হাজার হাজার অণুজীব এবং অন্যান্য আরো প্রাকৃতিক নিমিত্তকে মানুষের বস্তুগত প্রয়োজন পূরণের জন্য লাভজনকভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। একদিকে মানুষ যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের সুযোগ গ্রহণ করতে শিখেছে এবং উন্নত ফলনশীল জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে খাদ্য শস্যের উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি করতে শিখেছে, তেমনি অন্যদিকে সে উপলব্ধি করতেও শুরু করেছে যে, আল্লাহ্‌র এক হাজার একটা জিনিসের মধ্যে মানুষের রিযিক ছড়িয়ে রয়েছে। এখন তাকে যা করতে

হবে তাহলো এটুকুই যে, তাকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং সেই জ্ঞান প্রয়োগ করতে হবে। এটা ঠিক যে, পৃথিবীর সম্পদ ক্রমান্বয়ে ফুরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এটাও ঠিক যে, নিত্য নতুন সম্পদ ও প্রযুক্তি মানুষের করায়ত্তে আসছে। সাগরের বিশাল সম্পদ সম্ভাবনায় এখনো হানা দেয়া বাকী। অবশ্য, স্মরণ রাখতে হবে যে, মানুষ যখন প্রকৃতির উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং পরিবেশের উপর বর্ধনশীল হারে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং যখন তার জীবনের প্রয়োজন পূরণের মাধ্যম খুঁজে পায় তখন তার সর্বময় ক্ষমতাবান এবং সর্বক্ষমাশীল আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভুলে যাওয়া চলবে না, যিনি জ্ঞানান্বেষণকারীদেরকে হামেশাই জ্ঞান দান করে যাচ্ছেন। কখনই এক মুহূর্তের জন্য মানুষের চিন্তা করা বন্ধ করা চলবে না যে, কী বিশাল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আল্লাহ্‌ মানুষকে কর্তৃত্ব দান করেছেন এবং তার প্রয়োজন পূরণের সবরকম ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

١١. وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ
اِبْلِيْسَ ۚ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ○

৭ ঃ ১১ আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করি; অতঃপর তোমাদের রূপদান করি এবং অতঃপর ফিরিশতাদেরকে আদমের নিকট নত হ'তে বলি; ইবলিস ছাড়া সবাই নত হয়। যারা নত হ'ল সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হ'ল না।

মানুষ সৃষ্টি এবং বিভিন্ন আকার-আকৃতিতে ভ্রূণের বৃদ্ধি সাধনের বিষয়টি ৩ ঃ ৬ আয়াতের প্রসঙ্গে ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে।

١٢. قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ۖ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ
مِنْ طِيْنٍ ○

৭ ঃ ১২ তিনি বললেন 'আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কোন্‌ জিনিস তোমাকে নিবৃত্ত করল যে তুমি নত হলে না?' সে বলল, 'আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছ আর তাকে সৃষ্টি করেছ কর্দম দ্বারা'।

আগুন থেকে শয়তানের সৃষ্টির বিষয়টি বিজ্ঞানের বর্তমান জ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। ডিএনএ এবং আমিষ সৃষ্টিতে কাদামাটির ভূমিকা ৬ ঃ ২ আয়াতের অধীনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ঐ আলোচনা প্রসঙ্গে যুক্তি প্রয়োগে দেখানো হয়েছে কীভাবে সৃষ্টির প্রতিটি পর্যায়ে খোদায়ী করুণা কাজ করে যা ছাড়া কোন জৈব জীবনই উদ্ভব হতে পারত না।

www.bjilibrary.com

٢٢- فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۖ

৭ ঃ ২২ এভাবে সে তাদেরকে প্রবঞ্চনা দ্বারা অধঃপতিত করল। তারপর যখন তারা সেই বৃক্ষের ফলের আস্বাদ গ্রহণ করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা উদ্যান-পত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল।

অত্র আয়াত থেকে হযরত আদম (আ)-এর আবির্ভাবের সময় সম্পর্কে ধারণা করা যায়। আয়াতের এ অংশটি বলছে যে, এই সময় থেকে আদম (আ) তার উলঙ্গতা ঢাকার তাকিদ অনুভব করলেন এবং যেহেতু কাপড় বোনার মত অন্য কোন লোক ছিল না, সেহেতু তিনি তার গুপ্তাঙ্গ ঢাকার জন্য গাছের পাতা ব্যবহার করেন। নৃ-বিজ্ঞান থেকে জানা যায় যে, গাছের পাতা ও বাকল পরিধান করার প্রথা পুরোপলীয় যুগের শেষাংশের মানুষের মধ্যে প্রথম প্রচলন হয় যারা এক লক্ষ থেকে চল্লিশ হাজার বছরের মধ্যে বাস করত। কাজেই অনুমান করা যায় যে, অন্তত পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আদম (আ)-এর আবির্ভাব ঘটে।

٢٦- يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○

৭ ঃ ২৬ হে বনী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবার এবং বেশভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়েছি এবং তাক্ওয়ার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট। এটি আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

যৌন অঙ্গের সাথে সম্পর্কিত লজ্জার বিষয়টি উপলব্ধি করার পর মানুষ একে অন্যের কামুক দৃষ্টি থেকে আড়াল করার তাকিদ অনুভব করল। প্রাথমিক পর্যায়ে গাছের পাতা যথাযথভাবে সেলাই করে অঙ্গ ঢাকার কাজটা সারা হয়। আল্লাহ্ই তার মধ্যে এই তাকিদ সৃষ্টি করেন এবং তার মধ্যে উচ্চতর মেধা এবং উদ্ভাবনী শক্তিও দান করেন যা প্রয়োগ করে সে ক্রমান্বয়ে তার ব্যবহারার্থে উন্নত ও টেকসই কাপড় বোনার জন্য আঁশ এবং সুতা আবিষ্কারে সফলকাম হয়।

www.bjilibrary.com

কাজেই যে পোশাক এক সময়ে ছিল যেনতেন রকমের আবরণী মাত্র, তা মানুষের সৌন্দর্যবোধ এবং নতুন নতুন ধারণা গড়ে উঠার সাথে একটা অলংকার ভূষণে পরিণত হয় যা স্পষ্টতই দু'টো উদ্দেশ্য পূরণ করে, যথা-১. শান্তিদায়ক উত্তাপ আর কনকনে শীতের মত চরম জলবায়ুগত অবস্থা থেকে সুরক্ষা, এবং ২. বিভিন্ন উপলক্ষ ও পরিবর্তনশীল ঋতুর উপযোগী অধিকতর আকর্ষণীয় ডিজাইন ও বয়নের উদ্ভব ঘটিয়ে দেহের শোভাবর্ধন।

কালক্রমে জমকালো ভূষণ হিসেবে পোশাক অবিশ্বাস্যভাবে মানুষের ব্যক্তিত্বের একটা অংশ হয়ে পড়ে। আল্লাহ্‌র করুণাকে জানাই ধন্যবাদ যিনি মানুষকে নতুন নতুন কলাকৌশল উদ্ভাবনের শক্তি দিয়েছেন; আজকের পোশাকাদি এমন উচ্চ গুণ এবং মানে পৌঁছেছে যা কারুকার্যের সাথে উপযোগিতা ও আরামকে যুক্ত করেছে।

৫৪-إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى
عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ
مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৭ ঃ ৫৪ তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে এদের একে অপরকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর চাঁদ, সূর্য ও নক্ষত্ররাজি, যা তারই আজ্ঞাধীন, এসব তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁরই। মহিমাময় বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্।

ছয় দিনে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি

আয়াতটির এ অংশে আল্লাহ্ বলছেন যে, তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। আল কুরআনের অন্যান্য অংশে একদিনকে এক হাজার দিন (আয়াত ২২ ঃ ৪৭) এবং পঞ্চাশ হাজার দিন (আয়াত ৭০ ঃ ৪) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় আল্লাহ্‌র নিকট একদিন অর্থ একটা সময়কাল, যা দীর্ঘও হতে পারে আবার হতে পারে হ্রস্ব। কাজেই এ আয়াতে আসলে যা বুঝান হয়েছে তা হলো ঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে ছয় (সময়কালে কিংবা) পর্যায়ে। বিষয়টি সৃষ্টিতত্ত্ব ও ভূতত্ত্ব দ্বারা সূক্ষ্মভাবে সমর্থিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

মহানিনাদের পর সেই আদিযুগীয় অগ্নিগোলক বিস্ফোরিত হয়ে তীব্র বিকিরণ সাগরে নিমজ্জিত প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রনের দ্রুত সম্প্রসারণশীল ও শীতলায়মান গ্যাসীয় মেঘে পরিণত হয়। প্রথমে বিকিরণের চাপ সুষম সম্প্রসারণ বজায় রাখে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাইড্রোজেন পরমাণু ও সেই সাথে কিছু হিলিয়াম সহযোগে গঠিত বস্তু ঝাড় বা গুচ্ছ গঠন শুরু করে। সেই গ্যাসীয় গুচ্ছ বা বুদ্‌বুদ পরস্পর থেকে দূরে উড়তে থাকে, যদিও আলাদা আলাদা গুচ্ছে বস্তু নিজের অভিকর্ষের কারণে সংকুচিত হতে থাকে। এ সময় দু'টি বিপরীতমুখী বল বুদ্‌বুদটির উপর ক্রিয়া করে ঃ একটি হচ্ছে সম্প্রসারণ বল এবং অপরটি হচ্ছে অভিকর্ষ বল যা একে সংকুচিত করার চেষ্টা করে। অভ্যন্তরভাগে প্রচন্ড আলোড়নপূর্ব গতির কারণে সম্প্রসারণশীল গ্যাসীয় বুদ্‌বুদটি বিভিন্ন আকার ধারণ করে, যথা ঃ গোলাকার, ডিম্বাকার এবং পেঁচানো ইত্যাদি। প্রথম পর্যায়ে এভাবেই গঠিত হয় ছায়াপথসমূহ। আর এর মধ্য দিয়েই সমাপ্ত হয় আকাশমন্ডলী সৃষ্টির প্রথম পর্যায় বা দিন। এতে সময় লাগে প্রায় ১৫ কোটি বছর।

ছায়াপথ তথা সংকোচনশীল গ্যাস-গুচ্ছগুলো ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ সকল প্রতিটি অংশ সংকুচিত হতে হতে দ্রুততর বেগে ঘুরপাক খেতে থাকে এবং সমতলবিশিষ্ট হতে থাকে। কিন্তু গ্যাসের ঘনীভূত ও আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুচ্ছ বা বুদ্‌বুদে পরিণত হওয়া অব্যাহত থাকে। নীহারিকা নামীয় গ্যাস ও ধূলিকণা দ্বারা গঠিত প্রায় গোলাকৃতি এবং ধীরে ধীরে পরিবর্তনশীল এই মেঘ থেকেই সৃষ্টি হয় তারকামন্ডলী ও সৌরজগৎ। আবর্তনশীল এই নীহারিকা সংকুচিত হতেই থাকে এবং রেখে যায় চাকতিস্থিত বস্তুর বুদ্‌বুদ বা বলয় যা শেষ পর্যন্ত গ্রহে পরিণত হয়। এভাবেই সৃষ্টির দ্বিতীয় পর্যায়ে গঠিত হয় তারকা মন্ডলী, গ্রহ, নক্ষত্র আর উপগ্রহসমূহ। এর মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় দু'ধাপে বা দু'দিনে সপ্ত আকাশের সৃষ্টি প্রক্রিয়া। এই দ্বিতীয় পর্যায়ে সময় লাগে প্রায় একশ' কোটি বছর।

আমরা আজ যে পৃথিবীকে দেখতে পাচ্ছি এটির সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় চারটি ভূতাত্ত্বিক যুগে, অর্থাৎ প্রি-ক্যামব্রিয়ান যুগ, প্যালিওযোয়িক যুগ তথা জীবাশ্ম বা প্রত্ন যুগ, মেসোযোয়িক যুগ তথা মধ্যজীবীয় বা দ্বিতীয় ভূতাত্ত্বিক যুগ এবং সেনোযোয়িক যুগে। প্রি-ক্যামব্রিয়ান যুগে ঘুরপাক খাওয়া নক্ষত্রমন্ডলীর গ্যাসীয় বুদ্‌বুদ্ হিসেবে যাত্রা শুরু করে পৃথিবী এক তরল অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে এবং কালক্রমে একটা কঠিন বহিরাবরণ গঠন করে। তখন এই

www.bjilibrary.com

গ্রহটিকে ঘিরে ছিল ঘন বাষ্পীয় বায়ুমন্ডল। পৃথিবীপৃষ্ঠ শীতল হতে থাকার সাথে সাথে বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পকণা ঘণীভূত হয়ে বৃষ্টিতে পরিণত হয় এবং নদ-নদী ও সাগর সৃষ্টি করে। এভাবে সৃষ্ট পৃথিবীপৃষ্ঠ পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি, অগ্নিগিরি আর লাভা ক্ষেত্রের এক অনুর্বর প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্য গঠন করে। এ প্রক্রিয়ায় সময় লাগে প্রায় একশ' কোটি বছর। শেষের ১০ কোটি বছরে সৃষ্টি হয় এককোষী জীব, অমেরুদন্ডী প্রাণী এবং আদিমযুগীয় জলজ উদ্ভিদ সমূহ। এটাই হচ্ছে পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম পর্যায় বা প্রথম দিন।

দ্বিতীয় পর্যায় তথা প্যালিওযোয়িক যুগে সাগরের উপরিতলে উঠানামা করার প্রবণতা বিরাজ করে যাতে ভূ-ভাগে নিয়মিত পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এরপর সাগরের জলভাগ কমে গিয়ে ভূপৃষ্ঠের স্থলভাগ বৃদ্ধি পায়। এটাই ছিল ব্যাপকভাবে পর্বত সৃষ্টি আর অগ্নিগিরির তৎপরতার সময়কাল। এ সময়কালের শেষাংশে মহাদেশীয় সম্প্রবাহের কারণে পৃথিবী বেশ আন্দোলিত হয়। এ যুগের স্থায়িত্বকাল প্রায় চল্লিশ কোটি বছর। এ যুগেই উদ্ভব হয় মাছ, উভচর প্রাণী এবং সরীসৃপের মত মেরুদন্ডী প্রাণীকুলের। এভাবেই সমাপ্তি ঘটে পৃথিবী সৃষ্টির দ্বিতীয় দিবস বা পর্যায়ের।

ভূতাত্ত্বিক মধ্যজীবীয় যুগই হচ্ছে পৃথিবী সৃষ্টির তৃতীয় দিন বা তৃতীয় পর্যায়। এ যুগে স্থলভাগের অধিকাংশ স্থান জুড়েই ছিল মরুভূমি আর জঙ্গলাকীর্ণ পর্বত মালা। সাগর পুনরায় স্থলভাগের দিকে অগ্রসর হয়। স্থলভাগের অধিকাংশ স্থানেই ছিল বনজঙ্গল কিংবা হ্রদ ও নদীসহ জলাভূমি। এ সময়কালে ডাইনোসরের অস্তিত্ব ছিল এবং এরাই সে সময়ে পৃথিবীতে আধিপত্য করত। এ যুগ বা সৃষ্টির পর্যায় ১৫ কোটি বছর স্থায়ী হয়।

সেনোযোয়িক যুগ তথা পৃথিবী সৃষ্টির চতুর্থ পর্যায়ই হচ্ছে আজকের যুগ। প্লেট টেকটোনিক্স তথা ভূপৃষ্ঠের বহিরাবরণের শক্তিশালী বা প্রচন্ড আন্দোলনের ফলে আল্প্স ও হিমালয় পর্বতমালার গঠন সম্পন্ন হয়। এর ফলে বিভিন্ন মহাদেশ ও মহাসাগর বর্তমান আকার ধারণ করে। এ সময়কালে বরফ যুগের অস্তিত্ব দেখা যায়। ডাইনোসররা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ পর্যায়ে স্তন্যপায়ী জীব কুলের সৃষ্টি সম্পন্ন হয়। এ যুগের পূর্ণতা ঘটে মানুষ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে।

এভাবেই ছয়টি পর্যায়ে বা ছয় দিনে সমাপ্ত হয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি।

দিনের দৈর্ঘ্য সম্পর্কিত ব্যাখ্যার পাশাপাশি আমরা লক্ষ্য করছি যে, পৃথিবীর বর্তমান প্রাক্কলিত বয়স প্রায় পাঁচশ কোটি বছর। আবার মহাবিশ্বের প্রাক্কলিত

বয়স দেড় হাজার কোটি বছর। কুরআনের ভাষ্যমতে পৃথিবী সৃষ্টি হয় দু'দিনে আর মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয় ছয় দিনে এবং পৃথিবীর বয়স থেকে দিনের স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য ধরে নিলে এক দিনের দৈর্ঘ্য হয় আড়াইশ কোটি বছর। এ হিসাব অনুযায়ী ছয় দিনের অর্থ দাড়ায় দেড় হাজার কোটি বছর যা মোটামুটিভাবে মহাবিশ্বের বয়সেরই সমান!

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে পৃথিবী ও মহাবিশ্বের বয়স সম্ভবত বর্তমানে যা হিসেব করা হয়ে থাকে তা থেকে ভিন্ন হবে; কিন্তু তাদের অনুপাত ঠিকই কুরআনের ইঙ্গিত মোতাবেক অপরিবর্তিত থাকবে। যাই হোক্না কেন, সময়কাল হিসেবে দিনের ব্যাখ্যা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়।

তিনি রাতকে আবরণী হিসেবে দিনের উপর টেনে দেন ঃ গোলাকার পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণনের ফলে কীভাবে দিন ও রাত হয় তা ৩ ঃ ২৭ আয়াতের আলোচনায় বলা হয়েছে। সূর্য দিগন্তরেখার নিচে চলে যায় বলে মনে হলে রাত নেমে আসে এবং এর অন্ধকার ধীরে ধীরে দিনের ঔজ্জ্বল্যকে গিলে ফেলে, মনে হয় যেন দিনের উজ্জ্বল মুখমন্ডলের উপর আস্তে আস্তে রাত (এর আবরণ) টেনে দেয়া হচ্ছে।

তিনিই সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র আর তারকামন্ডলী, এ সবকিছুই তার কর্তৃত্বাধীন বিধান দ্বারা পরিচালিত ঃ মহাজাগতিক বস্তুসমূহের সৃষ্টির জটিলতা আজ পর্যন্ত যা জানা গেছে তা ২ ঃ ১১৭, ২ ঃ ১৬৪ আয়াতদ্বয় এবং পরিশিষ্ট-১ ও পরিশিষ্ট-২-এ আলোচনা করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিভিন্ন বিধানের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা গেছে যার দ্বারা মহাশূন্যে এদের কার্যাদি, ক্রিয়া-কর্ম এবং গতি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

সূর্য ঃ সূর্য সৌর ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। সকল গ্রহ সূর্যের চারদিকে আবর্তন করে থাকে। সপ্তদশ শতকে কেপ্লার সূর্যের চতুর্দিকে আবর্তনশীল গ্রহসমূহের চলার গতি নিয়ন্ত্রণকারী বিখ্যাত সূত্র বের করেন। প্রথম সূত্রটি এ রূপ ঃ 'গ্রহগুলোর কক্ষপথসমূহ হচ্ছে উপবৃত্তাকার যাতে সূর্য থাকে প্রতিটি উপবৃত্তের একটি ফোকাসে বা রশ্মিকেন্দ্রে।' দ্বিতীয় সূত্রে বলা হয় ঃ 'সূর্যের সাথে প্রতিটি গ্রহ যে রেখা দ্বারা সংযুক্ত (তাকে রেডিয়াস ভেক্টর বলা হয়ে থাকে) তা মহাশূন্যে সমান সময়ে সমান স্থান জুড়ে থাকে।' কেপ্লারের তৃতীয় সূত্রটি যাকে কখনও কখনও সদৃশ সূত্র বলা হয়ে থাকে তা এরূপ ঃ 'কোন গ্রহের নক্ষত্র সময়ের বর্গ সূর্য থেকে তার গড় দূরত্বের ঘন-এর সাথে আনুপাতিক।' এ তিনটি

www.bjilibrary.com

সূত্রের সমন্বিত রূপের মৌলিক ভিত্তি আবিষ্কার করেন নিউটন। তিনি এ তিনটি সূত্র থেকে উপলব্ধি করেন যে, গ্রহগুলোকে সূর্যের চারদিকের কক্ষপথে টেনে রাখে অভিকর্ষ নামে এক ধরণের বল। মাধ্যাকর্ষণের সূত্র তিনি এভাবে দাঁড় করালেন ঃ 'মহাবিশ্বের প্রতিটি কণা অন্য সকল কণাকে এমন একটা বল দ্বারা আকর্ষণ করে যা তাদের ভরের গুণফলের সাথে সরাসরি আনুপাতিক এবং তাদের মধ্যকার দূরত্বের বর্গের সাথে ব্যস্ত আনুপাতিক।' সূর্য সৌর জগতের সর্বাধিক প্রকান্ড বস্তু বিধায় এটি নিজ অবস্থানে অবস্থান করে। কিন্তু অন্য গ্রহসমূহ অত্যন্ত নিখুঁত ও সঠিকভাবে এ সকল সূত্র মেনে সূর্যের চারদিকে আবর্তন করে আসছে অতীতের লক্ষ কোটি বছর ধরে এবং সৌর ব্যবস্থা যতদিন টিকে থাকবে ততদিন তা অব্যাহত থাকবে। সূর্য ছায়াপথের অন্যান্য গ্রহসহ ছায়াপথ কেন্দ্রের ধনুক রাশির দিকে প্রতি সেকেন্ডে আড়াইশ' কিলোমিটার ধীরগতিতে আবর্তনশীল। সূর্য আবার নিজ অক্ষের চারদিকেও অত্যন্ত ধীরগতিতে ঘূর্ণনরত। এটা একটা বৈশিষ্ট্যমূলক ঘূর্ণন, এতে সূর্যের বিভিন্ন অংশে রয়েছে বিভিন্ন গতিবেগ। এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘূর্ণনের গ্রহসম্মিলনী সময় সূর্যালোকীয় দ্রাঘিমা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিষুবরেখাস্থ ২৭ দিন থেকে উত্তর-দক্ষিণে ৬০° ডিগ্রী দ্রাঘিমায় ৩১ দিন পর্যন্ত বেড়ে যায়। বর্ণালী বীক্ষণিক পরিমাপ থেকে দেখা যায় যে, ঘূর্ণন সময়কাল মেরু অবধি বাড়তে থাকে।

কেপ্‌লারের তৃতীয় সূত্রের সাহায্যে সূর্য থেকে গ্রহসমূহের আপেক্ষিক দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। এই পদ্ধতিতে দূরত্ব যেহেতু অনুপাত হিসেবে আসে, সেহেতু সৌরজগতের অভ্যন্তরস্থ দূরত্ব প্যারালাক্স বা লম্বন পদ্ধতিতে সঠিকভাবে নির্ণীত হতে হবে। এ উদ্দেশ্যে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বকে কাজে লাগানো হয়। আমেরিকার দিন-পঞ্জিকা এবং নৌবর্ষপঞ্জি থেকে এ দূরত্বটি পাওয়া যাচ্ছে চৌদ্দ কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ কিঃমিঃ অর্থাৎ প্রায় নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র থেকে সূর্যের ভর নির্ণয় করা যায় যার পরিমাণ ১.৯৯×১০^{৩০} কিঃগ্রাঃ অর্থাৎ পৃথিবীর ভরের তিন লাখ বত্রিশ হাজার নয় শত ত্রিশ গুণ। সূর্য মূলত ৩ ঃ ১ অনুপাতে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামে গঠিত যাতে আছে শতকরা ১% ভাগ লৌহের মত ভারী ধাতু।[২]

পৃথিবী সূর্য থেকে প্রায় সমস্ত তাপ ও আলোকশক্তি পেয়ে থাকে। সূর্য কর্তৃক বিকিরণকৃত তাপশক্তি স্টিফান-এর সূত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সূত্রটি হচ্ছে ঃ 'একটি কৃষ্ণ বস্তু দ্বারা বিকিরণকৃত সম্পূর্ণ শক্তি তার তাপমাত্রার চতুর্থ ঘাতের আনুপাতিক।'

www.bjilibrary.com

ফটোস্ফিয়ার নামে পরিচিত সূর্যের দৃশ্যমান বহিঃস্তরের তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয় স্টিফানের সূত্র এবং ওয়েইন-এর নামে আরেকটি সূত্র যা এরূপ ঃ 'সর্বাধিক তীব্রতাবিশিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য উচ্চতম তাপমাত্রার ব্যস্ত আনুপাতিক।'[২] এভাবে নির্ণীত সূর্যের তাপমাত্রা ধরা হয় গড়পড়তা ৬০০০ কেলভিন। ফটোস্ফিয়ারের উপরিস্থিত কয়েক হাজার কিঃ মিঃ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে বলা হয় ক্রোমোস্ফিয়ার। এর উপরে রয়েছে সৌর জ্যোতির্বলয় যা সৌরব্যাসার্ধের দশগুণব্যাপী বিস্তৃত। এই জ্যোতির্বলয় থেকেই ইলেকট্রন ও প্রোটন আকারে পদার্থ তীব্রবেগে বেরিয়ে আসে যাকে বলা হয় সৌর ঝড়। পৃথিবীস্থ বায়ুমন্ডলের বাইরে যে পরিমাণ সৌর বিকিরণ গ্রহণ করা হয় তাকে বলা হয় সৌর ধ্রুবক, যার গড়পড়তা পরিমাণ সূর্যের দিকে সমকোণ ধরে দাঁড়ায় ১.৯৬ ক্যাল/মিনিট /বর্গ সেঃ মিঃ তল।[৩] স্টিফান-এর সূত্র দ্বারা নির্ণীত সূর্য কর্তৃক বিকিরণকৃত শক্তির পরিমাণ ৩.৮৫×১০^{২৬} জৌল/ সেকেন্ড। সূর্যের মূল কেন্দ্রস্থলে শক্তি উৎপাদিত হয় তাপাণবিক সংশ্লেষণ (কার্বন চক্র) দ্বারা যাতে কার্বন পরমাণু কেন্দ্র প্রোটনের সাথে একীভূত হয়ে বিভিন্ন মাধ্যমিক পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে কার্বন ও হিলিয়াম পরমাণু কেন্দ্র তৈরি করে। চার লক্ষ কিঃ মিঃ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট সূর্যের বাকী এলাকাগুলোতে হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে রূপান্তরের প্রোটন-প্রোটন বিক্রিয়া দ্বারা শক্তি উৎপাদিত হয়ে থাকে। আইনস্টাইনের ভর- শক্তি সম্পর্ক দ্বারা সমাধান করে পাওয়া যায় যে, প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৪.২৮×১০^{৯} অর্থাৎ ৪২,৮০,০০০ মেট্রিক টন সৌর পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই হারে ভর হারাতে বা কমতে থাকলে সূর্য দশ হাজার কোটি বৎসরাধিককাল ধরে আলো ও তাপ বিকিরণ করতে থাকবে।

সূর্যের বহিঃপৃষ্ঠতলে (ফটোস্ফিয়ার) অনেক দাগ দেখা যায় যেগুলো অপেক্ষাকৃত গাঢ়। সৌরদাগসমূহ ঘন বা কাল দেখা যায় এ কারণে যে, আশপাশের এলাকার তুলনায় ঐসব স্থান কম বিকিরণ দেয়। সৌরদাগের সাথেই থাকে পৃথিবীর তুলনায় তিন হাজার গুণ বেশী শক্তিশালী চৌম্বক-ক্ষেত্র। সৌরদাগ থাকে জোড়ায়-জোড়ায়; প্রায়শই একটি থাকে নিচে, কোথায় তা দেখা যায় না। যদি উভয় দাগই দেখা যায়, তাহলে তারা বিপরীত মেরুবিশিষ্ট। সূর্যের ঘূর্ণনের কারণে সৌরদাগগুলো পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ধাবমান বলে মনে হয়। কোন এক সৌরদাগ চক্রে, একই গোলার্ধস্থ (উত্তর ও দক্ষিণ) সকল সৌরদাগ হয় সমমেরুবিশিষ্ট এবং অন্য গোলার্ধের সৌরদাগসমূহের থাকে বিপরীত মেরু। একই গোলার্ধস্থ সৌরদাগসমূহের মেরুযুক্ততা প্রতিটি ধারাবাহিক চক্রে একটি

www.bjilibrary.com

সৌরদাগ মেরুযুক্ততা সূত্র অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়ে থাকে। দেখা যায় যে, সৌরদাগ সংখ্যা এবং দাগফল সংখ্যা দিন-দিন এবং বছর-বছর পরিবর্তিত হয়ে কখনও সর্বোচ্চ সীমায় বৃদ্ধি পায় এবং অতঃপর ন্যূনতম সংখ্যায় নেমে আসে। গড়পড়তা ১১ বছরে এ ধরনের একটা চক্র পূর্ণ হয়, যদিও বিরামকালে ৭ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত পার্থক্য হয়ে থাকে।

এগারো বছরের একটি চক্র পূর্ণ করার পর বিপরীত মেরুবিশিষ্ট সঙ্গী সৌরদাগগুলো আরেকটি এগারো বছরের চক্রের জন্য আবির্ভূত হয়। এভাবে, সমমেরুবিশিষ্ট সৌরদাগগুলোর সর্বোচ্চ ও ন্যূনতম পুনরাবির্ভাবের সত্যিকার সময়কাল হচ্ছে বাইশ বছর।

কেন্দ্রস্থলের ঘূর্ণনের কারণে সৃষ্ট শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রসমূহের কর্মকান্ড কেন্দ্রগুলোর উদ্ভবের মূল নিয়ামক। সৌরদাগসমূহ সৌর কর্মকান্ডের মধ্যে সর্বাধিক সুস্পষ্ট হলেও, সূর্যের আরো অনেক ধরনের সাময়িক কর্মতৎপরতা রয়েছে। সৌরদাগসমূহের উপরে ক্রোমোস্ফিয়ারে রয়েছে প্ল্যাজ্ নামীয় আরেকটা অনেক বৃহদাকার বিক্ষুব্ধ অঞ্চল। যথোপযুক্ত সহায়ক যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশসহ সূর্যের ছবি নিলে প্ল্যাজ্ দেখতে একটি উজ্জ্বল তালি-তাপ্পির মত লাগে। সময় সময় প্ল্যাজে মূলত হাইড্রোজেনের একটা সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত তীব্র আলোক বিস্ফোরণ পর্যবেক্ষণ করা যায়। ক্রোমোস্ফিয়ারের উপরের কর্মকান্ডের কেন্দ্রস্থল জ্যোতির্বলয় পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়ে থাকে ঘনীভূত আকারে যা আশপাশের তুলনায় অধিক ঘন ও উজ্জ্বলতর বলে মনে হয়। সোজা, বাঁকানো এবং ফাঁস আকৃতির গ্যাস কাঠামো প্ল্যাজ্ থেকে জ্যোতির্বলয় পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। প্রান্তসীমায় যখন এরা অত্যুজ্জ্বল বস্তুর মত লাগে তখন এদেরকে বলা হয় অভিক্ষিপ্ত বস্তু। কিন্তু যখন এরা চাকতিতে দৃশ্যমান হয় তখন এদেরকে বলা হয় সূত্র বা আঁশ। এ সকল অভিক্ষিপ্তাবস্থা ও সূত্র কুড়ি থেকে চল্লিশ হাজার কিঃমিঃ দীর্ঘ এবং পাঁচ থেকে দশ হাজার কিঃ মিঃ পর্যন্ত পুরু হতে পারে।[৪]

চাঁদ ঃ পৃথিবীর নিকটতম মহাজাগতিক প্রতিবেশী এবং একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ চাঁদ আমাদের কাছ থেকে গড়ে মাত্র দু'লাখ আটত্রিশ হাজার আটশ সাতান্ন মাইল দূরে। পৃথিবী-চন্দ্র জগৎ মহাশূন্যে একত্রে চলে; বেরী সেন্টার (bary centre) নামে একটা সাধারণ ভরকেন্দ্রের চতুর্দিকে এরা ঘূর্ণায়মান। বেরীকেন্দ্রটি সূর্যের চারদিকে একটা উপবৃত্তাকার কক্ষপথে আবর্তন করে এবং পৃথিবী ও চাঁদ এটির চতুর্দিকে আবর্তনশীল থাকে। পৃথিবীর ভর ও বেরীকেন্দ্র থেকে এর দূরত্বের গুণফল চাঁদের ভর এবং বেরীকেন্দ্র থেকে এর দূরত্বের

www.bjilibrary.com

গুণফলের সমান। এই সম্পর্কের ভিত্তিতে চাঁদের যে ভর পাওয়া যায়, তা পৃথিবীর ভরের ১/৮১.৩% ভাগ অথবা ১.২৩% ভাগ। এটা গুরুত্বের সাথে উল্লেখ্য যে, কেপ্লারের সূত্র উপগ্রহের বেলায় যেমন খাটে, তেমনি চাঁদের ক্ষেত্রেও সমান উপযোগী।

চাঁদের রয়েছে এক জটিল আবর্তন গতির সমাহার। এটি নিজ অক্ষের চারদিকে আবর্তন করে। তেমনি এটি পৃথিবীর চারদিকে আবর্তন করে এবং এর সাথে সাথে এটি সূর্যের চারদিকে আবর্তন করে। সৌরজগতের সাথে সাথে এটি আবার ছায়াপথ কেন্দ্রের চারদিকেও আবর্তনশীল। এটি যুগপৎ ঘূর্ণনশীল, অর্থাৎ এটির নিজ অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণনের সময়কাল পৃথিবীর চারদিকে আবর্তনের সময়ের সমান। কাজেই, এটি পৃথিবীর দিকে একই মুখ বা পাশ করে থাকে।

এটি যখন পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকে তখন এর যে দিকটা পৃথিবী ও সূর্যের দিকে ফিরে থাকে সেই দিকটা বা পিঠটা পৃথিবী থেকে দেখা যায় এবং সূর্যালোকিত থাকে। পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান চাঁদের যে সকল অংশ আলোকিত থাকে তাদেরকে বলা হয় চন্দ্র কলা। যখন চাঁদের অর্ধাংশ সূর্যালোকিত থাকে এবং সেই অংশই আবার পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান হয় অর্থাৎ পৃথিবী যখন চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যবর্তী হয় তখন হয় পূর্ণিমা। এক্ষেত্রে যদি এমন হয় যে, পৃথিবী যে ছায়া ফেলে চাঁদ তার ভিতরে চলে আসে, তবে চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হয়। আবার চাঁদ যখন সূর্য আর পৃথিবীর মধ্যবর্তী হয়, তখন চাঁদের সূর্যালোকিত অংশ পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান হয় না অর্থাৎ তখন চাঁদ দেখা যায় না। এটাই হচ্ছে নতুন চন্দ্র কলা। এ ক্ষেত্রে যদি চাঁদের ছায়া পৃথিবীর কোন অংশের উপর পড়ে, তখন ঘটে সূর্য গ্রহণ যা পৃথিবীর ঐ অংশ থেকে দেখা যায়।

চাঁদ জোয়ার-ভাটার কারণ ঘটায়। পৃথিবীর আবর্তন চলাকালীন সময়ে চাঁদের কাছের দিকের সাগরের পানি নিচের শক্ত মাটি অপেক্ষা চাঁদের অধিকতর নিকটবর্তী থাকে বিধায় চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ বল নিচের মাটির তুলনায় পানির উপর বেশী শক্তিশালী হয়। এভাবে সাগরের পানি ফুলে উঠে এবং জোয়ার আসে। অথচ, পৃথিবীর উল্টোদিকের সাগরের পানি নিচের শক্ত মাটি অপেক্ষা চাঁদ থেকে অধিকতর দূরবর্তী হওয়ায় পানির নিচে অবস্থিত শক্ত মাটির উপর চাঁদের আকর্ষণ বেশী; অর্থাৎ পানির নিচ থেকে শক্ত মাটিকে টানা হচ্ছে। কাজেই, পানি মাটির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে জোয়ার ঘটায়। দিনে একবার পৃথিবীর পূর্ণ আবর্তনকালীন সময়ে দু'বার জোয়ার উঠে, একবার যখন সাগর থাকে চাঁদের দিকে এবং আরেকবার যখন চাঁদ থেকে দূরবর্তী স্থানে থাকে। সূর্য

www.bjilibrary.com

ও জোয়ার ঘটায়। সূর্য ও চন্দ্র যখন পৃথিবীর একই পাশে কিংবা উল্টো পাশে থাকে তখন উচ্চতম জোয়ার বা ভরা কটাল তথা বসন্ত জোয়ার উঠে। পৃথিবী থেকে দেখলে চাঁদ ও সূর্য যখন ৯০° ডিগ্রী কোণের দূরত্বে অবস্থান করে তখন নিম্নতম জোয়ার তথা মরা কটাল আসে।

পৃথিবী যদি নিজ অক্ষে আবর্তনশীল না হত, তাহলে চান্দ্র জোয়ার স্ফীতি ঘটত চাঁদের দিক বরাবর রেখায়। পৃথিবীর আবর্তনের কারণে পৃথিবীর জোয়ার স্ফীতি পৃথিবী- চাঁদ রেখা পার হয়ে আগে চলে যায়। কারণ, জোয়ার স্ফীতি তৈরি হওয়া ও তা ভাটায় রূপান্তরিত হতে কিছু সময় দরকার হয়। আর এ সময়ের মধ্যে পৃথিবীর আবর্তন জোয়ার স্ফীতিকে পৃথিবী-চাঁদ রেখা থেকে দূরে নিয়ে যায়। চাঁদের টান বা আকর্ষণ পৃথিবীর ঘূর্ণনগতিকে শ্লথ করে দেয়। ফলে, দিন দীর্ঘ হয়। একটা সময় আসবে যখন পৃথিবীর সময়কাল চন্দ্রের-পৃথিবীর চারদিক প্রদক্ষিণ করার সময়কালের সমান হবে। তখন পৃথিবী একই পার্শ্ব বা পিঠ চাঁদের দিকে মুখ করে থাকবে এবং চাঁদের আকর্ষণে জোয়ার আসবে না। অবশ্য তখনও সূর্যের দ্বারা জোয়ার সংঘটিত হবে। এতে পৃথিবীর আবর্তন গতি এমনকি আরো বেশী ধীর হয়ে আসবে এবং দিনকে মাসের চেয়েও দীর্ঘ করে ফেলবে। কৌণিক গতিবেগের সংরক্ষণ নীতিতে পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের আবর্তন গতি দ্রুততর হবে। এভাবে বেড়ে যাবে চাঁদের বেগ। পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের ঘূর্ণনকাল কমতে থাকলে কেপলারের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী তাদের মধ্যকার দূরত্বও কমে আসবে। এভাবে চাঁদ পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আস্তে আস্তে পৃথিবীর দিকে চলে আসবে এবং পৃথিবীর ঘনিষ্ট থেকে ঘনিষ্ঠতর হবে। শেষ পর্যন্ত চাঁদ পৃথিবীর এত নিকটবর্তী হবে যে, চাঁদের পৃথিবীর নিকটবর্তী ও দূরবর্তী দুই অর্ধাংশের উপর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণীয় টানের পার্থক্যই চাঁদকে আক্ষরিক অর্থে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। এ ঘটনা যখন ঘটবে, তখন চন্দ্রের ধ্বংসাবশেষ অন্তত আংশিকভাবে হলেও পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্বে একটা কণা-বলয়ের রূপ ধারণ করবে।[৫]

তারকামন্ডলী ঃ আল্লাহ্ তারকারাজির জন্যে কিছু কিছু বিধান দান করেছেন যা তারা খুঁটিনাটিসহ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পালন করে থাকে।

তারকারা দীপ্তিমান গ্যাসীয় বস্তু যা তাদের কেন্দ্রস্থলে আণবিক একীভবনের দ্বারা শক্তি উৎপন্ন করে থাকে। নির্দিষ্ট একটা পরিমাণের কম ভর হলে সৌরভরের ০.০৫ গুণ। কোন বস্তুর কেন্দ্রীয় চাপ ও তাপ একীভবন ক্রিয়ার সূত্রপাতের পক্ষে অপ্রতুল। কোন তারকার ভর নির্ধারণ করে ঐ তারকার দীপ্তিমানতা, তাপমাত্রা, আকার এবং এর ক্রমবিকাশ পদ্ধতির উপর। পরিশিষ্ট-১-এ বিভিন্ন ভরবিশিষ্ট

www.bjilibrary.com

তারকার ক্রমবিকাশ স্তরসমূহের বিষয় ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে। তারকাসমূহ নিজ নিজ নির্ধারিত পথে আবর্তন করে থাকে এবং এরা একে অপর থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে। প্রক্সিমা সেন্টাউরি নামের তারকাটি আমাদের সূর্যের নিকটতম তারকা, যা ৪.২৭ আলোকবর্ষ দূরত্বে অবস্থিত। সূর্য একটা সাধারণ তারকা ছাড়া আর কিছু নয়।

নিউট্রন বা পাল্‌সার-এর ক্ষেত্রে তারকার ব্যাস শত শত কিলোমিটার, শ্বেত বামনদের ক্ষেত্রে সহস্র সহস্র কিলোমিটার। আমাদের সূর্যের মত তারকার ক্ষেত্রে লক্ষ কোটি কিলোমিটার। আর অতি দৈত্যাকার তারকার ক্ষেত্রে কয়েকশ' কোটি কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। একটা তারকার আকার তার জীবনের শেষ দিকে যখন সে লাল দৈত্য স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়, সাংঘাতিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

এমন তারকা রয়েছে যাদের ঔজ্জ্বল্য সময়ের সাথে পার্থক্য হয়ে থাকে। এরা পরিবর্তনশীল তারকা হিসেবে পরিচিত। এ পর্যন্ত প্রায় পঁচিশ হাজার পরিবর্তনশীল তারকা তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। দীপ্তির পার্থক্য হওয়ার সময়কাল কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে। পার্থক্যের পরিমাণগত সীমা তথা সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মাত্রার ফারাক অত্যন্ত ব্যাপক। পরিবর্তনশীল তারকাদের তিনটি প্রধান দলে বিভক্ত করা হয়ে থাকে, যথা ঃ ম্লান তারকা, মিটমিট তারকা ও মহাপ্লাবন তারকা।

তারকাদের নির্গত আলোর রং অনুযায়ী তারকাদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে এবং এথেকে তাদের তাপমাত্রা অনুযায়ীও শেণীবিভাগ সম্পন্ন হয়েছে যা ওয়েন-এর স্থানচ্যুতি সূত্র থেকে নেয়া হয়েছে। সূত্রটি এরূপ ঃ 'তীব্রতম বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য উচ্চতম তাপমাত্রার সাথে ব্যস্ত আনুপাতিক। এর অর্থ হলো যে, কোন বস্তু যতই উত্তপ্ত হতে থাকে, ততই বিকিরণের চূড়া পরিবর্তিত হয়ে নীল রং ধারণ করে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী উত্তপ্ততম থেকে শীতলতম অবস্থায় বর্ণালী প্রতীকগুলো দাড়ায় O, B, A, F, G, K, M. বর্ণালীর পুঙ্খানুপুঙ্খ ও ক্ষুদ্র পরিবর্তনগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হতে আরো অধিক উপবিভাগ রয়েছে। 'O' তারকাসমূহের তাপমাত্রার পার্থক্য হয়ে থাকে ৩০ হাজার থেকে ৬০ হাজার কেলভিন ডিগ্রী পর্যন্ত; এ ধরনের তারকা অপেক্ষাকৃত খুবই কম দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। কেননা, এদের জীবনকাল বা স্থায়িত্বকাল হয় অল্প সময় মাত্র। 'B' তারকাসমূহ খানিকটা শীতল। এদের তাপমাত্রা থাকে ১০ হাজার থেকে ৩০ হাজার ডিগ্রী কেলভিনের মধ্যে। 'A' তারকাসমূহ আরো শীতল, সাড়ে

www.bjilibrary.com

সাত হাজার থেকে ১০ হাজার ডিগ্রী কেলভিনের মধ্যে। 'F' তারকাসমূহের তাপমাত্রা থাকে ৬ হাজার ডিগ্রী কেলভিনের উপর এবং সাড়ে ৭ হাজার ডিগ্রী কেলভিনের নিচে। 'G' তারকা তথা আমাদের সূর্যের বর্ণালী ধরনের তারকার তাপমাত্রা ৫ হাজার ডিগ্রী কেলভিন। 'K' তারকাসমূহ অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা মাত্র সাড়ে ৩ হাজার থেকে ৫ হাজার ডিগ্রী কেলভিনের মধ্যে। 'N' তারকারা আরো শীতল, সাড়ে তিন হাজার ডিগ্রী কেলভিনের নিচে। এদের বায়ুমন্ডল এত শীতল যে, ভেঙ্গে আলাদা না করা অবস্থায় অণুগুলো অস্তিত্বমান থাকতে পারে।[৬] আরেক শ্রেণীবিভাগে তারকাদের ঔজ্জ্বল্য নির্দেশ করার জন্য একটা ঔজ্জ্বল্য পরিমাপক ব্যবহার করা হয়েছে। আলোকমিতির বিপরীত বর্গ সূত্র যার আলোক তীব্রতা আলোক উৎস থেকে দুরত্বের বর্গের ব্যস্ত অনুপাতে কমবেশী হয়ে থাকে। এই সূত্রটি সকল নিশ্চিত মাত্রা হিসাব করতে ব্যবহৃত হয়। নিশ্চিত মাত্রাসমূহ এবং বর্ণালী ধরনসমূহের উপাত্তসমূহ যে সময়ে সংগ্রহ করা হচ্ছিল সে সময় অর্থাৎ ১৯১৪ সালের দিকে ডেনমার্কের এন্জার হার্টজস্প্রাং এবং যুক্তরাষ্ট্রের হেনরি নোরিস লক্ষ্য করলেন যে, উপরোক্ত বিষয় দু'টোকে সম্পর্কিত করে একটা নকশাচিত্রে রেখাচিত্রকৃত বিন্দুসমূহ স্বতন্ত্র দলে পড়ে গেল। একটা তাপমাত্রা (কিংবা বর্ণালী শ্রেণী) বনাম ঔজ্জ্বল্য নকশা হার্টজস্প্রাং রাসেল রেখাচিত্র (এইচ-আর রেখাচিত্র) হিসেবে পরিচিত যাতে তারকারাজিকে দেখানো হয় কর্ণরেখার উপরের বাম থেকে নিচের ডান বরাবর। এভাবে দেখা যায় যে, উত্তপ্ততম তারকাগুলো শীতলতর তারকাসমূহের চেয়ে উজ্জ্বলতর। অধিকাংশ তারকাই এই দলে পড়ে যাকে বলা হয় প্রধান অনুক্রম বা বামন তারকা। বামনদের ব্যাপারে আশ্চর্যের কিছু নেই। এরাই হচ্ছে স্বাভাবিক ধরনের তারকা। সূর্য হচ্ছে 'G' ধরনের বামন। কিছু কিছু তারকা আছে যেগুলো অত্যুজ্জ্বল অর্থাৎ প্রধান অনুক্রম তারকার চেয়ে অধিকতর উজ্জ্বল। এ সকল তারকাকে তাদের ঔজ্জ্বল্যের পরিমাপের উপর ভিত্তি করে অতি দৈত্য, উজ্জ্বল দৈত্য এবং দৈত্য নামে অভিহিত শ্বেত বামন নামক অনুজ্জ্বল বস্তুর শ্রেণীভুক্ত তারকাসমূহর অবস্থান নিচে এবং প্রধান অনুক্রমের বামে। এইচ-আর শ্রেণীকরণের গুরুত্ব স্পষ্ট কেননা, এটি তারকাদের জীবন ও মৃত্যুকে তুলে ধরে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সূর্য বর্তমানে এর প্রাথমিক স্তরে রয়েছে যখন হাইড্রোজেন পরমাণু কেন্দ্র হিলিয়াম পরমাণু কেন্দ্রে একীভূত হয়ে শক্তি সরবরাহ করে থাকে। কিন্তু অল্প কয়েকশ' কোটি বছরের মধ্যে সূর্যের কেন্দ্রস্থলস্থ হাইড্রোজেন পরমাণু কেন্দ্র নিঃশেষ হয়ে গেলে একটা সময় আসবে যখন দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে উজ্জ্বলতর ও রক্তিমতর হয়ে

www.bjilibrary.com

উঠবে। শেষ পর্যন্ত এটি স্ফীত হবে এবং বুধ ও শুক্র গ্রহকে গ্রাস করে পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এই অবস্থায় সূর্য হবে অস্বাভাবিক মাত্রায় উজ্জ্বল এবং পৃথিবীর সবকিছুকেই ধ্বংস করে দেবে। এর সুবিশাল দীপ্তিমানতা অসাড় হয়ে পড়বে এবং পৃথিবীস্থ সবকিছু পুড়ে অঙ্গার করে ফেলবে।৭

একটা তারকার আবর্তনগতি ছাড়াও আরো দু'টো গতি রয়েছে, যথা ঃ নিজস্ব গতি ও রশ্মিগত গতি। দৃষ্টিরেখার সাথে লম্বভাবে দৃশ্যত কৌণিক গতিকে বলা হয় 'প্রোপার' বা নিজস্ব গতি। অধিকাংশ তারকার ক্ষেত্রেই এই গতি খুবই সামান্য এবং উপেক্ষণীয় হিসেবে বিবেচিত। বার্ণার্ড-এর তারকার রয়েছে সর্বোচ্চ নিজস্ব গতি যার পরিমাণ বার্ষিক ১০.৩ ইঞ্চি। হাজার হাজার বছর পর নিজস্ব গতির দিক পার্থক্যের কারণে একটা তারকাগুচ্ছের (নক্ষত্রপুঞ্জ) আকৃতি লক্ষণীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এভাবে, সপ্তর্ষিমন্ডলের দু'টি তারকা তথা মেজর ধ্রুব্বে এবং আলকেইডের গতির পরিমাণ ও দিক গুচ্ছটির অন্য পাঁচটি তারকা থেকে আলাদা বিধায় তাদের আকৃতি অবিরত এবং ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এক লক্ষ বছর আগের এবং এখন থেকে দশ লক্ষ বছর পরের সপ্তর্ষিমন্ডলের আকৃতিগত পার্থক্য চিত্র-৪ এ দেখানো হল।

দৃষ্টিরেখা বরাবর তারকার যে গতি সেটাই তার রশ্মিগত গতি। এটি ডপ্‌লার-এর ইফেক্ট দ্বারা পরিমাপ করা হয়। গ্রহপুঞ্জের আকৃতির উপর এর কোন প্রভাব পড়ে না। প্রায় ৬০% ভাগ তারকার রশ্মিগত গতি আছে যার পরিমাণ প্রতি সেকেন্ডে ২০ কিলোমিটার।

তারকামন্ডলী মহাশূন্যে এলোপাতাড়িভাবে ছড়ানো নয়, বরং তারা গুচ্ছাকারে অবস্থান করে। তারকাগুচ্ছ প্রধানত দু'ধরনের ঃ ছায়াপথভুক্ত তারকাগুচ্ছ এবং বটিকাকৃতি তারকাগুচ্ছ। বটিকাকৃতি গুচ্ছে রয়েছে ছায়াপথভুক্ত গুচ্ছের তুলনায় অধিক বয়স্ক তারকামন্ডলী। ছায়াপথভুক্ত তারকামন্ডলীর বর্ণালীস্থ লাল রেখাসমূহের গবেষণা করে বিজ্ঞানী হাব্‌ল ১৯২৯ সালে তার বিখ্যাত সূত্র ঘোষণা করেন। সূত্রটি হচ্ছে 'একটি ছায়াপথের শিথিলতার গতিবেগ এর দূরত্বের সাথে আনুপাতিক।৮ এ সূত্র থেকেই মহাবিশ্ব সৃষ্টিকালীন সেই মহানিনাদ বা মহাবিস্ফোরণ থেকে কত সময় পার হয়েছে তা হিসেব করা যায়। আর এটি সংঘটিত হয়েছিল দেড় হাজার কোটি বছর আগে। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন পরিশিষ্ট-২)

www.bjilibrary.com

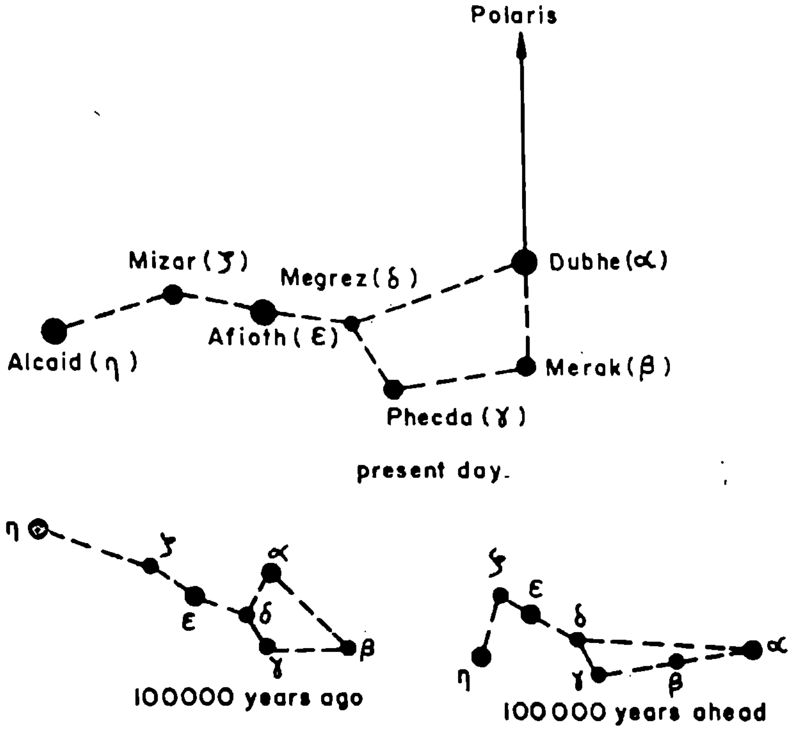

চিত্র-৪ ঃ সপ্তর্ষিমন্ডলের সাতটি প্রধান তারকার আকার ঃ এক লাখ বছর আগের, বর্তমানের এবং দশ লাখ বছর পরের।

উপরোক্ত আলোচনা স্পষ্টভাবে মহাশূন্যে চন্দ্র, সূর্য এবং তারকামন্ডলীর কার্যাবলী, কর্মকান্ড, ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য এবং গতি নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন বিধানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। সূর্য, চন্দ্র ও তারকামন্ডলীর সুবিশাল এই মহাবিশ্বের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনা, সংগঠন এবং শৃঙ্খলা দেখে অভিভূত হতে হয়। মহাবিশ্বে আসলেই কোন বিশৃঙ্খলা নেই, বরং মহাবিশ্ব স্রষ্টার নিয়ন্ত্রিত বিধান দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

www.bjilibrary.com

তথ্যসূত্র ঃ

1. Huffer, C. M., Trinklein, F. E. and Bunge, M., An Introduction to Astronomy, Holt, Rinehart and Winston Inc, New York, p. 62, 1973.
2. Ibid. p. 214
3. Ibid. p. 220.
4. Ibid p. 228.
5. Ibid p. 181.
6. Passachaff, Contemporary Astronomy, W. B. Saunders Co London. p. 25, 1977.
7. Ibid. pp. 37-38.
8. Ibid. p. 519.

www.bjilibrary.com

৫৭- وَهُوَ الَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیٰحَ بُشْرًۢا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهٖ ؕ حَتّٰۤی اِذَاۤ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّیِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰی لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

৭ ঃ ৫৭ তিনিই নিজ অনুগ্রহের প্রাক্কালে বায়ুকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। ঘন মেঘ যখন একে বহন করে নিয়ে যায় তখন আমরা তাকে নির্জীব ভূখন্ডের দিকে চালনা করি, পরে তাথেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তারপর এর দ্বারা সর্বপ্রকার ফল উৎপাদন করি। এভাবেই মৃতকে জীবিত করে থাকি যাতে তোমরা শিক্ষা লাভ কর।

বায়ুপ্রবাহ হচ্ছে গতিশীল বাতাস যা উচ্চতর বায়ুচাপ এলাকা থেকে নিম্নতর বায়ুচাপ এলাকার দিকে প্রবাহিত হয়। আল্লাহর নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী (আয়াত ১৫ ঃ ৫) এই সকল চাপ বায়ুমন্ডলে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন বল দ্বারা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

আবহাওয়াবিদ্যার ক্ষেত্রে বিউফোর্ট স্কেল বায়ুপ্রবাহের প্রবাহগতিভিত্তিক বারো রকম শ্রেণীবিন্যাস করে থাকে। এর মধ্যে চারটি ব্যাপক শ্রেণীবিন্যাস নিম্নরূপ ঃ ১. মলয়ানিল (অর্থাৎ শান্ত বায়ু প্রবাহ) যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রথম ছয় শ্রেণীর বায়ুপ্রবাহ যা ঘন্টায় ১-৩ মাইল বেগে প্রবাহিত হালকা বাতাস থেকে তীব্র বায়ুপ্রবাহ পর্যন্ত হয়ে থাকে (গতিবেগ ঘন্টায় ২৫-৩১ মাইল); ২. প্রবল বাত্যাপ্রবাহ যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে পরবর্তী চার ধরনের বায়ুপ্রবাহ ঃ মৃদু বাত্যা (গতিবেগ ঘন্টায় ৩২-৩৮ মাইল) থেকে পূর্ণ বাত্যা (ঘন্টায় ৫৫-৬৩ মাইল) পর্যন্ত, ৩. ঝড় ঘন্টায় ৬৪-৭৫ মাইল গতিবেগ সম্পন্ন; এবং ৪. ঝঞ্ঝা- গতিবেগ ঘন্টায় ৭৫ মাইল ও তার উর্ধ্বে।

অত্র আয়াতে رياح (রিয়াহা)-র অর্থ করা হয়েছে 'শান্ত বায়ু', কেননা এ শব্দগুলো সেই বায়ু প্রবাহের নির্দেশ করে যেগুলো মনোরম এবং সেসব বায়ু নয় যেগুলো অত্যন্ত তীব্র বা প্রচন্ড যার বেলায় কুরআনে ব্যবহৃত যথাযথ শব্দ হচ্ছে حاصبا (দেখুন আয়াত ৬৭ ঃ ১৭)।

২ ঃ ১৬৪ আয়াতের প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, প্রবাহিত হওয়ার সময় বায়ু ঃ ক) মেঘকে বিভিন্ন স্থানে বয়ে নিয়ে যায়; খ) দূষিত বাতাস তাড়িয়ে নিয়ে তদস্থলে সতেজ ও নির্মল বায়ু বয়ে আনে;

www.bjilibrary.com

গ) ফুলের পরাগধানী থেকে গর্ভমুন্ডে পুষ্পরেণু বহন করে পরাগায়নে সাহায্য করে যা শেষ পর্যন্ত বর্ধিত পরিমাণে ফলোৎপাদনে সহায়ক হয়; এবং ঘ) বায়ুমন্ডলে এক ধরনের তাপমাত্রার ভারসাম্য আনয়ন করে।

উপরে উল্লিখিত উপকারী ফলগুলোর মধ্যে মেঘকে বিভিন্ন স্থানে বয়ে নিয়ে যাওয়াটা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অত্যন্ত জলভারাক্রান্ত মেঘ যখন বায়ু তাড়িত হয়ে শুষ্ক অনুর্বর ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষণ করে (দেখুন ২ ঃ ১৬৪ আয়াত, কীভাবে বৃষ্টির ফোঁটা গঠিত হয় ও মাটিতে পড়ে), তখন 'মৃত ধরিত্রী' আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় প্রাণ ফিরে পায় এবং উর্বর ও সুন্দর হয়ে উঠে। আর সব রকমের শস্য ও ফসলাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

এটা পরিষ্কার যে, বায়ু প্রবাহের অনুপস্থিতিতে ঃ ক) অনুর্বর ভূমি উর্বর হত না কেননা বৃষ্টির পানি সেখানে পৌঁছত না, খ) বাতাস হয়ে পড়ত বদ্ধ ও নিশ্চল এবং দূষিত, গ) ফলের উৎপাদন ব্যাহত হয়ে পড়ত, এবং ঘ) বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রার ভারসাম্য একেবারেই নষ্ট হয়ে যেত।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বায়ু যখন প্রবাহিত হয় তখন এই সুসংবাদই সে প্রদান করে যে, আল্লাহ্‌র করুণা ও রহমত বহু রকম উপকারী ফল আকারে শীঘ্রই আসছে। এভাবে, 'বায়ুপ্রবাহ সুসংবাদ বহনকারী' হিসেবে কাজ করে থাকে।

৫৮-وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا
نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ○

৭ ঃ ৫৮ এবং উৎকৃষ্ট ভূমি–এর ফসল এর প্রতিপালকের আদেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট তাতে কঠোর পরিশ্রম না করে কিছুই জন্মায় না; এভাবে কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিভিন্নভাবে বিবৃত করি।

'আল-বালাদুত্ তৈয়্যেব' (البلد طيب) কথাটার অর্থ হলো, উত্তম ভূমি অর্থাৎ সেই মৃত্তিকা যাতে রয়েছে উপযুক্ত ভৌতিক গুণাবলী, পর্যাপ্ত জৈব ও অজৈব পুষ্টিসমূহ এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণে পানি আর যথাযোগ্য গ্যাসীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা। কোন মাটিতে যদি অন্যান্য উপাদান যথা ঃ তাপ, আলো এবং বৃষ্টিপাত কিংবা সেচ সঠিক অনুপাতে বর্তমান থাকে, তাহলে উপরোক্তরূপে বর্ণিত মাটিতে সবুজ গাছপালা জন্মে এবং উত্তম মানের পণ্য দ্রব্যাদি উৎপাদিত হয়। কিন্তু বিশুষ্ক ও অনুর্বর ভূমি এমনকি উপযুক্ত তাপ এবং পর্যাপ্ত আলো ও

www.bjilibrary.com

পানির সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও আশাব্যঞ্জক উৎপাদন দিতে পারে না। এ দু'টি প্রাকৃতিক বিষয়কে নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

মৃত্তিকা খনিজ যৌগের আকারে বর্তমান ৯২টি স্থিতিশীল প্রাকৃতিক মৌলিক পদার্থ দ্বারা গঠিত। এ সকল খনিজ যৌগ নির্দিষ্ট অনুপাতের ওজনবিশিষ্ট দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ দ্বারা গঠিত। মৃত্তিকাস্থ শিলাখণ্ড এবং খনিজ পদার্থসমূহ আকারে ভিন্ন হয়ে থাকে যার উপর ভিত্তি করে মৃত্তিকা কণাকে ব্যাপক অর্থে মোটা বালি, চিকন বা সূক্ষ্ম বালি, পলি ও কাদা এ সকল ভাগে বিভক্ত করা হয়। বিভিন্ন আকারের কণার মিশ্রণই মাটির গঠনবিভাগ নির্ধারণ করে থাকে। মাটির শক্ত অংশ অজৈব ও জৈব উভয় প্রকার পদার্থ দ্বারা গঠিত যার অনুপাত একেক মাটিতে একেক রকম হয়ে থাকে। মৃত্তিকা কণাসমূহের মধ্যকার শূন্য স্থানে বায়ু ও পানি দ্বারা পূর্ণ থাকে; এ দু'টি আবশ্যকীয় উপাদান দ্বারা উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফলদান নির্ধারিত হয়ে থাকে। মৃত্তিকার রাসায়নিক ও ভৌতিক গুণাবলী মাটিকে অজৈব পুষ্টি উপাদান, পানি এবং উচ্চহারে ফসল উৎপাদনে প্রয়োজনীয় অবস্থা নিশ্চিত করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রতিটি আবশ্যকীয় অজৈব রাসায়নিক পুষ্টিই জীবদেহসমষ্টি ও তাদের পরিবেশস্থিত জীবদেহসমূহের মধ্যে একটা জটিল চক্রাকারে বিস্তৃত হয়ে থাকে। এভাবে, মৃত্তিকা বৃহৎপুষ্টি ও ক্ষুদ্রপুষ্টি নামে শ্রেণী বিন্যাসিত ১৩টি মৌলিক পদার্থের ভারসাম্য পূর্ণ সরবরাহ দ্বারা সুসজ্জিত থাকে।

অবিরাম চাষাবাদের ফলে মাটির পুষ্টি উপাদানে একটানা ঘাটতি পড়তে থাকে, যা ফসল উদ্ভিদ দ্বারা ব্যবহারের ফলে কমতে থাকে। মৃত্তিকার ক্ষয়, নিষ্কাশন কিংবা অগ্নি দ্বারা মাটির উপরিভাগ ধ্বংস হলে নাইট্রোজেনসমূহ রূপান্তরিত হয়ে নাইট্রোজেন গ্যাস ও নাইট্রাস অক্সাইডে পরিণত হয়ে বায়ুতে ফিরে আসে। ক্ষয়, দূষণ ও নিষ্কাশিত পানির ঘাটতির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ ফসফরাস নদী ও ঝরণায় গিয়ে পড়ে। জীবদেহও তাদের পরিবেশ এবং স্বাভাবিক পুষ্টিচক্রসমূহের উপর মানুষের বৈরী কর্মতৎপরতার রয়েছে মারাত্মক প্রভাব। যদি সার দ্বারা এই ক্ষতি পুষিয়ে দেয়া না হয় তাহলে জমি ফসল উৎপাদনের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। জটিল ক্ষেত্রসমূহে মৃত্তিকা থাকে বিশুষ্ক, অনুর্বর যাতে কোন বীজের অঙ্কুরোদগম ও বৃদ্ধি সাধন সম্ভব হয় না। ইথিওপিয়ার ব্যাপারটি সাম্প্রতিককালের একটা দৃষ্টান্ত।

উত্তম মৃত্তিকা থেকে উদ্ভূত আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহ এবং অনুর্বর ভূমির বন্ধ্যাত্বের মধ্যে বস্তুত আমাদের জন্য রয়েছে এমন নিদর্শনসমূহ যার কারণে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর রহমতের জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

www.bjilibrary.com

৬৪- فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوا
بِاٰيٰتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِيْنَ ○

৭ ঃ ৬৪ অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে। তাকে ও তার সঙ্গে যারা তরণীতে ছিল তাদেরকে আমি উদ্ধার করি, এবং যারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদেরকে নিমজ্জিত করি। তারা ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়।

অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌র নিদর্শন অস্বীকারকারীদের শাস্তি স্বরূপ এক মহাপ্লাবনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধরনের শাস্তি নূহ নবীর (আ) অনুসারীদের উপর আরোপ করা হয়েছিল। কীভাবে এই প্লাবন সংঘটিত হয়েছিল অত্র আয়াতে তা বর্ণনা করা হয়নি।

মহাপ্লাবনের বিবরণ পাওয়া যায় ১১ ঃ ৪০, ২৩ ঃ ২৭ এবং ৫৪ ঃ ১১, ১২ আয়াতসমূহে। প্রথম দু'টি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ 'চুল্লি উথলে পানি বের হল', ৫৪ ঃ ১২ আয়াতে বলা হয় ঃ 'আমরাই মাটি থেকে পানির ঝরণা প্রবাহ উথলে দিলাম' এবং ৫৪ ঃ ১১ আয়াতে বলা হয় ঃ 'আমরাই আসমানের দ্বার খুলে দিলাম যাতে প্রবাহিত হল পানির স্রোতধারা।' এসব আয়াতের বক্তব্য একসাথে বিবেচনা করা হলে যা দাঁড়ায় তাহলো ঃ প্লাবনটি সংঘটিত হয়েছিল (১) বৃষ্টি, এবং (২) মাটির নিচ থেকে উথলে উঠা পানি দ্বারা।

অনেক জাতিগোষ্ঠীর লোকদের মধ্যেই একটা ব্যাপক ও ধ্বংসাত্মক মহাপ্লাবনের কথা নানাভাবে ও ভাষায় কথিত আছে। আল কুরআন, বাইবেল ও তওরাতে যদিও নূহ নবীর (আ) যামানায় একটা প্লাবন হয়েছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়, তথাপি কোন কিতাবেই এ প্লাবনের সঠিক তারিখ ও স্থানের উল্লেখ নেই। এ সকল কিতাবে প্লাবনের একই কারণ উল্লিখিত হয়েছে তথা ঃ বৃষ্টির পানি এবং মাটির তলা থেকে উথলে উঠা পানি।[১] এ তিনটি ধর্মের পেক্ষাপটে পৃথিবীর প্রতিবেশিক ইতিহাসকে প্লাবন-পূর্ব এবং প্লাবনোত্তর সময়কাল এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। কুরআনের বর্ণনার ভিত্তিতে এটা সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে, নূহ (আ)-এর নৌকা যে যায়গায় এসে থেমেছিল বা আটকে গিয়েছিল তা ছিল জুদি পর্বত (আয়াত ১১ ঃ ৪৪) এবং বাইবেল পূর্বভাগ জেন ৯ ঃ ৪ মতে, এটি ছিল আরারাত পর্বত। হযরত নূহ (আ) ছিলেন দজলা ও ফোরাতের মধ্যবর্তী মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের লোক। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বিভিন্ন কারণ অনুসারে প্লাবনকে বিভিন্নভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা ঃ ১) নদী বন্যা, ২) গলিত তুষার বন্যা, ৩) বরফ স্তূপীকৃত হওয়ার কারণে বন্যা, ৪) হিমবাহ, ৫) ভূমিধস,

www.bjilibrary.com

৬) উলকা সৃষ্ট উপদ্রবজনিত বন্যা, ৭) অ-উষ্ণমন্ডলীয় মহাসাগরের ঝড়, ৮) বেলোর্মি তথা স্তরচ্যুতি কিংবা অন্য কোন কারণে মহাসাগর তলের আকস্মিক আলোড়ন অথবা আগ্নেয়গিরির আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতের কারণে সংঘটিত প্লাবন।[২]

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার ভূতত্ত্ববিদ্ এমিলিয়ানি এবং তার সহকর্মীগণ[৩] খ্রিঃ পূঃ ৯৬০০ সালের উপকূলীয় প্লাবনের প্রাকৃতিক প্রমাণের বিবরণ তুলে ধরেছেন। উপকূলীয় বন্যা দু' ধরনের। কিছু কিছু ঘটে উল্কা সংক্রান্ত বিশৃংখলার কারণে আর বাকীগুলো ঘটে ভূকম্পন সংক্রান্ত উত্তেজনার কারণে।

হিমবাহীয় চক্র এবং সাগরতলের ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে যাওয়া যুগে যুগে সাগরের উপরিতলের উচ্চতায় পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ফেয়ারব্রিজ[৪]-এর মতে, বিগত মহাপ্লাবন চলাকালে হিমবাহীয় সিকি শতাব্দীতে সাগর স্তরের উচ্চতা ১০০ মিটার বৃদ্ধি পেয়েছিল। দজলা ও ফোরাত উপত্যকায় প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য প্রমাণাদি এবং মিসিসিপি উপত্যকায় প্রাপ্ত ভূতাত্ত্বিক সাক্ষ্য প্রমাণাদি ৬০০০ বছর আগে সংঘটিত চরম দুর্যোগপূর্ণ ও ব্যাপক দৃষ্টি আকর্ষক প্লাবনেরই প্রমাণ দেয়। যতদূর জানা যায়, প্রথম যে ঐতিহাসিক প্লাবনটি রেকর্ড করা হয় সেটি ছিল খ্রিঃ পূঃ ২২৯৭ সালে চীনের হোয়াং হো নদীর বন্যা। কুরআনে উল্লিখিত প্লাবণের কারণ ছিল ১) বৃষ্টির পানি এবং ২) মাটির নিচ থেকে উথলে উঠা পানি। আর আধুনিক ভূতাত্ত্বিক শ্রেণীবিন্যাসের দৃষ্টিতে বন্যার কারণ মিশ্র তথা ঃ ১) নদীতে বন্যা এবং ২) উল্কা সংক্রান্ত বিক্ষোভ বা উত্তেজনা। নদীর বন্যাই বন্যার প্রধান কারণ যা যে কোন ঋতুতেই ঘটতে পারে। এ ধরনের বন্যার প্রধান প্রধান কারণের মধ্যে রয়েছে ঃ ভারী বৃষ্টি এবং লক্ষণীয়ভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি। এই প্রকারের বন্যার আগাম আভাস পাওয়া সম্ভব। ১০০ বর্গমাইল এলাকা পানি বিধৌতকারী মাঝারি আকৃতির নদীর ক্ষেত্রে বৃষ্টিপাতের রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে বন্যার পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব। অধিকতর বৃহৎ অঞ্চল বিধৌতকারী দীর্ঘতর নদীর ক্ষেত্রে আরো বেশী সঠিক পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব। নূহ নবী (আ) আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের দ্বারা প্লাবনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যে সম্পর্কে ৭ ঃ ৬২, ১১ ঃ ৩৭ এবং ২৩ ঃ ২৭ আয়াতত্রয় থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়। ৫৪ ঃ ১১, ১২ আয়াতদ্বয়ের মতে, প্রথমে এসেছিল বৃষ্টি আর তারপরেই উল্কা বিক্ষোভ। উল্কা বিক্ষোভ হয়ে থাকে ভূ-কম্পীয় বিক্ষোভ তথা সামুদ্রিক ভূমিকম্প, সাগরতলীয় বিক্ষোভ ইত্যাদি।

এমিলিয়ানির মতে, বিগত ৬ হাজার বছর ধরে গড়পড়তা সাগরতলীয় উচ্চতা আপেক্ষিকভাবে অপরিবর্তিত রয়েছে। বিগত ৬ হাজার বছরে সাগরতলীয় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উচ্চতা বর্তমানের ১০ থেকে ১২ ফুট বেশী বা কম উচ্চতায়

www.bjilibrary.com

বেশ-কম হয়েছে। ১১০০ থেকে ১৬৫০ বছরের শব্দবিজ্ঞান থেকে মনে হয় সাগরতলের উচ্চতায় কমবেশী হওয়ার সময়কাল হবে প্রায় ৫৫০ বছরের এক চক্রের মত।

জীবাশ্ম রেকর্ড, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এবং এক্কাডীয়, সুমেরীয়, বেবিলনীয় এবং নিনেভীয় তথ্য প্রমাণাদির কুরআন ও বাইবেলের বর্ণনার সাথে এত মিল পাওয়া যায় যে, এই প্লাবনের সত্যতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। বিভিন্ন বর্ণনার ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে অনেক কিছু লেখা হয়েছে। বিশেষত স্যার লিওনার্দ উলীর 'উর অফ দ্য শ্যালডিস'-এর প্রকাশনার পর থেকে।[৫]

মেসোপটেমীয় নদী-উপত্যকার অন্যান্য প্রধান প্রধান শহর যথা কিশ, ফারে এবং নিনেভে-তেও প্লাবন স্তর দেখা যায়, যদিও এদের কোনটাকেও সময় দিয়ে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত করা যায় না। অন্য কথায়, মেসোপটেমীয় প্লাবনের সাক্ষ্য প্রমাণ নিছক দজলা ও ফোরাতের স্থানীয় প্লাবনকেই নির্দেশ করে। আল কুরআন নূহ-নবীর (আ) অনুসারীদের সাথে মহাপ্লাবনকে সম্পৃক্ত করেছে (৭ ঃ ৫৯, ২৫ ঃ ৩৯ আয়াত দ্রঃ), অর্থাৎ প্লাবনটি ছিল স্থানীয়, বিশ্বব্যাপী নয়।

আধুনিক জ্ঞানের আলোকে দেখলে প্লাবনটির কুরআনে বিধৃত বর্ণনায় এমন কিছু নাই যা কোন বিষয়গত সমালোচনার জন্ম দিতে পারে।[১]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সত্য বেরিয়ে আসে। যথা ঃ ১. নূহ (আ) নবী আল্লাহ্‌র নির্দেশে একটা সুবিশাল 'নৌকা' নির্মাণ করেছিলেন; ২. প্লাবনটি সংঘটিত হয়েছিল সংযুক্ত ভূতাত্ত্বিক ও উল্কা বিক্ষোভের কারণে; ৩. নূহ (আ) আল্লাহ্‌র নির্দেশনায় বিপর্যয়কর প্লাবনটির আগাম পূর্বাভাস দিতে পেরেছিলেন; ৪. আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানসমূহ মেসোপটেমিয়ার নিকটবর্তী অঞ্চলে এমন একটা মহাপ্লাবন সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত করে যা কুরআনের অধিকাংশ মুফাস্‌সির সেই মহাপ্লাবনের সংঘটনস্থল বলে গ্রহণ করে থাকেন।

নূহ (আ)-কে জাহাজ নির্মাণ প্রকৌশলের অগ্রদূত বিবেচনা করা যায়। তাঁর অনুসারীগণের পক্ষে জাহাজ নির্মাণে কোন অভিজ্ঞতা থাকাটা সম্ভব ছিল না, কেননা, তারা কোন সমুদ্রগামী জাতি ছিল না। এমনকি আধুনিক কম্পিউটার এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অভাবনীয় অগ্রগতি সত্ত্বেও আবহাওয়াবিদগণ বন্যা সম্পর্কে সঠিক-নির্ভুল দীর্ঘমেয়াদী পূর্বাভাস দান দুরূহ ব্যাপার বলে মনে করেন। বিশেষত এই আবহাওয়াগত সমস্যার ক্ষেত্রে জড়িত বহুসংখ্যক স্থিতিমাপের দৃষ্টিতে সত্যি বিস্ময়কর যে, হযরত নূহ (আ) নির্ভুলভাবেই প্লাবনের পূর্বাভাস লাভ করেছিলেন এবং এটা তাঁর পক্ষে তখনই সম্ভব হয়েছে যখন তিনি আল্লাহ্‌র নিকট

www.bjilibrary.com

থেকে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। আল কুরআন চৌদ্দশ' বছর আগে এ ঘটনা রেকর্ড করে আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানসমূহ দ্বারা যার সত্যতা নিশ্চিত হয়।

তথ্য সূত্র ঃ

1. Bucaile. M., The Bible, the Quran and Science, p. 218, 1985.
2. Encyclopaedia Americana, American Corporation International, Connecticut, 1979.
3. Emiliani, C., et al Paleo Climatological Analysis of Late Quarternary Cores from North Western Gulf of Mexico, Science, 1, p. 1085, 1975.
4. Farbridge, R. W., The Changing Level of the Sea, Scientific American, pp. 1-11, 1960.
5. Wolley, L., Ur of the Chaldees, Vol. II, 1954.

www.bjilibrary.com

৮০. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ○

৮১. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ○

৭ ঃ ৮০ এবং লূতকেও পাঠিয়েছিলাম। সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা এমন কুকর্ম করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি।'

৭ ঃ ৮১ 'তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারীকে ছেড়ে পুরুষের নিকট গমন করছ, তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।'

৭ ঃ ৮০ আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, হযরত লূত (আ)-এর অনুসারীরা যৌনবিকৃত জাতি ছিল, তাদের অধিকাংশ পুরুষই আল্লাহ্‌র অনুমোদিত অন্য বা বিপরীত লিঙ্গের সাথে যৌনক্রিয়ার স্থলে পুরুষের সাথে সমকামিতা পছন্দ করত। আল্লাহ্ আরো বলছেন যে, লূত জাতির আগে বিশ্বের কোন জাতি বা গোষ্ঠীই এ ধরনের পাপ কাজে লিপ্ত হয়নি। ইহুদিদের বাইবেল থেকে আমরা জানতে পারি যে, লূত (আ)-এর স্বদেশ সোডোম এবং গোমোর্‌রাহ্ নামে পরিচিত ছিল এবং মৃত সাগরের দক্ষিণ প্রান্তভাগে অবস্থিত ছিল বলে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। এ ধরনের যৌন বিকৃতি প্রধানত পুরুষদের সমলিঙ্গ যৌনকর্ম বা পায়ুকাম নামে পরিচিত।

প্রাচীন এশীরীয়, মিশরীয়, ক্যাটগাগিনিয়ান, সিথীয়ান, নরমান, রোমক এবং গ্রীক জাতিসমূহের মধ্যে এই যৌন বিকৃতির ব্যাপারটা জানা ছিল। কোন স্থানেই তবে এটা না ছিল কোন সাধারণ্যে প্রচলিত ব্যবস্থা আর না ছিল চিরন্তন কোন চর্চারীতি। কুরআনের ভাষ্যমতে, সোডোম ও গোমোররাহ্‌বাসীরা এদিক দিয়ে ছিল অদ্বিতীয়।

লূত জাতির লোকদের অসচ্চরিত্রতার প্রকৃতি স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে এবং ৭ ঃ ৮০ আয়াতে অসচ্চরিত্রতা দ্বারা পুরুষ সমকামিতার দিকে বিশেষভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সমকামিতাকে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত সীমার লংঘন হিসেবে দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞান সমলিঙ্গ ব্যক্তির প্রতি যৌন অনুভূতিকে যৌন বিকৃতি হিসেবে গণ্য করে এবং এটি নানাভাবে তথা যৌন বিপর্যয়, উল্টো যৌনানুভূতি এবং অধিক সাধারণ্যে সমকামিতা হিসেবে পরিচিত।

www.bjilibrary.com

মধ্যযুগে ইউরোপে সমকামিতা ছড়িয়ে পড়েছিল সামরিক শিবির এবং মঠ বা আশ্রমসহ কিছু কিছু সীমাবদ্ধ গোষ্ঠীর মধ্যে এবং প্রায়শ্চিত্ত বিধান গ্রন্থে সর্বদাই এটির উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কোলিয়ার্স-এর বিশ্বকোষে ব্রাসেল্‌স্[১] লিখছেন যে, সমকামিতা সাধারণভাবে পশ্চাদমুখী মানসিক গোলযোগ, মানসিক ব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তিত্ব, কিছু কিছু মদ্যপায়ী ও মাদকাসক্ত ব্যক্তি এবং বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহে বসবাসকারীদের মধ্যে দেখা যায়। ফ্রয়েড সমকামিতাকে প্যারানইয়া বা মস্তিষ্ক বিকৃতি এবং মাদকাসক্তির সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। ছোট ছোট বালকের সাথে যৌন সংসর্গকারী লোকদের মধ্যে যে ধরনের সমকামিতা দেখা যায় তার নাম দেয়া হয়েছে 'পিডার‍্যাসটি।' পাশ্চাত্য দেশগুলোতে সাম্প্রতিককালে পুরুষ সমকামিতা অনেক প্রচার-পরিচিতি পেয়েছে এবং কিছু কিছু দেশে এটি বেশ গ্রহণযোগ্যতাও লাভ করেছে। বিগত দশক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সমকামিদের মধ্যে এইডস AIDS-(একোয়ার্ড ইম্মিউন ডেফিশিয়েন্সি সিনড্রোম) নামে চিকিৎসা অযোগ্য এক ধরনের রোগের খবর পাওয়া গেছে যা বহুসংখ্যক লোকের মৃত্যু ঘটিয়েছে। পরবর্তীকালে সমগ্র ইউরোপ ও বিশ্বের অপরাপর অংশে এইড্‌স রোগ ছড়িয়ে পড়ে। এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ যা সংক্রমণের বিরুদ্ধে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে ফেলে এবং প্রাণনাশক প্রমাণিত হয়। এইডস প্লেগ রোগের মত মানব জীবনের জন্যে বিরাট হুমকি হিসেবে ব্যাপকতা লাভ করেছে (পরিশিষ্ট-৩ দেখুন)।

তথ্য সূত্র ঃ

1. Brussels, J. A. Collier's Encyclopaedia, Vol. 17, New York. p. 499, 1956.

www.bjilibrary.com

٨٤- وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۝

৭ ঃ ৮৪ তাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, সুতরাং অপরাধীদের পরিণাম কী হয়েছিল তা লক্ষ্য কর।

এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, লূত (আ) নবীর অনুসারীদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছিল, যারা ছিল পাপী। না সেই বর্ষণের প্রকৃতি, আর না তার পরিণতির কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় এ আয়াতে। এটা বুঝতে হলে আমাদেরকে সেই সকল আয়াতের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে যাতে নূহ (আ)-এর সময়ে সংঘটিত ঘটনাবলি বিধৃত হয়েছে। আরো দশ দশটি আয়াত রয়েছে যাতে এ ঘটনাটির বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ আয়াতগুলো হচ্ছে ঃ ৭ ঃ ৪; ১১ ঃ ৮২; ১৫ ঃ ৭৩, ৭৪; ২১ ঃ ৭৪; ২৭ ঃ ৫৮; ২৯ ঃ ৩৪; ৩৭ ঃ ১৩৬; ৫১ ঃ ৩৩; ৫৪ ঃ ৩১।

এমন কোন স্থান বা দেশের উল্লেখ নেই যেখানে এই লোকেরা বাস করত এবং এ সকল ঘটনা ঘটেছিল, শুধুমাত্র দু'টি আয়াত ছাড়া যাতে বলা হয়েছে যে, এটি ছিল সেই কাফেলা চলার পথ যা আরবরা কুরআন নাযিলের সময়ে ব্যবহার করত। বাইবেলে হযরত লূত (আ) নবীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ 'আচমকাই প্রভু সোডোম ও গোমোররাহতে গন্ধক বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাদেরকে ও সেখানকার লোকজন এবং জমিতে যা কিছু জন্মেছিল সব কিছুসহ সমগ্র উপত্যকা ধ্বংস করে দেন। (সৃষ্টিতত্ত্ব ১৯ ঃ ২৪, ২৫)। সোডোম ও গোমোররাহ্র বিষয়টি ৭ ঃ ৪ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘটনাটি সম্পর্কে প্রাপ্ত কুরআনের এগারোটি আয়াতের মধ্যে তিনটি শুধুমাত্র বৃষ্টির (বর্ষণ) কথাই বলে, বর্ষণের প্রকৃতি এবং এর পরিণতি সম্পর্কে কিছু বলে না। দু'টি আয়াতে (আয়াত ১১ ঃ ৮২ এবং ১৫ ঃ ৭৪) বলা হয় যে, কঠিন ইটের বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল। একটিতে (আয়াত ১৫ ঃ ৭৪) বলা হয়েছে যে, শহরগুলো উল্টিয়ে দেয়া হয়েছিল, অর্থাৎ ভূমিকম্প হয়েছিল। আরেক আয়াতে (আয়াত ৫১ ঃ ৩৩) বলা হয়েছে যে, মৃত্তিকা প্রস্তর পাঠানো হয়েছিল। দু'টি আয়াতে (আয়াত ১৫ ঃ ৭৩ ও ৫৪ ঃ ৩১) বলা হয় যে, প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দ সমগ্র এলাকাটিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

٩١- فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ۝

৭ ঃ ৯১ অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল, ফলে তাদের প্রভাত হল নিজগৃহে অধোমুখে পতিত অবস্থায়।

www.bjilibrary.com

এ আয়াতে ভূমিকম্প দ্বারা জীবন ও সম্পদের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ভূমিকম্প কর্তৃক ধ্বংসাত্মক ক্ষয়ক্ষতির বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। এক ভূমিকম্পে সান ফ্রান্সিসকোতে আড়াই লাখ লোক মারা যায়। ১৯৩৪ সালে বিহারে সংঘটিত ভূমিকম্প এবং কোয়েটায় সংঘটিত আরেক ভূমিকম্পেও হাজার হাজার প্রাণহানি ঘটে।

ভূপৃষ্ঠের কাঁপুনি বা ঝাঁকুনিগত আন্দোলনই হচ্ছে ভূমিকম্প। এই প্রাকৃতিক ঘটনাটির তীব্রতা শুধুমাত্র সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে উপলব্ধি করার মত। সামান্য ভূকম্পন থেকে শুরু করে ভূপৃষ্ঠের উপরিতলের গঠনে ব্যাপক পরিবর্তন সাধনকারী বিরাট আলোড়ন পর্যন্ত হয়ে থাকে যা জীবন ও সম্পদের প্রভূত ধ্বংস ডেকে আনে। ভূমিকম্পের ভূগর্ভস্থ উৎপত্তিস্থলকে বলা হয়ে থাকে কেন্দ্রবিন্দু, আর কেন্দ্রবিন্দুর সোজা ভূপৃষ্ঠস্থ বিন্দুকে বলা হয়ে থাকে উপকেন্দ্র।

১৯৩৫ সালে সি এফ রিখ্টার ভূমিকম্প মাপার জন্য রিখ্টার স্কেলের প্রবর্তন করেন। এই স্কেল ভূমিকম্পের মাত্রা M-কে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়ে থাকে ঃ এম = লগ১০(এ/এও), যেখানে এ (A) হচ্ছে উপকেন্দ্রের একশ' কিলোমিটার দূর থেকে ভূমিকম্প পরিমাপক যন্ত্র দ্বারা রেকর্ডকৃত সর্বোচ্চ বিস্তৃতি, এও (A_0) হচ্ছে এক মিলিমিটারের এক সহস্রাংশ বিস্তৃতি। ৫ কিংবা ততোধিক বিস্তৃতি বিশিষ্ট ভূমিকম্প বিভিন্ন ভবন কাঠামো ধ্বংসের পক্ষে যথেষ্ট মারাত্মক ভূ-আলোড়ন সৃষ্টি করে থাকে।

খুবই স্বল্প স্থায়িত্ব এবং মাঝারী ত্বরণের কারণে ৫.০-এর কম মাত্রায় ভূ-আলোড়ন ধ্বংসাত্মক হয় না। ইতিপূর্বে অনুমান করা হত যে, শিলাস্তরের স্তরচ্যুতি সৃষ্টিকারী ভূগর্ভস্থ আলোড়ন কর্তৃক ভূপৃষ্ঠে প্রদত্ত ঝাঁকি থেকেই ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপ চলাকালে গ্যাস কিংবা লাভা দ্বারা, অথবা পর্বতগুহার ছাদ ভেঙ্গে পড়া থেকেও ভূমিকম্পের উৎপত্তি হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। বিগত বিশ বছরে ভূবিজ্ঞানে এক বিপ্লব সাধিত হয়েছে যা আমাদের এই গ্রহ সম্পর্কে নতুন ধারণা এনে দিয়েছে। এই বিপ্লবের ফলে যে সকল বল মহাদেশের আকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের সম্প্রবাহ বজায় রাখে সেগুলো সম্পর্কে অধিকতর ধারণা দান করেছে। আমাদের গ্রহটির ভূ-পৃষ্ঠটি বেশ কিছুসংখ্যক শীতল, শক্ত, একশ কি.মি. পুরু শিলাময় ভূ-ফলকের টুকরায় বিভক্ত। এগুলো এসথেনোস্ফিয়ার নামে পরিচিত একটা উষ্ণ, অপেক্ষাকৃত নমনীয় এবং অংশত গলিত অঞ্চলের উপর ভাসছে। ফলকগুলো ধীরে ধীরে বার্ষিক ৫ থেকে ১০ সেন্টিমিটার গতিতে চলে এবং

www.bjilibrary.com

এগুলো দৃশ্যত বহিরাবরণে তাপ সঞ্চালন গতি এবং অভিকর্ষ দ্বারা তাড়িত। ভূতাত্ত্বিকগণ মনে করেন, কিছু পরিমাণে নতুন নতুন শিলা বহিরাবরণ থেকে সমুদ্রতলস্থ পর্বত শ্রেণীর ধার ঘেঁষে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে এবং পাশাপাশি ছড়িয়ে পড়ছে এবং নতুন ভূত্বক গঠন করছে যা মহাদেশের দিকে এগিয়ে আসছে। সমুদ্রতলস্ফীতি নামীয় এই প্রাকৃতিক ঘটনাই ভূ-ফলকের সম্প্রবাহ ঘটিয়ে থাকে। অধিকাংশ ভূভাগীয় ঘটনাই সংঘটিত হয় যখন ভূ-ফলকের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্নি-উদগীরণ, পর্বত গঠন ইত্যাদি ভূফলকসমূহের ব্যাপক অথচ ধীরগতিসম্পন্ন সংঘর্ষের ফলেই ঘটে থাকে। যদি ভারী মহাসাগরীয় শিলার একটা ফলক অধিকতর প্লবমান কোন মহাদেশীয় শিলা ফলকের সাথে ধাক্কা খায়, তাহলে এটি ঐ ধাক্কার চাপে ভিতরের দিকে বসে যায়। এটি ভিতরে ঢুকে যেতে থাকলে উত্তপ্ত হয়ে উঠে এবং শেষ পর্যন্ত গলে উপরের দিকে উঠে যায় এবং আগ্নেয়গিরির মধ্য দিয়ে বিস্ফোরিত হয়। দু'টি মহাদেশীয় ভূ-ফলকের মধ্যে যখন সংঘর্ষ বাঁধে, তখন সংঘটিত হয় ভূমিকম্প। মারাত্মক অবস্থার ক্ষেত্রে মহাদেশসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়ে। এমন অবস্থায় গড়ে উঠে রকি এবং হিমালয় পর্বতমালার মত বিশাল ভঙ্গিল পর্বতমালা। কাজেই, ভূ-ফলকসমূহের চাপ যখন তাদের দৃঢ়তাকে ছাড়িয়ে যায় তখনই ফলকসমূহের বহির্দেয়ালে ভূমিকম্প ঘটে। তখন ভূত্বকে ফাটল দেখা দেয় এবং ফলকসমূহ সরে যায় যাতে চাপ এতটা কমে যায় যে, তা শিলাগুলোর পক্ষে সহনীয় হয়।

প্রচণ্ড ভূমিকম্প সংঘটিত হয়ে থাকে ভূতলের বলতে গেলে গোটা দুই অঞ্চলে; একটি হচ্ছে ভূমধ্যসাগরের রেখা বরাবর তথা এশিয়া মাইনর, হিমালয় পর্বতমালা এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ যা ইউরো-এশিয়ান, আরব, অস্ট্রো-এশিয়া এবং ফিলিপাইন ভূ-ফলকের সীমারেখা। অপরটি পশ্চিম, পূর্ব ও উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকা বরাবর যা প্রশান্ত মহাসাগরীয়, উত্তর আমেরিকার এবং দক্ষিণ আমেরিকার ভূ-ফলকের সীমারেখা।

١٣٣- فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ
مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ○

৭ ঃ ১৩৩ অতঃপর আমি তাদেরকে প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করি। এগুলো হচ্ছে স্পষ্ট নিদর্শন; কিন্তু তারা দাম্ভিকই রয়ে গিয়েছিল, আর তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়।

www.bjilibrary.com

অত্র আয়াতে মূসা (আ) এবং তার অনুসারীদের নিকট আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত পাঁচটি প্লেগ তথা মহামারী রোগব্যাধি বা চরম দুর্দশার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মূসা (আ) কর্তৃক বারংবার সতর্কবাণী দেয়ার পরও কৃত ঔদ্ধত্যের শাস্তি হিসেবে আল্লাহ্ এ সকল মুসিবৎ পাঠিয়েছিলেন যা আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

'আততুফান' (الطوفان) অর্থ অবিরাম বর্ষণ, সেই সাথে ঝড়-ঝঞ্ঝা। এ সকল প্রাকৃতিক ঘটনা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশসমূহে অত্যন্ত স্পষ্ট ও সাধারণ ব্যাপার, যা এখানে আর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দরকার পড়ে না। তেমনি, 'কুম্মাল' (قمل) অর্থ কীট, মুষিকাদি তথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরভূক পোকা যেগুলো মানুষের অসুবিধা ঘটায় ও সেই সাথে রোগবালাইকে আশ্রয় দেয় এবং রোগজীবাণুর বাহক হিসেবে কাজ করে। এ প্রসঙ্গে জোঁকের কথা উল্লেখ্য, যা সাংঘাতিক শারীরিক অসুবিধা সৃষ্টি করে কিংবা উদ্ভিদের পোকার কথা উল্লেখ করা যায়, যাদের নাশকতামূলক তৎপরতা কোন কোন অবস্থায় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় যা তাদের দ্রুত বর্ধনে সহায়ক এবং এখানে সেগুলো আর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা করা হল না।

পঙ্গপাল ঃ পঙ্গপাল অর্থপ্টেরা শ্রেণীর ইন্সেক্টা বর্গের অন্তর্ভুক্ত। ঝিঁঝি পোকা এবং ফড়িং এ জাতীয় প্রাণী যাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জোরালো চিবন-চোয়াল, এবং লাফানোর জন্যে বড় আকারের পেছনের পা। এরা দেখতে ঠিক বড় ঘাস ফড়িং এর মত। বহু সংখ্যকের একসাথে উপস্থিতিতে এরা সঙ্গলিপ্সু হয়ে পড়ে, অর্থাৎ দলবদ্ধ হতে চায়। এরা দিনের বেলা লাখ লাখ এমনকি অনুকূল বায়ু প্রবাহ এবং তাপগত অবস্থার উপর ভিত্তি করে বহু লক্ষ সংখ্যা বিশিষ্ট বিশাল ঝাঁকে এক স্থান থেকে অন্যত্র চলে যায়। এই ঝাঁক মাটি থেকে বেশ উঁচু পর্যন্ত এমনকি সম্ভবত এক হাজার মিটার কিংবা তারও বেশী বিস্তৃত হয়ে থাকে।[১] ঘন্টায় ১০ থেকে ২৫ কিলোমিটার গতিতে এমন বিশাল সংখ্যক পঙ্গপালের ঝাঁক যখন আসে তখন এরা আকাশ কালো বা অন্ধকার করে ফেলে। এরা সবুজ গাছপালার সন্নিকটবর্তী উন্মুক্ত স্থানে ডিম পাড়ে এবং অনুকূল অবস্থায় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিশাল সংখ্যায় বংশ বিস্তার ঘটায়। 'সিস্টোসেরা গ্রেগ্যারিয়া' নামীয় মরুভূমির পঙ্গপাল পশ্চিম আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত দেখা যায় এবং উত্তরে ইরান থেকে দক্ষিণে কেনিয়া পর্যন্ত এদের বসবাস অঞ্চল বিস্তৃত।

'লোকস্টা মাইগ্রেটরিয়া' নামে অতিথি পঙ্গপাল অনেক বেশী এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত। এদের অবস্থান আফ্রিকা থেকে পূর্বে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।[১] নিকটপ্রাচ্যে পঙ্গপাল সর্বদাই প্রচুর সংখ্যায় বিদ্যমান, বছরের ফাঁকে ফাঁকে কিছু সময় বাদে এদের দেখা যায়। দর্শন ও রাসায়নিক ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে এরা

এদের খাদ্য এবং খাদ্যের অবস্থান নির্ণয় করে থাকে। এরা প্রাচীন মিশরে[২] আবাদকৃত বহু রকম শস্যের উপর চড়াও হত, যেমন ঃ গম, বার্লি, রাই এবং শণ। পঙ্গপালের পূর্ণ আহারের পরিমাণ এর দেহের ওজনের শতকরা প্রায় ১৫% ভাগ। সারাদিন ধরে খাদ্য খাওয়ার সুযোগ পেলে এরা দৈনিক নিজ দেহের ওজনের সমান শস্য খেয়ে ফেলতে পারে। ১০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা বিস্তৃত এক ঝাঁক পঙ্গপাল দিনে মোট ২ হাজার টনের মত সবুজ শস্য সাবাড় করে ফেলে।[৩] এভাবেই, পঙ্গপাল বিশেষত আফ্রিকা ও এশিয়ায় খাদ্য শস্যের অবর্ণনীয় ক্ষতিসাধন করে থাকে এবং ফেরাউনের মিশরে এরাই দুর্ভিক্ষের কারণ ঘটিয়ে থাকবে এটা সুনিশ্চিত।

ব্যাঙ ঃ প্রাচীন মিশরে ক্ষতিকারক পোকা হিসেবে ব্যাঙ অপরিচিত ছিল না। নদ-নদীসমূহ পূতিগন্ধময় হয়ে পড়লে কিছু রাসায়নিক পদার্থ এবং পোকাজীবন যুক্ত হয়ে ব্যাঙের বংশবৃদ্ধির উপযুক্ত পরিবেশ বা অবস্থার সৃষ্টি হয়। ফেরাউনের সময়কালে সহসাই যে ব্যাঙের সংখ্যা বেড়ে যায় তার কারণ হতে পারে এই যে, নিম্নে আলোচিত লোহিত জোয়ারে পানি দূষণের কারণে জল সাপের মত ব্যাঙ শিকারী প্রাণীর ব্যাপক মড়কের মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক প্রতিবেশের ভারসাম্যের ব্যাঘাত ঘটেছিল।

রক্ত ঃ স্পষ্টতই এটি 'লোহিত জোয়ার' নামে এমন এক প্রাকৃতিক ঘটনার সাথে সম্পর্কিত যা প্রাচীন কাল থেকেই পরিচিত এবং যার পুনরাবৃত্তি ঘটতে ঘটতে বর্তমানকাল পর্যন্ত এসে ঠেকেছে। সাগরের পানি যখন বিশেষত ডাইনোফ্লাগেলেটস সহ ভাসমান জীবাণুসমূহে ভরে যায়, যার মধ্যে রয়েছে রক্তিম কিংবা বাদামী রঞ্জকতন্তু, তখন পানি স্বচ্ছতা হারিয়ে লাল হয়ে যায়। আর এথেকেই সৃষ্টি হয় 'লোহিত জোয়ার' যা প্রাচীনকাল থেকে বিশ্বের অনেক অংশেই পরিচিত। মিশরের লাগোয়া লোহিত সাগরের মত কিছু কিছু পরিবেশ এতই সাধারণ যে, এই নাম অনুসারেই এর নামকরণ পর্যন্ত হয়ে গেছে।[৩] যে সমস্ত কারণে 'লোহিত জোয়ার' ঘটে থাকে তা যথাযথভাবে অনুধাবন করা হয় না, পুষ্টি স্তর, নকশা অঙ্কন ধাতুর উপস্থিতি, পয়ঃপ্রণালী নিঃসরণ, সাগরের লবণাক্ততা, তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ এবং আলো—এসব কিছুই কোন ভূমিকা পালন করতে পারে।

বিরূপ অবস্থায় ডাইনোফ্ল্যাগেলেট্‌সমূহ পানির তলায় চলে যায় এবং নতুন উদ্যমে তৎপর হওয়ার মত অনুকূল পরিবেশ না পাওয়া পর্যন্ত বিশ্রামার্থ স্ব স্ব পুঁজকোষ সুপ্ত অবস্থায় থাকে। কিছু কিছু ডাইনোফ্ল্যাগেলেট যে বিষ উৎপাদন করে থাকে তা অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন স্নায়ু জৈববিষ। এতে মাছ সরাসরি

www.bjilibrary.com

বিষাক্ত হয়ে পড়তে পারে। চিংড়ি বা কাঁকড়া জাতীয় খোলবিশিষ্ট মাছ এগুলো দ্বারা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও এদের সঞ্চিত বিষ মানুষের ভক্ষণের পক্ষে বিপজ্জনক। ১৯৭২ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দ্য নিউ ইংল্যান্ড কোস্ট সর্বপ্রথম লোহিত জোয়ার -এর অভিজ্ঞতা লাভ করে যাতে 'গোনিঅউল্যাক্স এক্সক্যাভ্যাটা' তথা ডাইনোফ্ল্যাগলেট দ্বারা বিষাক্ত খোলবিশিষ্ট মাছ খেয়ে বিষক্রিয়ায় ২৬ জনের প্রাণহানি ঘটে। লোহিত জোয়ার একটা পৌনঃপুনিক প্রাকৃতিক সমস্যা। ১৯৭৪ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার পশ্চিম উপকূল ১৮৪৪ সালের পর পঁচিশ বারের মত লোহিত জোয়ারে বিধ্বস্ত হয়, যাতে লক্ষ লক্ষ মরা মাছ সাগর সৈকত জুড়ে ছড়িয়ে স্তূপের মত গাদাগাদি করে থাকে।[৪] হ্যাস্টিংস[৫] লক্ষ্য করেন যে, নীল নদ যখন জুন মাসে পানিতে ভরে উঠে, তখন এর পানি বিবর্ণ হয়ে যায় এবং আগষ্ট মাসে যখন পানি কানায় কানায় পূর্ণ হয় তখন ক্রমেই পানি ধূসর লাল রং ধারণ করে। ব্যাপারটি বহু পর্যটকই নিশ্চিত করেছেন যারা বলেছেন যে, পরবর্তী পর্যায়ে পানি থেকে অসহ্য রকম দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসে। এই দুর্গন্ধ এবং সেই সাথে লোহিত জোয়ারের বিষাক্ত প্রকৃতি নিশ্চয়ই ফেরাউনের আমলে নীলনদের পানিকে মারাত্মকভাবে দূষিত করেছিল যা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর স্বাস্থ্যের উপর বিপর্যয়কর প্রভাব ফেলেছিল।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Chapman, R. F. A Biology of Locusts. Edward Arnold (Publishers) Ltd. London, pp. 1-65. 1976.
2. The Holy Bible, Exodus 10 : 22-24.
3. Carson, R., The Sea. Granada Publishing, London. 1976.
4. Raven, P. and Evert, R. F., Biology of Plants, 3rd ed., Worth Publishers, Inc., New York. p. 280, 1981.
5. Hastings, J., Dictionary of the Bible, 2nd ed., T. and T. Clarke. Edinburgh, p. 755.

১৫৮- قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعَا الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۠ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الَّذِىْ
يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

৭ ঃ ১৫৮ হে মুহাম্মদ বলুন, 'হে মানুষ, আমি তোমাদের সকলের প্রতি সেই আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী যিনি জমীন ও আসমানের বাদশাহীর একচ্ছত্র মালিক। তিনি ছাড়া আর কেউ আল্লাহ্‌ নন। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। সুতরাং তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর পেরিত উম্মী নবীর প্রতি যিনি নিজে আল্লাহ্‌ ও তাঁর সকল বাণীকে মেনে চলেন। সুতরাং তোমরা আনুগত্য কর যেন তোমরা সরল সঠিক পথের সন্ধান লাভ করতে পার।

পৃথিবী, মহাকাশ ও তার মধ্যবর্তী সবকিছুর মালিক যে একমাত্র আল্লাহ্‌ এই কথা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ২ ঃ ১১৭ আয়াতের সঙ্গে এবং পরিশিষ্ট ১ ও ২ এর মধ্যে।

আর আল্লাহ্‌ যে হায়াত, মউতের মালিক তাও ২১ ঃ ৩০ আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

١٦٠- وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰىٓ اِذِ اسْتَسْقٰىهُ
قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۚ قَدْ عَلِمَ كُلُّ
اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۚ

৭ ঃ ১৬০ আমরা তাদেরকে (ইয়াহুদী) বারোটি পরিবারে ভাগ করে স্বতন্ত্র দলে পরিণত করেছিলাম। মূসার জাতির লোকেরা যখন তার নিকট পানি চাইলো তখন আমরা তাকে নির্দেশ দিলাম একটি প্রস্তর শৈলের উপর তোমার লাঠি দ্বারা আঘাত কর। অতঃপর সেই শিলার বুক থেকে বারোটি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হল এবং প্রত্যেকটি দল পানি নেওয়ার জন্য নিজ নিজ জায়গা ঠিক করে

www.bjilibrary.com

নিলো। এবং আমরা তাদের উপর মেঘের ছায়া বিস্তার করে দিলাম এবং তাদের জন্য 'মান্না' ও 'সালওয়া' প্রেরণ করলাম (এবং বল্লাম) ঃ 'খাও সেই পবিত্র জিনিস সমূহ যা আমরা তোমাদেরকে দান করেছি। এবং আমাদের উপর তারা কোন জুলুম করে নি বরং তারা নিজেদের উপরই জুলুম করেছিল।

লাঠির আঘাতে পানির ঝর্ণা বের হওয়ার ঘটনা ২ ঃ ৬০ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে।

মেঘের ছায়া ঃ মরুভূমির উন্মুক্ত এলাকায় সূর্যের আলো সরাসরি বালির উপর পড়ে এবং তার ফলে বালি শীঘ্রই খুব উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। উত্তপ্ত বালি তাপ বিকিরণ করে বাতাসকেও উত্তপ্ত করে তোলে এবং গ্রীষ্মকালে এই উত্তাপ সহ্যের সীমার বাইরে যেতে পারে। তখন মেঘের ছায়াও পরম আরামদায়ক হয়ে যায় এবং ছায়ার নিচের বালি যথাশীঘ্র তাপ হারায় যার ফলে বালি আরামদায়ক ঠান্ডা হয় এবং সূর্যের তাপ সহ্যের সীমায় আসে। সুতরাং উন্মুক্ত মরুভূমিতে মেঘের ছায়া আল্লাহ্‌র খাস রহমত হিসেবেই বিবেচিত হয়। সিনাই উপত্যকায় ইসরাঈলীদের উপর এমনি মেঘের ছায়া দেওয়ার কথাই এখানে বলা হয়েছে।

মান্না ও সালওয়া ঃ এসব বিসয়ে ২ ঃ ৫৭ আয়াতের ব্যাখায় বলা হয়েছে।

١٧١- وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا
آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ○

৭ ঃ ১৭১ **স্মরণ কর, আমি পর্বতকে তাদের উর্ধ্বে স্থাপন করি, আর তা ছিল যেন এক চন্দ্রাতপ; তারা ভেবেছিল যে এটি তাদের উপর পড়ে যাবে; বললাম 'আমি যা দিলাম তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ কর, যাতে তোমরা তাক্ওয়ার অধিকারী হতে পার।**

কোন কোন মুফাস্সির এ আয়াতের ভাষান্তরে শব্দটির অর্থ করে থাকেন উর্ধ্বে তুলে ধরা যার অর্থ দাঁড়ায় যে এটি একটি অলৌকিক ঘটনা। অবশ্য শব্দটি দ্বারা ভূকম্পনও বুঝানো হয়ে থাকে যে অর্থটা আল্লামা ইউসুফ আলী এবং এম. পিকথল কর্তৃক বিবেচিত হয়েছে। পর্বতের পাদদেশে বসবাসকারী জনগণের ভূমিকম্প থেকে সৃষ্ট ভূকম্পনের কারণে একটা আতঙ্কজনক, ভীতিপ্রদ এবং মনোরম অভিজ্ঞতা থাকে। মহাদেশীয় ভূখন্ডগত গঠন কাঠামো বিষয়ে বর্তমান

সর্বশেষ জ্ঞানের দ্বারা ভূমিকম্পের কারণ জানা যায়।[১] মহাদেশীয় ভূখন্ডের সংযোগস্থলসমূহ ভূত্বকের দূর্বলতম স্থান যেখানে আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপ, ভূমিকম্প এবং পর্বত গড়ে উঠার মত ঘটনাসমূহ ঘটে থাকে। সর্বাধিক সাধারণ ধরনের ভূমিকম্প সংঘটিত হয়ে থাকে যখন ভূ-অভ্যন্তরে ভূতাত্ত্বিক বলের চাপে হঠাৎ করেই শিলাসমূহ ভেঙ্গে যায়। শিলাসমূহ স্থিতিস্থাপক এবং মহাদেশীয় ভূখন্ডগত বলের দ্বারা আকৃতি পরিবর্তনকালে শিলার মধ্যে শক্তি সঞ্চিত হয়। চাপ তখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে তা ভূ-ত্বকের দূর্বল অংশ তথা স্তরচ্যুতির শক্তিকে ছাড়িয়ে যায়, তখন স্তরচ্যুতির বিপরীত বা উল্টাপার্শ্বসমূহ হঠাৎ স্থানচ্যুত হয়ে স্থিতিস্থাপক তরঙ্গ উৎপন্ন করে যা ভূ-অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ে; আর তার ফলেই সৃষ্টি হয় ভূমিকম্পের। পানি ভূ-ত্বক অভ্যন্তরস্থ উত্তপ্ত ম্যাগমা তথা গলিত শিলার সংস্পর্শে আসার কারণে ভূ-ত্বকের সর্বাধিক দুর্বল স্থানসমূহে প্রচন্ড চাপের সৃষ্টি হয়। প্রচন্ড আলোড়িত গ্যাসচার্জপূর্ণ ম্যাগমা উত্তপ্ত স্থানসমূহে সজোরে উপরের দিকে উঠে যায় এবং এই উচ্চ চাপ ভূ-ত্বকের পক্ষে যখন সামাল দেয়া সম্ভব হয় না তখন তা ভেঙ্গে-গুড়িয়ে বা ফেটে যায় কিংবা স্থানচ্যুত হয়। মারাত্মক আগ্নেয়গিরির সক্রিয়তাও ভূমিকম্পের সৃষ্টি করতে পারে, এর কারণও মহাদেশীয় ভূ-ফলকগত ভূমিকম্পেরই অনুরূপ, অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক তরঙ্গের ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়া। ভূগর্ভস্থ গভীর গিরিখাদ এবং খনির বিধ্বস্ত হয়ে পড়া, ভূমিধস এবং রাসায়নিক কিংবা আণবিক যন্ত্রাদির ব্যাপক বিস্ফোরণেও আকস্মিকভাবে ভূকম্পনের সৃষ্টি হতে পারে।[২]

ভূমিকম্প ভূত্বকে স্তরচ্যুতির কারণ ঘটায় যা আনুভূমিক ও কখনও উল্লম্ব গতির সাথে কয়েক মাইল গভীর এবং শত শত মাইল পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে থাকে। ১৯০৬ সালে সানফ্রান্সিসকোর ভূমিকম্পে বিশ ফুট আনুভূমিক বিচরণ ছিল যাতে পূর্বাংশ দক্ষিণে সরে গিয়েছিল। ১৯৫৪ সালে মনটানা, হেবগেনের রেড কেনিয়নস্থ ভূমিকম্পে একটা এলাকা বিশ ফুট উপরে উঠে গিয়েছিল। সানফ্রান্সিসকোতে ১৯৭১ সালে বিচলন ছিল ছয় ফুট উপরের দিকে এবং আনুভূমিকভাবে ছয় ফুট বামে। মহান প্রকৃতিবিদ জন মুর 'ইওসেমাইট ভ্যালী'তে ১৮৭২ সালের ওয়েনস্ ভ্যালী ভূমিকম্পে তার অভিজ্ঞতার কথা লিখে গেছেন। [illegible] রক নামে কয়েক হাজার ফুট উঁচু একটা ভাঙ্গা চূড়া বিশিষ্ট শিলাময় [illegible] পাদদেশে শিবির স্থাপন করেছিলেন। তিনি লিখেছেন ঃ মার্চ মাসের এক

> [illegible] ভোর আড়াইটায় আমি একটা প্রচন্ড ভূকম্পনে জেগে উঠলাম [illegible] ইতিপূর্বে আর কখনও এ ধরনের ঝড়ের অভিজ্ঞতা আমার হয়নি, [illegible] অদ্ভুত শিহরণ জাগানো বিচলনের কথা কখনও ভুলবার নয়। আমি [illegible] থেকে আনন্দিত ও ভীত অবস্থায় দৌড়ে বেরিয়ে আসলাম

www.bjilibrary.com

এবং চিৎকার করে বললাম ঃ 'এক মহান ভূমিকম্প!' বুঝতে পারছিলাম যে, আমি কিছু শিখতে যাচ্ছি। ধাক্কা বা ঝাঁকুনিগুলো এত প্রচন্ড ও বিভিন্নধর্মী ছিল এবং এত দ্রুত একটার পর একটা ঘটছিল যে, হাঁটতে গিয়ে আমাকে সতর্কতার সাথে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়েছিল যেন কোন জাহাজের ডেক বা পাটাতনে ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে চলছি। অসম্ভব লাগছিল যে, বিশেষত উপত্যকাস্থ উঁচু উঁচু পাহাড়গুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে এভাবে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। আমার ভয় হলো যে, আমার শয়নকক্ষের উপরের দিকে অবস্থিত সেন্টিনেল শিলার খাড়া খাড়া অংশগুলো ঝাঁকুনি খেয়ে নিচে পড়ে যাবে। আমি একটা বৃহৎ হলুদ পাইন গাছের পশ্চাতে আশ্রয় নিলাম এ আশায় যে, এটা অন্তত বহির্মুখে ছুটন্ত ছোট আকারের শিলা খন্ডের হাত থেকে আমাকে বাঁচাবে। দু'এক মিনিটে ঝাঁকুনিগুলো অধিক থেকে অধিকতর প্রচন্ড হয়ে পড়ল, সেই সাথে আনুভূমিক চাপের আকস্মিক দমক এবং কয়েকটা মোচড় এবং দুমড়ানো, বিস্ফোরক এবং উৎক্ষেপক ঝাঁকি শুরু হয়ে গেল'।[৩]

মুর-এর বিবরণীর মধ্যদিয়ে ভূমিকম্প চলাকালীন সময়ে পর্বত পাদদেশে বসবাসকারী লোকের অভিজ্ঞতাই ফুটে উঠেছে। তাদের মনে হতে পারে যে, ভূমিকম্প পর্বতকে ঝাঁকানি দিচ্ছে এবং ভূকম্পনের ভয়াবহতা দ্বারা পর্বতকে তাদের উপর ফেলে দেয়ার উপক্রম করতে পারে। সুউচ্চ পর্বতের দোলা চলাকালে পর্বতচূড়ার পাদদেশে বসবাসকারী লোকদের মাথার উপর চলে আসতে পারে এবং ক্ষণিকের জন্যে হলেও এটাকে শামিয়ানার মত মনে হতে পারে। ভূকম্পনের ফলে পর্বতচূড়া স্থায়ীভাবে কাত হয়েও যেতে পারে।

তথ্য সূত্র ঃ

1. Bolt Bruce, A., Earthquakes and Volcanoes, Scientific American. W.H. Freeman and Company, San Francisco, 1980.
2. Rupert Furneux. Volcanoes, Penguin Books, England, 1974.
3. Oakeshoft, Gordon B., Volcanoes and Earthquakes, McGraw Hill Co. New York, 1976.

www.bjilibrary.com

١٨٥ اَوَ لَمْ يَنْظُرُوْا فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ ۙ
وَّاَنْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ ۚ فَبِاَىِّ حَدِيْثٍۢ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ○

৭ঃ ১৮৫ তারা কি লক্ষ্য করে না, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পর্কে এবং আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সে সম্পর্কে এবং এ সম্পর্কেও যে সম্ভব তাদের নির্ধারিত কাল নিকটবর্তী, সুতরাং এরপর আর তারা কোন্ কথায় বিশ্বাস করবে!

এ আয়াতটি অত্যন্ত চিন্তাভাবনা উদ্রেককারী এবং এ সত্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যে, আল্লাহ্ই ক্ষুদ্রতম কণা থেকে বিশালতম এই মহাবিশ্ব পর্যন্ত সমস্ত কিছুই যথার্থতা সহকারে ও খুঁটিনাটি পর্যন্ত নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন যা তাঁরই নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। বিশাল এই মহাবিশ্ব, ছায়াপথ, নীহারিকা, তারকামন্ডলী ও গ্রহ নক্ষত্রসমূহকে নিয়ন্ত্রণকারী বিধানসমূহ পরিশিষ্ট-১ ও পরিশিষ্ট-২ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

পদার্থ বিজ্ঞানীদের দ্বারা আবিষ্কৃত আণুবীক্ষণিক জগতের পরমাণু, নিউট্রন, ইলেকট্রন এবং অন্যান্য বহু ক্ষুদ্র কণার মধ্যে কোন গোলমাল ও বিশৃংখলা লক্ষ্য করা যায় না। এ সকল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা একটা জটিল বিধানসমষ্টি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এরা সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক নির্দেশিত বিশেষ পদ্ধতিতে আচরণ করে থাকে (বিস্তারিত জানার জন্য পরিশিষ্ট-৪ দ্রষ্টব্য)।

উদ্ভিদ ও প্রাণী সমন্বয়ে গঠিত জীবজগত আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। (১) এরা অত্যন্ত সু-শৃংখল ও সংগঠিত। আকার ও আকৃতি নির্বিশেষে প্রতিটি জীবদেহ জীবকোষ দ্বারা গঠিত যাদের প্রতিটিরই রয়েছে দু'টি প্রধান অংশ যথা ঃ ক- সাইটোপ্লাজম নামক আঠালো পদার্থ, এবং খ-নিউক্লিয়াস বা কোষকেন্দ্র। সাইটোপ্লাজম কোষ অভ্যন্তরে সংঘটিত সকল রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে; কোষ কেন্দ্র গঠন নিয়ন্ত্রণ করে এবং এটি হচ্ছে ক্রোমোজম এবং ডিএনএ-র অবস্থান স্থল। (২) প্রতিটি জীবদেহই পরিবেশ থেকে খাদ্য আহরণ করে থাকে যার প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সৌরশক্তির ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। এই শক্তি সবুজ গাছপালার পত্রহরিতের অণুতে ধরে রাখা ক্ষুদ্র একটা ভগ্নাংশ গতিশীল শক্তিতে রূপান্তরিত হয় যা জীব ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত বিপাক ক্রিয়ার উৎপত্তি ঘটায় এবং এসব কিছুও আবার তাপীয় গতির সূত্রানুসারে কাজ

www.bjilibrary.com

করে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাপীয়গতির প্রথম সূত্র মতে, শক্তি এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত করা যায়, কিন্তু এটি সৃষ্টি কিংবা ধ্বংস করা যায় না। উদ্ভিদে শক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর তখনি ঘটে যখন আলোকশক্তি উদ্ভিদপত্রে গিয়ে পৌঁছায়। শোষিত আলোর একটা অংশ তাপ হিসেবে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু কিছু অংশ আবার পত্রহরিৎ অণুস্থ ইলেক্ট্রনসমূহকে উত্তেজিত করে এবং এরা শেষ পর্যন্ত কার্বনডাইঅক্সাইডকে শর্করায় রূপান্তরের শক্তি যোগান দেয়। এই শর্করার মধ্যে উচ্চ মাত্রায় শক্তি থাকে যা এর গঠনকারী উপাদান তথা কার্বনডাইঅক্সাইড এবং পানি অপেক্ষা অনেক বেশী। উপযুক্ত সময়ে, উদ্ভিদ ভক্ষণকারী পশু দ্বারা শর্করা ভেঙ্গে যায় যাতে শর্করা অণুতে রাসায়নিক কিংবা সুপ্ত শক্তির হ্রাস ঘটে। অক্সিজেন যুক্ত হওয়ায় চিনি থেকে সুপ্ত শক্তি হারানোর ফলে অন্যান্য যৌগের মধ্যে সুপ্ত শক্তির বৃদ্ধি ঘটতে পারে।[১] প্রাণীরা এবং অ-সবুজ গাছপালা জৈব পদার্থ ভক্ষণ করে কিংবা অন্যান্য গাছপালা কিংবা মৃত যা জীবিত জীবজন্তুর উপর নির্ভর করে শক্তি আহরণ করে থাকে। (৩) সব জীবই তার পরিবেশ তথা আলো, তাপ, পানি, অভিকর্ষ এবং রাসায়নিক বস্তুর প্রতি সক্রিয়ভাবে সাড়া দেয়। (৪) এরা পরিবেশের সাথে এমনভাবে খাপ খাইয়ে চলে যে, তারা দক্ষতার সাথে তাদের জৈবিক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যেতে পারে। (৫) সকল জীবদেহই একটা নির্দিষ্ট দৈহিক স্তর পর্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং বিভিন্ন পর্যায়ে বংশ বিস্তার করে ঃ (ক) অণু (অর্থাৎ ডিএনএ অণুর সংখ্যা বৃদ্ধি), (খ) ক্রোমোজমসমূহ (কোষ বিভাজনে সংখ্যা বৃদ্ধি), (গ) কোষসমূহ (বিভাজিত হয়ে কলা পেশী গঠন), ব্যক্তি (তাদের যৌন ও অযৌন বংশবৃদ্ধি)। প্রতিটি ডিএনএ অণুর নিজের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষমতা ছাড়াও একটা প্রগাঢ় স্মরণশক্তি রয়েছে এবং বিশাল সংখ্যক সংকেত ও নীলনক্সা মজুত করে রাখে বা সে উপযুক্ত সময় ও স্থানে নির্গত করে একটি দেহের সমস্ত কোষ ও কাঠামো গঠনের সূত্রপাত করে, সেগুলোর বৃদ্ধি ঘটায় এবং তাদের জন্য নির্ধারিত সমগ্র জীবনকালে প্রতিটি মুহূর্তে তাদের কার্যক্রমের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে। (৬) এরা নবজাতকের মধ্যে ডিএনএ-র মাধ্যমে তথ্য স্থানান্তর করে দেয় এবং এভাবে বংশগতির ধারা অব্যাহত রাখে।

অত্র আয়াতে আমাদেরকে শুধু মহাবিশ্বের বিশাল নকশা এবং শৃংখলা নিয়েই গভীর চিন্তাভাবনা করতে বলা হয়নি, বরং উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণকারী ক্রোমোজমস্থ জীন্-এর সীমাহীন বিন্যাস ও সংযুক্তির উপরেও গভীরভাবে চিন্তা করতে বলা হয়েছে। এই প্রচন্ড বিভিন্নতা সত্ত্বেও স্রষ্টার কিছু কিছু স্পষ্ট বিধান

www.bjilibrary.com

দ্বারা পরিপূর্ণ শৃঙ্খলার সাথে প্রতিটি ব্যক্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় বংশগতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়। বস্তুত সেই আল্লাহ্‌রই প্রশংসা যিনি নিয়ন্ত্রক অণু তথা জীবনের বংশগতির নীলনক্সা স্বরূপ ডিএনএ সৃষ্টি করেছেন।

তথ্য সূত্র ঃ

1. Edwards N.A. and Hassall K.A. Cellular Biochemistry and Physiology, McGraw Hill Kogarusha Ltd. Tokyo, p. 112. 1971.

www.bjilibrary.com

١٨٧- يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۖ
لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ

৭ ঃ ১৮৭ তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামত কখন ঘটবে। বল, 'এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই রয়েছে। শুধু তিনিই যথাসময়ে তা প্রকাশ করবেন, ঐ ঘটনাটা হবে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে এক ভয়ঙ্কর ঘটনা। আকস্মিকভাবেই তা তোমাদের উপর এসে পড়বে।

মহাবিশ্ব, ছায়াপথসমূহ, তারকামন্ডলী, গ্রহ নক্ষত্র এবং আমাদের সৌর জগতের সৃষ্টি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক বিবরণাদি পরিশিষ্ট-১ ও ২-এ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। একটা তারকার জীবন কাহিনী, এর জন্ম, সময়ের সাথে সাথে ক্রমবৃদ্ধি এবং এর মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়ও সেখানে আলোচনা করা হয়েছে (আরো দেখুন ৭ ঃ ৫৪ আয়াত)। সূর্য একটা জি-২ বামন ধরণের শ্রেণী বিভাগকৃত তারকা। কয়েকশ' বিলিয়ন বছরের মধ্যে সৌরকেন্দ্রস্থ হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসসমূহ একীভবনের কারণে নিঃশেষ হয়ে গেলে হঠাৎ করেই সূর্য সম্প্রসারিত হয়ে পড়বে এবং অত্যন্ত উজ্জ্বল ও লালবর্ণ ধারণ করবে। শেষ পর্যন্ত এটি স্ফীত হয়ে নিকটবর্তী বুধ ও শুক্র গ্রহদ্বয়কে গিলে ফেলবে এবং পৃথিবীর নিকট পৌঁছে যাবে। এ সময়ে সৌর জগতের অভিকর্ষ বলে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেবে যার ফলে ব্যাপক টালমাটাল অবস্থা ও কম্পন শুরু হবে। এ সময় সূর্য এত উত্তপ্ত হয়ে পড়বে যে, এটি পৃথিবীস্থ সবকিছু পুড়ে ছাই করবে এবং পরিবর্তন করে ফেলবে। আমাদের গ্রহের সকল ধরনের প্রাণের এ রকম পরিণতি ১৪০০ বছর আগেই কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞানের আজকের জ্ঞান দ্বারা বিষয়টি নিশ্চিত হতে দেখে মু'মিনদের মনে আনন্দানুভূতি জাগায় আর কাফিরদের বিশ্বাসের ভিত্ গুঁড়িয়ে দেয়। বস্তুত এতে স্পষ্ট হচ্ছে যে, কুরআন মূলতই এক ঐশী গ্রন্থ।

١٨٩- هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ
فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا
لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ○

www.bjilibrary.com

৭ ঃ ১৮৯ তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তার সংগিনী সৃষ্টি করেন যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়। অতঃপর যখন সে তার সাথে সংগত হয় তখন সে এক লঘু গর্ভধারণ করে এবং তা নিয়ে সে অনায়াসে চলাফেরা করে; গর্ভ যখন গুরুভার হয় তখন তারা উভয়ে তাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করে, 'যদি তুমি আমাদেরকে এক পূর্ণাংগ সন্তান দাও তবে তো আমরা কৃতজ্ঞ থাকবোই।'

নারী ও পুরুষের জোড়া থেকে মানব জাতির সৃষ্টি সম্পর্কে ৪ ঃ ১ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

এই আয়াতে 'লঘুভার' বলতে গর্ভধারণের প্রথম পর্যায়কে বুঝানো হয়েছে, যখন নারী কোন বাড়তি ভার অনুভব করে না। গর্ভধারণের এই অবস্থা ৩-৪ মাস চলতে থাকে। ২০তম সপ্তাহের মধ্যে মা গুরুভার অনুভব করতে শুরু করে। আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে খুব সুন্দরভাবে সে অবস্থার বর্ণনা করেছেন।

٣٢- وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً
مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

৮ ঃ ৩২ স্মরণ কর, তারা বলেছিল, 'হে আল্লাহ্' এটা যদি তোমার পক্ষ হতে সত্য হয় তবে আমাদের উপর আকাশ হতে পাথর বর্ষণ কর কিংবা আমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দাও'।

অবিশ্বাসী মক্কাবাসীরা তাচ্ছিল্যভরে চ্যালেঞ্জ করেছিল যেন তাদের অবিশ্বাসের জন্য শাস্তি হিসেবে তাদের উপর আকাশ হতে পাথর বর্ষণ করা হয়– এ আয়াতে সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এখানে কোন বিশেষ ধরনের পাথরের কথা বলা হয়নি। হিজারাহ (حجارة) শব্দটি ৯টি আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে (২ ঃ ২৪, ৭৪; ৮ ঃ ৩২; ১১ ঃ ৮২; ১৫ ঃ ৭৪ ঃ ১৭ ঃ ৫০; ৫১ ঃ ৩৩; ৬৬ ঃ ৬; ১০৫ ঃ ৪)। তন্মধ্যে একটি আয়াতে মাটি (طين) থেকে, তিনটি আয়াতে (سجيل) 'সিজ্জিল' থেকে পাথর বর্ষণের কথা বলা হয়েছে এবং বাকী পাঁচটি আয়াতে সাধারণভাবে শুধুমাত্র পাথরের কথা বলা হয়েছে। আভিধানিক অর্থে পাথর (stone) হচ্ছে ক্ষুদ্র অথবা মাঝারী আকারের শিলাখন্ড বা কঠিন খনিজ বস্তু (ধাতব বস্তু নহে)। সিজ্জিল (سجيل) থেকে আসা পাথর অথবা এমনকি ভূমিজাত পাথর সম্পর্কে তফসীরকারীগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ

www.bjilibrary.com

কেউ মনে করেন যে পাথরগুলো ছিল বাইবেলের বর্ণনার অনুরূপ গন্ধক বা সালফারজাত, আবার অন্যরা মনে করেছেন যে সেগুলো ছিল তাপদগ্ধ কাদামাটি। বিভিন্ন ধরনের শিল্প বা পাথর সম্পর্কে ২ ঃ ৬০ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। শাস্তি হিসেবে পাথর বর্ষণের কথা তিনটি (আয়াত ১১ ঃ ৮২, ১৫ ঃ ৭৪ এবং ৫১ ঃ ৩৩) আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। নবী হযরত লূত (আ)-এর উম্মতের উপর এই শাস্তি আরোপিত হয়েছিল। ৭ ঃ ৮৪ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

আকাশ থেকে কিভাবে পাথর বর্ষিত হয়েছিল সে সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়নি। কেবলমাত্র আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্নুৎপাত ঘটলে কিংবা উল্কাপাতের মাধ্যমেই এরূপ পাথর বর্ষণের ঘটনা সম্ভব। আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্নুৎপাত ঘটলে পাথরসহ অন্যান্য বহু ধরনের বস্তু উৎক্ষিপ্ত হয়ে চারপাশে বর্ষিত হয়ে থাকে।

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে সানডা প্রণালীতে ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ক্রাকাটোয়া দ্বীপে বিশেষ ধরনের অগ্নুৎপাত ঘটেছিল। এই অগ্নুৎপাতের ফলে প্রায় এক মাইল ঘনক্ষেত্র-বিশিষ্ট শিলা, ধূলির আকারে বায়ুমন্ডলের প্রায় ১৫ মাইল উপরে উঠেছিল। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মার্টিনিক দ্বীপের পোলি পাহাড়েও অনুরূপ অগ্নুৎপাত ঘটেছিল। এই দ্বিতীয় অগ্নুৎপাতে কোন লাভা ছিল না, এতে ছিল মেঘ সদৃশ গ্যাস ও ধুলিকণার বিশাল আস্তরণ, যার ফলে সেন্ট পিয়ার শহরটি ২৮০০০ বাসিন্দাসহ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়।

যতদূর জানা গেছে মহাশূন্যে সৌরজগতের বাইরে থেকে আগত দৃশ্যমান উল্কাপিন্ডের মাত্র অর্ধেক সৌরজগতে এসে পৌঁছে, তবে এ সকল উল্কাপিন্ডের সঠিক সংখ্যা কত তা জানা যায়নি। এ সকল উল্কার প্রায় অর্ধেক প্রতি সেকেন্ডে ৪২ কিঃ মিঃ(২৬ মাইল) বেগে পৃথিবীর বায়ু মন্ডলে ছুটে আসে। বাদবাকী উল্কার গতিবেগ পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের দিকে ছুটে আসা উল্কার গতিবেগের চাইতে অনেক বেশী। নাক্ষত্রিক (Sideriolite) বৈশিষ্ট্যের উল্কাসমূহ ধাতু ও সিলিকেট জাতীয় উপাদান দ্বারা গঠিত হয়ে থাকে।

অধিকাংশ উল্কা পৃথিবীর উপরিভাগে মিহি ধূলার আকারে পতিত হয়। কিন্তু পৃথিবীর উপরিভাগে প্রতি সেকেন্ডে বহু মাইল বেগে ছুটে আসা শত শত টন ওজনের এ সকল বস্তু বায়ু তরঙ্গে এবং ভূকম্পনে যে কীরূপ প্রভাব ফেলে তা ধারণারও অতীত। আরিজোনায় উল্কাপাতের ফলে সৃষ্ট বিশাল আকারের গর্ত এবং অতি সম্প্রতি সাইবেরিয়ায় উল্কাপাতের ফলাফল থেকে এর প্রভাব সম্পর্কে জানা গেছে।

www.bjilibrary.com

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় হোবা নামক ৬০ টন ওজনের উল্কা হচ্ছে এ যাবত জানা সবচেয়ে বড় উল্কা। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব সাইবেরিয়ায় 'সিখোলা আলিন' নামে ২৩ টন ওজনের একটি উল্কাপিন্ড পতিত হয়েছিল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের কানসাসের নরটন অঞ্চলে প্রায় ১০০ খন্ড পাথরের সমন্বয়ে যে উল্কাপাত হয়েছিল তার একেকটি টুকরার ওজন ছিল প্রায় এক টন। সৌভাগ্যবশত বড় আকারের উল্কাপিন্ড খুব কমই দেখা যায়। এরূপ উল্কাপিন্ডের পতনের ফলে পুরো একটি শহর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

٣٦- اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○

৯ ঃ ৩৬ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহ্‌র বিধানে আল্লাহ্‌র নিকট মাস গণনায় মাস বারোটি, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান, সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করো না এবং তোমরা অংশীবাদীদের সাথে সর্বাত্মক যুদ্ধ করবে, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ করে থাকে। এবং জেনে রাখ, আল্লাহ্‌ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।

এই আয়াতের দুটি অংশ আছে, এগুলো জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাথে কিছুটা সম্পর্কিত হিসেবে ধরে নেয়া যায়। 'আল্লাহ্‌ তা'আলার দৃষ্টিতে মাসের সংখ্যা ১২ এ কথাটি হচ্ছে প্রথম অংশ এবং দ্বিতীয় অংশে আছে, 'তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন'।

২ ঃ ১৮৯ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে যে, প্রাকৃতিকভাবে সময়ের তিনটি একক রয়েছে। এগুলো হলো দিন, মাস ও বছর। প্রথম একক 'দিন' হলো পৃথিবীর নিজ কক্ষপথে একবার সম্পূর্ণরূপে আবর্তিত হওয়ার সময়। এই আবর্তনের হিসাব সূর্যকে মধ্যক ধরে করা যেতে পারে, সে ক্ষেত্রে এই সময়কে বলা হয়ে থাকে গড় সৌর দিবস (mean solar day)। এই সময়কে আবার সরাসরি ২৪টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, প্রতি ভাগের নাম গড় সৌর ঘন্টা। এ

কে পুনরায় মিনিট ও সেকেন্ডে ভাগ করা হয়েছে। কোন স্থির তারকাকে কেন্দ্র করেও পৃথিবীর আবর্তনের সময় হিসাব করা যেতে পারে, সেক্ষেত্রে এই সময়কে বলা হয় নাক্ষত্রিক দিবস। এখানে যে দু'ধরনের দিবসের কথা বলা হলো, দৈর্ঘ্যের দিক থেকে তারা সমান নয়। একটি নক্ষত্র দিবস হয়ে থাকে ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ডে অর্থাৎ গড় সৌর দিবস অপেক্ষা ৪ মিনিট কম। সাধারণভাবে একটি গড় সৌর দিবসকেই দিন বলা হয়ে থাকে।

সময়ের দ্বিতীয় একক হলো মাস। এই সময়ের মধ্যে চাঁদ পৃথিবীকে একবার সম্পূর্ণরূপে প্রদক্ষিণ করে। এই প্রদক্ষিণের হিসাব সূর্যকে মধ্যক ধরেও করা যায়। সেক্ষেত্রে তাকে বলা হয় synodic lunar month বা সিনোডিক চান্দ্র মাস। চাঁদের এই প্রদক্ষিণের হিসাব কোন স্থির নক্ষত্রকে সম্পর্কিত করেও করা যায়। সেক্ষেত্রে তাকে বলা হয় নাক্ষত্রিক চান্দ্র মাস (sidereal lunar month)। এ ক্ষেত্রেও উভয় প্রকার মাসের দৈর্ঘ্য সমান নয়। একটি সিনোডিক চান্দ্রমাস গঠিত হয়ে থাকে ২৯.৫৩০৫৯ দিনে এবং একটি নাক্ষত্রিক চান্দ্র মাস গঠিত হয় ২৭.৩২১৬৬ দিনে।

সময়ের তৃতীয় একক হলো বছর। বাহ্যত এই সময়ের মধ্যে পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে থাকে। এই হিসাব মহাবিষুব রেখাকে কেন্দ্র করেও করা যেতে পারে, সেক্ষেত্রে এই সময়কে বলা হয় ক্রান্তিয় বছর। সময় তখন ঋতুর সাথে তাল মিলিয়ে চলে। এই আবর্তনের হিসাব যদি স্থির নক্ষত্রের সাথে সম্পর্কিত করে নিরূপণ করা হয়, তবে তাকে বলা হয় নাক্ষত্র বছর। এই 'সময়' তারকারাজির সৌর-উদয় (heliacal rising)-এর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলে। এই দু'প্রকারের বছরও সম-দৈর্ঘ্যের নয়। একটি ক্রান্তিয় বছর গণনা করা হয় ৩৬৫.২৪২১৯ দিনে এবং একটি নাক্ষত্র বছর গণনা করা হয় ৩৬৫.২৫৬৩৬ দিনে। যেহেতু এই দু'ধরনের বছরের মধ্যে ব্যবধান খুবই কম এবং তারকারাজির সৌর উদয় ঋতুর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলে, তাই প্রাচীন মিশরে লুব্ধক তারকার সৌর উদয়কে নীল নদে আসন্ন বন্যার ইঙ্গিতবাহী মনে করা হতো।

সময়ের এই তিনটি একক নিয়ে প্রধান অসুবিধা হলো, সাধারণভাবে যেরূপ বলা হয়ে থাকে যে ৩০ দিনে মাস এবং ১২ মাসে বছর হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের এই সম্পর্ক অতটা সহজ নয়। উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, সিনোডিক হোক অথবা নাক্ষত্রিক হোক ১২ চান্দ্র মাসে পৃথিবী সূর্যকে একবার সম্পূর্ণরূপে প্রদক্ষিণ করতে পারে না। কক্ষপথের কিছু অংশ অবশিষ্ট থেকে যায়। তাই ১২

www.bjilibrary.com

চান্দ্র মাসে স্পষ্টতই একটি সৌর বছর হয় না, যা হয়ে থাকে তাকে বলা হয় চান্দ্র বছর। সময়ের সাথে সাথে এই ব্যবধান বৃদ্ধি পায়। বহু বছরে এই ব্যবধান আরো অনেক বড় হয়। ফলে চান্দ্রমাস ও সৌর ঋতুর মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষায় বড় ধরনের অসুবিধা দেখা দেয়। প্রাচীনকালেও এই পার্থক্য সম্পর্কে সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। এই ব্যবধান পূরণের লক্ষ্যে কোন কোন বছরে অতিরিক্ত হিসেবে ১৩তম মাস অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হতো। কোন কোন সভ্যতায় এটা করা হতো কিছু নিয়ম অনুসরণের মাধ্যমে এবং কোন সভ্যতায় করা হতো রাজার খেয়াল খুশী অনুসারে। অনুরূপ কারণে ভারতবর্ষে যে মাসে দু'বার নতুন চাঁদ দেখা যেত সে মাসকে বলা হতো অধিমাস এবং ১৩তম মাস হিসাবের জটিলতা এড়ানোর জন্য সে মাসকে পূর্ববর্তী মাসের বর্ধিত অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। অপরদিকে আসুরবাণীপাল গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত মৃত্তিকা ফলকে উৎকীর্ণ বিবরণে বলা হয়েছে যে, 'হামুরাবী (রাজত্বকাল ২১২৩ খ্রি. পূ. থেকে ২০৮১ খ্রি. পূ) ঘোষণা করেন যে যেহেতু বছরটি শুভ নয়, সেহেতু 'উলুলু'-এর পরবর্তী মাসকে বলা হবে দ্বিতীয় 'উলুলু।' এভাবে ঐ বছরকে ১৩ মাসে গণনা করা হয়। যদিও সৌর অথবা চান্দ্র হিসাবে সময় গণনা করা যায়, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জোর দিয়ে বলেছেন যে, যে পদ্ধতিতেই সময়ের হিসাব করা হোক না কেন মাসের সংখ্যা ১২ থাকতে হবে।

আয়াতের দ্বিতীয় অংশে উল্লেখিত 'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি' প্রসঙ্গে আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে ছয়টি সময়ে (দিনে)। নীল আর্মস্ট্রং ও অন্যান্য নভোচারী কর্তৃক চাঁদ থেকে নিয়ে আসা মাটি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, চাঁদ এবং পৃথিবীর মাটির বয়স একই। সুতরাং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে প্রদক্ষিণ করছে এবং মাস সৃষ্টি করছে।

১১৬- إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِ وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

৯ ঃ ১১৬ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহ্রই; তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই।

এ বিষয়ে ২ ঃ ১৬৪ আয়াতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

١٢٥- وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ

৯ ঃ ১২৫ এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তা তাদের কলুষের সাথে আরো কলুষ যুক্ত করে এবং তাদের মৃত্যু ঘটে কাফির অবস্থায়।

এই আয়াতে অন্তরের রোগ বলতে মনের রোগ বা মানসিক রোগের কথা বলা হয়েছে। আরবী ভাষায় قلب (কল্‌ব) বলতে সাধারণ পরিভাষা অনুসারে দৈহিক মন এবং বিমূর্ত মন এই উভয় সত্ত্বাকেই বুঝানো হয়ে থাকে। কুরআনে সাধারণ অর্থে قلب বলতে মনকে বুঝানো হয়েছে।

অল্প কিছুদিন আগেও মনের অসুখ হতে পারে বলে বিজ্ঞানের জানা ছিল না। ভিয়েনার চিকিৎসা বিজ্ঞানী জোসেফ ব্রেনার এবং সিগমুণ্ড ফ্রয়েড ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিকিৎসা বিজ্ঞানে মনোরোগের বিষয়টিকে তুলে ধরেন। পরবর্তীকালে (১৮৯৬ খ্রি.) ফ্রয়েড মানসিক চিকিৎসায় নতুন পদ্ধতির বিকাশ ঘটান। মজার ব্যাপার হলো আধ্যাত্মিক অর্থে হলেও পবিত্র কুরআন ১৪০০ বছরেরও আগে মানসিক ব্যাধি সম্পর্কে ধারণা দিয়েছে।

٣- إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

১০ ঃ ৩ নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন.......

৭ ঃ ৫৪ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

٤- إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ

১০ ঃ ৪ তাঁরই নিকট তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন; আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। সৃষ্টিকে তিনিই প্রথম অস্তিত্বে আনেন, অতঃপর এর পুনরাবর্তন ঘটান। যারা মু'মিন.....

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন যে তিনিই এই বিশ্বের স্রষ্টা এবং এর মাঝে সকল প্রকার জীবনের স্রষ্টাও তিনি। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর

www.bjilibrary.com

স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ২ ঃ ১১৭ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। পৃথিবীর বুকে প্রথম জীবন কণার স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে ২ ঃ ২৮ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং নক্ষত্রমন্ডলীর আদি উৎস সম্পর্কে পরিশিষ্ট ১ ও ২-এ আলোচনা করা হয়েছে।

সৃষ্টিকে তিনিই প্রথম অস্তিত্বে আনেন, অতঃপর এর পুনরাবর্তন ঘটান

আয়াতে يعيد শব্দটির বাহ্যিক অর্থ অপেক্ষা এর ব্যাপক প্রায়োগিক অর্থ রয়েছে। বিভিন্ন তাফসীরকারী 'পুনরাবর্তন' অথবা 'পুনরুৎপাদন' শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যদি শব্দটির প্রথমোক্ত অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে এই আয়াতের অর্থ হবে মৃত্যু। পরবর্তী জীবনে সৃষ্টি পরবর্তী পর্যায়, যা আমাদের বর্তমান আলোচনার আওতায় পড়ে না।

অপরদিকে শব্দটির মধ্যে যদি 'পুনরুৎপাদন' বা প্রজনন কথাটি নিহিত আছে বলে ধরে নেয়া হয় তাহলে নিম্নে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে যথাযথ বলে মনে হবে ঃ

সজীব ও নির্জীব বস্তুর মধ্যে পার্থক্যের ক্ষেত্রে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রজনন ক্ষমতা। এ্যামিবা ও ব্যাকটিরিয়ার মতো নিম্নপর্যায়ের জীব-কোষের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত সরল। এক্ষেত্রে কোনরূপ যৌন সংযোগ ছাড়াই fission (সমবিভাজন) পদ্ধতিতে কোষটি সমান দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। পরবর্তীতে প্রতিটি ভাগ একটি পূর্ণাঙ্গ এ্যামিবা বা ব্যকটিরিয়ারূপে বিকাশ লাভ করে। উঁচু পর্যায়ের প্রাণী এবং মানুষের মধ্যে লিঙ্গগত পার্থক্য থাকে। এদের সন্তান-সন্ততি জন্মলাভ করে পুরুষ ও নারী পিতামাতার যৌন কোষের মিলনের মাধ্যমে। মাঝে মাঝে মৌমাছির মত কিছু কীট পতঙ্গের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ার ব্যত্যয় ঘটতে দেখা যায় এবং এমনকি পুরুষ পিতার অনুপস্থিতিতেও (parthenogenesis যৌন সংসর্গ ব্যতীত সন্তান জন্ম গ্রহণ করা) নবজাতকের আগমন ঘটতে দেখা যায়।

উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তিন পদ্ধতিতে প্রজনন ঘটে থাকে, যেমন (ক) যৌন সংসর্গের মাধ্যমে পুরুষ ও স্ত্রী জননকোষ বা যৌন কোষের দ্বারা, (খ) অযৌন জননাঙ্গের মাধ্যমে, এবং (গ) গাছপালার কোন প্রকার অঙ্গজ বিস্তারের মাধ্যমে।

সকল প্রকার জীবন সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টিকর্তার একটি মহাপরিকল্পনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তাহলো সৃষ্ট প্রত্যেক প্রজাতির জীবনকে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত স্থায়ী করে রাখা। আর একাজটি সম্পন্ন হয়ে থাকে উপরোল্লিখিত প্রজনন পন্থার সুনিপুণ প্রক্রিয়ায় যা আল্লাহ্ তা'আলার এই বিস্ময়কর পরিকল্পনার বাস্তব প্রতিফলন মাত্র।

www.bjilibrary.com

٥- هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

১০ : ৫ তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং এর মনযিল নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা বছর গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পার। আল্লাহ্ এ সকল নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এ সকল নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে চাঁদ এবং সূর্য দুটি ভিন্ন পদ্ধতিতে কিরণ দিয়ে থাকে। বিজ্ঞান দেখেছে এটি বাস্তব সত্য। সূর্যের কেন্দ্রে সংঘটিত পারমাণবিক বিক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট শক্তির সাহায্যে সূর্য কিরণ দিয়ে থাকে। অথচ চাঁদ কিরণ দেয় চাঁদের উপরিভাগে সূর্যালোকের প্রতিফলন থেকে।

এই আয়াতে আরো বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মনযিল বা চাঁদের বিরতিস্থল নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে আমরা বছর গণনার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারি। এখন আমরা দেখব মনযিলসমূহ বলতে কী বুঝানো হয়েছে। চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে প্রদক্ষিণ করে। স্থির তারকারাজির সাথে সম্পর্কিত করে হিসাব করলে সম্পূর্ণরূপে প্রদক্ষিণ করতে প্রয়োজন হয় ২৭.৩ দিন। এই প্রদক্ষিণকালে মনে হয় যে প্রতিদিন চাঁদ তার কক্ষপথে অবস্থিত একগুচ্ছ তারকাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। এভাবে ২৭.৩ দিন অনুসারে চাঁদের কক্ষপথকে স্থির নক্ষত্রে প্রতিটি গুচ্ছের ভিত্তিতে ২৭ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতি অংশে তারকা গুচ্ছ চাঁদের কক্ষপথের যে জায়গায় অবস্থান করে তাদের একেকটিকে বলা হয় মনযিল বা চাঁদের বিরতিস্থল। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে একে বলা হয় নক্ষত্র। মনযিল গঠনকারী প্রতিটি তারকাগুচ্ছের আলাদা চেহারা এবং নাম আছে। ২৭টি মনযিল বা চান্দ্র নিবাসের ২৭টি চেহারা আছে। এভাবে চাঁদের বিভিন্ন পর্যায় যা আমরা একটি বর্ধমান চাঁদ থেকে আরেকটি বর্ধমান চাঁদ পর্যন্ত ২৭টি মনযিলে দেখতে পাই* যা সময় গণনা এবং বছর নির্ধারণে সহায়ক হিসেবে কাজ করে।**

---

* মনযিল সমূহের নাম পরিশিষ্ট-৪ এ দেখানো হয়েছে।

** জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসারে সূর্যের প্রথম মনযিলে দ্বিতীয়বার প্রবেশের সময় দ্বারা একটি সৌর নাক্ষত্রিক বছর গঠিত হয়। ১২টি চান্দ্রমাস (প্রতি চান্দ্র মাসে চন্দ্র ২৭টি মনযিল অতিক্রম করে) দ্বারা গঠিত সময়কে বলা হয় চান্দ্র বছর।

www.bjilibrary.com

٦- اِنَّ فِى اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ○

১০ ঃ ৬ নিশ্চয়ই দিন ও রাতের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা সৃষ্টি করেছেন তাতে নিদর্শন রয়েছে মুত্তাকী সম্প্রদায়ের জন্য।

২ ঃ ১৬৪ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে দিন ও রাতের পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আয়াতের দ্বিতীয় অংশ 'আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা সৃষ্টি করেছেন'– এর প্রতি খোদাভীরুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং এগুলোকে তাঁর নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই তাদেরকে আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রতি মনোনিবেশ করতে আহবান করা হয়েছে এবং সেগুলো বুঝার চেষ্টা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তারা ধীরে ধীরে সৃষ্টির রহস্য উন্মোচন করতে সক্ষম হবে এবং সম্ভ্রম ও বিস্ময়ে তাদের মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। তারা আরো অনুধাবন করবে যে সকল সৃষ্টি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে মানব জাতির জন্য কল্যাণকর।

١٠- دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১০ ঃ ১০ সেখানে তাদের ধ্বনি হবে, 'হে আল্লাহ। তুমি মহান, পবিত্র! এবং সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম' এবং তাদের শেষ ধ্বনি হবে 'প্রশংসা' জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র প্রাপ্য।

১ ঃ ২ আয়াতের আলোচনাকালে একটি প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছিল, সেখানে رب العلمين (জগত সমূহের লালন ও পালনকারী) কথাটির তাৎপর্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। উক্ত আলোচনায় علم (জগত) শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য সম্পর্কে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

١٣- وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۙ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ
وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ○

১০ ঃ ১৩ তোমাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করেছি যখন তারা সীমা অতিক্রম করেছিল। স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট তাদের রাসূল এসেছিল, কিন্তু তারা বিশ্বাস করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, অতীতে বহুজাতি এবং বংশ ধ্বংস হয়েছে এ কারণে যে তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ নবীগণ আসা সত্ত্বেও তারা তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং মন্দ কাজ থেকেও বিরত থাকেনি। যে সকল জাতি অথবা গোত্র ধ্বংস হয়েছে তাদের নাম অথবা যে সকল মন্দ কাজের জন্য তারা শাস্তি পেয়েছে অথবা সে সকল নবীগণের নাম যাদেরকে তারা অমান্য করেছে তার উল্লেখ করা হয়নি। তবে যে বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের মাধ্যমে ধ্বংস কার্য সম্পন্ন করা হয়েছিল সে সম্পর্কে ৩ ঃ ১৩৭ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

١٩- وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ۚ

১০ ঃ ১৯ মানুষ ছিল একই জাতি, পরে তারা মতভেদ সৃষ্টি করে....

এই আয়াতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ২ ঃ ২১৩ আয়াত প্রসঙ্গে প্রদান করা হয়েছে।

٢٢- هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ
بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ
مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا
مِنْ هَٰذِهِ

১০ ঃ ২২ তিনিই তোমাদেরকে জলে স্থলে ভ্রমণ করান এবং তোমরা যখন নৌকারোহী হও এবং সেগুলো আরোহী নিয়ে অনুকূল বাতাসে

www.bjilibrary.com

অগ্রসর হয় এবং তারা এতে আনন্দিত হয়। অতঃপর এগুলো বাত্যাহত এবং সবদিক হতে তরংগাহত হয় এবং তারা তা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে মনে করে, তখন তারা আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে আল্লাহকে ডেকে বলে ঃ তুমি আমাদেরকে এ হতে ত্রাণ করলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

এই আয়াতে সাগরে নৌভ্রমণের কথা বলা হয়েছে। যখন অনুকূল বাতাস থাকে তখন নৌ ভ্রমণ হয় স্বচ্ছন্দ এবং আরোহীরা থাকে আনন্দিত। কিন্তু যখনি প্রতিকূল ঝড়ো বাতাস শুরু হয়, নৌযানের চারদিকে ঢেউয়ের আঘাতে নৌযান আন্দোলিত হতে থাকে তখন আরোহীরা বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কান্নাকাটি করতে থাকে।

নৌযান চালনার কলাকৌশল সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ২ ঃ ১৬৪ আয়াত প্রসঙ্গে প্রদান করা হয়েছে।

٢- إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ
مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ
اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ اَتٰهَآ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا
كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

১০ ঃ ২৪ পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত যেমন আমি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি যা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়, যা হতে মানুষ ও জীব-জন্তু আহার করে থাকে। অতঃপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয় এবং এর অধিকারীগণ মনে করে যে এটা তাদের আয়ত্বাধীন তখন দিনে অথবা রাতে আমার নির্দেশ এসে পড়ে ও আমি তা এমনভাবে নির্মূল করে দেই, যেন ইতিপূর্বে এর অস্তিত্বই ছিল না। এভাবে আমি নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য। এই আয়াতে আমাদের পার্থিব জীবনকে আকাশ থেকে বারি বর্ষণের দ্বারা জন্মানো উদ্ভিদের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

বৃষ্টির ফোটা মাটিতে নেমে আসে আকস্মিক করুণার বারিপাত হিসেবে, মাটির সাথে মিশে একে সিক্ত করে এবং উর্বর করে তোলে। অসংখ্য ধরনের

www.bjilibrary.com

শাক সবজি, শষ্য ও ফল ফলাদি জন্মায় যা আহার করে মানুষ ও গবাদি পশু জীবন ধারণ করে। এ ছাড়া এভাবে উদ্ভিদের বিস্তার, তাদের পাতা, ফুল ও ফলের বিচিত্র রংয়ের কারণে পৃথিবী সৌন্দর্য্য ও মহিমায় সুশোভিত হয়ে উঠে। কৃষকরা ভাবতে থাকে এসব তাদের মেধা ও প্রচেষ্টার ফল। তারা গর্ব অনুভব করে এবং ভাবে এসব কিছু তাদের আয়ত্তাধীন। কত ভ্রান্ত ধারণা! তিনিই আল্লাহ্ যিনি মেঘ থেকে বৃষ্টি প্রেরণ করেন (বৃষ্টির কণা গঠন এবং উদ্ভিদের জন্ম সম্পর্কে ২ ঃ১৬৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে)। ফলে বীজ অঙ্কুরিত হয়, বৃদ্ধি পায় এবং ফুল ও ফল ধারণ করে। আল্লাহ্ তা'আলা, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই রয়েছে এসবের উপর একচ্ছত্র ক্ষমতা। যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে সব কিছু নিমেষে ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রচন্ড তুষারপাত, শিলাবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, পঙ্গপালের আক্রমণ, ভূমিকম্প অথবা আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্নুৎপাত এমনকি গাছপালার কোন মড়ক বা রোগ আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে শষ্যক্ষেত ও ফলের বাগানকে বিধ্বস্ত করে দিতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা যখন এরূপ ধ্বংসের আদেশ প্রদান করেন তখন মানুষের চরমভাবে হতাশ হওয়া ছাড়া আর উপায় থাকে না।

অনুরূপভাবে আমরা আমাদের সমগ্র পার্থিব জীবনে নিরবচ্ছিন্নভাবে আল্লাহ্ তা'আলার করুণা দ্বারা সিক্ত থাকি, বাহ্য দৃষ্টিতে আমরা শক্তি অর্জন করি, ব্যক্তিত্বের বিভিন্নমুখী বিকাশ ঘটাই এবং শক্তিশালী সত্তায় পরিণত হই। আমরা নিরলস চেষ্টায় আবিষ্কার করি, গড়ে তুলি মজবুত ঘরবাড়ি, নির্মাণ করি পরিকল্পিত শহর ও নগর, নদীকে বশে আনি, মহাশূন্য জয় করি, আমরা রচনা করি শিল্পকলা, কবিতা, সাহিত্য ও সঙ্গীত; এসব কিছুই আমাদের জন্য সৌন্দর্যের উপকরণ এবং এগুলো সকলকে আনন্দ দান করে। অজ্ঞতাবশত এ সবের জন্য আমরা গর্ব অনুভব করি এবং ভাবি যে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ, আমাদের যা কিছু আছে ও অর্জন করেছি সবকিছু আমাদের আয়ত্তাধীন। অথচ যিনি আমাদের জন্য জীবন বিধান তৈরি করে দিয়েছেন, জীবন ধারণের সুযোগ করে দিয়েছেন, মেধা ও চিন্তাশক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন, শ্রবণ, দর্শন ও অনুভব করার মতো অমূল্য নিয়ামত দান করেছেন যেগুলো ছাড়া আমাদের কোন পরিপূর্ণতা সম্ভব হতো না, তাঁর কথা চিন্তা-ভাবনা করা কি আমাদের উচিৎ নয়! আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাঁর ক্ষমা ও করুণা প্রত্যাহার করে নেন, তাহলে আমাদের সকল প্রকারের অর্জন ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। অতএব মানুষ বিজ্ঞানের দ্বারা যত অগ্রগতিই অর্জন করুক না কেন সকল কার্যকারণের নিয়ন্তা ও সর্বময় ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'আলার হাতে।

www.bjilibrary.com

٣١- قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ
فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ○

১০ ঃ ৩১ বল, কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হতে জীবনোপকরণ সরবরাহ করে, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কার কর্তৃত্বাধীন, কে জীবিতকে মৃত হতে নির্গত করে এবং কে মৃতকে জীবিত হতে নির্গত করে? তখন তারা বলবে, আল্লাহ্। বল, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?

উদ্ভিদায়নে এবং মানুষের জীবন ধারণের ক্ষেত্রে বৃষ্টির অনকূল প্রভাব সম্পর্কে ৬ ঃ ৯৯ এবং ৭ ঃ ৫৮ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য সামগ্রী যে পর্যাপ্তরূপে দিয়ে থাকেন তার একটি বিবরণ সম্বলিত ব্যাখ্যা সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির প্রতি তাঁর কিছু বিশেষ অনুকম্পার কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসমূহ এ অর্থে অনন্য যে, বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলোর আধুনিকতা খুবই উঁচু মানের এবং পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টিকৌশল আজও অজ্ঞাত। আল্লাহ্ তা'আলা এখানে সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করেছেন যে শ্রবণ ও দৃষ্টি ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিয়ন্ত্রণে এবং এই ঘোষণার সাথে মানুষের এ যাবৎ প্রাপ্ত জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে একমত পোষণ করে।

এবারে আমরা শ্রবণ ও দর্শন যন্ত্রের গঠন কৌশল সম্পর্কে বুঝার চেষ্টা করব।

কান ঃ কানের তিনটি কাজ যথা ঃ শ্রবণ, ভারসাম্য রক্ষা ও গতি। অঙ্গটি তিন অংশে বিভক্ত, ক) বহিঃকর্ণ, এই অংশটি auricle বা কর্ণছত্রের সাথে কর্ণকুহর দ্বারা কর্ণপটহের (ear drum) বা পর্দার সাথে সংযুক্ত।

(খ) মধ্য কর্ণ ঃ এটি কর্ণপটহ (tympanic membrane drum) থেকে অন্তঃকর্ণ (internal ear) পর্যন্ত বিস্তৃত অংশ যা একটি নালিকা দ্বারা গলবিলের (throat) সাথে সংযুক্ত, এই নালিকাটির নাম হচ্ছে ইউস্টেশিয়ান (eustachian) নালিকা। (গ) অন্তঃকর্ণ ঃ এই অংশটি গঠিত হয়েছে গোলক ধাঁধার মতো জটিল ল্যাবিরিনথ (labyrinth) দ্বারা যা মস্তিষ্কের ভেস্টিবুলো ককলিয়ার (vestibulocochlear) স্নায়ু (৮ম স্নায়ু) পর্যন্ত পৌঁছেছে।

www.bjilibrary.com

শ্রবণের জন্য বহিঃকর্ণ জরুরী নয় যদিও বহিঃকর্ণের কর্ণছত্র (pinna) শব্দ গ্রহণের চুঙ্গি হিসেবে কাজ করে।

মধ্যকর্ণ ঃ কর্ণপটহ্ বা পর্দা বহিকর্ণের একটি নালিকার (external acoustic meatus) শেষ প্রান্তে আড়াআড়িভাবে অবস্থান করে। মধ্য কর্ণস্থ গহ্বরের গভীরতা প্রায় ৮ মিঃ মিঃ × ৪ মিঃ মিঃ এবং এতে তিনটি অস্থি বা হাঁড় আছে যথা ম্যালিয়াস (হাতুড়ীর মতো), ইনকাস (নেহাইয়ের মতো), স্টেপিস (ঘোড়ার জিনের পা-দানির মতো)। এগুলোকে একত্রে বলা হয় (auditory ossicle) অডিটরী অসিকল। এগুলো কর্ণগহ্বরের ভিতরে কর্ণপটহ্ ও কোর্ডা টিমপানি (chorda tympani) তন্ত্রীর সাথে ভিতরের দিকে আড়াআড়িভাবে যুক্ত। তিনটি ক্ষুদ্রাকার হাঁড়ের শিকল আড়াআড়িভাবে কর্ণপটহ্কে কোর্ডা টিমপানি তন্ত্রী দ্বারা অন্তঃকর্ণের সাথে সংযুক্ত করে। কানের পর্দায় আঘাতকারী বায়ুতরঙ্গকে অসিকল এক ধরনের যান্ত্রিক গতিশীলতায় রূপান্তর করে কর্ণের অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থকে প্রভাবিত করে। (উল্লিখিত তরল জাতীয় পদার্থের উপর বায়ু তরঙ্গ সরাসরি খুব সামান্যই প্রভাব ফেলতে পারে।)

ইউস্টেশিয়ান নালিকা গলা (throat) থেকে বাতাস আসতে দেয় এবং এভাবে কাণের পর্দার উভয় পার্শ্বের চাপের ভারসাম্য রক্ষিত হয়। এই ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেলে বধিরতা দেখা দিতে পারে এবং এই নালিকা দ্বারা যে কোন সংক্রমণ মধ্যকর্ণ পর্যন্ত পৌছতে পারে।

অন্তঃকর্ণ ঃ এই ঝিল্লিময় ল্যাবিরিন্থ্ (membranous labyrinth) দু'ভাগে বিভক্ত। অগ্রভাগ ক্ষুদ ক্ষুদ্র অস্থিময় স্যাকিউল (sacule) এবং ককলিয়ার নালিকা (cochlear duct) দ্বারা গঠিত এবং এটি শ্রবণ ক্ষমতার সাথে যুক্ত। ককলিয়ার নালিকায় পেঁচানো অর্গান অব কর্টি (organ of Cortl) থাকে যেখানে শব্দ তরঙ্গসমূহ চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। অতঃপর এই শব্দগুলো ককলিয়ার তন্ত্রীতে প্রেরিত হয়। এই তন্ত্রীগুলো হচ্ছে ভেস্টিবুলোককলিয়ার তন্ত্রীর শাখা বিশেষ যা সূতার মতো তন্ত্রীসমূহ (filament) দ্বারা অর্গান অব কর্টি বা পেঁচানো কর্ণকুহরের সাথে সংযোগ রক্ষা করে। পেঁচানো কর্ণকুহরে থাকে দু'সারি দন্ত এবং কয়েক সারি বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের মসৃণ লোমযুক্ত কোষ। এই দন্তসমূহ ও লোমকোষগুলো সম্ভবত বিভিন্ন প্রকারের সঙ্গীত ধ্বনির সাথে সম্পর্কিত।

শ্রবণ ক্রিয়া ঃ যখন বাতাসের শব্দ তরঙ্গ কানে পৌছে এবং কানের পর্দায় আঘাত করে তখন এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করে তাকে আবার বাইরে টেনে আনে। এভাবে শব্দের দ্বিমুখী গতি সঞ্চারিত হয়। এই গতির ফলে মধ্যকর্ণের অসিকল শিকলের সাথে সংযোগ স্থাপিত হয়। আর এই গতিশীলতার ফলে

www.bjilibrary.com

স্টেপিসের পা-দানীর মতো অংশের সাথে অন্তঃকর্ণের পেরিলিম্ফের সংযোগ স্থাপিত হয়। সবশেষে এই গতি অর্গান অব কর্টি (organ of Corti)-এর সূত্রবৎ তন্ত্রীসমূহে (nerve filaments) পৌঁছায়, যা শ্রবণতন্ত্রীকে প্রভাবিত করে এবং এর ছাপ মস্তিষ্কের কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়।

শ্রবণ সম্পর্কিত দু'টি তত্ত্ব আছে যথা ঃ

(১) হেলম্‌হজ (Helmholtz)-এর তত্ত্ব অনুসারে কর্ণকুহরকে একটি পিয়ানোর সাথে তুলনা করা হয়েছে। তিনি মনে করেন যে প্রতিটি শব্দ কর্ণকুহরের সংশ্লিষ্ট অংশে কম্পনের সৃষ্টি করে।

(২) অপর তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, শব্দ সমগ্র কর্ণকুহরে কম্পনের সৃষ্টি করে, মস্তিষ্কের শ্রবণ কেন্দ্র উক্ত শব্দের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে ও উপলব্ধি করে।

দর্শন প্রক্রিয়া ঃ রেটিনা (অক্ষিপট) হলো একটি স্নায়ুময় কাঠামো এবং অক্ষি গোলকের সর্বাপেক্ষা ভেতরের স্তর অপটিক স্নায়ু (optic nerve) শ্বেতমন্ডল (sclerotic) কৃষ্ণমন্ডল (choroid) কে ভেদ করে, অতঃপর অক্ষিপট আবরণে ছড়িয়ে পড়ে। এখানে থাকে রক্তবাহিকা, রঞ্জক ও স্নায়ুকোষ সমূহ। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখলে দেখা যাবে যে অক্ষিপট প্রায় দশটি স্তরের সমন্বয়ে গঠিত। সবচেয়ে বাইরে আছে রঞ্জক কোষের স্তর, যা চোখের অভ্যন্তরে আলো ছড়িয়ে পড়াকে প্রতিরোধ করে। পরবর্তী স্তর হলো দণ্ডাকৃতি (rods) কোষ ও মোচাকৃতি (cones) কোষ, এতে আলোকরশ্মি গৃহীত হয় এবং তার প্রতিফলন চক্ষু স্নায়ুর (optic nerve) মাধ্যমে মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগে অবস্থিত নির্ধারিত স্থানে প্রেরণ করে, যেখানে সে আলোর বাস্তবতা উপলব্ধ এবং বস্তুটি দৃষ্টিগোচর হয়। বিস্তারিত জানার জন্য ২ ঃ ২০ আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন।

দুটি চক্ষুস্নায়ুতে প্রায় বিশ লক্ষ আঁশ (filaments) আছে। এগুলোর অধিকাংশ মধ্য মস্তিষ্কের (thalamus) পাশে অবস্থিত একটি বংশগতি নিরূপক পিণ্ডে (geniculate body) এসে শেষ হয়েছে। এই পিন্ডের প্রতিটি আঁশে মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগের দৃশ্যমান এলাকায় ৫০০০ নিউরন সমৃদ্ধ প্রান্তভাগ বা টার্মিনাল আছে। এ সকল নিউরনের প্রতিটির সাথে আবার প্রায় ৪০০০ অন্যান্য নিউরনের সংযোগ আছে। মানুষের অক্ষিপটে প্রায় ৬৫ লক্ষ মোচাকৃতি (cones) কোষ এবং প্রায় ১১ কোটি ৫০ লক্ষ দন্ডাকৃতি (rods) কোষ আছে। দৃষ্টিশক্তির দিক থেকে চোখকে ক্যামেরার সাথে তুলনা করা যায়।

www.bjilibrary.com

চোখের পিছনে একটি উল্টা প্রতিচ্ছবি তৈরি হয়। মস্তিষ্ক কী কৌশলে তা থেকে বস্তুর স্বাভাবিক অবস্থার ধারণা তৈরি করে তা আজও মানবীয় জ্ঞানের অতীত রয়ে গেছে।

শ্রবণ ও দর্শন উভয় অতি জটিল কলা কৌশল, আর এগুলো সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হয় আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মের অনুসরণে। স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য দু'টি বিষয় অপরিহার্য। এগুলো ছাড়া জীবনের বহুদিক অনাবিষ্কৃত থেকে যাবে। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা এসবের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং এগুলোকে তিনি মানব জাতির জন্য তাঁর বিশেষ করুণার নিদর্শন হিসেবে তুলে ধরেছেন। শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিহীন কারো পক্ষে আল্লাহ তা'আলার বাণী পরিপূর্ণরূপে অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

'এবং কে সকল বিষয় শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করে?' আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিকট থেকে বহু বহু দূরে অবস্থিত তারকারাজি থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু কণিকাসহ বস্তু জগতের সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। এ সম্পর্কে ৭ ঃ ৫৪ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে এবং পরিশিষ্ট-৩-এ আলোচনা করা হয়েছে। জীব জগতের সকল কিছুও আল্লাহ তা'আলার বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে (আয়াত ৭ ঃ ১৮৫)।

৩৪- قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ
ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنّٰى تُؤْفَكُونَ ○

১০ ঃ ৩৪ বল, তোমরা যাদেরকে শরীক কর তাদের মধ্যে এমন কেউ কী আছে যে সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করে ও পরে এর পুনরাবর্তন ঘটায়? বল, 'আল্লাহ্ই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনেন ও পরে এর পুনরাবর্তন ঘটান।' সুতরাং তোমরা কেমন করে সত্য-বিচ্যুত হচ্ছো?

সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনা ও তার পুনরাবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য ১০ ঃ ৪ আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন।

৫৫- أَلَآ إِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ ○

www.bjilibrary.com

১০ ঃ৫৫ সাবধান ! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই। সাবধান! আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশই অবগত নহে।

এই বিষয়ে ৫ ঃ ১৯ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে।

৫৯-قُلْ أَرَءَيْتُمْ مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَٰلًا
قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ○

১০ ঃ ৫৯ বল, 'তোমরা কী ভেবে দেখেছ, আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন, তোমরা যে তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছ? বল, আল্লাহ্ কী তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করছ?

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবরা কুসংস্কারবশত কিছু খাবারকে হারাম করেছিল সে বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অন্যান্য জাতি সমূহের মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কারের ক্ষেত্রেও এটা সমভাবে প্রযোজ্য। ইসলাম হারাম খাদ্য ও পানীয়ের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করেছে। অথচ ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবরা ধর্মগ্রন্থের অনুমোদন ছাড়াই কিছু কিছু খাদ্যকে হারাম অথবা হালাল ঘোষণা করতো। তবুও কিছু কিছু হারামকে তারা ঐশী নির্দেশ হিসেবে গণ্য করতো, অথচ সে সম্পর্কে তাদের হাতে কোন প্রমাণ ছিল না। ৬ ঃ ১৩৯ আয়াত প্রসঙ্গে এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

৬১-وَمَا تَكُونُ فِى شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا۟ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ
إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ
فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ○

১০ ঃ ৬১ তুমি কোন কাজে রত হও এবং তৎ সম্পর্কে কুরআন হতে যা আবৃত্তি কর এবং তোমরা যে কোন কাজ কর, আমি তোমাদের পরিদর্শক– যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অণু পরিমানও তোমার প্রতিপালকের অগোচর নেই এবং তা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর কিছু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।

এই আয়াতে মহান আল্লাহ্ তাঁর যে কোন সৃষ্টি সম্পর্কে এমন কি বিশাল অথবা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অন্যান্য বস্তু যেগুলো সাধারণ জ্ঞানের আড়ালে রয়ে গেছে সে সম্পর্কে তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞানের কথা নিশ্চিত করেছেন।

প্রায় তিন হাজার বছরেরও আগে গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস এই ধারণার সূচনা করেছিলেন যে, বস্তু এ্যাটমস্ (atmos) অর্থাৎ অদৃশ্য কণিকা দ্বারা গঠিত। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে ডালটন কর্তৃক বস্তুর আধুনিক পারমাণবিক মতবাদ প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত এই মত চলে আসছিল। এ্যাটম (atom) শব্দটি ল্যাটিন এ্যাটমস্ (atmos) থেকে নেয়া হয়েছে। ডালটনের মতে যে কোন উপাদান বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিভাজ্য পরমাণু দ্বারা গঠিত। ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে এভাগাদ্রো মলিকিউল (molecule) বা অণু সম্পর্কিত ধারণার সূচনা করেন। মলিকিউল গঠিত হয় দুই বা ততোধিক পরমাণুর সমন্বয়ে। লর্ড রাদারফোর্ড ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত গবেষণার মাধ্যমে পরমাণুর গঠন সংক্রান্ত তথ্য উদঘাটন করেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, একটি পরমাণু গঠিত হয় পুঞ্জীভূত ইলেকট্রনে ঘিরে থাকা একটি ক্ষুদ্র ঘন নিউক্লিয়াস বা পরমাণু কেন্দ্র দ্বারা। পরমাণু সম্পর্কে যত বেশী গভীর অনুসন্ধান চালানো হয়েছে তত বেশী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণু ধরা পড়েছে। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পদার্থ বিজ্ঞানীগণ একশ'-এরও বেশী উপ-পরমাণু আবিষ্কার করেন। এখন পদার্থ বিজ্ঞানীগণ বিশ্বাস করেন যে, সকল বস্তু লেপটন (leptons -ইলেকট্রন, মিউওনস্ ও নিউট্রিঅনস্) ও কোয়ার্কস (quarks) দ্বারা গঠিত। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য)।

বস্তুর অবিভাজ্য গঠনকারী উপাদান সম্পর্কে জানার প্রচেষ্টায় সম্পাদিত গবেষণা কর্মসমূহের মাধ্যমে জ্ঞানের নব নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এ সকল বস্তু কণার ওজন অবিশ্বাস্যভাবে কম অর্থাৎ একটি ইলেকট্রনের ভর ৯.১০৭ × ১০$^{-২৮}$ গ্রাম মাত্র। এ সকল কণিকা ৪টি প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। (পরিশিষ্ট-৩-এ বিস্তারিত দ্রষ্টব্য)। সংগঠন, যথার্থতা ও শৃঙ্খলা বিষয়ে এমনকি উপ-পারমাণবিক স্তরেও মানুষের বর্তমান জ্ঞান অতীব চমৎকার সৌন্দর্যে বিকশিত হয়েছে। সুতরাং এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকাগুলো শুধুমাত্র সৃষ্টিই করেননি, বিভিন্ন ধরনের বস্তু ও শক্তির মধ্যে এ সকল কণিকার সংগঠনেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অনুসন্ধান কৌশলের যেরূপ অবিরাম উন্নতি হচ্ছে তাতে এও হতে পারে যে, আজ যা যা সম্ভব হয়েছে, আগামী দিনে বস্তুর উপর আরো গভীরতর অনুসন্ধান

www.bjilibrary.com

করা হবে। আজ আমরা যে ক্ষুদ্রতম বস্তু কণার কথা জানতে পেরেছি, তার চাইতেও ক্ষুদ্রতর বস্তুকণা সম্পর্কে সন্ধান পাওয়া যাবে। তবে কোন বস্তুর ক্ষুদ্রতা সম্পর্কে চূড়ান্ত সত্য একমাত্র মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলারই জানা আছে।

$$১০^{-২৮} \text{ গ্রাম} = \frac{১}{১,১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০} \text{ গ্রাম}$$

٦٧. هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ۝

১০ ঃ ৬৭ তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত, তোমাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিন, দেখার জন্য। যে সম্প্রদায় কথা শোনে নিশ্চয়ই তাদের জন্য এতে আছে নিদর্শন।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয়েছে বিশ্রাম ও কাজের পারস্পরিক বদলের মাধ্যমে। আমরা যে পৃথিবীতে বসবাস করি তাতে রাতের পরে দিন এসে আমাদের জন্য পরিবেশকে অনুকূল করে দেয়।

দিনের বেলায় সূর্যালোকের কারণে চারদিকে পূর্ণরূপে আলোকিত থাকে বিধায় সকল কিছু আমাদের জন্য দৃষ্টিগ্রাহ্য থাকে (আলোকরশ্মি কীভাবে আমাদের দর্শন ইন্দ্রিয়কে জাগ্রত করে সে সম্পর্কে ২ ঃ২০ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে) এবং আমরা দিনের বেলায় নানাবিধ পার্থিব কার্যাবলী দক্ষতার সাথে সম্পাদনে সক্ষম হই। সন্ধ্যার দিকে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি এবং বিশ্রাম কামনা করি। সূর্যাস্তের সাথে সাথে অন্ধকারের আবরণে রাতের আবির্ভাব ঘটে, বায়ুমন্ডল ঠান্ডা হয়ে পড়ে এবং আমাদের নিদ্রার জন্য আরামদায়ক পরিবেশ তৈরি হয়, আমরা আবার সবল হয়ে উঠি। রাত ও দিনের পার্থক্য সম্পর্কে ২ ঃ ১৬৪ আয়াত প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

٧٣. فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَجَعَلْنٰهُمْ خَلٰٓئِفَ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝

১০ ঃ ৭৩ আর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে; অতঃপর তার সাথে যারা তরণীতে ছিল তাদেরকে আমি উদ্ধার করি এবং তাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করি ও যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল

www.bjilibrary.com

তাদেরকে নিমজ্জিত করি। সুতরাং দেখ, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের কী পরিণাম হয়েছে?

এই আয়াতে নবী হযরত নূহ (আ)-এর সময়ের প্লাবণের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এই আয়াত প্রসঙ্গে বন্যা সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

٩٢- فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ۝

১০ ঃ ৯২ আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক। অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকেই আমার নিদর্শন সম্বন্ধে অনবধান।

যখন হযরত মূসা (আ) তাঁর নবুওতী মিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে ফিরআউনকে বুঝাতে ব্যর্থ হলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বনি ইসরাইলীদেরকে নিয়ে মিশর ত্যাগ করার জন্য তাকে উপদেশ দিলেন। সে অনুসারে হযরত মূসা (আ) তার লোকজন নিয়ে চলে যাওয়ার সময় পানির বাধার (নদী অথবা সাগর) সম্মুখীন হলেন। অতঃপর আল্লাহ্র মেহেরবাণীতে পানির মধ্যে তৈরি হয়ে যাওয়া পথ অতিক্রম করলেন। ফিরআউন তার সৈন্যদল নিয়ে বনি ইসরাইলীদের পিছু ধাওয়া করে যখন সাগর বা নদীর তীরে এসে পৌঁছলো তখন দেখলো যে পলায়নকারীরা পানিতে তৈরি হওয়া পথের মাঝামাঝি রয়েছেন। ফিরআউন এই অলৌকিক পলায়নের কথা অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে তার দলবলসহ বনি ইসরাইলীদের পশ্চাৎ ধাবন করলো। বনি ইসরাইলীরা যখন অপর তীরে পৌঁছলো ফিরআউন ও তার সঙ্গীরা তখন মাঝপথে, তারা সেখানে আল্লাহ্র দেয়া শাস্তি হিসেবে ডুবে মারা গেল। ডুবে মরার সময় ফিরআউন আল্লাহ্র উপর বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করেছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছিলেন, 'কী! এখন, ইতিপূর্বে তো অমান্য করেছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।' (আয়াত ১০ ঃ ৯১) তখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হলো, যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণকারীদের পরিণাম সম্পর্কে নজির হিসেবে তিনি ফিরআউনের দেহকে সংরক্ষিত রাখবেন।

www.bjilibrary.com

ঐ ঘটনায় কোন্ ফিরআউনের মৃত্যু হয়েছিল সে সম্পর্কে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে কিছু সংখ্যক ফিরআউনের মমি পাওয়া গেছে এবং সেগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে। মূসা (আ)-এর সময়ের ফিরআউনের পরিচয় সম্পর্কে পন্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কিছু সংখ্যক পন্ডিতের মতে তৃতীয় তুতমোজেস-এর পুত্র এবং অষ্টাদশ রাজবংশের (১৫৮৭-১৩৭৫ খ্রিঃ পূঃ) দ্বিতীয় আমনহোতেপ-এর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ছিলেন মূসা (আ)-এর সময়ের ফিরআউন। কিন্তু অন্যান্যরা মনে করেন যে, উনিশতম রাজ বংশের (১৩৭৫-১২০২ খ্রিঃ পূঃ) দ্বিতীয় রামসেস ছিলেন অত্যাচারী ফিরআউন এবং তাঁর উত্তরাধিকারী ফিরআউন মারনেপতাহ্-এর সময়ে হিজরত (বনি ইসরাইলীদের) সংঘটিত হয়েছিল। এই তিনজন ফিরআউনের মমিও এখন শনাক্তকৃত। মূসা (আ)-এর সময়ের ফিরআউনকে চিহ্নিত করার জন্য কুরআন বিশেষজ্ঞগণকে পরবর্তী গবেষণায় এগিয়ে আসতে হবে। এ বিষয়ে আমরা বাইবেল বিশেষজ্ঞদের মতামতের উপর নির্ভর করে থাকতে পারি না। বাইবেলের মতে হিজরতকালীন ফিরআউন পানিতে ডুবে মারা যায়নি। যেহেতু কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, উক্ত ফিরআউনের দেহকে সংরক্ষিত রাখা হবে, তাহলে তার মমি অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে। এও হতে পারে যে ডুবে মরে যাওয়া ফিরআউনের উত্তরাধিকারী ঐ সময়ের প্রচলিত প্রথা অনুসারে মৃতদেহ সংরক্ষণের (মমি আকারে) ব্যবস্থা করেছে। অবশ্য এখনো বহু পিরামিড খননের অপেক্ষায় আছে।

৬- وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ
مُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ○

১১ ঃ ৬ ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্রই; তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্পর্কে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে।

সাধারণভাবে دابة শব্দের অর্থ হলো বিচরণশীল প্রাণী যা শুধুমাত্র পশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যদিও কিছু কিছু গাছপালা সম্পূর্ণরূপে স্থানান্তর শক্তি রহিত নয়। পশু ও উদ্ভিদরাজ্যে উভয়েরই কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে, কোয়েলেনটারেটস (coelenterates) তথা ওবেলিয়া (obelia)-এর মতো প্রাণীরা স্থবির, যদিও

তাদের জীবন চক্রের অন্তত একটা পর্যায়ে তারা গতিশীল থাকে। অপরদিকে নিম্নস্তরের কিছু কিছু আণুবীক্ষণিক আকারের সবুজাভ সচল শৈবাল (algae) ও ব্যাকটেরিয়া আছে। উঁচু স্তরের কিছু উদ্ভিদের জীবন চক্রের কোন কোন পর্যায়ে (জনন কোষের গতিশীলতা) এই গতিশীলতা দেখা যায়। সুতরাং 'বিচরণশীল প্রাণী' বলতে এখানে ব্যাপকার্থে প্রাণী জগত ছাড়াও স্থানান্তর ক্ষমতার অধিকারী উদ্ভিদও অন্তর্ভুক্ত।

খাবার খাওয়ানোর তৎপরতা ছাড়াও প্রতিটি প্রজাতির পাখি ও অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবকোষসহ বিভিন্ন প্রাণী অগণিত উৎস থেকে তাদের প্রয়োজন মতো খাদ্য পুষ্টি গ্রহণ করে । এ কাজ তারা শুধুমাত্র নিজেদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই করে না, সে সাথে তাদের বাচ্চাদের জন্যও খাবার যোগান দেয়। যখন খাবারের ঘাটতি দেখা দেয় অথবা পরিবেশগত উপাদানগুলো বিরূপ হয়ে উঠে, যেমন অত্যধিক গরম অথবা ঠান্ডা দেখা দিলে প্রাণীকুল নতুন এলাকায় স্থানান্তরে গমন করে, যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার পাওয়া যায় এবং আবহাওয়া প্রতিকূল থাকে না। বস্তুত পৃথিবীতে যত প্রজাতির পাখি আছে তার প্রায় এক তৃতীয়াংশ পাখি বিভিন্ন মাত্রায় স্থানান্তর গমন করে থাকে, তাদের সংখ্যা প্রায় হাজার হাজার লক্ষ। গ্রীনল্যান্ডের গাঙচিল প্রতিবছর সুমেরু থেকে আনুমানিক ১০০০০ মাইল উড়ে গিয়ে কুমেরুতে পৌছে। চড়ুই, রবিন ও কোকিল ইত্যাদি পাখি খাবারের সন্ধানে অথবা ডিম পাড়ার জায়গার খোঁজে দূরে কিংবা কাছে স্থানান্তরে গমন করে থাকে।

মূল বাসস্থান ত্যাগের সঠিক সময়, অস্থায়ী বাসস্থানে যাওয়ার প্রকৃত পথ এবং পুনরায় স্থায়ী বাসস্থানে কোন পথে প্রত্যাগমন করবে ইত্যাদি পাখিদের সহজাত প্রবৃত্তি আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্দেশিত নিয়মে বায়ুমন্ডলীয় চাপ, ভূ-প্রকৃতি ও আবহাওয়া ইত্যাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অস্ট্রেলিয়ার মাটন পাখি (mutton bird) আকাশে বিশাল চক্র তৈরি করে দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়া থেকে উত্তর দিকে উড়ে যায়। অতঃপর লক্ষ লক্ষ পাখির এই বিশাল ঝাঁক উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূল হয়ে তাদের ক্ষুদ্র দ্বীপে ফিরে আসে প্রতিবছর নভেম্বর মাসের শেষ দিকে একই সন্ধ্যায়[১]। এরূপ আরো দুটি উদাহরণ হলো ঃ সামুদ্রিক ঈগল ও বক পাখি একটি নির্দিষ্ট তারিখে স্কটল্যান্ডের পূর্ব উপকূলবর্তী পাহাড়ী এলাকায় আসে ডিম পাড়ার জন্য এবং সাইবেরিয়া ও অন্যান্য এলাকা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে জলচর পাখি বাংলাদেশের হাওর এবং বিলে (বিস্তীর্ণ জলমগ্ন এলাকা) আগমন করে। একই ধরনের উদাহরণ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের যেমন কৃষ্ণ

www.bjilibrary.com

হরিণ ও হাতিদের মধ্যে দেখা যায়। তারা খাবারের সন্ধানে দল বেঁধে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে। পাখি ও অন্যান্য প্রাণীর স্থানান্তর গমনের রহস্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে গিয়ে তাদের গমনাগমনের পথ, গন্তব্যে পৌঁছানো এবং চলে যাওয়ার সঠিক সময় ইত্যাদি সম্পর্কে মাত্র চলতি শতাব্দী থেকে মানুষ জানতে শুরু করেছে।

স্থানান্তর গমন ও খাদ্য প্রবাহের এই জটিল ও বহুমুখী প্রক্রিয়ার সাথে কোন-একটি সম্প্রদায়ের সকল জীবকোষের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত, যা রক্ষাকর্তা সর্বজ্ঞাতা ও সকল প্রাণীর লালনকারী আল্লাহ্ তা'আলার মহাপরিকল্পনার আরেকটি রূপায়ন।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Peterson, R. T. The Birds ; Time-Life International (Netherland) N. V. p. 101, 1968.

www.bjilibrary.com

٧- وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ

১১ ঃ ৭ তিনিই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে, তোমাদের মধ্যে কাজে কে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করার জন্য.....

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টির বিষয়ে ইতিপূর্বে ৭ ঃ ৫৪ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

٤٠- حَتّٰى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۙ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا

১১ ঃ ৪০ অবশেষে যখন আমার আদেশ আসলো এবং উনান উথলে উঠলো, আমি বললাম, এতে উঠিয়ে নাও .....

সূরা হুদ-এর ৩৬-৪৯ আয়াতে নবী হযরত নূহ্ (আ) কর্তৃক কিশতি নির্মাণ করা, এ ব্যাপারে অবিশ্বাসীদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, বিশ্বাসীদের প্রতি প্রজাতির প্রাণীর একটি করে জোড়া রক্ষা করা, প্লাবনের প্রশমন, কিশতি জুদী পাহাড়ে স্থির হওয়া এবং অবশেষে পৃথিবীতে মানুষের বসতি স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

٤١- وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ۗ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

১১ ঃ ৪১ সে বলল, 'এতে আরোহণ কর, আল্লাহ্‌র নামে এর গতি ও স্থিতি, আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা হূদ-এর ৪১ নং আয়াতে হযরত নূহ (আ)-এর অনুসারীদেরকে তার তৈরি নৌকায় তা সে ভাসমান অথবা বিশ্চল অবস্থায় থাকুক না কেন, আরোহণের জন্য আদেশ করা হয়। অতএব এটা অনুমিত হয় যে এমনকি প্লাবন শুরুর পূর্বে অথবা নৌকাটি ভাসানর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি হলে লোকজন নৌকায় আরোহণ করতে শুরু করে। আবার নৌকাটির ভাসমান অবস্থায় পানি ভেঙ্গে অথবা সাঁতার কেটে তারা নৌকায় চড়তে থাকে।

٤٢- وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ○

১১ ঃ ৪২ "পর্বত প্রমাণ তরঙ্গের মধ্যে নৌকাটি তাদেরকে নিয়ে বয়ে চলল; নূহ (আ) তাঁর পুত্র, যে অন্য সকলের নিকট থেকে পৃথক ছিল, তাকে আহ্বান করে বলল, 'হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে নৌকায় ওঠ এবং কাফিরদের সঙ্গী হয়ো না।'

এই আয়াতে পর্বত সদৃশ ঢেউ-এর কথা বলা হয়েছে। সমুদ্রের ঢেউ-এর দু'টি প্রধান শ্রেণী রয়েছে। খুবই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ-এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (এক তরঙ্গ শীর্ষ থেকে অন্য তরঙ্গ শীর্ষের দূরত্ব) এক সেন্টিমিটারেরও কম, আবার বড় ও দীর্ঘ ঢেউসমূহের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এক একটি ৪৫ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। প্রধানত ভূ-উপরিস্থ প্রবল চাপ থেকে উদ্ভূত একটি বেগ থেকে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ-এর সৃষ্টি। পক্ষান্তরে দীর্ঘ ও বিস্তীর্ণ ঢেউসমূহ কেবল মাত্র মাধ্যাকর্ষণ শক্তি থেকে তাদের স্বীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করে থাকে। ঢেউ-এর এই মুখ্য বিভাজনের বাইরে অভিকর্ষ দারা সৃষ্ট ঢেউ দু'টি স্বতন্ত্র কর্তৃত্বের অধীনে ঘটে। গভীর পানির ঢেউ অগভীর পানির ঢেউ থেকে আলাদা এবং এই দু'টি অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব দাড় করান হয়েছে। অগভীর পানি বলতে কী বোঝায় তা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। কোন বড় জলাধার বা হ্রদে সৃষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিকর্ষ ঢেউ গভীর পানির ঢেউয়ের মত পানির উপরিভাগ দিয়ে প্রবাহিত হয়, তবে তাদের গভীরতা থাকে মাত্র এক বা দুই ফুট। যেহেতু ঢেউগুলি অধিকতর অগভীর পানির মধ্য দিয়ে চলে তাই তাদের গতিবেগ হ্রাস পায়। এই ঢেউসমূহ যে শক্তি ধারণ করে তা একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এলাকায় কেন্দ্রীভূত হয় এবং এর ফলে ঢেউয়ের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। অগভীর পানির তরঙ্গমালা স্বীয় আকৃতি পরিবর্তন ব্যতীত তৈরি হতে পারে না। দুটি ঢেউয়ের মধ্যবর্তী নিচু স্থান থেকে ঢেউয়ের শীর্ষ দেশ অধিকতর দ্রুত বেগে প্রবাহিত হয়ে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে ধরে ফেলে। ঢেউয়ের সম্মুখভাগ খাড়া হয়ে ওঠে এবং শেষে ভেঙ্গে পড়ে। খাড়া তাক বিশিষ্ট সমুদ্র সৈকতে বড় বড় ঢেউ ভেঙ্গে পড়ে খুবই ধ্বংসাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করে।

পর্বত প্রমাণ ঢেউয়ের এই বর্ণনা থেকে এটা মনে হয় যে নূহ (আ)-এর এলাকার মহাপ্লাবনের গভীরতা খুব বেশী ছিল না, বরং গভীর পানির ঢেউয়ের ধ্বংসকারী আঘাতের ন্যায় এগুলো ছিল ক্ষুদ্র অভিকর্ষ ঢেউয়ের প্রচন্ড প্রবাহ।

www.bjilibrary.com

٤٤- وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ
وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○

১১ ঃ ৪৪ এরপর বলা হ'ল, 'হে পৃথিবী! তুমি তোমার পানি গ্রাস কর এবং হে আকাশ! ক্ষান্ত হও।' এরপর বন্যা প্রশমিত হ'ল এবং কাজ সমাপ্ত হ'ল, নৌকা জুদি পর্বতের উপর স্থির হ'ল এবং বলা হ'ল, 'সীমালজ্ঞনকারী সম্প্রদায় ধ্বংস হোক'।

এই আয়াতে মহাপ্লাবন প্রশমনের এবং জুদী পর্বতে নৌকা স্থিত হওয়ার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

জুদী পর্বতের অবস্থান নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে। তুরস্ক, ইরাক ও সিরিয়ার সীমান্তবর্তী বোহতান নামক একটি তুর্কী জেলায় বেশ উঁচু একটি পর্বত আছে। আরারাত মালভূমির বিশাল পর্বতরাজি এই জেলায় প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। জাবাল জুদীর সন্নিকটবর্তী অঞ্চলই বর্তমান কালের স্মৃতিময় ও কাহিনী সমৃদ্ধ সেই স্থান যেখানে নূহ (আ)-এর সময়কার মহাপ্লাবন এবং নৌকা থেকে অবরোহণের পর তাঁর জীবন সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

নূহ (আ)-এর নৌকার অবস্থানস্থল হিসাবে আরারাত পর্বতের উপর বাইবেলে উল্লেখিত কাহিনীর সাথে আরারাত পর্বতমালার একটি ক্ষুদ্রতর চূড়া সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বাসের সাদৃশ্য দেখা যেতে পারে।

٥٢- وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا
وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ○

১১ ঃ ৫২ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর দিকেই ফিরে আস। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বারি বর্ষণ করবেন। তিনি তোমাদেরকে আরো শক্তি দিয়ে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবেন এবং তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিও না।

এই আয়াতে আকাশ শব্দটি বৃষ্টি ভারাক্রান্ত মেঘমালার আকাশের পরিবর্তে গ্রহণ করা যেতে পারে। কোন কোন ভাষ্যকার আরবী শব্দ সামা'কে মেঘ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

www.bjilibrary.com

আকাশে মেঘের সৃষ্টি এবং আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত আয়াত নং ২ ঃ ১৬৪-এ আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে আরো বলা হয়েছে যে প্রচুর পরিমাণে বারি বর্ষণের ফলে মৃত ধরিত্রী কিভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং সবুজ তৃণাদি উৎপন্ন হয়। এর ফলে নানারকম শাক-সবজি, শষ্য ও ফল জন্মে। এ সকল উৎপন্ন ফসলাদি মানুষ ও প্রাণীকুলকে বাঁচিয়ে রাখে। ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় এই শব্দ সমষ্টির আমরা দুই প্রকার অর্থ করতে পারি। প্রথমত সহজে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য প্রাপ্তি মানুষকে স্বাস্থ্যবান অর্থাৎ শারীরিকভাবে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে; দ্বিতীয়ত ঐ উর্বর অঞ্চলে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং নিজদেরকে একটি শক্তিশালী সম্প্রদায়ে পরিণত করে। তবে এজন্য কর্মদক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের যথাযথ পরিচর্যার প্রয়োজন।

৫৬- إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ۚ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ
إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

১১ ঃ ৫৬ আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র উপর, এমন কোন জীবজন্তু নেই, যে তাঁর পূর্ণ আওতাধীন নয়; আমার প্রতিপালক আছেন সরল পথে।

আরবী "দাব্বাতিন" শব্দের অর্থ প্রাণীকুল যাদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াতের সামর্থ্য রয়েছে। তবে বৃহত্তর অর্থে আল্লাহ্‌ সৃষ্ট সকল জীবজন্তুকে বুঝান হয়েছে। এখানে চলমান জীবজন্তুর শিরোপরি কেশগুচ্ছ ধারণ ভাষার বাগবৈশিষ্ট্যের বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত এবং এই উপমাটি 'অশ্বের কেশগুচ্ছ' নামক বাক্যাংশ থেকে গৃহীত হয়েছে। কেশগুচ্ছ ধারণ একটি আরবী বাগধারা, এর অর্থ পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। যে ব্যক্তি অশ্বের মাথার উপর কেশগুচ্ছ ধরে রাখতে পারে, অশ্বের উপর তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে বলে ধরা হয়।

প্রাণীজগতের এই বিপুল বৈচিত্র্য তা তারা ভূমির উপর বিচরণকারী বন্য জন্তু বা পাখী, জলজ প্রাণী, কীটপতঙ্গ যাই হোক না কেন, পৃথিবীতে জীবনধারণকারী সবকিছুই তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন ও কল্যাণের জন্য আল্লাহ্‌ নির্দেশিত বিধান দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রাণীকুলের স্বীয় আবাসস্থল গড়ে তোলা, খাদ্যের উৎস খুঁজে বের করা, প্রতিরক্ষা কৌশল আয়ত্ব করা, স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বসবাস করা এবং প্রজনন রীতি মেনে চলা- এ সবই এই বিধানের

www.bjilibrary.com

অন্তর্ভুক্ত। নিখিল সৃষ্টি সংক্রান্ত সর্বজনীন এই বিধানাবলির কোন লংঘন হলে তা ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের অনিষ্ট সাধন করে এবং আল্লাহ্‌র মঙ্গলকর পরিকল্পনা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্ট জীবকে তত্ত্বাবধান ও পূর্ণ পর্যবেক্ষণে রাখেন। আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান লংঘনের কারণে যে ক্ষতি ও বিপর্যয় ঘটে তাও আল্লাহ্‌র পূর্ব নির্ধারিত নিয়মেই হয়ে থাকে।

٦١- وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ
هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي
قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ○

১১ ঃ ৬১ ছামূদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা সালিহকে পাঠিয়েছিলাম, সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তিনি তোমাদেরকে ভূমি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতেই তিনি তোমাদেরকে বসবাস করিয়েছেন। সুতরাং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন কর। আমার প্রতিপালক নিকটেই, তিনি আহ্বানে সাড়া দেন।

মাটি থেকে মানুষের সৃষ্টি- এই ভাবধারাটি সূরা আনআম-এর ২নং আয়াতে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। উপরোক্ত আয়াতে 'আরদ' শব্দটি 'জ্বিন' এর পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে যা সূরা আনআম-এর ২নং আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। উভয় শব্দ মানব সৃষ্টিসহ পৃথিবীতে জীবনের আঙ্গিক উৎপত্তি সম্পর্কে দিক নির্দেশ করে।

প্রাচীন যুগের মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের সাথে বাস করত। তারা কখনও কখনও প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট গুহা এবং ঝুলন্ত উঁচু পাহাড়কে অস্থায়ী বাসস্থান হিসেবে ব্যবহার করত। তারা পশু শিকার কিংবা গাছগাছড়া থেকে খাদ্য অন্বেষণের জন্য দলবদ্ধভাবে বিচরণ করত। কিভাবে খাদ্য শস্য উৎপাদন করতে ও জীবজন্তুকে পোষ মানাতে হয় তার কৌশল বর্তমান কালের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ১০,০০০ বছর আগে তারা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়[১]। এই আবিষ্কার তাদেরকে সর্বপ্রথম স্থায়ীভাবে ও বৃহৎ সংখ্যায় একত্রে বসবাসের সুযোগ করে দেয়। প্রথম

www.bjilibrary.com

মৌসুমের ফসল স্বাভাবিকভাবে ভাল মানের হয়। কিন্তু দুই বা তিন মৌসুম পর জমির উর্বরা শক্তি কমে যায় এবং এ সকল গোষ্ঠী যাযাবর জীবনযাপনে বাধ্য হয়। ফলে এক সময়কার ফসল উৎপাদনকারী ভূমি দীর্ঘদিন পতিত পড়ে থাকে এবং যতদিন পর্যন্ত তারা পূর্বের ভূমিতে ফিরে না আসে ততদিন এরূপ অবস্থা বিদ্যমান থাকে। খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে এভাবে বড় আকারে বিভিন্ন গোষ্ঠীর অভিবাসন হলে অনেকে স্থায়ী ভাবে থেকে যায় এবং পরবর্তীকালে পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতির উদ্ভব হয়।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Went, F.W. The plants, Time-life International (Netherland) N. V. Amsterdam, p. 169, 1968.

www.bjilibrary.com

٦٧- وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۝

১১ ঃ ৬৭ অতঃপর যারা সীমালঙ্ঘন করেছিল মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল; ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল।

এই আয়াতে ছামূদ গোত্রের লোকদের শাস্তির বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। এই গোত্রের লোকদের মধ্যে নবী সালিহ্ (আ) ধর্মপ্রচার করেন। কিন্তু কোন একটি নির্দিষ্ট স্ত্রী উটকে হত্যা না করার জন্য সালিহ্ (আ) সকলকে সতর্ক করে দিলে তারা তাঁর নির্দেশ অমান্য করে এবং আল্লাহ্‌র নিকট থেকে তাদের উপর শাস্তি নেমে আসে। অ্যাসিরীয় নৃপতি সারগোন-এর নামে ৭১৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দের একটি খোদাই করা শিলালিপিতে ছামূদ জাতির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এদেরকে আরব দেশের পূর্ব ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলের বলে অভিহিত করা হয়। অ্যাসিরীয় বিবরণী ও টলেমি ও প্লিনি'র মত কালজয়ী গ্রন্থকারদের মতানুসারে ছামূদ গোষ্ঠী উত্তর আরবে বিশেষ করে লোহিত সাগরের নিকটবর্তী হেজায প্রদেশের উত্তরাংশে বসবাস করত। হেজায রেলপথের বরাবরে বর্তমান কালের দুমাত আল-জানদাল নামে এই এলাকাকে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

ছামূদ গোত্র ঘনিষ্টভাবে লিহয়ান গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং তারা এই লিইয়ান গোত্রের পূর্ব পুরুষ ছিল। আনুমানিক ৪০০ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে ছামূদ গোত্রের পতন ও লিহয়ান রাজ্যের অবসান এই সময়ে ঘটে।

পবিত্র কুরআনের ১৩টি সূরার নিচের আয়াতসমূহে ছামূদ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে; (১) ৭ ঃ ৭৩-৭৯; (২) ১১ ঃ ৬১-৬৮; (৩) ২৫ ঃ ৩৮; (৪) ২৬ ঃ ১৪১-১৫৯; (৫) ২৭ ঃ ৪৫-৫৩; (৬) ২৯ ঃ ৩৮; (৭) ৪১ ঃ ১৩-১৭; (৮) ৫১ ঃ ৪৩-৪৫; (৯) ৫৪ ঃ ২৩-৩১; (১০) ৬৯ ঃ ৪-৮; (১১) ৮৫ ঃ ১৭-২০; (১২) ৮৯ ঃ ৯-১৪; (১৩) ৯১ ঃ ১১-১৫।

ছামূদ গোত্রের উপর নেমে আসা শাস্তির ধরণ ছিল– (১) ভূমিকম্প আয়াত ৭ ঃ ৭৮, (২) ঝড়-ঝঞ্ঝা/ মহাধ্বনি আয়াত ১১ ঃ ৬৭, ৫৪ ঃ ৩১ (৩) বজ্রপাত/ বজ্র আয়াত ৪১ ঃ ১৩, ১৭; ৫১ ঃ ৪৪, (৪) বজ্র-বিদ্যুৎ আয়াত ৬৯ ঃ ৫। এই সকল বিপদাপদ একত্রিত করলে এই তথ্য পাওয়া যায় যে সে সময় এক ভয়াবহ ভূমিকম্প/ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয় এবং তার সাথে বজ্রপাত ও বিদ্যুতের বিস্ফোরণ ঘটে।

সূরা আরাফ-এর ৭ ঃ ৯১ আয়াতে ভূমিকম্প সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে।

www.bjilibrary.com

পৃথিবীর কঠিন ভূত্বকের মধ্যে একটি মস্তবড় ছিদ্রপথের চারদিক ঘিরে যে চোঙাকৃতির পর্বত রয়েছে তাকে আগ্নেয়গিরি নামে অভিহিত করা হয়। আগ্নেয়গিরি লাভাসহ নানা প্রকার খন্ড খন্ড পদার্থ দ্বারা গঠিত। অতি উঁচু তাপমাত্রায় এর মধ্যস্থ পদার্থসমূহ গলিত হয়ে তরল আকারে প্রবাহিত হয় অথবা প্রচন্ড বিস্ফোরণমূলক অগ্ন্যুৎপাতের মাধ্যমে ভূঅভ্যন্তরস্থ পদার্থসমূহ বাইরে বেরিয়ে আসে। আবার এই উভয় অবস্থা একই সাথে ঘটতে পারে। আগ্নেয়গিরিকে ৩ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, যথা- (১) বিস্ফোরণমূলক; (২) নির্গমনমূলক; এবং (৩) মধ্যম প্রকার। (১) বিস্ফোরণমূলক আগ্নেয়গিরি থেকে শক্ত পদার্থের খন্ডাংশ ও গ্যাস নির্গত হয়। এসব পদার্থের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার বাধা সৃষ্টিকারী পদার্থ থাকে এবং তা প্রায়ই আংশিক তরল অবস্থায় নির্গত হয়। লাপিল্লি (Lapilli) অথবা ধূলিকণাও এসব পদার্থের মধ্যে থাকে। ধূলিকণাকে প্রায়ই ছাই হিসাবে উল্লেখ করা হয়। (২) নির্গমনমূলক আগ্নেয়গিরির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সামান্য বিস্ফোরণ অথবা কোন বিস্ফোরণ ছাড়াই তরল লাভা নীরবে বহির্গত হয়। (৩) মধ্যম প্রকারের আগ্নেয়গিরি থেকে কখনও কখনও প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয় এবং এর সাথে সাথে লাভার স্রোত নেমে আসে। প্রচন্ড বিস্ফোরণমূলক অগ্ন্যুৎপাতের একটি উদাহরণ হচ্ছে ডাচ পূর্ব ভারতের (ইন্দোনেশিয়া) স্যান্ডা প্রণালীতে অবস্থিত 'ক্রাকাতাও' আগ্নেয়গিরি। ১৮৮৩ সালে এক অগ্ন্যুৎপাতের ফলে এক ঘন মাইল শিলাখন্ড ধূলি আকারে বায়ুমন্ডলের ১৫ মাইল উচ্চতায় উঠেছিল। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের মার্টিনিক দ্বীপের মাউন্ট পিলী আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটে ১৯০২ সালে। মাউন্ট পিলীর অগ্ন্যুৎপাতে কোন লাভার স্রোত ছিল না, কিন্তু প্রচন্ড উত্তাপ বিশিষ্ট বিভিন্ন প্রকার গ্যাস ও ধূলিকণার এক বিরাট মেঘের সৃষ্টি হয় যা সেন্ট পিয়েরি (st. Pierre) শহরকে ধ্বংস করে দেয় এবং শহরের ২০,০০০ জনসংখ্যার প্রায় সবাই মৃত্যুবরণ করে।

এই আয়াতে কেবলমাত্র মহানাদ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। ধারণা হয় যে ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত কিংবা বজ্রবিদ্যুৎপূর্ণ ঝড়ের সময়ে যে প্রচন্ড শব্দের সৃষ্টি হয় তারই প্রসঙ্গ এখানে এসেছে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Ali, A. Y., The Holy Quran, p.360, 1975.
2. Scientific Encyclopaedia, Von Nostrand Company Inc., New York, 1947.

www.bjilibrary.com

٧٢- قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ۝
٧٣- قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۖ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ
إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝

১১ ঃ ৭২-৭৩ সে বলল, ‘কী আশ্চর্য! সন্তানের মা হব আমি, যখন আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামী বৃদ্ধ! এটা অবশ্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার!’ তারা বলল, ‘আল্লাহ্‌র কাজে তুমি বিস্ময় বোধ করছ? হে পরিবারবর্গ! তোমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কল্যাণ। তিনি প্রশংসার্হ ও সম্মানার্হ।’

এই ঘটনার চিকিৎসা শাস্ত্রের দিকটি নিয়ে ৩ ঃ ৪০ নং আয়াতে ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। রজঃনিবৃত্তির পর একজন রজঃনিবৃত্ত স্ত্রীলোকের সন্তানধারণের সম্ভাবনা বর্তমান বিজ্ঞানের ধারণার বাইরে।

٧٨- وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۚ قَالَ يَا قَوْمِ
هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنْكُمْ
رَجُلٌ رَشِيدٌ ۝

১১ ঃ ৭৮ তার সম্প্রদায় তার কাছে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে আসল, এবং পূর্ব থেকে তারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল। সে বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়! এরা আমার মেয়ে, তোমাদের জন্য এরা পবিত্র। সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার অতিথিদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে আমাকে হেয় কোর না। তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নেই?

সমকামিতার পরিণাম সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণা আয়াত ৭ ঃ ৮০,৮১ ও পরিশিষ্ট-৩ এ আলোচনা করা হয়েছে।

٨٢- فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ
مَنْضُودٍ ۝

১১ ঃ ৮২ অতঃপর যখন আমার আদেশ আসল তখন আমি জনপদকে উল্টিয়ে দিলাম এবং ওদের উপর ক্রমাগত প্রস্তর কংকর বর্ষণ করলাম।

এই আয়াতটি নবী লূত (আ)-এর সময়কার ঘটনা প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে। এই ঘটনা আয়াত ৭ ঃ ৮৪ তে আলোচিত হয়েছে। তাপে শুকিয়ে যাওয়া শক্ত মাটির ঢেলা তাদের উপর বর্ষণ করা ছাড়াও এটা বলা হয়ে থাকে যে ঐ সম্প্রদায়ের বসবাস স্থলের ভূমি উল্টিয়ে দেওয়া হয়। এর অর্থ হচ্ছে সেখানে প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়।

٩٤- وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ
الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ○

১১ ঃ ৯৪ যখন আমার নির্দেশ আসল তখন আমি শু'আয়ব ও তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করেছিলাম, অতঃপর যারা সীমালঙ্ঘন করেছিল মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল, ফলে তারা স্ব স্ব ঘরে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল;

এই আয়াতে মাদিয়ান অঞ্চলের অধিবাসীদের শাস্তি প্রদান সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। হযরত শু'আয়ব (আ) মাদিয়ান অঞ্চলে ধর্ম প্রচার করতেন। নবী শু'আয়ব (আ) ও মাদিয়ানের লোকদের নিয়ে যে ঘটনাসমূহ সংঘটিত হয়েছে তা আয়াত ৭ ঃ ৮৫-৯৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়াত ৭ ঃ ৯১ এ ভূমিকম্পের কথা বলা হয়েছে, পক্ষান্তরে এই আয়াতে মহানাদ-এর উল্লেখ রয়েছে। এতে ধারণা করা হয় যে ভূমিকম্পের সময়ে সৃষ্ট উচ্চ শব্দের বিষয়ে এখানে বর্ণিত হয়েছে।

শব্দের প্রতি মানুষের কানের স্বাভাবিক সংবেদনশীলতার পরিসীমা হচ্ছে ২০ হার্টজ থেকে ২০,০০০ হার্টজ পর্যন্ত। অবশ্য মানুষ ভেদে এর বিভিন্নতা রয়েছে। ২০ হার্টজ-এর নিচের শব্দকে নিচু ধ্বনিতরঙ্গ এবং এর পরিসীমা ২০,০০০ হার্টজের উপর হলে তাকে অতি উঁচু ধ্বনিতরঙ্গ বলে।[১]

যদি উঁচু ধ্বনি তরঙ্গের চাপ চারদিকে বিদ্যমান (স্বাভাবিক গড়) চাপের মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তাহলে গহ্বর সৃষ্টিকারী একটি অবস্থার উদ্ভব হয়। যদি এই

গহ্বর একটি উপযুক্ত ব্যাসার্ধের বৃত্ত সৃষ্টি করতে পারে তাহলে চাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃত্তটির সম্প্রসারণ ঘটে। তারপর যদি চাপ কমতে শুরু করে তাহলে এই বৃত্ত অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে এবং দ্রুত এর ক্রিয়াশক্তি লোপ পায়। এই শক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার সময় গহ্বরের মধ্যকার ব্যাস অতি উঁচু মাত্রায় চাপ দিয়ে সংক্ষেপণ করা হয়। এ রকম সংক্ষেপণকৃত চাপের পরিমাপ নিয়ে দেখা গেছে যে তা বায়ুমন্ডলের চাপের চেয়ে কয়েকশত গুণ বেশী। অভিঘাত তরঙ্গের তাপ বিকিরণ দ্বারা এই অতি উচ্চ মাত্রার চাপ ভারমুক্ত হয়। আর, এর রয়েছে ভয়াবহ ধ্বংসকারী ক্ষমতা।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Encyclopaedia Britannica, vol. 17, p. 19.

www.bjilibrary.com

١١٤- وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ
السَّيِّاٰتِ ۚ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ۝

১১ ঃ ১১৪ সালাত কায়েম করবে দিনের দুই প্রান্তভাগে ও রাতের প্রথমাংশে। সৎকর্ম অবশ্যই অসৎ কর্মকে মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে এটা তাদের জন্য এক উপদেশ।

এই আয়াতে উল্লেখিত দিনের দু'প্রান্ত বলতে স্পষ্টভাবে সন্ধ্যা বেলার কথা বলা হয়েছে যখন রাত দিনের মধ্যে প্রবেশ করে, আর যখন দিন রাতের মধ্যে প্রবেশ করে তখন সকালের সূচনা হয়। দিন রাতের এই বিবর্তন ক্রমান্বয়িক দিনের এই দু'প্রান্তের সংঘঠনের কারণ আয়াত ৩ ঃ ২৭ এ সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এই আয়াতে উল্লেখিত রাতের অভিগমনের অর্থ হতে পারে বিলম্বিত অপরাহ্ন ও সূর্যাস্ত পর্যন্ত সন্ধ্যাকাল। কিন্তু আরবী 'জুলাফাম্‌মিনাল্লায়াল' শব্দ সমষ্টিকে পিকথল ও অন্যান্য কিছুসংখ্যক ভাষ্যকার রাতের কিছু বিভাগ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাহলে সূর্যাস্তের পর পরই (মাগরিবের সালাতের সময়) রাতের প্রারম্ভিক অংশকে এটা সূচিত করবে এবং পরবর্তী অংশ হবে মধ্যরাতে পূর্বেকার সময় (ঈশার সালাতের সময়)।

١٢٣- وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ
وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

১১ ঃ ১২৩ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই এবং তাঁরই নিকট সকল কিছু প্রত্যানীত হবে। সুতরাং তার 'ইবাদত কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন।

আল্লাহ্ এই আয়াতে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে সকল গোপন ও অপ্রকাশ্য বিষয় তাঁর এখতিয়ারভুক্ত। এই প্রসংগে এ বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মানুষ স্বভাবতই দৃশ্যমান বস্তুর অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিচার করে কোন বিষয়ের উপর মনঃসংযোগ করে। কিন্তু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পরিসরে এমন বহুসংখ্যক গুপ্ত বিষয় রয়েছে যা আমাদের দৃষ্টি ও জিজ্ঞাসার বাইরে থেকে যায়।

www.bjilibrary.com

মানব সভ্যতার ঘটনাকালে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পরিসরে বহু বিষয় আবিষ্কার করা হয়েছে এবং এখনও বহু বিষয় অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে আমরা নিত্যনতুন বিষয়াদিকে অতিক্রম করে চলেছি। কিন্তু তা আমাদের এই সত্য অনুধাবন করায় যে কোন বিষয়ের 'শেষ কথা' বলে কিছু নেই। উদাহরণস্বরূপ আমরা অণু, পরমাণু, প্রোটন, নিউট্রোন ও ইলেকট্রোনের কথা বলতে পারি এবং অবশেষে কোয়ার্ক (প্রাথমিক কণা বিশেষ) ও লেপটোন (leptons)-এর বিষয়ও আসে যা পদার্থের মৌলিক গঠনমূলক উপাদান হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। আর এসব বিষয় আবিষ্কৃত হয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের নিরন্তর অনুসন্ধিৎসার কারণে। যদি কোন পদার্থের একটি মৌলিক গুণ আবিষ্কৃত হ'ল তো অতিসূক্ষ্ম পরিসরে আরেকটির অভ্যুদয় ঘটল। এভাবে উপ-আণবিক বিষয়াদির গবেষণার ক্রমান্বয় উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দিলে এটা চিন্তা করা ভুল হবে যে এই পৃথিবীর যাবতীয় গোপনীয় বিষয়ের আবরণ ইতোমধ্যে উন্মোচিত হয়েছে বা ভবিষ্যতে উন্মোচিত হয়ে যাবে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রচেষ্টার ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, একটি রহস্যের সমাধান হলে আরেকটি নতুন রহস্য এক কদম পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে। এই একই পর্যবেক্ষণ দূর মহাশূন্যের বিস্ময়কর বস্তুসমূহের বেলায়ও সত্য হতে পারে। এই আয়াতে এমন ইঙ্গিত রয়েছে যে প্রকৃতির জটিল রহস্য উন্মোচনে আমরা যত কঠিন সংগ্রামই করি না কেন তাতে কিছু আসে যায় না, তবুও সর্বদা কিছু অদৃশ্য বিষয় থেকে যাবে যার অবস্থান হবে মানব জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসার বাইরে। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণে আমরা বিরত থাকব। বস্তুত তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে গভীরভাবে জানা ও চিন্তা করার জন্য আমাদের উপর বার বার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। আমাদেরকে নিরন্তর এই চেষ্টা করে যেতে হবে। কিন্তু একই সময়ে আমরা যদি বর্তমান আয়াতটির তাৎপর্য অনুধাবন করি যেমন আল্লাহ্ সকল অদৃশ্য ও অপ্রকাশ্য বস্তু সম্পর্কে জানেন যা মানুষ তার অদম্য অনুসন্ধান প্রবৃত্তি সত্ত্বেও এই প্রচেষ্টার সমাপ্তি ঘটবে না, তা হলে আল্লাহ্‌র প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে যাবে এবং আমরা কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় ইবাদতে নিবেদিত হতে পারব।

৪৭- قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِىْ سُنْۢبُلِهٖۤ
اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ ○

১২ ঃ ৪৭ ইউসুফ বলল, 'তোমরা সাত বছর একাদিক্রমে চাষ করবে, তারপর তোমরা যে শস্য সংগ্রহ করবে তার মধ্যে যে সামান্য

www.bjilibrary.com

পরিমাণ তোমরা আহার করবে, তাছাড়া সমস্ত শীষসহ শস্য রেখে দেবে;'

এই আয়াতে এটাই নির্দেশ করা হয়েছে যে শস্যের দানা যদি শিষ-এর সাথে লাগান অবস্থায় থাকে তাহলে শিষ ছাড়া শস্যের দানা স্তুপ করে রাখার চেয়ে তা অধিকতর ভাল অবস্থায় থাকে। বর্তমানে সকল বিশেষজ্ঞ একমত পোষণ করেন যে Triticum dicoccum (এক প্রকার আবাদকৃত গম) প্রাচীন মিসরে চাষাবাদ হ'ত এবং দুর্ভিক্ষের সময় ইউসুফ (আ)-এর দশ ভাই মিসর থেকে শস্য কেনার জন্য গিয়েছিলেন। গমের দানা শিষ থেকে আলাদা করার পর সংরক্ষণের পূর্ব পর্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় অতিক্রম করে। কারণ, এই সময়ে শস্যদানা ব্যাপকহারে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ ও পরজীবী ছত্রাকের সংক্রমণের সম্মুখীন হয়। শস্যের ক্ষতিকারক গুবরে পোকা ও শুড়ওয়ালা কীটপতঙ্গ গুদামজাত করা শস্যের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি সাধন করে। পক্ষান্তরে Alternaria ও Fusarium প্রজাতির ছত্রাক গুদামজাতকৃত খাদ্যশস্য আক্রমণ করে তার প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। গুদামে রক্ষিত খাদ্যশস্যে কীটপতঙ্গ জন্মায়, আর ছত্রাক জন্মায় খাদ্যশস্যের উপর। তবে উভয় ক্ষেত্রে তাদের বাঁচা ও বৃদ্ধি নির্ভর করে খাদ্যশস্যে কতটুকু আর্দ্রতা রয়েছে তার উপর। অক্ষত ও উত্তম অবস্থায় রয়েছে এমন শস্যের উপর সাধারণত কীটপতঙ্গের আক্রমণ হয় না, কিন্তু ভিজা, সেঁতসেঁতে শস্যে খুব দ্রুত এদের জন্ম ও বংশবৃদ্ধি হয়। আর এরূপ শস্য ভাঙ্গা শাঁষে পূর্ণ থাকে।

ক্ষেত খেকে কেটে নেওয়া শস্য যদি শীষযুক্ত থাকে এবং ঝুলিয়ে রাখা যায় তাহলে শস্যের গুণাগুণ অক্ষুণ্ন থাকে এবং এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, মাড়াই করার পর গুদামজাতকৃত শস্যের চেয়ে এরূপ শস্যের সুবিধা বেশী। প্রথমত পরিপক্ক শস্য গমের ক্ষেত্রে অবশ্য এক বীজ বিশিষ্ট, ক্ষতিকর পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে শস্যের চারদিকের দেওয়াল ও বীজের অন্তর্গত আবরণী দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। পাকা শস্যের এই দেওয়াল ও আবরণী একত্রিত হয়ে বীজের ভ্রূণ ও অন্তর্গত সংরক্ষিত খাদ্যশক্তিকে আবদ্ধ করে রাখে। শস্যের এই বহিরাবরণ শস্য মাড়াইকালে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকে। শস্য ক্ষতিগ্রস্ত হলে ভিতরের শস্যদানা অনাবৃত হয়ে পড়ে যার ফলে এরূপ শস্যে অতি সহজে পোকার সংক্রমণ ঘটে। আবার ফসল মাড়াইয়ের সময় শস্যদানা ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও শীষ থেকে শস্য ছাড়িয়ে নেওয়ার সময় শস্যের চারদিকের প্রতিরক্ষা দেয়ালে ফাটলের সৃষ্টি হতে পারে এবং সেখান দিয়েই শস্য দানার উপর কীটপতঙ্গের আক্রমণ ও ছত্রাকের সংক্রমণ ঘটতে পারে। দ্বিতীয়ত শস্য যখন শিষে লাগান থাকে তখন সাধারণভাবে গমের আঁটি উর্ধ্বমুখী করে রাখা হয়।

www.bjilibrary.com

এই পদ্ধতিতে গমের শীষে বাতাস চলাচল করতে পারে এবং ক্রমশ মাটির উপরস্থ আর্দ্রতা শুকিয়ে যায়। এভাবে পোকা মাকড়ের আক্রমণ উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি হয় না। শীষে এভাবে শস্য রেখে দিলে তা অনেক বছর ধরে সংরক্ষণ করা যায়। শস্য সংরক্ষণের বিষয়ে মিসরবাসীদের পরামর্শ প্রদান নবী ইউসূফ (আ)-এর এই বিষয়ে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বাদশাহর স্বপ্নের তাবীর ব্যাখ্যা এবং সাত বৎসর ব্যাপী দুর্ভিক্ষ হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে বর্ণনা দেন।

وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰٓاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ

১২ ঃ ৮৪ যে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, 'আফসোস ইউসূফের জন্য।' শোকে তার চক্ষু দু'টি সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট ছিল।

মিশর থেকে ফিরে আসার পর ইউসূফ (আ)-এর সৎ ভাইয়েরা দ্বিতীয়বার যখন তাদের পিতাকে অবহিত করল যে তার কনিষ্ঠ পুত্র ও ইউসূফের ছোট ভাই বিন ইয়ামিন কথিত চুরির দায়ে মিশরে আটক আছে তখন ইয়াকূব (আ) এই সংবাদ অবগত হয়ে দারুণভাবে ব্যথিত হলেন এবং 'পুত্র ইউসূফকে হারানর শোক নতুন করে জেগে উঠল। তিনি তাদের নিকট থেকে চলে গেলেন এবং যেহেতু এই বৃদ্ধ বয়সে তার কিছুই করার ছিল না বলে তাকে এই দুঃসহ মানসিক যাতনা ও দুঃখ ভোগ করতে হ'ল। উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী দীর্ঘকালব্যাপী তার এই দুঃসহ দুঃখ নিজের মনে গোপন করে রাখার ফলে ইয়াকূব (আ)-এর চোখ সাদা হয়ে গিয়েছিল, চিকিৎসা বিজ্ঞানে এটা এখন স্বীকৃত যে প্রচন্ড মানসিক আবেগ ও উদ্বেগ সাময়িকভাবে শারীরবৃত্তীয় বৈকল্যের সৃষ্টি করতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় একে মানসিক বিকারজাত শারীরিক ব্যধি বিষয়ক বিশৃংখলা (psychosomatic disturbances) বলে। বলা হয়ে থাকে যে দুঃখ যদি অশ্রুর মাধ্যমে বের হওয়ার কোন পথ খুঁজে না পায় তাহলে তা শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাঁদার কারণ হতে পারে। এছাড়া, 'যখন বিশেষভাবে নির্দিষ্ট গোপনীয়, অন্তঃস্থ মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার ও কঠিন চাপমূলক অবস্থার নিরসনের জন্য কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় তখন মানসিক-স্নায়বিকভাবে পীড়িত ব্যক্তিত্বে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। আর তখন রোগী উত্তেজনা অথবা উদ্বেগের কারণে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার মনস্তাত্ত্বিক কৌশলের সাহায্য ব্যতিরেকে স্বীয় শক্তি জাগিয়ে তুলতে পারে না। অনেক মনস্তত্ত্ববিদ অতঃপর

www.bjilibrary.com

মানসিক উদ্বেগকে স্নায়বিক পীড়ার একটি সর্বজনীন শক্তিশালী উৎস হিসেবে বিবেচনা করেন।' মানসিক-স্নায়বিক পীড়া বিষয়ক পরিভাষাটিকে এরূপ বিষয়ের সাথে যুক্ত করা হয়। অন্যান্য শারীরিক বিশৃংখলার (যেমন angina pectoris, hypertension, migraine, peptic ulcer, ulcerative colitis, diabetes mellitus, asthma, anorexia, impotence, frigidity ইত্যাদি) ন্যায় মানসিক স্নায়বিক পীড়াজনিত বৈকল্যের সংবেদী লক্ষণসমূহ সাধারণত শরীরের ক্রিয়ামূলক অসামর্থ্যতা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। যেগুলো বেশ ঘন ঘন ঘটতে দেখা যায় তার মধ্যে anaesthesias, paresthesias এবং বিশেষ সংবেদী অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৈকল্য অন্যতম, যেমন অন্ধত্ব বা বধিরতা।[১] তাই এটা সম্ভব যে গভীর শোক অবদমন করার ফলে মানসিক-স্নায়বিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়ে তা নবী ইয়াকূব (আ)-এর দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি করে।

অন্ধত্বের পরিবর্তে 'শ্বেতবর্ণ' শব্দের ব্যবহারও কৌতুহল উদ্দীপক। চক্ষুর শ্বেত বর্ণ ধারণ সাধারণত চক্ষুর কেরাটাইটিস (keratitis) রোগের বেলায় ব্যবহৃত হয়। চক্ষুর কর্ণিয়াতে আলসার হলে কিংবা ছানি পড়লে এই রোগ হতে দেখা যায়। এরূপ অবস্থা হচ্ছে শরীরের সাময়িক ত্রুটি যা চিকিৎসা সাপেক্ষ। কিন্তু এসব রোগের কোনটাই মনের অবদমিত দুঃখের সাথে সম্পর্কিত নয়। অবদমিত শোক অনেক সময় সাময়িক অন্ধত্বের সৃষ্টি করতে পারে যা উপরে আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু শ্বেতবর্ণধারণকারী চক্ষু হচ্ছে পরিষ্কার চক্ষুর বিপরীত, তাই সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা সাময়িক অন্ধত্বকে বুঝানর জন্য এই শব্দ ব্যবহার করেছেন।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Kolb, L. C. Noyis, Modern Clinical Psychiatry, 7th edn. oxford & IBH Pub. Co. India, PP 413-458. 1970.

www.bjilibrary.com

٩٦ فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ
اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

১২ ঃ ৯৬ অতঃপর যখন সুসংবাদ বাহক উপস্থিত হ'ল এবং তার মুখমন্ডলের উপর জামাটি রাখল তখন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। সে বলল, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে জানি যা তোমরা জান না?

পূর্ববর্তী ১২ ঃ ৮৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে দীর্ঘস্থায়ী ও অতি প্রচন্ড অবদমিত শোকের কারণে নবী ইয়াকূব (আ)-এর চোখ সাদা হয়ে গিয়েছিল। ১২ ঃ ৮৪ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত চোখের সাদা হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে সাময়িক অন্ধত্ব যার সমর্থন ১২ ঃ ৯৬ নম্বর আয়াতে পাওয়া যায়। যখন ইউসূফ (আ)-এর সুসংবাদ এবং তৎকর্তৃক প্রেরিত জামাটি নবী ইয়াকূব (আ)-এর কাছে প্রেরণ করা হ'ল তখন তার দীর্ঘদিনের স্থায়ী শোক দূরীভূত হয়ে গেল। তাঁর দীর্ঘদিনের হারিয়ে যাওয়া পুত্রের হঠাৎ সন্ধান পাওয়ার সুসংবাদ তাঁকে পরম আনন্দ দান করে এবং সাময়িক অন্ধত্বের কারণ মনস্তাত্ত্বিক স্নায়বিক বৈকল্য দূরীভূত হয়ে যাওয়ায় তিনি তাঁর পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান।

١٠٥ وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ○

১২ ঃ ১০৫ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে; তারা এ সমস্ত প্রত্যক্ষ করে কিন্তু তারা এ সকলের প্রতি উদাসীন।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট নিদর্শনাদি প্রত্যক্ষ করে এবং যে নিদর্শনসমূহ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে তা নিয়ে চিন্তা করে তাহলে তারা আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসবে। অবশ্য অনেকে এ সকল নিদর্শন দেখার পরও উদাসীন থাকে। তারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের (আয়াত) মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না বলে তাদের মধ্যে উদাসীনতার সৃষ্টি হয়। এটা একটি চমকপ্রদ বিষয় এই যে আল্লাহ্‌র নিদর্শনাদির (আয়াত) যথাযথ মর্ম বুঝতে হলে বিজ্ঞানের উপর গভীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আরও কৌতুহল উদ্দীপক ঘটনা হ'ল এই যে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ তা'আলার অধিকাংশ নিদর্শনসমূহ ১৮টি সূরা ও ৪২টি আয়াতে দেখতে পাওয়া যায়। এ সকল আয়াতের সবই

www.bjilibrary.com

বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।[১] উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, জীবনহীন জড় পদার্থ থেকে জীবনের সৃষ্টি একটি নিদর্শন, তেমনি জীবন্ত প্রাণীর সঙ্গীর সৃষ্টি, সৃষ্টির আদি কারণ, মানুষের বর্ণ ও ভাষার বিভিন্নতা, মানুষের মনে ভালবাসা ও দয়ার সৃষ্টি, সবুজ লতা-পাতা গুল্মের জন্ম ও তাদের পাতার সালোক সংশ্লেষ (photosynthesis) প্রভৃতি অসংখ্য নিদর্শন মানুষের মনে প্রতিফলিত হতে পারে। আর মানুষ যখন জীবন্ত বা জীবনহীন বস্তুর গঠন প্রণালী সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার মহাপরিকল্পনা জানার ও বুঝার চেষ্টা করে তখন আল্লাহ্ সৃষ্ট নিদর্শনাদি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারে। এরূপ বলা সংগত নয় যে বর্তমান বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যুগে আমরা আল্লাহ্র নিদর্শনাদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছি। তবে এটা অবশ্যই সত্য যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমান্বয় অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের পক্ষে কিছুসংখ্যক নিদর্শন উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয়েছে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা বাকারায় (আয়াত ২ ঃ২৬৯) ইরশাদ করেছেন কেবলমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তি অর্থাৎ যাদের ইলম আছে (ইলমের অর্থ হচ্ছে পরিপূর্ণ জ্ঞান) তাঁর নিদর্শন সম্পর্কে জানতে, বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারবেন। তাই জ্ঞানার্জন সুস্পষ্টভাবে মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনসমূহ বুঝতে সাহায্য করে। উদাহরণ স্বরূপ গ্রহ সংক্রান্ত গতি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। গতি নিয়ন্ত্রণকারী বিপরীত বর্গীয় সূত্র মাত্র তিন শতাব্দীরও কিছু বেশী সময় পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং কেবল গত শতাব্দীতেই মানুষ জানতে পেরেছে যে বিভিন্ন শক্তির একই ধরনের বিপরীত বর্গীয় সূত্র (Inverse Square Law) পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ নিউক্লিয়াসের চারদিকে থাকা ইলেট্রনের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। একটি চমৎকার নিয়মের অধীনে এভাবে অতি বৃহৎ ও অতি ক্ষুদ্র পর্যায়ের বস্তুর যে বিন্যাস সাধিত হয় তা বাস্তবিকই আল্লাহ্র একটি নিদর্শন। বিজ্ঞানের চর্চা ব্যতিরেকে আল্লাহ্ তা'আলার এ সকল নিদর্শনের মর্ম উপলব্ধি করা যায় না। এরপর আরেকটি উদাহরণ যেমন কীভাবে বৃষ্টির সৃষ্টি হয় তা পর্যালোচনা করা যেতে পারে। এটা সকলের জানা আছে যে, জীবন ধারণের জন্য পানির প্রয়োজন সর্বাধিক। কিন্তু সেই পানি পৃথিবীর সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে দেয়া হয়নি। তাহলে যার হাতের কাছে পানি পাওয়ার সুযোগ নেই সে কীভাবে কৃষি ও অন্যান্য কাজে পানি ব্যবহার করতে পারবে? বিভিন্ন পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন থেকে অবশ্য একটি উত্তর পাওয়া যায়। আমরা জানি যে পানির তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা রয়েছে যথা কঠিন (বরফ), তরল (পানি) ও গ্যাসীয় (বাষ্প)। পদার্থের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন solid state physics-এর একটি চমকপ্রদ

www.bjilibrary.com

বিষয় এবং পানির ক্ষেত্রে যদি এরূপ পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন সাধিত না হ'ত তাহলে পানির লক্ষ কোটি কণার (যার ওজন লক্ষ লক্ষ কিলোগ্রাম) পক্ষে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে উপেক্ষা করে বাষ্পীভূত হয়ে যাওয়া এবং অবশেষে দূরবর্তী কোন অঞ্চলে মেঘ ও বৃষ্টিরূপে পতিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। সত্যিই এভাবে বৃষ্টির বর্ষণ ঐ ব্যক্তির নিকট আল্লাহ্র নিদর্শন হিসেবে গ্রহণীয় যে পানি বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু জানে। এরূপ নিদর্শন দ্বারা প্রকৃতি ভরপুর। তবুও মানুষ এসব নিদর্শন সম্পর্কে উদাসীন এবং আল্লাহ্র মোজেজার অন্বেষণে ব্যস্ত থাকে। আজকাল জীব-বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রেই জানে যে একটি কোষের সৃষ্টি হচ্ছে জীবনের একটি মাত্রা যা নিজেই একটি অলৌকিক ঘটনা বা মোজেজা এবং আল্লাহ্ তা'আলার একটি স্পষ্ট নিদর্শন। এভাবে বিস্ময়ে ভরা এই মহাবিশ্ব আল্লাহ্র সৃষ্টিতে বিদ্যমান নিদর্শনাদি সম্পর্কে জানার জন্য মানব সমাজকে আহবান জানায়। এ সকল নিদর্শনের প্রতি সাধারণ পর্যবেক্ষণ যথেষ্ট নয়, আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা হলে আল্লাহ্র সৃষ্টির বিস্ময়কর বিষয় মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এ সকল বিষয় পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে এবং মানুষ প্রতিনিয়ত এ সবেরই সাক্ষাৎ লাভ করে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Ali, Akbar M. Science in the Quran, Malik Library, Dhaka P. 57, 1976.

www.bjilibrary.com

١٠٩. وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰٓ ۗ
أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ
وَلَدَارُ ٱلْءَاخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

১২ ঃ ১০৯ তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের মধ্য থেকে পুরুষদেরকেই প্রেরণ করেছিলাম, যাদের নিকট ওহী পাঠাতাম। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং তাদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছিল তা কি দেখেনি? যারা মুত্তাকী তাদের জন্য পরলোকই শ্রেয়; তোমরা বোঝ না ?

এই আয়াতে অবিশ্বাসীদেরকে পৃথিবীতে ভ্রমণ করে ঐ সকল লোকের করুণ পরিণতি দেখার জন্য আহবান জানান হয়েছে যারা তাদের নিকট প্রেরিত নবীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেনি। আয়াত ৩ ঃ ১৩৭ এ এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

٢. ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ وَسَخَّرَ
ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ
لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ○

১৩ ঃ ২ আল্লাহ্ই ঊর্ধ্ব দেশে আকাশমন্ডলী স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ছাড়াই তোমরা তা দেখছ। তারপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করলেন; প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।

'তিনিই আল্লাহ্ যিনি কোন স্তম্ভ ব্যতিরেকে আকাশমন্ডলীকে উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন'– আয়াতের প্রারম্ভের এই গূঢ় বিষয়টি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব বহন করে। একটি স্তম্ভের কাজ হচ্ছে ভূমিতলের উপর কোন ভারী বোঝা উপরে তুলে ধরা। আমাদের নিকট আকাশ যেমন ভাসমান বলে

www.bjilibrary.com

প্রতীয়মান হয় তেমনি পৃথিবীর চারদিকে পরিব্যপ্ত বায়ুমন্ডলের বাইরে নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, জ্যোতিষ্কমন্ডলী মহাশূন্যের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই আয়াত সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা দেয় যে মহাবিশ্বে ভাসমান নক্ষত্রপুঞ্জ, গ্রহ, উপগ্রহ সমূহের একটা ভার রয়েছে যা ১১শ' শতাব্দীতে আল-বিরূনী প্রকাশ করে গিয়েছেন এবং পরবর্তীকালে কুরআন নাযিল হওয়ার প্রায় ১২০০ বছর পর নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র আবিষ্কারের ফলে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন যেমন আমরা জানি যে মহাকাশে বিরাজমান গ্রহ, উপগ্রহ বা কোন জড় বস্তু একটি শক্তি দ্বারা পরস্পরকে আকর্ষণ করছে। এই শক্তি ঐ সকল বস্তুর ভর-এর সমানুপাত বিশিষ্ট এবং বস্তুসমূহের পারস্পরিক দূরত্বের বর্গায়তনের প্রতি উল্টোভাবে সমানুপাতিক। মহাকাশে বিরাজমান এ সকল গ্রহ, উপগ্রহ, জ্যোতিষ্ক মন্ডলী ভেঙ্গে পড়ে না কিংবা পরস্পরের মধ্যে কোন সংঘর্ষের সৃষ্টি করে না। কারণ, নিরন্তর কক্ষপথ পরিক্রমা থেকে উদ্ভূত একটি ভারসাম্য পূর্ণ কেন্দ্রাতিগ শক্তি এরূপ কোন বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে। স্পষ্টতই কেন্দ্রাতিগ শক্তিদ্বারা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ভারসাম্যকরণ এই আয়াতে উল্লেখিত অদৃশ্য স্তম্ভের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে। সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্ তা'আলার বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তা ৭ ঃ ৫৪ সংখ্যক আয়াতে পর্যালোচিত হয়েছে।

একটি বিষয়ে সকলের ধারণা থাকা উচিত যে কুরআন কোন বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন যখন অবতীর্ণ হয় তখন মানব সভ্যতার তেমন অগ্রগতি সাধিত হয়নি যে এই আয়াতে বিশ্লেষিত মাধ্যাকর্ষণ ও কেন্দ্রাতিগ শক্তির সূত্র বা তত্ত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য জানতে পারবে। প্রায় ১২০০ বছর পর আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণ সূত্র ও কেন্দ্রাতিগ শক্তির তত্ত্ব এই আয়াতে বর্ণিত অদৃশ্য স্তম্ভের অবস্থিতিকে সত্য বলে স্বীকার করে। বাস্তবিকই সৃষ্টির এ সকল নিদর্শন বুঝতে পারলে তা মু'মিন বান্দাদের মনে পরম আনন্দ সৃষ্টি করে।

٣- وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ۖ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ○

১৩ ঃ ৩ তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক প্রকার ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায়

www.bjilibrary.com

জোড়ায়। তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

পৃথিবীর বিস্তার

বিগত ২৫ বছরে পৃথিবী সংক্রান্ত বিজ্ঞানে এক বিপ্লব সাধিত হয়েছে। এর ফলে এই গ্রহ সম্পর্কে নতুন ধারণার জন্ম দিয়েছে। মহাদেশ গঠনে যে শক্তি কাজ করছে সে সম্পর্কে জানার পরিধি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবার পিছনে এই বিজ্ঞানের অবদান রয়েছে। পৃথিবী নামক আমাদের এই গ্রহের উপরিভাগ শীতল, খুবই দৃঢ়, ১০০ কিলোমিটার গভীরতা বিশিষ্ট কিছুসংখ্যক lithospheric plate দ্বারা বিভক্ত। এই সকল plate aestheospheric নামে অভিহিত এবং তুলনামূলকভাবে নমনীয় ও আংশিকভাবে দ্রবীভূত এলাকায় ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। এই plate সমূহ চলমান এবং গতি এত ধীর যে বছরে ৫ থেকে ১০ সেন্টিমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। পর্বতময় এই plate সমূহ তাপ সঞ্চালন গতি দ্বারা তাড়িত হয়ে এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও পৃথিবীর স্বীয় কক্ষপথে ঘূর্ণনের ফলে স্থান পরিবর্তন করে। ভূতত্ত্ববিদদের মতে সমুদ্রের তলদেশে বিস্তৃত শৈলশ্রেণীর দৈর্ঘ্য বরাবরে নতুন নতুন পর্বতের উত্থান ঘটছে এবং তারা পৃথিবীর বহিরাবরণ গঠন করত পাশে বিস্তৃত হয়ে চলেছে। আর ভূত্বক হিসেবে পরিচিত এই বহিরাবরণ মহাদেশীয় প্লেইটের (continental plates) দিকে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে। 'সমুদ্রতল সম্প্রসারণ' (seafloor spreading) নামে অভিহিত এই অনন্যসাধারণ ঘটনাটি lithospheric plate সমুহের প্রবাহ তাড়নার সৃষ্টি করে এবং শেষ পর্যন্ত নানাভাবে পৃথিবীর সম্প্রসারণ ঘটায়। এরূপ সম্প্রসারণের আর একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের সমতলতা যা আয়াত ২ ঃ ২২ এ আলোচিত হয়েছে।

প্লেইটের গঠন সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যের এই ক্রম অগ্রসরতা দ্বারা Pangea নামক প্রাচীন এক অতি বৃহৎ মহাদেশ দু'টি মহা মহাদেশ যথা Laurasia ও Gondwana-এর মধ্যে পরিব্যপ্ত হয়ে পড়ে এবং পরিশেষে তা পৃথিবীর বর্তমান ৫টি মহাদেশের আকার ধারণ করে।

www.bjilibrary.com

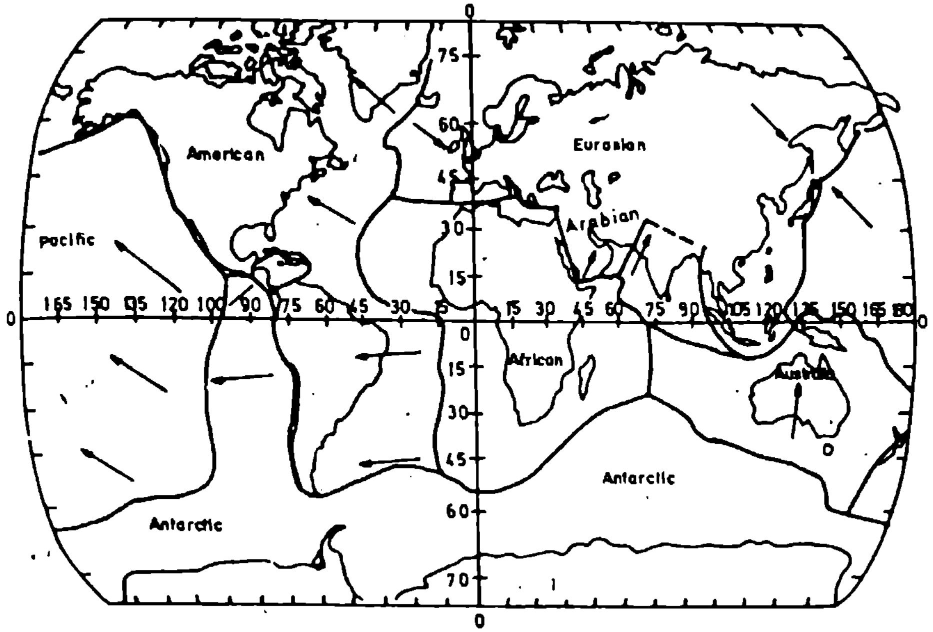

চিত্র–৫ ঃ মহাদেশীয় প্লেইট-এর গঠন সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য ঃ মহাদেশীয় টুকরো বিশিষ্ট ধাঁধা।

পৃথিবীর কঠিন ভূত্বক দ্বারা গঠিত একাধিক প্লেইটের মধ্যে যখন সংঘর্ষ হয় তখন অধিকাংশ পার্থিব ও ভূতাত্ত্বিক বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। নতুন পর্বতশ্রেণীর গঠন তৎসহ ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি প্লেইটসমূহের মধ্যে মৃদু সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি হয়। দু'টি মহাদেশীয় প্লেইটের সংঘর্ষে ভূমিকম্প হয়। সংঘর্ষের মাত্রা মারাত্মক পর্যায়ের হ'লে মহাদেশগুলো কুঞ্চিত হয় এবং প্রচুর ভাঁজ বিশিষ্ট পর্বতের উত্থান ঘটে।

পর্বতমালা

প্রধানত পরস্পর সংযুক্ত হয়ে অথবা নির্দিষ্ট ক্রমবিন্যাসের আকারে পৃথিবীতে পর্বতমালার সৃষ্টি হয়েছে। এ সকল পর্বতশ্রেণী মহাদেশসমূহের প্রান্তে সীমানা তৈরী করেছে এবং দ্বীপমালার আকারে সাগরে ও মহাসাগরে গিয়ে শেষ হয়েছে। পর্বত শ্রেণীর এরূপ বিন্যাসে ধারণা করা যায় যে, এর অংশ বিশেষ মহাসাগরে ডুবন্ত অবস্থায় রয়েছে। এভাবে একটি পর্বত শ্রেণী ভূমধ্যসাগরের উপকূল ধরে এশিয়া মাইনর, ভারত, বার্মা (মিয়ানমার) বরাবর বিস্তৃত হয়েছে এবং এর অংশ বিশেষ সমুদ্রে তলিয়ে রয়েছে। তারপর পূর্বদিকে ইস্ট ইন্ডিজ বা পূর্ব ভারতীয়

www.bjilibrary.com

দ্বীপপুঞ্জ সৃষ্টি করে উত্তর দিকে চলে গিয়েছে এবং এর ফলে এ্যালিউশিয়ান (Aleucian) দ্বীপমালার উদ্ভব হয়েছে। এরপর দক্ষিণদিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ সৃষ্টি করত নিউজিল্যান্ড অবধি গিয়েছে। এ্যানটার্কটিকার অপরদিকে সম্প্রতি একটি পর্বতশ্রেণী আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তা নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বতশ্রেণীর সাথে যুক্ত হয়েছে। এ্যান্টার্কটিকা হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশ দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ (Andes) পর্বতমালার সাথে সংযোগ ঘটেছে। তারপর সেখান থেকে সমুদ্র উপকূল বরাবর উত্তর আমেরিকার সাথে যুক্ত হয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতা এভাবে একটি সম্পূর্ণ বৃত্তাকারে পরিবেষ্টিত পর্বতশ্রেণী দ্বারা সীমানা তৈরি করা হয়েছে। আবার পাইরেনীজ (Pyrenees) হতে পামির মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ইউরেশীয় পর্বতশ্রেণী ভূমধ্যসাগর, কৃষ্ণসাগর ও পারস্য উপসাগরের তীর ধরে অগ্রসর হয়েছে। পর্বতশ্রেণীর এরূপ একটি ব্যবস্থাপনা পৃথিবীর বিদ্যমান সকল পর্বতের ক্ষেত্রে বিস্তারিতভাবে দেখা যেতে পারে। এভাবে সমগ্র পৃথিবী পর্বতমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছে, আর পর্বতসমূহ এর উপর শক্তভাবে দাড়িয়ে আছে। মহাদেশীয় প্লেইটের সীমানাতে পর্বতের সৃষ্টি। উপরে উল্লেখিত প্রথম পর্বত শ্রেণী ইউরেশীয় প্লেইট, আরবদেশীয় প্লেইট, অস্ট্রেলীয়-ভারতীয় প্লেইট ও এ্যান্টার্কটিকা প্লেইটের সীমানায় সৃষ্টি হয়েছে। আরেকটি শ্রেণী প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেইট, উত্তর আমেরিকার প্লেইট ও দক্ষিণ আমেরিকার প্লেইটের সীমান্তে উদ্ভূত হয়েছে। অন্যান্য পর্বতশ্রেণী সমূহকেও ভিন্ন ভিন্ন প্লেইটের সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে। (আয়াত নং ৭ ঃ ৯১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

পর্বতসমূহ শক্তভাবে দাড়িয়ে আছে, কারণ, তারা খুবই শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর শক্ত বহিরাবরণ অথবা কঠিন ভূত্বকের গভীরতা সমুদ্রতল থেকে প্রায় ৫ কিঃ মিঃ এবং মহাদেশীয় সমতল ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩৫ কিঃ মিঃ নিচে বিস্তৃত রয়েছে। আর হিমালয়ের মত বিশাল পর্বতমালার ক্ষেত্রে এই গভীরতার পরিমাণ প্রায় ৮০ কিঃ মিঃ। এভাবে পর্বতশ্রেণীসমূহ অতি শক্ত ভিত্তির উপর স্থাপিত।

নদ-নদী

পৃথিবীর প্রাচীন ভূকাঠামোগত দৃশ্যাবলীর মধ্যে নদ-নদী ও জলপ্রবাহ অন্যতম। একটি নদীর উদ্ভব সাধারণ ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত। ভূতাত্ত্বিক গঠন প্রক্রিয়া অর্থাৎ পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থিত গতিশীল শক্তি প্রবহমান পানির ভারসাম্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং তা জলবায়ুতে পরিবর্তন

www.bjilibrary.com

ঘটায়। ঝড়-ঝঞ্ঝা, প্লাবন প্রভৃতি ভূতাত্ত্বিক ঘটনাবলী একটি নদীর জীবন বৃত্তান্তে এক চরম সংকটময় বাঁক হিসেবে বিশিষ্টতা লাভ করে।

সর্বপ্রথম তরল অবস্থায় পানির সৃষ্টি লক্ষ কোটি বছর আগে হয়েছিল, আর এটা সম্ভব হয়েছিল বিশ্বের আদিযুগ (archaeozoic era—জীবনের অস্তিত্বমানতার অতি প্রাচীন যুগ) থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিস্তার পর্যন্ত যখন অতিমাত্রায় উজ্জ্বল ও উত্তপ্ত এই পৃথিবী শীতল হতে হতে তাপমাত্রা হিমাংকের নিচে নেমে গিয়েছিল। বায়ুমন্ডলের গ্যাস ঘনীভূত হয়ে বাষ্প তৈরী করে এবং বাষ্প থেকে পানির উৎপত্তি ঘটে। আর এই পানি বৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে বর্ষিত হয়। পানি সৃষ্টির এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে যতটুকু কল্পনা করা সম্ভবপর হয় তা হচ্ছে জনমানব শূন্য বিশালাকৃতির পর্বতমালার উপর দীর্ঘকাল ব্যাপী প্রচন্ড গতির বৃষ্টি বর্ষণের একটি চিত্র আঁকা যায় যা সে সময় ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর উপরিভাগের গঠন সম্পন্ন করে। বৃষ্টির পানি বিভিন্ন খাত দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যখন শীতল হয় তখন গর্তের ও খাঁজের সৃষ্টি করে। এভাবে প্রথমে নদী ও সমুদ্রের উদ্ভব হয় এবং একই সাথে পানির অবিরাম প্রবাহেরও সূচনা হয় যার মধ্যে নদী হচ্ছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সমস্ত মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত জল প্রবাহ ও নদীগুলোকে সরু ফিতার ন্যায় জড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। জালের ন্যায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এ সকল জলপ্রবাহ প্রকৃতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। ভূ-উপরিভাগের পানি নিষ্কাশনের পথ হিসেবে তারা পৃথিবীর জলচক্রের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গের কাজ করে। পানির চতুর্দিকে আবর্তনকারী এই প্রবাহ একবার সমুদ্রের, হ্রদের ও প্রবহমান ভূ-উপরিতলের পানির ক্রমাগত বাষ্পীভবন এবং আর একবার বৃষ্টির ও জলস্রোতের মাধ্যমে গঠিত হয়। ভূ-উপরিভাগ দিয়ে পানি নদী ও জলস্রোতের আকারে বয়ে চলে। বরফ, পানি ও বাষ্পের পর্যায়ক্রমিক বিবর্তন, একটি অতি কৌতুহল সৃষ্টিকারী পদ্ধতিতে পর্বতাদি ও নদীসমূহকে পরস্পর সংযুক্ত করে। পর্বতসমূহের মাথায় বরফের মুকুটের ন্যায় গঠিত বরফ গলে গিয়ে নদীর ও জালের ন্যায় বিস্তৃত শাখা প্রশাখার সাথে মিশে যায় এবং শেষ গন্তব্য হিসেবে নদীতে গিয়ে মিশে। পৃথিবীর উপরিভাগে অবস্থিত সকল জলাশয়ের বাষ্পীভবন পানির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এড়িয়ে যেতে সাহায্য করে এবং মেঘের আকারে দেশ থেকে দেশান্তরে নিয়ে যায়। যে জলাশয় থেকে বাষ্পের সৃষ্টি হয়েছিল সেখান থেকে বহুদূরে গিয়ে বৃষ্টির আকারে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় এবং তারা ঘনীভূত হয়ে পর্বতের শীর্ষে অবস্থিত বরফের পুনঃ পূর্ণতা সাধন করে। এভাবে বরফ, পানি ও বাষ্পের এবং পুনঃ পানি ও বরফের এই পর্যায়ক্রমিক

www.bjilibrary.com

বিবর্তন পর্বত ও নদীর মধ্যে একটি জলচক্রের ধারার সৃষ্টি করে যা এই আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। যদি কেউ কঠোর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে একটি নদীর গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে তাহলে দেখা যাবে যে এর অস্তিত্ব তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, যেমন ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে অবস্থিত পানির প্রাপ্যতা, ভূপৃষ্ঠে পানি নিষ্কাশনের পথ এবং ভূপৃষ্টের ক্রম নতিমাত্রা।

যখন থেকে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের পানি চারদিকে ছড়িয়ে আবর্তন করতে শুরু করেছে তখন থেকেই জলপ্রবাহ ক্রমাগত মহাদেশসমূহের ক্ষয়সাধন করে চলেছে। অধিকন্তু, অতি প্রাচীনকাল থেকে নদীসমূহ বারবার উঁচু; নিচু ও ভূত্বকের অংশ বিশেষের ঢালু হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ার উপলক্ষে পরিণত হয়েছে। সমুদ্রের অগ্রসরমানতা ও অপসরণতা, মহাদেশসমূহ ও মেরুদ্বয়ের অবস্থানের পরিবর্তন এবং তৎসহ গরম ও শীত এবং ভেজা ও শুকনো আবহাওয়ার নিয়ন্ত্রণাধীনে তাদের থাকতে দেখা যায়।

অতীতে আমাদের প্রাচীন পূর্ব পুরুষেরা নদী-নালার প্রতি আকর্ষণবোধ করত। কারণ এ সকল জলপ্রবাহ পানোপযোগী পানি ও খাদ্য হিসাবে মাছের যোগান দিত। তাছাড়া যাযাবর জাতির একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াতের সুবিধার জন্য এ সকল নদী-নালা ব্যবহৃত হ'ত। প্রাচীন মানুষ নদীর স্রোত, বন্যা, নদীর গতিপথ পরিবর্তন প্রভৃতির অনুকম্পার উপর নির্ভরশীল ছিল। তাছাড়া, এ সকল নদীর প্রশস্ততা, গভীরতা ও বিপুল পরিমাণ জলরাশি তাদেরকে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করত এবং নদ-নদীসমূহ সব সময়ই তাদের কাছে বিপদ হিসেবে গণ্য হত। নদী যত বড় হ'ত ততই তা তাদের কাছে অশুভ ও অবোধগম্য বলে বিবেচিত হত।

প্রকৃতির সরাসরি বিরোধিতা করে মানুষ তার ক্ষমতাহীনতার অবস্থান থেকে ক্রমান্বয়ে ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং এজন্য লক্ষ লক্ষ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। পিপাসা নিবৃত করা, পানি সংগ্রহ ও মাছ ধরার প্রাথমিক সুবিধাদির বাইরে মানুষ ধীরে ধীরে জানতে ও শিখতে পারে এবং কালক্রমে এ সকল জল প্রবাহকে নানাবিধ ব্যবহারের জন্য কাজে লাগায়। অতি অগ্রসরমান প্রাচ্য সভ্যতার উন্নয়ন অধিকাংশ ক্ষেত্রে নদ-নদীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সেচকার্যে পানির ব্যবহার এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসাবে বাঁধ নির্মাণ এই সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত। জাহাজযোগে মালামাল পরিবহনের জন্য প্রধান প্রধান নদীপথের সন্ধান ও উন্নয়ন, পদব্রজে চলাচলের জন্য কাঠের সেতু থেকে প্রিস্ট্রেস্ড্ কংক্রিটের চমৎকার বাঁকানো সেতুর ব্যবহারে বিবর্তন, পানি প্রবাহ দ্বারা চালিত মিলের চাকা থেকে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টারবাইনের ব্যবহার,

www.bjilibrary.com

পারমাণবিক রিএ্যাক্টরের শীতলতাদানকারী বস্তু হিসাবে ব্যাপকহারে রাসায়নিক উৎপাদনের জন্য শিল্পে ব্যবহৃত পানি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে উৎপাদনমূলক ব্যবস্থার সাথে নদী ঘনিষ্টভাবে জড়িত রয়েছে। নদীর নিয়ন্ত্রণ ও নিত্যকাজে এর ক্রমবর্ধমান ব্যবহার মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের অন্যতম অংশের গঠন সম্পন্ন করে।

বর্তমানে নদী-প্রকৌশল বিদ্যার প্রযুক্তিগত অগ্রগতির মধ্যে এমন কিছুসংখ্যক প্রযুক্তি রয়েছে যা একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনে বিশেষভাবে প্রণয়ন করা হয়। কখনও কখনও পানির বিরাটাকার আধার নির্মিত হয় এবং শুধুমাত্র পানিবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আধুনিক নদী প্রকৌশল বিদ্যার আদর্শ নমুনা হচ্ছে তথাকথিত বহুমুখী প্রকল্প যার মধ্যে নদীর বিভিন্ন সুবিধা সমূহের উন্নয়ন একটি মাত্র কমপ্লেক্সে করা সম্ভব হয়। একটি নির্দিষ্ট কার্যকর যৌথ ব্যবস্থা হচ্ছে একটি বিশাল আধারে নদীর পানি আটকে রাখা যাতে নৌচলাচল ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়, অনুর্বর এলাকায় পানিবিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন করা যায় এবং সেচকার্যে নদীর পানির ব্যাপক ব্যবহার করা সম্ভবপর হয়। মানব জাতির অসংখ্য উপকারের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নদী সৃষ্টি করেছেন।

তিনি সকল ফসলের মধ্যে দু'টি পতি-পত্নীর সৃষ্টি করেছেন

আয়াতে উল্লেখিত 'জাওজায় নিসনাইনে' শব্দ সমষ্টির অর্থ হচ্ছে একটি জোড়ার উভয়েই অথবা স্বামী-স্ত্রী এবং এটা এরূপ অর্থ প্রকাশ করে যে উদ্ভিদাদির ফল উৎপাদনের ক্ষমতা তাদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রীলিঙ্গের অবস্থিতির উপর নির্ভর করে। প্রকৃতির সব-ল রহস্যের মধ্যে জীব জগতে দু'টি লিঙ্গের অবস্থিতি এবং জন্মগতভাবে একইরূপ দেহ গঠনের অবিরামতা বজায় রাখার জন্য প্রজননের বিষয়টি আমাদের গভীর চিন্তার দাবী রাখে। যদিও কোন কোন উদ্ভিদে প্রজনন ব্যতিরেকে অন্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীবনের অবিরাম স্থায়িত্ব দেওয়া সম্ভব। অবশ্য পুরুষ ও স্ত্রী জনন কোষের সংমিশ্রণে স্বাভাবিক প্রজনন কাজ সম্পন্ন হয় এবং জন্মের ধারা বজায় থাকে। কোন কোন উদ্ভিদে ফুল জন্মে এবং অত্যন্ত জটিল প্রজনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফুল থেকে ফল তৈরি হয়। দ্বিলিঙ্গ ফুলের ক্ষেত্রে প্রতিটি ফুলের পুংকেশর ও গর্ভপত্র নামে পরিচিত পুং ও স্ত্রী জনন কোষ রয়েছে।

পর্যায়ক্রমে একলিঙ্গ বিশিষ্ট প্রতিটি ফুল কেবলমাত্র পুংকেশর অথবা গর্ভপত্র ধারণ করে। পুংকেশর পরাগ তৈরি করে এবং গর্ভমুন্ড নামে অভিহিত গর্ভপত্রের আগা এই পরাগ গ্রহণ করে। তারপর বাতাস, কীটপতঙ্গ, পাখি, পানি প্রভৃতির

সাহায্যে যে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে পরাগ মিলন বলে। পরাগ রেণু গর্ভমুন্ডের উপর অংকুরিত হয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নলের আকারে অবয়ব গঠন করে যা গর্ভমুন্ড ও নিচের কোষসমূহ ভেদ করে এবং পরিশেষে এরূপ অংকুরিত একটি পরাগ রেণু ডিম্বকোষে ডিম্বকের সাথে মিলিত হতে সক্ষম হয়। পরাগনলিকা শেষ পর্যন্ত দু'টি পুং নিউক্লিয়াস নির্গত করে যার সাথে ডিম্বকের মধ্যে দু'টি স্ত্রীজনন কোষের মিলনের ফলে উদ্ভিদের বীজ ও ফলের সৃষ্টি হয়। এভাবে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট ফলকে গর্ভাধান করা বলে এবং একটি ফলের জন্ম বলতে উদ্ভিদাদির মধ্যে পুং ও স্ত্রী জনন কোষের পূর্ব উপস্থিতি রয়েছে বলে ধরা যায়। কিন্তু গর্ভাধান ব্যতিরেকে কোন কোন চাষকৃত উদ্ভিদে ফল জন্মে যেমন কলা অথবা অঙ্গবৃদ্ধিকারী হরমোন প্রয়োগ করেও ফলাদি সৃষ্টি করা যায়। ফল উৎপাদনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার বাইরে এগুলো হচ্ছে ব্যতিক্রম। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় দু'টি জননকোষ একত্রিত হয়ে ফলের জন্ম দেয় এবং এই আয়াতের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমানে এ সকল ব্যতিক্রম আমাদের বোধশক্তির বাইরে।

ঘটনাক্রমে যে সকল উদ্ভিদে একলিঙ্গ বিশিষ্ট ফুলের (যেমন শ্রীলংকা ও ভারতে জাত তাল ও খেজুর) জন্ম হয়, সেখানে পুং গাছ কেবলমাত্র পরাগ সরবরাহ করে। এই পরাগ ভিন্ন গাছে অবস্থিত স্ত্রী ফুলকে ফলবতী করে এবং এর ফলে ফলের জন্ম হয়। এরূপ গাছের ফল থেকে জন্ম নেওয়া আপাতদৃষ্টিতে অভিন্ন বীজের মোট সংখ্যার মধ্যে কোন কোনটি পুং উদ্ভিদ তৈরি করার জন্য অংকুরিত হয় এবং অন্যগুলো স্ত্রী উদ্ভিদের জন্ম দেয়।

যদি 'যাওজায়'নিস নাইন' শব্দ সমষ্টি দু'জোড়া অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহলে আয়াতটির আরেকটি বিকল্প ব্যাখ্যার সম্ভাবনা থাকে এবং তা হবে এমন একটি চমকপ্রদ বিষয় যা 'angiosperms' নামে অভিহিত অদ্ভুত প্রকৃতির উদ্ভিদবর্গকে বুঝায়। এই উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর বীজ ফলের অভ্যন্তরে দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। পুনঃ ডিম্বকের মধ্যে পরাগনলিকার ডগা ফেটে গিয়ে দু'টি পুংজনন কোষ মুক্ত করে দেয়। এরমধ্যে একটি স্ত্রী ডিম্বকের সাথে মিলিত হয়ে zygote (দু' জননকোষের মিলনের ফলে উৎপন্ন) তৈরি করে। অপরটি ডিম্বকের মধ্যে অবস্থিত ভ্রূণ থলির দু'টি পরস্পর বিরোধী কোষের সাথে মিলিত হয়ে triploid endosperm nucleus গঠন করে। এই zygote ভ্রূণে পরিণত হয় এবং endosperm undeun থেকে endosperm এর উৎপত্তি হয় যা ভ্রূণের পরিপুষ্টির জন্য ভান্ডার হিসাবে বিবেচিত হয়। দু'বার একীভূতকরণ অর্থাৎ

www.bjilibrary.com

ডিম্বকের সাথে একটি পুং জননকোষ এবং অন্য আর একটি পুং জননকোষ দু'টি বিপরীতধর্মী কোষের সাথে মিলিত হলে তাকে দ্বৈত গর্ভাধান বলে এবং এটা ফলজ উদ্ভিদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করা হয়। বর্তমান আয়াতে সুস্পষ্টভাবে এ বিষয়ে পরোক্ষ উল্লেখ রয়েছে। অতএব, প্রতিটি ফলের উৎপাদনে (যৌন মিলন ছাড়া অন্য পদ্ধতির মাধ্যমে যে সবের উৎপাদন হয় তাদের ব্যতিরেকে) পুং ও স্ত্রী জনন অঙ্গের দু'জোড়ার মিলনের বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রয়েছে।

তিনি দিন দ্বারা রাতকে আবৃত করেন

কিভাবে পৃথিবী স্বীয় অক্ষের উপর ঘূর্ণনের ফলে দিন ও রাতের সৃষ্টি হয় তা আয়াত ৩ ঃ ২৭ এ বর্ণিত হয়েছে। এই আবর্তনে সূর্য যখন দিগন্তের নিচে চলে যায় তখন রাতের সূচনা হয় এবং এর অন্ধকার ক্রমান্বয়ে দিনের আলোকে গ্রাস করে। এটা এমন যেন রাতের অন্ধকার পর্দা দিনের উজ্জ্বল মুখায়বের উপর ক্রমশ টেনে দেয়া হয়।

৪- وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۗ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ۗ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُونَ ۝

১৩ ঃ ৪ পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখন্ড; তাতে আছে দ্রাক্ষা-কানন, শস্য ক্ষেত্র, একাধিক শিরবিশিষ্ট অথবা এক শিরবিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ সিঞ্চিত একই পানিতে, এবং ফল হিসাবে তাদের কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।

পৃথিবীতে এলাকাসমূহ পরস্পর সন্নিহিত

আরবী 'কাতঅ' 'শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'কেটে টুকরো টুকরো করা'। পৃথিবী যে tectonic plates এর বেশ কিছু সংখ্যক অংশে বিভক্ত তা আয়াত ৭ ঃ ৯১-এ আলোচনা করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

দ্রাক্ষক্ষেত্রসমূহ সদৃশ, এবং সদৃশ নয়

আরবী 'ছেনওয়ানুন' শব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয় এবং এর বাগধারাগত অর্থ হচ্ছে চাচাত, খালাত, মামাত, ফুপাত ভাই বা বোন, ছেলে অথবা বৈপিত্র ভাই অর্থাৎ একই মায়ের গর্ভের এবং আক্ষরিক অর্থে এটা একই ধরনের ভাব প্রকাশ করে। এভাবে 'গায়ের ছেনওয়ানুন' শব্দের অর্থ পূর্বোক্তটির বিপরীত অর্থাৎ একই মায়ের গর্ভের নয়। আয়াতে উদ্ধৃত তিনটি উদাহরণের প্রত্যেকটির অধীনে উদ্ভিদের প্রতিটি প্রজাতির গঠন কাঠামোর মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রজাতি রয়েছে যা অন্য প্রজাতির অনুরূপ। কিন্তু অন্য আরও কিছু সংখ্যক প্রজাতি অবশিষ্টদের থেকে আলাদা।

এই পার্থক্য নিরূপণকারী কৌশল সম্পর্কে একটি স্পষ্ট বোঝাপড়া থাকা আবশ্যক এবং আয়াতে বিধৃত অর্থের মূল বৈশিষ্ট্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। ফল টক হওয়ার অর্থ এ্যাসিডের উপস্থিতি, মিষ্টতার কারণ হচ্ছে ফলের কোষসমূহ চিনি দ্বারা পূর্ণ থাকে; এবং esters নামে অভিহিত রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ থেকে সৌরভের সৃষ্টি হয়। পানি ছাড়া এ্যাসিড ও এ্যালকোহলের সংমিশ্রণে esterr তৈরি হয়। ফল পাকার জন্য যে রাসায়নিক পদার্থটি কাজ করে তাকে protopectin বলে। এই উপাদানটি কোষের অসংখ্য ছিদ্রবহুল দেয়ালকে ধরে রেখে একত্রে মিশে গিয়ে pectin উৎপন্ন করে। আর এই pectin ফলটিকে নরম ও ময়দাতুল্য করে তোলে।২ যে জৈব রসায়ন কারণসমূহ প্রতিটি প্রজাতির ফলের গুণাগুণের মূলগত পার্থক্য নিরূপণ করে তা বংশগত উপাদানের পার্থক্যের কারণে হয় এবং এই উপাদান ফলের বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। জিন আচরণের চলতি তত্ত্ব অনুযায়ী এটা কোষের অন্তর্গত অসংখ্য নিউক্লিয়াসের ডিএনএ অণুর ভিত্তি সমূহের স্পষ্ট পরিণতি মাত্র। এই পরিণতিসমূহ একটি নিয়মাবলি তৈরি করতে এ্যামাইনো এসিডকে একত্রিত করে গঠিত এনজাইমকে একটি নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে। এই এনজাইমই দেহের একটি অঙ্গের প্রাণরসায়ন সম্পর্কিত উপাদানকে নির্ধারণ করে।৩ অধিকতর বৃহৎ ও বেশ জটিল কার্বোহাইড্রেট অণুর মধ্যে গ্লুকোজ অণুকে সংশ্লেষণ করার জন্য এনজাইমের প্রয়োজন হয়। আমরা ফল ও খাদ্যশস্য থেকে কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ করে থাকি।

আয়াতে উল্লেখিত প্রথম উদাহরণ যথা আঙ্গুরের বাগানে যে আঙ্গুর উৎপাদিত হয় তা Vitis vinifera প্রজাতির। এছাড়া আবাদকৃত কিছু সংখ্যক নতুন প্রজাতির আঙ্গুরও দেখা যেতে পারে এবং তার প্রত্যেকটার গঠন, আকার,

www.bjilibrary.com

বর্ণ, রসপুষ্টতা, স্বাদ, গন্ধ ও মিষ্টতার দিক দিয়ে একে অপর থেকে আলাদা। এ সমস্ত আঙ্গুরকে সাধারণভাবে আহারের শেষ পদ হিসেবে খাওয়ার আঙ্গুর, মদ তৈরির আঙ্গুর, কিশমিশ, মনাক্কা প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। দ্বিতীয় উদাহরণ 'যারঅ' বপনকৃত মাঠকে নির্দেশ করে। এই মাঠে প্রধান খাদ্য হিসাবে প্রধান প্রধান ফসল, খাদ্যশস্য যথা গম, বার্লি, ধান, ভুট্টা জন্মে। প্রত্যেকটি ফসলের জন্য সুনির্দিষ্ট আওতায় বহুসংখ্যক cultivar থাকে যা সুস্বাদ ও পুষ্টিগুণে একে অপরকে ছাড়িয়ে যায়। তৃতীয়ত খেজুর গাছে (যার বৈজ্ঞানিক নাম phoenix dactylifera—আরবদেশীয় খেজুর যা বুনো খেজুর P. sylvestris থেকে আলাদা) যে ফল ধরে তা মসৃণতা ও কোমলতায়, চিনি ধারণ ক্ষমতায়, স্বীয় বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। আলোচ্য বিষয়ে ফসলের বিভিন্ন প্রজাতির প্রত্যেকটির নানারকম শ্রেণী রয়েছে যা তার নিজের গুণ বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে এমন কি যদিও সে সকল ফসল পাশাপাশি এলাকায় একই পানি সেচের আওতায় জন্মে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Steingas, F.A Learner's Arabic-English Dictionary, Beirut, 1972.
2. Went, F. W. The Plants, Time-Life International (Netharland), pp.56-58, 1968.
3. Miller, W. B. and Leth, C. (eds) BSCG Green Version, High School Biology, Rand Mc Mally and Co. p. 666, 1967.

www.bjilibrary.com

٨-اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ○

১৩ : ৮ প্রতিটি গর্ভবতী নারী (তার ভিতরে) যা কিছু বহন করে চলেছে এবং (তার) জরায়ু (সন্তানের) যা কিছু বাড়ায় বা কমায় তার সবই আল্লাহ্ তা'আলা জানেন, তার কাছে প্রতিটি বস্তুরই একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট করা আছে।

আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যা জরায়ুর অভ্যন্তরে হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়

এখানে আল্লাহ্ ঘোষণা করছেন যে তিনি সকল লুকানো বস্তু এমন কি স্ত্রী-লোকের জরায়ুর মধ্যে যা রয়েছে সে সম্পর্কে জানেন। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে জরায়ুর অভ্যন্তরে ভ্রূণের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোন ঘাটতি বা বাড়তির ব্যাপারে তিনি সচেতন থাকেন। এ ছাড়া জরায়ুর অভ্যন্তরস্থিত তাঁর সৃষ্টিতে পরিমাপের সঠিকতা বিদ্যমান।

স্ত্রীজনন কোষের একটি পরিপক্ক ডিম্বাণু একটি শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হয়ে যখন zygote গঠন করে তখন গর্ভাধান শুরু হয়। যখন এই zygote বা সমৃদ্ধ ডিম্বাণু জরায়ু মধ্যস্থ নলিকার মধ্য দিয়ে যায় তখন কোষের বিভক্তি শুরু হয় এবং পঞ্চম দিনে একটি blastocyst গঠিত হয়। ষষ্ঠ দিনে blastocystটি জরায়ুর দেয়ালে (endometrium) ভ্রূণাবস্থিত দণ্ডে গিয়ে নিজকে স্থাপন করে। অতঃপর নিজের প্রবেশ ৯ম দিনে সম্পূর্ণ হয়। দু'সপ্তাহের মধ্যে এর আকার দাড়ায় দু'মিলিমিটারে এবং তখন একে ভ্রূণ বলে। ৬ষ্ঠ সপ্তাহ পর্যন্ত ভ্রূণটিকে আকারগত দিক দিয়ে অন্য প্রাণী থেকে আলাদা করে চেনা যায় না। এরপর এটা মানব দেহের স্পষ্ট অবয়ব নিতে শুরু করে। আর তখন একে মানব দেহের পূর্ণ ভ্রূণ নামে আখ্যায়িত করা হয়।[১]

সাধারণত একটি শুক্রাণু দ্বারা স্ত্রী ডিম্ব নিষিক্ত হওয়ার সময় থেকে গর্ভধারণ শুরু হয় এবং প্রায় ৩৮ সপ্তাহ পর শেষ হয়। অথবা নিষিক্ত হওয়ার ২৬৬ দিন পর বা প্রায় ৪০ সপ্তাহ কিংবা শেষ রজঃস্রাবের (LMP)[৩] ২৮০ দিন পর এর সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এই সময় কালের হ্রাস-বৃদ্ধিতে জটিলতার সৃষ্টি হয় (মানব দেহের গঠনগত ত্রুটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পরিশিষ্ট-৪ দ্রষ্টব্য)।

জরায়ু মধ্যস্থিত ত্রুটিসমূহ

১. Zygoteএর কমপক্ষে ১৫% প্রধানত ক্রোমোজম সংক্রান্ত অস্বাভাবিকতার কারণে আপনা-আপনি গর্ভপাত ঘটে। প্রকৃতিগতভাবে এরূপ

www.bjilibrary.com

গর্ভপাত ছাড়া প্রায় ১২% শিশু জন্মগতভাবে বিকলাঙ্গ হতে পারে, এর বিপরীতে স্বাভাবিক হার প্রায় ২-৩% মাত্র।

২. জন্মগত বিকলাঙ্গতা : জন্মগত বিকলাঙ্গতার কারণে শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার সময় প্রায় ২০% শিশু মারা যায়।[৩] সদ্যজাত শিশুর ২.৭% পর্যন্ত বিকলাঙ্গ হতে দেখা যায় এবং আরও ৩% শিশুর শৈশবকালে জন্মগত ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। এ সময় জন্মের প্রায় এক বছর পর্যন্ত হতে দেখা যায়।[৪]

(ক) জন্মগত কারণে বিকলাঙ্গ হওয়ার উদাহরণ হচ্ছে : টার্নার সিনড্রোম (Turner Syndrome) কম ক্রোমজোম বিশিষ্ট hypodiplod, সাধারণত ৪৫ ও ডাউন সিনড্রোম (Down Syndrome) অতিরিক্ত ক্রোমজোম বিশিষ্ট hyperdiplod, সাধারণত ৪৭। Mutant gene সমূহ ব্যাপক অঙ্গ বিকৃতির কারণ ঘটাতে পারে যেমন বেটে শরীর, বড় মাথা, কুঁজো পিঠ (thoracic kyposis), lumbar lordosis ও তলপেটের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি (achondroplasia)।

(খ) জরায়ুর মধ্যে মানব ভ্রূণ যদিও সুরক্ষিত তবুও বাইরের অনেক কারণ বিদ্যমান থাকে যা বিকলাঙ্গ হওয়ার উপলক্ষ তৈরি করে। এগুলোকে অঙ্গ বিকৃতি বলে। এসব নিমিত্ত বা কারণ হচ্ছে হরমোন, উপক্ষার (নিকোটিন), সুরা (অ্যালকোহল), জীবাণু প্রতিরোধী পদার্থ (অ্যান্টিবায়োটিক্স-টেট্রাসাইক্লিন ও স্ট্রেপটোমাইসিন), ঘনীভূতকরণ বিরোধী দ্রব্য (anticoagulants-Warfarin), মাংস পেশীর প্রবল আক্ষেপ বিরোধী উপাদান anticonvulsants (tridione, paradione), antineoplastic agents (aminoperin), corticosteroids (cortisone), কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্য (মাছের সাথে সংযোজিত দ্রব্য ও ছত্রাকের মধ্যে organic mercury), স্নায়ুর উত্তেজনা প্রশমনকারী ওষুধ (thalidomide, lithium carbonate, diazepam), অন্যান্য ওষুধ যেমন LSD (Lysergic Acid Diethelamide), বড়মাত্রায় alicylaties, পটাসিয়াম আইওডাইড, রেডিও অ্যাকটিভ আইওডাইন, সংক্রামক রোগ জীবাণু (Rubella Virus, Herps Simplex Virus, CMV (cytomegalovirus), Toxoplasma Gondii, Treponoma Pallum (সিফিলিস রোগ ঘটায়), রশ্মিবিচ্ছুরণ (Radiation১০ র‍্যাড-এর উপর বিচ্ছুরণ প্রকটিত হওয়া)।

যে সকল অনুঘটক দ্বারা বিকলাঙ্গতা সংঘটিত হয় তা হচ্ছে- বহিঃস্থ জননেন্দ্রিয়, জরায়ু মধ্যস্থ ভ্রূণের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হওয়া (IUGR), মানসিক বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ না হওয়া, microcephaly (ক্ষুদ্র আকারের মাথা),

www.bjilibrary.com

সংযোগ স্থলের অস্বাভাবিকতা, কাঠামোগত ত্রুটি (skeletal defects), ফেটে যাওয়া তালু (cleft palate), হৃদযন্ত্র সম্পর্কিত ত্রুটি (cardiovascular defects), phocomelia (সীল মাছের মত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ), amelia (অঙ্গবিহীন), micromelia (ক্ষুদ্র অথবা প্রাথমিক পর্যায়ের অঙ্গ, কাটা ঠোট, চোখের ক্ষয়িষ্ণুতা, hydrocephaly (বড় মাথা), microphthalmia (ক্ষুদ্র চক্ষু), চক্ষু ছানি, গ্লুকোমা, অন্ধত্ব, বধিরতা, জন্মগত হৃদরোগ, রেচনতন্ত্র ও পরিপাকতন্ত্রের অঙ্গবিকৃতি, তালুতে বড় ধরনের ফাঁক, থ্যাবড়ান নাক, Hutchinson's teeth (দাঁতের মধ্যে বড় আকারে ফাঁক, খোঁটার আকারের দাঁত, খাঁজকাটা উপরের দাঁত), শরীরের সম্মুখভাগ উঁচু হওয়া ইত্যাদি।[২]

(গ) প্রজননগত ও বহিঃস্থ কারণসমূহ একত্রিত হয়ে যে বিকলাঙ্গতার সৃষ্টি হয় তাকে বহু কারণ সম্বলিত উত্তরাধিকার নামে অভিহিত করা হয়। এরূপ উত্তরাধিকার প্রাপ্তিতে বংশগত ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় যেমন তালু ফাটাসহ বা তালু ফাটা ছাড়া বিচ্ছিন্ন ঠোট, spina bifida cystica-এর ন্যায় স্নায়ু নলে ত্রুটি (মেরুদন্ড দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে এর নিচের প্রান্তে cyst গঠন করে), anencephaly (মস্তিষ্কবিহীন), pyloric stenosis (পাকস্থলী থেকে অন্ত্রে প্রবেশের দ্বার সংকোচন), জন্ম থেকে নিতম্বের অঙ্গ বিকৃতি ইত্যাদি।[৫]

(ঘ) প্রাথমিক পর্যায়ের ভ্রূণ ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত ভ্রূণের গঠনে কখনও কখনও অস্বাভাবিক ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় যথা ক্ষয়প্রাপ্ত ভ্রূণ (ভ্রূণের থলিতে কোন ভ্রূণ না থাকা) বক্ষ দেয়ালের অনুপস্থিতি, এবং এমন কি শোথরোগের ফলে ভ্রূণের অগ্রগতি সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ হয়ে শরীরে পানিপূর্ণ পুঁজকোষের সৃষ্টি হয় যা ভ্রূণের মারাত্মক রূপান্তর ঘটায় (chorion epithelioma)।

(ঙ) মায়ের ভয়ানক অপুষ্টি ও ত্রুটিপূর্ণ খাদ্য গ্রহণ ভ্রূণের বৃদ্ধিকে ব্যাহত করতে পারে এবং এর ফলে শিশুর ওজন কম হওয়ার আশংকা থাকে।

জরায়ুর মধ্যস্থিত বৃদ্ধি

১. গর্ভাধানের স্থিতিকালের বৃদ্ধি হতে পারে। প্রায় ৮% থেকে ১২% ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থার সময় স্বাভাবিক থেকে ২-৩ সপ্তাহ বেশী লাগতে পারে।

২. মাত্রাতিরিক্ত ওজন বিশিষ্ট শিশু। একটি নবজাত শিশুর স্বাভাবিক ওজনের মাত্রা ২৫০০ গ্রাম থেকে ৩৪০০ গ্রাম হয়ে থাকে। ডায়াবেটিকে আক্রান্ত শিশু স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী ওজনের হয়। এরূপ ওজন ৪৫০০ গ্রাম পর্যন্ত হতে দেখা যায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরিশিষ্ট-৫ এ দেখা যেতে পারে।

www.bjilibrary.com

৩. যমজ শিশু ও অন্যান্য বহুবিধ গর্ভাধান।

৪. সংযুক্ত যমজ শিশু– যমজ শিশু একে অপরের সাথে যুক্ত থাকে, যেমন thoracopagus (বুকের সাথে বুক সংযুক্ত থাকে), cephalo-thoracopagus (মাথা ও বুকের সাথে সংযুক্তি), Siamese twins (একত্র জোড়া যমজ শিশু– এরা শারীরিকভাবে সংযুক্ত থাকলেও প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান) এবং পরজীবীয় ভ্রূণ (parasitic foetus) (ভ্রূণের একাংশ স্বাভাবিক শিশুর সাথে সংযুক্ত থাকে)।

৫. Polydactily- হাত ও পায়ের অতিরিক্ত সংখ্যক আঙ্গুল।

এভাবে জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণের স্থিতিকাল ও শারীরিক উন্নয়ন বিবেচনা করলে বহু ধরনের ঘাটতি ও অতি বৃদ্ধি হতে দেখা যায় এবং এসবই আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যদিও মানবিক ত্রুটির কারণে অনেক বিকলাঙ্গতার সৃষ্টি হয়। প্রধান প্রধান জন্মগত অঙ্গ বিকৃতির জন্মপূর্ব আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এবং ভ্রূণের লিঙ্গ সম্পর্কে জ্ঞানের বিষয়ে মানুষ কোন একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে তাদের কিছুটা জানতে পারে এবং এমন কি গর্ভে ভ্রূণের অবস্থান জানাও সম্ভব। কিন্তু তিন মাসকালীন গর্ভাবস্থায় তা এখনও পর্যন্ত জানা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া এটা জানার জন্য বিশেষ ধরনের পরীক্ষা-নীরিক্ষার প্রয়োজন (যেমন amniocentesis, foetoscopy, ultrasonography) এবং এগুলো অত্যন্ত জটিল ও ব্যয় বহুল। সাধারণের ব্যবহারের জন্য এ সকল পরীক্ষার সুপারিশ করা হয় না।

আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সবকিছুই পরিমিত

ভ্রূণের মাথা, বুক ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকার সবকিছুই বেঁচে থাকার জন্য আনুপাতিক ও উপযোগী। একটি বড় মাথা বিশিষ্ট শিশুর জন্মপথ দিয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়া কঠিন এবং বড় আকারের শরীর ও দীর্ঘ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কোন প্রতিবন্ধকতা ব্যতিরেকে জরায়ুতে ধারণ করা সম্ভব নয়। এরূপে জরায়ুতে সৃষ্ট ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সবকিছুই সঠিক পরিমাপের যা মানব শরীর গঠনের জন্য স্বাভাবিক মাত্রা।

(১) সমগ্র সৃষ্টিতে অনুপাতের বিষয়টি দু'ধরনের ঃ একটি পদ্ধতির অনুপাত তার নিজস্ব পরিবেশে অন্য পদ্ধতির সাথে সম্পর্কযুক্ত; ও

(২) একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতির মধ্যে বিভিন্ন অংশ বা উপাদানের অনুপাত। এখানে অনুপাতের দ্বিতীয় বিষয়টি অধিকতর প্রাসঙ্গিক। এটা অনুধাবন করা বাস্তবিকই চিত্তাকর্ষক যে মানব শরীরের গঠনমূলক স্ব স্ব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাদের

www.bjilibrary.com

প্রাসঙ্গিক অবস্থান, আকার, গুণগত উন্নতি, কর্মকান্ড ও পারস্পরিক সমন্বয়ের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট অনুপাত মেনে চলে। উদাহরণ স্বরূপ মানব শরীরের কিছু সংখ্যক শারীরস্থানিক অবস্থানের জ্যামিতিক পৃথকীকরণ আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক স্থিরীকৃত একটি প্যাটার্ন অনুসরণ করে চলে এবং Fibonacci সংখ্যা ১,১,২,৩,৫,৮,.......তে এটা আবিষ্কৃত হয়েছে।৬ বস্তুর অনুপাত ও পরিমাপের প্রশ্নটি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। কুরআনের ২৫ ঃ ২ আয়াতে এ বিষয়টির উপর কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Thomson, W.A.R. Black's Medical Dictionary, 33rd. edn. Adam & Charles Black, London, p 370, 1981.
2. Moore, K. and Azindani, A. M.A. The Developing Human with Islamic additions, 3rd. edn. Daral-Qibla for Islamic Literature, Saudi Arabia, p 94, 1988.
3. Mac Vicar, J. : Antinatal defection of foetal abnormality : Physical Methods, Brit. M. J, 32 : 4, 1976.
4. Mckeown, T. : Human Malformations, Introductins, Brit. M. J., 32 : 1, 1976.
5. Thomson, J. S. and Thomson, M.W, : Genetics in Medicine, 3rd. edn. W. B. Saunders Co. Philadelphia, pp 344-347, 1980.
6. Huntley, H. E. The Divine Proportion, Dover Publication, Inc. N.Y, 1970.

www.bjilibrary.com

١٢- هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّ طَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۚ

১৩ ঃ ১২ তিনিই তোমাদেরকে দেখান বিজলী যা ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে এবং তিনিই সৃষ্টি করেন ঘন মেঘ;

বজ্র ঃ ২ ঃ১৯নং আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, বজ্র হচ্ছে বায়ুমন্ডলে একটা উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক প্রবাহের নির্গমন। মেঘে বিদ্যুৎ শক্তি তৈরি হয়ে মেঘের জলকণাতে জমা হতে থাকে এবং শেষে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎ প্রবাহ পৃথক হয়ে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যুৎ প্রবাহী মেঘপুঞ্জ তৈরি করে। মেঘে গড়ে তোলা এরূপ বিদ্যুৎ শক্তি এত বড় হয়ে উঠে যে মধ্যবর্তী বায়ু তাদেরকে আর পৃথক করতে পারে না। তখন একটি মস্ত বড় স্ফুলিঙ্গ বিদ্যুৎবাহী মেঘের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক এলাকা দিয়ে চলে যায়। এই স্ফুলিঙ্গ সম্পূর্ণভাবে একটি মেঘের অভ্যন্তরে ঘটতে পারে, অথবা একটি মেঘ থেকে আরেকটি মেঘে লাফিয়ে যেতে পারে, কিংবা মেঘ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসতে পারে। এ সকল স্ফুলিঙ্গের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা তীব্র আলোর ঝলকানি ও প্রচন্ড শব্দের সৃষ্টি করে এবং একেই আমরা বজ্রধ্বনি নামে অভিহিত করি। বজ্রের বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রচন্ডভাবে উত্তপ্ত এবং দ্রুত চারদিকে বিস্তার লাভ করে এর পরিপার্শ্বকে উত্তপ্ত করে তোলে। বাতাসের এই হঠাৎ ব্যাপ্তি শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করে একটি বিরাট বিস্ফোরণকারী শব্দের জন্ম দেয় যা আমরা বজ্রের গর্জন হিসেবে শুনতে পাই।

বজ্রভীতি ঃ স্মরণাতীতকাল থেকে মানুষ বজ্র বিদ্যুৎকে ভীষণ ভীতির সাথে দেখে আসছে। এর তীব্র আলোর ঝলক ভীতিকরভাবে চোখ ঝলসে দেয় এবং আলোর ছটা এতই তীব্র যে চোখের দৃষ্টিশক্তি সাময়িকভাবে অন্ধ করে দেয় (আয়াত ২ ঃ ১৯,২০)।

অধিকন্তু, মেঘ ও পৃথিবীপৃষ্ঠের মধ্যে সংঘটিত বজ্র জীবনহানির কারণ ঘটায় এবং মৃত্যু হয় তাৎক্ষণিক। এতে সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। কারণ, বজ্রপাতের স্থলে প্রচণ্ড তাপের জন্য চার পাশের সব কিছু পুড়ে যায়।

বজ্র বিদ্যুৎ আশার স্থল হিসেবেও গণ্য হয়

১৯শ' শতকের শেষার্ধের পূর্ব পর্যন্ত বজ্র বিদ্যুতের অতি উপকারী ফলাফল সম্পর্কে জানা ছিল না। বিজ্ঞানীবর্গ আবিষ্কার করেন যে, বজ্র বিদ্যুৎ বাতাসে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনকে পরস্পর একত্রিত করে এবং নাইট্রোজেনের অক্সাইড গঠন করে। মাটিতে পড়া বৃষ্টির ফোটা এই অক্সাইড বহন করে নিয়ে আসে এবং দ্রবীভূত নাইট্রোজেন কমপাউন্ডের আকারে গাছপালার জন্য নাইট্রোজেন সরবরাহ করে। এই নাইট্রোজেন উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য দরকারী। প্রফেসর জে এইচ

www.bjilibrary.com

উড-এর[১] মতানুসারে 'বজ্র বিদ্যুৎসহ ঝড়ের সময় গঠিত নাইট্রোজেন অক্সাইড বৃষ্টির পানির সাথে মিশে গিয়ে নাইট্রিক অ্যাসিডের খুবই তরল একটি দ্রবণ তৈরি করে। এভাবে বাতাসের এক উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অকার্যকর নাইট্রোজেনের উপাদান নাইট্রোজেন কমপাউন্ডে রূপান্তরিত হয় এবং উদ্ভিদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্য মাটিতে সঞ্চিত থাকে। হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে একটি অঞ্চলে পরিমিত বৃষ্টিপাত হলে সেখানে প্রতিবছর প্রতি একরে ৫-৭ পাউন্ড নাইট্রোজেন নাইট্রিক অ্যাসিড হিসাবে জমা হয়। নিচের নকশায় (চিত্র-৬) নাইট্রোজেন চক্রের একটি চমৎকার চিত্র পাওয়া যাবে[২] ঃ

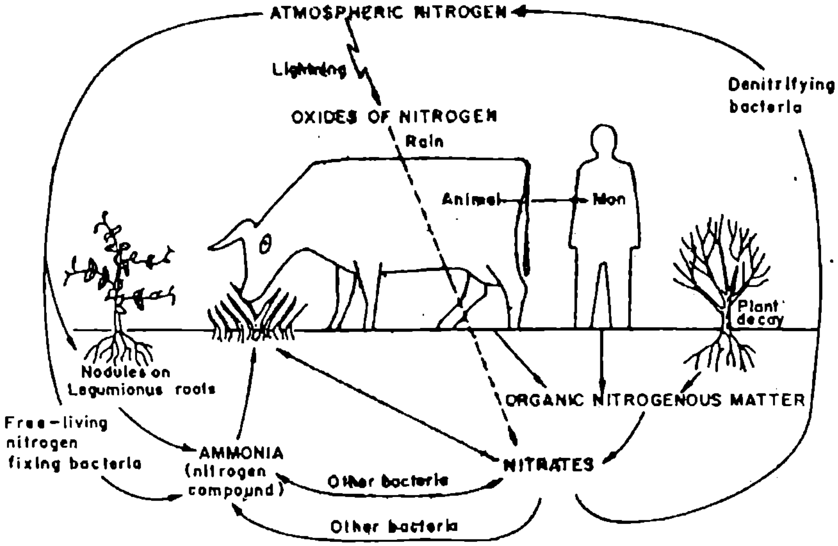

চিত্র- ৬ ঃ নাইট্রোজেন চক্র

এভাবে দেখা যায় যে বজ্র বিদ্যুতের এরূপ উপকারী অবদান ব্যতীত নাইট্রোজেন চক্রের এই অন্যতম উৎস বজায় রাখা সম্ভবপর হ'ত না এবং পরিণামে উদ্ভিদ জগত ক্ষতিগ্রস্ত হ'ত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে ভীতিকর বজ্র-বিদ্যুৎ সূক্ষ্ম উপকারক হিসাবে উদ্ভূত হয় এবং তা আল্লাহ্‌র মহান করুণা ভিন্ন আর কিছু নয়।

আকাশে বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘের গঠন ঃ এ বিষয়টি ২ ঃ ১০নং আয়াতে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Wood, J. H. General College Chemistry, Terresy, p. 377.
2. The Reader's Digest Great Encyclopaedia Dictionary, p. 1460, 1966.

www.bjilibrary.com

١٣- وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ
فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ۝

১৩ ঃ ১৩ বজ্রনির্ঘোষ ফেরেশতাগণ সভয়ে তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তিনি বজ্রপাত করেন। এবং যাতে ইচ্ছা তা দ্বারা আঘাত করেন; তবুও তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতর্ক করে যদিও তিনি মহাশক্তিশালী।

বজ্রপাত আল্লাহ্‌র প্রশংসা জ্ঞাপন করে

বজ্রপাতের গঠন সম্পর্কে ২ ঃ ১৯নং আয়াতে ব্যাখ্যাদান করা হয়েছে। বজ্র সৃষ্টিতে তিনটি বিষয় নির্ণয়যোগ্য ঃ (১) মেঘ থেকে ভারী বিদ্যুতের সঞ্চারণ, (২) প্রচন্ড উত্তাপের সৃষ্টি, ও (৩) আলোর চোখ ধাঁধানো ঝলকানি। বজ্রপাত নামে অভিহিত প্রচন্ড শব্দ বাতাসের হঠাৎ সম্প্রসারণ এবং এর পরপরই প্রবল সংকোচনের ফলে সৃষ্টি হয়। এর প্রত্যেকটি বিষয় যেন এক একটি ভীতি উৎপাদনকারী বিস্ময়। তীব্র আলোর ঝলকানি থেকে বজ্রের গর্জন পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছানুযায়ী নানাপ্রকার ফলাফল সৃষ্টি হতে দেখা যায় এবং আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মের কঠোর আজ্ঞানুবর্তিতায় এসব ঘটে। এর বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় অচিন্ত্যনীয়।

এভাবে আমরা বলতে পারি যে বজ্রপাত আল্লাহকে মহিমান্বিত করে এবং সর্বক্ষণ ও সর্বত্র তাঁর সুমহান সত্ত্বার সার্বভৌম ক্ষমতা ও মহত্ত্ব ঘোষণা করে। এই সূরার ১২ নং ও ১৩ নং আয়াত থেকে আমরা দেখতে পাই যে বারকুন (বজ্র বিদ্যুৎ) ও রুআদুন (বজ্রপাত) শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। বাস্তবিকই আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে বজ্র বিদ্যুতের সাথে ক্ষতিকর প্রভাব জড়িত, কিন্তু বজ্রপাতের সাথে নয়। কারণ, বজ্রের প্রচন্ড শব্দ ভয়ের সৃষ্টি করলেও সাধারণত মারাত্মক দুর্দশার কারণ হয় না। অধিকন্তু বজ্র বিদ্যুতের তীব্র ঝলকানি ও বিদ্যুৎ এত প্রচন্ড গতিতে সঞ্চারিত হয় যে তা প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল পরিভ্রমণ করে, পক্ষান্তরে বজ্রের গর্জন ধ্বনি বাতাসে কেবল মাত্র প্রতি সেকেণ্ডে ১১৯০ ফুট পর্যন্ত যেতে পারে।

١٥- وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ
بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۝

www.bjilibrary.com

১৩ ঃ ১৫ আল্লাহ্‌র প্রতি সিজদাহ্‌ অবনত হয় ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে এবং তাদের ছায়াগুলোও সকাল ও সন্ধ্যায়।

'অবনত' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে মাটির উপর উপুড় হয়ে থাকা এবং তা আনুগত্যের নিদর্শন হিসেবে করা হয়। এর অতিন্দ্রীয়বাদী ব্যাখ্যা আমাদের আলোচনার এখতিয়ার বহির্ভূত। সিজদাবনত হওয়া স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যের তাৎপর্য তুলে ধরে এবং তা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক সবই আল্লাহ্‌ নির্ধারিত বিধানাবলি অনুসারেই হতে হবে। অতঃপর, বস্তুজগত ও প্রাণীজগত উভয়ের জন্য এই বিষয়টি সবিস্তারে ৭ ঃ ৫৪নং আয়াত ও পরিশিষ্ট-৪ এ আলোচিত হয়েছে। ছায়া তৈরি হয় যখন আলো অস্বচ্ছ বস্তুর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে পারে না। ছায়ার দু'টি অংশ- প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া। প্রচ্ছায়া হচ্ছে প্রধান স্পষ্ট অংশ, আর বাইরের অস্বচ্ছ অংশটিকে উপচ্ছায়া বলে। ছায়ার গঠন আলোর রৈখিক বিস্তারকে প্রতিপাদন করে। সকালে ও সন্ধ্যায় কোন বস্তুর ছায়া সবচেয়ে দীর্ঘ হয় এবং স্রষ্টা কর্তৃক নির্ধারিত ভৌত বিধান মেনেই এটা সম্ভবপর হয়।

١٦- قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ قُلِ اللّٰهُ ۭ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَاۗءَ
لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ۭ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ڏ
اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ڬ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاۗءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ
فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۭ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○

১৩ ঃ ১৬ বল, কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক?' বল, 'তিনি আল্লাহ।' বল, 'তবে কী তোমরা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছ আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে যারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়?' বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক?' তবে কী তারা আল্লাহ্‌র এমন শরীক করেছে, যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে! বল, আল্লাহ্‌ সকল বস্তুর স্রষ্টা; তিনি এক, পরাক্রমশালী।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ্ প্রভু ও সংরক্ষণকারী

এই নিখিল বিশ্বে দু'টি বিষয় রয়েছে যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন। এর প্রথমটি আল্লাহ্র বিশ্বাধিপতিত্ব এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সংরক্ষক হওয়ার সাথে সম্পর্কিত। এ বিষয়টি আয়াত ১ ঃ২ এ কিছুটা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি হচ্ছে আল্লাহ্র শরীককারীদের এরূপ দায়িত্ব অর্পণ করা যে আল্লাহ্র সৃষ্টি সমতুল্য কোন কিছু সৃষ্টির ক্ষমতা তাদের রয়েছে এবং স্বয়ং আল্লাহই সে বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। মানুষের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক অবদানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি আলোচনা করা যাক। বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরে মানুষের জীবনের ভিত্তি হিসেবে অণু সম্পর্কিত ধারণার এক বৈপ্লবিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। জীবনের বংশগতির পরিকল্পনা হিসাবে ডিএনএ (DNA) অণু (Deoxyribonucleic acid) ইতোমধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। বার্তাবাহী RNA (Ribonucleic acid)-এর ব্যবহারও প্রায় বিশটি এ্যামাইনো এ্যাসিডের মধ্য থেকে বিভিন্ন প্রোটিনের সমন্বয়ের জন্য RNA হস্তান্তরের বিষয়টিও জানা গিয়েছে। যদিও মানুষ জীবনের এ সকল অণুর কিছু সংখ্যককে সমন্বয়ের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করছে, কিন্তু একটি কোষের সৃষ্টি যা জীবনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত তা এখনও বহু দূরের বিষয়। এমন কি যদিও আমরা জানতে পারি কীভাবে একটি কোষের ভিন্ন ভিন্ন উপাদানগুলো গঠিত হয় তবুও এ সকল উপাদানের একত্র সন্নিবেশ জীবন গঠন করতে পারবে না। এ সকল কোষের বিষয় মেনে নিয়েও মানুষ একটি কোষের বেড়ে ওঠার সঠিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে সক্ষম হয়েছে। যদিও টেস্ট টিউব গাছ (টিস্যু কালচার) ও টেস্ট টিউব শিশু হাল আমলে জীবতাত্ত্বিক গবেষণার সম্মুখভাগে খুবই ধোপদুরস্ত পরিভাষা রূপে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে তবুও মানুষের এ সকল সাফল্য নতুন কোন সৃষ্টি নয় এবং আল্লাহ্র নিখুঁত সৃষ্টির সাথে তুলনীয় হতে পারে না। আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা মানুষ জীবন ও পরিবেশ সৃষ্টির অনেক গুপ্ত রহস্য হয়ত জানতে পারে, কিন্তু তাকে কখনও জীবন ও বস্তু সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে এক মুহূর্তের জন্য হলেও আল্লাহ্র অংশীদার হিসেবে গণ্য করা যাবে না। মানুষ ক্ষুদ্রের এই জগতে অনেক কিছুই আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে, যেমন যৌগিক পদার্থ, উপাদান, অণু, পরমাণু, নিউক্লিয়াস (প্রাণকেন্দ্র), ইলেট্রন, প্রটোন, নিউট্রন, কোয়ার্ক (quark) ইত্যাদি। মানুষ যত গভীরভাবে বস্তুর প্রাণ নিয়ে গবেষণা করছে ততবেশী আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছে যে প্রকৃত বাস্তবতা অনেক বেশী সূক্ষ্ম এবং তা মানুষের জানার বাইরে। মানুষ অনেক কিছুই জানতে পেরেছে শুধু এটা বোঝার জন্য যে সে যা জেনেছে তা যা এখনও জানতে পারেনি তার ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র। এ যাবৎ

www.bjilibrary.com

যত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়েছে মানুষ তা নিয়ে মাইক্রোচিপস থেকে আরম্ভ করে মহাকাশযান পর্যন্ত সব বিস্ময়কর সরঞ্জামাদি তৈরি করেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মানুষের ভূমিকা কখনও আল্লাহ্‌র অংশীদার হিসেবে দেখা যাবে না। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির পিছনের এই জ্ঞান অফুরন্ত এবং মানুষ তার সীমিত জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাদিতে অনুসৃত প্রণালীসমূহ্‌ দিয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলার জ্ঞানের অংশ বিশেষে সীমিত আকারে প্রবেশ করতে পারে মাত্র। যেহেতু মানুষ মুষ্টিমেয় সংখ্যক বস্তু সৃষ্টি করতে পারে এ জন্য তাকে আল্লাহ্‌র অংশীদার হিসেবে গণ্য করার প্রশ্নটি একেবারে অবাস্তব। আল্লাহ্‌ হচ্ছেন সার্বভৌম স্রষ্টা।

১৭- أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۝

১৩ ঃ ১৭ তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ তাদের পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয় এবং প্লাবন তার উপরের আবর্জনা বহন করে, এরূপে আবর্জনা উপরিভাগে আসে যখন অলংকার অথবা তৈজসপত্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে আগুনে উত্তপ্ত করা হয়। এভাবে আল্লাহ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। যা আবর্জনা তা ফেলে দেয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়। এভাবে আল্লাহ্‌ উপমা দিয়ে থাকেন।

বৃষ্টিবিন্দুর বর্ষণ

আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের বিষয়টি ২ ঃ ২২ আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পানির প্রবাহ

যখন দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, তখন বৃষ্টির পানি নালা, ডোবা, পুকুর, খাল, বিল, নদী, হ্রদ ও ভূপৃষ্ঠের অন্যান্য নিচু জায়গা ভরে গিয়ে উপচিয়ে পড়ে। এ সকল জায়গা তাদের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী পানি গ্রহণ করে। পানির পরিমাণ নির্ভর করে জলাধারের আয়তনের উপর এবং এ সকল জলাধারের মধ্য দিয়ে পানি প্রবাহের গতির উপর পানির নিঃসরণ নির্ভর করে।

www.bjilibrary.com

এরূপ বন্যা পরিস্থিতিতে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। স্থানীয় অবস্থা অনুসারে প্রবল পানি প্রবাহের কারণে ফেনার সৃষ্টি হয়। এই নিতান্তই অনুল্লেখযোগ্য বস্তু পানি থেকে ওজনে হালকা এবং পানির উপর ভেসে থেকে প্রবল স্রোতের তোড়ে বেরিয়ে যায়। আর এর নিচে থাকে পরিষ্কার পানি যা উপরের ময়লা-আবর্জনা থেকে মুক্ত থাকে। এই আয়াতে আল্লাহ্‌র আধ্যাত্মিক অনুকম্পাকে বৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র এই রহমত অবিরামভাবে সকলের উপর বর্ষিত হচ্ছে। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়। আল্লাহ্‌র রহমতের পরিমাণ নির্ভর করবে রহমত গ্রহণকারী ব্যক্তির যোগ্যতার উপর। রহমতের এই প্লাবন আমাদের অন্তরের আধ্যাত্মিক ময়লা আবর্জনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অহঙ্কার ও মিথ্যার ফেনা যতই উপরে উপরে বড় করে দেখা যাক না কেন, তা অতি দ্রুত শূন্যে মিলিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত সত্য টিকে থাকে।

আকরিক খনিজ পদার্থ থেকে লোহা, সোনা ও রুপার নিষ্কাশন

এই আয়াতে তৈজসপত্র তৈরির জন্য যে ধাতু যেমন লোহা ব্যবহৃত হয় সে প্রসংগে গাঁজলার রূপকটি উল্লেখ করা হয়েছে এবং তেমনি অলংকারাদি তৈরিতে যে ধাতুর যেমন সোনা ব্যবহার হয় তার কথা বলা হয়েছে। এ সকল ধাতুর আকরিক খনি নানাবিধ ধাতুর সংমিশ্রণে পূর্ণ থাকে। এই মিশ্রিত ধাতব পদার্থ থেকে অপ্রয়োজনীয় অংশ আলাদা সরিয়ে ফেলতে হয়। তারপর একে প্রয়োজনীয় পরিমাণ উত্তাপ দিয়ে গলিয়ে ফেলে এর ময়লা আবর্জনা গাঁজলা হিসেবে উপরে ভেসে উঠে।

আকরিক থেকে লোহা নিষ্কাশনের[১] জন্য প্রথমে আকরিককে পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে এবং তারপর এর সাথে কোক কয়লা ও চূনাপাথর মিশাতে হবে। এই মিশ্রণকে ধাতব পদার্থ গলানর চুল্লীতে (blast furnace) 1500^0 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করা হবে। এই তাপে লোহা গলে যাবে এবং ধাতুমল নামে অভিহিত বর্জ্য পদার্থসমূহ (ক্যালসিয়াম সিলিকেট ও অন্যান্য অধাতব পদার্থ) ওজনে হালকা হওয়ার কারণে গলে যাওয়া লোহার তরলের উপর ভেসে উঠে। ধাতুমল তখন উঠিয়ে ফেলা হয় এবং এভাবে লোহা বিশুদ্ধ করে তৈজসপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

সোনা নিষ্কাশনের বেলায়২ সোনার আকরিক (gold telluride) সোডিয়াম সায়ানাইডের মিশ্রিত দ্রবণের সাথে মিশান হয় এবং এই মিশ্রণ প্রায় ৫০ ঘন্টা

যাবৎ ক্রমাগত আন্দোলন ও বায়ুপূর্ণকরণের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এভাবে গলিত অবস্থায় গোল্ড সায়ানাইড (gold cyanide) গঠিত হয় এবং তারপর পরিশ্রুতকরণ বা একপাত্র থেকে আরেক পাত্রে ঢেলে ঢেলে আকরিকের নিকৃষ্ট অংশ পৃথক করে উঠিয়ে ফেলা হয়। তারপর এটা একটি শূন্য প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করিয়ে বায়ুশূন্য করা হয়। সোনাকে তখন দস্তার চূর্ণ সহযোগে থিতান হয়, আর এই থিতানো দ্রব্যাদির মধ্যে সোনা ও কিছু পরিমাণ রূপা থাকে। এরপর যে দস্তা থেকে যায় তা সরিয়ে ফেলার জন্য দস্তাকে গলান হয়। ফলস্বরূপ সোনা-রূপা মিশ্রিত যে সংকর ধাতু (সাধারণত ৭০-৯০% সোনা-রূপা থাকে) পাওয়া যায় তা নাইট্রিক এ্যাসিড বা উত্তপ্ত ও গাঢ় সালফিউরিক এ্যাসিড দিয়ে পরিশোধন করা হয়। সালফিউরিক এ্যাসিড রূপাকে দ্রবীভূত করে, কিন্তু সোনাকে গলাতে পারে না (এই তরল পদার্থ হালকা হওয়ায় উপরে ভাসমান অবস্থায় থাকে এবং নিষ্কাশিত হয়ে যায়), অথবা গলিত ধাতুতে ক্লোরিন মিশ্রিত করে রূপাতে রূপান্তরিত করা এবং তারপর সিলভার ক্লোরাইড তৈরি হয় যা বর্জ্য হিসেবে সরিয়ে ফেলা হয়।

তথ্যসূত্র ঃ

1. World Book of Encyclopaedia, Vol. 6, England, pp. 555-570, 1966.
2. Mcgraw Hill, Encyclopaedia of Science and Technology, Vol. 6. p.260, 1971.

www.bjilibrary.com

١٩- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝

১৪ ঃ ১৯ তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথা নিয়মে সৃষ্টি করেছেন? তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনতে পারেন.

সত্যের উপর জগত সৃষ্টি

এই বিশ্বজগত সুস্পষ্টভাবে সত্য বলে ঘোষণা করে যে আল্লাহ তা'আলা নির্ভুলতার সাথে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আমরা এই সত্যকে সকল সৃষ্টির ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।

এটা উল্লেখ করা বেশ চমকপ্রদ যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সত্যকে খুঁজে বের করা যে জন্য পবিত্র কুরআনে বারবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্পষ্টতই 'তাফাক্কুর' অর্থাৎ প্রকৃতির বিধানাবলি নিয়ে গভীর চিন্তা ও তাদের উন্মোচন প্রত্যেক মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক। বিজ্ঞানের ইতিহাস এই সত্য প্রতিপাদন করে যে মানুষ যখন প্রকৃতির গোপন রহস্য উন্মোচন করতে পেরেছে তখন জীবন্ত ও জড় পদার্থের নিয়ন্ত্রণকারী বিধানসমূহ অবলোকন করে সে চমৎকৃত ও বিস্মিত হয়েছে। এই বিধানাবলি সত্যের বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয় যা আল্লাহ্র সকল সৃষ্টিকে পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে। এই সত্যের অর্থ হতে পারে পদার্থের সকল বৈশিষ্ট্য যথা গঠন, আকার, অভ্যন্তরীণ গঠন কাঠামো, রঙ, বস্তু বিশেষের গন্ধ ও অন্যের সাথে এর মিথষ্ক্রিয়া প্রভৃতি প্রকাশ করে দেওয়া। এর আরও অর্থ হতে পারে যে বস্তুর গঠনে নিয়ম যে কাজ করে অথবা বস্তুর অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় অনুপাত কিংবা প্রকৃতির বাস্তববিদ্যার প্রেক্ষাপটে একটি বস্তুর সাথে অন্য আরেকটি বস্তুর অনুপাত সম্পর্কে মানুষ প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্যের কিছুটা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। যত বেশী সত্যের আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে ততবেশী সে স্রষ্টার ও তাঁর শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলতার শক্তি ও সহনীয়তা সম্পর্কে বুঝতে পেরেছে। অপর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হচ্ছে এই যে প্রকৃতিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে যাতে মানুষের অস্তিত্ব টিকে থাকা সম্ভবপর হয়। তাই আল্লাহ্ শুধুমাত্র জড় পদার্থ বা জীবন্ত প্রাণী তাঁর সত্যের আওতায় সৃষ্টি করেননি এবং যে সত্য তাদের বিন্যাসের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত, তিনি এই সত্যকে মানবজাতির কল্যাণ ও সুবিধা প্রদানের জন্যও দান

www.bjilibrary.com

করেছেন। অতএব, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে তাঁর সৃষ্টির সত্যানুসন্ধানে নিজকে পরমানন্দে ব্যাপৃত রাখবে।

٣٢- اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ
الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ
وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ۝

১৪ ঃ ৩২ তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তার দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, যিনি জলযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তাঁর বিধানে তা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদী সমূহকে।

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে আয়াত ২ ঃ ১৬৪ ও পরিশিষ্ট ১ ও ২-এ আলোচনা করা হয়েছে।

আকাশ থেকে বৃষ্টির বর্ষণ

কীভাবে বৃষ্টিবাহিত মেঘদল (cumulo-nimbus clouds) আকাশে গঠিত হয়, বর্ষণের আকারে কীভাবে বৃষ্টির ফোটা পৃথিবীতে নেমে আসে, কীভাবে বৃষ্টির পানি মৃত পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার করে উষর ভূমিকে উর্বর করে তোলে এবং পৃথিবীতে উদ্ভিদ জীবনকে কীভাবে বাঁচিয়ে রেখে বিভিন্ন প্রকার ফসল ও ফলাদি উৎপন্ন করে তা সবই ২ ঃ ২২ ও ২ ঃ ১৬৪নং আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

খাদ্য হিসাবে ফলের উৎপাদন

উদ্ভিদ কোষের কার্যক্রমে পানির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে যা পরিণামে ফল উৎপাদনের কাজে লাগে, তা ২ ঃ ২২ নং আয়াতে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষের কল্যাণে নদীর ব্যবহার ও জাহাজের জলপথে পরিক্রমণ

আয়াতের এই অংশে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের মাধ্যমে আল্লাহ্ মানুষের কল্যাণে জাহাজ তৈরি করিয়েছেন এবং তিনি নদীসমূহকে মানুষের ব্যবহারের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

www.bjilibrary.com

আয়াত ২ ঃ ১৬৪-এর প্রসংগে সমুদ্র ও নদীতে জাহাজ ও নৌকা চলাচলের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

ভূপৃষ্ঠে সৃষ্ট বিভিন্ন গিরিখাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত স্বাভাবিক জলপ্রবাহ হচ্ছে নদী এবং নদীসমূহ নিজেরাই তাদের চলার পথ তৈরি করে নিয়েছে। নদী তার বিভিন্ন শাখানদী, উপনদী এবং পানি ধারণক্ষম এলাকা বা অববাহিকার মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন করে। ফলস্বরূপ এই দাড়ায় যে বৃষ্টি ও বরফ থেকে পানি নদী, গিরিখাত ও অববাহিকার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে নিচের দিকে নেমে যায়। উঁচু ভূমি থেকে নিচু ভূমির দিকে পানি প্রবাহের এই চলার পথে খাতগুলো পানিপূর্ণ হয়ে নিচে প্রবল স্রোতের সৃষ্টি করে এবং ক্রমান্বয়ে বড় আকার ধারণ করে। তারপর এই প্রবাহিত পানির ধারা নিজেই নিজের পথ তৈরি করে নিয়ে একটি সমন্বিত পানির নেট-ওয়ার্ক সৃষ্টি করে। যদি কোন বৃষ্টি বা বরফ না থাকত, অথবা ভূপৃষ্ঠ যদি সমুদ্র পৃষ্ঠের এক সমতলে অবস্থিত হত কিংবা তাপমাত্রা যদি হিমাংকের নিচে নেমে যেত তাহলে নদীর কোন অস্তিত্ব থাকত না।

একটি নদী যে পরিমাণ পানি ধারণ করে তা নির্ভর করে কী পরিমাণ বৃষ্টি এর অববাহিকায় বর্ষিত হয়ে জলস্রোত তৈরি করছে তার উপর। গড়ে মোট বৃষ্টিপাতের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ মাত্র প্রবাহিত হয় এবং অবশিষ্ট পানি বাষ্পীভবন ও উদ্ভিদাদির মাধ্যমে বাষ্পাকারে নষ্ট হয়ে যায়।

প্রবাহিত পানির পরিমাণ ও দ্রুততার সাথে নিঃসরণ ভূ-সংস্থান ও ভূপৃষ্ঠের উঁচু নিচু অবস্থার দ্বারা খুব বেশী প্রভাবান্বিত হয়। প্রচন্ডবেগে পানি নিচে নেমে যাওয়ার বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে খাড়া ঢল ও অপ্রবেশ্য ভূখন্ড পানির দ্রুত নিঃসরণকে সহযোগিতা করে এবং জলস্রোতের ধারা ঐ সকল এলাকায় দ্রুততার সাথে তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে। প্রবেশযোগ্য ভূখন্ডে পানির প্রচন্ড প্রবাহ মাটিতে শোষিত হওয়ার ফলে বাষ্পীভবনে পানির হ্রাস হয়ে যাওয়া কমে যায়। অবশেষে ভূগর্ভস্থ পানি বিভিন্ন ঝর্ণার মাধ্যমে নদীর স্রোতের সাথে গিয়ে মিলিত হয়।

একটি নদীর পানির মোট নির্গমন হচ্ছে কোন জলপথের আড়াআড়িভাবে ছেদনকৃত আরেকটি জলপথ থেকে প্রবাহিত পানির মোট পরিমাণের সমান। প্রতি সেকেন্ডে ঘনফুট হিসাবে পানি নির্গমনের সময়ের ইউনিট নির্ধারণ করা হয়।

কোন একটি জলস্রোতের নির্দিষ্ট কোন স্থানে সময়ে সময়ে পানি নির্গমনের বিভিন্নতা দেখা যায় এবং এটা নির্ভর করে অববাহিকাতে দ্রুত বৃষ্টির বর্ষণ ও বর্ষণকৃত বৃষ্টির নিচের দিকে প্রবাহিত হওয়ার উপর।

www.bjilibrary.com

নদীর তলদেশে পলি পড়তে শুরু করে যখন নির্দিষ্ট আকারের ক্ষুদ ক্ষুদ্র বস্তুকে চালনা করার সর্বনিম্ন পরিমাণ গতি নদীর স্রোতে না থাকে। যখন নদীর পানি উপচিয়ে পড়ে অর্থাৎ প্লাবিত হয় তখন নদীর বিস্তৃত হওয়ার কারণে স্রোতের বেগ কমে যায়। ফলে নদীর পানিবাহিত বস্তু নিচে পড়তে থাকে। পক্ষান্তরে অস্বাভাবিকভাবে সংঘটিত বড় বড় বন্যা উর্বর ও উন্নত জমির গ্রহণযোগ্যতা কমিয়ে দেয়। কারণ, বন্যা-প্লাবিত ভূমিতে প্রচুর বালু পড়ে জমি অনুর্বর করে দেয়।

যে নদীতে ভূমিক্ষয় ও পলিমাটি জমার মধ্যে একটি ভারসাম্য থাকে তাকে একটি নির্দিষ্ট গ্রেডভুক্ত করা বা সমভার অবস্থার বলে বলা হয়ে থাকে। গ্রেডভুক্তির এই ধারণা এই অর্থ প্রকাশ করে যে, পানি নির্গমনের আকার অথবা ধারণ ক্ষমতার কোন পরিবর্তন সাধিত হ'লে তা নির্গমনের পথ তথা নদীর আয়তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয় এবং সম্ভবত এই পরিবর্তনকে মানিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে নদীর ঢালও কাজে লাগে।

নদীর খাতের বাহ্যিক গঠনে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় কাজ করে, (১) নদীর স্রোত ধারার একটি সোজাপথ থেকে সরে আসার পরিমাণ, ও (২) বহু খাতে প্রবাহিত স্রোতধারার বিপরীতে একটি একক খাতে প্রবাহিত পানির পরিমাণ।

সরলরেখার মত সোজাসুজি বয়ে যাওয়া নদী বিরল। এর পরিবর্তে, অধিকাংশ স্রোতধারা কম বেশী এঁকে বেঁকে চলে। খুব বেশী আঁকা বাঁকা গতির নদীকে সর্পিল গতির নদী বলে এবং এর এক একটি বাঁককে সর্পিল বাঁক নামে অভিহিত করা হয়। এরূপ ধরনের নদীর উদাহরণ হচ্ছে তুরস্কের মিয়ানডার নদী (Meander River)। নদীর তীর যখন পানিতে পূর্ণ থাকে তখন নদীর পানি নির্গমণের আকার অনুযায়ী নদীর সর্পিল বাঁকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও প্রশস্ততার ব্যত্যয় ঘটে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন হয়। এটা সঠিকভাবে জানা যায় না যে নদী বাঁক খায় কেন। কিন্তু একবার বাঁক খাওয়া শুরু করলে এই বাঁক খাওয়ার প্রবণতা চলতেই থাকে। নদীর পাশাপাশি বাঁকগুলো একত্রে মিশে গেলে তা বাঁক বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং নদীর দৈর্ঘ্য কমিয়ে দিয়ে বলদের গলায় পরানর হাঁসুলি আকারের হ্রদে (oxbow lake) পরিণত করে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যম হিসেবে নদীর প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। এই কিছুদিন আগেও অধিকাংশ আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য নদীপথের মাধ্যমে সম্পাদিত হ'ত। নদী সন্নিহিত উপত্যকা সাধারণত ঘনবসতিপূর্ণ হয়। কারণ, সেখানে উর্বর ভূমি, সমতল ভূখন্ড ও মালামাল পরিবহনে কিছু সহজাত সুবিধা থাকে।

www.bjilibrary.com

মানুষের ঘরের কাজে ও শিল্পে বেশ বড় ধরনের পানির সরবরাহ নদী থেকেই সংগৃহীত হয়ে থাকে। নদীর পানি আটকে বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন বড় বড় অঞ্চলের অর্থনীতিকে দারুণভাবে পরিবর্তন করে দিয়েছে। নদীর প্লাবন ভূমি হিসেবে সকল কৃষিকাজের উপযুক্ত জমিতে সবচেয়ে বেশী ফসল উৎপাদিত হয়। অনেক উন্নত দেশের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ চাহিদার অধিকাংশই পানির শক্তি থেকে উৎপন্ন হয়। যদিও নৌ চলাচল ও বিদ্যুৎ শক্তি নদীর অধিকতর আয়ত্তসাধ্য বিষয়, তবুও গৃহকাজে ও শিল্পে ব্যবহারের জন্য পানির ব্যবহার সম্ভবত নদী থেকে আহরিত অর্থনৈতিক সুবিধার শীর্ষে অবস্থান করবে। নদীর পানিতে এক বিপুল সংখ্যক জলজ প্রাণী থাকে যেমন মাছ, শামুক, চিংড়ি, কাকড়া, গলদা চিংড়ি ইত্যাদি। শরীরে প্রোটিনের চাহিদা মেটানর জন্য এসব প্রাণীজ সম্পদ প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া শিল্প পণ্য উৎপাদনেও তাদের ব্যবহার হয়।

সাম্প্রতিককালে জনসংখ্যার বিপুলতায় এবং অর্থনৈতিক চাহিদার কারণে নদীর ন্যায় পানি সম্পদের প্রয়োজনীয়তা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই পানি সংরক্ষণকল্পে নদীর উপর বাঁধ দেওয়ার দরকার হয়ে পড়েছে। নদীর বিপুল জলরাশিকে সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে নদীর উপর বাঁধ নির্মিত হচ্ছে যাতে সেচ কাজে, বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে, বন্যা নিয়ন্ত্রণে, নৌচলাচলে, জনস্বার্থে পানির সরবরাহে, শিল্পকাজে ও চিত্তবিনোদনে পানির যথোপযুক্ত ব্যবহার হয়। কোন কোন বাঁধ উপরোক্ত মাত্র দু'একটি উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ বড় বড় বাঁধ বহুবিধ উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়ে থাকে।

পয়ঃনিষ্কাশনের জন্যও সাধারণত নদীর ব্যবহার হয়ে থাকে। সম্প্রতি দেখা গিয়েছে যে অনেক শিল্পোন্নত দেশ তাদের শিল্প বর্জ্য নদীতে নিষ্কাশন করছে, এর ফলে মারাত্মক পরিবেশগত বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

নদীতে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী রয়েছে যা খুব কমই ভেসে ওঠে ও স্রোততাড়িত হয়। এসবের কার্যকর চলাচল কখনও নির্দেশমূলক হয় না। এ সকল অতি ক্ষুদ্র জলজ প্রাণী প্লাংকটন (plankton) নামে পরিচিত।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Encyclopaedia Britannica, Vol. 15, pp. 867-891, 1978.

٣٣- وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝

১৪ ঃ ৩৩ তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে।

অত্র আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ সূর্য, চন্দ্র, দিন ও রাতকে তাঁর নির্ধারিত বিধান মেনে চলতে এবং এভাবে মানুষের উপকারে আসতে বাধ্য করেছেন। কুরআনের ৭ ঃ ৫৪ আয়াতে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কোন কোন মুফাস্সির আয়াতটির অনুবাদ করেছেন এভাবে "তিনি সূর্য, চন্দ্র, রাত ও দিনকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন।" বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। চন্দ্র ও সূর্যের মত মহাবিশ্বের বস্তুসমূহ কিংবা দিন ও রাতের মত প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ কখনই মানুষের অধীন থাকে না। এরা শুধুমাত্র আল্লাহ্রই অধীন। তারা আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী নিজ নিজ পথে চলে এবং তাঁরই পরিকল্পনা মাফিক মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকে।

٤٨- يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝

১৪ ঃ ৪৮ যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হবে এবং আকাশমন্ডলী এবং মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহ্র সম্মুখে, যিনি এক, পরাক্রমশালী।

অত্র আয়াতে পৃথিবী ও মহাবিশ্বের যে পরিবর্তনের কথা উল্লিখিত হয়েছে, তা হাশর তথা রোজ কিয়ামতের প্রাক্কালে যে অবস্থা বিরাজ করবে সে সম্পর্কিত। বর্তমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে নিম্নে আলোচিত পৃথিবী ও মহাবিশ্বের তিনটি সম্ভাব্য পরিবর্তনের কথা চিন্তা করা যায়।

পৃথিবী আজ যেমন আছে অতীতেও তেমন ছিল না, ভবিষ্যতে তেমন থাকবে না। যুগ যুগ ধরে অবিরাম পরিবর্তিত হয়ে চলেছে পৃথিবী। আকাশমন্ডলী তথা মহাবিশ্বের ব্যাপারেও একই কথা খাটে।

এক হাজার বা দু'হাজার কোটি বর্ষ আগে কোন পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য কিংবা কোন তারকা বা ছায়াপথের অস্তিত্ব ছিল না। ছিল শুধুমাত্র একটি অতি ক্ষুদ্র, অতি ঘন, অতি উত্তপ্ত আদিযুগীয় অগ্নিগোলক যার মধ্যে ছিল মহাবিশ্বের সমস্ত পদার্থ ও শক্তি। অগ্নিগোলকটি প্রচন্ড শব্দে বিস্ফোরিত হয় এবং দ্রুত

www.bjilibrary.com

সম্প্রসারণশীল এবং শীতলায়মান প্রোটন, ইলেক্ট্রন ও নিউট্রন গ্যাসে পরিণত হয়। সময়ে, এই গ্যাসগুচ্ছ ছায়াপথ গঠন করে। এ সকল ছায়াপথ পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে দূরে সরে যেতে থাকে। একই সাথে প্রতিটি আলাদা ছায়াপথের ভিতরকার পদার্থ মাধ্যাকর্ষণ বলজনিত কারণে সঙ্কুচিত হতে থাকে। কিছুকাল পরে, আলোড়ন সৃষ্টিকারী গতি সঙ্কোচনশীল ছায়াপথকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদে পরিণত করে যা শেষ পর্যন্ত নীহারিকাপুঞ্জ গঠন করে। এ ধরনেরই একটা ছোট্ট বস্তুই হচ্ছে সৌর নীহারিকা। মাধ্যাকর্ষণজনিত কারণে যতই এটা সঙ্কুচিত হতে থাকে ততই দ্রুততর বেগে ঘূর্ণন করতে থাকে। এভাবেই সঙ্কোচনশীল নীহারিকা আরো বেশী সঙ্কুচিত হতে ও দ্রুততর বেগে ঘুরতে থাকলে এগুলো কিছু কিছু পদার্থের ফুটকি বা বুদবুদ ছেড়ে দেয় যেগুলো শেষ পর্যন্ত গ্রহের আকার ধারণ করে, আমাদের পৃথিবী এ ধরণেরই একটি গ্রহ। আর এভাবেই জন্ম গ্রহণ করে আমাদের এই পৃথিবী।

জন্মকালে পৃথিবী ছিল একটা উত্তপ্ত গোলাকার গ্যাসের ফুটকি বা বুদবুদ। শীতল হতে থাকলে এর উপরিতলে একটা ত্বক বা স্তর গঠিত হয়। এভাবে, ঐ সময়ে পৃথিবীতে ছিল একটি মাত্র বিশাল মহাদেশ যাকে আজ বলা হয় প্যাঙ্গিয়া (Pangaea)। আর ছিল একটি মাত্র মহাসাগর যাকে বর্তমানে প্যান্থালোসা (Panthalossa) নামে নামকরণ করা হয়। কিছুকাল পর, এই বিশাল মহাদেশ দু'টুকরো হয়ে দু'টি সুপার মহাদেশে পরিণত হয় যাকে বর্তমানে লরেসিয়া (Laurasia) এবং গন্ডওয়ানাল্যান্ড (Gondwanaland) নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। ভূতাত্ত্বিক গঠন প্রক্রিয়ার কারণে এ দু'টি সুপার মহাদেশ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে বেশ কয়েকটি ভূ-ভাগে পরিণত হয় যাতে মহাদেশীয় সম্প্রবাহের ফলে পৃথিবী তার বর্তমান আকার আকৃতি ধারণ করে। ভূতাত্ত্বিক গঠনশৈলী এবং মহাদেশীয় সম্প্রবাহ চলতে থাকলে পৃথিবীর বর্তমান কাঠামো একদিন পরিবর্তিত হয়ে নতুন কাঠামো গড়ে উঠবে। এভাবে পৃথিবী ভৌগোলিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে নতুন এক পৃথিবীতে রূপান্তরিত হবে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূত্রানুযায়ী পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে যাবে। ছয়শ' কোটি বছরের মধ্যে সূর্য একটা রক্তিম দৈত্যাকার তারকায় রূপান্তরিত হবে এবং পৃথিবী বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। সূর্যের এই লাল দৈত্যাকার অবস্থার স্থায়িত্বকাল কয়েকশ' মিলিয়ন তথা প্রায় শত কোটি বছরের মত হতে পারে বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। দীর্ঘতম আকার ধারণ করা অবস্থায় সূর্যের উপরিতল বুধ ও শুক্রের কক্ষপথ গিলে ফেলবে এমনকি তা পৃথিবীর কক্ষপথ পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে। পৃথিবী যদি ঐ অবস্থা পর্যন্ত টিকে থাকে তাহলে পৃথিবী জ্বলে পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাবে।

www.bjilibrary.com

পৃথিবীর জীবমন্ডলেও পরিবর্তন আসবে। পৃথিবী পৃষ্ঠে জীবনের আবাসভূমি এই জীবমন্ডল, ভূত্বক, মহাসাগরসমূহ এবং বায়ুমন্ডল নিয়ে গঠিত। পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে এখন থেকে সাড়ে তিনশ' কোটি বছর পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব ছিল না। এরপর প্রথমে এককোষী জীবের উদ্ভব ঘটে। ক্রমে আদিমযুগীয় জলজ উদ্ভিদ এবং অমেরুদন্ডী প্রাণীর আবির্ভাব হয়। তারপরই আসে মেরুদন্ডী প্রাণী আর উভচর প্রাণীকুল। ডাইনোসরের মত বিশালদেহী সরীসৃপ পনের কোটি বছর পৃথিবীতে আধিপত্য করে। শেষতক আবির্ভাব ঘটে মানব প্রজাতির যারা এখনও ভূ-পৃষ্ঠের উপর সর্বোচ্চ আধিপত্য বিস্তার করে যাচ্ছে। সূর্য বিশাল রক্তিম দৈত্যাকার পর্যায়ে পৌঁছলে পৃথিবীর জীবমন্ডল অদৃশ্য হয়ে যাবে। এভাবে পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে নতুন এক রূপ ধারণ করবে।

এবার আকাশমন্ডলীর পরিবর্তন বিবেচনা করা যাক। এটা একটা ব্যাপকভাবে গৃহীত সত্য যে, মহাবিশ্বের দু'টি বিপরীতধর্মী বল কাজ করছে। এর একটা বিকিরণ চাপে সৃষ্ট আর অপরটি মাধ্যাকর্ষণজনিত সংকোচণের কারণে জন্ম লাভ করেছে। কাজেই এ দু'টি বলের মধ্যে ভারসাম্যই নির্ধারণ করে মহাবিশ্বের অবস্থা, অর্থাৎ মহাবিশ্ব এখনকার মত অনির্দিষ্টকাল ধরে সম্প্রসারিত হতে থাকবে কিনা।

সম্প্রসারণের হার হ্রাস পেতে পারে কিংবা শূন্যের কাছাকাছি নেমে আসতে পারে, তথাপি পৃথিবী উন্মুক্ত (তথা সম্প্রসারমান) থেকে যাবে। কিংবা পরিবর্তিত অবস্থায় সম্প্রসারণ বন্ধ হয়ে যাবে। সঙ্কোচণ প্রভাবশালী হবে এবং মহাবিশ্ব নিজে নিজে ধ্বংস হয়ে উচ্চ ঘনত্বের অন্য একটা অবস্থায় গিয়ে উপনীত হবে। সম্প্রসারণ ঠেকানোর মত মহাবিশ্বের যদি যথেষ্ট পদার্থের অভাব ঘটে, তাহলে ছায়াপথগুলো পরস্পর থেকে আরো দূরে চলে যাবে এবং মহাবিশ্বের একক প্রতি শক্তির পরিমাণ একটানা কমতেই থাকবে। এর পরিণতিতে অবস্থা দাঁড়াবে সকল বস্তুর হিম শীতল মৃত্যু যাতে তাপমাত্রা শূন্যের কাছাকাছি চলে আসবে। বিপরীত পক্ষে, মহাবিশ্বের ঘনত্ব যদি যথেষ্ট বেশী থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে সম্প্রসারণ সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে যাবে এবং তখন মহাবিশ্ব সংকুচিত হয়ে উচ্চ ঘনত্বের অপর এক একক অবস্থায় পরিবর্তিত হবে (বিস্তারিত জানার জন্য পরিশিষ্ট-৩ দেখুন)। উপরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় পরিবর্তন সম্পর্কে যে আলোচনা পেশ করা হল তা কুরআনে প্রকৃত ইঙ্গিতের সাথে উত্তমভাবে মিলে যায়।

www.bjilibrary.com

١٦- وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَّزَيَّنَّٰهَا لِلنَّٰظِرِينَ ۝

১৫ : ১৬ আকাশে আমি গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং তাকে করেছি সুশোভিত দর্শকদের জন্য।

সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর বার্ষিক গতির কারণে সূর্য বছরে একবার আকাশ পূর্ণরূপে প্রদক্ষিণ করে বলে মনে হয়। পৃথিবীর চারদিকে সূর্যের এই বার্ষিক আপাত পরিক্রমণ পথ একটা বিশাল বৃত্ত তৈরি করে যা ক্রান্তিবৃত্ত হিসেবে পরিচিত।

বিষুব রেখার চারদিকে ক্রান্তিরেখার উভয় পার্শ্বে ৯° ডিগ্রী বিস্তৃত যে বন্ধনীর মত এলাকা চলে গেছে তাকেই বলা হয় রাশিচক্র। দৃশ্যত এতে আছে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহসমূহের বার্ষিক পরিক্রমণ পথ। সকল সভ্যতায় এই বন্ধনীকে বারোটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রতিটি ভাগই ৩০° ডিগ্রী প্রশস্ত। প্রতিটি অংশেই তারকাসমূহ একত্রে স্থাপিত হলে রাশিচক্রের চিহ্ন নামে পরিচিত ছবি তৈরি করে বলে অনুমান করা হত।

বারোটি রাশির চিহ্ন

ক্রম	গ্রীক	বাংলা	আরবী
১.	এরিজ	মেষ রাশি	হামাল
২.	ট্যরাস	বৃষ রাশি	ছাউর
৩.	জেমিনি	মিথুন রাশি	জাওযা
৪.	ক্যানসার	কর্কট রাশি	সার্তান
৫.	লিও	সিংহ রাশি	আসাদ
৬.	ভারগো	কন্যা রাশি	আয্রা
৭.	লিব্রা	তুলা রাশি	মিযান
৮.	স্করপিও	বৃশ্চিক রাশি	আকরাব
৯.	স্যাগিটারিয়াস	ধনু রাশি	কাউস
১০.	ক্যাপ্রিকরনাস	মকর রাশি	জেদ্দি
১১.	একুয়ারিয়াস	কুম্ভ রাশি	দাল্ওয়া
১২.	পিসিজ	মীন রাশি	হুত

অত্র আয়াতটিতে 'যাইয়্যান্না'র অনুবাদ করা হয়েছে সুদর্শন। যাইয়্যান্না শব্দটি 'তাযীন' শব্দ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে যার মূলগত অর্থ সাজান, বা অলঙ্কৃত

www.bjilibrary.com

করা। কাজেই, যাইয়্যান্নাহা লিন্নাযিরিন অর্থ আমরা দর্শকদের জন্য একে (আসমান) সাজিয়েছি। আসমানকে দীপ্তিমান বস্তু দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে যেগুলো শুধুমাত্র রাতেই দৃষ্টিগোচর হয়। পৃথিবীতে কোন বিশেষ উৎসব উপলক্ষে স্বাভাবিক গতানুগতিক সাজসজ্জা বহু দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। রাত্রিকালীন আকাশের বিশালতা ও চমৎকারিত্ব তারাই যথাযথভাবে উপলব্ধি করেন যারা উপলব্ধি করার ক্ষমতা রাখেন, যদি তা প্রতি রাতের ঘটনা না হয়ে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে হত।

١٩- وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ○

১৫ ঃ ১৯ পৃথিবীকে আমি বিস্তৃতি করেছি এবং তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি, আমি তাতে প্রত্যেক বস্তু উদ্গাত করেছি সুপরিমিতভাবে।

পৃথিবীর বিস্তার

বিষয়টি ২ ঃ ২২ এবং ১৩ ঃ ৩ আয়াতদ্বয়ের আলোচনা উপলক্ষে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

পর্বতমালা স্থাপন

বিষয়টি ১৩ ঃ ৩ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে।

সুপরিমিতভাবে বস্তুর সৃষ্টি

বিষয়টি ১৩ ঃ ৮ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

٢١- وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ○

১৫ ঃ ২১ আমারই নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর অনিঃশেষযোগ্য ভাণ্ডার এবং আমি তা পরিমিত পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি।

এ আয়াতের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে, যথা- ১. আমাদের চারপাশে যা কিছু ধনদৌলত বা সম্পদ আমরা দেখি সেগুলোর ভাণ্ডার রয়েছে আল্লাহ্‌র নিকট, ২. এ সকল সম্পদ তিনি আমাদের নিকট পাঠান প্রয়োজনানুযায়ী, এবং ৩. তিনি এ সবকিছু পাঠান বিধান ও পরিকল্পনানুযায়ী। এ সকল বিষয়ে আল্লাহ্‌র দাবিসমূহ

প্রথমে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয় না। কিন্তু গভীর অনুসন্ধানী চিন্তা এসবের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যকে স্পষ্ট করে তোলে।

প্রথম যে প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করা যায় তাহলো- পৃথিবীতে কোন্ জিনিসগুলোকে ধনদৌলত বিবেচনা করা উচিত। সোনা, রূপা এবং মূল্যবান রত্নাদি উচ্চ মূল্য হাঁকতে পারে, কিন্তু আমাদের বেঁচে থাকা ও অস্তিত্বের ধারাবাহিকতার জন্যে এগুলোর প্রয়োজন নেই বিধায় এগুলোকে দৌলত-সম্পদ বিবেচনা করা যেতে পারে না। এই দৃষ্টিতে পানি, খাদ্য এবং শক্তিই হচ্ছে প্রকৃত সম্পদ যা জীবনের টিকে থাকা ও উন্নতির জন্য একান্ত অপরিহার্য। এই পটভূমিতে অত্র আয়াতের তাৎপর্য অনুধাবন করা অনেক সহজ হয়ে যায়। সমস্ত শাক-সব্জি জাতীয় খাদ্য যা সালোক সংশ্লেষণের কারণেই পাওয়া সম্ভব। এটি এমন এক প্রক্রিয়া যাতে ক্লোরোফিল নামক উদ্ভিদের সবুজ তন্তুরঞ্জক সূর্যালোকের সাহায্যে পানি থেকে প্রাপ্ত শর্করা এবং বায়ু থেকে প্রাপ্ত কার্বন ডাইঅক্সাইডের মধ্যে সংশ্লেষণ ঘটায়। আমাদের আমিষের প্রধান উৎস ভেড়া, ছাগল, গরু, উট এবং অন্যান্য জীবজন্তু সব্জি জগতের উপরেই বেঁচে থাকে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সূর্যতাপে বিপুল পরিমাণ সাগরের পানি বাষ্পাকারে আকাশে জমা হয় যা মেঘ আকারে বায়ুতাড়িত হয়ে স্থলভাগে চলে আসে। এই মেঘ আবার স্থলভাগ ও সাগরে সূর্য কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় তাপ প্রদানের কারণে সৃষ্ট পার্থক্যের দরুন পানিতে পরিণত হয়। মেঘ থেকে বারি বর্ষণ এবং পাহাড়চূড়াস্থ বরফের স্তর গলে যাওয়ায় সৃষ্টি হয় মিঠা পানির উৎস। জলীয় বাষ্প বায়ু দ্বারা তাড়িত হয়ে পাহাড় চূড়ায় পৌঁছলে সেখানে ঠান্ডার প্রভাবে ঘনীভূত হয়ে বরফের স্তর সৃষ্টি হয়। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, জীবনকে টিকিয়ে রাখার সকল প্রক্রিয়ারই মূলে রয়েছে সূর্য থেকে বিকিরিত বিপুল পরিমাণ শক্তি।

সূর্য তাপাণবিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত বিপুল পরিমাণ তাপ শক্তি প্রেরণ করে পৃথিবীতে। প্রতি সেকেন্ডে প্রায় বিয়াল্লিশ লক্ষ মেট্রিক টন সৌর পদার্থ তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং এই হারে পদার্থক্ষয় অব্যাহত থাকলে সূর্য দশ হাজার কোটি বৎসরাধিককাল ধরে তাপ ও আলো বিকিরণ করবে বলে ধরে নেয়া যায়। আরো বিস্তারিত এবং সৌর তৎপরতার বিধান ও মহাপরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে হলে ৭ ঃ ৫৪ আয়াতের আলোচনা দেখা যেতে পারে।

পৃথিবী যে পরিমাণ সৌর শক্তি গ্রহণ করে তা সকল জীবকে টিকিয়ে রাখার প্রক্রিয়াসমূহ বজায় রাখার ক্ষেত্রে এক অদ্ভুত ভারসাম্য রক্ষা করে। যদি অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ তাপ বিকিরিত হত তাহলে এ গ্রহটি অধিকতর শীতল

www.bjilibrary.com

হত এবং আমাদের পক্ষে জীবন ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ত। অনুরূপভাবে অত্যধিক শক্তির বিকিরণ পুরো গ্রহটিকে একটি বালির স্তুপে পরিণত করত।

মাটির নিচে আটকে পড়া সমস্ত জীবাশ্ম এবং হাইড্রোকার্বন (তেল ও গ্যাস) শক্তিসমূহ সৌর শক্তির কার্যক্রম দ্বারাই উৎপাদিত হয়েছে। বিদ্যুতের চমক . বায়ুতে উৎপাদিত হয়েছে। বিদ্যুতের চমকানি বায়ুতে নাইট্রোজেন থেকে নাইট্রাইডসমূহ তৈরি করে আর বৃষ্টির পানি এগুলোকে দ্রবণ আকারে মাটিতে নিয়ে আসে যা উদ্ভিদ কর্তৃক সার হিসেবে ব্যবহারযোগ্য।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাকৃতিক জগতের কর্মকান্ড সম্পর্কে আমরা যা জানতে পারি তা দ্বারা সত্যিই আমরা আলোচ্য আয়াতটিকে পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে পারি।

٢٢- وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ
وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ○

১৫ ঃ ২২ আমি বৃষ্টি গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, অতঃপর আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদেরকে পান করতে দেই; এর ভাণ্ডার তোমাদের নিকট নেই।

উর্বরতার অনুঘটক হিসেবে বায়ু প্রবাহের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে ৭ ঃ ৫৭ আয়াতের আলোচনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বায়ু এক পুরুষ ফুলের পরাগরেণু অন্য স্ত্রীপুষ্পের গর্ভমুন্ডে বহন করে নিয়ে পরাগায়নে সাহায্য করে থাকে।

বৃষ্টির পানি কিভাবে আকাশ থেকে নিচে নেমে আসে তা ২ ঃ১৬৪ আয়াতের আলোচনায় বলা হয়েছে।

٢٦- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ○

১৫ ঃ ২৬ আমি তো মানুষ সৃষ্টি করেছি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠন্‌ঠনে মৃত্তিকা হতে।

٢٨- وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ○

১৫ ঃ ২৮ স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাগণকে বললেন, আমি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠন্‌ঠনে মৃত্তিকা হতে মানুষ সৃষ্টি করছি।

www.bjilibrary.com

মানুষ সৃষ্টিতে নির্দিষ্ট আকার প্রদত্ত শুকনা ও কাদা মাটি কী ভূমিকা পালন করে সে বিষয়ে ৬ ঃ ২ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

٢٩- فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ○

১৫ ঃ ২৯ যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো।

বিষয়টি ১৩ ঃ ৮ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলোচিত হয়েছে।

٥٣- قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ○

٥٤- قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ○

٥٥- قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ ○

১৫ ঃ ৫৩-৫৫ তারা বলল, ভয় করো না। আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী পুত্রের শুভ সংবাদ দিচ্ছি।

সে বলল, তোমরা কী আমাকে শুভ সংবাদ দিচ্ছ আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ? তোমরা কী বিষয় শুভ সংবাদ দিচ্ছ ?

তারা বলল, আমরা সত্য সংবাদ দিচ্ছি। সুতরাং তুমি হতাশ হয়ো না।

এ সকল আয়াতে আল্লাহ্‌র নবী হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘরে তাঁর বয়োবৃদ্ধকালে এক পুত্র সন্তান জন্মের বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ফেরেশতাগণ এই সুসংবাদ দিলে হযরত ইবরাহীম (আ) বিস্মিত হন। তিনি অবাক হলেন এই ভেবে যে, তাঁর এরকম বয়োবৃদ্ধ অবস্থায় কী করে এটা সম্ভব হয়। ফেরেশতাগণ জওয়াবে বলেন যে, সংবাদটা আল্লাহ্‌র নিকট থেকেই এসেছে, অতএব এটা সত্য। অতঃপর ইবরাহীম (আ) তা বিশ্বাস করেন।

বয়োবৃদ্ধকালে সন্তান জন্মদানের বিষয়টি ইতিমধ্যে ৩ ঃ ৩৯-৪০ আয়াতে হযরত যাকারিয়ার (আ) ঘরে হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর জন্মের আলোচনাকালে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শতাধিক বছর বয়সেও সন্তান জন্মদানের বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে। আধুনিক জীববিজ্ঞানগত জ্ঞান অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সেও সন্তান জন্মদানের সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করে।

www.bjilibrary.com

৭৩- فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ○

৭৪- فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ○

৭৫- إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ○

৭৬- وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ○

৭৭- إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ○

১৫ ঃ ৭৩-৭৭ অতঃপর সূর্যোদয়ের সময়ে মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল এবং আমি জনপদকে উল্টিয়ে উপর-নিচ করে দিলাম এবং তাদের উপর প্রস্তর-কঙ্কর বর্ষণ করলাম। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য।

তা লোক চলাচলের পথিপার্শ্বে এখনও বিদ্যমান। অবশ্যই মু'মিনদিগের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

৭৩ ও ৭৪নং আয়াতে হযরত লূত (আ)-এর অনুসারীদের উপর তাদের অস্বাভাবিক যৌন আচরণের কারণে যে সকল ঘটনা ঘটেছিল সেদিকে ইঙ্গিত করে। আল্লাহ্ শাস্তি স্বরূপ তাদের উপর বিস্ফোরণ, ভূমিকম্প এবং প্রস্তরবৃষ্টি বর্ষণ করেন। ৭ ঃ ৮৪ এবং ৭ ঃ ৯১ আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিস্ফোরণ ও ভূমিকম্প বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১৫ ঃ ৭৬ আয়াতটি ঘটনাস্থল সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়। ৭ ঃ৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

৮৫- وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ۖ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ○

১৫ ঃ ৮৫ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করি নি। এবং কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং তুমি পরম সৌজন্যের সাথে তাদেরকে ক্ষমা কর।

পৃথিবী, আকাশমন্ডলী এবং এতদুভয়ের মাঝখানে যা কিছু রয়েছে সেগুলোর সৃষ্টি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ২ ঃ ১১৭ ও ১৬৪ আয়াতদ্বয় এবং পরিশিষ্ট-২ এ দেয়া হয়েছে। ৩ ঃ ১৯১ আয়াতে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে যে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রতিটি সৃষ্টিরই রয়েছে নির্দিষ্ট ভূমিকা। অনেক মুফাস্সির মনে করেন আয়াতটির শেষাংশ যেখানে বলা হয়েছে 'আর সেই সম-

www.bjilibrary.com

অবশ্যই আসছে' এর অর্থ এই সৃষ্টি জগতের ধ্বংস দিবস। যাহোক, এর আরেকটা সুদূরপ্রসারী ফলাফল এই হতে পারে যে, এমন একটা সময় আসছে যখন মানুষ প্রকৃতিতে বিদ্যমান পরিবেশগত ভারসাম্যসমূহ উপলব্ধি করতে পারবে এবং বুঝতে পারবে প্রতিটি আলাদা আলাদা সৃষ্টির যথাযথ উদ্দেশ্য। আজ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রকৃতিতে বর্তমান নানান সম্পদের উপর প্রচন্ড চাপ পড়েছে। মানুষ নজিরবিহীনভাবে গাছ কর্তন করে চলেছে তার জ্বালানী ও অন্যান্য গৃহস্থালী কাজের প্রয়োজনে। ফলে, বদ্বীপ অঞ্চলগুলোতে বন্যা আরো বেশী ক্ষতি করছে এবং আবহাওয়ার গতি-প্রকৃতি একেবারে অস্থির ও খেয়ালী হয়ে উঠেছে। বাছবিচারহীনভাবে জীবজন্তু ও গাছগাছালী ধ্বংস করা হচ্ছে। দ্রুত শিল্পায়নের ফলে বিপুল পরিমাণ বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদি তৈরি হচ্ছে যা মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করছে এবং অনেক ক্ষেত্রে বহু শিল্পোন্নত দেশ সামুদ্রিক বা জলজ জীবন ধ্বংস করে দিচ্ছে। জার্মানীর ব্লাক ফরেস্ট শিল্প-রাসায়নিক দ্রব্যাদির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিকগণ সম্প্রতি আবিষ্কার করেন যে, শিল্প কারখানা কর্তৃক উৎপাদিত সিএফসি গ্যাস আর্কটিক অঞ্চলে ওজোন স্তরের জন্য হুমকি হয়ে পড়েছে। ওজোন স্তর অতিবেগুনী রশ্মির ক্ষতিকারকতা থেকে পৃথিবীস্থ জীবনকে নিরাপদ রাখে। পাশ্চাত্যে প্রকৃতির সাথে মিলে মিশে বসবাসের আন্দোলন জোরদার হচ্ছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে পারমাণবিক বিস্ফোরণ প্রকৃতির জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে পড়েছে। রাশিয়া এবং ইউএসএ-তে কয়েকটি পারমাণবিক চুল্লিতে সংঘটিত দুর্ঘটনা জীবনের উপর মারাত্মক হুঁশিয়ারি ও হুমকি সৃষ্টি করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে আমরা বিভিন্ন জীব ও অনুজীব এবং তাদের পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতার উপকারী দিকসমূহ অবগত হচ্ছি (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ৩ ঃ ১৯১ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা)। বস্তুত সময় এসে উপস্থিত হলেই কুরআনের দাবী স্পষ্টরূপে প্রকাশ লাভ করে।

٨٦- إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۝

১৫ ঃ ৮৬ তোমার প্রতিপালকই মহা-স্রষ্টা, মহাজ্ঞানী।

আয়াতটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলছে যে, আল্লাহ্ই সুদক্ষ, সুনিপুণ সৃষ্টিকর্তা যিনি সর্বজ্ঞানী। আল্লাহ্ যে সর্বময় ও সুনিপুণ স্রষ্টা তা ইতিপূর্বে অন্যান্য আয়াতের আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, জগৎসমূহের অধিপতি এবং পালনকর্তা হিসেবে আল্লাহ্ই যে প্রধান পরিকল্পক এ বিষয়টি ১ ঃ২ আয়াতের আলোচনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ৩ ঃ ১৯১ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে

www.bjilibrary.com

যে, কোন কিছুই খামাখা সৃষ্টি করা হয়নি। ১৪ ঃ ১৯ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ কিছু কিছু জিনিস সৃষ্টি করতে পারলেও তা সত্যের উপর ভিত্তিশীল আল্লাহ্‌র বিশাল সৃষ্টি জগতের তুলনায় তেমন কিছু নয়। আর আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিন্দুমাত্র ত্রুটি থেকেও মুক্ত। আল্লাহ্‌ই সর্বসেরা সৃষ্টিকর্তা।

٣- خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

১৬ ঃ ৩ তিনি যথাযথ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।

এ আয়াত বলছে যে, আল্লাহ্‌ যথাযথ উদ্দেশ্যে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আমরা যদি শব্দটির শুধু অর্থ করি 'খেলাচ্ছলে নয়' কিংবা 'উদ্দেশ্যবিহীন নয়', তাহলে এ আয়াতের অর্থ দাড়ায় ৩ ঃ ১৯১ আয়াতের মতই যেখানে আল্লাহ্‌ চান যে মানুষ তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করুক এবং দেখুক যে আল্লাহ কোন কিছুই অযথা সৃষ্টি করেননি। পরবর্তী আয়াতটি জীব ও জড় বস্তুর গঠন প্রকৃতি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে যাতে বিধানগত ঐক্য এবং পর্যবেক্ষণকৃত জীবদেহসমূহের অস্তিত্বের প্রতি বাস্তব্য বিদ্যা সংক্রান্ত প্রভাবের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দেখা যায় যে, জ্ঞানের শাখা-প্রশাখা দ্রুত বিস্তৃতি লাভের সাথে সাথে বিজ্ঞানীগণ সৃষ্টি জগতে এক মহাপরিকল্পনার অস্তিত্ব আবিষ্কার করছেন। এক মহানিয়ন্ত্রকের দ্বারা প্রকৃতির শক্তিসমূহ সংগঠিত না হলে জীবন ও বস্তু আমরা যেভাবে জানি সেভাবে টিকে থাকতে পারত না।

٤- خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ○

১৬ ঃ ৪ তিনি (আল্লাহ) মানুষকে একটি ফোটা থেকে সৃষ্টি করেছেন অথচ সে এখন স্পষ্ট তর্ক বিতর্কে লিপ্ত।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানব শিশু এক বিন্দু জলীয় পদার্থ থেকে সৃষ্ট। আয়াতের নুতফাতিন শব্দের অর্থ সাধারণভাবে পুরুষের শুক্রকে ধরা হয়। কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ ফোঁটা বা বিন্দু, তাই এর দ্বারা মেয়েদের পরিপক্ক ডিম্বযুক্ত রক্ত মিশ্রিত সেই পানীয় বস্তুও হতে পারে যা পরিপক্ক ডিম্ব ডিম্বকোষ থেকে ফেটে বের হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর স্পষ্ট উক্তি রয়েছে যে তিনি বলেছেন, 'নুৎফা' দু'প্রকার একটি পুরুষের, আর একটি মহিলার। জনৈক

www.bjilibrary.com

ইয়াহুদী মহানবী (সা)-কে প্রশ্ন করেছিল, 'হে মুহাম্মদ? মানুষ কীভাবে সৃষ্ট?' মহানবী (সা) জবাব দিলেন, 'হে ইয়াহুদী! সেই দুটি বস্তু থেকে সৃষ্টি 'পুরুষের 'নুৎফা' এবং নারীর 'নুৎফা', (আল মুস্নাদ, ইমাম আহমদ)। সুতরাং এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে কুরআনে 'নুৎফা' বলতে পুরুষের শুক্রকীট এবং নারীর পক্ক ডিম্বাণুকে বুঝায়। ভাবতে অবাক লাগে যে ৭ম শতাব্দীর কুরআনে এমন বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে যা মানুষ বহু শতাব্দী পরে বুঝতে সক্ষম হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৭-এ দেখুন।

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

১৬ ঃ ৫ তিনি আন'আম সৃষ্টি করেছেন; তোমাদের জন্য তাতে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে এবং তা হতে তোমরা আহার্য পেয়ে থাক।

এ আয়াতে আল্লাহ্ গবাদিপশু থেকে যে সকল উপকার পাওয়া যায় সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। আন'আম- انعام। শব্দটি (نعم -এর বহুবচন) বলতে সকল গরু-ছাগলকে একত্রে বা সমষ্টিগতভাবে বুঝান হয়ে থাকে। কুরআনে উল্লিখিত শব্দ আন'আম- انعام। দ্বারা সকল গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুকে বুঝান হয়েছে। অর্থাৎ এই শ্রেণীর মধ্যে উট, গরু, মহিষ, ভেড়া ও ছাগলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ সকল প্রাণীর নিকট থেকে আমরা যে সকল উপকার পেয়ে থাকি তন্মধ্যে আল্লাহ্ বিশেষভাবে দু'টির কথা উল্লেখ করেছেন, যথা এদের চামড়া ও মাংস। দেফ্উন (دفء) শব্দটির অর্থ গরম কাপড় যা উটের লোম থেকে পাওয়া যায়, যদিও উট থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য জিনিস তথা খাদ্য, দুগ্ধ ও পোশাকাদিকেও দেফ্উন শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। উটের লোম ছাড়াও ভেড়ার পশমও সারা বিশ্বে পোশাক তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ভেড়া ও অন্যান্য গৃহপালিত জন্তু থেকে প্রাপ্ত পশম সম্পদ তথা পশমী কোট যে আমাদের উষ্ণতা এনে দেয় তার প্রধান কারণ হলো এসব জন্তুর কোঁচকানো চুল যা থেকে পশম নামক পেঁচানো পশমী তন্তু পাওয়া যায়। এ থেকে উৎপাদিত হয় বিভিন্ন ধরনের পোশাক যা আমাদেরকে উষ্ণ রাখে, তথা পুলোভার, জাম্পার, মোজা, মাফলার, হাতমোজা এবং অন্যান্য সকল পশমী জিনিসপত্র। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াজাতকৃত পুরো চামড়াটাই পশম সমেত গরম কোট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

www.bjilibrary.com

এসব ছাড়াও, সকল বয়সের লোকদের জন্য চামড়ার বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে যথা গ্রন্থাদির কভার বা আচ্ছাদান, কিছু কিছু বাদ্যযন্ত্রের কভার ইত্যাদি। শীতের দেশগুলোতে চামড়ার পোশাক খুবই উপকারী। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া আর উটের মাংস উন্নত মানের আমিষের উত্তম উৎস।

এ সকল জীবজন্তু থেকে আমরা আরও যে সকল উপকারিতা পেয়ে থাকি তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো উল্লেখযোগ্য;

১. গরু ও মহিষ স্মরণাতীতকাল থেকে কৃষক কর্তৃক জমি চাষের কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এমনকি বৈজ্ঞানিক উন্নতির এ যুগেও বিশ্বের এক বৃহৎ অংশে গাভী, বলদ, মহিষ, ঘোড়া এবং উট কৃষি জমি চাষের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২. বলদ ও উট কখনও কখনও মালামাল ও যাত্রী বহনের কাজে লাগানো হয়; বিশেষ করে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারত উপমহাদেশসহ সমগ্র উন্নয়নশীল বিশ্বে গরুর গাড়ী একটা পরিচিত দৃশ্য বটে।

৩. কুয়ো থেকে পানি তুলতে এবং তেল উৎপাদনে তেলবীজ ভাঙ্গাতে বলদ ব্যবহার করা হয়।

৪. ভারতীয় উপমহাদেশের দেশগুলোতে ধানের গাছ থেকে ধান এবং গমের শীষ থেকে গম আলাদা বা মাড়াই করতে বলদ ব্যবহার করা হয়।

৫. গবাদিপশুর মলমূত্র বিশেষত গরুর গোবর বিশ্বব্যাপী সার হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অনেক দেশে গোবর একটা সাধারণ জ্বালানী।

৬. গুটিবসন্তরোধক চিকিৎসা হিসেবে গো-টিকা তৈরিতে বাছুরকে ব্যবহার করা হত।

৭. গবাদিপশুর শিং চিরুনী, হাতল এবং সাজ-সজ্জার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

٧- وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ ۚ
إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

১৬ঃ৭ এবং তারা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় দূর দেশে যেখানে প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত তোমরা পৌঁছতে পারতে না। তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

www.bjilibrary.com

অত্র আয়াতটি ৫নং আয়াতেরই চলমানতা বা সম্প্রসারিত রূপ যা মানুষের জন্য গবাদি পশুর উপকারিতা ব্যাখ্যা করে। মানুষ যখন পশুকে গৃহে পালন করা শিখে, ঠিক তখন থেকেই সে এ সকল জন্তুকে এক স্থান/দেশ থেকে অন্য স্থান/দেশে বহন করে নিয়ে যাওয়ার কাজে লাগিয়ে আসছে। কাজেই, আধুনিক পরিবহন পদ্ধতি যখন ছিল না, সে সময়ে গৃহপালিত পশুই ছিল একমাত্র পরিবহন মাধ্যম। এমনকি আজও উটই ভারবাহী জন্তু হিসেবে মরুবাসীদের প্রয়োজন পূরণ করে থাকে। মধ্য এশিয়ার বল্‌খীয় উট এবং মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার আরবী উট এখনও তাদের খাপ খাইয়ে নেয়ার প্রশংসনীয় ক্ষমতার কারণে মরু অঞ্চলে যোগাযোগের বিশ্বস্ত মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। তাদেরকে যথার্থেই বলা হয়ে থাকে মরু জাহাজ। ঘোড়া, গাধা, খচ্চর এবং হাতিকে একই কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে উঁচু নিচু এবং পার্বত্যাঞ্চলে। পোষা কুকুর এবং বলগা হরিণও জুতসই ভারবাহী পশু হিসেবে কাজ করে থাকে এবং এরা হিমশীতল মেরু অঞ্চলে কঠিন পরিবেশে পরিভ্রমণ করে। তিব্বতীয় চমরী গাই এবং দক্ষিণ আমেরিকার পেরুভীয় মেষ হচ্ছে গৃহপালিত পশুর আরো দু'টো দৃষ্টান্ত যারা পরিবহনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এ সকল এবং আরো অনেক গৃহপালিত পশু ছাড়া পরিবহনের ক্ষেত্রে, যেখানে আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম পাওয়া যায় না, মানব জীবন শোচনীয় হয়ে পড়ত। একমাত্র আল্লাহ্‌র সীমাহীন কৃপা ও দয়ায়ই মানুষ তার জীবনমান উন্নয়নে আল্লাহ্‌র প্রদত্ত এই উপহার উপভোগ করছে।

৮- وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

১৬ ঃ ৮ তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, খচ্চর ও গর্দভ এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু, যা তোমরা অবগত নও।

১৬ ঃ ৭ আয়াতে গৃহপালিত জন্তুকে সাধারণভাবে ভারবাহী পশু হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান আয়াতে বিশেভাবে যে সকল পশুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ঃ ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর যাদেরকে শুধু যে যানবাহন হিসেবেই সৃষ্টি করা হয়েছে তা নয়, বরং কিছু কিছু ভাল জাতের ঘোড়া তাদের সুদর্শন চেহারা, উজ্জ্বলতা ও দ্রুতির কারণে প্রদর্শনী এবং দৃশ্যাভিনয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জন্তুসমূহ যখন একমাত্র পরিবহন মাধ্যম ছিল তখন থেকে এ পর্যন্ত ভূমি, পানি ও আকাশপথে যোগাযোগের জন্য মানুষের উদ্ভাবিত

www.bjilibrary.com

যান্ত্রিক কৌশলে চোখ ধাঁধানো পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী, আণবিক শক্তিচালিত জাহাজ এবং সুপারসনিক মহাকাশযান যা শব্দ অপেক্ষা অধিকতর গতিসম্পন্ন। এগুলো আধুনিক পরিবহনের কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত যা আধা শতাব্দী আগেও অজ্ঞাত ছিল। বর্তমান মহাকাশযুগে শুধু পৃথিবীতে নয়, পৃথিবীর বাইরে মহাকাশেও নিরাপদ, দ্রুত এবং আরামদায়ক ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার আরো উন্নয়নের বিশাল সুযোগ রয়েছে। মানুষের উদ্ভাবনী দক্ষতার দ্বারা ভবিষ্যতে আরো যে সকল উন্নয়ন ঘটবে তা আসলে সর্বজ্ঞাত, সর্ববিজ্ঞ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি হবে যার সম্পর্কে বর্তমানে আমাদের কোন জ্ঞানই নেই।

١٠- هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ○

১৬ ঃ ১০ তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন; তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা থেকে জন্মায় উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাক।

আসমান থেকে বৃষ্টিপাতের বিষয়টি ২ ঃ ২২ ও ২ ঃ ১৬৪ আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ৬ ঃ ৯৯ আয়াতের আলোচনায় গাছপালা শস্যফলাদির বৃদ্ধিতে বৃষ্টির উপকারী প্রভাবসমূহের কথা উল্লিখিত হয়েছে। বর্তমান আয়াতটিতে জোর দেয়া হয়েছে চারণভূমির ব্যাপারে যাতে থাকে লতাগুল্মের আধিক্য যা পতিত জমিকে ঘাস, লতা-পাতায় ভরে তোলে এবং বিপুল সংখ্যক বীজ উৎপাদন করে। নির্দিষ্ট কিছু কিছু ঘাস ভালভাবেই এই গুণে ভূষিত এবং এদের কিছু কিছু আবার বর্ধনসাধক মাধ্যমে দ্রুতগতিতে বংশবৃদ্ধি ঘটায়। ভেড়া, ছাগল, উট ও গরু মহিষসহ সকল চারণ জন্তুরই পছন্দ-অপছন্দ রয়েছে। আর চারণভূমির উপর প্রভাবটাই হলো যে, অধিকতর স্বাদু বা রুচিকর এবং পুষ্টিকর খাবারগুলো নিঃশেষ হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে রাখালরা তাদের জন্তুগুলোকে সেদিকেই তাড়িয়ে নেয় যেদিকে সরবরাহ বর্তমান অর্থাৎ য়্যুরোপের সুউচ্চ পার্বত্যাঞ্চলসমূহ, এবং তুরস্কের ইয়্যায়লাস (পার্বত্য চারণ ভূমি) রয়েছে। গৃহপালিত জন্তুর খাবার পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের বসতি এলাকায় তথা আর্দ্র সমভূমি, মরুভূমি এলাকা, সমুদ্র সৈকত এবং পাহাড়ে বিশাল বিশাল প্রাকৃতিক তৃণভূমি সারাবিশ্বেই ছড়িয়ে আছে– যেমন ঃ উত্তর আমেরিকার তৃণভূমি, দক্ষিণ আফ্রিকার নিষ্পাদপ স্যাভান্না প্রান্তর ইত্যাদি। এ সকল তৃণভূমি তাদের বিপুল বৃদ্ধির জন্য বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল।

١١- يُنۢبِتُ لَكُمۡ بِهِ الزَّرۡعَ وَ الزَّيۡتُوۡنَ وَ النَّخِيۡلَ وَ الۡاَعۡنَابَ وَ مِنۡ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ
اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ لَاٰیَۃً لِّقَوۡمٍ یَّتَفَكَّرُوۡنَ ﴿۱۱﴾

১৬ ঃ ১১ তিনি তোমাদের জন্য তার দ্বারা জন্মান শস্য, যায়তুন, খর্জুর, দ্রাক্ষা এবং সর্বপ্রকার ফল। অবশ্যই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

এ আয়াতটি হচ্ছে পূর্ববর্তী আয়াতের বিষয়বস্তুর চলমানতা যাতে আমাদের পানির সরবরাহ এবং সবুজ গাছপালার বৃদ্ধিতে বৃষ্টিপাতের শুভ প্রভাব আলোচিত হয়েছে। বৃষ্টিপাতের অধিকতর শুভ ফল তথা সবরকম ফলফলাদি যথা শস্যদানা, জলপাই, খেজুর এবং আঙ্গুর উৎপাদনের বিষয়টি ৬ ঃ ৯৯ আয়াতে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

١٢- وَ سَخَّرَ لَكُمُ الَّیۡلَ وَ النَّهَارَ ۙ وَ الشَّمۡسَ وَ الۡقَمَرَ ؕ وَ النُّجُوۡمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمۡرِهٖ ؕ
اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوۡمٍ یَّعۡقِلُوۡنَ ﴿۱۲﴾

১৬ ঃ ১২ তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রজনী, দিবস, সূর্য ও চন্দ্রকে, আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই বিধানে। অবশ্যই এতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

দিন ও রাত, সূর্য, চন্দ্র এবং তারকারাজি থেকে মানুষ যে সকল উপকার পেয়ে থাকে তা ৬ ঃ ৯৭, ৭ ঃ ৫৪, ১০ ঃ ৬৭ এবং ১৪ ঃ ৩৩ আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে। যে সকল বিধানাবলি এসব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং এরা আল্লাহ্‌র আদেশে যেসব সেবাদান করে তা বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে গভীর চিন্তা-ভাবনা করতে বাধ্য করে এবং এগুলো বস্তুতই তাদের জন্য 'নিদর্শনাবলি' বটে।

١٣- وَ مَا ذَرَاَ لَكُمۡ فِی الۡاَرۡضِ مُخۡتَلِفًا اَلۡوَانُهٗ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ لَاٰیَۃً
لِّقَوۡمٍ یَّذَّكَّرُوۡنَ ﴿۱۳﴾

১৬ ঃ ১৩ এবং বিবিধ প্রকার বস্তুও যা তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। এতে রয়েছে নিদর্শন সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করে।

চোখ ধাঁধানো বর্ণবৈচিত্র্যমন্ডিত বিশাল প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শকের নিকট এক আনন্দের বিষয়। এই নান্দনিক আনন্দ ছাড়াও রঙ-এর ভৌতিক উপলব্ধি বস্তুত আল্লাহ্র যিকিরকারীগণের জন্য এক 'নিদর্শন' স্বরূপ বটে। নিউটন সপ্তদশ শতকের শেষভাগে এই উপলব্ধির ব্যাপারে প্রথম একটা বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নিউটন কাঁচের প্রিজমের সাহায্যে সাদা আলোকে এর সাতটি গঠন-উপাদানে বিভক্ত করে ছড়িয়ে দেন। এগুলো হচ্ছে ঃ বেগুনী, আকাশী, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল (VIBGYOR)। নিউটনই ছিলেন সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী যিনি গুণগতভাবে ধারণা দেন যে, বাছাই প্রতিফলন ও শোষণের কারণেই প্রাকৃতিক বস্তুর বিভিন্ন রঙ দৃষ্টিগোচর হয়। এ সকল গুণগত পর্যবেক্ষণ পরবর্তীকালে একটি তলের সকল রঙের প্রতিফলন মাপার যন্ত্র স্পেক্ট্রোফটোমিটার উদ্ভাবনের পথ নিশ্চিত হয়।

বর্তমানে আমরা জানি যে, বাছাই প্রতিফলনের কারণে ধাতব বস্তুর তলীয় রং দেখা যায়। একই বস্তুসমূহ যেহেতু বাছাই শোষণ গুণসম্পন্ন সেহেতু তারা কোনকিছুর ভিতর দিয়ে প্রেরিত আলোতে বিভিন্ন রং প্রদর্শন করে। কাজেই, কোন বস্তুর রং নির্ভর করে আপতিত আলোর প্রকৃতির উপর। সকল রং প্রতিফলনকারী লিলিফুল সাদা আলোতে রাখলে সাদা দেখায়, লাল আলোতে রাখলে লাল দেখায়, নীল আলোতে রাখলে নীল দেখায় এবং সবুজ আলোতে রাখলে সবুজ দেখায়। নীল বস্তু যেহেতু নীল রং প্রতিফলিত করে, সেহেতু এটি নীল বা সাদা আলোতে রাখলে নীল দেখায়। কালো বস্তু কোন রং প্রতিফলিত করে না। এটি সকল রং শোষণ করে নেয় এবং সে কারণে কালো দেখায়।

ধাতব পদার্থের তুলনায় অস্বচ্ছ অধাতব পদার্থে দৃক-ব্যবস্থা কিংবা দেহ রং উপাদান অধিকতর জটিল। অধিকাংশ অস্বচ্ছ অধাতব পদার্থের রং ঐ পদার্থের অভ্যন্তরে আলোক ছড়িয়ে পড়া ও শোষণের সংযুক্তির কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই ছড়িয়ে পড়ার সাথে আকাশে আলোক ছড়ানোর মিল রয়েছে। অধি আণুবীক্ষণিক কণা বায়ুমন্ডলে বাছাইভাবে ছড়ায়। এটি Rayleigh-এর বিস্তার নামে পরিচিত যাতে ছড়িয়ে পড়া তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চতুর্থ ক্ষমতা হিসেবে বিপরীতক্রমে পরিবর্তন হয়ে থাকে। নীল রং-এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য লাল রং-এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অনেক বেশী হ্রস্ব। সুতরাং লালের তুলনায় নীল রং বেশী ছড়ায় হেতু আকাশ নীল দেখায়। সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্তকালে সূর্য থেকে আগত আলো তার হ্রস্ব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য উপাদান হারিয়ে ফেলে, কেননা আলো সূর্য থেকে

www.bjilibrary.com

বায়ুমন্ডলে সুদীর্ঘ স্তম্ভ হয়ে আমাদের দিকে আসার পথে বাছাই পার্শ্বপথ ছড়ানোর ঘটনা ঘটে। কাজেই সূর্যের কাছাকাছি আকাশকে লাল দেখায়। এ ধরনের বাছাই ছড়ানো এবং শোষণই অস্বচ্ছ এবং অধাতব বস্তুর রং-এর কারণ। পৃথিবীর খনিজ পদার্থেরও রয়েছে বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক রং। মনিমুক্তার মধ্যে যে চমক দেয়া রং দৃষ্টিগোচর হয় তাতে দৃশ্যমান বর্ণালীর বেগুণী থেকে গাঢ় লাল পর্যন্ত সবক'টি রংই রয়েছে। পান্না এবং পদ্মরাগমনির রংসমূহ সৃষ্টি হয় খনিজ পদার্থের মধ্য দিয়ে চলাচলকারী সাদা আলোর কিছু কিছু দৈর্ঘ্যের বাছাই ছড়ান ও শোষণের মধ্যে সংযুক্তির মাধ্যমে। রং আসে বাছাইভাবে ছড়ান তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকে। কিছু কিছু খাঁটি ক্ষারীয় হ্যালাউড স্ফটিক তথা সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) ক্লোরাইড (KCl) ইত্যাদি বর্ণালীর দৃশ্যমান অঞ্চল জুড়ে স্বচ্ছ। এ সকল স্ফটিক রঙিন করা যেতে পারে রং-কেন্দ্র সৃষ্টির মাধ্যমে। এগুলো হচ্ছে অপদ্রব্যাদি কিংবা দৃশ্যমান আলোক শোষণকারী স্ফটিকের ভিতরকার ফাঁকা স্থান। জীবজগতে পরিদৃষ্ট রংসমূহ অনেকটাই নান্দনিক আবেদন এবং উচ্চ বৈজ্ঞানিক গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণে, জীবজন্তুর রঞ্জায়ন এবং জীবদেহে এর গুরুত্বের ভৌতিক ও রাসায়নিক ভিত্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাস্য রয়েছে। পালকের বা চুলের শুভ্রতার কারণ হলো সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ আপতন যা বায়ুমন্ডল দ্বারা সূক্ষ্মভাবে বিভক্ত গঠন উপাদানের পৃথকীকরণ থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে, যেভাবে তুষার সাদা রং ধারণ করে।

নিঃসরণ কিংবা তলানী জমা পূর্ণরূপে ছড়ানোর কারণ হতে পারে যে কারণে সাদা রং প্রদত্ত হয় মাছের আঁইশে এবং নানান জাতের কঠিন খোলাযুক্ত প্রাণীবর্গ, তীক্ষ্ম কন্টকযুক্ত সামুদ্রিক শামুকজাতি, প্রোটোজোয়া ইত্যাদির কঙ্কালের ক্যালসিয়াম কার্বনেটে। সাদা আলোর স্বীয় বর্ণালী গঠন উপাদানে বিশ্লিষ্ট হওয়া সংঘটিত হয় প্রাণীর দেহ কাঠামোতে প্রধানত যখন আপতিত আলোকরশ্মি ভিতরে প্রবেশ করে এবং একটার পর একটা পাতলা স্তরবিশিষ্ট ফিল্মের মধ্য দিয়ে পুনঃ প্রতিফলিত হয় যা বাধার সৃষ্টি করে, যেমন– অনেক প্রজাপতির পাখ্‌নার আঁইশে, মৌমাছির, ময়ূর এবং রাঙা পাখির পালক ইত্যাদিতে, সরীসৃপের বহিঃ ত্বকে, মুক্তার শুক্তিপূর্ণ বহিঃপৃষ্ঠে এবং শামুকের কঠিন আবরণে। সরাসরি সূর্যালোকে মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ীর চুলের উজ্জ্বল চমক দেখা যায় বাধাপ্রাপ্ত রঙের কারণে যাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বচ্ছ পালক দ্বারা আলোক নিজের ভাঙ্গা ভাঙ্গা উপাদানে প্রতিফলিত হয় এবং যা প্রতিটি আলাদা আলাদা চুলকে চারপাশে ঘিরে ফেলে। প্রাণীজগতে যে নীল রঙের প্রদর্শনী লক্ষ্য করা যায় (অর্থাৎ চোখের

www.bjilibrary.com

নীল রঙ) বহু ক্ষেত্রে তার কারণে সূক্ষ্মভাবে বিচ্ছুরিত আঠালো ব্যবস্থার দ্বারা প্রতিফলিত আলো ছড়ায়। প্রাণীদেহে এমন বিভিন্ন তন্তুর রঞ্জক পদার্থ রয়েছে যেগুলো আলোর অংশ বিশেষের বাছাই শোষণ এবং অকবলিত অংশের প্রতিফলন কিংবা প্রেরণ দ্বারা বিভিন্ন রকম আলোক তৈরি করে। প্রাণীদের গুরুত্বপূর্ণ বর্ণপরিচিতিকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে তথা ঃ নাইট্রোজেনীয় রঞ্জক (অর্থাৎ ক্যারোটিনয়েড্স, এনথ্রাকুইনান্স, ক্রোমোলিপয়েড্স ইত্যাদি) এবং নাইট্রোজেনীয় রঞ্জক (অর্থাৎ রক্তের টেরাপাইরলিক রঞ্জক চামড়া, চুল ইত্যাদির ঘন মেলানিন ইত্যাদি)।

প্রাণীদের মধ্যে যে নানান রং-এর বাহার দেখা যায় তা অনুকৃতি নামে পরিচিত লুকানো পদ্ধতির কারণেই সম্ভব হয় যা প্রাণীদেরকে তাদের শত্রু কিংবা শিকারের কাছ থেকে নিজেদের আড়াল রাখতে সহায়ক। গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশের বনজঙ্গলে প্রত্যেক প্রকার গাছের কান্ডের রয়েছে বাদামী এবং লাল থেকে সাদা পর্যন্ত নিজস্ব বিচিত্র বর্ণ। এ সকল রং-এর উপর আশ্রয়গ্রহণকারী পোকারা তাদের শত্রুদের নিকট থেকে নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখার জন্য তাদের আবাসের রং তৈরি করে নেয়। রঞ্জক অক্ষিপট এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে সূর্যরশ্মি থেকে নিরাপদ রাখে। সাদা পাখির পালক অথবা মানবদেহে সাদা রং তাপ বিকিরণ শ্লথগতি করতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বা ঠান্ডা আবহাওয়ার দেশগুলোতে তাপ সংরক্ষণে অপরিহার্য। অনুরূপভাবে, গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে মানবদেহেও কৃষ্ণবর্ণ তাকে বাইরের প্রচন্ড তাপ থেকে নিজ দেহকে নিরাপদ রাখতে সাহায্য করে। কিছু কিছু পুরুষ পাখি যেমন ময়ূর তার উজ্জ্বলতর রংকে ময়ূরীর সাথে ভাব জমাতে কাজে লাগায়।

ক্লোরোফিল হচ্ছে মূলত তন্তুরঞ্জক যা অধিকাংশ উদ্ভিদকে সবুজ রং দান করে, আর এই রংই প্রকৃতিতে প্রভাবশালী। অন্যান্য উদ্ভিদ তন্তুরঞ্জকের ভূমিকা যেমন ক্যারোটিনয়েড্স– যা হলুদ থেকে লাল রং দেয় এবং এনথোসিয়ানিনস– যা লাল ও নীলের নানারকম মাত্রা দেয়। ইতিমধ্যে ৬ ঃ ৯৯ আয়াতের আলোচনায় এর উল্লেখ করা হয়েছে। ফুলের উজ্জ্বল রং পরাগায়নকারী পোকা ও পাখিদের আকৃষ্ট করে যারা পরাগায়ন সম্পন্ন করে থাকে। পাকা ফলের বিভিন্ন রঙ পাখিদের আকৃষ্ট করে যা ফলের ছড়িয়ে পড়ায় সহায়ক হয়। ১,২,৩

বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করা যায় যে, বিভিন্ন জাতের মধ্যেও বিশেষত মানুষের মধ্যেও রং-এর বৈচিত্র্য আছে এমনকি যমজ শিশুর মধ্যেও। এ ধরনের রং

www.bjilibrary.com

বৈচিত্র্যের রহস্য লুকিয়ে রয়েছে সেই 'জিন'-এর ভিতর যা ডিএনএ (ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিইক এসিড) তথা জীবনের নীল নক্সার মধ্যে বিদ্যমান।

আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে খুঁজে পাওয়া বর্ণবৈচিত্র্যের উৎস এবং এ সবের প্রতিটি যে কাজ করে তা অনুধাবনের মধ্যে সত্যি সত্যিই 'নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্যে যারা আল্লাহ্‌র যিকির করে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. P.J. Darrogh, A. J. Gaskin. and J. V. Saunders, Scientific Americana, April, 1976, p. 84.
2. Encyclopaedia Britannica, pp. 52-74.
3. G.B. Deodlhar, Introduction to Optics, Indian Press Private Ltd. 1957.
4. C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 5th edition, Wily Eastern Ltd. New Delhi, 1977.

www.bjilibrary.com

١٤- وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

১৬ ঃ ১৪ তিনিই যিনি তোমাদের জন্য নদী-সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন, যেন তোমরা তা থেকে নূতন তাজা গোশ্‌ত্‌ আহরণ করে খেতে পার এবং তা থেকে সৌন্দর্য শোভার এমন সব জিনিস তোমরা বের করে নেবে যা তোমরা পরিধান কর। তোমরা দেখেছ যে, নৌকা, জাহাজ নদী-সমুদ্রের বুক বিদীর্ণ করে চলাচল করে। এসব কিছু এ জন্য যে, তোমরা তাঁর মহা অনুগ্রহ সন্ধান করে নেবে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে।

এই আয়াতে সমুদ্রের সঙ্গে সম্পর্কিত তিনটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় ঃ- (১) পানি তাজা গোশ্‌ত্‌ সরবরাহ করে; (২) মনিমুক্তা ইত্যাদি অলঙ্কার সমূহ আহরণ করা হয়; এবং (৩) সমুদ্রের জাহাজ চলাচলের মাধ্যমে ব্যবসায় বাণিজ্য ইত্যাদির সাহায্যে মানুষের কল্যাণ লাভ হয়।

এর তৃতীয় অংশটুকু ২ ঃ ১৬৪ আয়াতের সঙ্গে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। সাগর ও মহাসাগর পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রায় ৭১% ভাগ দখল করে রয়েছে এবং এটা পৃথিবীর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই পানি এবং নদী, নালা, হ্রদ ইত্যাদি, বরফ ও মাটির নীচের ভূগর্ভস্থ পানিসহ সবগুলোকে বলা হয় পৃথিবীর hydrosphere,[১] বা 'পানিবৃত্ত'। বর্তমানে সমুদ্র থেকে মাছ আহরণ করে বছরে প্রায় ৬,০০,০০,০০০ (৬ কোটি) টন খাদ্য অর্জিত হয়। বৈজ্ঞানিকদের মতে সমুদ্রের খাদ্য সরবরাহ করার ক্ষমতা এর বহু শত গুণ বেশী। যে পদ্ধতিতে সমুদ্র থেকে খাদ্য আহরণ করা হয় তা ত্রুটিপূর্ণ এবং মানুষ যেহেতু মাত্র কয়েক প্রকার মাছ খেতে পছন্দ করে তাই এই পদ্ধতি আরও বেশী ত্রুটিপূর্ণ। সমুদ্রের সব রকম মাছ থেকে আমিষ সংগ্রহ করা হলে এই অপর্যাপ্ততার হ্রাস হবে। এই সংগৃহীত আমিষ (protein) সংরক্ষণ ও বিভিন্ন স্থানে প্রেরণের সুব্যবস্থা হলে অবস্থার অনেক উন্নতি হবে। এক পরিসংখ্যানে দেখানো হয়েছে যে মাছ থেকে মানুষের দৈনিক আমিষের প্রয়োজন মিটাতে মাথাপিছু মাত্র এক পেনি খরচ হবে। আর সমুদ্র থেকে বৎসরে প্রায় ২০০ কোটি টন খাদ্য আহরণ সম্ভব[১]।

বৈজ্ঞানিকদের মতে- সমুদ্রের খাদ্য উৎপাদন প্রণালী নিম্নরূপ ঃ সমুদ্রের সমস্ত জীবের জীবন সূর্যতাপের উপর নির্ভরশীল যা সরাসরি অতি সূক্ষ্ম ভাসমান জীবাণু (phytoplankton) কর্তৃক খাদ্যে পরিণত হয়। এই phytoplanktonকে সমুদ্রের অতিক্ষুদ্র প্রাণীসমূহ খাদ্য হিসাবে খেয়ে ফেলে

www.bjilibrary.com

এবং এই জীবাণুগুলো সমুদ্রের সন্তরণশীল এক ধরনের জীবের বংশ রক্ষা করে থাকে। বিভিন্ন জৈব তলানি ও উচ্ছিষ্ট পানির নীচে অবস্থিত প্রাণীগুলোর খাদ্য সরবরাহ করে। আর সমুদ্র কিনারের প্রাণীগুলোর খাদ্য স্থল ভাগের প্রবহমান নিষ্কাশনের মধ্যে পাওয়া যায়। সমুদ্র পাড়ের জৈব পদার্থের পচন থেকে phytoplankton এর খাদ্য সরবরাহ হয়ে থাকে।

বিভিন্ন প্রকারের মাছ ছাড়া বিভিন্ন রকমের ঝিনুক ও শুক্তি, শামুক ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর প্রয়োজনীয় খাদ্য। রোমকদের আমল থেকে এগুলোর চাষ হয়ে আসছে এবং বিভিন্ন দেশ থেকে বর্তমানে এসব সংগৃহীত হয়ে থাকে।

উপরের আয়াতে বর্ণিত অলঙ্কার বলতে সমুদ্রের মুক্তা ও প্রবালকে বুঝায়। মুক্তা দুই ঢাকনা বিশিষ্ট ঝিনুকসহ বিভিন্ন প্রকার শুক্তিতে তৈরি হয়। মুক্তা তৈরি সক্ষম ঝিনুক বিভিন্ন প্রকার এবং এগুলো সাধারণত ঈষৎ উষ্ণ সমুদ্রের পানিতে পাওয়া যায়। আর খাদ্য উপযোগী শামুক-ঝিনুক শীতল পানিতে পাওয়া যায়। ঝিনুকের শরীরে প্রবেশকৃত বাইরের কোন বস্তুর ক্ষতি থেকে রক্ষার প্রচেষ্টায় মুক্তা তৈরি হয়। বাইরের এই বস্তুগুলো কোন পরজীবী বা পাথর কণা হতে পারে। প্রথমে একটি নরম পরদা এইসব বস্তুকে আবৃত করে ফেলে পরে পরতে পরতে মুক্তার মূল পদার্থ জমা হতে থাকে। মুক্তার শুক্তি সকল উষ্ণ মন্ডলের সমুদ্রে পাওয়া যায় এবং মুক্তার প্রাচীন কেন্দ্র ছিল শ্রীলঙ্কা। মিসিসিপি নদীতেও মুক্তা উৎপন্নকারী শুক্তি পাওয়া যায়। এই মিঠা পানির মুক্তা অতি ক্ষুদ্র এবং ত্রুটিযুক্ত হয়ে থাকে।

প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অসংখ্য নাবিক বংশানুক্রমে সমুদ্রের নীচে প্রবাল তৈরির রহস্য বুঝতে পারে নি। এগুলো বিশ্বের কিছুটা উষ্ণমণ্ডলীয় এলাকার সমুদ্র coral জাতীয় এক রকম প্রাণীর কঙ্কাল থেকে সৃষ্ট। এর কতগুলো খুব চমৎকার রঙ্গীন এবং শক্ত প্রবাল থেকে অলঙ্কার তৈরি করা হয়। সবচেয়ে মূল্যবান প্রবাল হল Red coral বা corallium rubram, যা প্রশান্ত মহাসাগরে পাওয়া যায়।

অনেক প্রকার সামুদ্রিক শামুকও খুব সুন্দর ও মূল্যবান। এদের মধ্যে রয়েছে concs, volutes, murex shells, scallops, এবং Owries বা কড়ি।[২] কড়ি তার চক্‌চকে পিঠের জন্য বিখ্যাত। এদের পার্শ্ব গোলাকার এবং বিভিন্ন রংয়ের। এসবও অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Encyclopaedia Britannica, Vol. 13, pp. 482, 409, 501.
2. R.T. Abbott, Encyclopaedia Americana, Vol. 24, pp 691-93.

www.bjilibrary.com

١٥- وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

১৬ ঃ ১৫ তিনি যমীনের পর্বতের নোঙ্গরসমূহ গভীরভাবে গেড়ে দিয়েছেন যেন সে তোমাদের সহ দুলতে না পারে। তিনি নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং স্বাভাবিক পথও বানিয়েছেন যেন তোমরা হিদায়াত পেতে পার।

এই বিষয়টি ১৩ ঃ ৩ আয়াতে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

١٦- وَعَلٰمٰتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۝

১৬ ঃ ১৬ যিনি বহু নিদর্শন (যমীনে) স্থাপন করেছেন (মানুষের পথ দেখাবার জন্য) আর তারকার সাহায্যেও মানুষ পথের সন্ধান পায়।

এ বিষয়টি ৬-৯৭ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

١٨- وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

১৬ ঃ ১৮ তোমরা যদি আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহ গণনা করতে চাও তবে তা কখনও পারবে না, তবে আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

এ বিষয়ে ১ ঃ ১ঃ আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

٤٠- إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۝

১৬ ঃ ৪০ কোন জিনিসকে সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলে আমাদের জন্য এ ছাড়া আর কিছুই বলতে হয় না যে, হয়ে যাও আর অমনি তা হয়ে যায়।

এই মহাবিশ্ব আদিযুগীয় এক শক্তিপুঞ্জের প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফল, যা অতি ঘন, অতি উত্তপ্ত এবং অতি ক্ষুদ্র ছিল। এই বৈজ্ঞানিক তথ্যই কুরআনের দাবী 'হও' বললে 'হয়ে যায়' কথার প্রমাণ। এ বিষয়ে পরিশিষ্ট-২ এ আলোচনা করা হয়েছে। একথাও মনে রাখতে হবে যে কোন সৃষ্টির বেলায় মহান আল্লাহ্ 'হও' বললে তার সৃষ্টি শুরু হয় এবং আল্লাহ্‌রই নির্ধারিত নিয়মে ও সময়ে তা সংঘটিত হয়।

এখানে আমরা বলার কারণ যে সকল ক্ষমতার অধিকারীকে বহুবচনে বলাই নিয়ম।

٤٨- أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ
سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ۝

১৬ ঃ ৪৮ ওরা কী লক্ষ্য করে না আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যার ছায়া দক্ষিণে ও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহ্‌র প্রতি সিজদাবনত হয়?

জীবন্ত বা জড়বস্তুর ছায়া পর্যন্ত যে আল্লাহ্‌ নির্ধারিত বিধান ও নিয়মের অনুসারী তা সূরা ১৩ ঃ ১৫-তে বর্ণিত হয়েছে। ছায়ার বিপরীতমুখী দিক পরিবর্তন দৃশ্যত সূর্যের গতির কারণে হয়ে থাকে। ছায়ার এই দিক পরিবর্তনের গতির একটা নির্দিষ্ট বিন্যাসকে কৌশলে সূর্য ঘড়িতে সময় ও মৌসুম নির্ণয়ের কাজে ব্যবহার করা হয়। এমনিভাবে ছায়াও স্রষ্টার বিধান সাপেক্ষ। আর ছায়ার এই আনুগত্য স্রষ্টার উদ্দেশ্যে ছায়ার প্রচ্ছন্ন সিজদা বিশেষ।

٤٩- وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ
وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝
٥٠- يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝

১৬ ঃ ৪৯-৫০ আল্লাহ্‌কেই সিজদা করে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে, পৃথিবীতে যত জীব জন্তু আছে সে সমস্ত এবং ফিরিশতাগণও; তারা অহঙ্কার করে না। তারা ভয় করে তাদের উপর পরাক্রমশালী তাদের প্রতিপালককে এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তা পালন করে।

৭ ঃ ৫৪ আয়াত ও পরিশিষ্ট ৪-এর আওতায় সকল জীবন্ত বা জড়বস্তু স্রষ্টা নির্ধারিত বিধিবিধান সাপেক্ষ এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। সকল জীবন্ত বা জড় বস্তু স্রষ্টা নির্ধারিত বিধিবিধান অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করে স্রষ্টার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে।

www.bjilibrary.com

٥٢- وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ۚ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ○

১৬ ঃ ৫২ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাঁরই এবং নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য। তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে ভয় করবে?

আকাশ থেকে নিচে ধরণীতে বৃষ্টিপাত ও 'মৃত' মৃত্তিকায় আকাশ থেকে ঝরানো বৃষ্টি দিয়ে ঐ মৃত্তিকায় প্রাণ পুনঃ সঞ্চারের বিষয়টি ইতিমধ্যেই ২ ঃ ১৬৪ আয়াতের আওতায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

٦٥- وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً
لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ○

১৬ ঃ ৬৫ আল্লাহ্ আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা তিনি ভূমিকে এর মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন। অবশ্যই এতে নির্দশন রয়েছে, যে সম্প্রদায় কথা শোনে তাদের জন্য।

আকাশ থেকে বারিবর্ষণ ও মৃত্তিকা তথা ধরণীর 'মৃত্যুর' পর এতে বারিপাতের মাধ্যমে পুনঃপ্রাণসঞ্চারের বিষয়টি ইতিমধ্যে আয়াত ২ ঃ ১৬৪-এর আওতায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

٦٦- وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ
لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ○

১৬ ঃ ৬৬ অবশ্যই গবাদি পশুর মাঝে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় রয়েছে। তাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হতে তোমাদেরকে পান করাই বিশুদ্ধ দুগ্ধ, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।

এই আয়াতে আল্লাহ গবাদি পশু থেকে আমাদের খাদ্য হিসেবে দুধ প্রদানের রহমতের বিষয় বর্ণনা করেছেন। সকল মানব শিশু শিশুকালে তাদের পুষ্টি আহরণ করে থাকে মায়ের বুকের দুধ থেকে। পরবর্তীকালে তাদের জন্য পুষ্টির জোগান আসে গবাদি পশুর দুধ থেকে।

www.bjilibrary.com

দুধ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর জন্মের পর বেশ কিছুকালের জন্য স্বাভাবিক খাদ্য। দুধ মানুষের পুষ্টির জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য। দুধে রয়েছে উচ্চমানের প্রাণীজ আমিষ, ক্যালসিয়াম (অস্থি ও দাঁত গঠনের জন্য জরুরী) এবং নানা ভিটামিন যেমন, ভিটামিন এ, থায়ামিন, রিবোফ্ল্যাভিন, ভিটামিন 'সি' ও 'ডি' রয়েছে। কাঁচা দুধের প্রতি ১০০ মিলিলিটার পরিমাণ থেকে ৬৭ ক্যালোরি পাওয়া যায়। এই পরিমাণ দুধে সাধারণত ৮৭% পানি, ৩.৩% আমিষ (প্রোটিন), ৩৬% স্নেহজাতীয় পদার্থ, ৪.৭% শ্বেতসার বা শর্করা ও ০.১২% ক্যালসিয়াম থাকে। দুধ তাপ পেলে তা থেকে কেবল ভিটামিন সি ও থায়ামিন নষ্ট হয় তবে অন্যান্য ভিটামিন অক্ষুণ্ন থাকে।[১]

গ্রন্থিময় দেহকলা বিন্যস্ত স্তন থেকে দুধ উৎপাদিত হয়। স্তনের তন্তুময় দেহকলা লতিগুলোকে মেদময় দেহকলার সাথে সংযুক্ত করে। স্তনের গ্রন্থিময় অংশটি (বাঁট) অনেক লতি দিয়ে গঠিত। এ গুলোতে রয়েছে বহু লতিকার সমাবেশ যেগুলো আন্তরকলা, রক্তবাহী নালী সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি লতিকায় রয়েছে গোলাকার একগুচ্ছ বায়ুস্থলী যা দুগ্ধোদপাদক নালীর ক্ষুদ্রতম শাখাগুলোর দিকে উন্মুক্ত। এই দুগ্ধোৎপাদী শাখাগুলো একত্রিত হয়ে একেকটি দুগ্ধ উৎপাদক নালী হিসেবে গঠিত হয় যা গ্রন্থির একটি লতি থেকে বেরিয়ে আসে। আর এই সব নালী দিয়েই দুধ বাঁটে পৌঁছায়।

স্ত্রীজাতীয় প্রাণীর স্তনের গঠন ও বিকাশে ঐ প্রাণী বা পশুর বয়স অনুযায়ী নানা ধরনের তারতম্য ঘটে। জন্মের সময় স্ত্রী জাতীয় প্রাণীর স্তনগ্রন্থিগুলোতে দুগ্ধোৎপাদী নালী থাকলেও কোনো বায়ুস্থলিকা থাকে না। বয়ঃসন্ধিকালে ডিম্বকোষের ইস্ট্রোজেন হরমোনের প্রভাবে নালীগুলোর শাখা বিস্তার ঘটে ও নালীগুলোর প্রান্তদেশে বহুকোণবিশিষ্ট, দানাবৎ ক্ষুদ্রাকার, শক্ত বলয় বা গোলাকার কোষ গঠিত হয় যা পরবর্তীকালে বায়ুস্থলীতে পরিণত হয়। গর্ভকালে নালীগুলোর লক্ষণীয় শাখা বিস্তার ঘটে এবং গর্ভস্থ শাবকের আচ্ছাদনী থেকে ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন হরমোনের প্রভাবে বায়ুস্থলী ও নলিকা গহ্বর থেকে নলিকা অবধি নালী গঠিত হয়। মেদ বা স্নেহপদার্থবহুল দেহকলা এবং স্তনে রক্তের প্রবাহ বেড়ে যায়। সুবিন্যস্ত বায়ুস্থলীগুলো থেকে কোষসমূহের ক্ষরণ তৎপরতা গর্ভের শেষ মেয়াদের দিকে বেড়ে যায়। শাবক প্রসবের পর এভাবে প্রথম যে দুধের নিঃসরণ হয়ে থাকে তাকে শাল দুধ বলে। প্রকৃত দুধের নিঃসরণ শুরু হয় প্রসবের কয়েকদিন পর থেকে। আর এটি ঘটে ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরনের কম মাত্রার কারণে। এই দুই হরমোনের মাত্রা কমার সাথে সাথেই প্রায় পিটিউটারি গ্রন্থির সম্মুখ লতিকা থেকে দুধ ক্ষরণ শুরু হয়। এই গ্রন্থিই দুধ নিঃসরণকেও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

www.bjilibrary.com

গবাদি পশুসহ সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর ম্যামারি গ্ল্যান্ড বা স্তনগ্রন্থি দুধ উৎপাদনে সক্ষম। এই দুধ বায়ুস্থলী কোষ থেকে নিঃসরিত হয়। আর এই গ্রন্থিগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি আসে রক্ত থেকে। রক্তপ্রবাহ আসে বক্ষ, অন্তর্বক্ষ পঞ্জরাস্থি অঞ্চলের ধমনী থেকে। দুধের উপাদানগুলো স্তনে প্রবাহিত রক্ত থেকে পাওয়া যায়। এভাবে গবাদি পশুর দুধে রয়েছে তাদের খাদ্য- খড়ি বিচালি থেকে প্রাপ্ত উপাদানসমূহের সমাবেশ। খাদ্য গ্রহণ ও তা পরিপাকের পর খাদ্যের অব্যবহৃত অংশ বর্জ্য বা মল-মূত্র (গোবর-চোনা) হিসেবে বেরিয়ে যায়। খাদ্য থেকে বিশোষিত উপাদানগুলো রক্তে প্রবেশ করে ও শেষাবধি হৃৎপিণ্ডে পৌঁছায়। বাম নিলয় থেকে রক্ত অক্সিজেন দ্বারা পরিশুদ্ধ বা মিশ্রিত হয়ে বিশোষিত পুষ্টি উপাদানসহ দেহের বিভিন্ন অংশে বাহিত হয়। এভাবে পুষ্টি উপাদানগুলো স্তনগ্রন্থিতে পৌঁছে যায়। সেখানে বায়ুস্থলী কোষগুলো দুধ উৎপাদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো রেখে দেয়। রক্ত প্রবাহিত হয় শিরাপ্রণালীতে ও এমনি করে তা আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। গোটা চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে কুরআনে যেভাবে বর্ণিত আছে সে ভাবে বর্জ্য (গোবর) ও রক্তের মধ্য থেকে দুধ তৈরি হয়ে থাকে। স্তনগ্রন্থিসমূহ থেকে উৎপাদিত এই দুধ এক বিস্ময়কর বস্তু। যে কোনো প্রাণীর দুধই হোক না কেন, তা মানবশিশু থেকে পশুপাখির শাবক সকলের যথার্থ প্রয়োজন মেটানোর জন্য নিখুঁত করেই তৈরি। যেমন, দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, গরুর দুধে মানব মাতার দুধের২ তুলনায় দ্বিগুণ আমিষ (প্রোটিন), চার গুণ ক্যালসিয়াম ও পাঁচগুণ ফসফরাস রয়েছে।

দুধ উৎপাদন প্রক্রিয়া এক বিস্ময়কর রাসায়নিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার ধারাপ্রবাহ মানুষের এ পর্যন্ত জানা মতে অন্যতম সবচেয়ে জটিল প্রক্রিয়া বিশেষ। হিসেব করে দেখা গেছে যে, এক আউন্স দুধ[২] তৈরির জন্য আনুমানিক ৪০০ আউন্স রক্ত স্তনে প্রবাহিত হওয়ার প্রয়োজন পড়ে। অবশ্য, রক্তের উপাদানগুলো দুধের উপাদানের তুলনায় একেবারেই আলাদা অর্থাৎ রক্তের অ্যামিনো অ্যাসিড দুধের জটিল প্রোটিন বিন্যাস থেকে একান্ত ভিন্ন। রক্তে গ্লুকোজ বা শর্করা দুধের শর্করা তথা ল্যাকটোজ থেকে অনেকখানি ভিন্ন প্রকৃতির। আর রক্তের স্নেহাম্ল বা ফ্যাটি অ্যাসিড দুধের স্নেহজাতীয় পদার্থ থেকে একেবারেই ভিন্ন।

তথ্যসূত্র ঃ

1. W.A.R. Thomson, Black's Medical Dictionary, 33rd edn., Adams and Charles Black, London. P. 598, 1981.
2. J.D. Katcliffe, Reader's Digest Book of the Human Body, The Reader's Digest Association Ltd. London, 1964, p. 367.

www.bjilibrary.com

٦٧- وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

১৬ ঃ ৬৭ এবং খর্জুর বৃক্ষের ফল ও আঙ্গুর হতে তোমরা মাদক পানীয় ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে থাক; এতে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

খেজুর ও আঙ্গুর- এই দুটি ফল যেগুলির বিষয় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তা আরবদের উত্তম পুষ্টি যোগাতো।

খেজুর গাছ (ফিনিক্স ড্যাকটাইলিফেরা) তালজাতীয় (পাম) প্রজাতির গাছ। খেজুর গাছ উষ্ণ ও ঊষর অঞ্চলে ব্যাপকভাবে জন্মায়। তালজাতীয় যতো প্রজাতির গাছ আছে সেগুলোর মধ্যে উপকারিতার[১] দিক থেকে একমাত্র নারকেলের পরেই খেজুর গাছের স্থান।

খেজুর গাছ উত্তর আফ্রিকা ও আরব অঞ্চলের দেশজ। আনুমানিক চার হাজার বছর ধরে এই অঞ্চলে খেজুর গাছ জন্মায়। খেজুর ফল লম্বা কাঁদির ছড়ায় গুচ্ছাকারে ঝুলে থাকে। খেজুর সুমিষ্ট, এর পুষ্টিকর শাঁস একটি খাঁজ কাটা শক্ত আঁটির চারধারে লেগে থাকে। ১০-১৫ বছর বয়সী খেজুর গাছে ফল আসে ও আর এই ফলন ১০০ থেকে ২০০ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। খেজুর পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার অঞ্চলবিশেষের অধিবাসীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য। মহানবী মুহাম্মদ (সা)-এর আমলে খেজুর ছিল আরবদের প্রধান খাদ্য। স্পেনীয়রা প্রথমবারের মতো খেজুর গাছ আমেরিকা তথা নতুন দুনিয়ায় নিয়ে যায়। খেজুরের পুষ্টিমূল্য সম্পর্কে আয়াত ৬ ঃ ৯৯-এর আওতায় আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ও আমাদের উপমহাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে খেজুর গাছ দেখতে পাওয়া যায়। এই জাতের খেজুর ভারতীয় খেজুর বলে পরিচিত। অবশ্য এই জাতের খেজুরে তেমন শাঁস বা খাদ্যবস্তু থাকে না। তবে এই সব খেজুর গাছের কাণ্ডের ওপরের দিকে চেঁচে ও কেটে পরিষ্কার করে এক ধরনের সুমিষ্ট তরল রস পাওয়া যায়। খেজুর গাছ থেকে এই রস টপ টপ করে ফোঁটার আকারে পড়ে এবং খেজুর গাছের সাথে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা মাটির পাত্রে এই রস সংগ্রহ করা হয়। এই রস অত্যন্ত মিষ্টি ও সজীবকারক পানীয়। তাপে জ্বাল দিয়ে এই রস থেকে গুড় তৈরি করা হয়।

www.bjilibrary.com

দ্রাক্ষাকুঞ্জ (ভাইটিস ভিনিফেরা) বা আঙ্গুর গাছ আসলে লতিয়ে ওঠা একজাতীয় উদ্ভিদ। এ থেকে আঙ্গুর পাওয়া যায়। আঙ্গুরের চাষ করা হয় পৃথিবীর উত্তরভাগের গোটা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল জুড়ে। আরবের মরূদ্যানগুলোতেও দ্রাক্ষা চাষ হয়ে থাকে। মানুষ যতোকিছু উদ্ভিদের বাগান গড়েছে সবচেয়ে গোড়ার দিকে সেগুলোর মধ্যে দ্রাক্ষাবাগিচা মানুষের অন্যতম প্রথম প্রয়াস। মানবেতিহাসের অনেক গোড়া থেকেই২ ভোজনকালে মূল ভোজ্যের সাথে ফল, কিশমিশ, মনক্কা ও মদ হিসেবে পরিবেশনার কথা সুপরিজ্ঞাত।

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, খেজুর ও আঙ্গুর ফল পুষ্টিদায়ক খাদ্য ও পানীয়। আরবী শব্দ سكر (সাকর) এই আয়াতে মাদক পানীয় বোঝানো হয়েছে। এ ধরনের পানীয় খাম্বীরায়ন প্রক্রিয়ায় খেজুর ও আঙ্গুর থেকে তৈরি করা হতো। অবশ্য আরবীয়রা 'নাবিজ' (نبيذ) নামে অভিহিত সুরামুক্ত এক ধরণের পানীয় খেজুর থেকে তৈরি করে। খেজুর কয়েকদিন পানিতে ভিজিয়ে রেখে এই পানীয় তৈরি করা হতো। পাকা আঙ্গুর, শুকনো তথা কিশমিশও খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

কুরআনের এই আয়াতটি মহানবীর (সা) মদিনায় হিজরতের পরে ও মাদকপানীয় নিষিদ্ধ করার আগে নাযিল হয়। অবশ্য আল্লাহ্ এই দুটি ফল সম্পর্কে উক্ত তথ্যাদি দান করেছেন। আঙ্গুরের রসে রয়েছে গ্লুকোজ যা পরিপাকক্রিয়া ছাড়াই সরাসরি রক্তে বিশোষিত হয়। তাই আঙ্গুরের রস পুষ্টি উপাদানের শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ উৎস। খেজুর থেকে তৈরি নাবিজও পুষ্টিকর পানীয়। তবে আঙ্গুর সুরা তৈরির সর্বোত্তম উপকরণ। সূরা ২ ঃ ২১৯ আয়াতের আওতায় সুরার ক্ষতিকর প্রভাব প্রতিক্রিয়ার বিষয় আলোচিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. U.P. Hendrick, Date Palm, Collier's Encyclopaedia, 6, Vol. P.F. Collier and Sons Co., New York, 1956, pp. 290-91.
2. U.P. Hendrick, Grapes, Collier's Encyclopaedia, Vol.9, 1956, p.265.

www.bjilibrary.com

٦٨- وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ
٦٩- ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ
يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○

১৬ ঃ ৬৮-৬৯ তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকুলকে পাহাড়, গাছপালা ও মানব বসতিতে তাদের মধুচক্রের কোষ নির্মাণের ও এরপর (মাটিতে) উৎপন্ন সকল কিছু হতে (আহার) গ্রহণ করতে এবং অতঃপর (তোমার) প্রতিপালকের পথ অনুসরণ করতে প্রেরণা দিয়েছেন যে পথ তিনি নির্ণয়যোগ্য করেছেন। তাদের উদর হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণময় পানীয় যার মাঝে রয়েছে মানুষের জন্য আরোগ্য। অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

এই দুই আয়াতে অল্প কিছু শব্দের পরিসরে মধুর মতো সবচেয়ে নন্দিত ধরনের তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। প্রথমত যে প্রেরণায় উপযুক্ত পরিবেশে মধুর চাক গড়ে ওঠে সে সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করা হয়েছে। এরপর মৌমাছিদের মধুর উপাদানের উৎস ও কীভাবে মৌমাছিরা তাদের খাদ্যের জন্য মধুর উপাদানের সন্ধান করে সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে, মৌমাছির উদর থেকে উৎপাদিত নানা বিচিত্র বর্ণের মধু উৎপাদনে প্রকৃতির কী রহস্য ও বিস্ময় লুকিয়ে আছে সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে যা মানুষের নানা রোগের মহৌষধস্বরূপ।

মধুর চাক তৈরি

মৌমাছিকুলের আবাসস্থল মধুর চাকের সামাজিক গঠন বা নির্মিতি অত্যন্ত সুগঠিত। মধুর প্রতিটি চাকে একটি করে রাণী মৌমাছি ও কিছু পুরুষ মৌমাছি থাকে। আর থাকে অসংখ্য অপরিপূর্ণ বিকশিত স্ত্রী মৌমাছি বা শ্রমিক মৌমাছি। বিভিন্ন অবস্থা অনুযায়ী মৌমাছির চাকের মধ্যে বড়ো রকমের তারতম্য হয়ে থাকে। কোনো মৌচাক গড়া হয় প্রক্ষিপ্ত ও ঝুলন্ত শিলা বা গাছের ডাল, গাছের গুঁড়ির ফাঁকা খোলের মধ্যে, বিভিন্ন ভবনের দুই দেয়ালের মধ্যে বা ধ্বংসাবশেষে মধুর চাক গড়া হয়। পাহাড়ি মৌমাছিরা (Apis dorsata) বিরাট আকারের

একক মধুর চাক তৈরি করে যার আয়তন সাধারণত এক বর্গগজের মতো (০.৮ বর্গমিটার)।[১] অন্যান্য প্রজাতির মৌমাছি যেমন, ইউরোপীয় (Apis mellifica) ও এশীয় প্রজাতির মৌমাছিরা তুলনামূলকভাবে ছোট আকারের চাক তৈরি করে। চাকের যে বসতি এলাকায় মৌমাছিরা বাস করে তা সাধারণত ওপর থেকে নিচের দিকে ঝোলানো সমান্তরালভাবে সজ্জিত কোষ দিয়ে চাকটি গঠিত হয়। মধুর চাকে থাকে উলম্ব ঝুঁটি বা শীর্ষ ও সমান্তরাল কোষ দিয়ে গঠিত, প্রতিটি শীর্ষ বা ঝুঁটি কোষ থেকে একটি কেন্দ্রীয় মোমের চাদর থেকে ওপরে-নিচে উভয় দিকে প্রক্ষিপ্ত হয়। । এভাবে গোটা কোষের আকার দ্বিগুণাকার হয়ে থাকে। মৌচাকের মোমের উৎপত্তি হয় মৌমাছির দেহের বাম দিকের নিলয়ের কাছে অবস্থিত গ্রন্থি থেকে। কর্মী মৌমাছি মৌচাক তৈরির সময় এই মোম চিবিয়ে ও তাতে তার লালা মিশিয়ে পাতলা আস্তর ও ফিতার আকারে ছড়িয়ে চাকের ছয় কোণাকৃতি কোষগুলো তৈরি করে। যে কোনো জ্যামিতির ছাত্রের জন্য এটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়। ছয় কোণাকৃতি মৌচাকের কোষগুলি বিস্ময়করভাবে সবচেয়ে কম জায়গা নষ্ট করে সবচেয়ে বেশী ধারণক্ষমতার উপযোগী (চিত্র-৭) করে নির্মিত হয়। কোষগুলো আগেই বলা হয়েছে ষড়কোণবিশিষ্ট আর এগুলো দুটি আকারের হয়ে থাকে। ছোট আকারের কোষ কর্মী মৌমাছির পালন ও পরিচর্যা এবং পরাগ ও মধু সঞ্চিত করার জন্য এবং বড়ো আকারের কোষ পুরুষ মৌমাছি পালনের জন্য। একেক বিশেষ মৌসুমে যখন মৌমাছির সংখ্যা অতিরিক্ত হয়ে যায় তখন কর্মী মৌমাছিরা রাণী মৌমাছির জন্য বিশেষ কোষ নির্মাণ শুরু করে যা মৌমাছির বংশবৃদ্ধি তথা ডিম পাড়ার প্রস্তুতি। এই কোষগুলো খাড়া না হয়ে আনুভূমিক হয়ে থাকে। আর এগুলোর নিজের দিকে দরজা খোলা থাকে। এক পাউণ্ডের মতো (০.৫ কেজি) মোম দিয়ে মৌমাছির চাকের ৩৫ হাজার কোষ তৈরি হয়ে থাকে। আর এইসব কোষের মাঝে আনুমানিক ২২ পাউণ্ডের মতো (৯.৯ কেজি) মধু জমা করে রাখা যায়। কোষের প্রাচীরগুলো বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে নিঃসৃত ধুনার মতো পদার্থের প্রলেপ দেয়া থাকে কোষগুলোকে সুরক্ষিত রাখার জন্য। এই ধুনা বা আঠার মতো পদার্থ কর্মী মৌমাছিরা সংগ্রহ করে কোষের গহ্বরগুলোর দেওয়াল মসৃণ করে তোলার ও পানি থেকে সুরক্ষিত করার জন্য।[২] চাকের মধ্যে সাধারণভাবে যে পরিকল্পনা বিন্যাস লক্ষ্য করা যায় তা হলো তাতে একটি বড়ো এলাকা জুড়ে থাকে পরিচর্যা ইউনিট বা চাকের নিচের দিকে বাচ্চা পরিচর্যা ও পালন কেন্দ্র ও তার কাছাকাছি পরাগ সঞ্চার আগার। চাকের ওপরের দিকে থাকে খাদ্য প্রকোষ্ঠ যেখানে মধু সঞ্চয় করে রাখা হয়। এ মধু সঞ্চয় আগার বা প্রকোষ্ঠটি থাকে চাকের নিচের প্রবেশ পথ থেকে সবচেয়ে দূরে।

www.bjilibrary.com

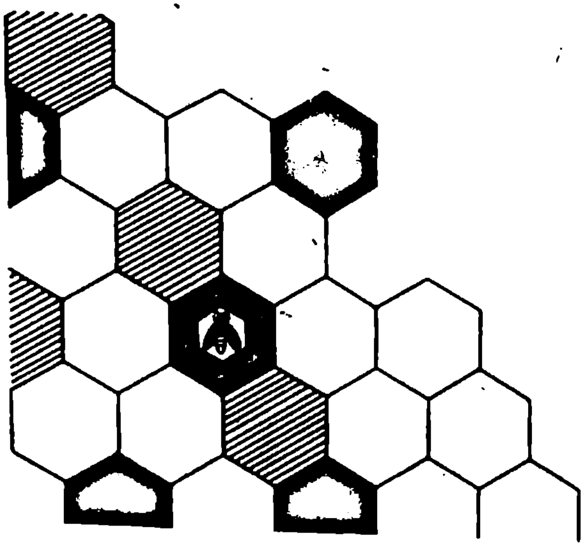

চিত্র ঃ ৭ মধুর চাকের একাংশের নকশা।

এখানে ষড়ভূজাকার কোষগুলো বিন্যস্ত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। যে কোষগুলো তির্যক রেখাঙ্কিত সেগুলোতে মধু ও পরাগ সঞ্চয় করে রাখা হয়। আর কালো ব্লক করা কোষগুলোতে কর্মী মৌমাছির পরিচর্যা ও পালন কার্য পরিচালিত হয়ে থাকে। অন্য কোষগুলো ফাঁকা থাকে।

মধুর উৎস সমূহ ও মৌমাছিরা যেভাবে এই সব উৎস থেকে মধু আহরণ করে থাকে

এক পাউন্ড (০.৫ কেজি) মধু তৈরি করার জন্য ৫৫০টিরও বেশি মৌমাছিকে আনুমানিক ৮০,০০০ বার[৩] দলবদ্ধভাবে উড়ে গিয়ে কমপক্ষে ২৫,০০,০০০ (পঁচিশ লক্ষ) ফুল হতে পরাগ সংগ্রহ করতে হয়। মৌমাছির খাদ্য হলো পরাগ ও সুমিষ্ট রস যা নানা ধরনের ফুল থেকে সংগ্রহ করা হয়। যখন ফুল থাকে না বা পাওয়া যায় না তখন তারা ফল থেকে মিষ্টি রস সংগ্রহের ওপর নির্ভর করে তবে তাদের চিবুকাস্থি এমনকি নরম ফলের খোসা ভেদ করার মতো যথেষ্ট শক্ত না হওয়ায় তাতে হুল ফোটাতে পারে না। তাই কোনো ফল কেবল আগে কোনো ভাবে ফেটে বা কিছুটা নষ্ট হয়ে আলগা হয়ে পড়লেই কেবল তা থেকে মৌমাছি রস সংগ্রহ করতে পারে।[৪]

গড় ধরনের একটি মধুর চাকে ৩০,০০০ থেকে ৬০,০০০ কর্মী মৌমাছি থাকে। এই জাতের মৌমাছি তাদের জীবনের ২১তম দিবসে বাইরে গিয়ে মধু আহরণের উপযুক্ত হয়। আর যে সব মৌমাছি বাইরে গিয়ে পরাগ ও মধুর নতুন

www.bjilibrary.com

উৎস সন্ধান করে এই মৌমাছিরা শেষ পর্যন্ত তাদের পথ প্রদর্শক বা স্কাউটের কাজ করে এবং তারপর তারা বাইরে কর্মরত অন্যান্য মৌমাছির কাছে এই খবর পৌঁছে দেয়। মৌমাছি খাদ্য ও সমৃদ্ধ সরবরাহের উৎস খোঁজার জন্য সাধারণত তাদের মধুর চাকের একশ মিটার পর্যন্ত এলাকায় অনুসন্ধান চালায়।৫ স্কাউট মৌমাছি তাদের সহকর্মী মৌমাছিদের মিষ্ট রসের সন্ধানের তথ্য জ্ঞাপন করতে যে পদ্ধতি অনুসরণ করে তাকে কথিত মধুনৃত্য হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তাদের সে তথ্য জ্ঞাপনের ভাষা ও নৃত্যের জ্যামিতিক তাৎপর্য সম্পর্কে সূরা ৬ ঃ ৩৮-এর আওতায় পরিপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। কুরআনের আয়াতে স্পষ্টতই মৌমাছিদের এই তথ্য নির্দেশের অর্থ করা হয়েছে "আপনার প্রভুর পথ সন্ধান করুন" এই মর্মে।

নানা বর্ণের মধুর উৎপাদন মানবজাতির জন্য আশ্চর্য রোগ আরোগ্যকারক

"মধু এক মিষ্টি, আধা ঘন পদার্থ, নানা ধরনের শর্করার এক দ্রবণ বিশেষ যার বর্ণ গাঢ় বাদামি থেকে সোনালী হলুদ হয়ে থাকে। মৌমাছিরা ফুল থেকে সংগৃহীত সুমিষ্ট রস থেকে মধু তৈরি করে ও তা পরবর্তীকালে তাদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্য চাকে সঞ্চয় করে রাখে।৬" মধু সর্বপ্রাচীন ও প্রায় একমাত্র প্রাকৃতিক মিষ্টি বলা চলে। কোন্ কোন্ ধরনের ফুল থেকে মিষ্টি রস ও পরাগ সংগ্রহ করা হয়েছে সেই অনুযায়ী মধুর সুরভি, রং ও গঠন নির্ভর করে।

মধুর সুগন্ধ ও রং উভয়ই নির্ভর করে কোন ধরনের ফুলকে মিষ্টি রস পাওয়ার উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে তার ওপর। মধুতে একপ্রকার অ্যাসিড রয়েছে। এই অ্যাসিডের নাম ট্যানিক অ্যাসিড। এই অ্যাসিডের জন্যই মধুর গাঢ় রং ও তীব্র স্বাদ হয়ে থাকে। মধুর রং হলুদ হয়ে থাকে ক্যারোটিন বা জ্যানথোফিল নামের রাসায়নিক পদার্থের কারণে। মধুর এই হলুদ রং হয়ে থাকে সাধারণত সরিষা ফুল থেকে মৌমাছির পরাগ সংগ্রহের কারণে। সাদা ক্লোভার৭ (মাষকলাই জাতের এক ধরনের ত্রিপত্রী উদ্ভিদ) থেকে সংগৃহীত মধুর রং সাধারণত গোলাপী রঙের হয়ে থাকে যার কারণ এই মধুতে অ্যানথোসিয়ানিন নামে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি। মধুর চাকে অতিরিক্ত পানির (আর্দ্রতার) বাষ্পীভবন ঘটে। আর সুক্রোজ বিপরীতায়ন প্রক্রিয়ায় মনোস্যাকারিডস লেভুলোজ বা ডেক্সট্রোজে পরিণত হয়। মধুর মধ্যে গড়ে ৪০.৫% লেভুলোজ, ৩৪% ডেক্সট্রোজ, ১.৯% সুক্রোজ, ১৭.৭% পানি, ১.৯% ডেক্সট্রিনস ও আঠা এবং ০.১৮% ছাই থাকে। এ ছাড়াও এতে থাকে ১.৫-৬% অন্যান্য উপাদান যেমন বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন (সি ও বি ভিটামিন

www.bjilibrary.com

গ্রুপের অনেকগুলি উপ-ভিটামিন), এনজাইম (যেমন, ডায়াসটেজ, ইনুলেজ, ক্যাটালেজ ও ইনভার্টেজ (সুক্রোজ ইনভার্টস), তরুলতার রঞ্জক পদার্থ, নিলম্বিত সলিডস (পরাগ ও মৌ-মোম), খনিজ (তামা, ক্যালসিয়াম, আয়রন), অতি সামান্য পরিমাণে সিলিকা, ম্যাঙ্গানিজ, ক্লোরিন, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ফসফরাস, গন্ধক, অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম। আহরিত মিষ্ট রসে কিছু খন্বীর উপাদান থাকতে পারে। আহরিত মধু উপাদান সঞ্চিত থাকাকালে তাই কিছু খন্বীরায়নও ঘটতেই পারে। সকল শ্রেণীর মধু আর্দ্রতাধারণ করে বলে ঠাণ্ডায় কখনও জমে যায় না। অতিরিক্ত তাপে মধুর সুগন্ধ ও খাদ্যগুণ নষ্ট হয়।৬

ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকেরা মধুকে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করেন। কুরআন এ বিষয়ে বলছে যে মানবজাতির জন্য মধু ওষুধের গুণ ধারণ করে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান অবশ্য মধুর ওষুধগুণ নিয়ে বিশদ ও বিস্তারিত গবেষণা পরিচালনা করেনি। তবে মধুর নিম্নবর্ণিত ব্যবহার সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ

১. কোনো কোনো চিকিৎসক মধু শিশুদের দেহে ক্যালসিয়াম বা চুন জাতীয় পদার্থ বজায় রাখার জন্য উপযোগী ও উপকারী প্রভাবসম্পন্ন খাদ্য বলে সুপারিশ করেছেন। মধু পরিপাকে কোনো সমস্যা নেই। কেননা, মধুর বেশিরভাগে রয়েছে মনোস্যাকারিডস বা সাধারণ চিনি।[৪]

২. মধুতে যে সব এনজাইম, পাচকরস, খনিজ ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে সবগুলোই মানুষের জন্য উপকারী। আর মানব পুষ্টির এসব অত্যাবশ্যক উপাদানের সরবরাহ লাভের জন্য মধুকে উত্তম উৎস বলে গণ্য করা যেতে পারে।

৩. এই মর্মে বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, মহানবী (সা) নানা ধরনের অসুস্থতা, বিশেষ করে, মাদকাসক্তি নিরাময়ে মধুর ব্যবস্থাপত্র দিতেন। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের আওতায় লারসেন৮ জটিল মাদকাসক্ত রোগীর চিকিৎসার জন্য বারংবার ১২৫ গ্রাম করে মধু খাওয়ানোর ব্যবস্থাপত্র দিতেন। মধুতে থিয়ামিন ও ভিটামিন 'বি' গ্রুপের নানা উপ-ভিটামিন ও নানা ধরনের শর্করার সমৃদ্ধ সমাবেশ রয়েছে। এসব উপাদান জটিল মাদকাসক্ত রোগীর পীড়িত যকৃতের চিকিৎসায় মধুর অপরিসীম গুরুত্ব সম্পর্কে বিশ্ব আজ নতুন করে জ্ঞান লাভ করছে। তিনি এ বিষয়ে ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালী ও জার্মানীর বহু বিজ্ঞান বিষয়ক জার্নাল থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে জটিল মাদকাসক্ত রোগীর রোগ চিকিৎসায় তাদের দেহের ভিটামিন ঘাটতি এবং তাদের দেহে মাদক সেবনের কারণে যে দূষণ ঘটে থাকে তা দূর করার প্রক্রিয়াকে[১০] মধু সহজ করে তোলার কাজে বিরাট সাফল্যের সাথে ব্যবহৃত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

৪. শরীরের কোনো অংশ পুড়ে গেলে সেই পোড়া ও কাটাছেঁড়া ঘায়ের চিকিৎসায় মধু ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কারণ, মধুতে মৃদু জীবাণুনাশক ও পচনরোধক গুণ রয়েছে।[৭]

মধুর ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সকল গুণ উদঘাটন করার জন্য এ বিষয়ে আরও সমীক্ষা প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Friedman (ed.), Collier's Encyclopaedia, Vol. 3, P.F. Collier, Inc. London, 1980, p. 762.
2. Encyclopaedia Americana, Vol.3, Ross & Hatchins, 1979. p. 438.
3. Ibid.
4. E. Crane, (ed.), Honey-a comprehensivc Survey, William Heinsmann Ltd. London, 1976. p.22.
5. Friedman (ed.), Collier's Encyclopaedia, Vol.3, P.F. Collier, Inc. London, 1980. P. 764.
6. C. L. Farror and H. M. Grace, Honey, Collier's Encyclopaedia, Vol. 10. 1956, pp. 139-141.
7. Encyclopaedia Britannica, 1962.
8. M. Larsen, Brit, M.J. (August)1954 quoted Digir, M. Al-Assal, Dar al-kutub al Arabia, Damascus, 1974.
9. M. Digir, Al-Assal, Dar al-Kutub al Arabia, Damascus, 1974.
10. M. B. Badri, Islam and Alcoholism, American Trust Publications, USA, 1976, pp.27-28.

www.bjilibrary.com

٧٢- وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً
وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ۙ

১৬ ঃ ৭২ এবং আল্লাহ্ তোমাদের থেকেই তোমাদের জোড়া (দম্পতি) সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে জীবনোপকরণ দান করেছেন। তবুও কী ওরা মিথ্যায় বিশ্বাস করবে এবং ওরা কী আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করবে ?

নাফস نفس -এর সরাসরি শব্দার্থ আত্মা ও আত্মার রিপু প্রধান অংশ। আল্লামা ইউসুফ আলী[১] নাফসকে প্রকৃতি বা স্বভাব বলে অর্থ করেছেন। আর পিকথল[২] কুরআনের এই আয়াতের আলোকে এর অর্থ করেছেন স্বকীয়তা। পুরুষ ও স্ত্রীদের বেলায় প্রকৃতি বা স্বভাবে বা "স্বকীয়তা" অর্থ মেনে নিয়ে ঐ বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ করতে গিয়ে সাধারণভাবে জীব-প্রকৃতি সম্পর্কে বিশেষত মানুষের জৈবতাত্ত্বিকভাবে এক তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে।

এক প্রজাতির সকল সদস্য সুপরিজ্ঞাতভাবেই অন্য সকল প্রজাতির সদস্যদের তুলনায় আলাদা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। মানুষ হোমো স্যাপিয়েনস প্রজাতিভুক্ত। মানুষসহ কোনো একটি জীবপ্রজাতির সদস্যরা এককভাবে একে অন্যের মধ্যে কিছু পরিমাণে তারতম্য প্রদর্শন করে থাকে যা সাধারণত তাদের ভৌগোলিক বন্টন বা কোথায় কোন অঞ্চলে বসবাস করে তার ওপর নির্ভর করে। তাছাড়া এই একই বিষয়ে বড় ধরনের জাতিগোষ্ঠী বা নরগোষ্ঠীতে বিভিন্নতার ভিত্তিতেও এই তারতম্য হয়ে থাকে। বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর সদস্যের মধ্যে পরিপূর্ণ প্রজনন সম্ভব। তবে অন্যান্য জীবপ্রজাতির কোনো সদস্যের সাথে মানব প্রজাতির কোনো সদস্যের আন্তঃপ্রজনন বা শিশু/ শাবক উৎপাদনের সম্ভাবনা কার্যত নেই। এর অর্থ এই যে, একটা জীবতাত্ত্বিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এ ধরণের বিষম প্রজননের মধ্যে। এই প্রতিবন্ধকতাগুলো জিনগত ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত। আর এর ফলে একটি জীব-প্রজাতি ও অন্য আরেক জীব-প্রজাতির মধ্যে আন্তঃপ্রজননের ক্ষেত্রে 'বিচ্ছিন্নতা ও পৃথকায়নের' সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন বাবা-মার জিনের পার্থক্যজনিত কারণে এটি হতে পারে। কেননা এই জিনগুলো প্রাণ বিকাশের ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী জৈবরাসায়নিক 'নির্দেশ' দিতে পারে। আর তার ফলে নিষিক্ত ডিম্বকোষ বিকশিত হতে পারে না অথবা বিকশিত হলেও যে শিশু বা

www.bjilibrary.com

শাবকের জন্ম হয় সাধারণত সে হয় দুর্বল ও পূর্ণ বয়সে তার মাঝে সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশ নাও ঘটতে পারে। অনেক সময় এক জীব-প্রজাতির শুক্রাণু অন্য এক জীব-প্রজাতির স্ত্রী জননাঙ্গের যথা অবস্থানে টিকে থাকতে পারে না। এ ধরনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জীব-প্রজাতির সদস্যবর্গের মধ্যে জিনের প্রবাহ অসম্ভব।

এই প্রজনন অন্তরায় বা বাধার জীবতাত্ত্বিক গুরুত্ব অসাধারণ। এই বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন জীব প্রজাতির স্বকীয় ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে। এই অন্তরায় না থাকলে যে কোনো একটি জীবপ্রজাতি শেষ পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক মধ্যবর্তী সংকর হিসেবে পর্যবসিত হতো ও এই প্রজাতির স্বকীয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতো। আর সেই সাথে দুটি আদি ও মূল জীবপ্রজাতির মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করা আর সম্ভব হতো না। যদি ভিন্ন দুই জীবপ্রজাতির মধ্যে আন্তঃপ্রজননের সুবাদে একটা টেকসই সংকর তৈরি করা সম্ভব হয়ও তাহলেও ঐ সংকরদের দিয়ে আরও আন্তঃপ্রজনন আর সম্ভব হবে না কেননা ঐসব সংকর হবে বন্ধ্যা। এ বিষয়ে একটি সুপরিচিত দৃষ্টান্ত হলো খচ্চর যা ঘোড়া ও গাধার মধ্যে আন্তঃপ্রজননের এক শক্তিশালী, কষ্টসহিষ্ণু ও ভারবাহী প্রাণী। অথচ এই সংকর প্রাণীটি হয়ে থাকে বন্ধ্যা। এই সংকর প্রাণীর বাবা-মা কিন্তু আলাদা ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যময় প্রাণী প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা করে চলে আর তাদেরই শাবক ঐ খচ্চরটি একজাতের বিচ্ছিন্ন, বন্ধ্যা প্রাণী হিসেবে বেঁচে থাকে। এই খচ্চরেরা নিজেদের বংশবৃদ্ধি করতে পারে না।

আল্লাহ্ প্রতিটি প্রজাতির প্রাণীকে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতায় সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্ট জীবকুল কেবল আন্তঃপ্রজননগত বিচ্ছিন্নতার সুবাদেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগত অবস্থা বজায় রাখে না, এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মেও তাদের বৈশিষ্ট্যের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখে। জিন বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে জিন উপাদানের স্থানান্তরনের মধ্য দিয়েই উল্লিখিত ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয়। এই বিষয়ের প্রতিই কুরআনের আলোচ্য আয়াতে পুরুষ ও তাদের স্ত্রীদের মধ্য থেকে সন্তান সন্ততি ও পুত্র-পৌত্রাদি উৎপাদনের কথার ইঙ্গিত করান হয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. A. A. Yusuf, The Holy Quran, Islamic Foundation, Liecester, UK. 1975, p.675.
2. M. Pickthall, The Meaning of The Glorious Quran, Kutub Khana Ishyat-ul-Islam, Churiwalan, Delhi.

www.bjilibrary.com

٧٧- وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَمَاۤ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ
اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

১৬ ঃ ৭৭ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্‌রই এবং কিয়ামতের ক্ষণের ব্যাপার তো চক্ষুর পলকের ন্যায়, বরং তা অপেক্ষাও সত্বর। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কিত আধুনিক তত্ত্বানুযায়ী মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে এক অত্যুষ্ণ ও অতি ক্ষুদ্র, অতি ঘন, মৌলিক প্রকৃতির অগ্নিগোলক থেকে যার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ২ ঃ ১১৭ আয়াতে এবং পরিশিষ্ট ১ ও ২-এ। মহাবিশ্বের শুরুতে ঘটে বিগ ব্যাং-এর মতো ঘটনা। আর তারপর ক্রমান্বয়ে পরমাণু, অণু, নীহারিকা, ছায়াপথ, নক্ষত্র ও সৌরমণ্ডল আদি অগ্নিগোলক থেকে সৃষ্টি হয়। মহাবিশ্ব সৃষ্টির এই বিগ ব্যাং তত্ত্ব আজ বিশ্বজনীনভাবে স্বীকৃত হলেও বাস্তবিক পক্ষে এটি আজও মহাবিস্ময়ই রয়ে গেছে। মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরুতে সকল পদার্থ একটি আবর্তক গতি লাভ করে যা আজও অস্তিত্বশীল। আর এই গতিই মহাকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে কেন্দ্রাতিগ শক্তি দ্বারা অভিকার্ষিক আকর্ষণের ভারসাম্য বিধান করে থাকে। বাস্তবিক পক্ষে আজও মহাবিশ্ব সৃষ্টির সূচনা থেকে সৃষ্ট এই আবর্তক গতির আদি উৎস এখনও রহস্যই থেকে গেছে। নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেক্ট্রনের আবর্তনশীল গতির আদি উৎস একইভাবে আজও রহস্যে ঘেরা। অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থের সৃষ্টি মহাবিশ্ব সৃষ্টির আরেক হেঁয়ালি। সৃষ্টির প্রতিটি স্তরের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা, উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা যে রয়েছে তা বিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। জ্ঞানের অগ্রগতির আলোকে মানুষ আকাশ ও পৃথিবীর অনেক রহস্য এখন উপলব্ধি করতে সক্ষম। তবে আরও অন্যান্য অনেক রহস্যই রয়েছে যেগুলো এখনও মানুষের বোধগম্য নয়।

শেষ বিচারের দিনের ক্ষণ সম্পর্কে যে উল্লেখ করা হয়েছে সে বিষয়ে ৭ ঃ ১৮৭ আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

٧٨- وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

১৬ ঃ ৭৮ আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের পেট থেকে বের করেছেন, এমন অবস্থায় যে তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি

www.bjilibrary.com

তোমাদেরকে শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং চিন্তা করার জন্য মন দিয়েছেন এজন্য যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

একথা খুবই সত্য যে মানব শিশু যখন জন্ম লাভ করে তখন সে কিছুই জানে না এবং সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল থাকে। তখন এই শিশুর লালন পালন করে তার পিতা-মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ও সেবক বা সেবিকারা। তারাই শিশুর খাদ্য, পানীয় ও পোশাক সরবরাহ করে। এখানে আল্লাহ্ আরও বলেছেন যে তিনি শিশুকে শ্রবণ, দৃষ্টি ও মনন শক্তি দান করেন।

কান শ্রবণ কার্য সম্পাদন করে। জন্মের সময় যদিও বাহ্যত দুটি কান থাকে যার প্রত্যেকটির তিনটি অংশ রয়েছে ঃ- বাইরের অংশ, মধ্যম ও অভ্যন্তরীণ অংশ। বাইরের অংশ বা কান মাতৃগর্ভেই তৈরি হয় যা গর্ভের ষষ্ঠ সপ্তাহে শুরু হয় এবং ৩২তম সপ্তাহে তার নির্দিষ্ট স্থানে সন্নিবেশিত হয়। মধ্যম অংশ গর্ভধারণে ২৪-২৮ দিনের মধ্যে শুরু হয় এবং গর্ভের শেষ সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হয়। অভ্যন্তরীণ কানের সৃষ্টি গর্ভের ৪র্থ সপ্তাহে শুরু হয় এবং ২০তম সপ্তাহে শেষ হয়। কিন্তু এ সময় শিশু সব শব্দ খুব স্পষ্ট শুনতে পায় না। কানের পেছনের উঁচু অংশকে mastoid বলে। তাতে বাতাস ধরে রাখার মত অনেকগুলো গর্তের সৃষ্টি হয় যা আওয়াজকে স্পষ্ট করতে সাহায্য করে। এগুলো গর্ভাবস্থায় শুরু হলেও জন্মের পর এর বেশীর ভাগের তৈরি শেষ হয়। জন্মের সময় mastoid সমান থাকে উঁচু হয় না- এক বছর বয়সে এটা বেশ উঁচু হয় এবং তখনই শিশু ভাল শুনতে পায়। তবে এর গঠন যৌবনকাল পর্যন্ত চলতে পারে।[১]

একটি শিশু ভাল শুনতে পেলেই কথা বলতে শিখে তাই এক বৎসর হলে বাচ্চা কথা বলতে শুরু করে।

চক্ষুও গর্ভের ৪র্থ সপ্তাহে (২২তম দিবসে) শুরু হয় এবং ৩২ দিনের সময় optic cup চোখের ভিতরের অংশ যা দৃষ্টির জন্য বিশেষ প্রয়োজন, সৃষ্টি হয় এবং চক্ষুর নার্ভ optic nerve ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম সপ্তাহে তৈরি হয়। জন্মের সময় চোখের নার্ভের বাহ্যিক আবরণ (myelination) বাকি থাকে যা মস্তিষ্কের সঙ্গে সম্পর্কিত। জন্মের পর চোখে আলো পড়ার পর প্রায় দশ সপ্তাহ পরে এই আবরণ তৈরি সম্পূর্ণ হয়।[২] চোখের দুই পাপড়ি দুদিক থেকে এসে মিলিত হয় গর্ভের দশম সপ্তাহে এবং ২৬তম সপ্তাহে পাপড়ি দুটি আলাদা হয়।[৩] এর আগ পর্যন্ত পাপড়ি দুটি যুক্তই থাকে। নবজাত শিশুর চক্ষু, পূর্ণ বয়স্ককালের চক্ষুর তুলনায় দুই-তৃতীয়াংশ ছোট থাকে। প্রথম বছরে চক্ষুর আকার বৃদ্ধি পায় দ্রুতগতিতে,

www.bjilibrary.com

তারপর যৌবন পর্যন্ত ধীরে ধীরে এবং তারপর চক্ষুর আকার বৃদ্ধির পরিমাণ অতি সামান্য ও নগণ্য।[১]

নবজাত শিশু প্রথম কয়েক সপ্তাহ ভাল করে (স্পষ্ট) দেখতে পায় না। চক্ষুর ভিতরের বিশেষ অংশ (macula lutea এবং fovea centralis) গুলো পূর্ণভাবে গড়ে ওঠে না বলে তাদের দৃষ্টি স্থির করার শক্তি হয় না। তখন তারা চেয়ে থাকলে স্পষ্ট দেখে না- অর্থাৎ শুধু তাকিয়ে থাকে। চক্ষুর ভিতরে পেছন দিকে রেটিনার কেন্দ্রের হলদে দাগকে macula lutea বলে আর এর মধ্যকার সামান্য গর্তটিকে fovea centralis বলে। এখানকার রেটিনার আস্তরণ খুব পাতলা এবং শুধু cones দ্বারা তৈরি। বাকী রেটিনাতে cones এবং rods পাশাপাশি থাকে। তবে যেখানে optic nerve প্রবেশ করে যেখানে rod বা cone কিছুই থাকে না। এখানে কোন আলোর প্রতিফলন হয় না বলে এটাকে অন্ধ এলাকা বা blind spot বলা হয়। কোন বস্তুর আলো রেটিনাতে পড়লে এবং fovea তে refracted ও পুঞ্জীভূত হলেই স্পষ্ট দেখা যায়। জন্মের প্রায় এক মাস পর macula ও fovea পূর্ণতা লাভ করে।[২] তাই মাসখানেক পর শিশু চক্ষু স্থির করে দেখতে পায়, এর পূর্বে চক্ষু স্থির হয় না।

হৃৎপিন্ড ও রক্ত চলাচল মাতৃগর্ভের শোধিত রক্ত (৮০%) মায়ের placenta থেকে umbilical vein (নাড়ী) দিয়ে ফিরে আসে। এর প্রায় অর্ধেক রক্ত যকৃতের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। আর বাকী অর্ধেক যকৃৎকে বাদ দিয়ে ductus venosus দিয়ে inferior vena cava (IVC) (নিম্নের বৃহৎ শিরা)তে প্রবেশ করে। এই রক্তের চলাচল ductus venosus sphincter দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়।[৪] যেহেতু মাতৃগর্ভে শিশু শ্বাস নেয় না এবং লিভার বা যকৃতের কাজও করে তাই সব শোধিত রক্ত যকৃতের মধ্য দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। দুই পথেই শোধিত রক্ত নিম্নের বৃহৎ শিরায় প্রবেশ করে। এখানে নিম্নাঙ্গের পেট ও তলপেট থেকে আগত রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। এই রক্ত শেষ পর্যন্ত হৃৎপিন্ডের দক্ষিণ অলিন্দে (atrium) প্রবেশ করে। যদিও এতে অশোধিত রক্ত থাকে তবুও এই রক্ত মোটামুটিভাবে যথেষ্ট অক্সিজেন বহন করে। শরীরের উর্ধ্বাঙ্গ থেকে অশোধিত রক্ত উর্ধ্বতন বৃহৎ শিরা বা superior venacava (SVC) মারফত ডান অলিন্দে প্রবেশ করে। ডান ও বাম অলিন্দের মধ্যকার দেয়ালে এ সময় একটি ছিদ্র থাকে যার নাম foramen ovale IVC থেকে আসা বেশীর ভাগ রক্ত foramen ovale দ্বারা বাম অলিন্দে প্রবেশ করে যেখানে ফুসফুস থেকে কিছু রক্ত (শ্বসনের নয় বলে অশোধিতই থেকে যায়) এসে জমা

www.bjilibrary.com

হয়। ফুসফুস তার প্রয়োজনীয় অক্সিজেন রক্ত থেকেই গ্রহণ করে। তারপর বাম অলিন্দের রক্ত বাম প্রকোষ্ঠে (left ventricle) প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে ধমনির সাহায্যে সারা শরীরে ছড়িয়ে যায়।

IVC-র কিছু রক্ত যা বাম অলিন্দে যায়নি তার সঙ্গে SVC দ্বারা প্রবাহিত রক্ত একত্র হয়ে দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে যায় এবং সেখান থেকে pulmonary trunk দ্বারা ফুসফুসে যায়। তবে এর বেশীর ভাগ রক্ত ductus arteriosus দ্বারা ফুসফুসে যায়। তবে এর বেশীর ভাগ ধমনিতে প্রবেশ করে। সুতরাং মাতৃগর্ভে খুব সামান্য রক্ত (৫-১০%) ফুসফুসে যায়। কারণ স্থান নেয় না বলে ফুসফুসের কাজ খুব কম হয়। যে রক্ত ধমনির নীচের অংশে প্রবেশ করে তাতে মাত্র ৫৮% অক্সিজেন থাকে। এই রক্তের অর্ধেক শরীরের নিম্নাংশকে সরবরাহ করে, আর বাকি অর্ধেক নাড়ীর ধমনি (umbilical arteries) দিয়ে plncenta-তে যায় এবং মায়ের মাধ্যমে অক্সিজেন লাভ করে umblical vein দিয়ে আবার শিশুর শরীরে প্রবেশ করে।

জন্মের সঙ্গে সঙ্গে নবজাতকের রক্ত চলাচলে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। Placenta মারফত মায়ের রক্ত আসা বন্ধ হয়ে যায় আর শিশুর শ্বাসক্রিয়া শুরু হয়। গর্ভাবস্থার তিনটি বিকল্প পথ foramen ovale, ductus venosus এবং ductus arteriosus গুলোর আর প্রয়োজন থাকে না। কারণ, তখন যকৃত ও ফুসফুস পূর্ণ কার্যক্ষম হয়।

মাতৃগর্ভে শিশুর হৃৎপিন্ডের ডান প্রকোষ্ঠের দেয়াল অতিরিক্ত কাজের ফলে বাম প্রকোষ্ঠের তুলনায় মোটা। জন্মের মাত্র এক মাস পর বাম প্রকোষ্ঠের দেয়াল ডান প্রকোষ্ঠের তুলনায় বেশী মোটা হয় যা বাকি জীবনভর থাকবে। আর ডান প্রকোষ্ঠের দেয়াল কম কাজ করার ফলে পাতলা হয়ে যায়।

নবজাতকের কয়েকবার শ্বাস নেবার সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুসের রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায় এবং বাম অলিন্দে রক্ত চাপ বৃদ্ধি পায়। ফলে ডান অলিন্দ থেকে রক্ত আসতে পারে না বলে foramen ovale ধীরে ধীরে অকেজো হয়ে যায়। Ductus arterious ১০-১৫ ঘন্টায় আর কার্যক্ষম থাকে না সম্ভবত ফুসফুস কর্তৃক তৈরি braykinin নামক রাসায়নিক বস্তুর মধ্যস্থতায়।[৫]

যেহেতু pulmonary trunk যথারীতি রক্ত ফুসফুসে প্রেরণ করে তাই এই পথের আর কোন প্রয়োজন থাকে না এবং কাজ না থাকায় শেষ পর্যন্ত ductus venosus কাজের অভাবে ক্রমে বন্ধ হয়ে যায় এবং portal vein যথারীতি কাজ করে যায়। মাতৃগর্ভের রক্ত চলাচলের পরিবর্তন হতে বহু দিন থেকে বহু সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লাগে। (ছবি দ্রষ্টব্য)

www.bjilibrary.com

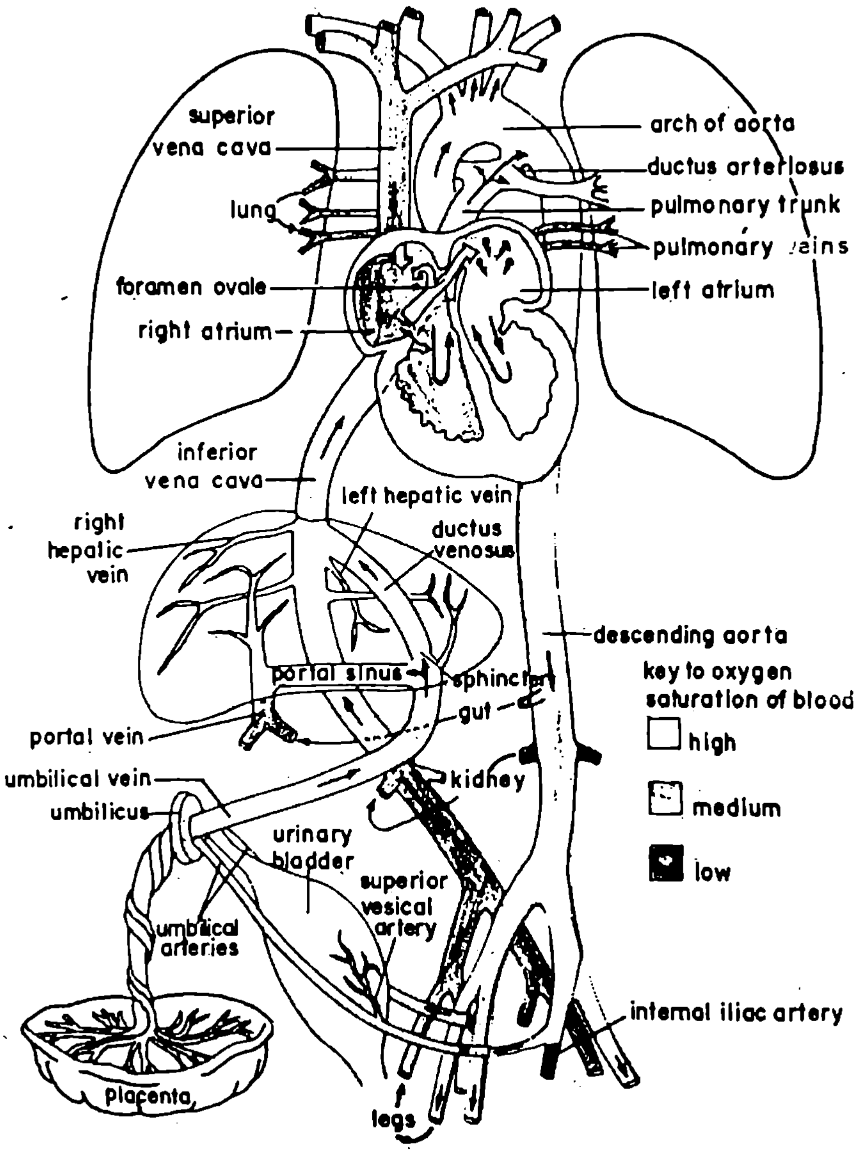

www.bjilibrary.com

সুতরাং জন্মের সময় শিশুর চক্ষু, কর্ণ এবং হৃৎপিন্ড পূর্ণ কার্যক্রমে থাকে না। শিশু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান লাভ করে। আর এই জ্ঞান লাভের জন্য চক্ষু, কর্ণ ও হৃৎপিন্ডের প্রয়োজন। শুনতে বা দেখতে না পেলে মানুষ জ্ঞান লাভ করতে পারে না। তাই উপরের আয়াত অনুযায়ী এ কথা অত্যন্ত সঠিক যে শিশু যখন জন্মলাভ করে তখন সে অজ্ঞ এবং আল্লাহের দেওয়া চক্ষু, কর্ণ ও হৃৎপিন্ডের মাধ্যমে শীঘ্রই দৃষ্টি, শ্রবণ ও চিন্তা শক্তির সাহায্যেই সে জ্ঞান লাভ করে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. K. L. Moore A. M. A. Azzindani (eds.)The Developing Human, 3rd edn. W. B. Saunders Co. Philadelphia, 1983, p. 424, 420.
2. M. L. Kwitko, (ed) Surgery of the Infant Eye, Appleton-Century-Crofts, New York, 1979.
3. K. K. Jain, G. J. Bhandari, and S.P. Koronne, Histogenesis of the Human Eyelid, East Arch. Opt, 3 : 8. 1973.
4. A. D., Dickson, The development of the ductus venosus in man and the goat, J. Anat. 91 : 358, 1957.
5. K.L. Melmon, M.J. Cline, J. Hughes; and A. S. Nies Kinins : Possible mediators of neonatal circulatory changes in man, J. Clin. Invest 47; 1295, 1968.

www.bjilibrary.com

٧٩- اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِىْ جَوِّ السَّمَآءِ ؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ؕ
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

১৬ ঃ ৭৯ তারা কী লক্ষ্য করে না আকাশের মাঝে উড্ডীন আনুগত্যশীল বিহঙ্গকুলকে? আল্লাহ্ই তাদেরকে সেখানে উড্ডীন ও অস্তিত্বশীল রাখেন। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

বাতাসে পাখা বিস্তার করে পাখির আকাশচারণ মানুষের জন্য সর্বকালের বিস্ময়। আমরা পাখির এই বায়ুমণ্ডলে আকাশে উড্ডয়নের ব্যাখ্যা করতে পারি শক্তির বিশ্লেষণ বা পৃথকীকরণ সূত্র এবং নিউটনের গতি সম্পর্কিত তৃতীয় সূত্রের ভিত্তিতে। পাখা সঞ্চালনের মাধ্যমে উড্ডয়নের বেলায় উপরে ওঠা ও অভিকর্ষক টানে ধাক্কার শক্তি আসে একজোড়া পাখার সঞ্চালন বা আলোড়নের কারণে। পাখার নিম্নাভিমুখী সঞ্চালন অভিঘাতের সময় নিম্নে প্রদত্ত ছবি অনুযায়ী বাতাস কখ অভিমুখে ধাবিত হয়। আর নিউটনের গতিসংক্রান্ত ৩য় সূত্র অনুযায়ী, প্রতিক্রিয়ামূলক শক্তি ডানায় কখ দিকাভিমুখে কাজ করে (চিত্র ৯)। কখ দিকাভিমুখে ক্রিয়াশীল পাখার শক্তিকে কগ ও কঘ দিকাভিমুখী শক্তি হিসেবে আলাদা বা বিশ্লিষ্ট করা যায়। আর এই শক্তির উপাদানগুলো যথাক্রমে অভিকর্ষ টানের বিরুদ্ধে ওপরে ওঠায় এবং প্রয়োজনীয় ধাক্কার শক্তি জুগিয়ে পাখিকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সমর্থ করে। একটি সম স্তর উড্ডয়নের সাথে সামনের দিকে উড়ে এগিয়ে যাওয়ার বেলায় পাখির পাখা নিচের ও সামনের দিকে তার দেহের সাথে আপেক্ষিকতা বজায় রেখে আন্দোলিত হয়। এর ফলে পাখার নিম্নাভিমুখী অভিঘাতের সময় সামনের দিকে একটা ধাক্কার সৃষ্টি হয়। আর পাখির পাখার অভিঘাত যখন ওপরের দিকে ঘটে তখন পাখা দুটি উল্টো ওপরের দিকে অভিঘাত করে ফলে পাখা দুটি এমনভাবে বাতাসে আঘাত হানে যাতে ওপরে ওঠার একটা শক্তি তৈরি হয়। এ সময় পাখা দুটি দ্রুত পেছনের দিকে সঞ্চালিত হয় যার ফলে সামনের দিকে যাওয়ার গতির সৃষ্টি করে। এমনিভাবে উপরে ওঠা ও সামনের দিকের ধাক্কাজনিত শক্তি পাখার নিম্ন ও উর্ধ্বাভিমুখী উভয় অভিঘাতেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। পাখির উড্ডয়নের ক্ষেত্রে ডানা ঝাপটে পাখির উড্ডয়ন সবচেয়ে কার্যকর।

www.bjilibrary.com

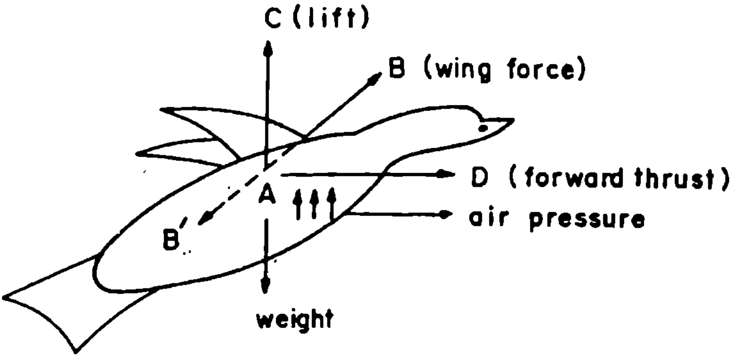

চিত্র ঃ ৯

পাখির ওড়ার আরও দু প্রকারের পদ্ধতি রয়েছে ঃ ১. অবতরণমূলক উড্ডয়ন; ও ২. আরোহণমূলক উড্ডয়ন। অতরণমূলক উড্ডয়নে পাখি উপর থেকে নিচের দিকে নেমে আসে। তখন অভিকর্ষের টান পাখিকে নিচে নামার শক্তি বা ঠেলা দিয়ে সহায়তা করে। উর্ধ্বারোহণমূলক উড্ডয়নে পাখি উর্ধ্বমুখী বায়ুপ্রবাহের সুবিধে নেয় আর সে ক্ষেত্রে তার পাখা চালনা বা ঝাপটানোর দরকার হয় না। বহু পাখি সময়ের পরিবর্তন বা আনুভূমিক বাতাসের গতিকে কাজে লাগায় এবং ঐ বাতাসের মাঝে নিজেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আনুভূমিক সঞ্চারের মুহূর্তগুলোকে কাজে লাগিয়ে উর্ধ্বারোহণ করে। আলব্যাট্রস পাখি এ ধরনের উর্ধ্বমুখী ভাবে ওড়ে এবং বাতাস থেকে বিপুল গতি ও শক্তি সঞ্চয় করে। এরপরে এই পাখি অবতরণমুখী উড্ডয়ন কৌশল কাজে লাগিয়ে সমুদ্রের উপরিভাগে খাদ্যের সন্ধানে বিরাট দূরত্ব অতিক্রম করে। যখন তার উড্ডয়নের গতি অনেকটাই হ্রাস পায় তখন অ্যালব্যাট্রস আবার ওপরের দিকে উড়তে শুরু করে এবং আবার নিম্নাভিমুখী অবতরণের জন্য একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে নিম্নাভিমুখী অবতরণমূলকভাবে ওড়ে। এই কৌশল কাজে লাগিয়ে অ্যালব্যাট্রস সাগরের ওপর হাজার হাজার মাইল ধরে ওপরের দিকে ওড়ে। এজন্য তার পাখা ঝাপটানোর প্রয়োজন হয় না। হামিং বার্ডের মতো কোনো কোনো পাখি আকাশে খাড়াখাড়ি উর্ধ্বে এমনকি খাড়াখাড়ি নিচেও উড়ে নামতে পারে। পাখির সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হলো তারা বাতাসে হেলিকপ্টারেরর মতো স্থির হয়ে থাকার ক্ষমতা ও তারই মধ্যে ফল থেকে মধু আহরণ করতে পারে। তাদের এই সামর্থ্যের গোপন রহস্য হলো তাদের পাখা তাদের কাঁধের সাথে একটি বিশেষ ধরনের সুইভেল (ঘূর্ণায়মান) সন্ধি সন্নিবেশিত থাকে।

www.bjilibrary.com

পাখির কঙ্কাল প্রকৃতির হালকা প্রকৌশল ও নির্মিতির অপূর্ব নিদর্শন। পাখির কঙ্কালে রয়েছে হালকা দেহকাঠামোর সাথে শক্তি সামর্থ্যের সমন্বয়। যে সব পাখি আকাশে ওড়ে তাদের বক্ষদেশের অস্থি খুবই হালকা- পাতলা হলেও তাতে সন্নিবেশিত রয়েছে গভীরে স্থাপিত একটি তলদেশের মতো বিস্তৃততর পাত বিশেষ যার সাথে আটকানো রয়েছে ওড়ার জন্য শক্তিশালী পেশী। ওড়ার জন্য হালকা, পাতলা শারীরিক গড়ন অত্যাবশ্যক বলে পাখির শরীরে অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে ব্যবস্থা রয়েছে বায়ুথলি বিন্যাসের আকারে। এই বায়ুথলিগুলো পাখির শরীরের এমনকি ফাঁপা হাড়ের মধ্যে সহ প্রায় সকল অঙ্গে বিন্যস্ত রয়েছে। এই জটিল ধরনের বায়ুথলিগুলোর সাথে বুদ্বুদের বুনট পাখিকে অধিকতর বড়ো ফুসফুস বিশিষ্ট স্তন্যপায়ী প্রাণীদের চেয়েও তার প্রশ্বাসের বায়ুও তার ছোট্ট ফুসফুসে অনেক বেশি দক্ষতার সঙ্গে ছেড়ে দিতে সমর্থ করে। এই বায়ুথলিগুলো পাখির জন্য তাপনিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার কাজটিও করে। বলা দরকার পাখির দেহের বিপাকীয় ব্যবস্থা দ্রুততর। পাখির শরীরের তাপও থাকে অনেক বেশী। আর সেই সাথে ঘাম শীতল করার জন্য কোনো গ্রন্থিরও ব্যবস্থা নেই।

পাখির পাখনা এক অনন্য সাধারণ বস্তু। এই পাখনা পাখিকে সন্দেহাতীত ভাবে সকল আকাশচারীর মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে। পাখনা অত্যন্ত হালকা ও গঠনের দিক থেকে শক্তিশালীও। পাখির পাখনার শক্ত দাঁড় একটা ঋজুতা দেওয়ার সাথে সাথে পাখনার অগ্রভাগকে বাতাসে ওড়ার জন্য নাড়াচাড়া করার স্বাচ্ছন্দ্য দেয়। পাখনার নকশার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতা পাখনাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে ধরলে বোঝা যায়। এতে দেখা যাবে প্রতিটি আনুভূমিক ফলার মতো বস্তু পাখনার মূল দণ্ড থেকে তীর্যকভাবে আড়াআড়ি বিন্যস্ত আর এগুলোর সাথে সংলগ্ন রয়েছে অসংখ্য ক্ষুদ্রাকার শাখা (barbules) যা নিকটবর্তী ফলাগুলোতে হেরিং মাছের কাঁটার মতো বিন্যাসে অধিব্যাপিত হয়ে আছে। আর এগুলো থেকে অতি ক্ষুদ্রাকৃতি কিছু বস্তু বেরিয়ে আছে যেগুলোকে ফলার শাখাণু বা বারবিসেল বলা হয়। এরকম বারবিসেলের সাথে অতি ক্ষুদ্র বঁড়শির মতো আংটা সংলগ্ন থাকে আর এগুলো পরিপাটিভাবে সবকিছু তার যথাস্থানে স্থির থাকতে সাহায্য করে। এভাবে স্পষ্টত দেখা যায়, পাখির এই পাখনা আকাশে ওড়ার জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত উপহার বিশেষ।

পাখির আকার যতো বড়ো হবে, পাখির ওড়ার সমস্যাও ততোখানি বাড়বে। পাখির ওজন রৈখিকভাবে ঘন মাত্রার হারে বাড়ে আর সেই সাথে পাখির বর্গের আকারে উপরিতলের আয়তনও বাড়ে। পাখির উন্নততর উড্ডয়ন সামর্থ্য নির্ভর

www.bjilibrary.com

করে উচ্চতর উপরিতল এলাকার ওপর। কেননা, বাতাসে অক্সিজেনের সীমাবদ্ধতার কারণে নিম্ন তাপমাত্রা ও বাতাস পাতলা হয়ে আসার জন্য পাখিরা সাধারণত আকাশে ১০ থেকে ১৫ হাজার ফুট ওপরে ওঠে। পাখিদের ২৪ ঘণ্টায় গড় উড্ডয়নের হার ৩০০-৪০০ মাইল। কোনো কোনো পাখি অবশ্য ২৪ ঘন্টায় ৭০০ মাইল পর্যন্ত ওড়ে বলে রেকর্ড করা হয়েছে। কোনো কোনো পাখি খাদ্যের এক বিরাট এলাকা অত্যন্ত উঁচু দিয়ে ওড়ে। মৌসুমি পাখি যেমন সাইবেরিয়ার পাখিরা আকাশের অত্যন্ত উঁচু দিয়ে অত্যন্ত নিয়মিত ও নিখুঁতভাবে অবিশ্বাস্য দূরত্বের গন্তব্যে চলাচল করে।

মানুষের আকাশে ওড়ার আকাঙ্খা উনিশ শতকের শেষাবধি পূরণ হয়নি। ঐ সময়ে আমেরিকার রাইট ভ্রাতৃদ্বয় গ্লাইডারের উড্ডয়নের নিয়ম সূত্রকে ভিত্তি করে তাঁদের ঐতিহাসিক আকাশ ভ্রমণে সক্ষম হন। মানুষ পাখির ওড়ার জটিল কার্যপ্রণালী সমীক্ষা করে ক্রমান্বয়ে আধুনিক বিমান তৈরি করে। বিমানের মাটি থেকে ঊর্ধ্বারোহণ ও সামনের দিকে ঠেলে দেওয়ার শক্তি আসে তার প্রপালশান ইঞ্জিন ব্যবস্থা থেকে। এই ইঞ্জিন বা টার্বাইনচালিত প্রপেলার বা টার্বাইন সৃষ্ট জেট প্রবল বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি করে বিমানের পাখায় শক্তি যুগিয়ে ঊর্ধ্বারোহণের ব্যবস্থা করে।[১২]

প্রকৃতির এইসব নিয়ম সূত্র সম্পর্কিত জ্ঞান বা স্রষ্টা নির্ধারিত 'নিদর্শনগুলো' সত্যিকার অর্থেই উপলব্ধির বিষয়।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Encyclopaedia Americana.
2. Encyclopaedia of Science and Technology, McGraw Hill, Vol. 5, 1977.

www.bjilibrary.com

٨٠- وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ
بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا
وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ۝

১৬ ঃ ৮০ এবং আল্লাহ্ তোমাদের আবাসস্থলকে করেন তোমাদের আবাসস্থল যেখানে তোমরা বিশ্রাম নিতে পার ও নীরবে থাকতে পার এবং এজন্য তিনি তোমাদের জন্য পশুচর্মের তাঁবুর ব্যবস্থা করেন, তোমরা ভ্রমণকালে এটা সহজে বহন করতে পার এবং (কোথাও) অবস্থানকালে সহজে খাটাতে পার এবং তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পশুর পশম, লোম ও কেশ হতে কিছুকালের জন্য স্থায়ী গৃহসামগ্রী ও ব্যবহার উপরকণ।

আল্লাহ্ তাঁর অপার অনুগ্রহে মানুষকে উন্নত বুদ্ধিমত্তা এবং নতুনতর জ্ঞান অর্জনের এবং অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হবার সামর্থ্য দিয়েছেন। আর এই সুবাদে মানুষ ক্রমে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে ও তার সুবিধা মতো পরিবেশ বদলে নিয়েছে। এক সময়ে মানুষ উত্তমভাবে ছাউনিযুক্ত ও সুরক্ষিত আবাস নির্মাণে সমর্থ হয়েছে যেখানে সে তার পরিবার নিয়ে বাস করতে, বিশ্রাম নিতে ও নিরাপত্তা, শান্তি ও আয়েশের সঙ্গে নিদ্রা যেতে পারে। মানুষের এই অগ্রযাত্রায় সে নানা জীবজন্তুর চামড়া প্রক্রিয়াজাত করার ও সে ভাবে চামড়া সংরক্ষণের নানা পদ্ধতি বের করেছে। নানাভাবে এ চামড়ার ব্যবহার করতে শিখেছে। মরুচারী ও মরুবাসী যাযাবর বেদুঈন গোত্রগুলো যারা সাধারণত তাঁবুতে বাস করে তাদের জন্য এই জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার বেলায় চামড়ার এই হালকা তাঁবু বেশ কাজে লাগে। তাছাড়া এ ধরনের তাঁবু সহজে খুলে ফেলে গুটিয়ে নেওয়া যায়। আর সহজে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে সেখানে খুব একটা অসুবিধে ছাড়াই তাঁবু স্থাপন করা যায়।

এছাড়াও মানুষ ভেড়ার চমৎকার পশম, ছাগলের মোটা পশম ও উটের নরম পশম থেকে চমৎকার সুতো তৈরি করে তা দিয়ে মানুষের আরাম-আয়েশ ও সুবিধের জন্য কম্বল ও গরম কাপড় তৈরি করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। এসব জিনিসপত্র মানুষকে ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা করে ও এগুলো তৈরির কাঁচামাল বাস্তবিকপক্ষে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে মহৎ উপহার। এসব উপহার অবশ্য যে ইহজাগতিক উপহার তা মনে রাখা দরকার। এগুলো কেবল কিছু সীমিত সময়ের জন্য স্থায়ী।

www.bjilibrary.com

٨١. وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ○

১৬ ঃ ৮১ এবং আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা হতে তিনি তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের; তা তোমাদেরকে তাপ হতে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদের জন্য বর্মের, তা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে। এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর।

এই সূরায় আল্লাহ্ চার ধরনের নিরাপত্তামূলক অনুগ্রহের কথা বলেছেন। এগুলো হলো- (১) যেসব বস্তু আমাদের ছায়াদান করে; (২) পাহাড়-পর্বত যেগুলো আমাদেরকে আশ্রয় দেয়; (৩) বস্ত্রাদি যা আমাদের তাপ থেকে রক্ষা করে; ও (৪) পশুচর্ম নির্মিত বর্মবিশেষ যা শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। ছায়ার কাঠামো সম্পর্কে সূরা ২৫ ঃ ৪৫ এ আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা হচ্ছে গাছের ছায়ায়, কোনো উঁচু বস্তুর পাশে মাটিতে, পাহাড়ের পাশে এবং ছাদওয়ালা বাড়ীতে কড়া রোদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আশ্রয় নেওয়া। এমনকি মেঘের কারণে যে ছায়ার সৃষ্টি হয় তাও মরু অঞ্চলে আরামদায়ক। সূরা ৭ ঃ ১৬০-এর আওতায় মেঘের ছায়ার বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। মানুষ ছায়াকে আরও এক কাজে ব্যবহার করেছে। আগেকার দিনে মানুষ সূর্যঘড়ির ছক এঁকে দিনের সময় নির্ণয়ের উপায় বের করেছে। দিনের বিভিন্ন সময়ে মাটিতে স্থাপন করা একটি নির্মিত কাঠামোতে সূর্যের আলো পড়ার পর যে ছায়া তৈরি হয় তার দৈর্ঘ্য মেপে ও দেখে সময় নির্ণয় করা হতো।

পাহাড়-পর্বত সম্পর্কে বলা যায়, স্মরণাতীতকাল থেকেই মানুষ জানে বিভিন্ন সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত পাহাড়ের গুহাগুলো বন্যপশুর আক্রমণ, উত্তাপ ও ঠাণ্ডা থেকে সুরক্ষিত ও উত্তম আশ্রয়স্থল। পাহাড়ের গুহাগুলোর অধিকাংশই সৃষ্টি হয়ে থাকে ভূমি ধসের কারণে। পাহাড়ের ফাটল দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে। তাতে মাটি

www.bjilibrary.com

গলে যায়, পাথর১ ক্ষয়ে যায় ও স্থানান্তরিত হয়। এভাবে খোদিত হয়ে তৈরি হওয়া গুহাগুলোতে সাধারণত ভালোভাবেই বায়ু চলাচল করে ও আলোকপাত ঘটে। আর গুহার ভেতরকার তামমাত্রাও মোটামুটি স্থির থাকে। এই তাপমাত্রা সাধারণত সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের২ গড় বার্ষিক তাপমাত্রার চেয়ে কিছুটা কম। সবচেয়ে আদি গুহাবাসী মানুষের বাস ছিল চীনে আনুমানিক ৩,৬০,০০০ বছর আগে। ইউরোপে মানুষ সম্ভবত আনুমানিক ৭০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ বছর আগে বাস করতো। শ্রীলঙ্কার ভেদ্দা সম্প্রদায়ের মতো কিছু আদিবাসী লোক কিছুকাল আগে অবধিও গুহায় বাস করত। ফ্রান্স ও স্পেনের কিছু গুহায় প্রাগৈতিহাসিক মানুষ গুহার প্রস্তর গাত্রে ছাপ দিয়ে ও খোদাই করে নানা চিত্রময় অলঙ্করণ করে রাখতো। জর্দান, ইরাক ও অন্যান্য দেশের কোনো কোনো অংশে গরীব লোকেরা আজও গুহায় বাস করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে পাহাড়-পর্বতের কোন কোন গুহা বিমান আক্রমণ থেকে নিরাপদ আশ্রয় স্থল বা খাদ্য গুদাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও উঁচু পাহাড় শ্রেণী বা পর্বতমালা বহিরাগত আকমণকারীদের হামলার বিরুদ্ধে কার্যকর রক্ষা প্রাচীর হিসেবে কাজ করে।

পরিধেয় বস্ত্রের বিষয়ে বলা যায়, কালপরিক্রমার একটি পর্যায়ে মানুষ তার আল্লাহ্ প্রদত্ত মেধা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাবলে নানা ধরনের তন্তু ও সুতো তৈরি করতে সমর্থ হয় এবং কেবল শীত থেকে নয় গরম থেকে শরীরকে রক্ষা করতে সুতো বা তন্তু বুনতে শেখে। বস্ত্র উত্তম তাপ কুপরিবাহী, আর এর মধ্যে রয়েছে বাতাসপূর্ণ অতি ক্ষুদ্র রন্ধ্র। আমরা বস্ত্র বয়ন শিল্পজাত কাপড়ের যেসব জামাকাপড় পরি তা বাইরে থেকে অতিরিক্ত তাপ আমাদের দেহকে পৌঁছুতে দেয় না ও তাতে করে আমরা অস্বস্তির হাত থেকে বেঁচে যাই। আর তাপজনিত কারণে কোনো স্ফোটকও হয় না।

সবশেষে বর্ম তথা চামড়ার ঢালের আলোচনায় বলতে হয়, মানুষের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃততর হওয়ার সাথে সাথে মানুষ লৌহ্ আকর আবিষ্কার করেছে এবং তা থেকে আকর তুলে তা দিয়ে বহু দরকারি হাতিয়ার বিশেষ করে ঢাল তৈরি করেছে। এই ঢাল বা বর্ম যুদ্ধে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. The World Book of Encyclopaedia, Field Enterprises Educational Corporation, Vol. III, London, 1966.
2. Collier's Encyclopaedia, Colliers and Sons Limited, Vol. V, USA, 1980.

www.bjilibrary.com

١١٤- فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ○

১৬ ঃ ১১৪ অতএব, আল্লাহ্ যা কিছু হালাল ও পাক রিয্ক্ তোমাদেরকে দান করেছেন তা খাও এবং আল্লাহর অনুগ্রহের (নেয়ামতের) শোকর আদায় কর যদি সত্যি তোমরা তাঁরই এবাদত কর।

খাদ্যের হালাল হারাম বিষয়ে ২ ঃ ১৬৮ ও ২ ঃ ১৭২ আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

١١٥- إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

১৬ ঃ ১১৫ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য মরা জীব, রক্ত শূকরের মাংস আর সেই সব জন্তু যাদেরকে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নামে জবাই করা হয়েছে হারাম করেছেন। অবশ্য ক্ষুধার ফলে বাধ্য হয়ে আল্লাহ্র আইনের বিরোধী বা সীমালংঘনকারী না হয়ে খায় তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দয়ালু ও ক্ষমাশীল।

এ বিষয়ে ২ ঃ ১৭৩ আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

١٢- وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً
لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ
وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ○

১৭ ঃ ১২ আমি রাত্রি ও দিবসকে করেছি দুটি নিদর্শন; রাত্রির নিদর্শনকে অপসারিত করেছি ও দিবসের নিদর্শনকে আলোকপ্রদ করেছি যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষ সংখ্যা ও হিসাব নির্ণয় করতে পার; এবং আমি সব কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

উল্লিখিত আয়াতের এই অংশে রাত ও দিনকে আল্লাহ্র দুটি নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই রাত ও দিনের বিষয়ে ব্যাখ্যা রয়েছে সূরা ২ ঃ ১৬৪ সম্পর্কিত আলোচনার আওতায়।

www.bjilibrary.com

١٧- وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ
خَبِيرًا بَصِيرًا ○

১৭ ঃ ১৭ নূহের পর আমি কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি। তোমার প্রতিপালকই তাঁর বান্দাদের পাপাচরণের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট।

এই আয়াতে নূহ (আ)-এর পর কয়েক প্রজন্মের মানব ধ্বংসের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কোন কোন প্রজন্ম তা উল্লেখ করা হয়নি কিংবা কোন অপরাধে তাদের ধ্বংস করা হলো তারও উল্লেখ নেই। সূরা ৭ ঃ ৪ সম্পর্কিত আলোচনার আওতায় বিভিন্ন মানব প্রজন্মের ধ্বংসের উল্লেখ নয়, বিভিন্ন শহর ধ্বংসের বিবরণ রয়েছে।

٤٤- تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۗ
وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ
إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ○

১৭ ঃ ৪৪ সপ্ত আকাশ পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুই তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রসংশ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না; তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

সূরা ২ ঃ ২৯ সম্পর্কিত আলোচনার আওতায় সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী সম্পর্কিত বিষয়ের বিবরণ আছে। সপ্ত আকাশ ও পৃথিবীতে সৃষ্ট সকল জড় বস্তু ও প্রাণী যে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে তার অর্থ তারা তাদের জন্য আল্লাহ্ নির্ধারিত বিধি-বিধান কঠোর নিষ্ঠার সাথে পালন করে তাঁরই মহিমা ঘোষণা করে। বিষয়টি সূরা ১৩ ঃ ১৫ সম্পর্কিত আলোচনার আওতায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

٦٦- رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ
إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ○

১৭ ঃ ৬৬ তোমাদের প্রতিপালক তিনিই যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালিত করেন, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার। তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

www.bjilibrary.com

সূরা ২ ঃ ১৬৪ সম্পর্কিত আলোচনার আওতায় জাহাজ নির্মাণ ও তাদের নৌযাত্রা সম্পর্কিত ব্যাখ্যা ও বিবরণ রয়েছে।

٦٨- أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا
ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ۝

১৭ ঃ ৬৮ তোমরা কী তা হলে নিরাপদ বোধ কর যে যখন তোমরা যমীনে অবস্থান কর তিনি তোমাদেরকে মৃত্তিকার নিচে গ্রাস করবার কারণ ঘটাবেন না কিংবা তোমাদের উপর শিলাবর্ষণসহ প্রচণ্ড ঝড় পাঠাবেন না? তখন তোমরা কাকেও পাবে না তোমাদের বিষয়াদি পরিচালনা করতে।

এই আয়াতে মানুষকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে তারা যেন ধরাপৃষ্ঠে থাকতে পারছে বলেই নিজেদেরকে নিরাপদ বোধ না করে। উল্লেখ করা হয়েছে, স্থলভাগও ভূমিকম্প ও ঝড়ের ধাক্কা সাপেক্ষ। এই দুই প্রাকৃতিক দুর্বিপাকই বিরাট বিপর্যয় ঘটাতে পারে ও তাতে বহুসংখ্যক লোকের প্রাণহানি ঘটতে পারে।

১. সূরা ৭ ঃ ৯১-এর আলোচনায় ভূমিকম্পের বিষয় আলোচিত হয়েছে।

২. কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ঘূর্ণিবাত্যা হওয়ার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, আবহাওয়ার নানা উপাদানের মধ্যে বাতাস সম্ভবত সবচেয়ে হেঁয়ালিময়। মূলত বাতাস হলো বায়ু যা গতিতে বিদ্যমান রয়েছে। তবে এমনকি একটি মাত্র মৌসুমেও বাতাসের শক্তি ও প্রবাহের দিকের মধ্যে যে বিরাট বৈচিত্র্য রয়েছে সে সবের কারণ বহু ও জটিল। স্থলভাগ থেকে বাতাসের প্রবাহ যখন সমুদ্রে এসে পড়ে কিংবা সমুদ্র থেকে বাতাস স্থলভাগে প্রবাহিত হয় তখন বাতাস যে আকার নেয় ও যে শক্তি বা প্রচণ্ডতায় প্রবাহিত হয় তা সর্বদাই ক্রমাগতভাবে পরিবর্তনশীল তাপমাত্রার বিন্যাস, পাহাড়-পর্বত ও অন্যান্য ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগত কারণ ও সেই সাথে পৃথিবীর আপন কক্ষে[১] আবর্তনের কারণে প্রভাবিত হয়।

বাতাসের গতি বর্তমানে বিউফোর্ট স্কেল দ্বারা নির্ণীত হয়ে থাকে। বাতাসের গতির ভিত্তিতে এই বিউফোর্ট স্কেলে জল বা স্থলভাগের পরিস্থিতি নির্ণয় করা যায়।

www.bjilibrary.com

বিউফোর্ট নং	শিরোনাম	গতিসীমা (৩৩ ফুট) খোলা জায়গায় (ঘন্টায়প্রতিমাইল)	স্থলভাগের সাধারণ চিত্র	জলভাগের সাধারণ চিত্র
০	শান্ত	১-এর কম	শান্ত	আলোড়ন নেই
১	হালকা বাতাস	১-৩	বাতাসের গতি ধোঁয়ার প্রবাহ দ্বারা প্রদর্শিত	ছোট দৈর্ঘ্যের ঢেউ
২	হালকা মৃদু বাতাস	৪-৭	গাছের পাতার খসখস আওয়াজ	ছোট ছোট তরঙ্গ
৩	মৃদুমন্দ বাতাস	৮-১২	পাতা ও ছোট ফড়কির অনবরত আন্দোলন	অপেক্ষাকৃত বড়ো তরঙ্গ
৪	মাঝারি	১৩-১৮	ধূলো ওড়ে, ঝরা পাতা ও শাখা দূরে সরে যায়	আরও বড়ো তরঙ্গ
৫	তাজা বাতাস	১৯-২৪	ছোট আকারের গাছ ও পাতা দুলতে শুরু করে	মাঝারি ধরনের ঢেউ ও আরও লক্ষ্যণীয় দৈর্ঘ্যের ঢেউ
৬	জোর বাতাস	২৫-৩১	বড়ো ডালপালার ব্যাপক আন্দোলন	বড়ো আকারের তরঙ্গ ও ফেনায়িত উর্মিশীর্ষ
৭	মাঝারি ঝড়	৩২-৩৮	গোটা গাছ দুলতে থাকতে	সাগর উচ্ছ্বাসিত হয়ে ওঠে
৮	নতুন সৃষ্ট ঝড়	৩৯-৪৬	গাছের ফড়কি ভেঙ্গে উড়িয়ে নেয়	মাঝারি ও প্রচুর ফেনাময় তরঙ্গ
৯	প্রবল ঝড়	৪৭-৫৪	নির্মাণ কাঠামোসমূহের সামান্য ক্ষয়ক্ষতি	উঁচু তরঙ্গ ও ঘন ফেনা
১০ .	পূর্ণ ঝড়	৫৫-৬৩	উৎপাটিত বৃক্ষ, বাড়িঘরের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি	অত্যন্ত উঁচু তরঙ্গ
১১	প্রবল ঝড়	৬৪-৭৫	ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি	এতো উঁচু ঢেউ যে সঙ্কীর্ণ চ্যানেলে থাকা জাহাজও দেখা যায় না
১২	হারিকেন	৭৫-এর উর্ধ্বে	"	বাতাসে ফেনা ও অন্যান্য দ্রব্য

তথ্যসূত্র ঃ

1. B. David Bowen, Britain's Weather, pp. 29-32.

www.bjilibrary.com

٧٠. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ
وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۝

১৭ ঃ ৭০ আমি তো আদম সন্তানদেরকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের জন্য যানবাহন দিয়েছি; তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপরেই তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

এই আয়াত অনুযায়ী, আল্লাহ্ মানুষকে কী বৈশিষ্ট্য ও গুণ দিয়েছেন সে সবের বিষয় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষকে সৃষ্টিধর্মী বুদ্ধিমত্তা দিয়েছেন যা আল্লাহ্ তাঁর অন্যান্য সৃষ্টিকে দেননি। মানুষ তার এই সৃষ্টিধর্মী মেধা দিয়ে নানা যন্ত্রপাতি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। যন্ত্র দ্বারা মানুষ জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে। আল্লাহ্ মানুষকে বিভিন্ন বস্তু দান করেছেন সেগুলি থেকে তাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন খুঁজতে হয়। বস্তুত মানুষ যে দিন থেকে এই ধরায় অস্তিত্বশীল ঠিক সেই দিনটি থেকে এই কাজটিই করে আসছে। মানুষের এই সৃষ্টিধর্মী মেধা মানুষের জন্যই বিশেষ অনুগ্রহ। তারা এজন্য কৃতজ্ঞতার সাথে সে কথা স্মরণ করবে সেটিই প্রত্যাশিত।

١٠١. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ
فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ۝

১৭ ঃ ১০১ তুমি বনি ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা করে দেখ আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম; যখন তিনি বনি ইসরাঈলদের সমীপে আসলেন ফিরআউন তাঁকে বলেছিল "হে মূসা, আমি তো মনে করি তুমি যাদুগ্রস্ত।

মূসাকে (আ) প্রদত্ত নয়টি স্পষ্ট নিদর্শনের মধ্যে তিনটি হলো عصا (আছা/ ছড়ি) (সূরা ৭ ঃ ১০৭) এবং খরা (السنين ونقص من الثمرات) ও স্বল্প ফসলের বছর (সূরা ৭ ঃ ১৩০)। ছড়ি/ আছার অলৌকিক গুণগুলো বক্ষমান রচনায় আলোচনার অবকাশ নেই। খরার বছরগুলো বৃষ্টিহীনতা ও একনাগাড়ে শুকনো আবহাওয়ার পরিণতিতে হতে পারে যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে ফসলের ক্ষেত্রে। আল্লাহ্র ইচ্ছায় নীল নদের উপত্যকার মতো উর্বর ও রেকর্ড

www.bjilibrary.com

বৃষ্টিপাত সমৃদ্ধ অঞ্চলেও হতে পারে দীর্ঘকাল বৃষ্টিপাতের অভাব যার ফলে নদীতে পানি জোগানের গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ উৎসও শুকিয়ে যায়। আর অল্প ফসল হতে পারে নানা কারণে। এসব কারণের অন্যতম হলো খরা। কারণগুলো হলো (১) গোলায় বীজ মওজুদ থাকাকালে পোকা বালাইয়ের আক্রমণে রুগ্ন বীজ জমিতে বপনের কারণে; (২) আবাদকালে পানির নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাবে; (৩) ফসলের সুস্থ বিকাশ ও বীজ উৎপাদনের জন্য মাটিতে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের অভাবে; ও (৪) ছত্রাক ও পোকামাকড়ের বালাই ইত্যাদির জন্য। মানুষের সর্বোত্তম প্রয়াস ও যত্ন সত্ত্বেও উল্লিখিত সমস্যাগুলোর কোনো কোনোটি থাকতেই পারে।

ফিরআউনের প্রজাদের জন্য অবশিষ্ট ছয়টি নিদর্শনের পাঁচটি হলো : মহাপ্লাবন الطوفان।, পঙ্গপাল الجراد।, ফসলের ক্ষতিকর কীট, মুষিকাদি قمل, ব্যাঙ الضفادع।, ও রক্ত الدم। যা আল্লাহ্ ফিরআউনের রাজ্যে পাঠিয়েছিলেন তাদের ঔদ্ধত্যের জবাবে শুদ্ধিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে যদিও এ বিষয়ে তাদেরকে মূসা (আ) বারবার হুঁশিয়ার করেছিলেন। এই হুঁশিয়ারির বিষয় ইতিমধ্যে সূরা ৭ : ১৩৩-এর আওতায় আলোচিত হয়েছে।

অবশিষ্ট একটি অর্থাৎ নবম যে নিদর্শনটি মূসাকে (আ)-কে দেওয়া হয় সেটি ছিল সুখ্যাত অলৌকিক বস্তু যার নাম البيضاء। اليد। (উজ্জ্বল হস্ত) যে বিষয়টি এই বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনার আওতা বহির্ভূত।

* খরার নিয়ন্ত্রণ খুবই কঠিন ব্যাপার। কারণ, এ সমস্যার সমাধান করতে হলে বিপুলসংখ্যক শর্ত পরিমিতিসহ বহু ব্যবস্থার সমাবেশ বা আয়োজন থাকা আবশ্যক। তাই খরার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ্র হাতে আর এটাকে তাঁর নিদর্শন হিসেবে ধরা যায়।

١٧. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت
تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ

১৮ : ১৭ সূর্য উদিত হলে তুমি দেখতে পেতে- ওরা যখন গুহার প্রশস্ত চত্বরের মাঝে পড়েছিল তখন সূর্য গুহার দক্ষিণ দিকে হেলে যায় আর যখন সূর্য তাদের থেকে বামে সরে গিয়ে অস্ত যায়। এই সময়ই আল্লাহ্র নিদর্শন।

এই আয়াতে আসহাবুল কাহফের (গুহাবাসী সঙ্গী) সাত সঙ্গী যে গুহায়

www.bjilibrary.com

৩০৯ বছর ঘুমিয়েছিলেন সেই গুহার অবস্থান সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। সাত মুমিন যুবক আল্লাহ্‌তে তাদের বিশ্বাসের জন্য তাদের ওপর অত্যাচার করা হতে পারে এই ভয়ে পাহাড়ের এক গুহায় আশ্রয় নেয় ও ঘুমিয়ে পড়ে। এভাবে ৩০৯ বছর ঘুমিয়ে থাকার পর তারা জেগে উঠে। তখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। সাধারণত মনে করা হয় এটি হলো এফিসিউসের সাত খ্রিস্টান যুবকের কাহিনী যারা রোমক সম্রাটের অত্যাচারের ভয়ে তাদের ঐ শহর ছেড়ে যায়। গিবনের 'Decline and Fall of Roman Empire'- গ্রন্থে এভাবেই বর্ণনা রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, সূর্য এমন অবস্থানে ছিল যে গোটা বছর ধরে তার কিরণ সরাসরি গুহায় প্রবেশ করতো না। সূর্য উঠতো গুহার ডান দিকে আর অস্ত যেতো বাম দিকে। সূর্যের প্রাত্যহিক চক্রপথ ছিল দক্ষিণে কর্কট ক্রান্তি থেকে মর্কট ক্রান্তিতে। যেহেতু আলোচ্য গুহার বেলায় সূর্য ডান দিকে উঠে বাম দিকে অস্ত যেতো সেহেতু স্পষ্টতই গুহার প্রবেশ পথ ছিল উত্তর দিকে। আর কোনো মানুষ ঐ গুহামুখে দাঁড়ালে সে তার ডান দিক থেকে সূর্যোদয় দেখবে ও বামদিকে সূর্য অস্ত যাবে। কাজেই ঐ গুহার অবস্থান অবশ্যই কর্কট ক্রান্তির উত্তরে অবস্থিত ছিল।

কুরআনে গুহার সত্যিকারের অবস্থানের উল্লেখ নেই। খ্রিস্টান কাহিনী অনুযায়ী, এফিসিউসের গুহার অবস্থান ছিল উত্তরে ৩৮° ডিগ্রি দ্রাঘিমায়। এরকম অবস্থানে কোনো গুহার প্রবেশপথ উত্তর দিকাভিমুখী হলে সে গুহার ভেতরে কখনও সূর্যকিরণ প্রবেশ করার কথা নয়। তাই এফিসিউসের গুহার অবস্থানটি কুরআনে গুহার বর্ণনার সাথেই সঙ্গতিপূর্ণ।

۳۷- قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا

১৮ ঃ ৩৭ তার প্রতিবেশী (কথা প্রসঙ্গে) তাকে বলল, তুমি কী কুফরী কর তাঁর (সেই মহান আল্লাহ্‌র) সাথে যিনি তোমাকে প্রথমে মাটি থেকে, পরে নুৎফা থেকে এবং পরে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করলেন?

অবিশ্বাসীরা সব সময়ই আল্লাহ্ ও তাঁর সৃষ্টি ক্ষমতা সম্পর্কে মিথ্যা আরোপ

www.bjilibrary.com

ও অবিশ্বাস করে আসছে। কিন্তু যদি কেউ নিরপেক্ষ ভাবে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি পর্যবেক্ষণ করে তবে তাকে অবশ্যই বিজ্ঞানী হতে হবে।

এখানে আল্লাহ্‌ মানব সৃষ্টির প্রাথমিক স্তরগুলোর উল্লেখ করেছেন। মানুষ যে মাটি থেকে সৃষ্ট এ সম্পর্কে ২ ঃ ২৮ আয়াতে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। আয়াতের تراب বলতে ধূলাবালি বুঝায়। অর্থাৎ মানুষ মাটিতে মওজুদ বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ থেকে সৃষ্ট। কারণ মানুষের শরীরের সকল মৌলিক পদার্থ তার খাদ্য থেকে আহরিত। আর খাদ্য (শাক-সব্‌জি মাছ মাংসসহ) সবই শেষ পর্যন্ত মাটি থেকে উদ্ভূত। সুতরাং মানুষ মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্ট। পশুপক্ষী সবই সব্‌জি বা গাছপালা খেয়ে বাঁচে যা মাটিতে জন্মে। এই বিষয়টি ২৩ ঃ ১২ আয়াতে বলা হয়েছে যা উক্ত আয়াতের সঙ্গে আলোচিত হবে।

মানুষ যে ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين থেকে সৃষ্ট এ বিষয়ে ১৬ ঃ ৪ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। মানুষ মায়ের পেটে মায়ের নুৎফার ডিম্ব আর বাপের নুৎফার শুক্রকীট এর মিলনে সৃষ্ট zygote থেকে উদ্ভূত তা আজ বৈজ্ঞানিক সত্য। এই সৃষ্টিতে মানুষের সরাসরি কোন কর্তৃত্ব বা কৃতিত্ব নেই। শিশুর লিঙ্গ আল্লাহ্‌ই ঠিক করেন এবং এর উপর মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।

٤٠- فَعَسَىٰ رَبِّيْٓ أَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ۝

১৮ ঃ ৪০ তবে হয়ত আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন এবং তোমার উদ্যানে আকাশ থেকে নির্ধারিত বিপর্যয় প্রেরণ করবেন, যার ফলে তা উদ্ভিদ শূন্য মাটিতে পরিণত হবে।

হুসবানান শব্দটির আক্ষরিক অর্থ (মর্মে উপলব্ধি করানোর উপায় হিসেবে) আর আলোচ্য আয়াতে এর প্রচ্ছন্ন অর্থ হতে পারে আকাশ থেকে নেমে আসা কোনো দুর্বিপাক। আলোচ্য প্রসঙ্গের আলোকে এই দুর্বিপাক বলতে বজ্রপাত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

বজ্রপাত সবসময় বিজলী চমকানোর সাথে সম্পর্কিত; মেঘ থেকে পৃথিবীর

www.bjilibrary.com

মাটিতে বজ্রপাতের ফলে প্রাণহানি ছাড়াও বিষয় সম্পত্তির যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। বজ্রপাতে যে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হয় তাতে যে পথ দিয়ে বজ্রপাত ঘটে সেই পথ বরাবর ও কাছাকাছি সবকিছুই পুড়ে যেতে পারে যদি না মাটির সাথে সংযোগসহ বজ্রপাতের বিরুদ্ধে রক্ষামূলক ব্যবস্থা না থাকে। প্রতি বছর বজ্রপাতে কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই আনুমানিক ১৫০ ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটে, ২ কোটি ডলার মূল্যের সম্পত্তির ক্ষতি হয়, ১০,০০০-এর মতো ঘটনা ঘটে ও ৩ কোটি ডলার মূল্যের দামী ও বিক্রির উপযোগী কাঠ[১] ধ্বংস হয়ে থাকে। বজ্রপাত ঘটলে এমনকি একটি চমৎকার তরুলতার সুন্দর বাগানও অল্পদিনের মধ্যেই পতিত ভূমিতে পরিণত হয়, অত্যন্ত উর্বর জমি একেবারেই উষর, অনুর্বর হয়ে ওঠে এবং ক্রমে বালুময় হয়ে পরিশেষে কার্যত এক নিদারুণ মরুভূমি হয়ে ওঠে।

বিজলী চমক ও বজ্রপাতের বিধ্বংসী প্রভাব প্রতিক্রিয়ার বিষয় কিছুটা বিশদ কলেবরে সূরা ১৩ ঃ ১২-তে এ সম্পর্কিত আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

শিলাঝড়, হারিকেন কিংবা বেশ বড়ো আকারের জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড পৃথিবীতে আঘাত হানে। এ ধরনের উল্কাপিণ্ড পৃথিবী পৃষ্ঠে আঘাত হানার পর ঐ প্রচণ্ড আঘাতে যে গর্তের সৃষ্টি হয় তাতে আটকে থাকে। এ ধরণের উল্কাপাতে সুন্দর বাগানও ধ্বংস হয়।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Encyclopaedia Britannica, Vol. 10, 15th edition, p. 966, 1980.

www.bjilibrary.com

৪১- اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا ○

১৮ ঃ ৪১ অথবা ঐ বাগানের পানি মাটির তলায় অন্তর্নিহিত হবে আর তোমরা কখনও তার সন্ধান লাভে সক্ষম হবে না।

বাগানে ভূগর্ভ থেকে যে পানি পাওয়া যায় সেই ভূগর্ভস্থ পানির প্রবাহ লোপ পাওয়ার ফলে বাগানটি মরুসদৃশ হয়ে উঠে ধ্বংস হতে পারে। বাগানের জন্য পানির এরূপ অনুপস্থিতি নানাভাবে ঘটতে পারে, যেমন ঃ

(১) পানির মূল উৎসটি শুকিয়ে যাওয়ায় পানির প্রবাহ বন্ধ হতে পারে; (২) ভূগর্ভে পানির স্তর আরও নিচে চলে যেতে পারে যার নাগাল পাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে উঠতে পারে; (৩) ভূমিকম্পের কারণে মৃত্তিকা স্তরের উত্থান-পতনের কারণে ঐ বাগান থেকে পানির প্রবাহের ধারাটি আরও দূরে অন্যদিকে পরিচালিত হতে পারে।

৪৫- وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ○

১৮ ঃ ৪৫ তাদের নিকট পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনের ঃ এটা পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যদ্দারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট যা উৎপাত হয়, অতঃপর যা বিশুদ্ধ হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ্ সব বিষয়ে আধিপত্যশীল।

আকাশ থেকে বারিপাত ও তার সাথে উদ্ভিদের বিকাশের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা ও ব্যাখ্যা রয়েছে সূরা ২ ঃ ২২ ও সূরা ২ ঃ ১৬৪-র আওতায়।

উদ্ভিদ সমৃদ্ধতর ও সুন্দর হয়ে উঠে এবং অপূর্ব ঘনশ্যাম চেহারা ধারণ করে। কিন্তু তার এই ঘন সবুজ তারুণ্য ও যৌবন চিরস্থায়ী নয় বরং নশ্বর ও সাময়িক। মাত্র সীমিত সময়ের জন্য এ অবস্থা স্থায়ী হয়। তারপর জরা, ক্ষয়গ্রস্ত হয়ে পড়ে আর বাতাসে উড়িয়ে নেওয়ার জন্য অচিরেই শুকনো আবর্জনায় পর্যবসিত হয়। এই তার অনিবার্য নিয়তি। তারপর তার আর কোনো অবশেষের চিহ্নমাত্র থাকে না। এই উপমার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমাদেরকে পৃথিবীতে আমাদের সাময়িক অস্তিত্বের প্রকৃতিটি বুঝে উঠতে সাহায্য করে।

www.bjilibrary.com

৪৭- وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝

১৮ ঃ ৪৭ এবং একদিন আমি পর্বতকে করব সঞ্চালিত এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে উন্মুক্ত সমতল প্রান্তর হিসেবে।

আনুমানিক পাঁচশ কোটি বছরের পরিক্রমায় সূর্য এক বিরাট রক্তিম গোলকে রূপান্তরিত হবে বলে মনে করা হয়। তখন এই সূর্যের ব্যাস তার বর্তমান আকার থেকে শতগুণ বাড়বে। আর তেমন অবস্থায় ১৪ বুধ ও শুক্র গ্রহকে গ্রাস করে পৃথিবীর কক্ষপথ প্রায় স্পর্শ করবে। পৃথিবীর সকল সমুদ্রের পানি বাষ্প হয়ে উবে যাবে। অতি প্রখর সূর্যকিরণে ধাতব সব বস্তু গলে যাবে। পৃথিবী হয়ে উঠবে এক প্রচণ্ড উত্তপ্ত কড়াইয়ের মতো। এখানে কোনো প্রাণী প্রাণ রক্ষা করতে পারবে না। পাহাড়-পর্বত উৎপাটিত হয়ে ধূলিকণায় পরিণত হবে। আর তা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়বে। আর এমনিভাবে পৃথিবীর স্থলভাগ এক বিশাল সমভূমির মতো হয়ে উঠবে।

৫৯- وَتِلْكَ الْقُرَىٰٓ أَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ۝

১৮ ঃ ৫৯ ঐ সব জনপদ- তাদের অধিবাসীবৃন্দকে আমি ধ্বংস করেছিলাম, যখন তারা সীমা লঙ্ঘন করেছিল এবং তাদের ধ্বংসের জন্য আমি স্থির করেছিলাম এক নির্দিষ্ট ক্ষণ।

এই আয়াতে অন্যায়কারী জনগোষ্ঠীর বিষয়ে বলা হয়েছে যারা একটি নির্ধারিত সময়ে ধ্বংস হয়ে যায়। এসব ঘটনার দৃষ্টান্ত নূহ (আ) সূরা ১১ ঃ ৪০, লূত (আ) সূরা ৭ ঃ ৮৪ এবং আদ ও ছামূদ জাতির ধ্বংসের মাঝে পাওয়া যাবে যাদের বিষয় সূরা ৭ ঃ ৭৮ ও ৯১-এ আলোচিত হয়েছে।

৯৩- حَتّٰىٓ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ۝

১৮ ঃ ৯৩ চলতে চলতে সে যখন দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌছল তখন সেখানে সে এক সম্প্রদায়কে পেল যারা তার কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না।

www.bjilibrary.com

৯৪-قَالُوا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰٓى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

১৮ ঃ ৯৪ তারা বলল, 'হে যুলকারনাইন! য়াজুজ ও মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে; আমরা কী তোমাকে কর দেব এই শর্তে যে তুমি আমাদের ও তাদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়ে দেবে?

ইবন খালদূন তাঁর সুবিখ্যাত রচনা মুকাদ্দিমা গ্রন্থে য়াজুজ ও মাজুজের দেশের একটি ধারণা দিয়েছেন। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী, "পৃথিবীর আবাদী অঞ্চল উত্তরাভিমুখেই অধিকতর সম্প্রসারিত ও বিস্তৃত। আর এই অঞ্চল একটি গোলাকার তল হিসেবে বিষুব রেখার অভিমুখে দক্ষিণে ও গোলাকার রেখাবৎ উত্তরে সম্প্রসারিত। এরপর আছে পর্বতমালা যে পর্বতমালা পৃথিবীর আবাদী অংশকে তার সামুদ্রিক বা মূল জলভাগ থেকে আলাদা করে রেখেছে। এই পর্বতমালার মধ্যে বেষ্টিত রয়েছে য়াজুজ ও মাজুজের বাঁধ। এই পর্বতমালা পূর্বাভিমুখে বিস্তৃত"।[1] এই পর্বতমালা কুফায়স পর্বতমালা নামে পরিচিত যা য়াজুজ-মাজুজকে পরিবেষ্টন করে আছে। সংশ্লিষ্ট এই জাতিগুলো তুর্কি বংশোদ্ভূত। এই দুই পর্বতের মধ্যকার বাঁধটি আলেকজাণ্ডার কর্তৃক নির্মিত।[2]। ১৭ শতকের ভৌগোলিক সাদিক ইসফাহানির মতে য়াজুজ ও মাজুজ দেশটির অবস্থান ১৩৯° ৩০ ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশ ও ৪৮° অক্ষাংশ মধ্যে অবস্থিত। আর এই অবস্থানের হিসেব করা হয়েছে ফরচুনেট দ্বীপ থেকে দ্রাঘিমার ডিগ্রি ও বিষুবের অক্ষরেখা[3] থেকে অক্ষাংশে গণনা করে (সাদিক ইসফাহানির ভৌগোলিক রচনাবলি, অনু. J.C. John Murray, London. 1832, p. 146 & p. 60).

এক আধুনিক ভাষ্যকারের মতে কুরআনের বিবরণের সাথে হুবহু মিলে যায় এমন এক লোহার দ্বারের সন্ধান পাওয়া গেছে মধ্য এশিয়ার দারবান্দ অঞ্চলে। জায়গাটি বুখারার অনুমানিক ১৫০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে হিসার জেলায়। এখানে একটি খুবই সঙ্কীর্ণ এক গিরিসঙ্কট রয়েছে। এর ওপর দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে বিশাল এক শিলা। গিরিসঙ্কটটি সংযুক্ত করেছে ভারত ও তুর্কিস্থানকে। এর ভৌগোলিক অবস্থান অক্ষাংশ ৩৮° ডিগ্রি উত্তর ও দ্রাঘিমাংশ ৬৭° পূর্ব। এই এলাকাটিকে বর্তমানে তুর্কি বাজগোল খানা (ছাগল গৃহ) বলা হয়। আগে নাম ছিল লৌহদ্বার (বাবুল-হাদিদ); Per (দার-ই আহানি)। এখানে এখন আর

www.bjilibrary.com

কোনো লোহার প্রবেশ দ্বার নেই। তবে ৭ম খ্রিস্টাব্দে এখানে তার অস্তিত্ব ছিল। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ভারতে যাওয়ার পথে ঐ লোহার প্রবেশদ্বার দেখতে পান। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী লোহার তৈরি দরজা ভাঁজ করে গুটিয়ে নেওয়া যায়। আর এই দ্বারের সাথে ঘন্টাও ঝোলানো ছিল। আরব ভৌগোলিক ও পরিব্রাজক মুকাদ্দাসি তাঁর আনুমানিক ৩৭৫/৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দের দিকে এক লেখায় বলেছেন আব্বাসীয় খলিফা ওয়াসিক (৮৪২-৮৪৬ খ্রি.) এই লোহার গেটের বিবরণ দেওয়ার জন্য মধ্য এশিয়ায় একটি মিশন পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা সেখানে এসে এই ১৫০ গজ প্রশস্ত গিরিসঙ্কটটি দেখতে পান। লোহার ইটের তৈরি ও গলানো সীসা দ্বারা গাঁথুনিসহ দুটি স্তম্ভের সাথে দুটি বিশাল আকারের গেট লাগানো। এ গেট বন্ধ রাখা হতো। এই ভাষ্যকারের মতে কৃত্রিমভাবে নির্মিত এই প্রতিবন্ধকতাটি কিছুকাল তার উদ্দেশ্য পূরণ করে ও পরে ভেঙ্গে পড়ে ধূলোয় মিশে যায়।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Khaldun. Ibn. Muqa. Vol. 1, p. 96
2. Ibid, pp. 162-166.
3. Ali, A. Yusuf, The Holy Quran. p. 762, 1975.

٩٦- اٰتُوۡنِیۡ زُبَرَ الۡحَدِیۡدِ ؕ حَتّٰۤی اِذَا سَاوٰی بَیۡنَ الصَّدَفَیۡنِ قَالَ انۡفُخُوۡا ؕ حَتّٰۤی اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوۡنِیۡۤ اُفۡرِغۡ عَلَیۡهِ قِطۡرًا ؕ

১৮ ঃ ৯৬ তোমরা আমার নিকট লৌহপিণ্ডসমূহ আনয়ন কর, অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে লৌহস্তূপ যখন দুই পর্বতের সমান হল তখন সে বলল, 'তোমরা হাপরে বাতাস দিতে থাকো' যখন তা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হল তখন সে বলল, তোমরা গলিত তাম্র আনয়ন কর, আমি তা ঢেলে দিই এর উপর।

এই আয়াতে য়াজুজ ও মাজুজকে প্রতিহত করার ব্যাপারে যুলকারনাইনের প্রয়াসের উল্লেখ করা হয়েছে। য়াজুজ ও মাজুজ নামে দুই হানাদার গোত্র। তাদের আক্রমণ ঠেকাতে লোহার প্রাচীর* গড়ার চেষ্টা করা হয়। এটি করা হয় উত্তপ্ত, রক্তিম লোহা ও গলিত সীসা মিশিয়ে। এভাবে দুটি ধাতব পদার্থের বা অন্যান্য উপাদান মিশিয়ে যে মিশ্রিত ধাতব পাওয়া যায় তাকে সংকর ধাতু বা ইংরেজিতে অ্যালয় বলে। মূল উপাদান গলানোর সময় যে অ্যালয় তৈরি হয় সেটিও এক ধাতব পদার্থই বটে। এই অ্যালয় মৌলিক ধাতুর চেয়ে সাধারণত যান্ত্রিক গুণাবলির দিক থেকে অনেক বেশি উৎকৃষ্ট হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধাতুর সংকরায়নে অনেক সময় মিশ্রিত ধাতুর মরিচাজনিত ক্ষয়রোধ বৈশিষ্ট্যের ক্ষতিও হতে পারে, উন্নতিও হতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় সংকর ধাতুটির ঔজ্জ্বল্য বাড়ে, নমনীয়তাও বৃদ্ধি পায়।

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত পিণ্ড লোহা বা ঢালাই লোহাতে আনুমানিক ২-৪.৫% ওজনের কার্বন, ০.৫% ম্যাঙ্গানিজ, ১-২.৫% সিলিকন, ০.১-০.৩% গন্ধক ও ০.০১% ফসফরাস থাকে[১]। বাতাস ও আর্দ্রতার সংস্পর্শে আসলে লোহায় জং বা মরিচা ধরতে শুরু করে। সংকরায়ন করে, রং লাগিয়ে বা দস্তার প্রলেপ দিয়ে লোহার মরিচা রোধ করা যায়। বস্তুত ইংরেজিতে গ্যালভানাইজিং বলে যে-প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হয়েছে তার আওতায় লোহাকে খুব ভালো করে পরিষ্কার করে তা গলানো দস্তা বা তামার মধ্যে ডুবিয়ে নেওয়াকে বুঝিয়ে থাকে।

বিশুদ্ধ লোহা ১৫৩৩° সেন্টিগ্রেড তাপে গলে যায়। তবে যে লোহায় আনুমানিক ৪.৬% হারে ওজনের কার্বন থাকে তার গলনাঙ্ক অপেক্ষাকৃত নিম্ন মাত্রার অর্থাৎ ১১৪৭° সেন্টিগ্রেড২, তামা ১০৮৩° সেন্টিগ্রেড তাপে গলে যায়।

www.bjilibrary.com

লোহা উত্তপ্ত হলে আগুনের মতো লাল দেখায় যার অর্থ তাপমাত্রা তখনও নিচে রয়েছে। আর তাপের মাত্রা সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌছালে ঐ লোহা গলে যাওয়ার আগে শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। লোহার পিণ্ড লোহার গলনাঙ্ক মাত্রার অনেক কম তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হলে তা ঐ লোহার পিণ্ডের পরবর্তী পিণ্ডের সাথে জুড়ে যায় ও এই লৌহখণ্ডগুলোর ওপর গলিত তামা ঢেলে এই প্রক্রিয়াকে আরও মজবুত করা হয়। গলিত তামা এক ধরনের সংকর ধাতু তৈরি করে ঢালাই লোহার সাথে মিলে যায়। এটা সম্ভব হয় গলিত তামা একটা নির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত ঐ জুড়ে দেওয়া খণ্ডগুলোর মাঝখানে ওপর থেকে প্রবিষ্ট হওয়ার ফলে। এভাবে গ্যালভানাইজ করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়, আর তাতে ধাতব ব্লকগুলোর উপরিভাগ অতিরিক্ত জোরদার ও স্থায়ী হয়ে ওঠে। ইস্পাত লৌহ সংকরেরই অন্যতম আকার বা গঠন। কিন্তু এ ধরনের সংকরায়নের ইস্পাত ব্যবহারের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কেননা, ইস্পাত নিজেই এক ধরনের সংকর ধাতু। এতে থাকে অত্যন্ত বিশুদ্ধ ধরনের লোহা মূল ধাতব হিসেবে আর সেই সাথে থাকে সামান্য পরিমাণ ও হারে ক্রোমিয়াম বা টাইটানিয়াম যা মেশানো হয় উৎপন্নাধীন দ্রব্যকে শক্ত করার জন্য। ইস্পাতের গলনাঙ্ক অত্যন্ত উচ্চ মাত্রার। আর সে কারণে ইস্পাতের ব্লক বা খণ্ডগুলো একসাথে জোড়ার কাজটি খুবই কঠিন। অন্যদিকে ঢালাই লোহার সংকর ধাতুগুলোর শক্তি সম্পর্কিত গুণ অপেক্ষাকৃত বেশি, ক্ষয় প্রতিরোধক, সহজে যন্ত্রে ব্যবহার করা যায়, উত্তাপ দিয়ে এর গুণমান প্রয়োগ উন্নত করা যায় ও মরিচা প্রতিরোধক করেও তোলা যায়।

* কোনো কোনো ভাষ্যকার কিতরা শব্দটির অনুবাদ করেছেন পিতল হিসেবে যা আসলে তামা ও দস্তার সংকর মাত্র। এ. ওয়াই. এ. (পৃঃ ৭৫৬)-এর অনুবাদ করেছেন সীসা হিসেবে। কিন্তু আমরা এ সম্ভাবনাকে নাকচ করছি এ কারণে যে লোহার সাথে সীসার কোনো সংকর হতে পারে না। আর পিকথলের মতে কিতরা শব্দের অর্থ তামা।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Encyclopaedia Americana, Vol. 1. p.606,1979.
2. P. Max Hasan, Constitution of Biranay Alloys, 2nd. Ed. McGraw Hill Co., London. pp. 353, 580, 1950.

www.bjilibrary.com

٥- وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۝

১৯ ঃ ৫ আমি এখন আশঙ্কা করি আমার স্বগোত্রীয়দের সম্পর্কে; আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; সুতরাং তুমি তোমার নিকট হতে আমাকে দান কর [আমার] উত্তরাধিকারী।

٧- يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ۝

১৯ ঃ ৭ তাঁকে বলা হল, 'হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি তার নাম হবে য়াহয়্যা; এই নামে পূর্বে আমি আর কারও নামকরণ করি নি।

قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝

১৯ ঃ ৮ সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক, কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত।

٩- قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝

১৯ ঃ ৯ তিনি বললেন, 'এরূপই হবে।' তোমার প্রতিপালক বললেন, এটা আমার জন্য সহজসাধ্য; আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না।

নবী জাকারিয়া (আ) তাঁর বৃদ্ধ বয়সে তাঁর বংশ রক্ষার বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন যা সূরা ১৯ ঃ ৫-এ উল্লিখিত হয়েছে। তাই তিনি আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত করলেন তাঁর একজন বংশধর দেওয়ার জন্য। এই মোনাজাতে সাড়া দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর কাছে একজন ফেরেশতা পাঠালেন তাঁকে এই শুভ সংবাদ দিতে যে তিনি এক পুত্র সন্তান লাভ করবেন। জাকারিয়া (আ) শুভ সংবাদ পেয়ে খুবই বিস্মিত হলেন এ কারণে যে, তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রী ছিলেন বন্ধ্যা। তাঁর এ প্রতিক্রিয়ার বিষয় বুঝতে পেরে ফেরেশতা বললেন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তা সম্ভব হবে।

www.bjilibrary.com

বৃদ্ধ বয়সে পুরুষ ও বন্ধ্যা স্ত্রীর সন্তান হওয়ার বিষয়টি ইতিমধ্যেই সূরা ৩ ঃ ৩৯, ৪০-এ আলোচিত হয়েছে।

১৯ ঃ ৯ আয়াতে আল্লাহ্ নবী জাকারিয়াকে (আ) স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, বৃদ্ধ বয়সে ও তাঁর স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়া সত্ত্বেও সন্তান হওয়ার বিষয়টি তাঁর (আল্লাহ্‌র) জন্য খুবই সহজ। একজন মানব সন্তানের জন্মের আগে তার কোনো পরিচয় নেই ও একজন নতুন শিশুর সৃষ্টি সর্বদাই বিস্ময়কর বিষয়।

٢٠- قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ○

১৯ ঃ ২০ মারয়্যাম বলল, 'কেমন করে আমার পুত্র হবে যখন আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করে নি এবং আমি ব্যাভিচারিণীও নই?'

٢١- قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ○

১৯ ঃ ২১ তিনি বললেন, 'এরূপই হবে।' আপনার প্রতিপালক বলেছেন, "এটা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমি তাকে এ জন্য সৃষ্টি করব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার নিকট হতে এক অনুগ্রহ; এটাতো এক স্থিরীকৃত বিষয়।

কুমারী মাতার গর্ভে ঈসার (আ) জন্ম তথা অযোনি সংসর্গজাত জন্মের বিষয়টি সূরা ৩ ঃ ৪৭-এর আওতায় ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে। এখানে আল্লাহ্ আরও বলেছেন, ঈসার (আ)-এর জন্ম মানবজাতির জন্য এক নিদর্শন হবে। তিনি (ঈসা) মানবজাতির জন্য করুণা, কেননা তিনি শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছেন। ঈসার (আ) জন্ম মানবেতিহাসে একমাত্র অনন্য দৃষ্টান্ত আর তাই আল্লার তরফ থেকে এক বিরাট নিদর্শন।

٢٥- وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ○

১৯ ঃ ২৫ তুমি তোমার দিকের খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে নাড়া দাও, তা তোমাকে সুপক্ক তাজা খর্জুর দান করবে।

www.bjilibrary.com

কুরআনের এই আয়াতটি আরও তিন আয়াতের অনুবর্তী। এতে কুমারী মরিয়মের (আ) গর্ভধারণ ও তার জেরুজালেমের অনতিদূরে বেথলেহেমের এক নিভৃত খেজুর বীথিতে তাঁর যাওয়ার ব্যাখ্যা ও বিবরণ দেওয়া হয়েছে। প্রসব বেদনার সূচনায় তিনি ব্যথায় যখন ক্রন্দনরত তখন এক ফেরেশতার কণ্ঠস্বর তাঁকে দুঃখ না করার জন্য সান্ত্বনা দেয়। তাঁকে জানানো হয় যে অদূরেই রয়েছে এক স্রোতস্বিনী যেখান থেকে তিনি পানি পান করতে ও ওজু করতে পারেন। তাঁকে খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে নাড়াবারও পরামর্শ দেওয়া হয় কিছু তাজা সুপক্ক খেজুর পাওয়ার জন্য। এই ঐশী বাণীর দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ দিক রয়েছে যা মরিয়মের (আ) জন্য অত্যন্ত সময়োপযোগী ও বিরাট সাহায্য হিসেবে প্রমাণিত হয়। কেননা তিনি তখন তীব্র প্রসব যাতনায় ছটফট করছিলেন।

১. প্রসব বেদনা চলাকালে আকস্মিকভাবে জরায়ু ও তলপেটের পেশীর সঙ্কোচন দেখা দেয়। আর এটি চলতে থাকে কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে। তবে ক্রমেই এটি দ্রুততর হতে থাকে। বেদনাও বাড়তে থাকে। আর তাতে স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ করে কোনো সঙ্গী তাকে পাশে বসে সান্ত্বনা দেবার না থাকলে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে যারা ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ তারা আসন্নপ্রসবা রোগীকে বেদনার সময় কোনো স্থির বস্তুকে আঁকড়ে ধরে থাকার পরামর্শ দিয়ে থাকেন যাতে করে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যায়। আর যাতে সেই সাথে জাতক তার জন্মনালী হয়ে বেরিয়ে আসার কাজটিও সহজ হয়। খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে থাকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে এই উদ্দেশ্যটি পূর্ণ করতে পারে। আর সেই সাথে ঐ কাণ্ড নাড়া দেওয়ায় খাদ্য হিসেবে পাকা খেজুর পাওয়া যেতে পারে।

২. প্রসব বেদনার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরই মায়ের জরায়ুতে তীব্র সঙ্কোচনের আলোকে যে শক্তিক্ষয় ঘটে তা পূরণের জন্য তাৎক্ষণিক পুষ্টির প্রয়োজন হয়। মধ্যপ্রাচ্যে খেজুর মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য। আর এতে প্রধান পুষ্টি উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে বিপুল মাত্রায় চিনি যা খেজুরের ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ। এই সাথে খেজুরে এ, বি, বি২, নিকোটিন অ্যাসিডের মতো উৎকৃষ্ট ভিটামিনও রয়েছে। তাৎক্ষণিক পুষ্টির সরবরাহ হিসেবে মরিয়মের (আ) জন্য আল্লাহর তরফ থেকে পুষ্টিকর পাকা খেজুরের ব্যবস্থা করা হয়।

www.bjilibrary.com

৬৫- رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ؕ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ۟

১৯ ঃ ৬৫ তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের অন্তবর্তী যা কিছু আছে তার প্রতিপালক। সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁর ইবাদতে ধৈর্যশীল থাক। তুমি তাঁর সমগুণসম্পন্ন কাকেও জানো ?

বিষয়টি সূরা ৫ ঃ ১৯-এ আলোচিত হয়েছে।

৭৪- وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَّرِءْيًا ۟

১৯ ঃ ৭৪ তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি যারা তাদের অপেক্ষা সম্পদ ও বাহ্য দৃষ্টিতে উন্নততর ছিল।

এই আয়াতে বহুকাল আগে বহু মানব প্রজন্মকে ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছে। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির লোকেরা তাদের জড় বিষয়-বৈভবের আয়োজন ও বাহ্যাড়ম্বরে ব্যাপক জৌলুস ও শান-শওকতের অধিকারী ছিল। এই বিষয়টি সূরা ৭ ঃ ৪, ৬৪-তে আলোচিত হয়েছে।

কুরআনে যেসব জাতির ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে তাদের ব্যাপারে আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে দেখা গেছে আদ ও ছামূদ জাতির লোকেরা এই আয়াতে উল্লিখিত জাতিসমূহের চেয়েও বেশি সমৃদ্ধ ছিল।

৯৮- وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ ؕ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۟

১৯ ঃ ৯৮ তাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি? তুমি কি তাদের কাউকে দেখেতে পাও অথবা তাদের ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাও?

এই আয়াতে আগেকার কোনো কোনো মানব প্রজন্মের সামগ্রিক ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে। নানা প্রজন্মের লোকজনের ধ্বংসের বৃত্তান্ত সূরা ৭ ঃ ৪,৬৪-তে আলোচিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

এভাবে যেসব প্রজন্মের মানুষ ধ্বংস হয়েছে তাদের কোনো চিহ্ন নেই, কেউ আর তাদের কথা বলে না। তারা এখন ইতিহাস মাত্র।

সূরা ১৯ ঃ ৭৪, ১৯ ঃ ৯৮ এবং আরও অন্যান্য আয়াতে যে সব মানব প্রজন্মের ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে তাদের অস্তিত্ব যে এককালে ছিল এখন বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে তা প্রমাণিত হয়েছে।

٤- تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلَى ۝

২০ ঃ ৪ যিনি সমুচ্চ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিকট হতে এটি অবতীর্ণ।

বিষয়টি সূরা ২ ঃ ১১৭ ও পরিশিষ্ট-২-এ আলোচিত হয়েছে।

٦- لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ۝

২০ ঃ ৬ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে, এই দুইয়ের মধ্যস্থলে যা কিছুই রয়েছে তার সবকিছুই আল্লাহ্র।

এই আয়াতের শেষাংশ ছাড়া অন্যান্য অংশ সম্পর্কে সূরা ৫ ঃ ১৯-এ আলোচনা হয়েছে। শেষাংশ "মৃত্তিকার নিচে যা কিছু আছে" অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের নিচে যা কিছু আছে সে সব বিষয় এখানে আলোচিত হবে।

পৃথিবী হচ্ছে একটা শিলাময় বলয়বিশেষ। এর গড় ব্যাসার্ধ ৬৩৭১ কিমি, দুই মেরুর দিকে ঈষৎ চাপা। পৃথিবী তিন প্রধান স্তর সমন্বয়ে গঠিত। এই তিন স্তর আবার কয়েকটি উপ-স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তর বা ত্বক স্তরকে ভূত্বক বলা হয়। পরের স্তর অংশত গলিত ও অংশত আধা তরল, পরিজের মতো এক উপাদান যার নাম আচ্ছাদন স্তর। পৃথিবীর সবচেয়ে অভ্যন্তরভাগের অঞ্চলটি মূল গর্ভ নামে পরিচিত।

ভূত্বক পৃথিবীর মোট পরিমাণের মাত্র ০.৬%। এর পুরুত্ব বেশ সমাকার; সাগরতলে ৫ কিলোমিটার থেকে মহাদেশীয় সমতল উপরিভাগে ৩৫ কিলোমিটার পর্যন্ত এবং বিশাল পর্বতমালার নিচে যেমন হিমালয়ের নিচে ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত গভীর। ভূত্বকে বহু সম্পদ যেমন, নানা ধরনের খনিজ,

www.bjilibrary.com

কয়লার মতো জীবাশ্মজাত জ্বালানি, ভূগর্ভস্থ বিশুদ্ধ পানি এবং নাইট্রোজেন চক্র রক্ষাকারী বহু তরুলতার ভূনিম্নে প্রবিষ্ট অংশ ও জীবাণু। মহাদেশীয় ভূত্বক প্রধানত সিলিকন ও অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে গঠিত। আর তার সাথে অক্সিজেন মিশ্রিত থাকে। মহাদেশীয় ভূত্বকের উপাদানগুলোর নামকরণ করা হয়েছে সিয়াল (sial) যা ইংরেজি silicon ও aluminium শব্দ দুটির যথাক্রমে দুটি করে আদ্যাক্ষর মিলিয়ে গঠিত হয়েছে। অনুরূপভাবে সমুদ্র তলীয় ভূত্বকের উপাদানের নামকরণ করা হয়েছে সিমা (sima) যা silicon ও magnesium -এর সমাহার দিয়ে।

ভূত্বকের নিচে রয়েছে এক আধা-শক্ত উপাদানের এক স্তর। এই স্তর ৭০ কিলোমিটার পুরু। এই স্তরের নাম অশ্মমণ্ডল lilhosphere। আমাদের এই পৃথিবী গ্রহের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই বাস্তবতায় নিহিত যে অশ্মমণ্ডলসহ এর উপরিভাগ বা পৃষ্ঠদেশ কয়েকটি শীতল ও ঋজু অশ্মমণ্ডলীয় প্লেটে বিভক্ত।

অশ্মমণ্ডলের নিচে ভূগঠনে খুবই লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। আর তা চিহ্নিত সীমা চৌহদ্দিমূলক রেকার মাধ্যমে। আর একে বলা হয় মোহো বিচ্ছিন্নতা (Moho discontinuity)। এই রেখার নিচে রয়েছে আচ্ছাদন স্তর যা ২৯০০ কিলোমিটার পুরু কিংবা গভীর। এই স্তর ভূগঠনের মোট পরিমাণের ৮২%। ৭৫ কিলোমিটার থেকে ২৫০ কিলোমিটার গভীরতার মধ্যে আচ্ছাদন স্তরে এমন এক অঞ্চল রয়েছে যা উষ্ণ, অপেক্ষাকৃত নমনীয়, আংশিকভাবে গলিত ঘন পরিজের মতো। এই স্তরকে অ্যাসথিনোস্ফিয়ার বলা হয়। এই অনেকটা গুড়ের উপাদানের স্তর কঠিন অশ্মমণ্ডলীয় প্লেটগুলিকে নড়াচড়া তথা সঞ্চরণের সুযোগ করে দেয়, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরতে পারে আর তার ফলে মহাদেশগুলো ভূমণ্ডল জুড়ে ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকে। এইসব প্লেট বার্ষিক ৫ সেন্টিমিটার থেকে ১০ সেন্টিমিটার সরে যায়। এই গতির সৃষ্টি হয় আচ্ছাদন স্তরের শিলার উষ্ণতার অবতলীয় গতি এবং পৃথিবীর অভিকর্ষ ও আবর্তনের কারণে। অ্যাসথিনোস্ফিয়ারও ম্যাগমার আকারে নতুন ভূত্বকীয় উপাদানের উৎস হিসেবে কাজ করে। এই ম্যাগমা ভূগর্ভের অভ্যন্তর থেকে ভূপৃষ্ঠ অবধি উঠে আসে।

আচ্ছাদনের অবশিষ্ট অংশ আধা তরল এবং তা মধ্যগোলকমণ্ডল (mesosphere) নামে পরিচিত। এর আরও গভীরে অবস্থিত কেন্দ্র বা মূলগর্ভ রয়েছে। এই কেন্দ্র বা মূলগর্ভের রয়েছে দুটি স্তর : বহিঃকেন্দ্র ও অন্তর্কেন্দ্র। বহিঃকেন্দ্র ২১০০ কিলোমিটার পুরু, আর অন্তর্কেন্দ্রের ব্যাসার্ধ হলো পৃথিবীর

www.bjilibrary.com

কেন্দ্রে ১৩৭০ কিলোমিটার। বহিঃকেন্দ্র তরল লোহা দিয়ে গঠিত আর সেই সাথে কিছু পরিমাণ গন্ধক মিশ্রিত আছে। অন্তর্কেন্দ্রটি সম্ভবত শক্ত, আর তাতে আছে লোহা ও অন্যান্য ভারী পদার্থ। এ ধরনের আবর্তনশীল গলিত লোহার অন্তর্কেন্দ্র থাকার অন্যতম সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফল হিসেবে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়ে থাকে যার নাম চৌম্বকমণ্ডল।

আজকের মানুষের জ্ঞান যতোটুকু সেই অনুযায়ী বলা যায়, পৃথিবী পৃষ্ঠের নিচে রয়েছে এই সব উপাদান আর এসবের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্। এভাবে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও গবেষণা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে পৃথিবী পৃষ্ঠের নিচে বেশ কিছু উপাদান ও প্রক্রিয়া প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এসবের পরিপূর্ণ জ্ঞানের মালিকও আল্লাহ্ আর বাস্তবিকপক্ষেই পৃথিবী পৃষ্ঠের ওপরে ও নিচে যা-ই থাকুক সবকিছুরই মালিক আল্লাহ্।

তথ্যসূত্র ঃ

1. J. C. Brandt, and Maran S.P, New Horizon in Asrtronomy, W. H. Freemand Company, San Fransisco, USA.
2. J. Gribbin, Genesis, Oxford University Press, Oxford, UK.
3. B. M. Cordell, Venus Astronomy, September, 1982.

www.bjilibrary.com

৩৯-أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ
يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۝

২০ ঃ ৩৮-৩৯ স্মরণ কর সেই সময়ের কথা যখন আমরা তোমার (হযরত মূসা আ) মাকে ইঙ্গিত করলাম এখন থেকে যা অহীর সাহায্যেই করা হয় যে, এই শিশুটিকে (শিশু মূসা) ঝুড়ির মধ্যে রেখে দাও এবং পরে ঝুড়িটিকে নদীতে ভাসিয়ে দাও। নদী তাকে কিনারায় ঠেলে দেবে এবং তাকে আমার শত্রু ও এই শিশুটির শত্রু গ্রহণ করবে। কিন্তু আমার দিক হতে তোমার উপর ভালবাসার সৃষ্টি করে দিলাম এবং এমন ব্যবস্থা করলাম যে তুমি আমার চাক্ষুষ রক্ষণাবেক্ষণে প্রতিপালিত হবে।

হযরত মূসা (আ)-র জন্ম এমন এক সময় হয়েছিল যখন ঈসরাঈলীদের প্রতি দুশমনির ফলে মিশর রাজ ফেরাউন তাদের সকল পুরুষ শিশুকে জন্মের পরই হত্যার হুকুম দিয়েছিল। মূসা (আ)'র মা তাকে নিয়ে লুকিয়ে ছিল। কিন্তু আর লুকিয়ে থাকা যখন সম্ভব ছিল না তখন মহান আল্লাহ্ তাকে যে উপদেশ দেন তাই এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তখন মা তার শিশু পুত্রকে একটি ঝুড়িতে রেখে সেই ঝুড়ি নীল নদীর পানিতে ভাসিয়ে দেন। ঝুড়ি ভাসতে ভাসতে ফেরাউনের রাজঘাটের নিকট নদী পাড়ের ঝোপে আটকে রইল। তখন রানীর চোখে পড়ায় সেই শিশুকে রাজবাড়ীতে নেওয়া হয়। ফেরাউন নিঃসন্তান থাকায় ও রানীর কথায় শিশু মূসা ফেরাউনের ঘরে লালিত পালিত হয়। এই ঘটনা বাইবেল ও কুরআনে রয়েছে।

এখানে আলোচনার বিষয় কী ধরনের ঝুড়ি বা বাক্স যাতে রেখে শিশুকে পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। নীল নদীর তীরে Cyperus papyrus নামক এক প্রকার নল খাগড়া গাছ প্রচুর জন্মে যার প্রমাণ রয়েছে বহু পিরামিডে প্রাপ্ত সে সময়কার অঙ্কিত ছবিতে। এই নল খাগড়ার কান্ড সে সময় সমুদ্রগামী নৌকা বানাতে ব্যবহৃত হতো। এছাড়া এ সব দিয়ে ঝুড়ি, বাক্স সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় গৃহ সামগ্রী তৈরি করা হতো। এইগুলোর ভেসে থাকার ক্ষমতার ফলেই প্রাচীন মিশরীয়রা সামুদ্রিক জাহাজ তৈরি করতে এবং এর সাহায্যে আটলান্টিক পাড়ি দিতে সমর্থ হয়েছিল বলে এখন ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন। সুতরাং এ ধরনের গাছের তৈরি বাক্স বা ঝুড়িতে শিশুটির ভেসে যাওয়া ও বেঁচে থাকা খুবই সম্ভব ছিল।

www.bjilibrary.com

৫০- قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ○

২০ ঃ ৫০ ফেরাউনের কথার জবাবে হযরত মূসা (আ) বল্লেন, "আমাদের রব তিনি, যিনি প্রত্যেকটি জিনিষের আকৃতি দিয়েছেন এবং পরে তাতে পথ দেখিয়েছেন।"

এই আয়াতের বিষয় বস্তু দৃশ্যমান ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরিদৃষ্ট গঠন প্রণালী ও কার্য পদ্ধতি সকল জৈব ও অজৈব সৃষ্টির বেলায়ই প্রযোজ্য। সব সৃষ্টির মূল তার মৌলিক পদার্থ যা বিভিন্ন প্রকার পরমাণুর (atom) সমষ্টি এবং যা কোন মানুষের সৃষ্ট নয়। পরে মানুষ এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে এবং এই শক্তি নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহারও করেছে; যেমন বিদ্যুৎ ,এক্স-রে, আণবিক শক্তি, আণবিক চুল্লী ইত্যাদি। আণবিক এবং নিউক্লিয়ার গঠন পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকার শক্তির উপর নির্ভরশীল যেমন অণুর ভিতরের নিউক্লিয়াস (প্রোটন ও নিউট্রনসমূহ), এর গতি, শক্তিশালী নিউক্লিয়ার শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আর এটমের ভিতরে ইলেকট্রন এর গতি electromagnetic শক্তি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এ ছাড়াও নিউক্লিয়াসে এক বিশেষ অথচ দুর্বল কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়ার শক্তিও রয়েছে। এই দুই শক্তির সমন্বয়ে (nuclear force and electromagnetic force) বিভিন্ন প্রকারের শক্তির বিকাশ ঘটে। এক বা একাধিক ইলেকট্রনের সংযোগ ঘটলে অর্থাৎ এক বা একাধিক প্রোটন এটমের ভিতরের electricity কে neutral করে দিলে কোন বস্তুর প্রকৃতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। লিথিয়াম[৬] সবচেয়ে হালকা ধাতু, এর এটমে ৩টি electron ও ৩টি proton রয়েছে। যদি আরও ১টি proton এতে যোগ করা যায় তবে Berrylium তৈরি হয় যা খুব ক্ষণস্থায়ী এবং শীঘ্র দুটি Helium nuclei এ বিভক্ত হয়ে যায়। Berrylium কেন স্থায়ী হয় না তা ৩ ঃ ১৯১ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে Berrylium স্থায়ী হলে এই মহাবিশ্ব ধ্বংস হয়ে যেতো। সুতরাং এই বস্তুর অস্থায়ী প্রকৃতি কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। বরং মহান আল্লাহ্র বিরাট পরিকল্পনার অংশ মাত্র।

৫৩- الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ○

২০ ঃ ৫৩ যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং তাতে করে দিয়েছেন তোমাদের চলবার পথ, তিনি আকাশ হতে বারিবর্ষণ

www.bjilibrary.com

করেন এবং আমরা তা দ্বারা একে অপর হতে ভিন্ন নানা প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করে থাকি।

গালিচার মতো পাতা পৃথিবী এবং চলার পথের ব্যবস্থা

এই আয়াতের অংশবিশেষ পৃথিবী গালিচার মতো পাতা, এ রকম বিষয়ের ব্যাখ্যা রয়েছে সূরা ২ ঃ ২২-এ। আয়াতের এই অংশটিতে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিষয়ে আলোচনা রয়েছে, আর তার বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যোগাযোগ ব্যবস্থা মানব কার্যাবলিকে প্রভাবিত, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকে। প্রাচীনকালে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সড়ক নির্মিত হয়। প্রাচীন বাণিজ্যপথগুলো এসব সড়কেরই দৃষ্টান্ত। এ ক্ষেত্রে আমরা সুবিখ্যাত রেশম পথের কথা উল্লেখ করতে পারি। এই সড়ক চীনের সাথে ভারতকে সংযুক্ত করে। এছাড়া গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের কথাও বলা যায়। বিভিন্ন সমতল ভূমি ও মালভূমি অঞ্চলের মধ্যে পর্বতমালাসমূহ প্রবল বাধা হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকে। পামির গ্রন্থি থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন পর্বতশ্রেণী এশিয়ায় তিব্বত, পারস্য, চীনের ইউনান এবং সিন্ধু ও গাঙ্গেয় সমভূমি একে অন্যকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে (চিত্র-১০)। দক্ষিণ ইউরোপে নবীন ভাঁজ বিশিষ্ট পর্বতমালা আল্পস বহু পার্বত্য ফাঁসের সৃষ্টি করেছে এবং বহু সমভূমি ও মালভূমিকে আলাদা করে পরিবেষ্টিত রেখেছে। উত্তর আমেরিকার রকি পর্বতমালা এবং দক্ষিণ আমেরিকার ভঙ্গিল অ্যান্ডিজ পর্বতমালা দুই আমেরিকা মহাদেশের পশ্চিমাঞ্চলীয় সমভূমি ও মালভূমিগুলোকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। পার্বত্য গিরিপথগুলো সাধারণত ঐসব ভঙ্গিল পর্বতমালা দ্বারা বিচ্ছিন্ন সমভূমি ও মালভূমি অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ দ্বার হিসেবে কাজ করে। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে ইরানের সাথে পাকিস্তানের কোয়েটাকে যুক্তকারী বোলান গিরিপথ, আফগানিস্তানের সাথে পাকিস্তানের পেশোয়ারকে যুক্তকারী খাইবার গিরিপথ এবং আফগানিস্তানের গযনীর সাথে পাকিস্তানের ডেরা ইসমাঈল খানের সাথে যুক্তকারী গোমাল গিরিপথের নাম উল্লেখ করা যায়। কাশ্মীরের শ্রীনগর শহর থেকে দুটি দুর্গম পথ রয়েছে যোজিলা গিরিপথ ও কারাকোরাম গিরিপথের মধ্য দিয়ে। ভারতের পাঞ্জাব থেকে তিব্বত পর্যন্ত রয়েছে শিপকি গিরিপথ। ভারত ও মিয়ানমারের মধ্যে চারটি গিরিপথ রয়েছে। এগুলো অবশ্য কৃচিৎ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এগুলো হলো ঃ (১) তুজুর সংকট; (২) মণিপুর রুট; (৩) আন, ও (৪) তাউনগুপ গিরিপথ। কানাডায় রকি পর্বতমালা যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক বিরাট অন্তরায়। এই বাধা কাটানো হয়েছে কিকিং হর্স ও ইয়েলো হেড গিরিপথে রেলপথ নির্মাণের মাধ্যমে।

www.bjilibrary.com

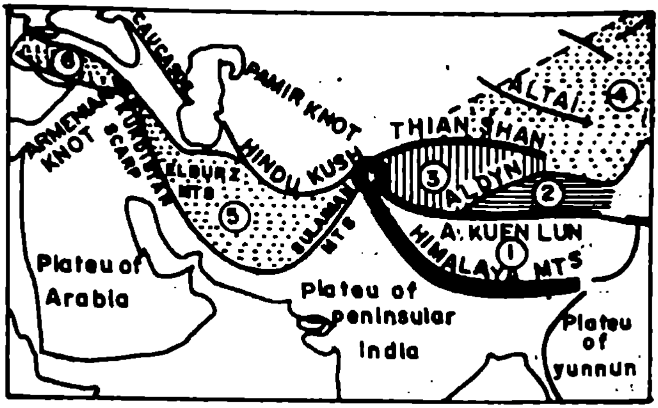

চিত্র–১০

চিত্র পরিচিতি ঃ এশিয়ার পর্বতমালা ও মালভূমিসমূহের এক সরল মানচিত্র। এখানে (১) তিব্বতের মালভূমি; (২) একটি জলাভূমি; (৩) তারিম উপত্যকা; (৪) গোবি মরুভূমি; (৫) ইরানের মালভূমিসমূহ, এবং (৬) এশিয়া মাইনর মালভূমি দেখান হয়েছে।

বিভিন্ন দেশ ও ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্বের কারণে মানুষ উন্নততর যানবাহনের উপায় খুঁজতে প্রবৃত্ত হয়েছে। রেল যোগাযোগ প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে স্থল যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক বিপ্লব সাধিত হয়। বিশ শতকের মধ্যভাগে মোটরযানের দ্রুত বিকাশের কারণে বহু উন্নত দেশে পাকা রাজপথ ও সেতু নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এমনকি উন্নয়নশীল দেশগুলোও উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে দ্রুত অগ্রগতি অর্জন করছে।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে জলপথ গুরুত্বের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। কানাডায় গ্রেট লেক ও লরেন্স রিভার, যুক্তরাষ্ট্রে মিসিসিপি ও ওয়ারিয়র, মধ্য ইউরোপে রাইন নদী, আফ্রিকায় নীল, নাইজার ও কঙ্গো নদী, চীনে ইয়াংসি নদী, ইন্দোচীনে মেকং নদী, বর্মায় ইরাবতী নদী এবং ভারতে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের ভাটি অঞ্চলের প্রবাহ সড়কের মতো তুলনীয় যোগযোগ ব্যবস্থার সুবিধে প্রদান করে।

মনে রাখা আবশ্যক যে বিশ্ববাণিজ্যের সিংহভাগ সমুদ্রপথে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই সামুদ্রিক পথগুলো কেবল উন্নত ও সুসজ্জিত সামুদ্রিক বন্দর থেকেই

www.bjlibrary.com

পরিচালিত হয় না, এই বন্দর থেকে বিভিন্ন নৌপথের মধ্যবর্তী নানা বিরতি স্থলে জ্বালানি ও জাহাজ মেরামতের সুযোগ-সুবিধেও থাকে। এই নৌপথসমূহ জরিপকৃত। এগুলোর উপযুক্ত মানচিত্রও আছে। আর এই সমুদ্র পথের যে যে স্থান জাহাজ চলাচলের জন্য বিপজ্জনক সেই সব স্থান বাতিঘর ও বাতিজাহাজ দ্বারা সুচিহ্নিত করা রয়েছে। সুয়েজ খাল হলো বিভিন্ন সমুদ্রপথের মিলনস্থল। অনুরূপভাবে পানামা খাল পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ রুটে জাহাজ চলাচলের সুবিধে প্রদান করে। পানামা খাল এলাকা ভৌগোলিকভাবে একটি যোজক অর্থাৎ দুটি বিপুল ভূভাগ- উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাকে এক চিলতে ভূখণ্ডের মাধ্যমে যুক্ত রেখেছিল। তার মধ্য দিয়ে খাল কেটে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে সংযোগ সাধন করা সম্ভব হয়েছে এখানকার এই বিশেষ ভৌগোলিক সুবিধের কারণে।

এই আলোচনায় কুরআনের এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে পৃথিবীকে গালিচার মতো বিছিয়ে দিয়ে আল্লাহ্ মানুষকে বিভিন্ন যোগাযোগ পথে ভ্রমণ করে তার নিজের কল্যাণে বিপুল উপকার নিয়ে আসার সুবিধে করে দিয়েছেন।

আকাশ থেকে বারিপাত

আয়াতের এই অংশে আকাশ থেকে বৃষ্টিপাতের কথা বলা হয়েছে। সূরা ২ ঃ ২২-এর আলোচনার আওতায় এ বিষয়টির ব্যাখ্যা রয়েছে।

নানা প্রজাতির উদ্ভিদের জোড়

আজওয়াজা শব্দের অর্থ জোড় বা জুটি। এখানে স্পষ্টত উদ্ভিদের পরাগায়ন, যৌন বা বংশবৃদ্ধির উল্লেখ করা হয়েছে। দুই জনক-জননী উদ্ভিদের মাধ্যমে যৌনমিলনে বংশবিস্তার (একটি জোড় বা দম্পতি) ঘটে তখনই যখন দুটি ভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের পুরুষ ও স্ত্রী বংশবিস্তারক ইউনিট মিলিত হবার ফলে সৃষ্ট নবীন উদ্ভিদের জন্ম হয় ক্রোমোজমের নতুন সমন্বয় সহকারে। এভাবে যে যৌনমিলনভিত্তিক যে বংশবিস্তার ঘটে তার ফলে অশেষ উদ্ভিদ প্রজাতি সৃষ্টি সম্ভব হয়। আর সেগুলোর মাঝে নানা বৈশিষ্ট্যের অশেষ সমন্বয় ঘটে। আর এভাবে সৃষ্ট উদ্ভিদের পক্ষে পরিবর্তনশীল পরিবেশে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের জন্য বেড়ে যায় খাপ খাইয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা যা অত্যন্ত সুবিধেজনক।

এই আয়াতে পরে যে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা উদ্ভিদ বৈচিত্র্য সম্পর্কিত। হিসেব করা হয়েছে, মেরু থেকে ক্রান্তীয়, স্থলভাগ থেকে জলভাগ, বায়ুজীবী থেকে অবায়ুজীবী ৩,৫০,০০০ প্রজাতির উদ্ভিদকে বিভিন্ন

www.bjilibrary.com

পরিবেশ এবং আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর তাতে এইসব উদ্ভিদের মাঝে তাদের আকৃতি ও গঠনে ব্যাপক বৈচিত্র্যও পরিলক্ষিত হয়। এসবের মাঝে পুষ্পক উদ্ভিদগুলো আকারে কয়েক টন ওজনের বিরাট বৃক্ষ থেকে ধানের ফসলের মতো ছোট উদ্ভিদের সমপর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এই বৈচিত্র্য সত্ত্বেও উদ্ভিদকুল সকল স্তরের সংগঠন কাঠামো ও কার্যপ্রণালী উভয় ক্ষেত্রে অসাধারণ বিন্যাসগত ঐক্য রক্ষা করেছে। বিন্যাসগত ঐক্যের অন্যতম নজির হলো প্রজননের বিষয়টি। জীবাণু বা নীলাভ-সবুজ অ্যালগির (শেওলা) মতো উদ্ভিদের একটি আদিবর্গ ছাড়া এই যৌনভিত্তিক বংশ বিস্তার বিশ্বজনীনভাবেই প্রায় সকল উদ্ভিদে বর্তমান। যৌনভিত্তিক বংশবিস্তার জন্মসূত্রে উত্তরাধিকারের বিষয়, বিবর্তনের কার্যপ্রণালী ও জীবের বেশির ভাগ আচরণকে প্রভাবিত করে। আর এর ফলে আবার উদ্ভিদকুলে বিপুল বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। আমরা সে সবই এখন প্রত্যক্ষ করছি।

এ ছাড়াও সূরা ১৩ ঃ ৩-এ যৌন বিষয়ের উল্লেখ আছে ঈষৎ ভিন্ন ব্যাখ্যা সহকারে। এই আয়াতে জাওজাইন শব্দনিচয় ব্যবহৃত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আয়াতেই অবশ্য এর একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হিসেবে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও রয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. L. Duddley, Stamp, A Regional Geography pts. I.V., Longmans, Green and Co. Ltd., N.Y. 1939.
2. W. G. Moore, New Visual Geography Mountains and Plateaus Hutchinson Educational Ltd. London, 1970.

www.bjilibrary.com

٥٤- كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ۟

২০ ঃ ৫৪ তোমরা আহার কর ও তোমাদের গবাদি পশুর চারণ করাও; অবশ্যই এতে নিদর্শন আছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য।

এই আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের মূলভাবেরই নিরবচ্ছিন্ন আলোচনা বিশেষ। এতে বৃষ্টিপাতের পর যেসব ঘটনা পর পর ঘটে তার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। যেমন অনেক উদ্ভিদের জন্ম হয় যেগুলো তাদের ভিন্ন ভিন্ন যৌন পরিচয় ও জীবতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য প্রদর্শন করে। আলোচ্য আয়াতে খাদ্যের আকারে আল্লাহ্‌র রহমতের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে আমরা সবুজ উদ্ভিদ থেকে কেবল আমাদের জন্যই খাদ্য সংগ্রহ করি না, আমাদের গবাদি পশুর জন্যও খাদ্য সংগ্রহ করি। আমাদের প্রধান খাদ্যের উৎস হচ্ছে দানাশস্য, ডাল ও কন্দজাতীয় ফসল। এসব ছাড়াও নানা মাত্রা, ধরণ ও স্বাদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য ফলও আমরা পেয়ে থাকি সবুজ উদ্ভিদ থেকেই। এ ধরনের কতকগুলি ফলের গাছ মানুষ নিজেরা আবাদও করতে পারে। উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রধানত ঘাস ও অন্যান্য আগাছা যার রাসায়নিক উপাদান মানুষের পাকস্থলীর উপযোগী নয় যদিও পশুখাদ্য হিসেবে গবাদি ও অন্যান্য তৃণভোজী প্রাণীর পরিপাক যন্ত্রের জন্য উপযোগী ও সেই সুবাদে তাদের জন্য চমৎকার রকমের উপযোগী খাদ্য।

বোধসম্পন্ন মানুষ তার নিজ প্রজাতি ও গবাদি পশুর প্রাণ রক্ষার জন্য উদ্ভিদরাজ্য থেকে আল্লাহ্ যে পুষ্টি সরবরাহের ব্যবস্থা করেছেন তার নেপথ্যে তাঁর বিপুল বিচক্ষণতা ও উপকার অনায়াসেই উপলব্ধি করতে পারবেন। এই উদ্ভিদজগত ঘটনাক্রমে খাদ্য চক্রের এক যোগসূত্র। তৃণভোজী প্রাণী সবুজ উদ্ভিদ খেয়ে প্রাণ ধারণ করে। আর প্রায় সর্বভূক মানুষ সবজি ও পশুর গোশত উভয় প্রকার খাদ্য গ্রহণ করে। কাজেই এই আমিষ তথা গোশতেরও পরোক্ষ উৎস হলো উদ্ভিদ, আর তাতেই 'সকল মাংসই ঘাস' এই বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণিত। মানুষ ও গবাদি পশুর গলিত লাশ মাটিতে আবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান জোগায়। এই উপাদান উদ্ভিদের চমৎকার ও সমৃদ্ধতর বিকাশের জন্য জরুরী। বস্তুত এসবের মধ্যে রয়েছে চিন্তাশীল ও বোধসম্পন্ন মানুষের চিন্তার খোরাক।

www.bjilibrary.com

۵۵- مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ○

২০ ঃ ৫৫ মৃত্তিকা হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি আর তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং তা হতেই পুনর্বার তোমাদেরকে বের করব।

মানুষ পৃথিবীর উপাদান থেকে সৃষ্টি হয়েছে- এই বিষয়টি ইতিমধ্যেই সূরা ১৮ ঃ ৩৭-এ আলোচিত হয়েছে।

মানুষ আবার মৃত্তিকায় ফিরে যাবে- এ বিষয়টির কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বাইবেলেও একই ধারণা অভিব্যক্ত রয়েছে। সেখানেও বলা হয়েছে, "তোমরা ধুলো থেকে এসেছো, সেখানেই তোমরা ফিরে যাবে।' বিভিন্ন জাতির লোক নানাভাবে মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা করে থাকে। ইহুদী, মুসলমান ও খ্রিস্টানরা তাদের প্রথা মাফিক লাশ কবরে দাফন করে। কবরেই ঐ লাশ পচে মাটির সাথে মিশে যায়। মুসলমানদের বেলায় কাফনের কাপড় এই পচনক্রিয়ায় খুব একটা বাধার সৃষ্টি করে না। খ্রিস্টান ও ইহুদীরা কাঠের বাক্স বা কফিন ব্যবহার করে।তাতে লাশের পচনক্রিয়া ও মাটিতে মেশা অনেকটা বিলম্বিত করে। আর যদি লাশ কোনো পাথর বা কনক্রিটের ভল্টে সমাধিস্থ করা হয় তাহলে তাতে ঐ লাশটিতে পচনক্রিয়া ঘটবে লাশের দেহে অবস্থিত সপন সহায়কী জীবাণুর কারণে। তবে তাতে লাশের মাটিতে মিশে যেতে দীর্ঘতম সময় লেগে যাবে। প্রাচীন মিসরীয়রা তাদের লাশের গায়ে এক ধরনের ভেষজ মলম লাগিয়ে কাপড় দিয়ে লাশ জড়িয়ে নেওয়ার পর পাকা কবর বা পিরামিডে রেখে দিত। আজও এ ধরনের লাশ অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত রয়েছে। এইসব লাশ মাটির সাথে মিশতে অনেক বেশি সময় নেয়।

লাশ সৎকারের আরেক উপায় হলো দাহ করা। হিন্দুরা তাদের শবদেহ সাধারণত কোনো নদীর ধারে কিংবা সাগরকূলে কাঠের চিতায় দাহ করে। তারপর লাশের যেসব অংশ থেকে যায়, পোড়ে না সেগুলো সহ লাশের ছাই সাধারণত ঐ নদী বা সাগরে নিক্ষেপ করে। লাশের যা ছাই হয়ে যায় তা গ্যাসের আকারে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে ও বৃষ্টির আকারে আবার তা মাটিতে ফিরে আসে। ফলে যেভাবেই লাশের নিষ্পত্তি করা হোক না কেন শবদেহের উপাদানসমূহ এভাবে আবার মাটিতে ফিরে আসে।

অগ্নিপূজক পারসিকরা তাদের লাশ একটি উঁচু টাওয়ারের ওপর রাখে। আর সেখানে শকুনেরা লাশের মাংস ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে। আর তারপর হাড়গুলো

www.bjilibrary.com

টাওয়ারে বিশেষভাবে তৈরি ছিদ্রপথে নিচে এসে পড়ে এবং তা এক সময় মাটির সাথে মিশে যায়। শকুনেরা লাশ ভক্ষণ করে যে বিষ্ঠা ত্যাগ করে তা মাটিতে পড়ে, আর তারা নিজেরাও একসময় মারা যায় ও মাটিতে মিশে যায়।

অনুরূপভাবে যদি কেউ নদী বা সাগরে ডুবে মারা যায় এবং তার লাশ যদি দাফন বা সমাধিস্থ করার জন্য না পাওয়া যায় তাহলে সেক্ষেত্রেও লাশটি মাছ বা হাঙ্গরে খেয়ে ফেলবে অথবা সমুদ্র বা নদীতলে পচে মাটির সাথে মিশে যাবে।

তাই বস্তুত মৃত্যুর পর সকল মানুষকে মাটিতেই ফিরতে হবে।

এই আয়াতের তৃতীয় অংশটি রোজ হাশরের দিনে মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করার বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে যা আমাদের বর্তমান আলোচনার এখতিয়ারের বাইরে।

٧١. قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَاُقَطِّعَنَّ
اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ
وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَآ اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى ○

২০ : ৭১ ফিরআউন বলল, 'কী আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা মূসাতে বিশ্বাস স্থাপন করলে! দেখেছি, সে তোমাদের প্রধান, সে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং আমি তো তোমাদের হস্তপদ একাদিক্রমে কর্তন করবই এবং আমি তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করবই এবং তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে আমাদের দুইয়ের মধ্যে কার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী।

এখানে যে দণ্ডের কথা বলা হয়েছে সেরকম শাস্তির বিধান তৎকালে প্রচলিত ছিল। যদি একদিকের হাত ও পা কেটে ফেলা হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট লোকটি আর দাঁড়াতে বা চলতে পারবে না। কিন্তু একটি হাত রেখে আরেক দিকের হাত বা একটি পা রেখে বিপরীত দিকের পা কাটা হয় সেক্ষেত্রে লোকটির পক্ষে কোনো রকমে চলাফেরা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে তাকে হয়তো অন্যকিছু কৃত্রিম বস্তুর সাহায্য নিতে হবে। কেননা, মানুষ তার দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে তার বিপরীত প্রত্যঙ্গ

www.bjilibrary.com

দিয়ে। এমন দণ্ডদানের নেপথ্য চিন্তা ছিল বিষয়টির ব্যাপক প্রচার নিশ্চিত করা। তাই ফিরআউন একটি হাত বা একটি পা রেখে অন্যটি কাটার নির্দেশ দেন। তিনি ক্রুশবিদ্ধ করার হুমকি দেন যা ছিল কঠিনতম শক্তি। ক্রুশবিদ্ধ করে মারার পদ্ধতিটির আওতায় শাস্তিভোগীকে মৃত্যুর আগে অবধি তিলে তিলে দীর্ঘকাল নিদারুণ কষ্ট পেতে হতো। ক্রুশে চড়িয়ে সাধারণত ক্রুশকাঠের সাথে পেরেক ঠুকে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রত্যঙ্গ সেঁটে দেওয়া হতো বা তার দেহ বেঁধে রাখা হতো। এই ক্রুশ বলতে খেজুর গাছের একটা গুঁড়ি বোঝাতো। অভিযুক্তকে ক্রুশে আটকে রাখা হতো রক্তপাত, ভয় বা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মারা যাওয়া পর্যন্ত।

...يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ قَدْ أَنجَيْنَٰكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَٰعَدْنَٰكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ○

২০ ঃ ৮০ হে বনী ইসরাঈল! আমি তো তোমাদেরকে শত্রু হতে উদ্ধার করেছিলাম, আমি তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং তোমাদেরকে মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করেছিলাম।

এই আয়াতের তৃতীয় অংশটিতে মান্না ও সালওয়ার উল্লেখ রয়েছে। আর এটি আমাদের আলোচনার সাথে সম্পর্কিত। বিষয়টি সূরা ২ ঃ ৫৭-র আওতায় আলোচিত হয়েছে।

...كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا۟ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِى ۖ
وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِى فَقَدْ هَوَىٰ ○

২০ ঃ ৮১ তোমাদেরকে যা দান করেছি তা হতে উত্তম বস্তু আহার কর এবং এই বিষয়ে সীমা লংঘন করো না, করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ আপতিত হবে আর যার উপর আমার ক্রোধ আপতিত হয় সে বাস্তবিক পক্ষেই ধ্বংস হবে।

আল্লাহ্ এখানে বনী ইসরাঈলের ওপর তাঁর করুণা ও রহমতের বিষয় উল্লেখ করেছেন যখন মূসা (আ) তাদেরকে মিসরের কারাগার থেকে মুক্ত ক... ঐ

www.bjilibrary.com

সময় আল্লাহ্ তাদেরকে খাদ্য হিসেবে মান্না নামে একধরনের খাদ্য ও সালওয়া নামের একধরনের খাদ্যোপযোগী কোয়েল পাখি প্রেরণ করেন। মান্নায় ছিল শ্বেতসার ও কোয়েল পাখিতে ছিল প্রোটিন, স্নেহজাতীয় পদার্থ এবং খাদ্যের তিনটি আবশ্যকীয় উপকরণ। যেহেতু মান্না ও সালওয়া পুষ্টি ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য তাই আল্লাহ্ এগুলোকে মানুষের জন্য উত্তম খাদ্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিষয়টি নিয়ে সূরা ২ ঃ ৫৭, ৭ ঃ ১৬০ ও ২২ ঃ ৮০তে আলোচনা রয়েছে।

١٠٥- وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا ۝

২০ ঃ ১০৫ ওরা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'আমার প্রতিপালক ওদেরকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দেবেন'।

পর্বতমালার মূলোচ্ছেদ এবং তাদের ধূলিসম ছিটিয়ে পড়ার বিষয়টি ১৮ ঃ ৪৭ আয়াতের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

١٢٨- أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِى مَسَٰكِنِهِمْ

২০ ঃ ১২৮ এই লোকগুলো কি (ইতিহাসের শিক্ষা থেকে) কোন হিদায়াত পেল না? তাদের পূর্বে কত জাতিকেই না আমরা ধ্বংস করেছি যাদের (ধ্বংসপ্রাপ্ত) জনপদে আজ এই লোকেরা চলাফেরা করছে। বস্তুত এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।

এই আয়াত বিভিন্ন জাতিকে যে আল্লাহ্ ধ্বংস করে দিয়েছেন সে বিবরণ নবী (সা) মারফত মানুষকে জানিয়ে দিয়েছে। এ বিষয়টি ৭ ঃ ৪ এবং ৭ ঃ ৬৪ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

বলতে গেলে কুরআনের এসব আয়াতে archeology (প্রত্নতত্ত্ব) বিজ্ঞানের দিক নির্দেশ দিয়েছে। কুরআন নাযিলের পূর্বে এই বিষয়ে মানুষের কোন জ্ঞান ছিল বলে জানা যায় না।

www.bjilibrary.com

١٣٠- فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ
وَمِنْ آنَائِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ○

২০ ঃ ১৩০ সুতরাং তারা যা বলে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পরে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং রাত্রিকালে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং দিবসের প্রান্তসমূহেও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা দিনের শুধু দু'টি প্রান্তসীমাই দেখতে পাই ঃ একটি সূর্যোদয়কালে যাকে বলা হয় উষা, আর অপরটি সূর্যাস্তের সময় যাকে বলা হয় গোধূলি। কুরআনের ১১ ঃ ১১৪ আয়াতে দিবসের দু'প্রান্তের উল্লেখ রয়েছে।

কিন্তু অত্র আয়াতে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো ঃ এত্‌রাফ اطراف (তরফ طرف -এর বহুবচন) যাতে স্পষ্টতই দু'য়ের অধিক প্রান্তের কথা বুঝানো হয়েছে। তাহলে দিনের দু'য়ের অধিক প্রান্তের ব্যাপারটা আমরা কীভাবে অনুধাবন করতে পারি?

দিবসের স্বাভাবিক দু'প্রান্তের বিষয়টি কোন বিশেষ অঞ্চলের স্থানীয় যে কোন পর্যবেক্ষকের অভিজ্ঞতায়ই ধরা পড়ে। কিন্তু দর্শক বা পর্যবেক্ষক যদি পূর্ব কিংবা পশ্চিম অভিমুখে বেশ ভাল গতিতে সরে যান, তাহলেই ঘটে পরিস্থিতির পরিবর্তন। ধরা যাক, এক ব্যক্তি উচ্চ গতিসম্পন্ন কোন বিমানে ভ্রমণ করছেন, ঘন্টায় ২ হাজার মাইলযোগে পশ্চিমদিকে উড়ছে বিমানখানি, সূর্যাস্তের ঠিক পরপরই তিনি কোন নির্দিষ্ট স্থান থেকে যাত্রা শুরু করেছেন। ২ হাজার মাইল দূরে কোন স্থানে অবতরণ করলে তিনি বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করবেন যে, সূর্য পশ্চিম দিগন্তরেখার বেশ উপরেই আছে এবং ১৫-২০ মিনিট পরেই তিনি আরেকটি সূর্যাস্তের অভিজ্ঞতা লাভ করবেন। আর তিনি যদি তার যাত্রা অব্যাহত রাখেন এবং আরো এক ঘন্টার ভ্রমণ শেষে থামেন, তাহলে তার অভিজ্ঞতায় সংযুক্ত হবে আরো একটি সূর্যাস্ত। কাজেই, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, একজন চলমান পর্যবেক্ষকের পক্ষে দিনের দু'য়ের অধিক প্রান্তের সাক্ষাত লাভ সম্ভব। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পৃথিবীর গোলাকৃতি এবং আপন অক্ষের চারদিকে আহ্নিকগতির কারণেই এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। অনুরূপভাবে কেউ যদি সূর্যোদয় প্রত্যক্ষ করার ঠিক পর পরই কোন নির্দিষ্ট স্থান থেকে অনুরূপ গতিতে

www.bjilibrary.com

পশ্চিম দিকে ভ্রমণ করতে থাকেন, তাহলে তিনি বেশ কয়েকটি সূর্যোদয় দেখতে পাবেন। এভাবে বিস্ময়কর হলেও তিনি দিবসের দু'য়ের অধিক শুরু বা সূচনা প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবেন। আর এতে স্বাভাবিক বা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মানুষের মুখে উচ্চারিত হবে আল্লাহর প্রশংসাবাণী।

٦- مَا اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا ۚ اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ ○

২১ ঃ ৬ এদের পূর্বে কোন জনবসতিই যাকে আমরা ধ্বংস করেছি ঈমান আনেনি আর এখন এরা কি ঈমান আনবে?

মোজেজা দেখানো সত্ত্বেও অনেক জাতি তাদের নবীর উপর ঈমান আনেনি। জনপদ ধ্বংসের ব্যাপারে ৭ ঃ ৪ এবং ৭ ঃ ৬৪ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

١١- وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ○

২১ ঃ ১১ কত অত্যাচারী জনবসতিই এমন আছে যেগুলোকে আমরা পিষে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছি এবং তাদের পরে যেখানে আমরা অন্য কোন জাতিকে উত্থিত করেছি।

এ বিষয়টি ৭ ঃ ৪ ও ৭ ঃ ৬৪ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

١٦- وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ○

২১ ঃ ১৬ আমরা এই আসমান ও যমিন এবং এদের মধ্যে যা কিছু আছে, খেলার ছলে সৃষ্টি করি নি।

এই আয়াতের বিষয়বস্তুর অনুরূপ বিষয়টি ৩ ঃ ১৯১ আয়াতের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

٣٠- اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ۗ
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۗ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ○

২১ ঃ ৩০ যারা কুফরী করে তারা কী ভেবে দেখে না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম। এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে,তবুও কি ওরা বিশ্বাস করবে না?

www.bjilibrary.com

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া

বিজ্ঞানীদের দ্বারা এ সত্য গৃহীত হয়েছে যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীস্থ সবকিছু তথা সকল বস্তুই একত্রে যুক্ত ছিল এবং একটি মাত্র একক বিন্দুতে একটি অতি ক্ষুদ্র, অতি ঘন এবং অতি উত্তপ্ত বুদবুদের মধ্যে অস্তিত্বমান ছিল। সময়ের ঘড়ির কাঁটা তখনও যাত্রা শুরু করেনি। এমনি শূন্য সময়ে সৃষ্টির সূচনা হয় 'বিগব্যাং' তথা মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমে এই বুদ্‌বুদের বিচ্ছিন্ন বিশ্লিষ্ট হওয়ার মধ্য দিয়ে। শূন্য সময়ে এবং অসীম ঘনত্ববিশিষ্ট এই ক্ষুদ্র গোলকটির অবস্থা কেমন ছিল পদার্থ বিজ্ঞান তার বিবরণ দিতে পারেনি। প্রচন্ড ঐ বিস্ফোরণের $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড পর ঐ সময়ে অনুমিত অস্তিত্বমান মহাকর্ষ বল একক সংযুক্ত বল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে যায়। এ মুহূর্তে মহাবিশ্বের ব্যাস ছিল $১০^{-২৮}$ সেঃ মিঃ এবং তাপমাত্রা ছিল $১০^{-৩২}$ কেলভিন। প্রচন্ড বিস্ফোরণের পর $১০^{-৩২}$তম সেকেন্ডে শক্তি বিভিন্ন বস্তুকণা তথা কোয়ার্ক, ইলেক্ট্রন এবং এন্টিম্যাটার নামক তাদের আয়না প্রতিবিম্বে জমাট বাঁধতে শুরু করে। মহাবিশ্ব স্ফীত হয়ে একটা নরম বলের আকার ধারণ করে। মহাবিস্ফোরণের অব্যবহিত পরের $১০^{-৬}$ সেকেন্ডে মহাবিশ্ব বেড়ে গিয়ে $১০^{-১৩}$ কেলভিন তাপমাত্রা বিশিষ্ট আমাদের এই সৌর জগতের আকার নেয়। এত নিম্ন তাপমাত্রায় কোয়ার্কগুলো বাঁধনযুক্ত হয়ে প্রোটন ও নিউট্রনে পরিণত হয়। মহা বিস্ফোরণের তিন মিনিট পর প্রোটন ও নিউট্রন একীভূত হয়ে আনবিক নিউক্লিয়াস তথা সুষুম্না কেন্দ্র গঠন করে। এ পর্যায়েও ইলেক্ট্রনগুলো এত শক্তিমান থাকে যে বন্ধনযুক্ত হয়ে পরমাণু গঠন করতে পারে না। এ পর্যায়ে মহাবিশ্বের তাপমাত্রা থাকে $১০^{৯}$ ডিগ্রী। বিগ ব্যাং-এর এক লাখ বছর পর ইলেকট্রনসমূহ সুষুম্নাকেন্দ্রের সাথে যুক্ত হয়ে পরমাণু গঠন করে, বিকিরণ বস্তু থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং আরো মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করতে থাকে। এ পর্যায়ে তাপমাত্রা ছিল ৩০০০ কেলভিন। মহা বিস্ফোরণের ১০০ কোটি বছর পর তাপমাত্রা কমে গিয়ে ১৫ কেলভিনে এসে দাঁড়ায়। কোয়াসার সমূহ গঠিত হয় এবং মহাবিশ্ব তার পরিচিত আকৃতি ধারণ করে যেখানে ছায়াপথসমূহ তীব্র গতিতে পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়। কাজেই, যদিও আমরা দেখতে পাই যে, বস্তু বিভিন্ন স্তরে সংগঠিত হয়। প্রাথমিক অবস্থায় সকল আকারের বস্তু একত্রে সংযুক্ত ছিল এবং অতঃপর তারা বিভক্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করে।

পানি থেকে সকল জীবের সৃষ্টি

জীবনের প্রক্রিয়া হচ্ছে কার্বন-ভিত্তিক অণুর ব্যবহার দ্বারা সংগঠিত রাসায়নিক বিক্রিয়ার এক ধারা বিশেষ। এ প্রক্রিয়ায় বস্তুকে একটি ব্যবস্থার মধ্যে

www.bjilibrary.com

নেয়া হয় এবং এই ব্যবস্থাও প্রজননকর্মে ব্যবহার করা হয় যাতে পরিত্যক্ত দ্রব্যাদিকে নির্গত বা বহিষ্কার করা হয়। জৈব ও অজৈব অণুর অসংখ্য বিন্যাস দ্বারা গঠিত এক বা একাধিক কোষ নিয়ে জীবদেহ গঠিত। প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধির সংকেত থাকে কেন্দ্রীয় কোষ ডিএনএ-তে (ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিয়িক এসিড)। পৃথিবীর ইতিহাসের আদি যুগীয় সময়কালে এখানে বিরাজমান আদিম পরিবেশে সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়া জীবনের প্রথম স্পন্দনের সূত্রপাত ঘটাতে সক্ষম হয়। ১৯৫০ সালে, রসায়নবিদ এস. এল. মিলার হাইড্রোজেন, এমোনিয়া, মিথেন এবং জলীয় বাষ্পের এক গ্যাসীয় মিশ্রণকে একটা পানির পাত্রের ভিতর রাখেন এবং এর উপর দিয়ে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ প্রবাহিত করেন। কয়েকদিন পর পানির পাত্রটিতে ধারণ করে এমাইনো এসিডের দ্রবণ যার বিভিন্ন যৌগ আমিষ তৈরি করে। বিজ্ঞানীগণ ধারণা করেন, 'প্রাথমিক চোলাই'-এ এ ধরনের রাসায়নিক কর্মকান্ডের ফলে প্রথম জীবকোষ সৃষ্টি হয়।[১]

অতি শীঘ্রই এই 'প্রাথমিক চোলাই' প্রকল্প সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপিত হয়। এরই মধ্যে জীবনের সংকেত বা প্রধান পরিকল্পক ডিএনএ সম্পর্কে জানা যায়। দেখা গেল বিষয়টা এত জটিল যে, অনেকে অবিশ্বাস করলেন যে, ডিএনএ পানিতে উৎপন্ন হয় যেখানে এর বিভিন্ন গঠন উপাদানের একত্রে সংযুক্তি ছিল অসম্ভব। ডিএনএ দেখতে একটা পেঁচানো মই-এর মত, যাকে বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন যুগল পেঁচ। মইয়ের ধাপগুলো তৈরি হয় এডেনাইন (এ), থাইমিন (টি), গুয়ানিন (জি) এবং সাইটোসিন (সি) নামক চারটি অণুর বিভিন্ন যুগলের একত্রে সংযুক্তির মাধ্যমে। মইয়ের প্রতিটি ধাপ সর্বদাই তৈরি হয় AT অথবা TA, GC কিংবা CG অণুর যুগল তৈরির মাধ্যমে। AT, CG, GC এবং TA-র বিন্যাস এক জিন (তথা গতির নিয়ন্ত্রক উপাদান) থেকে অন্য জিনে পার্থক্য হয়ে থাকে, যাতে অধঃস্তন বংশধরের মধ্যে বংশগতির বৈশিষ্ট্যাদির সঞ্চারণ নিশ্চিত হয়। ডিএনএ অণুর ধাপসমূহ সকল জীবদেহেই একই রকম। সকল জীবের মধ্যে পার্থক্য ঘটে থাকে এই সকল ধাপ যেভাবে সাজানো থাকে তার উপর এবং AT (কিংবা TA)-এর সাথে GC (কিংবা CG)-র সংখ্যানুপাতের উপর। এই বিন্যাস এবং অণুপাতের কারণেই পার্থক্য সূচিত হয় একটি নীল মাছি আর একটা কুকুরের মধ্যে। এমনিভাবেই একটা গোলাপ আর একটা ক্যাকটাস ফুল কিংবা একজন মানুষ আর একটা বানরের মধ্যেও পার্থক্য ঘটে থাকে।[২]

জে. ডি. বার্নাল ডিএনএ-র গঠন উপাদানসমূহকে একত্রে সংযুক্ত করণে সমুদ্র সৈকতে সূর্যতাপে শুকানো মাটির ভূমিকার কথা বলে গেছেন।[৩] এ বিষয়টি ৬ ঃ ২ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। রাসায়নিকভাবে

সিলিকেট পাতের স্তুপ দিয়ে মাটি গঠিত যাতে দু'টি পাতের মধ্যে বাতাস ও পানি চলাচলের মত যথেষ্ট ফাঁক বিদ্যমান। সূর্যতাপে শুষ্ক হওয়া আর সাগরের পানিতে ভিজে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি অনুসমূহকে সংযুক্ত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করে থাকে। কাদামাটির বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রসমূহ তাদের ভিতর দিয়ে চলাচলকারী যৌগসমূহের উপর কোন নির্দিষ্ট ঔজ্জ্বল্য আরোপ করে থাকতে পারে। বিজ্ঞানীগণ আজ বিশ্বাস করেন যে, আদিম সেই চোলাইয়ে যখন জটিল অণুসমূহ কাদামাটির স্তরবিন্যস্ত কাঠামোর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে, ঠিক তখনই জীবনের প্রথম স্পন্দনের সূচনা হয়। সর্বাধিক নাটকীয় ঘটনাটি ছিল জড় থেকে জীবন স্তরে উন্নীত হওয়ার সেই আদিম অগ্রগতিটি, যা দৃশ্যত সংঘটিত হয়েছিল সমুদ্র সৈকতে সূর্যতাপে বিশুষ্ক কাদামাটির মধ্যে। আদিমযুগীয় চোলাই থেকে জীবনের উন্মেষ সম্পর্কে উপরে উল্লিখিত সবগুলো বৈজ্ঞানিক মতামতই অবশ্য বাস্তবতার অতি সরলীকরণ মাত্র। জীবন গঠনকারী সবগুলো অণুকে একটা পরীক্ষা পাত্রে একত্রে রাখলেই তা জীবন সৃষ্টি করতে পারবে না। জীবনের প্রারম্ভটা অবশ্যই ডিএনএ থেকে হতে হবে। ডিএনএ-র জটিল আণবিক গঠন কাঠামো দৈবক্রমে জীবন সৃষ্টির পক্ষে একটা সমাধান অযোগ্য সমস্যা সৃষ্টি করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একটা ভাইরাসের ডিএনএ-তে রয়েছে ২ লাখ (মইয়ের) ধাপ। আর মানব ক্রোমোজমের অভ্যন্তরস্থ একটা ডিএনএ অণু কমপক্ষে ৬শ' কোটি ধাপ নিয়ে গঠিত। কোন ধাপ ভুলভাবে স্থাপিত হলে একটা পরিব্যক্তি তথা বংশগত পরিবর্তন ঘটে। এভাবে ধাপগুলোর বিভিন্ন সংযুক্তির মধ্যে শুধুমাত্র একটি সংযুক্তিই মানব জীবনের জন্যে উপযুক্ত হয়েছে। আদিযুগীয় সেই চোলাইয়ে বিভিন্ন সম্ভাব্যতার প্রতিটি যদি শুধুমাত্র কয়েকদিন সময় নিত, তাহলে দৈবক্রমে সরলতম ডিএনএ-র সৃষ্টি হওয়া একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার ছিল। আর, ধাপগুলো সাজানোর ৬০০ কোটি জোড়ার সম্ভাব্যতা আছে এটা বিবেচনা করলে মানব ডিএনএ-র দৈবক্রমে উদ্ভব হওয়াটা প্রায় অসম্ভব।

তথ্য সূত্র ঃ

1. J. D. Bernal, Science in History, Vol. 3, Penguin Books, 1965. p. 986.
2. J. G. Navarra, J., Zafforoni and J.E. Gatone, California State Deptt. of Education, 1967, P. 170.
3. J. D. Bernal, The Physical Basis of Life, London, Rootledge and Kegan Ltd., 1952.

www.bjilibrary.com

٣١- وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝

২১ ঃ ৩১ এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত যাতে পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে এদিক-ওদিক ঢলে না যায় এবং আমি তাতে করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ যাতে তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে।

কুরআনের ২০ ঃ ১০৫ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে মহাদেশীয় ভূখন্ডের পারস্পরিক সংঘর্ষকালে প্লেট টেক্‌টোনিক্‌স দ্বারা কীভাবে পর্বতমালার সৃষ্টি হয়। সংঘর্ষের আঘাত বা চাপ সমান না হওয়ায় বিভিন্ন উচ্চতা বিশিষ্ট আলাদা পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হয় এবং সেই সাথে থাকে উপত্যকা ও গিরিপথ। পর্বতসমূহ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকে। কেননা, ভূত্বক পর্বতের ৮০ কিঃ মিঃ নিচে থাকে, যেখানে মহাদেশীয় অঞ্চলগুলোতে থাকে ৩৫ কিঃ মিঃ, আর মহাসাগরের থাকে প্রায় ৫ কিঃ মিঃ নিচে। যখন দু'টি ভূখন্ডের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে, তখন একটা প্রচন্ড স্থিতিস্থাপক ক্ষেত্র তৈরি হয় যার ফলে ভূকম্পনের সৃষ্টি হয়। এথেকে পর্বতমালা গঠনের প্রাথমিক স্তরে সাংঘাতিক ভূমিকম্প তৎপরতা চলতে থাকে। পর্বত গঠিত হলে স্থিতিস্থাপক ক্ষেত্রটি মুক্ত হয় এবং এভাবে ভূকম্পনের মাত্রা কমে আসে। গিরিপথগুলো সাধারণত পর্বতসমূহের মধ্যকার সরু পথ বিশেষ, যা এক ঢালু স্থান থেকে অন্য ঢালু জায়গা এবং কখনও কখনও বিভিন্ন বাধার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। গিরিপথের থাকতে পারে বিরাট কৌশলগত গুরুত্ব। নিজ নিজ গিরিপথসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সফলতা ও ব্যর্থতার উপরই কখনও কখনও বিভিন্ন জাতির ইতিহাসের পথ-পরিক্রমা নির্ধারিত হয়েছে। ভূমি বাণিজ্য পথকে অবশ্যই গিরিপথ অতিক্রম করতে হবে। বিশ্বের কিছু কিছু গিরিপথের মধ্যে রয়েছে হিমালয়ের খাইবার ও অন্যান্য গিরিপথ, গ্রীসের থার্মোপাইলা, আল্‌প্‌স পর্বতমালার সেন্ট বার্ণার্ড, ককেশাসের দারিয়াল ইত্যাদি। এভাবে এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহ্ পর্বতমালা দ্বারা বিভক্ত-বিচ্ছিন্ন এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ভ্রমণ ত্বরান্বিত করতে পর্বতমালার মাঝে গিরিপথ সৃষ্টি করেছেন।

٣٣- وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝

২১ ঃ ৩৩ আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।

www.bjilibrary.com

রাত ও দিন এবং চাঁদ ও সূর্যের সৃষ্টি বিষয়ে ২ ঃ ১৬৪ এবং ৭ ঃ ৫৪ আয়াতদ্বয়ে এবং পরিশিষ্ট-১ ও ২-এ আলোচনা করা হয়েছে। ইতিপূর্বে ধারণা করা হত যে, সূর্য, চন্দ্র এবং গ্রহ-নক্ষত্র ছাড়া অন্য সব মহাজাগতিক বস্তু মহাশূন্যে স্থিরভাবে আটকানো আছে। তাদের নিজেদের কোন গতি আছে বলে মনে হয় না, কিন্তু মহাজাগতিক ক্ষেত্রের ঘূর্ণনের কারণেই এরা ঘুরছে বলে মনে হয়। বর্তমানে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত যে, প্রতিটি মহাজাগতিক বস্তুরই নিজ নিজ নির্দিষ্ট গতি আছে। এভাবে, পৃথিবীরও রয়েছে সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণনের গতি, যাতে ৩৬৫.২৪ দিনে সে সূর্যকে পুরোপুরি প্রদক্ষিণ করে থাকে। অনুরূপভাবে, চাঁদের ঘূর্ণনগতিকাল ২৭.৩ দিন, বুধের ৮৮ দিন, শুক্রের ২২৫ দিন, মঙ্গলের ১.৮৮ বছর, বৃহস্পতির ১১.৯ বছর, শনির ২৯.৫ বছর, ইউরেনাসের ৮৪ বছর, নেপচুনের ১৬৫ বছর এবং প্লুটোর ২৪৮ বছর। সূর্য মিল্কিওয়ে ছায়াপথের অন্যান্য গ্রহসহ ২৫০ কিঃ মি/ সেকেন্ড গতিতে ঘুরছে। অন্যান্য ছায়াপথগুলোও ২,০০০ কিঃ মিঃ/সেকেন্ড থেকে ৫০,০০০ কিঃ মিঃ/সেকেন্ড-এর মত প্রচন্ড গতিতে ঘূর্ণায়মান রয়েছে। দূরবর্তীতম মহাজাগতিক বস্তুসমূহ তথা কোয়াসারগুলো আরো অধিক বেগে ধাবমান; এদের কতকগুলোর গতি আলোর গতির চেয়ে ৯০% ভাগ পর্যন্ত বেশী। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, অত্র আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য জ্যোতি-পদার্থবিদ্যার জ্ঞানের সাহায্যেই অনুধাবন করা সম্ভব।

٣٤- وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ○

٣٥- كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ○

২১ ঃ ৩৪-৩৫ আর হে নবী আমরা তো তোমার পূর্বের কোন মানুষের জন্য চিরঞ্জীব (অমর) হওয়ার ব্যবস্থা করি নি ? তুমি যদি মরে যাও তবে এই লোকেরা কি চিরদিন বেঁচে থাকবে?

প্রত্যেক জীবন্তকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর আমরা ভাল ও মন্দ অবস্থায় ফেলে তোমাদের সকলের পরীক্ষা করছি। তোমাদের সবাইকে আমাদের কাছেই ফিরে আসতে হবে।

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে দুনিয়াতে কোন জীবই অমর নয়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে জীবিত কালের বিভিন্নতা পাওয়া যায়। কিন্তু ১০০ বছরের উর্ধ্বে জীবিত লোকের সংখ্যা নগণ্য। উত্তম খাদ্য, উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা, ব্যাপক শিক্ষা ব্যবস্থা, ইত্যাদির ফলে গড় আয়ুর সীমা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবুও শতবর্ষ আয়ু পায় এমন লোকের সংখ্যা খুব কম। শিশু মৃত্যুর হার কম

www.bjilibrary.com

বলে উন্নত দেশে বৃদ্ধ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নত দেশসমূহে উন্নত জীবনযাত্রার ব্যবস্থা শিশু মৃত্যুর হার কমিয়েছে এবং বৃদ্ধলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে।

পৃথিবীর সব জীবকেই মরতে হবে। এটা এক চিরন্তন সত্য। মৃত্যুর একমাত্র নির্দিষ্ট প্রমাণ হচ্ছে হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া, যা স্টেথোস্কোপ দিয়ে নিশ্চিত করা যায়-অর্থাৎ যখন হৃদপিণ্ডের কোন শব্দ শোনা যায় না। মৃত্যুর অন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হচ্ছে মুখের সামনে আয়না ধরলে তাতে বাষ্প জমবে না, বা একটি পালক উপরের ঠোঁটে রাখলে তা স্পন্দিত হবে না, অথবা মৃত ব্যক্তির বুকের উপর পানি ভর্তি একটি কাপ রাখলে পানির কোন নড়াচড়া বুঝা যায় না। মৃত্যুর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হলো চামড়া বা রক্তনালী কাটলে রক্ত বের না হওয়া। অন্য স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান প্রমাণ হলো মুখের কোষগুলো ঢিলা হয়ে যাওয়া, ফলে চোখ স্থির হয়ে যায় এবং মুখ হা হয়ে থাকে, পিঠের বক্রতা হারিয়ে যায়, চামড়ার রং ফ্যাকাসে হয়, চামড়া পুড়ালে ফোসকা পড়ে না এবং লাল হয় না।

কোন কোন ক্ষেত্রে এক দেহ থেকে অন্য দেহে অঙ্গ সংযোজন এবং যান্ত্রিক উপায়ে পুণর্জীবিতকরণ যেমন বায়ুশোধক মুখোশের সাহায্যে একজনের হৃদপিণ্ড অনির্দিষ্টকালের জন্য সচল রাখা অনেক সময় মৃত্যুকে বুঝা কঠিন করে তুলেছে। এই সমস্যা পরিহার করার জন্য 'ব্রেইন ডেথ'-এর উদ্ভাবন হয়েছে। ইলেক্টোইনসেফালোগ্রামের মাধ্যমে ব্রেইন কার্যকর নয় ধরা পড়লে কৃত্রিম উপায়ে শ্বসন ও হৃদপিণ্ড চালু থাকলেও একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে ধরা হয়।

এ পর্যন্ত আমাদের জীবন জীবন্ত কোষের সঙ্গে জড়িত যা বার্ধক্যজনিত কারণে লয় হয়। এই লয় কৃত্রিমভাবে বিলম্বিত করা যায় কিন্তু অনির্দিষ্টকালের জন্য ঠেকানো যায় না।

٩٠- فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۡ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ
فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ؕ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ۝

২১ ঃ ৯০ আমরা (যাকারিয়ার) দোয়া করলাম আর তাকে দান করলাম ইয়াহইয়াকে। আর তার জন্য তার স্ত্রীকে উপযুক্ত করে দিলাম। এই লোকেরা (যাকারিয়া, ইয়াহইয়া ও যাকারিয়ার স্ত্রী) নেক ও পুণ্য কাজে অগ্রসর, আমাকে আগ্রহ ও ভয় সহকারে থাকত এবং আমাদের নিকট ছিল ভীত, অবনত।

www.bjilibrary.com

এখানে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে বৃদ্ধ বয়সে এবং সন্তানহীনা স্ত্রীর গর্ভে হযরত যাকারিয়া (আ)-এর পুত্র সন্তান ইয়াহইয়া (আ)-র জন্মের কথা বলা হয়েছে। হযরত জাকারিয়ার পুত্র সন্তান লাভের দোয়া আল্লাহ্ কবুল করেছিলেন। এ বিষয়টি ১৯ ঃ ৮ ও ৯ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

٩١- وَالَّتِىٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً
لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

২১ ঃ ৯১ **আর সেই মহিলা (বিবি মরিয়াম) যে নিজের সতীত্ব রক্ষা করেছিল, আমরা তার গর্ভে স্বীয় 'রূহ' ফুঁকে দিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে (হযরত ঈসা আ) দুনিয়াবাসীর জন্য উজ্জ্বল নিদর্শন বানিয়ে ছিলাম।**

এখানে কুমারীমাতা হযরত মরিয়াম (আ)-এর গর্ভে হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মগ্রহণের প্রসঙ্গটি আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। এই বিষয়টি ১৯ ঃ ২০ ও ২১ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

١٠٤- يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَىِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۗ كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ۗ
وَعْدًا عَلَيْنَا ۗ اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ ○

২১ ঃ ১০৪ **সেদিন আকাশমন্ডলীকে গুটিয়ে ফেলব, যেভাবে গুটান হয় লিখিত দফতর; যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব; প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য; আমি তা পালন করবই।**

এখানে আল্লাহ মহাবিশ্বের চূড়ান্ত অবস্থা সম্পর্কে ইঙ্গিত দিচ্ছেন। এটা সেই মহাবিশ্ব সম্পর্কে যা একটা প্রচন্ড বিস্ফোরণ তথা বিগ ব্যাং দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল। বিগ ব্যাং তথা মহা বিস্ফোরণের পরবর্তী সম্প্রসারণের বেগ এখনও কার্যকর রয়েছে। ছায়াপথ ও ছায়াপথ গুচ্ছসমূহ তীব্রবেগে পরস্পর থেকে দূরবর্তী স্থানে চলে যাচ্ছে; দূরত্ব যত বাড়ছে, দূরে সরে যাওয়ার বেগও ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন প্রশ্ন হলো যে, মহাবিশ্ব কি অনন্তকাল ধরে সম্প্রসারিত হতেই থাকবে? এ সম্প্রসারণ বলকে প্রতিরোধ করার জন্যে রয়েছে আকর্ষণ বল যা মহাকর্ষ থেকে সৃষ্ট। এ মহাকর্ষ বলের কারণে, ছায়াপথগুচ্ছ এবং আলাদা আলাদা

www.bjilibrary.com

ছায়াপথসমূহ পরস্পরকে আকর্ষণ করে থাকে। এভাবে, মাধ্যাকর্ষণ বল সম্প্রসারণের হার কমিয়ে থাকে। মহাবিশ্বে মাধ্যাকর্ষণ এবং সম্প্রসারণ–এ দু'টি বল ক্রিয়াশীল রয়েছে। আজ পর্যন্ত সম্প্রসারণ বলটি মাধ্যাকর্ষণ বলকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। যে কারণে ছায়াপথগুলো এখনো পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সম্প্রসারণ বলের নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত থাকলে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণও অব্যাহত থাকবে। এক সময় সম্প্রসারণের হার হ্রাস পেতে পারে, এমনকি তা শূন্যের কাছাকাছিও যেতে পারে। কিন্তু মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হতেই থাকবে এবং তা খোলা থাকবে। অপরপক্ষে, মাধ্যাকর্ষণ বল যদি প্রভাবশালী হয়, তাহলে এমন একটা সময় আসবে যখন সম্প্রসারণের হার হ্রাস পেতে শুরু করবে এবং শেষ পর্যন্ত তা শূন্য হয়ে যাবে। কিন্তু তখনও মাধ্যাকর্ষণ বল ক্রিয়াশীল থাকবে। ফলে, মহাবিশ্ব সংকুচিত হওয়া শুরু করবে এবং শেষ পর্যন্ত বিরাট এক চূর্ণনধ্বনির মাধ্যমে ভেঙ্গে পড়বে এবং অতি ক্ষুদ্র, অতি ঘন এক বুদ্‌বুদে পরিণত হবে।

সম্প্রসারণ বল এবং মহাকর্ষজনিত সংকোচণ বলের মধ্যে প্রচণ্ড রশি টানাটানির ফলাফল নির্ভর করে মহাবিশ্বে বর্তমান বস্তুর গড় ঘনত্বের উপর। গড় পড়তা ঘনত্ব যদি সংকট সৃষ্টিকারী নিম্নতম মানেরও কম হয় তাহলে সম্প্রসারণ বল হয়ে পড়ে প্রভাবশালী ও নিয়ন্ত্রণকারী; আর মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ অব্যাহত থাকে এবং চিরকালের জন্য খোলা থাকে। অপরপক্ষে, বিশ্বের গড় ঘনত্ব যদি সংকট মান অতিক্রম করে, তাহলে সংকোচণ বল শক্তিশালী হয়, মহাবিশ্ব নিজের মধ্যে গুটিয়ে আসে এবং সংকুচিত হওয়া শুরু করে; অবশেষে বিশাল এক চূর্ণনধ্বনির মধ্য দিয়ে ভেঙ্গে পড়ে।

মহাবিশ্বের বস্তুর গড় ঘনত্বের এই সংকট মান প্রতি ঘন আলোকবর্ষ ভরের সমান। মহাবিশ্বের সকল জ্ঞাত বস্তুর ভর বিবেচনা করলে, গড়পড়তা ঘনত্ব দাঁড়ায় সংকট মানের মাত্র ৩০% ভাগ। এমতাবস্থায় মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হতেই থাকবে এবং খোলা থাকবে। কিন্তু ছায়াপথগুলোর ভিতর বিপুল পরিমাণে ঘন, অদৃশ্য বস্তু আছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই ঘন বস্তুর মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণ গহ্বর,অনুজ্জ্বল ও ভস্মীভূত তারকাপুঞ্জ, বিপুল সংখ্যক বৃহস্পতি আকৃতির বস্তু যেগুলো এতটা ভারী ছিল না যে প্রজ্বলিত হয়ে তারকায় পরিণত হয়। সবচেয়ে অবাক করার মত ঘটনা হচ্ছে ঐ সব অতি ক্ষুদ্র ভরবিহীন কণা-নিউট্রিন যেগুলো প্রচণ্ড বিস্ফোরণকালের প্রথমদিকে সৃষ্টি হয়েছিল এবং এখনও তারকার মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে। এ সকল নিউট্রিনের বিদ্যুৎবিহীন, ভরবিহীন শক্তি প্রচণ্ড হবার কথা ছিল। ১৯৮০ সালে সোভিয়েত এবং আমেরিকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইঙ্গিত দেয় যে,

www.bjilibrary.com

নিউট্রনগুলোর খুব সামান্য ভর থাকতে পারে।[১] বিগব্যাঙ সৃষ্ট নিউট্রনসমূহের সংখ্যা আলোক কণা ফোটনের বিপুল সংখ্যার কাছাকাছি। এদের সংখ্যা এত বিপুল যে, সাধারণ বস্তুকে নিউট্রন পর্বতমালার শীর্ষে বরফের আচ্ছাদনের মত লাগতে পারে। যদি তাই হয়, নিউট্রনসমূহের ভর যত সামান্যই হোক না কেন, সম্ভাব্য সকল অদৃশ্য বস্তুর কথা বিবেচনায় আনলে বিশ্বস্থিত বস্তুর গড়পড়তা ঘনত্ব সংকট মানের চেয়ে বেশী হবে। কাজেই, এমন একটা সময় আসবে, যখন মহাবিশ্ব সংকুচিত হওয়া শুরু করবে এবং বিশাল চূর্ণনধ্বনির মধ্য দিয়ে ভেঙ্গে পড়বে।

মহাবিশ্বকে যে গোটান কাগজের মত গুটিয়ে নেয়া হবে, মহাবিশ্বের চূড়ান্ত অবস্থার কর্মসূচির মধ্যেই সেটার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, যা আমেরিকার বিজ্ঞানী ফ্রিম্যান ডাইসনের বিবরণীতে পাওয়া যায়।[২] তিনি স্বীকার করেন যে, মহাচূর্ণনধ্বনির প্রায় একশ' কোটি বছর আগে আলাদা আলাদা ছায়াপথগুলোর ভিতরকার শূন্যস্থানগুলো ছোট হয়ে আসবে। মহাবিশ্ব তখন তারকামণ্ডলীতে পূর্ণ হয়ে যাবে এবং তারকাগুলো পরস্পরের আরো কাছাকাছি চলে আসবে। মহাচূর্ণনধ্বনির এক লাখ বছরের মত আগে ছায়াপথসমূহ একাঙ্গীভূত হয়ে যাবে এবং তারকাসমূহ পরস্পরের এত কাছাকাছি চলে আসবে যে, মনে হবে একটা বিশাল সূর্য জ্বলছে। মহাচূর্ণনধ্বনির এক হাজার বছর আগে তারকাসমূহের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধবে এবং বিপুল সংখ্যক কৃষ্ণ গহ্বর সৃষ্টি হবে। চূড়ান্ত পর্যায়ে এ সকল গহ্বর পরস্পরকে আকর্ষণ করতে করতে এক সময় একাঙ্গীভূত হয়ে একটিমাত্র অতি ক্ষুদ্র, অতি উত্তপ্ত, অতি ঘন বস্তুর বুদ্‌বুদে পরিণত হবে। এটাই সেই মহাচূর্ণনধ্বনি।

কিছু কিছু বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে, মহাচূর্ণনধ্বনির পর আরেকটি মহাবিস্ফোরণ ঘটবে এবং বর্তমান মহাবিশ্বের মত নতুন একটা মহাবিশ্ব সৃষ্টি হবে। এই অভিমতটি আলোচ্য আয়াতের মর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

তথ্যসূত্র ঃ

1. G. Philips, Restless Universe, Nigel Henbest and Heather Couper, 1980.
2. Ibid.

www.bjilibrary.com

ه- يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ
ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ؕ
وَنُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ۚ
وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ
عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ○

২২ ঃ ৫ হে মানব সমাজ" মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে যদি তোমাদের মনে কোন সন্দেহ থাকে তবে তোমাদের জানা উচিত যে আমরা তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি, পরে শুক্রকীট হতে, তার পর রক্তপিন্ড হতে, পরে মাংসপিন্ড হতে যা আংশিক গঠিত এবং আংশিক অগঠিত। (এ সব বলার) উদ্দেশ্য যেন তোমাদের নিকট সব কথা স্পষ্টভাবে পেশ করা হয়। আমরা যাকে ইচ্ছা করি একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত জরায়ুর মধ্যে স্থিতিশীল করে রাখি, পরে তোমাদেরকে একটি শিশুরূপে ভূমিষ্ট করি, পরে তোমাদেরকে বর্ধিত করি যেন তোমরা পূর্ণ শক্তি সক্ষম হয়ে উঠতে (যৌবন পর্যন্ত পৌঁছাতে) পার। আর তোমাদের মধ্যে কাকেও পূর্বাহ্নেই মৃত্যুদান করি আবার কাউকে দুর্বলতম বৃদ্ধ অবস্থায় পৌঁছাই এমনকি তারা সব কিছু জানার পরও তখন কিছুই জানে না। তোমরা দেখতে পাও, জমিন প্রাণহীন অনুর্বর অবস্থায় পড়ে রয়েছে, কিন্তু পরে যখনই এর উপর পানি বর্ষণ করি, তা পুনঃ সতেজ হয়ে ওঠে, ফুলে ওঠে এবং তা সকল প্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিজ্জ উৎপাদন করতে শুরু করে দেয়।

মাতৃগর্ভে মানব শিশুর সৃষ্টি

এই আয়াতে মাতৃগর্ভে মানব শিশুর সৃষ্টির কয়েকটি স্তর সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ যে মাটি থেকেই সৃষ্ট এ বিষয়ে ২ ঃ ২৮ ও ১৮ ঃ ৩৭ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। মাটি থেকে অর্জিত মৌলিক পদার্থ মা ও বাবার

খাদ্যের মাধ্যমে বাবার শুক্রকীট ও মায়ের ডিম্ব সৃষ্টি হয় যাকে নুৎফাহ্ বা ফোটা বলা হয়েছে। নুৎফাহ্ থেকে মানব শিশুর জন্ম পর্যন্ত বিষয়ও ১৬ ঃ ৪ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে যা পরিশিষ্ট ৭-এ বিস্তারিত দেওয়া আছে।

ডিম্ব ও শুক্রকীট মিলনের পর যে সঞ্জীবিত ডিম্ব (fertilized ovum) হয় যার zygote ফেলোপিয়ান টিউব দিয়ে জরায়ুতে প্রবেশ করে তার দেয়ালে গেঁথে বসে। সেখানে এর বৃদ্ধি হতে থাকে। zygote-এর পরবর্তী স্তরের নাম আলাকাহ্ علقة যার অর্থ জোকের মত কোন বস্তু অথবা ঝুলন্ত কোন বস্তু বা রক্তপিন্ড যা গায়ের সঙ্গে লেগে থাকে।[১] সুতরাং জরায়ুতে গেঁথে বসাকেই আলাকাহ্ বা (علقة) ঝুলন্ত স্তরের শুরু। ভ্রূণের ৩-৪ সপ্তাহ (২৪-২৫তম দিন) সময়ে জোকের মত একটি বস্তু জরায়ুর গায়ে লেগে ঝুলে থাকে (ছবি-১১)। এ সময় ভ্রূণ একটি তরল পদার্থ ভরা থলিতে ঝুলতে থাকে। এ সময় ভ্রূণের হৃৎপিণ্ডের সৃষ্টি শুরু হয় এবং ভ্রূণ মায়ের রক্তের উপর নির্ভরশীল বলে জোকের সঙ্গে তুলনা করা যুক্তিসঙ্গত যা দেখতেও জোকের মত।[২] এই আলাকাহ্ স্তর ১৫-২৪ দিন পর্যন্ত চলে।

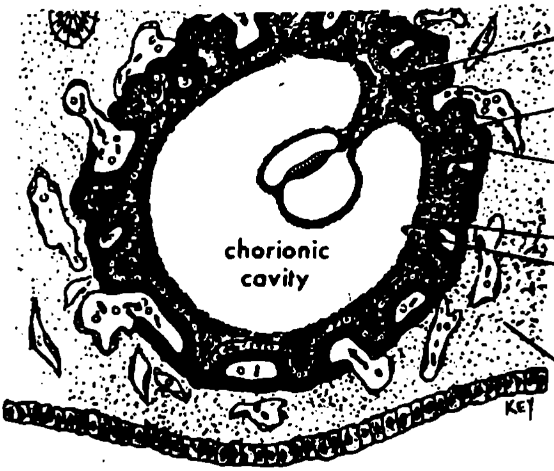

চিত্র- ১১

এ সময় যদি গর্ভপাত হয় তবে এই স্তরের ভ্রূণ (অথবা যদি শল্য চিকিৎসক জরায়ুর দেয়াল চেঁছে বের করে) দেখতেও জোকের মত (ছবি-১২) বা একটি

www.bjilibrary.com

রক্তপিন্ড মাত্র।[৩,৪] এ ছাড়া ভ্রুণের ১৫-১৬ দিন সময়ে একে জরায়ুর দেয়াল থেকে ঝুলতে দেখা যায়।[৫] সুতরাং আলাকাহ্ শব্দের সবগুলো অর্থই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত।

এর পরের স্তরকে বলা হয়েছে مضغة (মুদগাহ্) অথবা চিবানো বস্তু যা মাংসপিন্ডের মত। এই স্তর ২৩ থেকে শুরু করে ৪২ দিন পর্যন্ত চলে। এ সময়কার ভ্রূণ দেখতে সত্যিই চিবানো বস্তুর মত, যার তেরটি প্রকৃত অংশ (somites) দেখতে চিবানো মাংসে দাঁতের দাগের মত মনে হয় (ছবি-১২)।[৬] এ সময় যদিও শরীরের বিভিন্ন অংশ তৈরি শুরু হয় তবে তাদের কাজ শুরু হয় না অর্থাৎ অন্ত্র ও যন্ত্রগুলো তখনও পূর্ণভাবে তৈরি হয়ে যায়নি। তাই কুরআনের বর্ণনা আংশিক তৈরি ও আংশিক তৈরি নয় অবস্থা বৈজ্ঞানিকভাবেও সত্যি। এ বিষয়ে বাকি স্তরগুলো সম্পর্কে ২৩ ঃ ১২-১৫ আয়াতগুলোতে পরবর্তীতে বিস্তারিত বলা হবে।

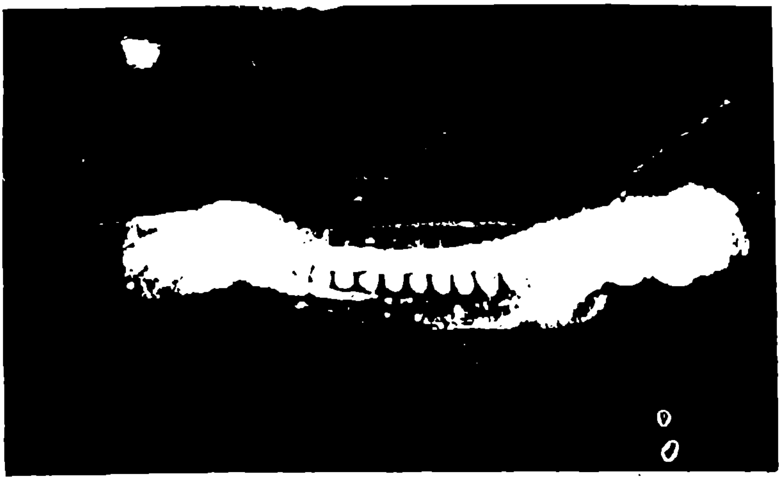

চিত্র- ১২

গর্ভকাল সাধারণত ডিম্বের গর্ভাধানের (fertilization) ২৬৬ দিন বা ৩৮ সপ্তাহ্ পর্যন্ত অথবা শেষ ঋতুস্রাবের (last menstrual period or LMP) -এর ২৮০ দিন বা ৪০ সপ্তাহ্ বলে ধরা হয়। তবে প্রকৃত পক্ষে এই গর্ভকাল কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ্ কম বা বেশীও হতে পারে। এই সময়কাল আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত যাকে এখানে আল্লাহ্র নির্দিষ্ট সময় বলা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

সন্তানের জন্মগ্রহণ এক অলৌকিক ঘটনা। সন্তান জন্মের পর সে শিশু, কিশোর, যৌবন ও বৃদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এখানে আল্লাহ বেশী বৃদ্ধাবস্থার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। যৌবনে ও প্রৌঢ়কালে মানুষ বেশ শক্তিশালী থাকে। কিন্তু বৃদ্ধকালে আবার দুর্বল হয়ে যায়। তবে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এত বেশী বৃদ্ধ হয়ে যায় যে তারা শিশুর মত হয়ে যায় এবং তারা সব জানা বিষয় ভুলে যায়। এই অবস্থাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে Alzheimer's dementia বলা হয় যা মস্তিষ্কের বিশেষ ধরণের শুষ্কতা (sclerotic)-র জন্য হয়ে থাকে। এটা সত্যি ভাববার বিষয় যে আল্লাহ্ আমাদেরকে একটি ক্ষুদ্র ভ্রূণ থেকে বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে পূর্ণ মানব শিশু রূপে পৃথিবীতে ভূমিষ্ট করান যা এখন আমরা ভ্রূণ তত্ত্বের মাধ্যমে জানতে পারছি। অথচ যখন ভ্রূণ তত্ত্বের জন্মই হয়নি তখন ৭ম শতাব্দীর কুরআনে এই সমস্ত তথ্য সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে আল-কুরআন আল্লাহ্র প্রেরিত কিতাব, কোন মানব রচিত পুস্তক নয়।

বৃষ্টির পানি মাটিকে উজ্জীবিত করে

এই পৃথিবীতে অনেকদিন বৃষ্টিপাত না হলে গাছপালা ও লতাপাতার অবর্তমানে মৃত মনে হয় যদিও এর মধ্যে নানা প্রকার উদ্ভিদের বীজ লুক্কায়িত থাকে। কোন গাছই পানি ছাড়া বাঁচে না। আর স্থলভাগের বৃক্ষরাজি সাধারণত বৃষ্টির পানিতেই বেঁচে থাকে। আমরা সবুজ বনানী ও ঘাসে আবৃত সুন্দর পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করলেই পানির সঙ্গে বৃক্ষের বিশেষ সম্পর্ক দেখতে পাই। শুষ্ক মাটিতে গাছের বীজ পানির অভাবে মৃতপ্রায় পড়ে থাকে এবং তাপের তারতম্য সহ্য করার শক্তি রাখে। এরূপ আপাত মৃত পৃথিবীতে বৃষ্টির পর সুপ্ত বীজগুলো অঙ্কুরিত হয়, এ বিষয়ে ৬ ঃ ৯৫ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

কুরআনের শব্দদ্বয় اهتزاز এবং ربت বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর অর্থ বলতে বুঝায় আন্দোলিত বা আলোড়িত হওয়া বা উৎফুল্ল হওয়া যার তরজমা আনন্দে উদ্বেলিত হওয়াকে বুঝায়। শুকনো মাটিতে বৃষ্টির পানি পড়লে ঘাস লতা গুল্ম যে ভাবে দ্রুত জন্মে তাতে এই আনন্দে উৎফুল্ল ভাবই যেন ফুটে উঠে। বৃষ্টির পানিতেই মাটিতে গাছপালা জন্মের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক ও জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া শুরু হয়। বহু উপর থেকে পড়া বৃষ্টির ফোটা মাটির ঢেলাকে নরম করে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। আর মাটির কোন কোন ক্ষুদ্রাংশ

www.bjilibrary.com

পানির সাহায্যে ফুলে ফেঁপে উঠে বীজ অংকুরিত করতে সহায়তা করে। আরবী رب শব্দের অর্থ খাওয়ানো, পুষ্টি সাধন বা লালন-পালন করা। প্রকৃতপক্ষে ভিজা মাটিই গাছ-পালার বীজকে পুষ্টি প্রদান করে। মাটি আর পানির মিলনে মৃত পৃথিবী আবার সবুজ বৃক্ষলতায় সুশোভিত হয়ে উঠে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. K. L., Moore and A.M.A., Azzindani, The Developing Human with Islamic Additions, 3rd edn. Dur al-Qiblah for Islamic Literature, Jeddah, p. 73, 1982.
2. Ibid, pp. 56-82.
3. M.G. Muazzam, History of the Discovery of the Mechanism of Reproduction and the Revelation in the Holy Quran, Pak. J. Science. Vol. 14, No. 6, pp. 281-298, 1982.
4. K. L., Moore and A.M.A., Azzindani, The developing Human with Islamic Additions, 3rd edn. Dur al-Qiblah for Islamic Literature, Jeddah, 1982, p. 56a.
5. Ibid, p. 67.
6. Ibid, p. 80.
7. Steingass, Arabic-English Dictionary. Cosmo Publications, New Delhi, India, 1982.
8. M. Pickthall, The Meaning of the Glorious Qur'an. Kutub Khana Ishayat-Ul-Islam (Regd), Delhi. 1979.

www.bjilibrary.com

٦- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

২২ ঃ ৬ সুতরাং নিশ্চয়ই আল্লাহই একমাত্র সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবনদান করেন এবং একমাত্র তিনিই সব কিছুর উপর প্রভাব রক্ষাকারী।

মৃতকে জীবিত করার বিষয়টি ২ ঃ ২৮ আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

١٨- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ؕ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ؕ
وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۝

২২ ঃ ১৮ তোমরা কী লক্ষ্য কর না যে আসমানসমূহ ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু বা জিনিষই আল্লাহর নিয়মের নিকট অবনত শির যেমন সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা এবং প্রাণীজগত, আর মানব জাতিরও বিরাট অংশ। এমন অনেক রয়েছে যাদের উপর আল্লাহর আযাব অবধারিত হয়ে রয়েছে। আল্লাহ যাকে ঘৃণা করেন তাকে আর কেউ সম্মান দিতে পারে না। বস্তুত আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করতে সক্ষম।

মহাকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় জীব ও বস্তু যে একমাত্র আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন এ বিষয় ৫ ঃ ১৯ ও ৭ ঃ ১৮৫ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে এবং পরিশিষ্ট—৩-এ এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

٤٧- وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ؕ وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ
كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۝

২২ ঃ ৪৭ আর এরা আপনার নিকট আযাবের জন্য তাগাদা করছে (কারণ তাদের ধারণা আযাব আসবে না), অথচ আল্লাহ কখনো তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করবেন না। আর আপনার রবের নিকট একটি দিন এক হাজার বছরের সমতুল্য।

www.bjilibrary.com

আমরা পৃথিবীর নিজের মেরুদন্ডের (axds) চার পাশে দৈনিক আবর্তনকে একদিন গণনা করি। আর সূর্যের চারদিকে ঘুরবার সময়কে এক সৌর বছর ধরা হয়। তবে এই ঘূর্ণনের বেলায় যদি সূর্যকে স্থির ধরা হয় তবে বছরের দৈর্ঘ্য হয় ৩৬৫.২৪২ দিন আর যদি কোন তারকাকে স্থির ধরা হয় তবে এক বছরের দৈর্ঘ্য হয় ৩৬৫.২৫৬ দিন।

এমনিভাবে যে কোন গ্রহ, উপগ্রহ যদি তার মেরুদন্ডের চার পাশে একবার ঘুরে তবে তাকে সেই গ্রহের একদিন ধরা হবে। পৃথিবী থেকে এই সব বিভিন্ন গ্রহের প্রতিদিনের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন হবে। আমাদের চাঁদও তার মেরুদন্ডের চার পাশে একবার ঘুরলে আমাদের হিসাবে চাঁদের একদিন হবে। তবে পৃথিবীর হিসাবে হবে ২৯ দিন। আর সূর্যের নিজস্ব একদিন আমাদের হিসাবে হবে ২৭ দিন। আমাদের মিল্কিওয়ের (Milkyway) একদিন আমাদের পৃথিবীর হিসাবে হবে ২২ কোটি বছর। সুতরাং মহাবিশ্বের বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র ইত্যাদির দিনগুলো আমাদের হিসাবের বিভিন্ন সময়ের হবে।

আর পাক কুরআনে يوم বলতে একদিন নয় এক সময়কাল (period) বুঝায়। যদিও আমরা আকাশের বিভিন্ন বস্তুর দিনের বিভিন্ন হিসাব দিবার চেষ্টা করেছি তবে এখানে আল্লাহ্ বলছেন যে আখেরাতের একদিন হবে আমাদের এক হাজার বছরের সমান। অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকট একদিন আমাদের দিন বা বছরের তুলনায় অনেক বেশী। তাই ৭ ঃ ৫৪ আয়াতে মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে ছয় দিন লাগার অর্থ ছয় সময় কাল যা বহু হাজার লক্ষ বছরও হতে পারে।

٥٣- لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ
قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝

২২ ঃ ৫৩ যেন তিনি (আল্লাহ্) শয়তানের উদ্ভাবিত সন্দেহকে এমন লোকদের পরীক্ষার উপকরণ করে দেন যাদের অন্তরে ব্যধি রয়েছে এবং যাদের হৃদয় কঠিন। আর বাস্তবিক এই যালিমরা চরম বিরোধিতার মধ্যে রয়েছে।

মনের রোগ বা মানসিক রোগের কথা ৯ ঃ ১২৫ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। ২ ঃ ১০ আয়াতেও মনের রোগের উল্লেখ রয়েছে।

হৃদয় কঠিন বলতে হৃৎপিন্ডের মাংস শক্ত হয়ে যাওয়াকে বুঝায় না বরং এতে আল্লাহকে বিশ্বাস না করার ধৃষ্টতা বুঝায়।

www.bjilibrary.com

٦١- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ○

২২ ঃ ৬১ সেটা এ জন্য যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে প্রবিষ্ট করান দিবসের মধ্যে আর দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাত্রির মধ্যে এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।

৩ ঃ ২৭ আয়াতে এটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

٦٣- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۫ فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ○

২২ ঃ ৬৩ তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ বারি বর্ষণ করেন আকাশ হতে যাতে সবুজ শ্যামল হয়ে উঠে ধরিত্রী : আল্লাহ্ সম্যক সূক্ষ্মদর্শী, পরিজ্ঞাত।

২ ঃ ১৯ এবং ২ ঃ২২ আয়াতদ্বয়ে আকাশে মেঘের গঠন এবং বৃষ্টির ফোঁটার নিচে পতন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পৃথিবীর সবুজে আচ্ছাদিত হওয়ার অর্থ প্রাচুর্যের সাথে গাছপালা ও শস্য ফলাদির জন্ম ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া। বৃষ্টির ফোঁটা শুষ্ক মৃত্তিকার উপর পড়ে, বিশুষ্ক, অনুর্বর ভূমিকে উর্বর করে এবং তারপর প্রচুর পরিমাণে সবুজ গাছপালার জন্ম দেয়। সবুজ গাছপালা ও শস্যফলাদির বৃদ্ধির বিষয়টি ২ ঃ ১৬৪, ৬ ঃ ৯৯ এবং ২০ ঃ ৫৩ আয়াতত্রয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

٦٤- لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ○

২২ ঃ ৬৪ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই এবং আল্লাহ্, তিনি তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

'বিলংগিং' (belonging) তথা অধিকারভুক্তি কথাটার প্রচলিত অর্থ মালিকানা বা দখল এর পরিবর্তে ভিন্ন এক অর্থে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কেননা আল্লাহ্র কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। অবশ্য, আল্লাহ্ যেহেতু (জীব ও জড়) সব কিছু সৃষ্টি করেন, লালন-পালন করেন এবং নিজ বিধান মোতাবেক পরিচালনাও করেন, সেহেতু সবকিছুই তাঁর মালিকানাভুক্ত হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলাই যে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তা ২ ঃ ১৬৪ আয়াতে এবং পরিশিষ্ট-১ ও ২-এ আলোচিত হয়েছে। ১ ঃ ২ আয়াতে দেখানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ই সবকিছু লালন-পালন করেন। আল্লাহ্ একজন আইনদাতা হিসেবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন–এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে ৭ ঃ ৫৪ আয়াতে। ৫ ঃ ১৯ আয়াত প্রসঙ্গে যে আলোচনা রাখা হয়েছে তা-ও এখানে প্রাসঙ্গিক।

٦٥- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهٖ ۚ وَيُمْسِكُ
السَّمَآءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهٖ ۗ إِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

২২ ঃ ৬৫ তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তার সব কিছুকে এবং তার নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণশীল জলযানসমূহকে এবং তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাতে তা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর তাঁর অনুমতি ব্যতীত। আল্লাহ্ মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

পৃথিবীস্থ সবকিছুকেই যে আল্লাহ্ মানুষের অধীন করে দিয়েছেন, তার প্রচুর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে প্রকৃতিকে বশে আনতে ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে মানুষের অব্যাহত সফলতার মধ্য দিয়ে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে তা সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীস্থ সবকিছুর উপর মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সত্যি সত্যি সে তাকে আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসেবে প্রমাণ করেছে। এ বিষয়ে ২ ঃ ২৯ আয়াতে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সাগর ও নদীবক্ষে আল্লাহ্র হুকুমে জাহাজ চলাচলের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে ২ ঃ ১৬৪ আয়াতে।

অত্র আয়াতে উল্লিখিত আকাশের পৃথিবী পৃষ্ঠে পতন ঠেকিয়ে রাখার বিষয়টি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়ার দাবী রাখে। ১৩ ঃ ২ আয়াতে ঘোষিত বিষয় তথা 'তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমরা যে আকাশমণ্ডলী দেখতে পাও তাকে কোন স্তম্ভ ছাড়াই উচ্চে স্থাপন করেছেন' বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেই একই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখানেও খাটে। কেননা অত্র আয়াতে আল্লাহ্ স্পষ্টভাবেই এমন অনেক বলের কথা বলেছেন যা আসমান ও আকাশমণ্ডলীস্থ সবকিছুকে যথা স্থানে রাখে এবং এই বলই মহাকর্ষ বল হিসেবে পরিচিত।

٦٦- وَهُوَ الَّذِيْٓ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ○

২২ ঃ ৬৬ আর তিনিই সেই বরং যিনি তোমাদেরকে জীবনদান করেছেন, আবার তোমাদেরকে মৃত্যু প্রদান করবেন, পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করবেন। নিশ্চয়ই মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

আল্লাহ্ যে জীবন ও মৃত্যু দেন এ বিষয় ২ ঃ ২৮ এবং ৯ ঃ ১১৬ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে পুনরায় জীবিত করা বলতে কিয়ামতের পর বিচারের সময় আবার জীবিত করা বুঝান হয়েছে।

www.bjilibrary.com

VII UNIVERSE	PHL957, INDUS, A665, HERCULES, COMA, A2232	20,000,000,000 LIGHT YEARS
VI LOCAL SUPER-CLUSTER OF GALAXIES	SCULPTOR, VIRGO, NGC 5128, URSA MAJOR, M96, NGC 3245	75,000,000 LIGHT YEARS
V LOCAL GROUP OF GALAXIES	ARGO, LEO I, SMALL MAGELLANIC CLOUD, URSA MINOR, LEO II, LARGE MAGELLANIC CLOUD, ANDROMEDA, NGC 205, MILKYWAY	2,000,000 LIGHT YEARS
IV MILKY WAY		50,000 LIGHT YEARS
III LOCAL GROUP OF STARS	PROCYON, 61 CYGNI, SIRIUS, BARNARD STAR, ALPHA CENTAURI, SUN, TAU CETI	20 LIGHT YEARS
II SOLAR SYSTEM	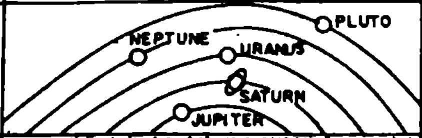	5 LIGHT HOURS
MINOR PLANETS		
I INTERIOR PLANETS	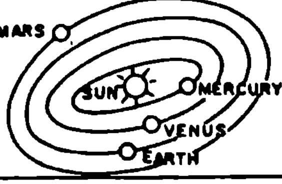	13 LIGHT MINUTES

· PLATE : SEVEN FIRMANENTS

www.bjilibrary.com

١٢- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۝

١٣- ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۝

١٤- ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ
عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ۗ ثُمَّ أَنْشَأْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ۗ
فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۝

١٥- ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ۝

২৩ ঃ ১২-১৫ আর আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাকে আমি বীর্য রূপে সৃষ্টি করে এক সুরক্ষিত স্থানে সংযুক্ত করে রাখলাম। অতঃপর আমি উক্ত শুক্র বিন্দুকে জোকের মত লেগে থাকা বস্তুকে পরিণত করলাম, অনন্তর সেই বস্তুকে চিবানো মাংসপিন্ডের মত বস্তুতে পরিণত করলাম, পরে সেই মাংসপিন্ডকে হাড়ে পরিবর্তন করলাম, পরে উক্ত হাড়গুলোকে গোশত দিয়ে জড়িয়ে দিলাম। তারপর আমি তাকে একটি নতুন সৃষ্টিরূপে গড়ে তুললাম। সুতরাং মহান সেই আল্লাহ্ যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা। অতঃপর তোমরা অবশ্য মৃত্যুবরণ করবে এবং তারপর তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত করা হবে।

এই আয়াতসমূহে মায়ের গর্ভে ভ্রূণ তৈরি এবং তা থেকে ক্রমে বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে পূর্ণ মানব শিশু সৃষ্টির বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। একে সংক্ষিপ্ত ভ্রূণ তত্ত্ব (embryology) বলা যায়। পরিশিষ্ট-৬ এ বিস্তারিত দেখুন।

মাটির নির্যাস বা উপাদান থেকে মানুষ সৃষ্টির বিষয় ১৮ ঃ ৩৭ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। নুৎফা থেকে ভ্রূণ সৃষ্টির কথা ২২ ঃ ৫ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। পুরুষের নিক্ষিপ্ত কোটি কোটি শুক্রকীটের মধ্যে একটি মাত্র শুক্রকীট মায়ের ডিম্বে প্রবেশ করলে ভ্রূণের সূচনা হয় যাকে zygote বলা হয়। এই zygote গর্ভাশয়ের নালী ফেলোপিয়ান টিউবের মধ্যদিয়ে গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে এবং তার জন্য তৈরি করা দেয়ালে সংযুক্ত হয় যেখানে এটা নিরাপদে

www.bjilibrary.com

অবস্থান করে। তাই কুরআনে একে قرار বা শান্তিস্থল বলা হয়েছে। সুতরাং قرار مكين বলতে zygote গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে তার দেয়ালে গ্রথিত (embedding) হওয়াকে বুঝায়। এর অন্য অর্থও করা যায়। আমরা জানি যে ডিম্বে প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত শুক্রকীট অস্থির বা চঞ্চল থাকে। ডিম্বে প্রবেশ করে তা স্থির হয়। আবার zygote-ও পেটের পানিতে ভাসতে থাকে এবং গর্ভাধানের দেয়ালে সংযুক্ত হবার পর স্থির হয়।[১] শুক্রকীট ডিম্বে প্রবেশ করে এবং zygote গর্ভাধানের দেয়ালে সংযুক্ত হওয়ার পর স্থির এবং নিরাপদ আশ্রয় লাভ করে থাকে।

علقة এবং مضغة -র স্তর সম্পর্কে ২২ ঃ ৫ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। 'মুদগাহ' স্তর প্রায় গর্ভের ৪০তম দিবস পর্যন্ত চলতে থাকে।[২]

এর পরের স্তর হল হাড়ের সৃষ্টি। প্রথমে দুই হাতের হাড় সৃষ্টি শুরু হয়। ষষ্ঠ সপ্তাহের শুরুতে হাড় হবার উপযুক্ত কোষগুলো 'কার্টিলেজ' বা নরম হাড়ে পরিবর্তিত হয়। ষষ্ঠ সপ্তাহের শেষে দুই হাতের এবং বার সপ্তাহের মধ্যে সমগ্র শরীরের হাড়ের একটি কাঠামো তৈরি হয়ে যায়।

আয়াতে 'নুৎফা' থেকে 'আলাকা' স্তর পর্যন্ত প্রতি স্তরের শুরুতে ثم বা অতঃপর শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবীতে এই সংযোগকারী অব্যয় প্রতি স্তরের মধ্যে কিছুটা সময় লেগেছে বুঝায়। মুদগাহ'র পদ ف অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে। এতেও অতঃপর বুঝায়। তবে এতে কম সময়ের ব্যবধান বুঝায়। তাছাড়া এই সব স্তরই একটার পর একটা শুরু হলেও বিভিন্ন স্তর তার নির্দিষ্ট প্রয়োজন ও সময় পর্যন্ত চালু থাকে।

হাড়ের পরের স্তর হচ্ছে মাংসপেশির সৃষ্টি। গর্ভের ৭ম সপ্তাহ থেকে হাড় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে শুরু করে এবং ক্রমে শরীরের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন আকারের হাড় সৃষ্টি হতে থাকে। অতঃপর ভ্রূণ একটি মানব শিশুর আকার লাভ করে। ৭ম ও ৮ম সপ্তাহে মাংসপেশি হাড়গুলোকে ঢেকে দেয় বা হাড়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। যদিও হাড় ও মাংসপেশী প্রায় একই সময়ে তৈরি হতে থাকে। তবে মাংসপেশী ও হাড় তৈরি হওয়ার পরই সংযুক্ত হয় তাই হাড়ের পর মাংসপেশির সংযোগ বলা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক। আর হাড়কে মাংসপেশি আবৃত করছে বলাও খুব যুক্তিপূর্ণ উক্তি।

৮ম সপ্তাহের পর শরীর ও হাত পায়ের ও মাথার মাংসপেশিগুলো সঠিক অবস্থান গ্রহণ করে এবং তখন নবসৃষ্ট শিশু সামান্য নড়াচড়া করতে সক্ষম হয়।[৩]

এরপর শিশুটি ক্রমেই বড় হতে থাকে যেমন ২২ ঃ ৫ আয়াতের আলোচনায়

www.bjilibrary.com

বিবৃত হয়েছে। একেই এখানে খালাকান আখার বা নবীন সৃষ্টি বলা হয়েছে। অতঃপর পূর্ণতা প্রাপ্ত শিশু ভূমিষ্ট হয় এবং একজন নতুন মানুষের পৃথিবীতে আগমন ঘটে।

আল্লাহ্ নিজকে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা বলেছেন যা খুবই সঠিক বিবরণ। মানুষ অনেক কিছুই সৃষ্টি করতে পারে। তবে সে যাই সৃষ্টি করুকনা কেন তা সে করে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তু দিয়েই। তাই আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা। আর আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে বলা হয় আশরাফুল মাখলুকাত বা সেরা সৃষ্টি।

মানব সৃষ্টি রহস্যের ঐতিহাসিক বিবরণ পরিশিষ্ট-৬ এ দেওয়া হয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. M.G. Muazzam, History of the Discovery of the Mechanism of Reproduction and the Revelation in the Holy Quran, Pak. J. Science. Vol. 14, No. 6, pp. 281-298, 1962.
2. K. L., Moore and A.M.A., Azzindani, The developing Human with Islamic Additions, 3rd edn. Dur al-Qiblah for Islamic Literatures, Jeddah, p. 73, 1982.
3. Ibid, p. 364.

www.bjilibrary.com

١٧- وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ○

২৩ ঃ ১৭ আমি তো তোমাদের ঊর্ধ্বে সৃষ্টি করেছি সপ্ত স্তর এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে অসতর্ক নই।

আমাদের মাথার উপরে আছে মহাজাগতিক ক্ষেত্র। আর এর মধ্যেই রয়েছে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জগত। আল্লাহ্‌র অন্যতম সৃষ্টিকর্ম এই পৃথিবীও এই মহাজাগতিক ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত।

আল-কুরআনের ২ ঃ ২৯ আয়াতে দেখা যায়, সাতটি আলাদা রকমের মহাজাগতিক বস্তু রয়েছে, যাদের প্রত্যেকের রয়েছে নব নব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গতি ও চলার পথ। সাত প্রকার মহাজাগতিক বস্তুসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. তারকা ঃ একক, দ্বৈত ও বহুমুখী তারকা, তারকাগুচ্ছ, বাদামী বামন, প্রধান অনুবর্তী তারকা, রক্তিম দৈত্য, স্পন্দনশীল, শ্বেত বামন, ক্ষণ উজ্জ্বল নক্ষত্র, অতি উজ্জ্বল নক্ষত্র, নিউট্রন তারকার কম্পনকারী তারকা এবং কৃষ্ণ গহ্বর। প্রত্যেকের নিজ নিজ ঘূর্ণন গতি, রশ্মি এবং যথাযথ গতি রয়েছে। এরা নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘোরে।

২. গ্রহ-নক্ষত্র ঃ সৌরজগৎ কিংবা অন্যান্য তারকামণ্ডলীয় গ্রহও হতে পারে। প্রতিটির নিজস্ব দু'টি গতি আছে ঃ সূর্যের কিংবা সংশ্লিষ্ট তারকার চারদিকে প্রদক্ষিণের গতি এবং নিজ অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণনের গতি। প্রতিটি গ্রহ উপবৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্য কিংবা সংশ্লিষ্ট তারকাকে অন্যতম ক্রিয়া-কেন্দ্রে রেখে ঘূর্ণায়মান থাকে।

৩. উপগ্রহ ঃ গ্রহের উপগ্রহ, সংশ্লিষ্ট গ্রহের চারদিকে ঘোরে এবং নিজ অক্ষের চারদিকেও ঘোরে।

৪. ধূমকেতু ঃ এরা সৌরজগৎ কিংবা অন্য কোন তারকা সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থার অধীন, এটা সূর্য কিংবা সংশ্লিষ্ট তারকার চারদিকে পরিভ্রমণ করে এমন কক্ষপথে যা গ্রহের কক্ষপথের চেয়ে অনেক বেশি কেন্দ্রাপসারী।

৫. নীহারিকা ঃ নীহারিকা হচ্ছে আন্তঃতারকা গ্যাসীয় মেঘবিশেষ, যা হয় উজ্জ্বল নীহারিকা হিসেবে পরিচিত একটা দীপ্তিমান আলোকখণ্ড আকারে নতুবা অনুজ্জ্বল নীহারিকা হিসেবে পরিচিত একটা অন্ধকারময় ফিতা বা বন্ধনীর গহ্বর আকারে পরিদৃষ্ট হয়। নীহারিকা যে ছায়াপথে অবস্থিত তার গতি এবং সেই সাথে এর নিজস্ব গতির কারণে নীহারিকা ঘূর্ণায়মান থাকে।

৬. ছায়াপথ ঃ এগুলো তারকা ও তাদের জগৎ, গ্যাস এবং ধূলির এক বিশাল

www.bjilibrary.com

সমাবেশ যার মধ্যে কেন্দ্রীভূত রয়েছে মহাবিশ্বের দৃশ্যমান বস্তুসামগ্রী। ছায়াপথ উপবৃত্তাকার, পেঁচানো, বাহ্যত-পেঁচানো কিংবা অসমাঙ্গ হতে পারে। ছায়াপথ প্রচণ্ড বেগে ঘোরে। ছায়াপথের দূরত্ব যত বাড়ে, ততই এর অপসরণমানতার বেগও বাড়ে। প্রতিটি ছায়াপথই আলাদা আলাদা কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান।

৭. কোয়াসার ঃ কোয়াসার হচ্ছে ছায়াপথ-বহির্ভূত ঘন সন্নিবিষ্ট বস্তুবিশেষ, যা দেখতে আলোকপ্রান্তের মত হলেও একশটি অতি দৈত্যাকার ছায়াপথের চেয়েও বেশী শক্তি নির্গত করে। এরা অচিন্তনীয় গতিতে ঘূর্ণায়মান থাকে। কিছু কিছু কোয়াসারের গতি আলোর গতির চেয়ে প্রায় ৯০% ভাগ বেশি।

এভাবে এ সত্যটি এখন প্রতিষ্ঠিত হল যে, সকল মহাজাগতিক বস্তুই গতিশীল এবং এদের প্রতিটি স্পষ্টতই আলাদা আলাদা কক্ষপথে ঘোরে। আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির প্রতি এতটা সজাগ দৃষ্টি রাখেন যে, মহাজাগতিক বস্তুর সংখ্যা অগণিত হলেও তারা এলোপাতাড়ি চলাচল করে না, পরস্পরের সাথে সংঘর্ষ বাধায় না বা একে অপরকে ধ্বংস করে না। বরং তারা স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট কক্ষপথে এমনভাবে চলতে আদিষ্ট যেন তারা পরস্পরের সংস্পর্শে না আসে।

১৮- وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ ۖ
وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ ۝

২৩ ঃ ১৮ এবং আমি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে, অতঃপর আমি তা মৃত্তিকায় শোষণের ব্যবস্থা করি; এবং আমি তাকে অপসারিত করতেও সক্ষম।

আকাশে বৃষ্টির ফোঁটা কীভাবে সৃষ্টি বা গঠিত হয় তা কুরআনের ২ ঃ ১৯ ও ২ ঃ ২২ আয়াতদ্বয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বৃষ্টির ফোঁটা মাটিতে এসে পড়ে বর্ষণ আকারে। অধিকাংশ পানিই শোষণ করে নেয় শুষ্ক মাটি, আর তা থেকেই জন্মে সবুজ গাছপালা।

একমাত্র জলদ-পুঞ্জ মেঘই পানিপূর্ণ থাকে যা বর্ষণ ঘটায় এবং তাও সীমিত পরিমাণে। বর্ষণের পরিমাণ নির্ভর করে জলদ মেঘের আকার, মাটি থেকে এর উচ্চতা, ঐ স্থানের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা এবং ঐ সময়ের বর্তমান বায়ু প্রবাহের তীব্রতার উপর। আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী, যখন সমস্ত বিবেচ্য বিষয়সমূহ অনুকূল অনুপাত ধারণ করে, তখন বৃষ্টির পানি মাটিতে পড়বে। অন্যথায় বাতাস ভাসমান মেঘকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে এবং ঐ অঞ্চল শুষ্কই থেকে যাবে।

www.bjilibrary.com

বৃষ্টির ফোঁটা ভূ-পৃষ্ঠের গর্ত ও খানাখন্দে জমা হয়। অধিকন্তু, এ পানি ভূগর্ভে ও ভূ-অভ্যন্তরস্থ পানির আধার হিসেবেও জমা হয়ে থাকে। এটাকে ভূগর্ভস্থ নিরাপদ পানির আধার হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে এ সকল স্থানে সঞ্চিত পানি উধাও বা শেষ হয়ে যেতে পারে। এভাবে পানি প্রত্যাহার বেশ কয়েকভাবে সম্পন্ন হতে পারে। পানি চুঁইয়ে দূরবর্তী কোন মৃত্তিকা-গহ্বর বা খাদ এবং অনেক নিচু পানির স্তরবিশিষ্ট খাল, নদী কিংবা হ্রদ, কিংবা তা মাটির গহীন গর্ভে নাগালের বাইরেও চলে যেতে পারে। দ্রুত ভূ-উপরিস্থ বাষ্পীভবনের মাধ্যমে অথবা উচ্চ নির্গমন হার বিশিষ্ট উদ্ভিদের পাতার মধ্য দিয়ে দ্রুত পানি নির্গমনের মাধ্যমেও পানি অদৃশ্য হয়ে হারিয়ে যেতে পারে। বর্তমানে এটা একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, ইথিওপিয়ার ভয়াবহ পানি সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ হলো যে, ঐ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ইউকেলিপটাস গাছের আবাদ।

এভাবে দেখা যাচ্ছে, আকাশ থেকে যথার্থ পরিমাপে বৃষ্টির পানির ভূপৃষ্ঠে পতন এবং মাটি থেকে পানি প্রত্যাহৃত হওয়ার জন্য দায়ী সমস্ত কারণই বস্তুত আল্লাহ্ই নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

২১- وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا
وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

২৩ ঃ ২১ এবং তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় আছে আন'আম; তোমাদেরকে পান করাই ওদের উদরে যা আছে তা হতে এবং তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকারিতা; তোমরা ওটা থেকে ভক্ষণ কর।

আয়াতটিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য তথা গরুর দুধ এবং মাংস সহ গরুর অনেক উপকারিতার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। এ সকল বিষয় ১৬ ঃ ৫ এবং ১৬ ঃ ৬৬ আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

২৭- فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۙ
فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ
وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ۝

২৩ ঃ ২৭ অতঃপর আমি তার নিকট প্রত্যাদেশ করলাম, 'তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌযান নির্মাণ কর,

www.bjilibrary.com

অতঃপর যখন আমার আদেশ আসবে ও উনান উথলে উঠবে তখন উঠিয়ে নিও প্রত্যেক জীবের এক জোড়া হারে তোমার পরিবার পরিজনকে, তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়েছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বোলো না, তারা তো নিমজ্জিত হবে।

অত্র আয়াতে হযরত নূহ নবীর (আ) আমলের সংঘটিত মহাপ্লাবনের উল্লেখ করা হয়েছে যখন তিনি আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলেন একটা নৌকা তৈরি করতে এবং প্লাবন এসে পড়লে ঐ নৌকায় পরিবারবর্গ ও প্রতিটি জাতের একজোড়া প্রাণী সহ জলযাত্রা করতে।

এ বিষয়টি কুরআনের ১১ ঃ ৪০-৪২ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

٧٨- وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ○

২৩ ঃ ৭৮ তিনিই তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন; তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।

এ বিষয়টি কুরআনের ১০ ঃ ৬ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

٨٠- وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

২৩ ঃ ৮০ তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁরই অধিকারে রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তন। তবুও কি তোমরা বুঝবে না ?

দিন ও রাতের পরিবর্তন সম্পর্কে ১০ ঃ ৬ আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

٨٦- قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ○

২৩ ঃ ৮৬ জিজ্ঞাসা কর, 'কে সপ্তাকাশ এবং মহাআরশের অধিপতি?'

সপ্ত (স্তর বিশিষ্ট) আকাশমণ্ডলী সম্পর্কে ২ ঃ ২৯ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

٨٨- قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ○

২৩ ঃ ৮৮ জিজ্ঞাসা কর, 'সমস্ত কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাঁর উপর আশ্রয় দাতা নাই, যদি তোমরা জান?'

সকল কিছুর পরিচালনা বিষয়ে ৭ ঃ ৫৪ ও ৭ ঃ ১৮৫ আয়াতদ্বয় এবং পরিশিষ্ট-৩ এ আলোচনা করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

৩৯. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءًۭ ؕ حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

২৪ ঃ ৩৯ যারা কুফরী করে তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে কিন্তু সে তার নিকট উপস্থিত হলে দেখবে তা কিছু নয় এবং সে পাবে সেখানে আল্লাহ্‌কে, অতঃপর তিনি তার কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেবেন। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

মরীচিকা এক প্রকার দৃষ্টি বিভ্রম যাতে বায়ুঘনত্বের উল্লম্ব বণ্টনকালে বায়ুমণ্ডলে আলোকরশ্মির বেঁকে যাওয়ার ফলে দূরবর্তী বস্তুর প্রতিবিম্ব কখনও কখনও উল্টানো অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয়।

দিবাভাগে, মরুভূমির বালি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উপরের বায়ুস্তরের তুলনায় ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ুস্তর অনেক বেশী উত্তপ্ত করে। আলোকরশ্মি যখন আকাশ এবং/অথবা বৃক্ষের উপরিভাগ থেকে এ সকল বায়ুস্তর ভেদ করে নিচের দিকে আসতে থাকে, তখন আলোকরশ্মি প্রতিসারিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত উপরের দিকে বেঁকে গিয়ে দর্শকের দৃষ্টিরেখার নিচ দিয়ে তার চোখে প্রবেশ করে। দর্শক তখন আকাশ ও গাছের প্রতিবিম্ব উল্টো অবস্থায় দেখতে পায় ঠিক যেমন তারা দেখে জলাশয় থেকে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব। এভাবেই তৈরি হয় দূরবর্তী কোন হ্রদের ধারণা যা নিকট থেকে দেখলে অদৃশ্য হয়ে যায়। কিছু কিছু মরীচিকা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও লক্ষণীয় যা দৃশ্যত এমনকি ঢেউ প্রদর্শন করে থাকে। উত্তপ্ত বায়ু স্তরের অবস্থানের পার্থক্য হওয়ায় এ রকম ঘটে।

মরীচিকার ব্যাপারটা যদিও প্রাচীন কালের মানুষের নিকটে জ্ঞাত ছিল, তবুও সর্বপ্রথম এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন টোবিয়াস গ্রুবার-১৭৮০'র দশকে।

৪০. اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ؕ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ؕ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ۝

২৪ ঃ ৪০ অথবা গভীর সমুদ্র তলের অন্ধকার সদৃশ, যাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উর্ধ্বে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ স্তরের উপর স্তর এমনকি সে হাত বের করলে তা আদৌ দেখতে পাবে

www.bjilibrary.com

না। আল্লাহ্ যাকে জ্যোতি দান করেন না তার জন্য কোন জ্যোতিই নেই।

এখানে ব্যবহৃত উপমেয়তার সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে "আলোর উপর আলো" বিষয়ের আলোচনায়।[১]

অত্র আয়াতে স্বাভাবিক এবং ব্যাহত আবহাওয়াগত পরিস্থিতিতে বিশাল মহাসাগরতলে অন্ধকারের গভীরতা বৃদ্ধির বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। যখন সাগর শান্ত ও আকাশ পরিচ্ছন্ন থাকে, এমনকি তখনও সাগরতলে বেশ অন্ধকার থাকে। কারণ, সাগরের পানি দৃশ্যমান আলোকসহ বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ তীব্রভাবে শোষণ করে থাকে। যতই সাগরের গভীরে যাওয়া যায়, ততই আলোর তীব্রতা দ্রুত কমে আসে এবং বস্তুত সাগরের তলায় এই তীব্রতা একেবারেই কম। এটাই হচ্ছে প্রথম প্রকারের অন্ধকার।

সাগরের উপরিতল শান্ত থাকার পরিবর্তে যদি তরঙ্গের উপর তরঙ্গের অভিঘাতে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হয়, তাহলে সূর্যালোকের বেশীর ভাগই ঢেউয়ের তির্যক পাশে প্রতিফলিত হয়ে বাইরে চলে যায় এবং প্রতিসরিত হয়ে শেষ পর্যন্ত যতটুকু আলো সাগরতলে গিয়ে পৌঁছে তা নিতান্তই সামান্য। এভাবে সাগরতলের অন্ধকার বেড়ে বেশ গভীর হয়, আর এটাই হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকারের অন্ধকার।

আমরা জানি, মেঘ হচ্ছে বিন্দু বিন্দু ফোঁটা আর অতি ক্ষুদ্র বরফ কণা আকারে বাতাসে ভাসমান ঘনীভূত জলীয় বাষ্পপুঞ্জ যা জলদপুঞ্জ মেঘ নামে পরিচিত। বর্ষণ-মেঘ হচ্ছে বিশাল-বিস্তৃত এবং বিরাট উচ্চতাবিশিষ্ট পর্বতসম মেঘপুঞ্জ যার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে অন্ধকার। এর উচ্চতা পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। উপর থেকে সূর্যালোক এর ভিতর দিয়ে চলার সময় মেঘ গঠনকারী বরফ কণা এবং পানির কণিকায় প্রতিফলিত হয়ে বাইরে চলে যায়। কাজেই, উত্তাল-তরঙ্গমালার উপরস্থিত আসমান যখন ঘন মেঘে আচ্ছাদিত থাকে তখন বেশীর ভাগ সূর্যালোকই মেঘ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং যেটুকু নিস্তেজ আলো ঢেউয়ের উপর পড়ে তা গভীর পানির ভিতর দিয়ে তেমন একটা প্রবেশ করতে পারে না। ফলে, সাগরের তলদেশ সবটুকু আলো থেকেই বঞ্চিত থাকে যা সাগরতলকে করে তোলে ঘন অন্ধকারময়। এই তৃতীয় প্রকার অন্ধকারে কেউ নিজের হাতটি পর্যন্ত চোখের সামনে আনা হলেও দেখতে পায় না। এতই গাঢ় এ অন্ধকার!

তথ্যসূত্র ঃ

1. M.F. Khan. Light upon Light, Dhaka Ahsania Mission, Dhaka, Bangladesh, pp. 33-35. 1986.

www.bjilibrary.com

٤١- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ○

২৪ ঃ ৪১ তুমি কী দেখ না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড্ডীয়মান বিহঙ্গকুল আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে ? প্রত্যেকেই জানে তার প্রার্থনার এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি এবং ওরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

ক্ষুদ্রতম জীবদেহ থেকে শুরু করে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীস্থ বিশালকায় প্রাণী পর্যন্ত সকলেই আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধানের অধীন। এ সকল বিধান ৭ ঃ ৫৪ এবং ৭ ঃ ১৮৫ আয়াতদ্বয় ও পরিশিষ্ট-১, ২ এবং ৩ এ আলোচিত হয়েছে।

পাখিদের উড়ন্ত ভ্রমণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ১৬ ঃ ৭৯ আয়াতের আলোচনায় দেয়া হয়েছে। বস্তুত এমনকি পাখিদের আকাশে উড়ার ব্যাপারটাও স্রষ্টা প্রদত্ত বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এভাবে, সকল কিছুই আল্লাহ্র জারীকৃত বিধান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করছে এবং এভাবে তারা আল্লাহ্র ইচ্ছার নিকট মাথা নত করছে। এ সত্যটিকেও তাদের ইবাদত হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যেজন্য তাদের থাকতে পারে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রকাশ পদ্ধতি। এ ধরনের ইবাদতের জন্যে তারা যে প্রচুর ফায়দা লাভ করে থাকে তার জন্যেও তারা তাদের নিজস্ব বৈশিষ্টপূর্ণ পন্থায় আল্লাহ্র শোকর আদায় করে থাকে।

٤٤- يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ ○

২৪ ঃ ৪৪ আল্লাহ্ দিবস ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান। এতে শিক্ষা রয়েছে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য।

রাত ও দিনের আবর্তন হয় পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারদিকে আবর্তনের কারণে (দ্রঃ আয়াত ১০ ঃ ৬)। এই অক্ষীয় আবর্তন বা ঘূর্ণন, যা অধিকাংশ গ্রহেই দেখা যায়, আসে কোত্থেকে ? বহু পারমাণবিক কণার ঘূর্ণন গতি এক অত্যন্ত মজার ব্যাপার। সকল মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেন এবং অন্যান্য হালকা মৌল নিউক্লিয়াসের একীভবনের মাধ্যমে তারকামণ্ডলীর উৎপত্তি প্রক্রিয়া চলে। আদিম যুগীয় সেই অগ্নিগোলক (দ্র. পরিশিষ্ট-২) যতই শীতল হতে থাকে এই সকল আটককৃত ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ গঠন করে। বিজ্ঞানীগণের ধারণা পরমাণু অভ্যন্তরস্থিত আণুবীক্ষণিক জগতের কণার ঘূর্ণনের সাথে যার ঘূর্ণন গতি বাইরের কোন সহায়ক শক্তির সাহায্য লাভ করেনি। এর কারণ, পরমাণু অভ্যন্তরস্থিত কণা থেকে উদ্ভূত কৌণিক গতির পরিধি এত বড়

www.bjilibrary.com

হয় না যে, বস্তুটি ঘোরাতে পারে। অবশ্য, এই ধারণা এটা ব্যাখ্যা করতে পারে না যে, কেন শুক্র বাদে আর সব গ্রহ একইভাবে আবর্তন করে। কিন্তু শুক্র গ্রহ অন্যান্য গ্রহের বিপরীত দিকে ঘোরে। অন্য আরেক ধারণানুযায়ী বিজ্ঞানীগণ অনুমান করেন যে, গ্রহসমূহ নিজেদের কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে এবং নিজ নিজ অক্ষের চারদিকে আবর্তন করে নীহারিকা হিসেবে আখ্যায়িত এক ধরনের ঘূর্ণায়মান গ্যাসীয় মেঘ থেকে সূর্য এবং গ্রহসমূহের গঠিত হওয়ার কারণে। এ প্রকল্পটি ল্যাপল্যাস কর্তৃক ১৭৯৬ সালে উত্থাপিত হয়েছিল। এ প্রকল্পের বক্তব্য অনুযায়ী ঘূর্ণায়মান গ্যাস বলয় ছুঁড়ে মারে বলে ধরে নেয়া হয় যা শেষ পর্যন্ত ঘনীভূত হয়ে গ্রহের আকার ধারণ করে। ল্যাপলাসের প্রকল্প বিভিন্ন পর্যায়ে গৃহীত ও প্রত্যাখাত হয় এবং অতঃপর সাম্প্রতিককালে খানিকটা গৃহীত হয়েছে বটে। এখন ধরে নেয়া হয় যে, আদিমযুগীয় সেই সৌর নীহারিকার সম্ভবত প্রথম থেকেই একটা ছোট জালের আকারের ঘূর্ণন ছিল। আদিমযুগীয় স্তরে ঘূর্ণায়মান কৌণিক গতি ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

যতই এটা সংকুচিত হতে থাকে ততই এটা কৌণিক গতির সংরক্ষণে দ্রুততর গতিতে ঘুরতে থাকে যে নীতিটি ঘূর্ণায়মান একজন বরফ স্কেইটারের মাধ্যমে উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। স্কেইটার যখন দ্রুততর গতিতে স্কেইটিং করতে চান, তখন তিনি তার হস্তদ্বয়কে নিজেরদিকে গুটিয়ে আনেন যা তার দেহের ভরের বন্টনকে কার্যকরভাবে ঘূর্ণন অক্ষের অধিকতর নিকটে নিয়ে আসে। আর এটি দ্রুততর ঘূর্ণন দ্বারা পুষিয়ে যায় যাতে কৌণিক গতি (অক্ষ ভরবেগ থেকে দূরত্ব) একই থাকে। অবশ্য, এই মতবাদ বহু বিস্তারিত বিষয় ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয় যেমনটি লক্ষ্য করা যায় সৌর জগতে। যেমন ঃ উচ্চতর মহাকর্ষ বল থাকা সত্ত্বেও কেন বহিঃস্থ গ্রহসমূহ হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের পুরু বায়ুমণ্ডল ধরে রাখতে ব্যর্থ হল, যেখানে এই মতবাদ অনুমান করছে যে, বৃহৎ এবং হালকা উপাদানে গঠিত বহিঃস্থ গ্রহসমূহের তুলনায় অন্তঃস্থ গ্রহসমূহ অধিকতর ঘন উপাদানে গঠিত হওয়া উচিৎ ? এ ধারণা আরো ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ যে, সৌরজগতের এত বেশী কৌণিক গতি কেন গ্রহগুলোর কক্ষপথের গতিতে থাকে, আর খোদ সূর্যের আবর্তনের মধ্যে এত কম কেন ? সম্ভবত শক্তিশালী সৌরদহন আন্তঃগ্রহসমূহের হালকা গ্যাস দূরে সরিয়ে দিয়েছে এবং মূল সৌর কৌণিক গতির অধিকাংশটাই নিয়ে গেছে।১ দিন ও রাতের আবর্তনের বিভিন্ন উপকারী দিক সম্পর্কে ২৮ ঃ ৭১, ৭২ এবং ৭৩ আয়াতত্রয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ

1 Jay M.Pasachoff, Contemporary Astronomy, W.B. Saunders co., London. p 284, 1976.

www.bjilibrary.com

৪-وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ
يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ ۭ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۭ
اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

২৪ ঃ ৪৫ আল্লাহ্ সকল প্রাণীকেই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এদের মধ্যে কেউ বুকের উপর ঘসে চলে, কেউ দু'পায়ে ভর দিয়ে চলে আবার কেউ চার পায়ে ভর দিয়ে চলে। আল্লাহ্ যাই চান তাই সৃষ্টি করেন কারণ তিনি সব কিছুর উপর শক্তিমান।

এই বিষয়টি ২১ ঃ ৩০ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে।

৫-اَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْٓا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ۭ
بَلْ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

২৪ ঃ ৫০ ওদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে, না, ওরা সংশয় পোষণ করে? না ওরা ভয় করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ওদের প্রতি জুলুম করবেন? বরং ওরাই তো সীমা লংঘনকারী।

অন্তরে রোগের বিষয়টি ইতিপূর্বে ২ ঃ ১০ আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

৬-الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ
لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ۝

২৫ ঃ ২ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নি; সার্বভৌমত্বের তাঁর কোন অংশী নাই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে।

আসমান ও জমিনের সবকিছুই যে আল্লাহ্‌রই কর্তৃত্বাধীন এ বিষয়টি ৭ ঃ ৫৪ আয়াত এবং পরিশিষ্ট-১ ও ২এ আলোচনা করা হয়েছে। আয়াতটির শেষাংশে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাঁর সকল সৃষ্টির জন্যে একটা পরিমাপ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ বক্তব্যটির ভিতরে বিজ্ঞানের যে বিষয় রয়েছে তা অনুধাবন করতে প্রথমে মানুষের আকার বিবেচনা করা যাক্। মানুষের স্বাভাবিক আকার ১ থেকে ২ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট হওয়া পৃথিবী নামক এই গ্রহের তার আবির্ভাবের পর থেকেই যে মাধ্যাকর্ষণ বলের অভিজ্ঞতা তার হচ্ছে

www.bjilibrary.com

সেটার সাথে পরিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারেন, মানুষ বর্তমানের তুলনায় দু'তিনগুণ বড় হলে কী ঘটত? সেক্ষেত্রে দেখান যায় যে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের মধ্যে হাঁটাচলা করা অত্যন্ত বিপদসংকুল হয়ে পড়ত। মানুষ তিনগুণ লম্বা হলে এবং একই অনুপাতে তার দেহের আকার বর্ধিত হলে বর্তমানের তুলনায় তার ওজন হত সাতাশ গুণ। হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একজনকে ২৭ গুণ ওজনের ধাক্কা সামলাতে এবং শুধু পড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তিনগুণ দূরে পড়ে যাওয়ার ধাক্কা সামলাতে হত। আর পড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সামগ্রিক চাপের পরিমাণ দাঁড়াত ৮১ গুণ। তার হাড়গুলোর ওজন বাড়ত ৯ গুণ। কেননা, এদের শক্তি নির্ভর করে আড়াআড়ি অবস্থানের উপর। কাজেই, পতন হয়ে পড়ত ৯ গুণ ক্ষতিকর। উল্টোদিকেও প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, মানুষ বর্তমানের তুলনায় বেশ ছোট আকারের হলে কী ঘটত? আবারো এটা প্রমাণ করা যায় যে, পরের ক্ষেত্রেও মানুষকে প্রচন্ড অসুবিধার মুখোমুখি হতে হত। আমরা জানি, শরীর থেকে অপশক্তি হারানোর পরিমাণ দেহের তলীয় ক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে।* মানুষ যদি হত অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তার তলীয় ক্ষেত্র আয়তনের তুলনায় হয়ে যেত অনেক বড়। সুতরাং তার দেহ তখন অনেক বেশী তাপশক্তি হারাত এবং সে ঠান্ডা হয়ে পড়ত। উষ্ণ থাকার জন্য তাকে তখন খেতে হত বিপুল পরিমাণ খাদ্য। বস্তুত ইঁদুর জাতীয় ছোট ছোট প্রাণী, যারা ক্ষুদ্রতম উষ্ণ রক্ত বিশিষ্ট, উষ্ণ থাকার জন্য বিপুল খাদ্য খেয়ে থাকে যার পরিমাণ তার দেহের ওজনের কয়েকগুণ হয়ে থাকে। এভাবে দেখা যাচ্ছে, মানুষ যদি তার বর্তমান আকার অপেক্ষা কয়েকগুণ ছোট হত, তাহলে শুধু যে চরম খাদ্য সংকটই দেখা দিত তা নয়, বরং তার মস্তিষ্কের আকার একেবারেই ক্ষুদ্র হয়ে যেত এবং সে আল্লাহ্‌র সর্বাধিক বুদ্ধিমান সৃষ্টি হিসেবে গর্ব করতে পারত না। এ সবকিছুই আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, আল্লাহ্ মানুষকে যে 'পরিমাপ' দান করেছেন তা বস্তুতই বিজ্ঞতম।

ঘটনাক্রমে, দেখা গেল যে, যে কোন জীবদেহের দৈহিক মাপ আল্লাহ্ তাকে যে পরিবেশে বাস করার অনুমতি দিয়েছেন তার সাথে সম্পর্কযুক্ত। উপরে আলোচিত জীবদেহ এবং তাদের পরিবেশের মধ্যে তাপ বিনিময়ের তাপীয়গতির বিবেচনা এও ব্যাখ্যা করে যে, কোন মেরুভল্লুক যাকে দেহের তাপ আটকে রাখতে হয়, আকারে বড় যার রয়েছে সৌর ভল্লুকের তুলনায় কম তলীয় ক্ষেত্র;

---

* কোন বস্তুর আয়তনের সাথে তলের অনুপাত কোন গোলাকার বস্তুর সাথে মিলিয়ে রাশিতে প্রকাশ করা যায়। যার অনুপাতের রাশি হচ্ছে $4\pi r^2/4\pi r^3 = 1/r$ যেখানে r হচ্ছে বস্তুর ব্যাসার্ধ। r যতই কমতে থাকে, অর্থাৎ বস্তুটি যত ছোট হতে থাকে, তলের সাথে আয়তনের অনুপাত ততই বাড়তে থাকে।

www.bjilibrary.com

কেননা সৌর ভল্লুককে ঠাণ্ডা থাকতে হলে তাপশক্তি হারাতে হয় এবং সে কারণে সে আকারে ক্ষুদ্র এবং আনুপাতিকভাবে বৃহৎ তলীয় ক্ষেত্রবিশিষ্ট।

এখন কোন একটা জিনিসের সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা দিক তথা তার সৌন্দর্যের বিষয়টি বিবেচনা করা যাক্। আমরা সবাই আল্লাহ্র সৃষ্টি জগতের সর্বত্র প্রকাশিত সৌন্দর্য উপভোগ করে থাকি। আমরা জানি যে, কোন বস্তুর সৌন্দর্য ঐ বস্তুটি দ্বারা প্রকাশিত সামঞ্জস্য (সেটা প্রতিফলন কিংবা ঘূর্ণন যে ধরণেরই হোক না কেন) হয়ে পড়বে অর্থহীন যদি কোন বস্তুর গঠন উপাদান বা অংশসমূহ পরস্পরের তুলনায় কোন একটা নির্দিষ্ট মাপের না হয়। উদাহরণ স্বরূপ, নাক দ্বারা লম্বালম্বিভাবে দ্বিবিভাজিত মানব মুখমন্ডলের প্রতিফলন-সামঞ্জস্য নষ্ট হত যদি মুখের গঠনে ডানপার্শ্বের তুলনায় বাম পার্শ্বটা বড় হত।

পরিমাপের অস্তিত্ব আনন্দের সাথে আলোচনা করে গেছেন অংকশাস্ত্রবিদগণ। তারা লক্ষ্য করেছেন যে, সূর্যমুখী ফুলের সুন্দর পাপড়িগুলো কেন্দ্র থেকে বর্ধিত দূরত্বে এবং ১,১,২,৩,৫,৮,১৩,২১ অনুপাতে সাজানো এবং এ সংখ্যাগুলো হচ্ছে ফিবৌনাচি সংখ্যা তথা প্রতিটি সংখ্যা পূর্ববর্তী দু'টি সংখ্যার যোগফলের সমান। (চিত্র ঃ ১৩ দ্রঃ)

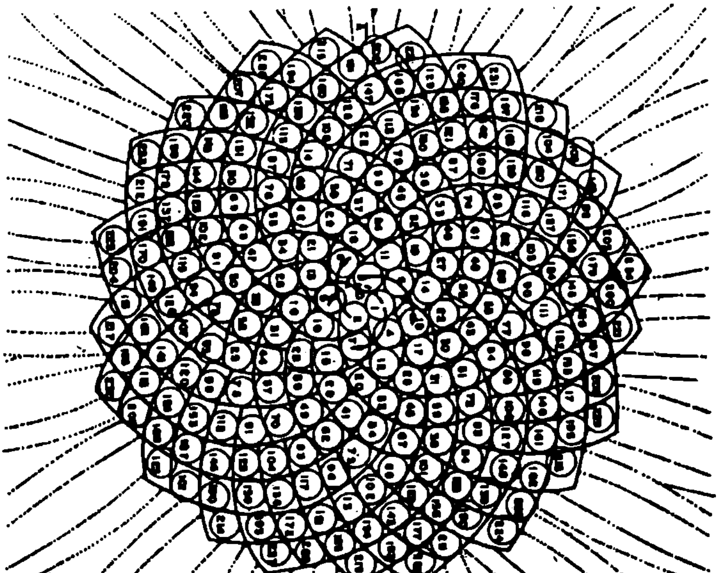

চিত্র ১৩ ঃ একটি সূর্যমুখী ফুলের পুনর্গঠিত মাথা

www.bjilibrary.com

এভাবে, আনন্দের সাথে লক্ষ্য করা যায় যে, গাণিতিকভাবে সূর্যমুখী ফুলের নকশা করার সময় আল্লাহ্ এর গঠনে একটা পরিমাপ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। প্রকৃতি যে আল্লাহ্র নির্ধারিত গাণিতিক পরিকল্পনা দ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

উপরে যা উল্লেখ করা হলো তা শুধু অল্প কয়েকটা দৃষ্টান্ত মাত্র, যা প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ কর্তৃক সব জিনিসই একটা নির্দিষ্ট পরিমাপ অনুযায়ী অত্যন্ত যথাযথভাবে রূপদান করা হয়েছে। কোন কিছুর পরিমাপ সম্পর্কিত বিষয়টির অনুধাবন থেকে দল মতবাদ, স্ফটিক বিদ্যা, ভূ-সংস্থানবিদ্যাসহ পদার্থবিদ্যা ও গণিতের নতুন নতুন কিছু শাখার উদ্ভব হয়েছে যা মহাকাশে বস্তুসমূহের বিন্যাস এবং তাদের সামঞ্জস্য বিষয়ে কাজ করে।

উপসংহারে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ২৫ ঃ ২ আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ্ প্রতিটি জিনিসের জন্যে পরিমাপ নির্দিষ্ট করেছেন তা চমৎকারভাবে এ সকল জিনিসের জন্য যে বাস্তবিক বা দৈহিক কার্যাবলি নির্ধারণ করেছেন এবং মহাবিশ্বের সার্বিক বাস্তুসংস্থান ব্যবস্থার যে ভূমিকা পালনের জন্যে তাদের নিযুক্ত করেছেন, তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

١١- بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝

২৫ ঃ ১১ এরা সেই নির্দিষ্ট সময়কে মিথ্যা মনে করেছে (শেষ বিচার দিবস) আর যারাই সেই নির্দিষ্ট সময়কে মিথ্যা মনে করবে তাদের জন্য আমরা জলন্ত আগুনের ব্যবস্থা করে রেখেছি।

এই বিষয়টি ৭ ঃ ১৮৭ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

٢٥- وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا ۝

২৫ ঃ ২৫ যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফিরিশ্তাদেরকে নামিয়ে দেওয়া হবে–

এটা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত যে, এমন একটা সময় আসবে যখন সূর্যসহ গোটা সৌরজগৎ দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং গ্যাসীয় মেঘ বের হয়ে চলে যাবে। সূর্যের ভিতর দু'টি বিপরীতমুখী বল কাজ করছে ঃ একটি হচ্ছে দহনক্রিয়ার মাধ্যমে হাইড্রোজেনের হিলিয়ামে রূপান্তরে একীভবন শক্তির নির্গমণজনিত কারণে সৃষ্ট সম্প্রসারণ বল এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে মহাকর্ষজনিত সংকোচণ বল।

www.bjilibrary.com

যতক্ষণ এ দু'টি বল পরস্পরের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে, ততক্ষণ সূর্য এর প্রধান পরিণাম ফল হিসেবে স্থিতিশীল অবস্থায় বিরাজ করে। সময় যতই গড়ায় ততই অধিক হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয় যা অপেক্ষাকৃত অধিক ভারী হওয়ায় কেন্দ্রীয় অঞ্চলে পড়ে যায়। ধীরে ধীরে অভ্যন্তরভাগ দু'টি অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি হচ্ছে জ্বলন্ত হাইড্রোজেন খোলসের পরিবেষ্টনের সাথে সৃষ্ট হিলিয়ামের প্রাণকেন্দ্র এবং অপরটি হচ্ছে একটি বহিরাঞ্চল, যা মূলত হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত ও নিম্নতাপমাত্রার কারণে একীভূত হতে এবং পারমাণবিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটাতে পারে না। এতে সূর্য অত্যন্ত অসমত্ব হয়ে পড়ে কারণ, অন্তঃস্থ প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে বহিরাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্রের তুলনার চারগুণ বেশী ভর। অন্তঃস্থ প্রাণকেন্দ্র যতই বড় হয়, সূর্যের স্থিতিশীলতার জন্য এর অসমত্ব ততই বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। যখন সূর্যের অন্তঃস্থ হাইড্রোজেন ভরের ১০% ভাগের দহন সম্পন্ন হবে, তখন আর সূর্য স্থিতিশীল থাকবে না। হিসেব করে দেখা গেছে যে সূর্য যখন এ স্তরে পৌঁছে, বহির্মুখী চাপের কারণে বহিঃস্তর দ্রুত সম্প্রসারিত হয় যাতে সূর্যের আলোকক্ষেত্র (দৃশ্যমান তল)-এর মূল ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি পেয়ে দশ গুণে পৌঁছে এবং এভাবে অভ্যন্তরীণ গ্রহসমূহ তথা বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গলের১ কক্ষপথসমূহ গিলে ফেলে। এ অবস্থায়,কখনও কখনও সংকোচণ বল বেশী শক্তিশালী হয়ে যায় এবং অন্য সময় সম্প্রসারণ বল প্রভাবশালী হয়। আর এভাবেই সূর্য হাজার হাজার বছর ধরে কম্পমান রয়েছে। শেষতক, অন্তঃস্থ হিলিয়াম কেন্দ্র ভেঙ্গে পড়বে এবং একীভবনের মাধ্যমে কার্বনে পরিণত হবে, যা একটা স্থিতিশীল অবস্থা। বহিঃস্থ স্তর তখন দীর্ণবিদীর্ণ হবে এবং মেঘ আকারে ছড়িয়ে পড়বে। এ ঘটনা যখন ঘটবে, সম্ভবত সেটাই সেই দিন যেদিনের কথা অত্র আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Brand and W.H. Maran, New Horizon of Astronomy, Freeman, San Francisco p. 299, 1922.
2. National Geographic, June 1983.

www.bjilibrary.com

٤٥- اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ۚ
ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ۝
٤٦- ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا ۝

২৫ ঃ ৪৫-৪৬ তুমি কি তোমার প্রতিপালকের প্রতি লক্ষ্য কর না কীভাবে তিনি ছায়া সম্প্রসারণ করেন? তিনি ইচ্ছা করলে একে তো স্থির রাখতে পারতেন; অনন্তর আমি সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক।

অতঃপর আমি একে আমার দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি।

একটি অস্বচ্ছ বস্তু দ্বারা আলোক বাধাপ্রাপ্ত হলে প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয় এবং এটি আলোর উৎসের বিপরীত দিকে দেখা যায়। সূর্যের মত আলোর উৎসটি যদি স্থির না হয়, তাহলে প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য এবং অবস্থানও স্থিতিশীল হয় না। আলোর উৎস তথা সূর্যের অবস্থান দ্বারা তা নির্ধারিত হয়। প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য আপতন কোণের স্পর্শকের ব্যস্ত আনুপাতিক হয়ে থাকে। সুতরাং আপতন কোণ যত ছোট হবে, প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য তত বড় হবে। কাজেই, সকালে যখন সূর্যের উচ্চতা থাকে কম, তখন প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য থাকে বেশী। সূর্যের উচ্চতা যতই বাড়তে থাকে, প্রতিবিম্বও পর্যায়ক্রমে ক্ষুদ্রতর হতে থাকে। পুনরায় প্রতিবিম্বটি পর্যায়ক্রমে দীর্ঘতর হতে থাকে যতই সূর্যের উচ্চতা হ্রাস পেতে থাকে। সূর্য কর্তৃক সৃষ্ট প্রতিবিম্বের এ সকল পরিবর্তন আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধান অনুযায়ীই হয়ে থাকে। আয়াতের শেষাংশ তথা ঃ 'তিনি ইচ্ছা করলে এটাকে স্থির করে দিতে পারতেন' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এটা ঘটতে পারত শুধুমাত্র তখন, যখন পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণনের গতি এত ধীর থাকত যে, পৃথিবী যে সময়ে সূর্যের চারদিক প্রদক্ষিণ করে আসে ততক্ষণে নিজ অক্ষের চারদিকে মাত্র একবার ঘূর্ণন সমাপ্ত করত। সেক্ষেত্রে পৃথিবীর এক পাশ স্থায়ীভাবে সূর্যের দিকে মুখ করে থাকত যেখানে প্রতিবিম্ব হত স্থির, আর অপর পাশ থাকত স্থায়ীভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন। এ ধরনের পরিস্থিতি হত ভয়ানক বিপর্যয়কর। কেননা, পৃথিবীর যে পাশটি স্থায়ীভাবে সূর্যের দিকে মুখ করে থাকত সে পাশটি হয়ে পড়ত জ্বলন্ত মরুভূমি আর অন্ধকারাচ্ছন্ন পাশটি অত্যন্ত জমাট বরফ হয়ে পড়ত, যাতে এ রকম চরম পরিবেশগত অবস্থায় জীবনের পক্ষে এই পৃথিবীতে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ত। আল্লাহ্ তার সীমাহীন দয়ায় পৃথিবীকে তার অক্ষের চারদিকে

www.bjilibrary.com

ঘূর্ণনগতি দান করেছেন যে কারণে প্রতিবিম্ব বড় হয় আবার আকারে ক্ষুদ্র হয়ে যায়। এভাবে, পৃথিবীর কোন পাশই দীর্ঘকাল ধরে সূর্যের দিকে মুখ করে কিংবা সূর্য থেকে দূরে বা বিপরীত দিকে থাকে না। ফলে, পৃথিবীর বায়ুমন্ডল হয়েছে অত্যন্ত শান্ত-কোমল এবং জীবনের টিকে থাকা ও সমৃদ্ধি লাভের উপযোগী।

٤٧- وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ○

২৫ ঃ ৪৭ এবং তিনিই তোমাদের জন্য রাত্রিকে করেছেন আবরণ স্বরূপ, বিশ্রামের জন্য তোমাদের দিয়েছেন নিদ্রা এবং সমুত্থানের জন্য দিয়েছেন দিবস।

রাত্রির আগমনে দিনের উপর একটা পর্দা টেনে দেয়া হয় (দ্রঃ ১৩ ঃ ৩ আয়াত), অন্ধকার নেমে আসে এবং ক্রমান্বয়ে সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আমরা অন্ধকারে আচ্ছাদিত হয়ে যাই এবং ঘুমে ঢলে পড়ি।

বিশ্রাম ও প্রশান্তি হিসেবে ঘুম- এ বিষয়টি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কুরআনের ১০ ঃ ৬৭ আয়াত এবং পরিশিষ্ট-৭ এ আলোচিত হয়েছে।

রাত্রিবেলা আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ ঘুমের মধ্যে সুপ্ত থাকে যাকে ঘুমের মধ্যে সাময়িক মৃত্যুর সাথে তুলনা করা যায়। সকালবেলা আমরা ঘুম থেকে জেগে উঠি অর্থাৎ বলতে গেলে পুনরায় জীবন ফিরে পাই।

٤٨- وَهُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا
مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ○

২৫ ঃ ৪৮ তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আমি আকাশ হতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি।

'বায়ু প্রবাহের শুভ সংবাদ বয়ে নিয়ে যাওয়া' আয়াতের এ অংশটি ৭ ঃ ৫৭ আয়াতের আলোচনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে আর আসমান থেকে বৃষ্টি ফোঁটার পতন বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে ২ ঃ ২২ আয়াতের আলোচনায়।

বাইরে থেকে কোন অনাকাঙ্খিত হস্তক্ষেপ না করলে প্রাকৃতিক পরিবেশে সৃষ্ট বৃষ্টির পানি এই অর্থে বিশুদ্ধ যে এ পানি কোন ক্ষতিকর পদার্থ (কিংবা রোগজীবাণু) দ্বারা দূষিত হয় না; বজ্র মেঘমালা থেকে তৈরি বৃষ্টি কখনও কখনও দ্রবীভূত নাইট্রাস অক্সাইড বহন করে আনে যা উদ্ভিদ জগতের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। কিন্তু কোনভাবেই প্রাণীদের জন্য ক্ষতিকর নয়।

www.bjilibrary.com

٤٩- لِّنُحْـِۧيَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِيَّ كَثِيْرًا ۝

২৫ ঃ ৪৯ তিনি আসমান থেকে পবিত্র পানি নাযিল করেন এবং একটি মৃত অঞ্চলকে তার সাহায্যে জীবন দান করেন এবং আমাদের সৃষ্ট বহু জন্তু জানোয়ার ও মানুষের পিপাশা নিবৃত্ত করেন।

মৃত পৃথিবীকে বৃষ্টির পানিতে পুনর্জীবিত করার কথা ২ ঃ ১৬৪ আয়াতের আলোচনায় বিবৃত করা হয়েছে।

সমস্ত জীবন্ত প্রাণীকুল ও বৃক্ষ সবাই তাদের পিপাসা নিবৃত্তি বা পানির প্রয়োজনের জন্য আল্লাহ্‌র দেওয়া পানি ব্যবহার করতে বাধ্য হয় যা তাদের জীবন ধারনের জন্য অপরিহার্য, আর বৃষ্টিই পানির প্রধান উৎস।

٥٠- وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ۫ فَاَبٰۤى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ۝

২৫ ঃ ৫০ এবং আমি এটা (পানি) তাদের মধ্যে বিতরণ করি যাতে তারা স্মরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক কেবল অকৃজ্ঞতাই প্রকাশ করে।

অত্র আয়াতে উল্লিখিত বন্টন বলতে পানির বন্টন বুঝানো যেতে পারে। পানিচক্র তথা বরফ, পানি, জলীয় বাষ্প এবং জলীয় বাষ্প, পানি, বরফ থেকে পানি প্রাপ্তি সাধারণত নিশ্চিত ধরে নেয়া হয় এবং জীবনের অস্তিত্বের জন্য এই চক্রের যে কী তাৎপর্য তা আমরা পুরোপুরি উপলব্ধি করি না। আমাদের মধ্যে কতজন সত্যি সত্যি উপলব্ধি করি যে, টন খানেক পানি কোন উৎস তথা নদী কিংবা সাগর কিংবা পুকুর থেকে দূরবর্তী কোন স্থানে বহন করে নিয়ে যাওয়া কত দুরূহ হত এবং তারপরেও এটার প্রয়োজন হত! কিন্তু উপরে উল্লেখিত পানি পরিবহন ব্যবস্থা থাকায় হাজার বা লক্ষ কোটি পানির অণু মাধ্যাকর্ষণের বিপরীতে পানির উৎস থেকে বাষ্প হয়ে উবে যাচ্ছে এবং উপরের বায়ুমন্ডলে মেঘ তৈরি করছে। এ সকল মেঘ তখন বায়ুপ্রবাহ দ্বারা বাহিত হয় এবং তা থেকে কোন কোন স্থানে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে পারে। এভাবে প্রকৃতি পানি স্থানান্তর এবং সেই সাথে মেঘমালার গঠন ও বায়ুপ্রবাহের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে পানির বিভিন্ন উৎস থেকে দূরবর্তী স্থানসমূহে পানির বন্টনকর্ম সম্পন্ন হয়ে থাকে।

আবার, পানি বহনকারী মেঘমালা পাহাড়চূড়াস্থ পুরু বরফস্তরে যুক্ত হয়ে পানির স্থায়ী আধারে পরিণত হয়। এসব বরফ স্তর গলিত হয়ে নদী, হ্রদ ও সাগরে পানির সরবরাহ বজায় রাখে। মেঘমালা থেকে পতিত পানি এ সকল

www.bjilibrary.com

পানির উৎসে আরো পানি যোগান দেয়া ছাড়া মাটির গভীরেও প্রবেশ করে। এই পানি নদীতীর ধরে চোয়ানো পানির সাথে মিলে ভূ-অভ্যন্তরে পানির উৎসে পরিণত হয় যা যে কোন সময় দরকার হলে সুবিধাজনকভাবে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

প্রকৃতিতে বিরাজমান এ সকল পানি বন্টন ব্যবস্থা লক্ষ্য করে প্রকৃতির যে কোন গভীর পর্যবেক্ষক আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেই।

৫৩- وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ
وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا

২৫ ঃ ৫৩ তিনিই দুই দরিয়াকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন, একটি মিষ্ট, সুপেয় এবং অপরটি লোনা, খর; উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান।

পানি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের কারণে অধিকতর উচ্চতা থেকে নিম্ন উচ্চতার দিকে প্রবাহিত হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় প্রবহমান পানির দু'ধরনের আধার সৃষ্টি করা হয়েছে। একটি অধিক উচ্চতাবিশিষ্ট ভূ-ভাগে এবং অপরটি সাগর সৃষ্টিকারী পৃথিবীর নিম্নাংশে। স্বাভাবিক অবস্থায় পানি ভূ-ভাগ থেকে সাগরের দিকে প্রবাহিত হয়। জোয়ার এবং ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মত অস্বাভাবিক আবহাওয়াগত অবস্থায় সাগরের পানি ভূ-ভাগের দিকে ছুটে যায় এবং স্বাভাবিক আবহাওয়াগত অবস্থায় এলে পুনরায় সাগরে ফিরে যায়।

পানি ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় ৭০% ভাগ জুড়ে রয়েছে এবং সাগরগুলোই ধারণ করে আছে প্রায় সব পানি। সাগরের পানি লবণাক্ত, যার ওজনের মধ্যে ৩.৫% ভাগ দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ রয়েছে। আর এই দ্রবণে রয়েছে সকল প্রাকৃতিক রাসায়নিক উপাদান। কার্বন, নাইট্রোজেন, ফসফরাসসহ সকল জৈবিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক পদার্থ এবং প্রধান প্রধান বিদ্যুৎবাহী আয়ন, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং পটাশিয়াম সাগরের পানিতে বর্তমান। অপ্রধান মৌলিক পদার্থের মধ্যে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান এবং সিলিকন, বেরিয়াম, স্ট্রোনশিয়াম এবং ফ্লোরাইডসমূহ যা জলজ জীবদেহের কঠিন অংশসমূহের গঠনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বিজ্ঞানীগণ বিশ্বাস করেন যে, সাগরের পানির সার্বিক গঠন ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সমুদ্রের পানিতে কোন বিশেষ মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রীভূত হওয়া নির্ভর করে ভূ-ত্বকে এর প্রাচুর্য এবং কতটা সহজেই তলানী বস্তু

www.bjilibrary.com

হিসেবে এটি দ্রবীভূত হতে পারে কিংবা বৃষ্টির পানি দ্বারা বাহিত হতে পারে তার উপর। বাষ্পীভবণ প্রক্রিয়া সাগরের পানি থেকে নিয়ে আসে মিঠা পানি আর সেখানে রয়ে যায় বিভিন্ন ধরনের লবণ, জৈব ও অজৈব পদার্থ। বায়ুমণ্ডলে মেঘ গঠিত হয় এবং মেঘমালা নিচে নেমে আসে বৃষ্টির পানির আকারে এবং সেই সাথে পানি ও বরফ ভূভাগে পানির উৎসে পরিণত হয়। পাহাড়ী জলস্রোত, ঝর্ণা ও ছোট নদীসমূহ হ্রদ ও গলায়মান বরফ স্তর থেকে উৎপন্ন হয়ে নিম্নমুখে প্রবাহিত হয় এবং মিলিত হয়ে গঠন করে নদী। এ সকল নদী বিপুল পরিমাণ পানি সাগরে বয়ে নিয়ে আসে এবং এ সকল স্রোতধারা পাহাড়-পর্বত এবং সমতলভূমি পার হয়ে অগ্রসর হবার সময় বিভিন্ন প্রকার লবণ ও খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত করে। আর বিপুল পরিমাণ তলানী পদার্থও বয়ে আনে।

জীবনের উন্মেষ সাগরেই হয় বলে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। আর সাগরের পানি আজও ফাইটোপ্লাংকটন নামে এক ধরণের আণুবীক্ষণিক সজি জাতীয় উদ্ভিদের বিস্তারের জন্যে প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি উপাদানের যোগান দিয়ে থাকে, যা জলজ খাদ্য সামগ্রীর ভিত্তি তৈরি করে এবং জলজ জীবনধারার ক্রমবিকাশে এমন সব মৌল উপাদান সরবরাহ করে যা প্রচুর পরিমাণে পানিতে বিদ্যমান। এভাবে, ঘটনাক্রমেই অনুসন্ধিৎসু মনের নিকট সমুদ্রের পানির লবণাক্ততা এবং এর গঠনও কোন দুর্ঘটনা বলে মনে হতে পারে না: সমগ্র জিনিসটারই আবির্ভাব ঘটছে স্রষ্টার এক মহাপরিকল্পনা হিসেবে।[১]

লবণাক্ত পানি মিঠা পানি অপেক্ষা অধিক ঘন এবং একই স্তরে রাখা হলে এতদুভয় পরস্পরের সাথে মিশ্রিত হয়ে যায়। আয়াতে উল্লিখিত এতদুভয়ের মধ্যেকার প্রতিবন্ধকটি তৈরি হয় ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতায় অবস্থিত এ দু'টি জলভাগের উপর মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবের দরুন। লবণাক্ত ও মিঠা পানির মধ্যকার প্রান্তসীমায় মধ্যম ঘনত্বের একটা স্তর সৃষ্টি হয়। পরিব্যাপ্তির মধ্য দিয়ে পরস্পরের সাথে মিশ্রিত হওয়ার প্রাকৃতিক প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও নোনা ও মিঠা পানিকে মাধ্যাকর্ষণ বল মধ্যবর্তী স্তরে আলাদা করে রাখে। এই প্রতিবন্ধকটির অবস্থানের পরিবর্তন হতে পারে, তবে এর অস্তিত্ব বিরাজমান থাকেই।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Michael, Whitefield. The salt sea-accident or design ? New scientist 1, p.14. April 1982.

www.bjilibrary.com

٥٤- وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاۤءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ؕ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ○

২৫ ঃ ৫৪ এবং তিনিই পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং পরে তার শরীর থেকে রক্ত সম্পর্ক ও বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে দুটি আত্মীয়তার ধারা শুরু করেছেন। তোমাদের প্রভু অতীব শক্তিশালী।

মানুষের শরীরের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ পানি, সুতরাং পানিই মানুষ সৃষ্টির প্রধান উপাদান।

আমরা যদি মানুষের জন্ম পদ্ধতির দিকে লক্ষ্য করি, তবে আমরা দেখতে পাই যে, বীর্যের শুক্রকীট এবং ডিম্বকোষ ফেটে বের হওয়া জলীয় পদার্থে অবস্থিত ডিম্বাণু এ দুইই জলীয় পদার্থের অংশ যাদের মিলনে ভ্রূণ সৃষ্টি হয়।

তাই আল-কুরআনে পুরুষের শুক্র বা বীর্যে, আর নারীর ফুটন্ত ডিম্ববাহী পদার্থ দুটিকেই জলীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে (দ্রঃ আয়াত ৮৬ ঃ ৬)। আর এ দু'টোই বেগের সাথে বের হয়। তাই এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন মানুষ যেন চিন্তা করে সে কিসের সৃষ্টি, সে প্রক্ষিপ্ত তরল পদার্থের সৃষ্টি।

আরবী শব্দ মা'য়ুন দ্বারা পানি বা তরল পদার্থকে বুঝায়। সুতরাং মানুষ যে পানি থেকে সৃষ্ট তা খুবই সত্য।

যৌন মিলনের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি হয় বলে বৈবাহিক সূত্রে রক্ত সম্পর্ক স্থাপিত হয় যার ফলে পিতামাতা, সন্তানাদি, দাদা-দাদি ও নানা-নানির সঙ্গে এবং পৌত্রাদি ক্রমে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বৃদ্ধির ফলে বিতর্কিত উত্তরাধিকারের সমস্যার সমাধান হতে পারে, রক্ত পরীক্ষা ও জিন পরীক্ষার মাধ্যমে যা অতীতে সম্ভব ছিল না।

স্বাভাবিক সমাজ স্বীকৃত বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা সকল ধর্মেই রয়েছে। আজকাল তথাকথিত উন্নত দেশগুলোতেই ব্যক্তি স্বাধীনতার আড়ালে প্রাক বিবাহ এবং বিবাহ বহির্ভূত যৌন মিলনের ফলে সেই প্রাচীন মহান বিবাহ ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এর ফল মোটেই কল্যাণকর হয়নি।

অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও পাশ্চাত্যের সেই দুষ্ট ব্যধি ক্রমেই বিস্তার লাভ করছে। ইসলামী দেশগুলোতেও বর্তমান ইসলাম বিমুখ শাসকবৃন্দ বেপরদার মাধ্যমে যৌন ব্যভিচার বৃদ্ধিতে সাহায্য করে যাচ্ছে।

www.bjilibrary.com

পবিত্র বিবাহ বন্ধন শিথিলের ফলে সমাজে বিশেষ করে তথাকথিত উন্নত দেশগুলোতে জারজ সন্তান, যৌন ব্যধিসমূহ এবং পারিবারিক অশান্তির চাপ দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। যৌনব্যধি AIDS এর নতুন কুফল মাত্র। পবিত্র কুরআনের মতে বিবাহ বন্ধন ছাড়া কোন রূপ যৌন মিলন সিদ্ধ নয়।

٥٩- الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ
الرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِيرًا ○

২৫ ঃ ৫৯ তিনিই যিনি আসমানসমূহ ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং নিজেই সেইসব নিয়ন্ত্রণের একচ্ছত্র কর্তৃত্বের আসন আরশে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তিনি অত্যন্ত দয়ালু। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে জানতে হলে এ বিষয়ে যাদের জ্ঞান আছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর।

এ বিষয়টি ৭ ঃ ৫৪ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

٦١- تَبٰرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرٰجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ○

২৫ ঃ ৬১ কত মহান তিনি যিনি নভোমন্ডলে সৃষ্টি করেছেন রাশিচক্র এবং তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র।

এ বিষয়টি ১০ ঃ ৫ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে।

٦٢- وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ○

২৫ ঃ ৬২ এবং যারা উপদেশ গ্রহণ করতে ও কৃতজ্ঞ হতে চায় তাদের জন্য তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি এবং দিনকে পরস্পরের অনুগামীরূপে।

কুরআনের ১০ ঃ ৬ আয়াতের আলোচনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে কীভাবে রাত ও দিন পরস্পরকে অনুসরণ করে এবং কীভাবে এই পরিবর্তন আমাদের কর্মতৎপরতার ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটা 'ছন্দ' এনে দেয়।

স্বাভাবিকভাবে অধিকাংশ লোকই এই প্রাকৃতিক ব্যাপারটিকে একটা বাস্তবিক বা সত্যি ঘটনা বলে বিবেচনা করে থাকেন। কিন্তু রাত ও দিনের

www.bjilibrary.com

পরস্পরের মধ্যে মিশে যাওয়ার এই প্রাকৃতিক ঘটনাটি নিয়ে যারা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন, তারা এ ঘটনাটির তাৎপর্য উপলব্ধি না করে পারেন না এবং তাদের অন্তর আনন্দ ও বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হবে। আর তারা বিমুগ্ধ চিত্তে সিজদাবনত হবেন এবং বলে উঠবেন ঃ 'সমস্ত প্রশংসা সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌রই।'

২৮- قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ○

২৬ ঃ ২৮ মূসা বলল, 'তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক; যদি তোমরা বুঝতে পার।

অত্র আয়াতটি বলছে যে, যা কিছু পূর্বে আছে এবং যা কিছু পশ্চিমে আছে আর আছে এ দু'য়ের মাঝখানে এসব কিছুই মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র।

পূর্ব হচ্ছে সেই দিক যেখানে সূর্য দিগন্তের উপরে উঠে। আর পশ্চিম হচ্ছে সেই দিক যেখানে সূর্য দিগন্তরেখার নিচে চলে যায় বলে মনে হয়। আমরা জানি, সূর্যের দু'টি সাময়িক গতি আছে; এর একটি হচ্ছে একদিন সময়কালের মধ্যে নিজ অক্ষের চারদিকে একবারসহ সকল মহাজাগতিক বস্তুসমূহ বিষুব রেখার সমান্তরালে বৃত্তাকারে ঘোরে বলে মনে হয়। এ রকম প্রতিটি বৃত্তই দিগন্তরেখাকে দু'টি বিন্দুতে ছেদ করে ঃ একটি পূর্বদিকে আর অপরটি পশ্চিম দিকে। সূর্যের চারদিকে সাময়িক প্রদক্ষিণের জন্য পৃথিবীর আরেকটি গতি আছে। এ গতির সময়কাল এক বছর। এ গতির কারণে সূর্য ভিন্ন ভিন্ন দিনে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করে বলে মনে হয়। প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানের কারণে পৃথিবী ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তাকার পথে ঘোরে বলে মনে হয় যাতে সে দিগন্ত রেখাকে বিভিন্ন বিন্দুতে ছেদ করে। এভাবেই, সূর্য বিভিন্নস্থানে উদয় হয় ও অস্ত যায় বলে মনে হয়; অর্থাৎ, প্রতিটি দিনেরই আলাদা আলাদা পূর্ব বিন্দু ও পশ্চিম বিন্দু রয়েছে।

সূর্যের দৃশ্যমান বার্ষিক প্রদক্ষিণ পথ তথা কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি ২৩° ডিগ্রী ২৮ মিনিট কোণে দু'টি বিন্দুতে ছেদ করে। যেদিন সূর্য এ রকম কোন একটা বিন্দুতে চলে আসে বলে মনে হয় সেদিন সূর্যের দৈনিক বৃত্তাকার পথ বিষুব রেখার সাথে মিলে যায়। ঘটনাক্রমে, বিষুবীয় রেখার সাথে দিগন্ত রেখার ছেদবিন্দুকেই পূর্ব বিন্দু ও পশ্চিম বিন্দু বলা হয়ে থাকে।

কাজেই, পৃথিবীগত দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিকভাবে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থানের কথা বলা যেতে পারে। মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থানের সবকিছুরই মালিক এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

٦٣- فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ۝

২৬ ঃ ৬৪ অতঃপর মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম; 'তোমার যষ্টি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর।' ফলে, তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল।

অত্র আয়াতে মূসা নবীর (আ) মিশর থেকে বহির্গত হওয়ার ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে। তিনি সাগরে উপনীত হয়ে যখন তাঁর লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত করলেন, সাগর তখন দু'ভাগ হয়ে গেল।

এই অলৌকিক ঘটনার পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। অবশ্য, কোরিয়ায় পর্যবেক্ষণকৃত একটা সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক ব্যাপার এটাই ইঙ্গিত করে যে, এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে।

মূসার অলৌকিক ঘটনার মত একটা প্রাকৃতিক বিস্ময় বছরে দু'বার ঘটে দক্ষিণ কোরিয়ার এক দ্বীপে। চিন্দে দ্বীপের এক গ্রাম হোয়েদংনি এবং পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র দ্বীপ মেদার মধ্যে রয়েছে একটা সাগর প্রণালী। সেখানে বছরে দু'বার প্রাকৃতিকভাবে জেগে উঠে ২ .৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ৪০ মিটার প্রস্থ এক শুকনো বালুর চড়া। স্থানটি সিউল থেকে ৩১০ কিঃ মিঃ দূরে। ঘটনাটি প্রথম আন্তর্জাতিকভাবে নজরে আসে মধ্য ৭০-এর দশকে। কোরিয়ায় নিযুক্ত ফরাসী রাষ্ট্রদূত পিয়েরে ল্যান্ডি ১৯৭৩ সালে ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করেন। ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে ল্যান্ডি ফরাসী সংবাদপত্রে একটা নিবন্ধ লেখেন। এতে তিনি মূসার অলৌকিক ঘটনার কোরীয় সংস্করণটির বিবরণ দেন।

কোরীয় সাগরের বিভক্ত হওয়ার ঘটনা ঘটে বিশেষ জোয়ার পরিস্থিতিতে। ১৯৭৩ সালে ঘটনাটি ঘটে ১৪ এপ্রিল বিকেল পাঁচটায় যখন জোয়ারের পর ভাটার টান আরম্ভ হয়। পাঁচ মিনিট পরেই সাগর শুকিয়ে এক স্থানে সম্পূর্ণ বিভক্ত হয়ে পড়ে যা মাত্র ঘন্টাখানেক আগেও ছিল মাঝ দরিয়া। পানি ধীরে ধীরে পুনরায় সাগরতল ঢেকে ফেলা শুরু করে। ৬টা ১০ মিনিটের মধ্যে পানি জেগে ওঠা পথটাকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে ফেলে। এটা একটা অত্যন্ত বিরল প্রাকৃতিক ঘটনা যাকে বলা যায় বিশ্বের নিকট দীর্ঘকাল যাবৎ অজ্ঞাত এক অলৌকিক ঘটনা। কবে থেকে এ ঘটনা ঘটে আসছে কিংবা আরো কতদিন এ রকম ঘটতে থাকবে তা অবশ্য কারো জানা নেই।

হতে পারে, এ ধরণেরই একটা পরিস্থিতি সেই দূর অতীতে মিশর ও ফিলিস্তিনের মধ্যকার সাগরে ঘটে থাকবে যা কেউ লক্ষ্য করেনি। মূসা (আ)

www.bjilibrary.com

আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে তার যাত্রাপথে ঐ বিশেষ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং তিনি যে মুহূর্তে সাগরে তার লাঠি দ্বারা আঘাত করেন ঠিক সেই মুহূর্তে এই প্রাকৃতিক ঘটনাটি ঘটে।

١٦٥- أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِينَ ○

١٦٦- وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُونَ ○

২৬ ঃ ১৬৫-৬৬ সৃষ্টির মধ্যে তোমরা তো কেবল পুরুষের সাথেই উপগত হও এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা বর্জন করে থাক। তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

উপরোক্ত আয়াতটি হযরত লূত (আ)-এর অনুসারীদের যৌন বিকৃতির দিকে ইঙ্গিত করে। তারা স্ত্রীর সাথে যৌন মিলনের পরিবর্তে পুরুষদের সাথে সমকামিতায় লিপ্ত হয়েছিল। এই অভ্যাসটিকে স্পষ্ট বিপথগামিতা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ বিষয়ের উপর বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক আলোচনা ইতিমধ্যে ৭ ঃ ৮০-৮১ আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে করা হয়েছে।

١٧٣- وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ○

২৬ ঃ ১৭৩ তাদের উপর শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল, তাদের জন্য এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট!

আয়াতটি হযরত লূত (আ)-এর সময়ে সংঘটিত ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে যা ৭ ঃ ৮৪ আয়াতের আলোচনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

١٢- وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ ۟ فِي تِسْعِ أٰيٰتٍ إِلٰى
فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فٰسِقِينَ ○

২৭ ঃ ১২ এবং তোমার হাত তোমার বক্ষপার্শ্বে বস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করাও। এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র নির্দোষ হয়ে। এটা ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত। তারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

www.bjilibrary.com

মূসার (আ) দীপ্তিমান হাত একটি সুপরিচিত অলৌকিক ঘটনা বা মোজেজা যা ছিল মূসাকে (আ) ফেরাউনের মিশরে তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্যে আল্লাহ্ প্রদত্ত নয়টি মোজেজার অন্যতম। মূসা (আ) কর্তৃক বার বার সতর্ক করে দেয়ার পরেও মিশরবাসীদের ঔদ্ধত্যের শাস্তিস্বরূপ পাঠানো পাঁচটি স্পষ্ট নিদর্শন তথা মহাপ্লাবন, পঙ্গপাল, কীট-পতঙ্গ, ব্যাঙ এবং রক্তের বিষয় ইতিমধ্যে ৭ ঃ ১৩৩ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলোচিত হয়েছে। অত্র উল্লিখিত নয়টির বাকি তিনটি নিদর্শন হচ্ছে ঃ লাঠি (দ্রঃ ৭ ঃ ১০৭ আয়াত), খরা-অনাবৃষ্টির বছরসমূহ (দ্রঃ ৭ ঃ ১৩০ আয়াত), এবং শস্য ঘাটতি (দ্রঃ ৭ ঃ ১৩০ আয়াত)।

লাঠি এবং এর অলৌকিক গুণাবলী বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার আওতা বহির্ভূত।

বৃষ্টিপাতের অভাবের ফলেই বছরের পর বছর খরা বা অনাবৃষ্টি দেখা দিয়ে থাকতে পারে যা ফসলের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল। উর্বর নীল নদ উপত্যকার মত প্রচুর বার্ষিক বৃষ্টিপাতের রেকর্ড বিশিষ্ট অঞ্চলেও দীর্ঘদিন ধরে শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করলে এবং এর ফলে নদীতে প্রধান পানির প্রবাহ শুকিয়ে গেলে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। শস্য-শীষ ছোট হওয়াও সাধারণত খরারই ফল। তবে নিম্নোক্ত কারণগুলোও এ ঘটনার জন্যে দায়ী হতে পারে ঃ

১. গুদামে অপুষ্ট বীজে পোকার আক্রমণ;
২. চাষাবাদের সময় পানি নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব; ফলে জলাবদ্ধতা কিংবা অপর্যাপ্ত পানি সরবরাহ;
৩. শস্যগাছের সুস্থভাবে বেড়ে উঠা এবং বীজ উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান মাটিতে না থাকা;
৪. মাটির অনুপযোগী ভৌতিক গুণাগুণ; এবং
৫. ছত্রাক ও পোকামাকড়ের কারণে শস্য মহামারী।

٥٥- أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ○

২৭ ঃ ৫৫ তোমরা কি যৌন পিপাসা মিটানোর জন্য নারীদের পরিবর্তে **পুরুষকে গ্রহণ করবে? নিঃসন্দেহে তোমরা অতি অজ্ঞ জাতি।**

এ বিষয়ে ৭ ঃ ৮০ ও ৭ ঃ ৮১ আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

٥٨- وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ○

২৭ ঃ ৫৮ **তাদের উপর ভয়ঙ্কর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম; যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল তাদের জন্য এই বর্ষণ ছিল কত মারাত্মক।**

www.bjilibrary.com

অত্র আয়াতে লূত নবীর (আ) সময়ে সংঘটিত ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়টি ৭ ঃ ৮৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলোচিত হয়েছে।

٦٠- أَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ فَأَنْبَتْنَا بِهٖ حَدَائِقَ
ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَهَا ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ۝

২৭ ঃ ৬০ বরং তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্যে বর্ষণ করেন বৃষ্টি; অতঃপর আমি তা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি, তার বৃক্ষাদি উদ্গত করাবার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ্ আছে কি? তবু ও তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্য বিচ্যুত হয়।

আসমান ও যমিনের সৃষ্টি বিষয়ে ২ ঃ ১১৭ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

আকাশ থেকে বৃষ্টির ফোঁটার পতন সম্পর্কে ২ ঃ ২২ এবং ২ ঃ ১৬৪ আয়াতদ্বয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গাছপালা- শস্য ফলাদির জন্ম ও বৃদ্ধি সাধন ২ ঃ ১৬৪ আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

٦١- أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَا أَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ
الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

২৭ ঃ ৬১ বরং তিনি, যিনি পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং তার মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদী-নালা এবং তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই দরিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়; আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তবুও তাদের অনেকেই জানে না।

২৫ ঃ ৫৩ আয়াতে এ বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

٦٣- أَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۗ
ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

২৭ ঃ ৬৩ বরং তিনি, যিনি তোমাদেরকে স্থলের ও পানির অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করেন এবং যিনি স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য ইলাহ্ আছে কি? তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ্ তা হতে বহু উর্ধ্বে।

www.bjilibrary.com

ভূ-ভাগ এবং সাগরের আঁধার সংক্রান্ত বিষয়টি ৬ ঃ ৬৩ আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং 'স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন' এই বক্তব্যটি ৭ ঃ ৫৭ আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

٦٤- اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

২৭ ঃ ৬৪ কে সৃষ্টি শুরু করেছেন এবং বার বার সৃষ্টির ধারা জারি রেখেছেন এবং কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দান করেন? তিনি ছাড়া কি আর কোন সৃষ্টিকর্তা আছে? (যারা আরো সৃষ্টিকর্তা আছে বলে) তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর ঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে এ কথার প্রমাণ পেশ করো।

সৃষ্টির শুরু এবং সৃষ্টির ধারা সম্পর্কে ২ ঃ ১১৭ এবং ২১ ঃ ১০৪ আয়াতসমূহে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

٨١- وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِى الْعُمْىِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

২৭ ঃ ৮১ তুমি অন্ধদেরকে তাদের পথ ভ্রষ্টতা হতে পথে আনতে পারবে না। তুমি শুনাতে পারবে কেবল তাদেরকে, যারা আমার নিদর্শনাবলিতে বিশ্বাস করে। আর তারাই আত্মসমর্পণকারী।

আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলি ঃ

বিভিন্ন আয়াতে উল্লিখিত আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এর আগেই প্রদান করা হয়েছে। এসব আয়াতের মধ্যে নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ উল্লেখযোগ্য ঃ

আয়াত ২ ঃ ১৬৪, ৩ ঃ ১৯০, ৬ ঃ ৯৭, ৬ ঃ ৯৮, ৬ ঃ ৯৯, ৭ ঃ ৫৮, ১০ ঃ ৫, ১০ ঃ ৬, ১০ ঃ ৬৭, ১৩ ঃ ২, ১৩ ঃ ৩, ১৩ ঃ ৪, ১৬ ঃ ১২, ১৬ ঃ ১৩, ১৬ ঃ ৬৫, ১৬ ঃ ৬৬, ১৬ ঃ ৬৭, ১৬ ঃ ৬৯, ১৬ ঃ ৭৯, ২১ ঃ ৯১।

٨٦- اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

২৭ ঃ ৮৬ ওরা কী অনুধাবন করে না যে, আমি রাত সৃষ্টি করেছি ওদের বিশ্রামের জন্য এবং দিনকে করেছি আলোকপ্রদ। এতে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

www.bjilibrary.com

বিশ্রামের জন্য রাত আর আলোর জন্য দিন-এ বিষয়টি ১০ ঃ ৬৭ আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৮৮- وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ
صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ○

২৭ ঃ ৮৮ আর তুমি পর্বতমালা দেখে অচল মনে করছ, কিন্তু সেদিন তাতে হবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় সঞ্চরমান। এটি আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি নৈপুণ্য। যিনি সমস্ত কিছুকে করেছেন সুষম। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবহিত।

আল্লাহ্ সব কিছুই সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেন

আল্লাহ্ সবকিছু নির্দিষ্ট অনুপাতে, নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুযায়ী এবং সামঞ্জস্যের সাথে সৃষ্টি করেছেন– বিষয়টি ইতিপূর্বে কয়েকস্থানে আলোচিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১ ঃ ১, ৭ ঃ ৫৪, ১৩ ঃ ১৬, ২৫ ঃ ২ আয়াতের আলোচনাসমূহ দেখা যেতে পারে।

৭- وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا
تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ○

২৮ ঃ ৭ আমরা (আল্লাহ্ তা'আলা) মূসার মা'কে প্রেরণা দিলাম ঃ তোমার সন্তানকে প্রতিপালন কর, যদি তার নিরাপত্তা সম্পর্কে ভয় পাও তবে তাকে (আমার নির্দেশ মত) পানিতে ফেলে দাও এবং কোন ভয় করোনা বা হা-হুতাশ করোনা (হতাশ হয়ো না)। কারণ আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দেব এবং তাকে আমার একজন নবী (বা রাসূল) বানাবো।

মূসা (আ)-কে শিশু অবস্থায় পানিতে ফেলার কাহিনী ২০ ঃ ৩৯ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

৭১- قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ○

২৮ ঃ ৭১ বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কী, আল্লাহ্ যদি রাতকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন– আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ্

www.bjilibrary.com

আছে, যে তোমাদেরকে আলোক এনে দিতে পারে? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করবে না?

٧٢- قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ مَنْ إِلَـٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ○

২৮ ঃ ৭২ বল, তোমরা ভেবে দেখেছো কী– আল্লাহ্ যদি দিনকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ্ আছে, যে তোমাদের জন্য রাত্রির আবির্ভাব ঘটাবে যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার। তবুও কী তোমরা ভেবে দেখবে না?

٧٣- وَمِن رَّحْمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ○

২৮ ঃ ৭৩ তিনিই তাঁর দয়ায় তোমাদের জন্য করেছিলেন রাত ও দিন, যেন তাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার এবং তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

উপরে উল্লিখিত আয়াত তিনটিতে আল্লাহ্ যে বাণী পৌঁছে দিয়েছেন তা উপলব্ধি করতে হলে আয়াতত্রয়কে একসাথে আলোচনায় আনতে হবে। পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্ পৃথিবীকে তার নিজ অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণনের আহ্নিক গতি দান করেছেন যাতে দিন ও রাত আসে। রাত ও দিনের উপকারী ফলসমূহ ১০ ঃ ৬৭ আয়াতের আলোচনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পৃথিবীর অক্ষীয় গতির সময়কাল যদি সূর্যের চারদিকে একবার পূর্ণ প্রদক্ষিণের সময়কালের সমান হত, তাহলে পৃথিবীর এক গোলার্ধে হত চিরস্থায়ী দিন আর অপর গোলার্ধে চিরস্থায়ী রাত। সূর্যের দিকে চিরস্থায়ীভাবে মুখ করে থাকা পৃথিবীর গোলার্ধের তাপমাত্রা থাকত অত্যন্ত উচ্চ। প্রধানত যে কারণে পানি এবং সবুজ গাছপালার অভাবে এখানে জীবন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ত। অনুরূপভাবে, চিরস্থায়ী রাতে আচ্ছাদিত গোলার্ধে আলোক সংশ্লেষণের অবর্তমানে জীবনের বিকাশ সম্ভব হত না।

আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে পৃথিবীকে তার অক্ষের চারদিকে বর্তমানের ঘূর্ণনগতি থেকে ভিন্ন কোন ধরনের ঘূর্ণনগতি দান করতে পারতেন। আমাদের সৌর জগতেও পৃথিবী থেকে ভিন্ন ধরনের বেশ কিছু অক্ষীয় গতির দৃষ্টান্ত রয়েছে। চাঁদ

www.bjilibrary.com

তার অক্ষের চারদিকে এমনভাবে ঘূর্ণনরত যে, যে সময়ে এটি নিজ অক্ষের চারদিকে একবার ঘূর্ণন পূর্ণ করে, সেই সময়ের মধ্যে চাঁদ পৃথিবীকেও একবার প্রদক্ষিণ করে আসে এমনভাবে যাতে চাঁদের যে কোন স্থানে পৃথিবীর ১৫ দিনের সমান একদিন এবং ১৫ রাতের সমান এক রাত হয়; আর চাঁদের একপাশ স্থায়ীভাবে পৃথিবীর দিকে মুখ করে থাকে। ইউরেনাসের অক্ষীয় গতি আরো অধিক আকর্ষণীয়। এর ঘূর্ণন অক্ষ এর প্রদক্ষিণ ক্ষেত্রের প্রায় উপরে অবস্থিত; ফলে, সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণকালের অর্ধেক সময় ধরে এর এক মেরু সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে এবং বাকি অর্ধেক সময় (পৃথিবীর প্রায় ৪২ বছর) ধরে অন্য মেরু সূর্যের বিপরীত দিকে মুখ করে থাকে।

দিনের মধ্যভাগে চাঁদের তাপমাত্রা ১২০° ডিগ্রি সেঃ পর্যন্ত উপরে উঠে যায় আর রাতের তাপমাত্রা ১০০° ডিগ্রি সেঃ-এ নেমে আসে।

শুক্রগ্রহ ঘূর্ণনরত আছে অন্য সব গ্রহের বিপরীত দিকে এবং এর অক্ষীয় গতির সময়কাল প্রদক্ষিণ সময়কালের চেয়ে বেশী। এর অক্ষীয় ঘূর্ণনে সময় লাগে ২৪৩ পার্থিব দিন এবং প্রদক্ষিণ সময়কাল ২২৫ পার্থিব দিন। দিন কিংবা রাত চিরস্থায়ী হলে জীবনের বিকাশকে অত্যধিক দুরূহ এবং সম্ভবত অসম্ভব করে তুলত। এ সকল আয়াতে আল্লাহ্ তাঁর সীমাহীন করুণার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং পৃথিবী নামক এই গ্রহে দিন ও রাতকে নির্দিষ্ট পরিমাপযুক্ত করার মাধ্যমে আমাদেরকে 'তাঁর মেহেরবানী তালাশ' করতে আহবান জানান।

٨١- فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ۝

২৮ ঃ ৮১ অতঃপর আমি কারূনকে ও তাহার প্রাসাদকে ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম। তাহার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না।

অত্র আয়াতে হযরত মূসার (আ) সাথে মিশর থেকে বহির্গত দলের অন্তর্ভূক্ত কারূন নামীয় অন্যতম ইসরাঈলীর উপর যে শাস্তি নেমে এসেছিল সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি বেশ সম্পদশালী ছিলেন যা তাকে মূসা (আ) এবং তাঁর সঙ্গীদের প্রতি উদ্ধত আচরণ করার সাহস যুগিয়েছিল।

বাইবেল মতে, আড়াইশ' সঙ্গীসহ তিনি মূসার (আ) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন যে কারণে দু'জন সঙ্গীসহ তাকে শাস্তি প্রদান করা হয়। তাদের পায়ের নিচের মাটি ফেটে দু'ভাগ হয়ে যায় এবং মাটি তাদেরকে গিলে ফেলে।

ধরণী কর্তৃক গলাধঃকরণের একটা সহজ দৃষ্টান্ত হচ্ছে চোরাবালি। বাহ্যিক দৃষ্টিতে চোরাবালিকে আশপাশের বালি থেকে ভিন্ন রকম কিছু মনে হয় না, যে কারণে এটি মুসাফিরদের জন্যে ভয়ানক। এটি হচ্ছে আলগা, পরিবর্তনশীল বালুকারাশি যা পানিতে এতটা সুসিক্ত থাকে যে, সহজেই চাপের নিকট নতি স্বীকার করে এবং কোন লোক কিংবা জীবজন্তুর ভার বহন করতে পারে না। ফলে, এটি নিচের দিকে দেবে যায় এবং মানুষ বা প্রাণীর দেহ ধীরে বালির নিচে হারিয়ে যায়। মাটি মানুষ বা প্রাণীদেহকে গলাধঃকরণ করে। ছোট ছোট চোরাবালি মাঝে মধ্যেই দেখা যায় বিশেষত আইল্যান্ডে, নদীর মোহনায় আর সুবিস্তৃত সাগর সৈকতে যেখানে বালির নীচে লুকিয়ে থাকে পরিবর্তনশীল কাদামাটি এবং অন্যান্য অভেদ্য বস্তু।

প্রচন্ড ভূমিকম্পও এ ধরনের গলাধঃকরণ তথা জীবন্ত কবরস্থকরণের মত ঘটনার কারণ হতে পারে এবং সেই সাথে আরো অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি তো থাকেই। মহাবিপর্যয়কর ভূমিকম্পে ভবনসমূহ দীর্ঘ হয় বা ভেঙ্গে যায়, ভূপৃষ্ঠে বড় বড় ফাটল দেখা দেয়, কখনও কখনও সাগরের বিশাল বিশাল ঢেউ এবং তার সাথে বিপুল পরিমাণ পানি ও কাদা তীরে চলে আসে এবং মানুষ ও সম্পদের উপর বিরাট ধ্বংস ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে। অতীতে যে সকল ভূমিকম্প বিপর্যয় ডেকে এনেছিল সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ ১৭৫৫ সালে লিসবনের ভূমিকম্পে তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটেছিল; শহরের বৃহত্তর অংশ ভেঙ্গে-ধসে যায়; আগুনের বিস্ফোরণ ঘটে এবং জলোচ্ছ্বাস জাহাজঘাটগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ১৭৮৩ সালে ইতালীর ক্যালাব্রিয়ায় সংঘটিত ভূমিকম্পে ষাট হাজার লোক মারা পড়ে। ১৯২৩ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর জাপানে সর্বাপেক্ষা ধ্বংসকারী ভূমিকম্প হয় যাতে টোকিও ও ইয়াকোহামা শহর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। ১৯৩৫ সালে কোয়েটা শহর এক ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়। ১৯৩৪ সালের বিহার ভূমিকম্পে বহু লোকের প্রাণহানি হয়। ইরানের উত্তরাঞ্চলে ও আজারবাইজানের ভূমিকম্পেও বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়।

১৯- أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ○

২৯ ঃ ১৯ এরা কী কখনো লক্ষ্য করে না কীভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টি শুরু করেন, পরে তারই পুনরাবৃত্তি করেন? নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহ্র পক্ষে খুবই সহজ।

কীভাবে সৃষ্টির শুরু হয়েছে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক আলোচনা পরিশিষ্ট-২ এ দেওয়া হয়েছে।

এ কথাও আলোচনা করা হয়েছে যে মহাবিশ্বে দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তি কাজ করছে একটি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আকর্ষণ আর দ্বিতীয়টি হলো মহাবিস্ফোরণ

www.bjilibrary.com

(Big Bang) জনিত সম্প্রসারণ (expansion) শক্তি। একটি মতবাদ এই যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিই শেষ পর্যন্ত কামিয়াব হবে এবং মহাবিশ্ব মহাধ্বংসের (big crunch) মাধ্যমে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে এবং অতি ক্ষুদ্র, অতি ঘন এবং অতি উত্তপ্ত কণায় পরিণত হবে। আবার এগুলো থেকে আর এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে নতুন মহাবিশ্বের সৃষ্টি হবে এ বিষয়ে ২ ঃ ১১৭ এবং ২১ ঃ ১০৪ আয়াতদ্বয়ের আলোচনাও দেখা যেতে পারে।

٢٠- قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

২৯ ঃ ২০ (লোকদেরকে) বল (হে নবী!) তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং লক্ষ্য করে দেখো যে কীভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টির সূচনা করেছেন এবং তিনিই দ্বিতীয়বার জীবনদান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাশালী।

এই আয়াতে মহান সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণার উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। সৃষ্টি জগতের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য ভ্রমণই যে বিশেষ পদ্ধতি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ বিখ্যাত বৃটিশ জীববিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন। বাইশ বছর বয়সে তিনি বৃটিশ রয়েল নেভির "বিগল্" নামক জাহাজে প্রকৃতি বিশেষজ্ঞ হিসেবে চাকুরী পান। জাহাজটি ১৮৩১ সালে সমুদ্র যাত্রা শুরু করে।[১] এর ফলে তিনি বিভিন্ন প্রকারের জীব, বিভিন্ন দেশের জীবন পদ্ধতি ও প্রাকৃতিক জগত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পান। ডারউইনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান Theory of Evolution যা প্রাণ উন্মেষের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। প্রশান্ত মহাসাগরের গালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ দেখবার পরই তার এইসব চিন্তার সূত্রপাত হয়। যেহেতু সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ এবং পাক কুরআনের বিজ্ঞানময় বিষয়সমূহ সম্বন্ধে ডারউইনের কোন ধারণা ছিল না; বরং মানব রচিত বাইবেলের বিজ্ঞান বিরোধী ভাবধারা তার জানা ছিল তাই তিনি তার মতবাদে সৃষ্টিকর্তার কোন উল্লেখ করেন নি।

ব্যাপক ভ্রমণের মাধ্যমে প্রকৃতি জগতের উপর গভীর গবেষণা চালালে যে কোন বিজ্ঞানী সব সৃষ্টির মধ্যে এক মহান সৃষ্টিকর্তার ব্যাপক পরিকল্পনা বুঝতে পারবেন এবং সবকিছু যে একজন মহান সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়েছে এবং আবারও হতে পারে এই সত্য তথা মহান আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাসী হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তথ্যসূত্র ঃ

1. The Wonders of Life on Earth. Editors of Life and Lincoln Barnett. Prentice-Hall International, London, p. 9, 1963.

www.bjilibrary.com

٢٨- وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ

২৯ ঃ ২৮ আর (স্মরণ কর) যখন লূত তার দেশবাসীকে বলল ঃ "তোমরা তো এমন নির্লজ্জ দুষ্কর্ম কর যে তোমাদের পূর্বে দুনিয়ায় কোন জাতিই এরূপ করেনি।"

এ বিষয়ে ৭ ঃ ৮০-৮১ আয়াতের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

٢٩- أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوا ٱئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ

২৯ ঃ ২৯ "তোমরা (এমন নিকৃষ্ট যে) তোমরা পুরুষদের নিকট (যৌন পিপাসা মিটাতে) যাও, রাহাজানি কর এবং নিজেদের মজলিশে দুষ্কর্ম কর।" কিন্তু তার জাতির নিকট এই কথার কোন জবাব ছিল না বরং বলল, নিয়ে এসো তোমার আল্লাহ্‌র আযাব যদি তোমার দাবী সত্য হয়ে থাকে।"

এতে বুঝা গেল যে লূত (আ)-র জাতি শুধু গোপনে সমকামী ছিল না, বরং তারা প্রকাশ্যে দল বেধে এই দুষ্কর্ম করতো এবং অন্যান্য সন্ত্রাসী কর্মকান্ডও চালাতো। অর্থাৎ এ ধরনের বিকৃত যৌন জীবনযাপনে তাদের কোন লজ্জা বা পাপবোধ ছিল না। তাই আল্লাহ্ এই জাতিকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দেন।

এই ধরনের সামাজিক ও প্রকাশ্য যৌন ব্যভিচার সম্পর্কে মহানবী (সা) তাঁর উম্মতদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন যে, এমন অবস্থার সৃষ্টি হলে আল্লাহ্ সেই নির্লজ্জ জাতির মধ্যে বিভিন্ন মহামারি ছাড়াও এমন নতুন রোগ ছড়িয়ে দেবেন যা তাদের পূর্বপুরুষগণ কখনও দেখেনি (ইব্‌ন মাজা)। বর্তমান কালের AIDS সম্ভবত যৌন ব্যভিচারীদের প্রতি শাস্তিস্বরূপ দুরারোগ্য রোগ।

٣٨- وَعَادًا وَثَمُودَا۟ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَٰكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا۟ مُسْتَبْصِرِينَ

২৯ ঃ ৩৮ "এবং আমি আদ ও ছামূদ গোত্রকে ধ্বংস করেছিলাম; তাদের বাড়ীঘরই তোমাদের জন্য এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। শয়তান তাদের কাজকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল এবং তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল, যদিও তারা ছিল বিচক্ষণ।"

www.bjilibrary.com

এই আয়াতে নবী সালিহ্ (আ) ও নবী হূদ (আ)-এর লোকদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ এ সকল লোকের পাপের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন। এ বিষয়টি যথাক্রমে আয়াত ১১ ঃ ৫৮ ও ১১ ঃ ৬৭-এর প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

٤٠- فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ
وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ۚ
وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

২৯ ঃ ৪০ তাদের প্রত্যেককেই তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলাম। তাদের কারও প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড ঝড়, তাদের কাউকে আঘাত করেছিল মহানাদ, কাকেও আমি মাটির নিচে গেঁড়ে দিয়েছিলাম এবং কাকেও ডুবিয়েছিলাম। আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোন জুলুম করেননি; তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল।

পূর্বেকার আয়াতসমূহ যথা ২৯ ঃ ৩১-৩৯-এ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের উপর যে নানা প্রকার শাস্তি আরোপ করা হয়েছিল সে সম্পর্কে এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। যাদের প্রসঙ্গে এই শাস্তির কথা বলা হয়েছে তারা হ'ল নবী লূত (আ)-এর লোক, কারূন, নবী মূসা (আ)-এর একজন সঙ্গী এবং ফিরাউন (ফারাও)। এদের বিষয়ে ৭ ঃ ৮৪ নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

টর্নেডোর (প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়) সৃষ্টি

কোন কোন বজ্রবিদ্যুৎপূর্ণ ঝড়-বৃষ্টি বিশেষ করে প্রবল ঝড়ো বাতাস মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যার সষ্টি করে যা মেঘের তলদেশে উদ্ভব হয়ে নিচে নেমে আসে এবং ভূমি স্পর্শ করে। এটা আবার উপরে গিয়ে মেঘের সাথে মিশে যায় এবং নিকটবর্তী কোন স্থানে গিয়ে আঘাত হানে অথবা আর কখনও এর পুনরভ্যুদয় হয় না। প্রচণ্ড গতিবেগের কারণে টর্নেডোর অভ্যন্তরে অত্যন্ত নিম্নচাপ বিরাজ করে। একটি ভবনের উপর দিয়ে টর্নেডো অতিক্রম করলে ভবনের চারদিকে বাতাসের এই অতি নিম্নচাপের কারণে ভবনটি প্রায় গুড়িয়ে যায় বা বিধ্বস্ত হয়। দক্ষিণ ও মধ্য পশ্চিমাঞ্চলে প্রায়ই টর্নেডো আঘাত হানে (Van Nostrand's Scientific Encyclopaedia, ২য় সং, ১৯৪৭, পৃঃ ১৪৩২)। লূত (আ)-এর লোকদের উপর প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হওয়ার বিষয়টি আয়াত নং ১৫ ঃ ৭৩-এ আলোচনা করা হয়েছে। কারূনের ঘটনাটির বিবরণ রয়েছে ২৮ ঃ ৮১ নং আয়াতে।

৬১- وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ۚ فَأَنّٰى يُؤْفَكُونَ ○

২৯ ঃ ৬১ যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন ?' তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্।' তাহলে, তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে।

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আয়াত ২ ঃ ১১৭, ২ ঃ ১৬৪ ও পরিশিষ্ট ১ ও ২ এ বর্ণনা করা হয়েছে। সূর্য ও চন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধানের বিষয়টি ৭ ঃ ৫৪ সংখ্যক আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

৬৩- وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا
لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ○

২৯ ঃ ৬৩ যদি তুমি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, ভূমি মৃত হওয়ার পর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে কে তাকে সঞ্জীবিত করে ? তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্।' বল, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌রই।' কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা অনুধাবন করে না।

আকাশ থেকে বৃষ্টির বর্ষণ এবং বৃষ্টির পানি পেয়ে শুষ্ক মৃত ভূমির সজীব হয়ে ওঠার প্রসঙ্গটি ২ ঃ ১৬৪ নং আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৯- أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا
وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ
وَلٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ○

৩০ ঃ ৯ তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না ? তাহলে দেখতে পেত যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছে। শক্তিতে তারা ওদের অপেক্ষা প্রবল ছিল, তারা জমি চাষ করত, তারা তা আবাদ করত ওদের চেয়ে বেশী। তাদের নিকট এসেছিল তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন সহ, বস্তুত ওদের প্রতি জুলুম করা আল্লাহ্‌র কাজ ছিল না, ওরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল।

এ বিষয়টি আয়াত ৩ ঃ ১৩৭ ও ৬ ঃ ১১তে আলোচনা করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

١١- اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

৩০ ঃ ১১ আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করেন, পরে তিনিই তার পুনরাবৃত্তি করবেন এবং অবশেষে তোমাদের সবাইকে তাঁর নিকট নিয়ে যাওয়া হবে।

এই বিষয়টি ২ ঃ ১১৭, ২১ ঃ ১০৪ এবং ২৯ ঃ ১৯ আয়াতসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

١٩- يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ۝

৩০ ঃ ১৯ তিনিই জীবিতকে মৃত হতে বের করেন, এবং মৃতকে জীবন্ত হতে বের করে আনেন এবং যমিনকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন। এমনিভাবে তোমাদেরকেও (মৃত অবস্থা হতে) বের করে আনা হবে।

মৃতকে জীবন্ত থেকে এবং জীবন্তকে মৃত থেকে বের করার বিষয়টি ৩ ঃ ২৭ ও ৬ ঃ ৯৫ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

মৃত পৃথিবীকে জীবন দান সম্পর্কে ২ ঃ ১৬৪ আয়াতের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

٢٠- وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ۝

৩০ ঃ ২০ তাঁর (আল্লাহ্‌র) নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি এই যে তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে পয়দা করেছেন এবং অতঃপর তোমরা মানুষ হিসেবে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছ।

মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করার বিষয়টি ২ ঃ ২৮ এবং ১৮ ঃ ৩৭ আয়াত দ্বয়ের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

সমগ্র পৃথিবীতে মানুষের ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে বহু কারণ ও প্রণালী এর জন্য দায়ী। সবচেয়ে বড় কারণ মানুষের স্থান পরিবর্তন (migration)। মানব জাতির শুরু থেকেই এই স্থান পরিবর্তন চলে আসছে। প্রাগৈতিহাসিক বা প্রাথমিক যুগে গোষ্ঠী বা দলগতভাবে মানুষ খাদ্য, পানি এবং পশুচারণ ক্ষেত্রের তালাশে স্থান পরিবর্তন করতো। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভূপ্রকৃতির পরিবর্তন যেমন

বরফমালার ধস, মহাদেশ সমূহের ক্রমাগত সরে যাওয়া এবং ভূমিকম্প ইত্যাদিও মানুষকে স্থান পরিবর্তনে বাধ্য করেছে। সম্প্রতিকালে বিভিন্ন দেশ ও দ্বীপপুঞ্জের আবিষ্কার মানুষের দলে দলে স্থান পরিবর্তনে সাহায্য করেছে যেমন আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও অসংখ্য দ্বীপপুঞ্জ।

কিন্তু এইসব দেশসমূহ প্রথম আবিষ্কৃত হবার সময় যেমন অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জে সভ্য জাতি সেইসব দেশের আদিম অধিবাসীদেরকে দেখতে পেয়েছে। সুতরাং মহান আল্লাহই মানুষকে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

٢٢- وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِیْنَ ○

৩০ ঃ ২২ এবং তাঁর (আল্লাহ্‌র) নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে আকাশসমূহ ও যমিনের সৃষ্টি, তোমাদের ভাষাসমূহ ও বর্ণের পার্থক্য। বস্তুত এই সবে জ্ঞানী লোকদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে।

আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির বিষয়টি ২ ঃ ১১৭ এবং ২ ঃ ১৬৪ আয়াতদ্বয়ের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

যদিও সব মানুষ একই মূল থেকে সৃষ্ট তবুও মানুষের ভিন্ন ভিন্ন গায়ের রঙ ও ভাষাসমূহ সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

মানুষের গায়ের রং শুধু তার চামড়ায় সীমাবদ্ধ। চামড়ার বহিরাবরণের বিশেষ স্তরে 'মেলানিন' রংয়ের পরিমাণের ভিত্তিতেই গায়ের রং বিভিন্ন হয়। চামড়ার বহিরাবরণে পাঁচটি স্তর রয়েছে যার নিম্নস্তরে অবস্থিত melanocyte কোষ। এ কোষ থেকে মেলানিন রং সৃষ্টি হয় এবং ক্ষুদ্র কণিকার মত হয়ে জমা হয়। এই রং বিশিষ্ট চামড়া সূর্যতাপের আলট্রাভায়োলেট রশ্মির প্রভাবে (যা সকল গ্রীষ্ম প্রধান দেশসমূহে বিদ্যমান) সেই রংয়ের কণিকাগুলো মুক্ত হয়ে চামড়ার বহিরাবরণের উপরিভাগের তৃতীয় স্তর (statum grannlosun) এ পুঞ্জীভূত হয়, যার ফলে এই রংয়ের চামড়া দেখা যায়। অতিরিক্ত সূর্যতাপে এই আলোর প্রভাবে বেশী রং তৈরি হয় যা সূর্যতাপজনিত (suntan) বলে পরিচিত। তাই শীতপ্রধান দেশের লোকের চামড়ায় খুব কম মেলানিন রং থাকে বলে তারা শ্বেতকায় বা বেশ গোরা। আর গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকের ত্বক বিভিন্ন রংয়ের কালো, শ্যামবর্ণ বিশিষ্ট ইত্যাদি।

এই মেলানিন তথা ত্বকের কাল রংয়ের বিস্তৃতির উপর বংশ তথা 'জিন্‌সের' প্রভাব রয়েছে। তাই বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহের মাধ্যমে বহু শংকর রংয়ের শিশু জন্মলাভ করতে পারে। শ্বেতকায় ও অশ্বেতকায় রংয়ের লোকদের ত্বকের বিভিন্ন

www.bjilibrary.com

রংয়ের কারণ এই রংয়ের পরিমাণ ও উপস্থিতির উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে বিশ্বে নানা রংয়ের লোক দেখতে পাওয়া যায়।

২৩- وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاۤؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ○

৩০ ঃ ২৩ এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাতে ও দিনে তোমাদের ঘুম এবং তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ। এতে অবশ্য শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

শরীরের বিশ্রামকালীন অবস্থার নাম হচ্ছে ঘুম এবং তা শরীরের ক্লান্তি দূর করে শক্তি পুনরুদ্ধার করে। এছাড়া মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র, মাংসপেশী এবং সমগ্র শারীরবৃত্তিয় ব্যবস্থাকে সঞ্জীবিত করে তোলে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত জানার জন্য পরিশিষ্ট-৮ দ্রষ্টব্য।

২৪- وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

৩০ ঃ ২৪ এবং তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে–তিনি তোমাদেরকে প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ, ভয় ও ভয়সঞ্চারকারী রূপে এবং তিনি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন ও তাদ্বারা ভূমিকে তার মৃত্যুর পরে পুনর্জীবিত করেন; এতে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

ভীতি ও প্রত্যাশা উভয় দ্বারা বজ্র বিদ্যুৎকে এই আয়াত ১৩ ঃ ১২ তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আকাশ থেকে বৃষ্টি পাতের ফলে কীভাবে মৃত পৃথিবী সজীব হয়ে ওঠে তা ২ ঃ ২২, ১৬৪ তে বর্ণনা করা হয়েছে।

২৫- وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاۤءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ۗ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ اِذَاۤ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ○

৩০ ঃ ২৫ এবং তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে তাঁরই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি; অতঃপর আল্লাহ্ যখন তোমাদেরকে মাটি থেকে উঠবার জন্য একবার আহ্বান করবেন তখন তোমরা উঠে আসবে।

www.bjilibrary.com

আকাশমণ্ডলীতে অবস্থিত সবকিছুই যেমন নক্ষত্ররাজি, গ্রহ-উপগ্রহাদি, কৃত্রিম উপগ্রহসমূহ, ছায়াপথ ও ছায়াপথে অবস্থিত উজ্জ্বল নক্ষত্রমণ্ডলী ইত্যাদি এবং পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল জীবন ও জড়বস্তু প্রকৃতির বিধান মেনে চলে। এই বিধানগুলো আল্লাহ্ নির্দেশিত এবং সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণ ও আদেশাধীন। এভাবে আকাশ ও পৃথিবী তাঁর আদেশে পরিচালিত হয়। এই বিষয়টি আয়াত ৭ ঃ ৫৪, ১৮৫ ও পরিশিষ্ট ১, ২ ও ৪ এ বর্ণিত হয়েছে।

٢٦- وَلَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُۥ قَٰنِتُونَ ۝

৩০ ঃ ২৬ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। সকলেই তাঁর আজ্ঞাবহ।

এই বিষয়টি আয়াত ৫ ঃ ১৯ এ বিবৃত করা হয়েছে।

٤٦- وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَٰتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِۦ
وَلِتَجْرِىَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِۦ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

৩০ ঃ ৪৬ তাঁর নিদর্শনাবলির একটি যে তিনি বায়ু প্রেরণ করেন সুসংবাদ দেওয়ার জন্য ও তোমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ আস্বাদন করানোর জন্য; এবং যাতে তাঁর বিধানে জলযানগুলো বিচরণ করে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহের সুসংবাদকারী হিসেবে বাতাসের ভূমিকা সম্পর্কে এই আয়াত ৭ ঃ ৫৭-এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের বিষয়টি আয়াত ২ ঃ ১৬৪ তে বর্ণনা করা হয়েছে।

٤٨- ٱللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُۥ فِى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ
وَيَجْعَلُهُۥ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَٰلِهِۦ ۖ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِۦ مَن يَشَآءُ
مِنْ عِبَادِهِۦٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝

৩০ ঃ ৪৮ আল্লাহ্, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে; অতঃপর তিনি একে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন, পরে একে খণ্ড-বিখণ্ড করেন এবং তুমি দেখতে পাও তা থেকে নির্গত হয় বারিধারা; অতঃপর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে

www.bjilibrary.com

যাদের নিকট ইচ্ছা এটা পৌছিয়ে দেন, তখন তারা হর্ষোৎফুল্ল হয়।

সুসংবাদদানকারী হিসেবে বাতাস সম্পর্কে ৭ ঃ ৫৭ আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কীভাবে একটি মেঘে জল হয়, বাতাসের সাহায্যে তা কীভাবে আকাশে উঠে যায়, আকাশের অধিকতর উচ্চতায় কীভাবে মেঘদল একটি বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং কীভাবে মেঘের মধ্যস্থিত জলকণাসমূহ পরস্পর একীভূত হয়ে পানির ফোঁটায় পরিণত হয় যা আকারে ক্রমান্বয়ে বড় হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে ভারী জলকণার ফোঁটাকে বাতাস আর ধরে রাখতে পারে না; তখন তা বৃষ্টির ফোঁটার আকারে মাটিতে পড়ে–এসব কিছুই আয়াত ২ ঃ ১৬৪-এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বাতাসে ভাসমান থাকা বিরাট মেঘদলের, সর্বত্র একই মাত্রায় তাপ, বায়ুচাপ ও বায়ুর গতি বিদ্যমান থাকে না। মেঘপুঞ্জস্থিত এই তাপ, বায়ুচাপ ও গতির পরিবর্তনশীলতা যখন কোন নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে তখন মেঘের বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন আপেক্ষিক গতির সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত মেঘের প্রধান অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন খণ্ডাংশে ভেঙে পড়ে।

আগেই এটা বলা সম্ভব নয় যে, ভূ-পৃষ্ঠের ঠিক কোন স্থানে মেঘের এসব খণ্ডাংশ বৃষ্টিপাত ঘটাবে। কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে বৃষ্টিপাত হওয়া বেশ কয়েকটি বিষয়ের একত্র সম্মিলনের উপর নির্ভর করে; যেমন– (১) মেঘের আকার ও প্রকৃতি এবং উচ্চতা, (২) বাতাসের গতি, (৩) বাতাসের তাপ ও আর্দ্রতা, (৪) ভূপৃষ্ঠে অরণ্যের অবস্থিতি, এবং (৫) বাতাস প্রবাহিত হওয়ার বড় বড় প্রতিবন্ধকতা (উঁচু পর্বত শ্রেণী)। মানুষের পক্ষে এ সকল বাধ্যবাধকতার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা সম্ভবপর নয়। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁর বায়ুমণ্ডলে কর্মরত অগণ্য সংখ্যক শক্তির মাধ্যমে এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করেন।

٥٤-اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً
ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ○

৩০ ঃ ৫৪ আল্লাহ্, তিনি তোমদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বলরূপে, দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

মানব শিশু পৃথিবীতে সবচেয়ে অসহায় প্রাণী এবং নিজের পায়ে দাড়ানোর পূর্বে শিশুটির পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন ও পরিচর্যাকারীদের কয়েক বছর পর্যন্ত

সার্বক্ষণিক যত্নের প্রয়োজন। শৈশবকালের এই অসহায়ত্ব থেকে শিশু ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে হামাগুড়ি দিতে, হাটতে, কথা বলতে এবং সবশেষে যৌবনে পদার্পন করে। এ সময় সে নিজেই নিজের দেখাশুনা করতে পারে। একটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের এই দীর্ঘ প্রক্রিয়া তাকে দুনিয়া ও তার পরিবেশ সম্পর্কে জানার একটি বড় সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় যেটা তার বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন।

এই প্রাপ্তবয়স্কতা ৫০ থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত শক্তি সামর্থ ও কর্ম দ্বারা পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং তারপর ক্রমান্বয়ে এই শক্তি হ্রাস পেতে থাকে। সবশেষে বৃদ্ধ বয়সে তাকে শিশুর ন্যায় দুর্বল ও অসহায় হয়ে পড়তে হয়। জানা কোন অসুস্থতা ব্যতিরেকে এটা একটি সাধারণ পরিণতি এবং একে বার্ধক্যজনিত ক্ষয় বা দুর্বলতা নামে অভিহিত করা হয়। মানুষের ক্ষেত্রে বার্ধ্যক্যের স্বাভাবিক বয়স ৭০ বছর বা তার উর্ধ্বে। বয়সের দরুণ পলিত কেশের অর্থ হচ্ছে শ্বেত শুভ্র মাথা বা বৃদ্ধ বয়সের পাকা চুল।

চুলের রং-এর পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে মেলানিন নামে এক প্রকার রঞ্জক পদার্থ নানা পরিমাণে চুলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। চুলে মেলানিন না থাকলে এবং মেলানিন গঠনকারী পদার্থের কোষসমূহে অসংখ্য শূন্য স্থান থাকার ফলে চুল সাদা হয়ে যায়। যদিও পাকা চুল বৃদ্ধ বয়সের নিদর্শন তবুও চুল পাকা হওয়ার বয়স নিয়ে মতভিন্নতা রয়েছে। সাধারণত ৩০ বছরের পর থেকে চুল পাকা হতে শুরু করে। তবে সম্পূর্ণ পাকা হওয়ার কোন নির্দিষ্ট বয়স নেই।

١٠. خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقٰى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ
وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا
فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ۝

৩১ ঃ ১০ তিনি আকাশমণ্ডলী নির্মাণ করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত—তোমরা এটা দেখছ; তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা যাতে এটা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সব রকম জীবজন্তু। এবং আমিই আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে এতে উদ্গত করি সব ধরনের কল্যাণকর উদ্ভিদ।

স্তম্ভ ব্যতীত আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টি

১৩ ঃ ২ নং আয়াতের প্রথমাংশে এটি আলোচিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

পৃথিবীতে পর্বতমালার দৃঢ়ভাবে সংস্থাপন

এটা ১৩ ঃ ৩ সংখ্যক আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রত্যেক প্রকার উন্নত প্রাণীর জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি

আয়াতের এই অংশে উদ্ভিদের বেলায় জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টির প্রতি দিক নির্দেশ করে এবং তা আল্লাহ্ কর্তৃক আকাশে ছড়িয়ে থাকা মেঘের বারি বর্ষণের সহায়তায় সম্পন্ন হয়। ১৩ ঃ ৩ নং আয়াতে এ বিষয়টির উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

١١- هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِیْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِیْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ
بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ○

৩১ ঃ ১১ এই-ই হলো আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। এখন দেখাও দেখি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যেরা কী জিনিস সৃষ্টি করেছে। আসল কথা হল, এই যালেম লোকেরা সুস্পষ্ট গোমরাহির মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে।

মানুষের যে কোন সৃষ্টি যে মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টির তুলনায় নগণ্য সে বিষয়ে ১৩ ঃ ১৬ আয়াতে বিজ্ঞানভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

٢٠- اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعَمَهٗ
ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ؕ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُّجَادِلُ فِی اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًی
وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِیْرٍ ○

৩১ ঃ ২০ তোমরা কী দেখ না আল্লাহ্, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন ? মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, তাদের না আছে পথ নির্দেশক আর না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব।

এ বিষয়টি আয়াত নং ১৬ ঃ ১২ তে আলোচনা করা হয়েছে।

٢٩- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ یُوْلِجُ الَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَیُوْلِجُ النَّهَارَ فِی الَّیْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؗ
كُلٌّ یَّجْرِیْۤ اِلٰۤی اَجَلٍ مُّسَمًّی وَّاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِیْرٌ ○

www.bjilibrary.com

৩১ ঃ ২৯ তুমি কী দেখ না আল্লাহ্ রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে পরিণত করেন ? তিনি চন্দ্র সূর্যকে করেছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকটি বিচরণ করে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত; তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত।

দিনের অভ্যন্তরে রাতের ও রাতের অভ্যন্তরে দিনের নিমজ্জন।

আয়াত ৩ ঃ ২৭ এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সূর্য, চন্দ্রকে নিয়মাধীন করণ

সূর্য, চন্দ্র ও আকাশমণ্ডলীতে অবস্থিত নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সবই আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়মের অধীন এবং এ বিষয়টি ৭ ঃ ৫৪ নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। আকাশমণ্ডলীতে অবস্থিত প্রত্যেকটি বস্তুর দু'টি গতি রয়েছে, একটা স্বীয় অক্ষের উপর ঘূর্ণন ও অপরটি কক্ষপথে পরিক্রমণ বা আবর্তন। আবর্তনের গতির কারণে আকাশমণ্ডলীর প্রতিটি বস্তু একটি নির্দিষ্ট পথ বা কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে। কারণ, একটি একক বস্তু যখন মহাকর্ষীয় এলাকার মধ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে তখন কক্ষপথ একটি মোচাকৃতির অংশের হয় যেমন গোলাকার, উপবৃত্তাকার, অধিবৃত্তাকার, অথবা পরাবৃত্তাকার হতে পারে। অধিকাংশ কক্ষপথ উপবৃত্তাকার এবং অধিকাংশ গ্রহ-উপগ্রহের কক্ষপথ প্রায় গোলাকার। অধিবৃত্তাকার বা পরাবৃত্তাকার কক্ষপথের ফল এমন দাড়ায় যে, কক্ষপথে পরিক্রমণকারী বস্তুটি একটি অতি বৃহদাকার বস্তুর নৈকট্য থেকে এমন এক গতিতে দূরে সরে যায় যা এর সরে যাওয়ার গতির সমান অথবা এর চেয়ে বেশী হয়ে থাকে। আকাশমণ্ডলীর প্রতিটি বস্তু একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে নিজস্ব পথে চলতে থাকে অর্থাৎ সেই সময় পর্যন্ত যখন প্রত্যেকটি বস্তু গ্রহ-নক্ষত্রের আর একটির আকার ধারণ করে (যেমন সূর্যের একটি রক্তবর্ণ দানবে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে)। এ সকল গ্রহ-নক্ষত্র ধরে নেয়া হয় যে ভিন্ন ভিন্ন মেয়াদে অথবা তাদের সমাপ্তি পর্যন্ত পরিক্রমণরত থাকবে।

٣١- أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ آيَاتِهِ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝

৩১ ঃ ৩১ তুমি কী লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে জলযানগুলো সমুদ্রে বিচরণ করে, যার দ্বারা তিনি তোমাদেরকে তার নিদর্শনাবলির কিছু প্রদর্শন করেন? এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

www.bjilibrary.com

জলপথে জাহাজের পরিক্রমণ ২ ঃ ১৬৪ নং আয়াতে আলোচিত হয়েছে। এখানে উল্লেখিত কিছুসংখ্যক নিদর্শন কিছু পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এ প্রসংগে আয়াত ২৭ ঃ ৮১ দেখা যেতে পারে।

٣٢- وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ۝

৩১ ঃ ৩২ যখন ঢেউ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে মেঘচ্ছায়ার মত তখন তারা আল্লাহ্‌কে ডাকে তাঁর অনুগত ও বিশুদ্ধ হয়ে। কিন্তু তিনি যখন তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলভূমিতে পৌছান তাদের কেউ কেউ সরল পথে থাকে: কেবল বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই তাঁর নিদর্শনাবলি অস্বীকার করে।

আয়াত নং ২৭ ঃ ৮১ এর নিচের টীকা দেখুন।

٣٤- إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

৩১ ঃ ৩৪ ক্বিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন জরায়ুতে যা আছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সব বিষয়ে অবহিত।

জরায়ুতে যা আছে তা জানা

জরায়ুর অভ্যন্তরস্থিত গর্ভাধানের বিষয়টি বিবেচনা করলে দু'জনন কোষের মিলনের ফলে সৃষ্ট বস্তু (zygote) সম্পর্কে মানুষের খুব কমই জ্ঞান রয়েছে। মানুষের অবয়ব লাভ না করা পর্যন্ত 'জাইগোট' জরায়ুর মধ্যেই অবস্থান করে। ডিম্বাণু জরায়ুতে সমৃদ্ধ হওয়ার প্রায় এক সপ্তাহ পর এই জাইগোট জরায়ুতেই থাকে এবং পরবর্তী রজঃস্রাব বন্ধ থাকে। একটি মাসিক রজঃস্রাব না হলে সাধারণত গর্ভধারণের পরীক্ষা করা হয় এবং এভাবে ডিম্বাণু নিষিক্ত হওয়ার পর প্রায় দু'সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়। মানুষের জানার বহু পূর্বেই কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা জানেন কখন গর্ভাধানের ঘটনাটি ঘটবে।

www.bjilibrary.com

আধুনিককালে মানুষ জৈব-রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে গর্ভাধানের বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে। এই পরীক্ষা pregnandiol -এর বাড়তি উৎপাদন ও নিঃসরণের উপর ভিত্তি করে সম্পাদিত হয়। এই pregnandiol হচ্ছে জরায়ুর অভ্যন্তরে corpus luteum কর্তৃক জন্মান progesterone-এর নিঃসরণকৃত ফল।

যদিও গর্ভাবস্থা সম্পর্কে বেশ কিছু আগেই নিশ্চিত হওয়া যায়, কিন্তু ভ্রূণের লিঙ্গ সম্পর্কে দীর্ঘ সময়ব্যাপী কোন কিছু জানা যায় না। গর্ভাবস্থার একেবারে শেষ পর্যায়ে জন্ম সম্বন্ধীয় কিছু গবেষণা ও জৈব রাসায়নিক পরীক্ষা ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণে সহায়তা করতে পারে, কিন্তু তাতে নিশ্চিত হওয়া কঠিন যদি না আলট্রাসোনোগ্রাফি পরীক্ষায় ভ্রূণের অবস্থান ঠিকভাবে থাকে।

যাহোক এই আয়াতে এমন দাবী করা হয়নি যে জরায়ুতে কী আছে তা মানুষ জানতে পারবে না। বরং এটাই বলা হয়েছে যে জরায়ু মধ্যস্থিত বস্তুর সঠিক জ্ঞান কেবল মাত্র এক আল্লাহ্‌র রয়েছে। এছাড়া গর্ভাধানের কিছু জটিলতা যেমন কোন আঁচিলের সৃষ্টি বা chorion epithelioma-এর উদ্ভব হওয়া এসব কিছুতে গর্ভাবস্থার পরীক্ষার ফলাফল ইতিবাচক হয়ে থাকে এবং এরূপ পরীক্ষা রোগীকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ভুল পথে চালিত করতে পারে।

٤-ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ
عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ مَا لَكُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِىٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝

৩২ ঃ ৪ আল্লাহ্ তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্গত সব কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি 'আরশে সমাসীন হন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং সাহায্যকারীও নেই; তবু কী তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

ছয় দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির বিষয়টি ৭ ঃ ৫৪ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

٥-يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ
كَانَ مِقْدَارُهُۥٓ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝

৩২ ঃ ৫ তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, অতঃপর একদিন সবকিছুই তাঁর নিকট উত্থিত হবে- যে দিনের পরিমাপ হবে তোমাদের হিসাবে হাজার বছরের সমান।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ্ যে আকাশমণ্ডলী থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করেন তা আয়াত নং ৭ ঃ ৫৪ ও ৭ ঃ ১৫৮-তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই বিশ্বজগতের সমাপ্তির প্রসংগটি পরিশিষ্ট ১ ও ২-এ আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ্র একটি দিন যে আমাদের হিসাব মতে এক হাজার বছরের সমান হবে তা ২২ ঃ ৪৭ সংখ্যক আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

একটি দিনের গণনা

আমাদের হিসাবের একটি দিন অর্থাৎ একটি পার্থিব দিন হচ্ছে পৃথিবী তার স্বীয় অক্ষের উপর একবার ঘোরার ফল। যদি অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলীর প্রতিদিনের এই একই সংজ্ঞা প্রয়োগ করা হয় তাহলে এমন অনেক গ্রহ-উপগ্রহ আছে যাদের দিন পার্থিব দিন থেকে অধিকতর অল্পকালব্যাপী এবং কোন কোন গ্রহ-উপগ্রহের দিন পার্থিব দিন থেকে দীর্ঘতর। এভাবে একটি বৃহস্পতি দিনের অর্থ হচ্ছে বৃহস্পতি গ্রহের স্বীয় অক্ষের উপর একবার ঘুরে আসার সময়কে বুঝায়। আমাদের হিসাবে দিনটির সময়ের পরিমাণ ৯.৯৬ ঘন্টা অর্থাৎ একটি পার্থিব দিনের অর্ধেকেরও কম। অন্যদিকে এই একই প্রকার সংজ্ঞা দ্বারা একটি চান্দ্র দিবস পৃথিবীর ২৭ দিনের সমান। সূর্যের নিরক্ষীয় অঞ্চলের একটি দিন পৃথিবীর ৩১ দিন; বুধ গ্রহের একদিন পৃথিবীর ৫৮ দিন; আর শুক্র গ্রহের এক দিনের সমান পৃথিবীর ২৪৩ দিন। আমাদের ছায়াপথস্থিত উজ্জ্বল নক্ষত্র মণ্ডলীর ক্ষেত্রে যে Milky Way (ছায়াপথ) রয়েছে তার ঘূর্ণন হচ্ছে পৃথিবীর এক বছরের হিসাবে ২৫ কোটি বছর। সুতরাং এটা যথার্থভাবেই বলা যেতে পারে যে আকাশমণ্ডলীতে এমন অনেক গ্রহ-নক্ষত্র রয়েছে যাদের এক দিনের ঘূর্ণনকাল আমাদের পৃথিবীর বছরের হিসাবে ১০০০ বছর। তাই, বর্তমান আয়াতে উল্লেখিত ১০০০ বছরব্যাপী দীর্ঘ সময় আক্ষরিক অর্থে ধারণা করা আদৌ কঠিন কিছু নয়। এখানে যে দীর্ঘদিনের কথা বলা হয়েছে তা একটি অতি দীর্ঘ সময়ের অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই পরবর্তী ব্যাখ্যাটিই অনেকে গ্রহণ করেছেন।

তথ্যসূত্র ঃ

1. J.C. Brandt, and S.P., Maran, New Horizon in Astronomy, W.H. Freeman and Company, San Francisco, p. 235, 1972.

٢٧- اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ
اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ ○

٧- الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۝

٨- ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ۝

٩- ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ۝

৩২ ঃ ৭-৯ তিনি (আল্লাহ্) যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সবই খুব সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন আর মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি হতে। পরে তাদের বংশধারা সৃষ্টি করেন এক নিকৃষ্ট পানি জাতীয় বস্তু থেকে। পরে তাকে সুঠাম করে গড়েছেন এবং তাতে তাঁর রুহ ফুঁকে দিয়েছেন। আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি এবং চিন্তা শক্তি (দিল) অথচ তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

প্রথম মানুষকে কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করার বিষয়টি ৬ ঃ ২ আয়াতের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এরপর মানুষের বংশধরদের যৌন মিলনের মাধ্যমে সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। এটাও ১৬ ঃ ৪ আয়াতের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। মানব শিশুর সৃষ্টির জন্য যে পানি জাতীয় বস্তুর কথা বলা হয়েছে তাহলো পুরুষের বীর্য আর নারীর ডিম্বাণু যা ডিম্বকোষ ফেটে বের হয়। এই দু'রকম জলীয় বস্তুই ইসলামের দৃষ্টিতে নাপাক বা অপবিত্র। এই কথার আসল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে তার সৃষ্টি একরকম ঘৃণিত বা নাপাক বস্তু থেকে তাই তাদের সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে তাদের অহঙ্কার ও বিদ্রোহ করা অনুচিত।

সুঠাম করে গড়া বলতে মাতৃজরায়ুতে ধীরে ধীরে নিজস্ব আকৃতিতে গড়ে উঠা বুঝায় এবং এ বিষয়টি ২৩ ঃ ১২-১৪ আয়াতগুলোর সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের শরীরে আল্লাহ্‌র রূহ ফুঁকে দেওয়ার বিষয়টি আমাদের বর্তমান জ্ঞানের সীমার বাইরে। আর শ্রবণ, দৃষ্টি ও চিন্তা শক্তির সৃষ্টি সম্পর্কে ১৬ ঃ ৭৮ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

৩২ ঃ ২৭ ওরা কী লক্ষ্য করে না, আমি উষ্ণ ভূমির উপর পানি প্রবাহিত করে তার সাহায্যে শস্য জন্মাই, যা থেকে খাবার গ্রহণ করে তাদের 'আন্‌আম' এবং তারাও। ওরা কি তবুও লক্ষ্য করবে না?

আকাশে মেঘের সৃষ্টি এবং ভূপৃষ্ঠে বৃষ্টিপাতের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আয়াত ২ ঃ ২২-এ সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। বৃষ্টিপাতের ফলে প্রত্যেক প্রকার শস্যের জন্ম সম্পর্কিত বিষয়টি আয়াত ৬ ঃ ৯৯ ও ১৬ ঃ ১১তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বৃষ্টির উপকারী ফলাফল হিসাবে ঘাস, লতাপাতার জন্ম, গবাদিপশু সম্পর্কে ২০ ঃ ৫৪ আয়াতের আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِی الْاٰخِرَةِ ؕ
وَهُوَ الْحَكِیْمُ الْخَبِیْرُ ۝

৩৪ ঃ ১ প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সব কিছুরই মালিক এবং আখিরাতেও তাঁরই প্রশংসা। তিনি প্রজ্ঞাময় এবং সর্ববিষয়ে অবহিত।

এই বিষয়টি আয়াত নং ২০ ঃ ৬-এ আলোচিত হয়েছে।

٢- یَعْلَمُ مَا یَلِجُ فِی الْاَرْضِ وَمَا یَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا یَعْرُجُ فِیْهَا ؕ
وَهُوَ الرَّحِیْمُ الْغَفُوْرُ ۝

৩৪ ঃ ২ তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে, যা তা থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত ও যা কিছু আকাশে উত্থিত হয়। তিনিই পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল।

এই আয়াতে বেশ কিছুসংখ্যক বিষয় পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যা ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তা হচ্ছে (১) পানি মাটির ভিতর দিয়ে চুঁইয়ে গিয়ে নিচে ভূগর্ভে পানির আধার সৃষ্টি করে, (২) উদ্ভিদাদির শিকড় মাটির ভিতরে গিয়ে পুষ্টি সংগ্রহ করে গাছপালাকে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রাখতে সাহায্য করে, (৩) উদ্ভিদাদি ও প্রাণীদেহ পচে গিয়ে শেষে মাটিতে মিশে যায়, (৪) মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশকারী প্রাণী তাদের বাসস্থান তৈরি করে নেয়।

মাটি থেকে যা বের হয়ে আসে তা হচ্ছে (১) মাটির মধ্যে বীজের অংকুরোদ্গম হয়ে তা মাটির উপরে পল্লবিত হয়ে উঠে; (২) পানির প্রস্রবণ যা মাটির নিচ থেকে প্রবল বেগে বাইরে বেরিয়ে আসে; (৩) গ্যাস ও খনিজ তেল

www.bjilibrary.com

যা মাটির নিচে থেকে তোলা হয়, এবং (৪) আগ্নেয়গিরি অগ্নুৎপাতের ফলে মাটির অভ্যন্তর থেকে ধোঁয়া, গরম কাদা, পাথর ও গলিত লাভা সবেগে বেরিয়ে আসে।

আকাশ থেকে নেমে আসা বস্তুর মধ্যে (১) বৃষ্টি, ঝড়-ঝঞ্ঝা ও বজ্র-বিদ্যুৎ (২) সূর্য ও নক্ষত্রমণ্ডলীর রশ্মি বিকীরণ, (৩) উল্কা ইত্যাদি। যে সমস্ত জিনিষ মাটি থেকে আকাশে উঠে যায়, তার মধ্যে রয়েছে (১) বাষ্প যা সূর্যের তাপে ভূপৃষ্ঠের পানি বাষ্প হয়ে উঠে যায়, (২) পৃথিবীতে সৃষ্ট ধোঁয়া ও গ্যাস, (৩) অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণা যা উপরের বাতাসে মিশে গিয়ে বায়ুমণ্ডলে ভাসতে থাকে, (৪) বিদ্যুৎ চুম্বকীয় ধরনের যোগাযোগ বার্তাসমূহ।

উপরিল্লিখিত বিষয়াদির অতি সূক্ষ্মতম ক্ষুদ্র অংশের পরিচয় আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞাত। তিনি এ সকল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর সংঘটনের সুনির্দিষ্ট কলা-কৌশল স্থাপন করেছেন। এটা একটা কৌতূহল উদ্দীপক বিষয় যে বিজ্ঞানধর্মী এ সকল বিষয় বা বস্তু ব্যতীত কোন জীবিত প্রাণীর সৃষ্টি, গঠন বা বেঁচে থাকা সম্ভবপর ছিল না। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য এ সকল বস্তুর যদি পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে তা স্রষ্টার অশেষ অনুগ্রহের কথাই বলবে যদিও তার মধ্যে কোন কোনটি মানুষের কৃতকর্মের জন্য শাস্তির কারণ ঘটাবে। এ সকল আয়াতের বিষয়বস্তু মানুষের জীবন চক্রের চারদিকে আবেষ্টনকৃত ও স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত সুবিধাদি সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করবে।

٣-وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۖ
لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا
أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتٰبٍ مُبِينٍ ۝

৩৪ ঃ ৩ কাফিররা বলে, 'আমাদের ক্বিয়ামত আসবে না।' বল, 'আসবেই, শপথ আমার প্রতিপালকের, নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট ক্বিয়ামত আসবে, তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁর অগোচর নয় অনুপরিমাণ কিছু; বরং এর প্রত্যেকটিই লেখা রয়েছে সুস্পষ্ট কিতাবে।

এ বিষয়টি আয়াত ১০ ঃ ৬১তে আলোচিত হয়েছে।

٩-أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ
بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ۝

www.bjilibrary.com

৩৪ ঃ ৯ তারা কী তাদের সামনে ও পিছনে আসমান ও যমিনে যা আছে তার প্রতি লক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে সহ ভূমি ধসিয়ে দেব অথবা তাদের উপর আকাশ খণ্ডের পতন ঘটাব, আল্লাহ্‌র অভিমুখী প্রতিটি বান্দার জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

এখানে আল্লাহ্ বলছেন যে, মানুষ গভীরভাবে চিন্তা করে না যে অতীতে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীতে কী ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে। পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী নিয়ে গঠিত এই বিশ্বজগতের বুঝবার বা জানার অনেক বিষয় ঘটনার অনুক্রম অনুযায়ী সার সংক্ষেপ করা যেতে পারে। আদি যুগের প্রচণ্ড অগ্নিগোলকের বিস্ফোরণের মাধ্যমে এর শুরু। এই সম্প্রসারণশীল মাধ্যমের অন্তর্গত ছায়াপথে অবস্থিত নক্ষত্রমণ্ডলী ও সবচেয়ে প্রাচীন নক্ষত্রসমূহ ১০ শত থেকে ১৫ শত কোটি বছর পূর্বে গঠিত হয়েছে। ছায়াপথটি চ্যাপ্টা হয়ে একটি চাকতি সদৃশ আকার ধারণের পর গ্যাস ও ধূলাবালির মেঘ থেকে সূর্যের ঘনীভূতকরণ সম্পন্ন হয়। প্রায় ৪৫০ কোটি বছর আগে পৃথিবীসহ সৌরজগতের গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টি হয়।

৪৫০ কোটি বছর থেকে ৬০ কোটি বছর আগের যুগকে প্রি-ক্যামব্রিয়ান (Pre-cambrian) যুগ বলে। এই যুগে পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার হয়। সর্বপ্রথম এককোষী জীবের সৃষ্টি হয়। তারপরে জন্ম নেয় অমেরুদণ্ডী প্রাণী ও সামুদ্রিক জলজ উদ্ভিদের। ৬০ কোটি বছর থেকে ২০ কোটি বছর আগের পরিব্যাপ্তি কালকে Paleozoic যুগ নামে অভিহিত করা হয়। এই যুগে প্রথম মেরুদণ্ডবিশিষ্ট মাছের জন্ম হয়। এরপর উদ্ভব হয় উভচর ও সরীসৃপ প্রাণীর। পরবর্তী যুগের নাম হচ্ছে Mesozoic যুগ। এ যুগের শুরু হয় ২০ কোটি বছর আগে এবং শেষ হয় ৬ কোটি ৫০ লক্ষ বছর আগে। এই যুগে ডাইনোসর নামক দৈত্যাকার সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী পৃথিবীতে একাধিপত্য বজায় রাখে। এই যুগের শেষভাগে ঘোড়ার ন্যায় স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব ঘটে এবং ডাইনোসর জাতীয় প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যায়। এর পরবর্তী যুগ হচ্ছে বর্তমান Cenozoic যুগ। ৬ কোটি ৫০ লক্ষ বছর আগে এ যুগের শুরু হয়। এ যুগে প্রায় এক লক্ষ বছর আগে মানব গোষ্ঠী অর্থাৎ Homo sapiens -দের আবির্ভাব ঘটে।

পৃথিবীর বর্তমান ভৌগলিক চিত্র আগের মত যেমন ছিল না তেমনি বর্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও থাকবে না। প্রায় ৫০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর কঠিন ভূত্বক সৃষ্টিকারী plate সমূহ পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ থেকে Pangaea নামক একটি মাত্র মহাদেশ গঠন করে। এই plate সমূহের গঠনিক বৈশিষ্ট্যের কারণে পৃথিবীর ভূগোল ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে এবং শেষ পর্যন্ত

www.bjilibrary.com

বর্তমান গঠন কাঠামোয় পর্যবসিত হয়েছে। Plate সমূহের বিচলনের কাজ এখনও সম্পন্ন হয়ে চলেছে এবং এখন থেকে ৫ কোটি বছর সময়ের মধ্যে পৃথিবীর বর্তমান আকৃতি ভিন্ন হয়ে যাবে। দক্ষিণ আমেরিকা উত্তর থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং আটলান্টিক মহাসাগর আরও প্রশস্ত হবে। অস্ট্রেলিয়া এশিয়ার মূল ভূখণ্ডের দিকে এগিয়ে আসবে এবং এছাড়া অন্যান্য আরও পরিবর্তন সাধিত হবে।

এটা আমাদের জানা আছে যে পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্র স্থির নয়। পৃথিবীর আয়ুষ্কাল অনুসারে চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের বিপরীতধর্মী হওয়া খুব তাড়াতাড়ি ঘটে। একবার যদি এই চৌম্বকীয় ক্ষেত্র এক বা অন্যভাবে স্থির হয়ে যায় তাহলে কমপক্ষে এক লক্ষ বছর অথবা সর্বাধিক ৫ কোটি বছর ধরে এই স্থিরতা বজায় থাকে। বর্তমানে পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্র ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়ছে। যে গতিতে দুর্বল হচ্ছে তাতে আগামী ২০০০ বছরের মধ্যে এই ক্ষেত্রটি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের কার্যকলাপের একটি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভবের কাহিনীর সাথে প্রাসঙ্গিক হতে পারে। এরূপ মত প্রকাশ করা হয়েছে যে চৌম্বকীয় ক্ষেত্র যখন দুর্বল বা অনুপস্থিত থাকে তখন মহাকাশ থেকে বর্ধিত মাত্রায় বিদ্যুতায়িত বস্তুসমূহ, মহাজাগতিক রশ্মিসমূহ ভূপৃষ্ঠে পড়ে জীবনের ক্ষতি করতে পারে। সাধারণত বিদ্যুতায়িত এ সকল বস্তু পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্র দ্বারা প্রতিহত হওয়ার ফলে পৃথিবীতে পৌঁছতে পারে না। যদি নিরাপত্তামূলক এই চৌম্বকীয় ক্ষেত্র না থাকত তাহলে ঐ সকল বিদ্যুতায়িত বস্তু সরাসরি পৃথিবীতে অথবা বায়ুমণ্ডলের নিচের স্তরে নেমে এসে জীবনের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াত। কিংবা তারা জলবায়ুর স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করত যা পৃথিবীতে জীবন ধারণকে কঠিন করে তুলত।

সূর্যের ভবিষ্যতের অবস্থার সাথে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কযুক্ত। সূর্য প্রায় ৬০০ কোটি বছর ধরে একটি নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতার মধ্যে অবস্থান করছে এবং ঐ একই অবস্থায় সূর্য অনুরূপ আর একটি পর্যায়কাল অতিক্রম করবে। তারপর এটি একটি ভয়ঙ্কর অগ্নিগোলকে রূপান্তরিত হবে। এর বহির্ভাগ বুধ ও শুক্র গ্রহকে গ্রাস করবে এবং তারপর এটি পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছবে। প্রচণ্ড তাপে সমুদ্রের পানি টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে থাকবে। ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই অঙ্গারে পরিণত হবে। (পরিশিষ্ট-২ দ্রষ্টব্য)।

সামগ্রিকভাবে নিখিল বিশ্বের ভবিষ্যৎ অবস্থার উপর পৃথিবীর টিকে থাকা নির্ভর করে। এই বিশ্বে দু'টি বিপরীতধর্মী শক্তি কাজ করছে, যেমন আণবিক বোমার যে কেন্দ্রগত অংশ থাকে তা আদিযুগীয় ভয়ংকর এক বিস্ফোরণের কারণে

www.bjilibrary.com

সম্প্রসারণশীল শক্তির উদ্ভব হয়। এই বিস্ফোরণের ফলে যে প্রচণ্ড শব্দের সৃষ্টি হয় তাকে Big Bang নামে অভিহিত করা হয় এবং দ্বিতীয়ত মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে আকর্ষণকারী শক্তির সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে সম্প্রসারণশীল শক্তি প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে এবং এর ফলে এই বিশ্ব ক্রমাগত সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। ভবিষ্যতে যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রাধান্য বিস্তার করে তাহলে এই সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া থেমে যাবে এবং তখন সংকোচণ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। আর যদি সম্প্রসারণ শক্তির বিজয় হয় তাহলে গ্রহ-নক্ষত্ররাজি ধারণকারী ছায়াপথগুলো একে অপর থেকে আরো দূরে, বহুদূরে সরে যাবে। "যদি আমি ইচ্ছা পোষণ করতাম তাহলে তাদেরকে ভূগর্ভে প্রোথিত করতাম" এ বিষয়টি ২৮ ঃ ৮১ নং আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

তাদের উপর আকাশের একটি টুকরোর পতন ঘটান

তাদের উপর আকাশের একটি টুকরোর পতন এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে আকাশে অবস্থানরত একটি বস্তুর ভূপৃষ্ঠে পতন হচ্ছে। আকাশ হচ্ছে পৃথিবীর বাইরে একটি মহাশূন্য। পৃথিবীর সবচেয়ে বাইরের স্তর হচ্ছে বায়ুমণ্ডল। এই বায়ুমণ্ডলকে আবার বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা হয়েছে। ভূপৃষ্ঠের সবচেয়ে দূরবর্তী স্তর হচ্ছে exosphere যার ৫০০ কিলোমিটার অর্থাৎ ৩০০ মাইল উচ্চতা থেকে শুরু। সেখানকার বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ভূপৃষ্ঠের চাপের $১০^{১৩}$ গুণ। এই উচ্চতার বাইরে আরও উঁচুতে বায়ুমণ্ডলীয় উপাদানসমূহ মহাশূন্যে তাদের সংখ্যায় বিরলতা ও সরে যাওয়ার কারণে পারস্পরিক সংঘর্ষের সুযোগ হারিয়ে ফেলে। অতএব এটা ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে যে মহাকাশ ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩০০ মাইল উচ্চতা থেকে শুরু হয়েছে। অতঃপর, ৩০০ মাইলেরও বাইরের কোন উচ্চতায় অবস্থানরত বস্তুকে মহাকাশের একটি টুকরো নামে অভিহিত করা যেতে পারে। কিন্তু তাই বলে শিলাপিন্ডকে আকাশের টুকরো বলা যায় না।

মহাকাশের বস্তুসমূহ বলতে গ্রহ-উপগ্রহসমূহ, নক্ষত্ররাজী, জ্যোতিষ্কমণ্ডল, ছায়াপথসমূহকে বুঝায়। মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষপথের মধ্যস্থিত বিস্তৃত বলয়ে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্রাকৃতির বস্তু সূর্যের চারদিকে অনন্তকালব্যাপী প্রদক্ষিণ করে চলেছে। মহাকাশে অবস্থানরত এ সকল বস্তু গ্রহাণু বা ক্ষুদ্রাকার গ্রহ নামে পরিচিত।

আন্তঃগ্রহগত মহাশূন্যের সর্বব্যাপী অসংখ্য শিলা ও লৌহ খণ্ড বিদ্যমান এবং তাদের অধিকাংশই সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। আর কিছুসংখ্যক সৌর জগত বহির্ভূত মহাশূন্যের গভীরতা থেকে অতি দ্রুত বেগে সৌরজগতস্থিত গ্রহ

www.bjilibrary.com

নক্ষত্রাবলির দিকে ধেয়ে চলেছে। প্রায় দশ কোটিরও অধিক এসব বস্তুখণ্ড প্রতিনিয়ত পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ছে এবং নিরবচ্ছিন্ন স্রোতের ন্যায় বায়ুমণ্ডলে প্রবাহিত হচ্ছে। যদি পৃথিবীর চারদিকে বায়ুমণ্ডলের এরূপ পুরু আবরণ না থাকত তাহলে তারা অবিরত মাটিতে পতিত হত এবং ভূপৃষ্ঠ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে চাঁদের পিঠের আকার ধারণ করত।

ভূপৃষ্ঠে পতিত এসব বস্তু উল্কাপিণ্ড নামে অভিহিত। বায়ুমণ্ডলে প্রচণ্ড ঘর্ষণজনিত কারণে যে তাপের সৃষ্টি হয় তাতে এসব উল্কাপিণ্ডের অধিকাংশই বাষ্পীভূত হয় অথবা পুড়ে গিয়ে সূক্ষ্ম ছাইকণায় পরিণত হয়। আমরা কেবল মাত্র গুটি কয়েক, সম্ভবত প্রতি ঘন্টায় অর্ধ ডজনের মত উল্কা দেখতে পাই যদি রাত্রে এককভাবে আকাশ পর্যবেক্ষণ করা যায়। অবশিষ্ট উল্কাপিণ্ড সম্পর্কে আর কখনও জানা যায় না, কারণ তারা সমুদ্রে, মরুভূমিতে অনাবাসিক অঞ্চলে গিয়ে পড়ে। আরও কারণ হচ্ছে এসব উল্কা দিনের বেলায় অথবা মেঘে ঢাকা অবস্থায় থাকে যা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না।

গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ ধরে মহাশূন্যে শত শত কোটি উল্কাপিণ্ড পরিক্রমণরত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে কোন কোন ধূমকেতু থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। পৃথিবী স্বীয় কক্ষপথ পরিক্রমণকালে যখন কোন উল্কাপিণ্ডের ঝাঁককে বিদীর্ণ করে এবং বাস্তবে এটা অহরহ ঘটে, তখন হাজার হাজার ক্ষুদ্র বস্তু অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে বায়ুমণ্ডলে প্রবল বেগে প্রবেশ করে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এর ফলে উল্কাপিণ্ডের বর্ষণ ঘটে। আধুনিককালে এর সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ হচ্ছে ১৮৩৩ সালের নভেম্বর মাসে এরূপ একটি বর্ষণের ঘটনা ঘটে যা আকাশে মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রায় আড়াই লাখ পিণ্ডসমূহ একটি নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করে। এই অবস্থানকে রশ্মি বিকীরণকারী অবস্থান নামে অভিহিত করা হয়। নক্ষত্রপুঞ্জের নামানুসারে উল্কাপাতের নামকরণ করা হয়ে থাকে এবং এই উল্কা পাতের মধ্যেই কোন একটি স্থানে রশ্মি বিকীরণকারীর অবস্থান রয়েছে বলে অনুমিত হয়। যেমন কোন কোন উল্কাপাতকে লিওনিদ, জেমিনিদ, ওরিওনিদ ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এরূপ নাম আরও রয়েছে।

কখনও কখনও অতি বৃহৎ উল্কাপিণ্ড ভূপৃষ্ঠে আঘাত হানে এবং তার ফলাফল হয় দর্শনীয়। এতবড় প্রকাণ্ড উল্কাপিণ্ডের পতনের উপর বায়ুমণ্ডলের গতি হ্রাসকারী ক্ষমতা কোন কাজে আসে না। অতএব এ সকল উল্কাপিণ্ড ভূপৃষ্ঠে প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত হেনে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের ন্যায় বিরাটাকার গর্তের সৃষ্টি করে। উত্তর

www.bjilibrary.com

আমেরিকার আরিজোনার মরুভূমিতে এরূপ একটি বিখ্যাত খাত রয়েছে। এই খাতের মুখ আড়াআড়িভাবে ১.২ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ১৭০ মিটার গভীর এবং এর আশপাশের এলাকার উপর প্রায় ৫০ মিটার উচ্চতাসম্পন্ন একটি গোলাকার বেড় তৈরি হয়েছে। প্রায় ৩০টির মত প্রমাণিত উল্কা পাত সৃষ্ট খাতের তথ্য জানা গিয়েছে। এর মধ্যে কানাডার কুইবেকে মানকোয়াগণ (Manquagon) খাতটি এত বড় যে এর মুখ প্রায় ৬০ কিলোমিটার প্রশস্ত। এভাবে আকাশমণ্ডলীর বস্তু হিসেবে পরিচিত উল্কাপিণ্ডসমূহ ভূপৃষ্ঠে যথানিয়মে পতিত হয়ে থাকে।

আকাশে অবস্থারত বস্তুসমূহের মধ্যে ধূমকেতুকেও অনুরূপ বস্তু বিবেচনা করা হয়। বিশাল সৌরজগতের মধ্যে ধূমকেতু নিতান্তই তুচ্ছ এবং তা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পরিদৃষ্ট হয়। স্বীয় কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে এটি পরিক্রমণ করে। তবে বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহমণ্ডলীর ন্যায় অনেক বেশী ভিন্নকেন্দ্রী। ধূমকেতু গ্রহমণ্ডলীর কক্ষপথের মধ্য দিয়ে অসতর্কভাবে পরিক্রমণ করে এবং অবশ্যম্ভাবীভাবে গ্রহমণ্ডলীর সাথে সময়ে সময়ে সংঘর্ষ হয়। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে এরূপ একটি ধূমকেতু পৃথিবীকে আঘাত করে। এই ধূমকেতুটি সাইবেরিয়ার আকাশে তীব্র আলো বিচ্ছুরণ করে জ্বলে যায়। তার বিস্ফোরণ ক্ষমতা এত বেশী ছিল যে হিরোশিমা ধ্বংসকারী আণবিক বোমার শক্তির ১০০০ গুণ বেশী ছিল। 'তুনগুসকা' নামে অভিহিত ঘটনাটি সম্ভবত মানব জাতির নিকট পরিচিত সর্ববৃহৎ প্রাকৃতিক বিপর্যয়। কোনরূপ পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যতিরেকেই এই বিস্ফোরণটি ১৯০৮ সালের ৩০শে জুন সকাল সোয়া সাতটায় এক আলোকিত সকালে ঘটে। ফ্রান্স ও জার্মানীর আয়তন একত্রিত করলে যে পরিমাণ দাঁড়ায় তার থেকেও বেশী বিস্তৃত একটি অঞ্চলের উপর তুনগুসকা (Tunguska) -এর বিস্ফোরণ দেখা ও শোনা গিয়েছিল। এই বিস্ফোরণের পর বেশ কয়েক রাত ধরে ইউরোপের আকাশ উজ্জ্বল আলোয় এত দীপ্তিময় হয়ে উঠেছিল যে মধ্যরাতের পর দীর্ঘক্ষণ ধরে বইপত্র পড়তে পারা যেত। এটা এখন সাধারণভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয় যে ভূপৃষ্ঠে একটি ক্ষুদ্রাকার ধূমকেতুর পতনের ফলে এ ঘটনাটির সূত্রপাত হয়েছিল।[১]

এভাবে আকাশের একটি বস্তু হিসেবে ধূমকেতু ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। উপগ্রহ, গ্রহাণু এসবই আকাশে বিচরণশীল বস্তু। এটা এখন স্বীকৃত যে কমপক্ষে একটি গ্রহাণু অতীতে ভূপৃষ্ঠে আঘাত হেনেছিল। আনুমানিক ৬ কোটি ৫০ লক্ষ বছর আগে অন্যান্য mesozoic প্রাণীর সাথে ডাইনোসর (dinosaurs) পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং এ সকল দৈত্যাকার প্রাণীর পরিবর্তে স্তন্যপায়ী প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে। ১৯৮০ সালে একজন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এক বিজ্ঞানী

www.bjilibrary.com

একদল বিজ্ঞানীসহ্ বার্কলেস্থিত ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এই নিবন্ধে তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ব্যাপকাকারে বিলুপ্তির ঘটনাটি ১০ কিলোমিটার ব্যাস বিশিষ্ট একটি গ্রহাণুর ভূপৃষ্ঠে সংঘাতের ফলে ঘটে।২ এই সংঘর্ষের ফলে এত বিপুল পরিমাণ ধূলিকণার সৃষ্টি হয় যে বায়ুস্তরে এই ধূলিকণা অতি কার্যকরভাবে কয়েক বছর ধরে সূর্যরশ্মিকে আটকে রাখে। এই সময়ে সালোক সংশ্লেষের প্রচণ্ড অবদমনের কারণে সমগ্র জীবজগতে এক মারাত্মক বিপর্যয় ঘটে। জীবমণ্ডলের খাদ্য জোগানর ধারায় ছেদ পড়ার ফলে বিভিন্ন জীবের ব্যাপকাকারে অবলুপ্তি ঘটে।

এভাবে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছানুসারে আকাশ থেকে বিভিন্ন বস্তুর অংশবিশেষ নানা আকারে ভূপৃষ্ঠে পড়ে। এটা অতীতে ঘটেছে এবং তাঁর মহান ইচ্ছানুসারে ভবিষ্যতেও অনুরূপ ঘটনার অবতারণা হতে পারে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. New Scientist, Halley's Comet issue.
2. Ibid : Death of Dinosaurs.

www.bjilibrary.com

۱۰- وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ۝

۱۱- أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ۖ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

৩৪ ঃ ১০-১১ আমি নিশ্চয় দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং আদেশ করেছিলাম, 'হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং পাখী সকলকেও, তার জন্য নমনীয় করেছিলাম লোহা যাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরি করতে এবং বুনার পরিমাণ রক্ষা করতে পার এবং তোমরা সৎকাজ কর, তোমরা যা কিছু কর আমি তার সম্যক দ্রষ্টা।

আল্লাহ্ তা'আলার রহমত ও অনুগ্রহে দাউদ (আ) লোহা দ্বারা বর্ম তৈরির কৌশল শিখেছিলেন।

ইংরেজি বিশ্বকোষ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা অনুসারে লৌহ যুগের শুরু হয় ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। লোহার প্রধান প্রধান আকরিক হচ্ছে এর অক্সাইড হেমাটাইট (oxides hematite) এফই২ (Fe2), ও৩ (O3), এবং ম্যাগনেটাইট (magnetite), এফই৩ (Fe3), ও৪(O4), কার্বোনেট (carbonate), সিডেরাইট (siderite), এফইসিও৩ (Fe Co3) এবং পানিযোজিত ফেরিক অক্সাইড (ferric oxides)। লোহার এ সকল আকরিক থেকে পানি দূর করার জন্য সাধারণত এগুলোকে তাপদগ্ধ করা হয়, আর কার্বোনেট সমূহকে মূল উপাদান থেকে আলাদা করার জন্যও এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। ধাতব পদার্থ গলানর জন্য ব্যবহৃত চুলা blast furnace নামে অভিহিত বিশেষ চুল্লীতে এই তাপদগ্ধ আকরিকসমূহকে কোক কয়লায় রূপান্তরিত করা হয়। মিশ্রিত লৌহ আকরিক, ধাতব মিশ্রণ হিসাবে ব্যবহৃত চুনাপাথর ও কোককে ব্লাস্ট ফার্নেসের একেবারে উপরে রেখে মুখ নলের মাধ্যমে ব্লাস্ট ফার্নেসের তলায় আগে থেকে উত্তপ্ত করে রাখা বাতাস দ্রুত প্রবাহিত করা হয়। এর ফলে কঠিন পদার্থসমূহ ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসার সাথে সাথে সেগুলো গ্যাস ও তরল লোহা ও ধাতুমলে রূপান্তরিত হয়। এই বের হয়ে আসা উত্তপ্ত গ্যাস ব্লাস্ট ফার্নেসের বাতাস গরম করার কাজে ব্যবহৃত হয়। গলে যাওয়া লোহা ও ধাতুমল ফার্নেসের তলদেশ থেকে বের করে নেয়া হয়।

গলে যাওয়া তরল লোহার মধ্যে সাধারণত ৩% থেকে ৪% দ্রবীভূত কার্বন থাকে, আর থাকে সিলিকন, ম্যাঙ্গানিজ, ফসফরাস ও সামান্য পরিমাণে সালফার। এরূপ অপরিষ্কৃত গলিত লোহা যদি হঠাৎ করে শীতলীকরণ করা হয়

www.bjilibrary.com

তাহলে শ্বেতবর্ণের ঢালাই লোহা পাওয়া যায় এবং এই শীতলীকরণ যদি ধীরে ধীরে করা হয় তাহলে ধূসর বর্ণের ঢালাই লোহা তৈরি হবে। এই উভয় প্রকার ঢালাই লোহা বেশ ভঙ্গুর প্রকৃতির। উপযুক্ত যৌগিকের ধূসর বর্ণের ঢালাই লোহাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ দেওয়া হলে পিটিয়ে পাতলা করা যায় এমন পাতবিশিষ্ট ঢালাই লোহা পাওয়া যায় এবং এরূপ লোহা বেশ শক্ত এবং সাদা বা ধূসর রং-এর ঢালাই লোহা থেকে কম ভঙ্গুর। এই আয়াতে এরূপ পেটান পাতলা লোহার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে এবং যুদ্ধে এ ধরনের লোহা দ্বারা নানা প্রকার আত্মরক্ষাকারী বর্ম তৈরি করা যায়। এই বিষয়টি আয়াত নং ১৬ ঃ ৮১ তে বর্ণনা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Linus Pauling, College Chemistry, Vakil, Feffer and Simons Pvt. Ltd. Bombay, 4th ed. p. 647-650, 1969.
2. Encyclopaedia Britanica, p. 894, 1978.

www.bjilibrary.com

১২- وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ۖ
وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا
نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝

১৩- يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ
رَاسِيَاتٍ ۚ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ۝

৩৪ ঃ ১২-১৩ আমি বায়ুকে সুলায়মানের অধীন করেছিলাম যা সকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং সন্ধ্যায়ও এক মাসের পথ অতিক্রম করত। আমি তার জন্য গলিত তামার এক প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছিলাম। আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে জিন্নদের মধ্যে কিছুসংখ্যক তার সামনে কাজ করত। ওদের মধ্যে যে আমার আদেশ অমান্য করে তাকে আমি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাব।

তারা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, মূর্তি, হাওযা সদৃশ বড় আকারের পাত্র এবং দৃঢ়ভাবে স্থাপিত বড় আকারের ডেগ তৈরি করত। আমি বলেছিলাম, "হে দাঊদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সাথে তোমরা কাজ করতে থাক। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ।"

নবী সুলায়মান (আ)-এর আমলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে এই দু'টি আয়াত থেকে ধারণা পাওয়া যায়। আয়াতের প্রথম অংশটিতে নবী'র (আ) বাতাসের উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। বস্তুত এটি আয়াত নং ২১ ঃ ৮১-এর পুনরাবৃত্তি মাত্র। বাইদাভী ইবনু'ল কাছির-এর ন্যায় অতি উঁচু মানের তাফসীরকারীর মতানুসারে নবী সুলায়মান (আ) এক বিরাটাকার সিংহাসনে আরোহণ করতেন এবং তাঁর নির্দেশে বাতাস তা বহন করত।১ আধুনিক ভাষ্যকারদের মতে এটা ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের আকাবা উপসাগর দিয়ে চলাচলকারী নবী'র (আ) নৌ-শক্তির প্রসংগে উল্লেখিত হয়েছে এবং প্রতীকী অর্থে তিনি বাতাসকে নির্দেশ প্রদান করতেন। এই বিষয় নবী (আ) সম্পর্কে বাইবেলে উল্লেখিত বর্ণনার মিল রয়েছে (প্রথম বাদশাহগণ ৯ ঃ ২৬,

www.bjilibrary.com

৩৪ ঃ ১৩ সংখ্যক আয়াতে দেখা যায় যে নবী সুলায়মান (আ) এর আমলে মূর্তি, বড় বড় গামলা, বয়লার প্রভৃতি গলান লোহা দিয়ে তৈরি হত। এতে স্পষ্ট হয় যে ধাতুবিদ্যা সংক্রান্ত অনেক কাজ সে আমলে সম্পাদিত হত। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে লোহিত সাগরের মুখে প্রাচীন ইজিয়ান জেবার (Ezion Geber) নামে পরিচিত আকাবা অঞ্চলে লোহা ও অন্যান্য ধাতব পদার্থের খনি ছিল এবং সে আমলে এসব ধাতুর কাজ সম্পন্ন হত। এই অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে তামা ও লোহার খনি দেখতে পাওয়া যায় এবং একটি ধাতু গলানর কারখানা খননের ফলে আবিষ্কৃত হয়। এ থেকে ধারণা করা যায় যে উত্তর দিক থেকে প্রবাহিত প্রচণ্ড বাতাসের একটি পরিপূর্ণ ঝাপটাকে যাতে ধরা যায় এবং হাপরের সাহায্যে বায়ুকে টেনে আনার অনুরূপ কোন পদ্ধতির প্রয়োজন ব্যতিরেকে জোরপূর্বক সৃষ্ট একটি প্রবল দমকা বাতাস গ্রহণের কৌশল সে আমলে বর্তমান ছিল। এই সমগ্র বিষয়টিই আধুনিক শিল্প কারখানার পদ্ধতি অনুযায়ী নির্মিত একটি সঠিক ব্লাস্ট ফার্নেস। আধুনিক শিল্প কারখানায় পূর্বের Bessemer system হিসাবে এর পুর্নজন্ম হয়। এই Fertile Crescent -এর কোথাও এমনকি ব্যাবিলন বা মিসরেও এতবড় ফার্নেস দেখা যায় না।

আমেরিকান স্কুল অব ওরিয়েন্টাল রিসার্চ-এর অধ্যাপক নেলসন গ্লুয়েক (Nelson Glueck) মধ্যপ্রাচ্যের এই অংশে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে ছিলেন। তার মতে সুলায়মান (আ) ছিলেন একজন বিখ্যাত তামা বিশেষজ্ঞ বাদশাহ এবং খুব সম্ভবত প্রাচীন পৃথিবীতে সে আমলে বড় বড় তামা রপ্তানীকারকদের মধ্যে তার পরিচিতি ছিল। একটি বিষয় স্পষ্ট যে সুলায়মান (আ)-এর অধীনে খনি থেকে লোহা ও তামা বিপুল পরিমাণে আহরিত এবং বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে গলান হত। যাহোক, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে লোহা ও তামা গলানর জন্য সে সময়ে কোন যন্ত্রকৌশল উদ্ভাবিত হয়েছিল এবং এজন্য সৃষ্ট খুবই উত্তপ্ত বাতাস নিয়ন্ত্রণও করা হত। এই গরম বাতাস কোন কৌশল উদ্ভাবন করে বেলুন তৈরির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারত।

ইতিহাসে দেখা যায় যে ১৭৮৩ সালে Montgolflier ভ্রাতৃবর্গ গরম বাতাসের সাহায্যে বেলুন ওড়ানোর কৌশল প্রথম উদ্ভাবন করেন। বর্তমানে গ্যাসের সাহায্যে উপরে উঠার কাজটি প্রধানত হিলিয়াম গ্যাস দ্বারা সম্পাদিত হয়। বর্তমানে দু'ধরনের বেলুন রয়েছে মুক্ত ও আবদ্ধ। আবদ্ধ বেলুনকে সামরিক প্রয়োজনে অথবা আগুনকে নিয়ন্ত্রণে আনার কাজে ব্যবহৃত হয়। ভূপৃষ্ঠ ছাড়িয়ে দশ থেকে ষাট কিলোমিটার উর্ধ্বের আকাশ অর্থাৎ আন্তর আকাশ

www.bjilibrary.com

(stratosphere)-এর মহাজাগতিক রশ্মি ও বায়ুমণ্ডলের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য এই আন্তর আকাশে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে মুক্ত বেলুন ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের বেলুন প্রায় ৭০,০০০ ফুটের ওপর উঠতে পারে। বেলুন বাতাসের সাহায্যে ভেসে বেড়ায় এবং এর মধ্যে স্থাপিত ব্যালাস্ট মুক্ত করে দেওয়ার প্রেক্ষিতে উপরে উঠে যেতে পারে, আবার ভাল্ব খুলে দিয়ে গ্যাস ছেড়ে দিলে নিচে নেমে আসে। দক্ষতা ও আবহাওয়ার চমৎকার সংযোজন ঘটলে এরূপ বেলুনে চড়ে ১০০০ মাইলেরও বেশী পথ সহজে পরিক্রমণ করা যায়। এটা অসম্ভব কোন ব্যাপার নয় যে নবী সুলায়মান (আ)-এর আমলে এরূপ কোন বেলুন উদ্ভাবিত হয়ে থাকতে পারে যা আকাশে দীর্ঘ দূরত্বের পথ পাড়ি দিতে পারত।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Muhammad, Shafi, Mariful Quran, Vol, p 254, 1983.
2. A Yusuf Ali, The Holy Quran-Text, Translation and commentary, Sheik Mohammad Ashraf, Lahore, 2nd Ed. p. 1137, 1977.

www.bjilibrary.com

١٦- فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ○

৩৪ ঃ ১৬ পরে তারা আদেশ অমান্য করল। ফলে আমি তাদের উপর বাঁধ ভাঙ্গা বন্যা প্রবাহিত করলাম এবং তাদের উদ্যান দু'টিকে এমন দু'টি উদ্যানে পরিবর্তন করে দিলাম যাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউগাছ ও কিছু কুল গাছ।

এই আয়াতের ঠিক পূর্ববর্তী আয়াতে ইয়েমেন-এর সাবা নগরীর প্রসংগে আলোচিত হয়েছে। সেখানে মা'আরিব নামক বিখ্যাত বাঁধ দিয়ে সেচের ফলে প্রচুর পরিমাণে ফসল, বাগানে নানাবিধ ফলমূল, মশলা, গুগগুল, ধুনা প্রভৃতি জন্মে এবং ইয়েমেন সম্পদশালী হয়ে ওঠে। হযরত সুলায়মান (আ) ও রানী বিলকিস-এর আমলে এই ঘটনা সংঘটিত হয়।১ শ্রীবৃদ্ধিশালীর এই আমল সুলায়মান (আ)-এর ইন্তেকালের পরেও বর্তমান থাকে। কিন্তু সাবা নগরীর জনগণ এই প্রাচুর্যের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার পরিবর্তে তাঁর নির্দেশিত পথ থেকে সরে এসে বেইমানী করে। ফলে মা'আরিব বাঁধ ভেঙ্গে বন্যার আকারে তাদের উপর আল্লাহ্র ক্রোধ নেমে আসে। বাঁধটি ধ্বংস হওয়ার কারণে নিয়মিত সেচের কাজ ব্যাহত হয় এবং ঐ এলাকায় খরা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। রসাল ফলমূলে পূর্ণ একদা সমৃদ্ধশালী বাগানগুলো ক্রমান্বয়ে শুকিয়ে গিয়ে মরুময় হয়ে ওঠে এবং মরুভূমির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ঝোপ-ঝাড় ও কাটা গাছের সৃষ্টি হয়। এরূপ মরুময় অবস্থায় জন্মানো দু'টি গাছের উদাহরণ এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে; গাছ দু'টি হচ্ছে- চিরহরিৎ ঝাউগাছ ও কাটাযুক্ত কুল গাছ। ঝাউ গাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুষ্ক অভক্ষণযোগ্য ফল জন্মে। আর Zizyphus গোত্রের কুল গাছ তার কাটাযুক্ত ঝোপের জন্য কুখ্যাত, এই গাছ কোন ছায়া দেয় না এবং মানুষের খাওয়ার অনুপযোগী তিক্ত কষাযুক্ত ফল উৎপাদিত হয়।

তথ্যসূত্র ঃ

1. A. Y. Ali, The Holy Quran-Text, Translation and Commentary, Sheikh Mohammad Ashraf, Lahore, p. 1138 (1938).

www.bjilibrary.com

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۭ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاۗءُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৩৫ ঃ ১ প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্রই যিনি ফেরেশতাদের বাণীবাহক করেন যারা দুই দুই, তিন তিন অথবা চার চার পক্ষ বিশিষ্ট। তিনি তাঁর সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি বিষয়ে সবিস্তারে পরিশিষ্ট-২ এ আলোচনা করা হয়েছে।

٣- يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۭ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاۗءِ وَالْاَرْضِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ڮ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○

৩৫ ঃ ৩ হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ্ ব্যতীত কি কোন স্রষ্টা আছে যে তোমাদেরকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী থেকে জীবনোপকরণ দান করে? তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত হচ্ছো?

আকাশমণ্ডলী অথবা পৃথিবী থেকে জীবনোপকরণ সরবরাহ করা হয় তা আয়াত ১৫ ঃ ২১-এ আলোচিত হয়েছে।

٩- وَاللّٰهُ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ○

৩৫ ঃ ৯ আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করে তা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চালিত করেন। অতঃপর আমি তা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর আমি তা দ্বারা ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি। পুনরুত্থান এভাবেই হবে।

আকাশ থেকে বৃষ্টিপাতের বিষয়টি আয়াত ২ ঃ ২২-এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

١١- وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ۭ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ۭ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ۭ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَي اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

৩৫ ঃ ১১ আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, পরে জলীয় পদার্থ (নুৎফা) হতে, পরে তোমাদেরকে জোড়া বানিয়ে দিয়েছেন।

www.bjilibrary.com

কোন নারী আল্লাহর জ্ঞাতসারে ছাড়া গর্ভধারণ করে না বা সন্তান প্রসব করে না। বয়স্ক ব্যক্তি যখন বৃদ্ধ হয় অথবা কোন ব্যক্তির বয়সহ্রাস লাভ করে এ সবই একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে, এবং আল্লাহর জন্য এটা খুবই সহজ।

মাটি থেকে এবং শুক্র বা নুৎফা থেকে মানব সৃষ্টির বিষয়টি ১৬ ঃ ৪ এবং ১৮ ঃ ৩৭ আয়াতদ্বয়ের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। নারী পুরুষ এর জোড়া সৃষ্টি মানুষের ক্ষমতার বাইরে। বর্তমানকালে মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে গর্ভস্থ সন্তান একটু বড় হলে ছেলে না মেয়ে তা জানতে সক্ষম। কিন্তু সন্তান ছেলে বা মেয়ে হোক এ বিষয়ে কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই। জোড়া সম্পর্কে বলা যায় যে আল্লাহ্ পুরুষের নুৎফা বা বীর্যে যে শুক্রকীট সৃষ্টি করেন তা জোড়ায় জোড়ায় থাকে অর্থাৎ শুক্রকীট সমূহের অর্দ্ধেক পুরুষ (২৩Y ক্রোমোজম) এবং অর্দ্ধেক নারী (23X)। যদি 23Y শুক্রকীট ডিম্বকে সমৃদ্ধ (fertilise) করে তবে সন্তান মেয়ে আর যদি শুক্রকীট ২৩Y হয় তবে সন্তান ছেলে হবে। এতে বাবা-মা বা অন্য কারোর কোন হাত নেই।

এ ছাড়া মায়ের গর্ভের সন্তান সুস্থ ও স্বাভাবিক অথবা ত্রুটিযুক্ত হতে পারে। আর কোন মা জীবিত সন্তান প্রসব করে, আবার কেউ মৃত সন্তান বা ত্রুটিযুক্ত সন্তান প্রসব করে অথবা কারো সন্তান গর্ভপাতের মাধ্যমে নষ্ট হয়। এসবই আল্লাহ্র জ্ঞানের মধ্যে মানুষ অনেক পরে তা জানতে পারে। এই বিষয়ে পরিশিষ্ট-৫ এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষের বয়স কত হবে এ বিষয়েও একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ তা জানে না।

١٢- وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرٰنِ ۖ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۖ
وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ
فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

৩৫ ঃ ১২ সমুদ্র দু'টি একরূপ নয়- একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটির পানি লোনা, খর। প্রত্যেকটি থেকে তোমরা তাজা গোশত আহার কর এবং অলংকার যা তোমরা পর এবং রত্নসমূহ আহরণ কর এবং তোমরা দেখ তার বুক চিরে জাহাজ চলাচল করে যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

www.bjilibrary.com

প্রবাহিত পানির দু'টি ধরন রয়েছে। এটা ২৫ ঃ ৫৩ সংখ্যক আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। আয়াত নং ১৬ ঃ ১৪তে গোশত, টাটকা ও নরম এবং সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

١٣- يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
كُلٌّ يَّجْرِيْ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ
دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ○

৩৫ ঃ ১৩ তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করান এবং দিনকে প্রবিষ্ট করান রাতে, তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করেছেন নিয়ন্ত্রিত; প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিপালক। সার্বভৌমত্ব তাঁরই। এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারাতো খেজুরের আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয়।

দিনের মধ্যে রাত ও রাতের মধ্যে দিনকে অন্তর্ভুক্ত করানোর বিষয়টি আয়াত ৩ ঃ ২৭-এ আলোচিত হয়েছে। সূর্য ও চন্দ্রকে একটি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে পরিচালিত করার বিষয়টি আয়াত ৭ ঃ ৫৪-এ আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব ৫ ঃ ১৯ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

٢٧- اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا
وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ ○

৩৫ ঃ ২৭ তুমি কী দেখনা আল্লাহ্ আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত করেন এবং আমি তা দ্বারা বিচিত্র বর্ণের ফলমূল উদ্ভূত করি। পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের পথ- সাদা, লাল ও নিকষ কাল।

এই আয়াতে প্রকৃতির ৩টি নিদর্শনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যথা (১) আকাশ থেকে নিচে বৃষ্টি প্রেরণ, (২) বিভিন্ন রং ও বর্ণের ফলের উৎপাদন, এবং (৩) পাহাড়ে রং-এর নানা বৈচিত্র্য।

(১) আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত

আকাশ থেকে ভারি বর্ষণ এবং গাছপালার উপর এর মঙ্গলজনক প্রভাব সম্পর্কে ২ ঃ ২২ সংখ্যক আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

(২) নানা বর্ণের ফলের উৎপাদন

জীবতাত্ত্বিক ঘটনাবলির ধারাবাহিকতার সূচনা হয় বৃষ্টিপাতের মধ্য দিয়ে, আর সমাপ্তি ঘটে ফলের উৎপাদনের সাথে। অপক্ব ফল-ফলাদির রং প্রায়ই সবুজ হয় এবং না পাকা পর্যন্ত পাখ-পাখালি, স্তন্যপায়ী প্রাণী ও পোকা-মাকড়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গাছের সবুজ পাতার নিচে লুকিয়ে থাকে। ফল পাকতে থাকলে রং-এর পরিবর্তন ঘটে এবং নানা ধরনের প্রাণী ও পাখীদের আকর্ষণের এটা একটা কৌশলও বটে। তারা পেকে যাওয়া ফলের বীজকে নানাদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। পাকা ফলের হলুদ বর্ণ থেকে লাল রং-এর উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করার জন্য এক ধরনের পিঙ্গল বর্ণের পদার্থ দায়ী। একে ক্যারোটিন বলে। আবার এ্যানথোসায়ানিন (anthocyanin)-এর প্রভাবে ধূসর বর্ণ থেকে বেগুনি, লাল অথবা নীল রং-এ পরিবর্তন ঘটে। যদিও আরবী "সামারাত" শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে ফল-ফলাদি, তবুও এর অর্থ সকল খাদ্যশস্য বিশেষ করে সকালের খাবারের বেলাতেও প্রযোজ্য হয়। প্রাতঃরাশে যে খাবার খাওয়া হয় তা গর্ভাধানের ফলে সৃষ্ট ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। ডালকেও বীজ বলা যেতে পারে অথবা অন্যভাবে ফলের অংশ বিশেষ হিসেবে গণ্য করা যায় এবং বৃহত্তর ভাবধারায় আরবী "সামারাত"কে যদি ফল হিসেবে মেনে নেওয়া হয় তাহলে ডালও ফলের অংশ বিশেষের পর্যায়ে পড়ে।

সংজ্ঞা যাই হোক না কেন ফলের রং-এর নানা রূপ বৈচিত্র্য এতই স্পষ্ট যে আমরা তা অবহেলা করতে পারি না এবং এসব কিছু মানুষ ও জীবজন্তুর জন্য আল্লাহর তরফ থেকে উদার দানশীলতা ভিন্ন আর কিছু নয়।

(৩) পাহাড়-পর্বতাদিতে নানান রং-এর বৈচিত্র্য

নানান ধরনের পাথর দিয়ে গঠিত পাহাড়সমূহে রং-এর বৈচিত্র্য দেখা যায় এবং এটা নির্ভর করে তাদের উৎপত্তির ধরনের উপর। অনেক প্রকৃতিবিদের চোখে এটা বেশ মনোরঞ্জনকর। অসংখ্য সামুদ্রিক প্রাণীর দেহাবশেষ দ্বারা আংশিকভাবে গঠিত পর্বতমালার ডলোমাইট (dolomites— এক ধরনের খনিজ পদার্থ), চুনা পাথর, ও খড়িমাটি প্রভৃতির রং সাদা ও ধূসর। মার্বেল পাথর সাধারণত সাদা থেকে ধূসর বর্ণের হয়ে থাকে। এরূপ পাথরের মধ্যে শিরা-উপশিরার ন্যায় কাল রং-এর দাগ দিয়ে যে অপূর্ব নকশার সৃষ্টি হয় তা দেখতে খুবই মনোমুগ্ধকর হয়। এক প্রকার কর্বুরবর্ণ প্রস্তর বা মনি লাল ও সবুজ রং-এর স্ফটিকের ন্যায় শোভা পায়। ল্যাট্যারাইট (laterite) পাথর লাল বর্ণের এবং আগ্নেয়শিলা হচ্ছে কাল ধূসর থেকে কাল বর্ণের। পক্ষান্তরে চকমকি পাথরের রং হচ্ছে ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের। গ্যালেনা (galena) পাথরে রয়েছে সীসার

www.bjilibrary.com

গন্ধক মিশ্রণ যা থেকে নীলাভ ধূসর রং বের হয়ে আসে। Fluorspar -এর সবুজাভ রং ক্যালসিয়াম ফ্লুওরাইড-এর উপস্থিতির কারণে হয়ে থাকে। বক্সাইটের (bauxite) মধ্যে এ্যালুমিনিয়াম রয়েছে। এই এ্যালুমিনিয়ামে নানা মাত্রায় লোহা, সিলিকন অথবা টাইটানিয়ামের অকসাইড মিশ্রণ রয়েছে এবং এসব পাথরের রং সাদা থেকে লাল রং-এর মধ্যে গাঢ় বাদামী হয়ে থাকে।

পাহাড়-পর্বতাদির পাথরের মধ্যে রং-এর এই বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যে কয়েকটি উদাহরণের উল্লেখ করা গেল মাত্র। পাথরের এরূপ নানা রং-এর পদার্থগত ও রাসায়নিক গঠন প্রণালীর কারণে হয়ে থাকে। এবং এসবই আল্লাহ্র সৃষ্টিতে আড়ম্বরপূর্ণ রং-এর অংশ হিসেবে অবদান রেখে চলেছে।

٢٨- وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ
عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ○

৩৫ ঃ ২৮ এভাবে রং বেরং-এর মানুষ, জন্তু ও আন'আম রয়েছে। আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই আল্লাহ্কে ভয় করে; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

পূর্ববর্তী আয়াতে নানা রং-এর বৈচিত্র্যের মূল ভাবটি এই আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু এই আয়াতের বিষয়বস্তু হচ্ছে মানুষ, সরীসৃপ ও গবাদিপশু। মানব শরীরের বহিরাবরণে রং-এর যে বিভিন্নতা রয়েছে তা আয়াত ২ ঃ ২১৩ তে আলোচনা করা হয়েছে।

আরবী শব্দ 'দাওয়াব্ব' মূল ধাতু 'দাব' থেকে এসেছে। এর অর্থ হামাগুড়ি দেওয়া বা বুকে হাঁটা[১], বুকে হাঁটে যে সব প্রাণী একে সে অর্থে ব্যবহার করা হয় যার অর্থ সকল শ্রেণীর সরীসৃপ। এ সকল সরীসৃপ নানান বর্ণের হয় এবং গিরগিটির ন্যায় তাদের কোন কোনটি চামড়ার রং বাদামী থেকে সবুজ বা লাল বর্ণে পরিবর্তন করতে পারে। চামড়ার রং পরিবর্তনের বিষয়টি তারা চারপাশের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেয়। সরীসৃপের মধ্যে সবচেয়ে বর্ণবহুল শ্রেণীটি হচ্ছে সাপ। এদের রং ঘন কাল থেকে সবচেয়ে দর্শনীয় সবুজ, হলুদ বা বাদামী হয়ে থাকে। তাছাড়া এদের চামড়া বহুবর্ণে চিত্র-বিচিত্র কিংবা অন্যান্য উজ্জ্বল রং-এর সাথে ফুটকিও দেওয়া হয়। সরীসৃপের এ সকল বিচিত্র রং তাদেরকে শিকারীদের হাত থেকে রক্ষা করে এবং নিজেরা শিকার ধরার সময় লুকিয়ে থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট গহীন অরণ্যের ভাইপার বা বিষধর সাপের রং সবুজ, মরুভূমির মহাবিষধর সাপ দেখতে হলুদাভ

www.bjilibrary.com

বাদামী এবং ঝোপ জঙ্গলের কেউটে সাপ কাল-বাদামী থেকে কাল। এ সকল সাপ যেখানে বাস করে তার চারপাশের রং-এর সাথে এরা মানিয়ে চলে ফলে সহজে চেনা যায় না।

'আন'আম' শব্দটির অর্থ গবাদি পশু যার মধ্যে গাভী, ষাঁড়, মহিষ রয়েছে। কিন্তু ব্যাপক অর্থে গৃহপালিত পশুকে বুঝায় যাদের কাছ থেকে দুধ, গোশত, চামড়া ও পশম আহরণ করা যায়। মহিষের রং সাধারণত কাল হয়। কিন্তু গরু, ষাড়ের চামড়ার রং নানা রকমের হয় যেমন সম্পূর্ণ সাদা থেকে সম্পূর্ণ বাদামী এবং কাল ও ঘন বাদামী রং-এর ছোপ ছোপ পড়তেও দেখা যায়। ঘোড়া, উট, ছাগল ও ভেড়ার রং-এও বৈচিত্র্য রয়েছে এবং এটা নির্ভর করে তাদের জাতির উপর। গবাদি পশুর জাতিগত বৈশিষ্ট্যসহ এ সকল নানা ধরনের বর্ণ তাদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা করে চিনতে সাহায্য করে এবং তারা মানব সমাজকে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে সেবা প্রদান করে।

বস্তু জগত ও জীব জগতে রং-এর বৈচিত্র্য আমাদের সকলের নিকট প্রকাশ্য ও স্পষ্ট, কিন্তু একমাত্র জ্ঞানী লোকেরাই তা উপলব্ধি করতে পারে এবং আল্লাহ্ তা'আলার মহাবিচক্ষণতাকে অনুধাবন করতে পারে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. F. Steingass, Arabic-English Dictionary, Cosmo Publications, New Delhi, India, p. 351, 1884, reprint 1982.

www.bjilibrary.com

٤١- إِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَا
إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ ۚ إِنَّهٗ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ○

৩৫ ঃ ৪১ আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়, তারা স্থানচ্যুত হলে তিনি ছাড়া কে তাদেরকে সংরক্ষণ করবে? তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ন।

আল্লাহ্ তা'আলা যে আসমান যমিনে সকল প্রাণী ও জড় বস্তুর সংরক্ষক তা আয়াত ১ ঃ ২ এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

٤٤- أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا
فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهٗ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ○

৩৫ ঃ ৪৪ এরা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি? তাহলে এদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল তা দেখতে পেত। ওরা তো এদের চেয়ে অধিকতর বলশালী ছিল। আল্লাহ্ এমন নন যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কোন কিছুই তাকে অক্ষম করতে পারে, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

এটি একটি সাধারণ পর্যবেক্ষণ যে জনগণকে জিজ্ঞাসা করা কে নবীর বাণী শ্রবণ করবে না এবং কুরআনকে মেনে চলবে না? তাদেরকে পরিভ্রমণ করতে হবে এবং দেখতে হবে যে আল্লাহ্র আদেশ অমান্যকারী শক্তিশালী 'আদ ও ছামূদ গোত্রের দশা কী হয়েছিল। এ বিষয়টি আয়াত ৩ ঃ ১৩৭-এ আলোচিত হয়েছে।

١٢- إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَاٰثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنٰهُ
فِيٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ ○

৩৬ ঃ ১২ আমিই মৃতকে করি জীবিত এবং লিখে রাখি যা তারা আগে প্রেরণ করে ও যা তারা পিছনে রেখে যায়, আমি প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।

সব জিনিসের লিপিবদ্ধকরণের বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হলে যদি সকল জিনিস বলতে সকল ঘটনাকেই বুঝান হয় তাহলে এই আয়াতটি বিজ্ঞানের

www.bjilibrary.com

দৃষ্টিকোণ থেকে একটি চমৎকার ব্যাখ্যা প্রদান করে। একটি ঘটনা কোন একটি বা একাধিক বিষয়ের নির্দিষ্ট অবস্থার সদৃশ বা যুক্ত হয়। এরূপ অবস্থা সেই বিষয়ের সমন্বয় ও প্রেরণার নির্দিষ্ট মূল্যবোধ দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়। এই মূল্যবোধ যেহেতু পরিবর্তিত হয় তাই সেই বিষয়ের অবস্থারও পরিবর্তন সাধিত হয়। একটি বলের মাটিতে পড়া একটি ঘটনা, কিন্তু এই ঘটনাটি অর্থাৎ বলের মাটিতে পতনের পূর্বে বলের একাধিক ক্রমান্বয় পরিবর্তন ও গতিবেগ দ্বারা বিশিষ্টতা লাভ করে। একটি ইলেকট্রনের একটি পরিক্রমণ পথ থেকে আরেকটি পরিক্রমণ পথে লাফিয়ে যাওয়া একটি ঘটনা। আণুবীক্ষণিক জগতে ঘটা এই ঘটনাটি ইলেক্ট্রনের অবস্থান ও গতিবেগের ধারাবাহিকতাহীন (অর্থাৎ হঠাৎ অথবা ঝাকুনিযুক্ত) পরিবর্তন দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়। যখন একটি শুক্রাণু একটি স্ত্রী ডিম্বকোষের সাথে মিলিত হয়ে জাইগোট (zyzote— দুই জনন কোষের মিলনের ফলে উৎপন্নকৃত) গঠন করে তখন এই জাইগোট একটি ক্রমান্বয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় এবং শিশু জন্মগ্রহণ না করা পর্যন্ত এই পরিবর্তনের ধারা বজায় থাকে। ক্রমান্বয়ে পরিবর্তনের এসব কিছুকেই একটি পর্যায়ক্রমিক অবস্থা হিসেবে অভিহিত করা হয়। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে একটি ক্রমান্বয়িক ঘটনাবলি মাতৃজনন কোষে জাইগোটের বিভিন্ন অংশের অবস্থান ও গতিবেগের ধারাবাহিক পরিবর্তন দ্বারা বিশিষ্টতা দান করা হচ্ছে। এরূপ পরিবর্তনের সংখ্যা সংখ্যাতীত ভাবে বিশাল। অতঃপর প্রশ্ন উঠতে পারে যে গণনার অতীত এ সব ঘটনাবলি কিভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখা সম্ভব? এমনকি যদি আণুবীক্ষণিক পর্যায়ে এ সকল পরিবর্তনের একটি হিসাব রাখতে সক্ষম হইও তবুও সকল ঘটনার খুঁটিনাটি হিসাবের জন্য বিশালায়তনের জায়গার প্রয়োজন হবে। এ প্রসংগে কম্পিউটার যন্ত্রের ক্রমোন্নতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে যা আমরা চার দশক ধরে দেখে আসছি। গোড়ার দিকের বৈদ্যুতিক কম্পিউটারসমূহে ভাল্ব ব্যবহার করা হত, কিন্তু পরবর্তীকালে ব্যবহৃত হয় ট্রানজিস্টর। ট্রানজিস্টর আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে অণুপরিমাণ বিদ্যুৎ পরমাণুর (microelectrons) উন্নয়ন কল্পনাতীতভাবে দ্রুত হয়েছে। ভাল্ব, ট্রানজিস্টর, সমন্বিত সার্কিট (Integrated Circuits-IC), ব্যাপকাকার সমন্বয় (Large Scale Integration-LSI) এবং খুবই ব্যাপক সমন্বয়ন (Very Large Scale Integration-VLSI) ইত্যাদি হচ্ছে মাইক্রো ইলেকট্রোনিক বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়। বর্তমানে অতি ক্ষুদ্রাকার প্রতিরূপের অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌছেছে যে, ১″×১″ আয়তন বিশিষ্ট জায়গায় ১০ লক্ষেরও অধিক বৈদ্যুতিক উপাদানসমূহ সংযোজন করা যায়। একটি মাইক্রো প্রসেসর-এর আকার একটি ডাক টিকেটের আয়তনের সমপর্যায়ে পর্যবসিত হয়েছে। ষাটের দশকের গোড়ার দিকের বড় আকারের একটি কম্পিউটার যে

www.bjilibrary.com

কাজ করতে পারত তা এখন একটি পকেট আকারের ক্যালকুলেটর করতে পারে। এভাবে কম্পিউটারের আকার ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে আসছে, কিন্তু তাদের ধারণ ক্ষমতা ও গতি বেড়ে চলেছে। খোদাই করা বিদ্যার ক্ষেত্রে কারিগরি দক্ষতা এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, একশত বছর আয়ু বিশিষ্ট একজন ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় যত কথা বলবে হাতের তালু থেকে ক্ষুদ্রতর একটি চাকতির মধ্যে তা সংরক্ষণ করা যাবে। শব্দ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে উচ্চারিত শব্দসমূহকে ঘটনাবলি বলা যায় এবং তা যেমন সংরক্ষণ করা যায় তেমনি পরবর্তী সময়ে পুনর্গঠনও করা যায়।

এই প্রসংগে যে বিষয়ের উপর দৃষ্টি দেওয়া যায় তা হচ্ছে যদি আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিনিধি হিসাবে মানুষ এতবেশি কারিগরী দক্ষতা অর্জন করতে পারে যা একটি অতি ক্ষুদ্র আয়তনে লক্ষ লক্ষ ঘটনাবলি সংরক্ষণ করা যায় তাহলে মানুষের স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁর অপরিসীম জ্ঞান ও ক্ষমতাবলে সব জিনিসের রেকর্ড কেন রাখতে পারবেন না? তবে এটা ঠিক যে সমস্ত তথ্য সংরক্ষণে আল্লাহর কৌশল সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। কিন্তু তথ্য সংরক্ষণে ক্রমান্বয় অগ্রগতির দিকে তাকালে আমরা মাইক্রোইলেকট্রনের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক উন্নয়ন প্রত্যক্ষ করি যা চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে কল্পনাতীত ছিল এবং সে সময় ট্রানজিস্টর আবিষ্কৃত হয়নি। তথ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক্সের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সম্ভবত অধিকতর নাটকীয় পরিবর্তন আনতে পারে এবং এরূপ উন্নয়নের অধিকতর অগ্রগতি মানুষকে বর্তমান আয়াতের একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত করতে পারবে।

٣١- اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ○

৩৬ ঃ ৩১ তারা কী দেখে নাই তাদের পূর্বে আমরা কত জাতিকে ধ্বংস করেছি তারপর তারা আর তাদের নিকট ফিরে আসে নি।

এ বিষয়টি ৭ ঃ৪ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

٣٣- وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۖ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ○

٣٤- وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ○

৩৫ ঃ ৩৩-৩৪ এই লোকদের জন্য নিষ্প্রাণ যমিন একটি নিদর্শন বিশেষ। আমরা একে জীবন্ত করি, তা হতে ফসল উৎপন্ন করি যা এরা খেয়ে থাকে। আমরা তাতে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান তৈরি করি এবং তা হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করি।

www.bjilibrary.com

মৃত যমিনকে জীবন্ত করার বিষয়টি ২ ঃ ১৬৪ আয়াতে, খাদ্য উৎপাদন, খেজুর ও আঙ্গুর বাগান সৃষ্টির বিষয়টি ৬ ঃ ৯৯ আয়াতে এবং ঝর্ণাধারা সৃষ্টির কথা ২ ঃ ৬০ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

٣٦- سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৩৬ ঃ ৩৬ পবিত্র মহান সেই সত্তা, যিনি সব রকমের জোড়া পয়দা করেছেন, তা যমিনের উদ্ভিদেই হোক অথবা মানব জাতির মধ্যেই হোক অথবা সেইসব সম্পর্কে যা তারা এখনও জানে না।

প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের মধ্যে জোড়া সৃষ্টির বিষয়টি ১৩ ঃ ৩ আয়াতে বলা হয়েছে। এখানে মানুষের মধ্যে নর-নারী সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। মানুষের পুরুষ বা নারী সন্তান সৃষ্টির ব্যাপারে কোন হাত নাই এবং সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণকারী একমাত্র আল্লাহ্। এ বিষয়ে ৪ ঃ ১ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এই সঙ্গে ৫৩ ঃ ৪৫-৪৬ আয়াতদ্বয়ের আলোচনাও প্রাসঙ্গিক।

٣٧- وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ۝

৩৬ ঃ ৩৭ ওদের জন্য এক নিদর্শন রাত, তা থেকে আমি দিনের সৃষ্টি করি। এবং দেখ তাদেরকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করি।

একটি নির্দিষ্ট স্থানে দিগন্তের উপরে সূর্য যে সময়ে অবস্থান করে তা হচ্ছে সেখানকার দিনের সময়। পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে দিন অপসারিত হয়, তখন সূর্য দিগন্তের নিচে নেমে যায় এবং দৃষ্টির আড়াল হয়ে পড়ে। তখন সেখানে রাতের সূচনা হয়, আর সে স্থানটি অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। দিন ও রাতের এই বিষয়টি ৩ ঃ ২৭ নং আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

٣٨- وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۭ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝

৩৬ ঃ ৩৮ এবং সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, তা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণে।

এই বিষয়টি আয়াত ৭ ঃ ৫৪-এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

৩৯. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ۝

৩৬ ঃ ৩৯ এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনজিল; অবশেষে তা শুকনো বাঁকা, পুরনো খেজুর ডালের আকার ধারণ করে।

সময় পরিমাপের মাধ্যম হিসেবে চাঁদের আলোচনা আয়াত নং ১০ ঃ ৫-এ করা হয়েছে।

৪০. لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ۝

৩৬ ঃ ৪০ সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটে।

সূর্য কর্তৃক চাঁদকে আঁকড়িয়ে ধরা

দু'টি বস্তু যখন একত্রে থাকে অর্থাৎ একই অবস্থানে বিদ্যমান হয় তখন একে অপরকে আঁকড়িয়ে ধরা বলে। সমশ্রেণীভুক্ত বস্তু যখন একই অবস্থানে থাকে তখন গণিত শাস্ত্রানুযায়ী দু'টি বস্তুর একই অবস্থান বুঝায়। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তিন প্রকার সম-শ্রেণীভুক্ত বস্তুর প্রচলন রয়েছে ঃ উচ্চতা-দিগ্বলয়, আকাশের মহাবিস্তার–দৈর্ঘ্য এবং সঠিক আরোহণ ও ক্রম নিম্নগমন। উচ্চতা দিগ্বলয় হচ্ছে স্থানীয় স্থানাংক অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে যেমন দেখা যায়। এক স্থান থেকে দেখা হলে দু'টি বস্তুর একই উচ্চতা-দিগ্বলয় থাকতে পারে। কিন্তু অন্যান্য স্থান থেকে দেখলে সমশ্রেণীভুক্ত এ সকল বস্তুকে সাধারণত ভিন্ন ভিন্ন হিসাবে দেখা যায়। যদিও আকাশের মহাবিস্তার ও দৈর্ঘ্য বিশ্বজনীন, হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা ব্যতীত অন্য কোথাও এর কোন চর্চা নেই। সমশ্রেণীভুক্ত বস্তু, সঠিক আরোহণ ও ক্রম নিম্নগমন সর্বজনীন এবং এর ব্যবহার সাধারণ্যে প্রচলিত। গ্রহ সম্মিলনের বেলায় সূর্যের ও চন্দ্রের সঠিক প্রভাব (অথবা গ্রীনিচ-এর সময় কোণ) একই থাকে, কিন্তু ক্রম নিম্নগমনের বেলায় তা হয় ভিন্ন। সূর্য গ্রহণের সময় সূর্য ও চন্দ্রের এই সমশ্রেণীভুক্ত দু'টি বস্তু একই থাকে। অতএব একটি এসে মনে হয় সূর্য চন্দ্রকে ধরে ফেলেছে। তবে এই দু'টি বস্তু দ্বিমাত্রাবিশিষ্ট যেমন আকাশমণ্ডলীতে অবস্থানরত সকল গ্রহ-উপগ্রহকে পৃথিবী থেকে একই দূরত্বে রয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু পৃথিবী থেকে দূরত্বের ব্যাপারে তৃতীয় একটি মাত্রা রয়েছে। মহাকাশে এই দু'টি বস্তুর মধ্যকার দূরত্ব বিশাল।

www.bjilibrary.com

তাই সূর্য গ্রহণের সময় সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যকার দূরত্বের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫ কোটি ৮০ লক্ষ কিলোমিটার। অতএব সূর্য কখনও চন্দ্রকে ধরে ফেলার যোগ্যতা রাখে না বা তাকে এরূপ অনুমতি দেওয়া হয় নি।

রাত দ্বারা দিনকে পিছনে ফেলে যাওয়া

'রাত দিনকে কখনও পিছনে ফেলে যেতে পারে না'–এই কথার অর্থ হচ্ছে, রাত দিনের কোন অংশের নাগাল ধরতে পারে না। দিগবলয়ের নিচের অবস্থানে সূর্য থাকলে সেটা রাত, আর দিগ্বলয়ের উপরে থাকলে দিন হবে। সূর্য কখনও একই সময়ে দিগ্বলয়ের উপরে বা নিচে একই অবস্থানে থাকতে পারে না। সুতরাং একই স্থানে একই সময়ে রাত ও দিন হতে পারে না। তাই, এভাবে বলা যায়, রাত কখনও দিনকে পিছনে ফেলে যেতে পারে না। এ প্রসঙ্গে আয়াত ৭ ঃ ৫৪ এর আলোচনা দেখা যেতে পারে।

প্রত্যেকে তার স্বীয় কক্ষপথে পরিক্রমণ করে

সূর্য ও চন্দ্রের গতি নিয়ন্ত্রণ করার বিধান সম্পর্কে আয়াত ৭ ঃ ৫৪ তে আলোচনা করা হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে চন্দ্র ও সূর্য স্ব স্ব কক্ষপথে সবচেয়ে সঠিক ও অতীব সূক্ষ্ম প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছন্দে ভেসে চলেছে। তারা তাদের স্রষ্টা নির্দেশিত বিধান অনুসরণ করে অতি সতর্কতার সাথে স্বীয় পথ পরিক্রমায় রত আছে এবং তাদের কখনও পারস্পরিক সংঘর্ষ হয় না।

٤١- وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۝

٤٢- وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ۝

৩৬ ঃ ৪১-৪২ তাদের এক নিদর্শন এই যে, আমি তাদের বংশধরদেরকে বোঝাই জলযানে আরোহন করিয়েছিলাম; এবং তাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহন করতে পারে।

একচল্লিশতম আয়াতটিতে নূহ নবীর (আ) কিশ্‌তির কথা বলা হয়েছে, যাতে করে মহাপ্লাবনের সময় তাঁর অনুসারীদের বহন করা হয়েছিল। বিয়াল্লিশতম আয়াতে মহাপ্লাবন পরবর্তীকালে নির্মিত জাহাজের কথা বলা হয়েছে।

নৌকা, জাহাজ বিষয়ক ব্যাপারটি ২ ঃ ১৬৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলোচিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

٦٨- وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ○

৩৬ ঃ ৬৮ যে ব্যক্তিকে আমরা দীর্ঘ জীবন দেই তাঁর দেহের গঠনকেই আমরা উল্টিয়ে দেই। এটা দেখেও কী তাদের কোন জ্ঞান হয় না?

বৃদ্ধ নর-নারী অনেক সময় শিশুদের মত দুর্বল এবং পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। এই বিষয়টি ৩০ ঃ ৫৪ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বৃদ্ধ বয়সে শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে শিশুদের মত দুর্বল হয়ে যাওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

٧٢- وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ○

٧٣- وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ○

৩৬ ঃ ৭২-৭৩ আমরা এগুলোকে এমনভাবে তাদের আয়ত্বাধীন করে দিয়েছি যে, এগুলোর (গৃহপালিত পশু) কারো উপর তারা সওয়ার হয় আবার কোনটার গোশ্‌ত তারা খায়। আর এদের মধ্যে তাদের জন্য আরো অনেক কল্যাণ রয়েছে এবং এদের থেকে পানীয় (দুধ) পেয়ে থাকে। এদের কি শোকর করা উচিত নয়?

প্রথম আয়াতে (আয়াত ৩৬ ঃ ৭১) গৃহপালিত গবাদি পশু সম্পর্কে বলা হয়েছে যাদের কিছু আমাদের বোঝা বহন করে, মানুষ পিঠে সওয়ার হয় এবং কোন কোনটির গোশ্‌ত খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এ বিষয়ে ১৬ ঃ ৫, ৭ ও ৮ আয়াতের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আর প্রাণী থেকে উৎপাদিত দুধ সম্পর্কে ১৬ ঃ ৬৬ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

٧٧- أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ○

৩৬ ঃ ৭৭ মানুষ কী দেখে না যে, তাদেরকে আমরা শুক্রকীট থেকে সৃষ্টি করেছি? অথচ এখন সে প্রকাশ্য বিরোধী হয়ে উঠেছে।

নুৎফা থেকে মানব সৃষ্টির বিষয়টি ১৬ ঃ ৪, ১৮ ঃ ৩৭ ও ৩৫ ঃ ১১ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

٨٠- الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ○

www.bjilibrary.com

৩৬ ঃ ৮০ তিনি তোমাদের সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন তৈরি করেন এবং তোমরা তা দ্বারা আগুন জ্বালাও।

পবিত্র কুরআনের একেবারে গোড়ার দিকের তাফসীরকারক সাহাবী হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-ই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি এই আয়াতের সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন তৈরির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরব মরুভূমিতে জন্মান পত্রবিহীন ঝোপ মারখ-এর প্রসঙ্গের অবতারণা করেন।[১] Forskal[২] মূলত এই তৃণের বর্ণনা দেন, যিনি এর নামকরণ করেন Cynanchum pyrotechnica Forsk । পরবর্তীকালে এই তৃণটি Pyrotechnica (Forsk) Decne নামে পরিচিতি লাভ করে। তৃণটির সবুজ ডালপালার মধ্যে বাতাসের সাথে ঘর্ষণজনিত কারণে আগুন ধরে যায় এবং এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এর লেখক pyrotechnica নাম দেন। ডালপালায় ঘর্ষণ লাগলে আগুন ধরে যায়, এই বিশেষত্ব প্রাচীন আরবদের জানা ছিল। আগুন জ্বালাবার জন্য তারা যিনাদ (zinad) নামে একটি কাঠের যন্ত্র ব্যবহার করত। এই তৃণের দু'টি শাখা এই যন্ত্রের সাথে সংযুক্ত করা হত–এর উপরের অংশের নাম ছিল 'আফার বা যানদ এবং নিচের অংশকে মারখ বলা হত। এই ডাল দু'টির পরস্পর ঘর্ষণের ফলে আগুনের সৃষ্টি হত।[৩] ইস্পাত ও চকমকি পাথরে ঘর্ষণের ফলে আগুন তৈরির পদ্ধতি প্রবর্তনের পূর্বে আরববাসীরা আগুন জ্বালাবার এই কৌশল ব্যবহার করত।

মিগাহিদ[৪] (Migahid) তাঁর Flora of Saudi Arabia গ্রন্থে এই গাছটির আরবী নাম মারখ বা সাদাদাহ্ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি একে পত্রবিহীন গুল্ম বা ৫ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট অসংখ্য দীর্ঘ সরু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত গাছ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আরবী শব্দ 'শাজারাল আখদারি'-এর অর্থ সবুজ বৃক্ষ এবং এই আয়াতের প্রেক্ষাপটে এর একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। সবুজ ক্লোরোফিল-এর কারণে সবুজ গাছপালা বায়ুমণ্ডলের শোভা লাভ করে এবং এর পাতা দ্বারা সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে সৌর শক্তি গ্রহণ করে। তারপর কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে যা কার্যকর অবস্থায় শক্তি সঞ্চয় করে রাখে। রাসায়নিক আকারে এই বোতলজাত সৌর শক্তি তৃণটির শাখা-প্রশাখায় ঘর্ষণের ফলে এক শক্তিশালী আলো ও তাপের আকারে বেরিয়ে আসে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. M. Hamidullah, Early Muslim Contribution to Botany, Science in Islamic Polity, pp 216-222, 1983.
2. P. Forskal, flora of Aegyptiaco-Arabica, Beirut, p. 53, 1775.
3. A. Y. Ali, The Holy Quran-text, translation and commentary, Shaikh Muhammad Ashraf, Lahore, p. 1188, 1938.
4. A. M. Migahid, Flora of Saudi Arabia Vol. 1. 2nd edn. Riyadh University Publications, 1978.

www.bjilibrary.com

٨٢- إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ○

৩৬ ঃ ৮২ তাঁর ব্যাপার শুধু এই, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে বলেন, 'হও', ফলে তা হয়ে যায়।

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে কোন ঘটনা ঘটাতে পারেন। আমরা যখন কোন ঘটনার কথা বলি তখন এও বলি যে, ঘটনাটি অধিক অথবা কম বিশ্বাসযোগ্য। আমরা কখনও কখনও বলতে উদ্বুদ্ধ হই যে, এটা একটা অসম্ভব ঘটনা। উদাহরণস্বরূপ কেউ যদি একটি বল উঁচু পাহাড়ের দিকে কার্যকর শক্তির চাইতে কম গতিশক্তি ব্যবহার করে গড়িয়ে দেয় তাহলে যে কেউ বলবে যে, বলটির পাহাড় অতিক্রম করে যাওয়া একটি অসম্ভব ঘটনা। কিন্তু সংখ্যা তাত্ত্বিক বলবিদ্যার (quantum mechanics) ক্ষেত্রে (অর্থাৎ ক্ষুদ্রের বলবিদ্যা যা বৃহৎ পদার্থের বলবিদ্যা থেকে নানাভাবে ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং নিউটনীয় বলবিদ্যা নামে খ্যাত) কেউ একথা বলতে পারে না যে, এই ঘটনা ঘটা অসম্ভব। সংখ্যাতাত্ত্বিক বলবিদ্যা যে কোন ঘটনার সম্ভাব্যতা প্রদান করে। এভাবে একটি ঘটনা খুব উঁচু মাত্রায় সম্ভাব্য হতে পারে, আবার নাও হতে পারে, কিন্তু তাকে অসম্ভব বলা যাবে না। একটু আগে উল্লেখিত সম্ভাব্যতার বিস্তৃতিকে 'তরঙ্গ কার্যক্রম' (wave function) নামে অভিহিত করা হয়। সংখ্যা তাত্ত্বিক বলবিদ্যা বলে যে এমন কী যদি বলের গতিবেগ এমন হয় যে, এর গতি শক্তি পাহাড়ের উচ্চতায় এর কার্যকর শক্তির চেয়ে অধিকতর কম তাহলে বলটির পাহাড় পার হয়ে যাওয়ার একটি সীমিত সম্ভাবনা থাকে। পরিভাষাগতভাবে একে 'সংখ্যাতাত্ত্বিক সুড়ঙ্গপথ' (quantum tunneling) নামে অভিহিত করা হয়। এরূপ কার্যকর প্রতিবন্ধকতার সমস্যার ক্ষেত্রে এ ধরনের সুড়ঙ্গপথে অগ্রসর হওয়া পরীক্ষামূলকভাবে এর সত্যতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, যদি একটি ক্ষুদ্র পদার্থ ১/২ এমভি২ ($^1/2mv^2$) গতিবেগ শক্তির সাথে উচ্চতা ৫ (height V) এর একটি কার্যকর প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করা হয় এবং ১/২ এমভি২ ($^1/2mv^2$) যদি ৫ (V) থেকে কিছুটা ক্ষুদ্র হয় তাহলে ঐ ক্ষুদ্র পদার্থটি অধিকাংশ সময় প্রতিবিম্বিত হবে এবং কখনও কখনও প্রতিবন্ধকতার ভেতর দিয়ে চলে যেতে পারবে। প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে প্রেরণের সম্ভাব্যতা প্রতিবিম্বতার সম্ভাব্যতা থেকে অবশ্য অনেক কম হবে। একটি সন্ধানকারী যন্ত্র পাহাড়ের একদিকে এবং আর একটিকে পাহাড়ের অপরদিকে স্থাপন করা যেতে পারে। প্রথম সন্ধানকারী যন্ত্রের কল যেখান থেকে নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র পদার্থটি নিক্ষেপ করা হয়েছে, যদি টিপে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং উদাহরণ

www.bjilibrary.com

স্বরূপ একটি আলোর ঝলকানি দেখা যায় তাহলে আমরা জানতে পারব যে, বলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর যদি পাহাড়ের অপর দিকে স্থাপিত যন্ত্রটির কল টিপে দেওয়া হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে, নিক্ষিপ্ত পদার্থটি প্রেরিত হয়েছে। নিজে সৃষ্ট সমস্যাটি এরূপ যে, একই প্রাথমিক গতিশক্তির জন্য একই গুণসম্পন্ন পদার্থ কখনও কখনও প্রতিবিম্বিত হয় আবার কখনও কখনও উপর দিয়ে চলে যেতে পারে। পদার্থটি প্রতিবিম্বিত হবে, না অতিক্রম করে যেতে পারবে তা কে নির্ধারণ করবে ? Squires[১] তার 'Mystery of the Quantum World' নামক সাম্প্রতিক গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি দু'টি ভূমিকা আরোপ করেছেন। বর্তমান আয়াতটির প্রসঙ্গে প্রথম ভূমিকাটি যথাযথ এবং নিচে তা উদ্ধৃত করা হল ঃ

"প্রথম ভূমিকাটি হল পছন্দ তৈরির যা একটি পরিমাপ তৈরি হলে প্রয়োজন হয়। সম্ভাব্য পরিণতির একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতি থেকে এই পরিমাপ নির্বাচন করে। এরূপ একজন ঈশ্বর পৃথিবী থেকে সকল দ্বিধা বা স্থির লক্ষ্যের অভাব দূরীভূত করেন। আর তিনি নিজেই সে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যা পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়ম তাড়িত নয়। যদিও ঐতিহ্যগত পরিভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত নয় তবুও একজন ঈশ্বরের গৃহীত ভূমিকার সাথে যুক্তিসঙ্গতভাবে সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি পৃথিবীর সকল বিষয়ে খুবই সক্রিয় হবেন এবং তার নির্ধারিত সীমাবদ্ধতার মধ্যে তিনি হবেন সর্বশক্তিমান। পদার্থবিদ্যার বিধানানুযায়ী তার আচরণের ভবিষ্যদ্বাণী হবে একবারেই অসম্ভব (লক্ষ্য করুন যে, এই অধ্যায়ে আমরা কোন গুপ্ত বৈষম্যকে আমলে আনছি না) যদিও ধর্মতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বিশ্বাস করতে চাইব যে, নির্বাচিত পছন্দসমূহের কমপক্ষে কয়েকটি সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। অন্যথায় আমরা এলোমেলো অবস্থার মধ্যে ফিরে যাব এবং ঈশ্বরের পক্ষে তার ভূমিকা পালন করা সম্ভবপর হবে না। এখানে উল্লেখ করা বেশ চমকপ্রদ হবে যে, ঈশ্বরের এই ভূমিকা অলৌকিক ঘটনাবলিকে এমন কি স্বীকার করে নিতে পারে যদি আমরা এরূপ অলৌকিক ঘটনাকে অতি অসম্ভাব্য বলে ধরে নিই। কারণ, এ সকল ঘটনা একেবারে সুনির্দিষ্ট ও অস্বাভাবিক। ঐশী পছন্দ ব্যতিরেকে কার্যকরভাবে অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়। উদাহরণস্বরূপ, সংখ্যাতাত্ত্বিক তত্ত্বানুসারে একটি অবশ্যই ক্ষুদ্র কিন্তু শূন্যবিহীন সম্ভাব্যতার অনুপাত থাকবে যে, আমি যদি দৌড়ে দেয়ালের মধ্যে গিয়ে পড়ি তাহলে আমি এর মধ্য দিয়ে পার হয়ে যাব। কার্যকর প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম পরীক্ষার এটা একটা বিশেষ ঘটনা এবং বামদিকের wave function ও তারপর প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে প্রেরণ কখনও সম্পূর্ণ শূন্য হবে না। তাহলে

www.bjilibrary.com

প্রেরণের জন্য সম্ভাব্যতা অনুপাত যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন একজন ঈশ্বর যদি পছন্দ করেন, তিনি পরিণতি হিসাবে একে নির্বাচন করতে পারেন।

ইসলাম ধর্মে আমরা কেবল একমাত্র একক এক আল্লাহ্‌কে বুঝি এবং তাঁরই কেবল সর্বময় ক্ষমতা রয়েছে কোন অসম্ভব ঘটনার পরিণতি বাছাই করার। তিনি চান যে তা ঘটুক এবং অতঃপর তিনি বলেন "হও", আর তা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়।

মহানাদ (Big Bang)-এর মাধ্যমে নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি হচ্ছে বিজ্ঞানের একটি বিস্ময়কর ঘটনা এবং বাস্তবিকপক্ষে তা ঐশী আদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কেউ হয়ত বলতে পারেন যে, নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি শুরু হয় একটি নির্দিষ্ট অবস্থা থেকে যেখানে বিশ্বের সকল পদার্থ কেন্দ্রীভূত ছিল। কেউ হয়ত যথার্থভাবে প্রশ্ন করতে পারেন যে, একটি একক বস্তু কীভাবে সীমাহীন শক্তি ধারণ করতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে এরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। কাউকে এটা ধরে নিতে হবে যে, সমগ্র বিষয়টি ছিল অনন্যসাধারণ একক এবং মহানাদ (Big Bang) থেকে সময়ের শুরু। ধরে নেওয়ার বিষয়টি হচ্ছে বিশ্বাসের একটি শর্ত এবং পরবর্তীকালের ঘটনাবলি যথাযথ পরিমাপের সাথে ব্যাখ্যাযোগ্য যদি কেবলমাত্র প্রাথমিক হঠাৎ বিস্ফোরণকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। তবে একজনের পক্ষে এই উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না যে, এই আকস্মিক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সিদ্ধান্ত কে গ্রহণ করেছিল। কেউ হয়ত সংখ্যাতাত্ত্বিক অস্থিরতার (quantaum fluctuations) পরিভাষা অনুসারে এর একটা ব্যাখ্যা দাড় করানোর চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু ঘটনাটি সম্পর্কে কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ইসলাম ধর্মানুসারে এক এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। একমাত্র আল্লাহ্ই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন মহানাদ ঘটাবার এবং তা যত সম্ভাব্যহীন হোক না কেন, এটা তাঁর স্বীয় ইচ্ছার এখতিয়ারাধীন। আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ "হও" নিখিল বিশ্ব সৃষ্টির অকুস্থল তৈরি করতে পারে এবং একইভাবে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র উভয় পর্যায়ে পদার্থের গঠন ও বিস্তার সম্ভবপর হয়।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Evan Squires, The Mystery of the Quantum World, Adam Hilger Ltd. Bristol and Boston, pp 66-67, 1986.

www.bjilibrary.com

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۝٥

৩৭ ঃ ৫ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্বর্তী সব কিছুর প্রভু এবং সকল উদয়স্থলের।

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রভু আল্লাহ্। এ বিষয়টি আয়াত ৫ ঃ ১৯ এ আলোচিত হয়েছে।

সকল উদয়স্থলের প্রভু

এই আয়াতটির বর্ণনানুসারে অনেকগুলো পূর্বদিক রয়েছে অর্থাৎ অনেকগুলো অবস্থান রয়েছে যেখান থেকে সূর্য উদিত হয় এবং আল্লাহ্ এ সকল অবস্থানের প্রভু।

আমরা জানি যে, পৃথিবীর দু'ধরনের গতি রয়েছে। একটি হচ্ছে স্বীয় অক্ষের উপর একবার ঘূর্ণনের আহ্নিকগতি, আর অপরটি সূর্যের চারদিকে স্বীয় কক্ষপথে একবার ঘুরে আসা, যাকে বার্ষিক গতি বলে। পৃথিবীর ঘূর্ণনের বার্ষিক গতির কক্ষপথ একটি বিরাটাকার বৃত্ত, একে সূর্যের বার্ষিক পরিক্রমণ পথ বলে। এই বার্ষিকগতির কারণে বছরের বিভিন্ন দিনে আকাশে সূর্যকে সৌর অয়নবৃত্তে বিভিন্ন অবস্থানে দেখতে পাওয়া যায়। আর পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে সূর্যকে বিভিন্ন বৃত্তাকারে আকাশে আড়াআড়িভাবে অবস্থান করতে দেখা যায়। তাই বিভিন্ন অবস্থানে সূর্যকে উঠতে ও অস্ত যেতে দেখা যায়। কার্যত বছরের প্রতিটি দিনে সূর্যকে বিভিন্ন অবস্থান থেকে উঠতে দেখা যায় এবং একইভাবে বিভিন্ন অবস্থানে অস্ত যায়। তাই সূর্যোদয় (পূর্ব প্রান্ত) ও সূর্যাস্তের (পশ্চিম প্রান্ত) অনেকগুলো অবস্থান রয়েছে। যদি ভিন্ন ভিন্ন দিনে বিভিন্ন অবস্থান থেকে সূর্যোদয় না হত তাহলে ঋতু বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হত না। এই ঋতু বৈচিত্র্য এবং গাছপালা ও জীবজগতের উপর তার প্রভাব পৃথিবীতে জীবনচক্রের ক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্যময়। সুতরাং বিভিন্ন অবস্থানে সূর্যোদয় অর্থাৎ বিভিন্ন পূর্বদিকের সৃষ্টি মহাপ্রভু আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শন। অতএব আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই আল্লাহ্ হচ্ছেন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সকল অবস্থানের প্রভু।

পূর্ব ও পশ্চিম দিক

যদিও পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে যে, অনেকগুলো পূর্ব ও পশ্চিম দিক রয়েছে তবুও কেবলমাত্র একটি উত্তর ও একটি দক্ষিণ দিক বর্তমান। গোলাকার আকাশে পৃথিবীর ঘূর্ণনের অক্ষরেখাকে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু একটি পয়েন্টে আড়াআড়িভাবে ছেদ করেছে। মেরুদ্বয় ও সুবিন্দু ভেদ করে যে

মহাবৃত্ত চলে গিয়েছে তাকে পৃথিবীর বৃত্তের মধ্যরেখা (meridian) বলে এবং ভূপৃষ্ঠের সমতলে মহাবৃত্ত যে স্থান ছেদ করেছে তাকে দিগন্তরেখা (horizon) বলে। এই মধ্যরেখা ও দিগন্তরেখা যে পয়েন্টে পরস্পর ছেদ করেছে তাকে উত্তর পয়েন্ট ও দক্ষিণ পয়েন্ট বলে। যেহেতু একটি স্থানে কেবলমাত্র একটি মধ্যরেখা ও দিগন্ত রেখা রয়েছে তাই সেখানে শুধুমাত্র একটি করে উত্তর প্রতিচ্ছেদ পয়েন্ট ও দক্ষিণ প্রতিচ্ছেদ পয়েন্ট থাকবে। নিরক্ষরেখার (ধ্রুবাক্ষের সমকোণে মহাবৃত্ত) প্রতিচ্ছেদের পয়েন্ট তৎসহ দিগন্তরেখা অর্থাৎ উত্তর পয়েন্ট ৯০° ডিগ্রী দূরে হচ্ছে পূর্ব পয়েন্ট ও পশ্চিম পয়েন্ট।

দু'টি পূর্ব পয়েন্ট ও দু'টি পশ্চিম পয়েন্ট

আমরা জানি যে, একটি মহাবৃত্তের মধ্যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে (অথবা সূর্যকে ঘুরতে দেখা যায় বলে মনে হয়)। এই মহাবৃত্তকে সৌর অয়ন বৃত্ত বা সূর্যের বার্ষিক পরিক্রমণপথ বলে। এই ক্রান্তিবৃত্ত নিরক্ষরেখার উপর ২৩° ডিগ্রী ২৮ মিনিট নোয়ান অবস্থায় রয়েছে। সুতরাং সূর্যের স্বীয় কক্ষপথ ধরে উত্তর দিকে পরিক্রমণের সময় তার এই ২৩° ডিগ্রী ২৮ মিনিটের বাইরে যাওয়ার কোন উপায় নেই। তাকে এখানে এসে দক্ষিণ দিকে মোড় নিতে হয়। অনুরূপভাবে সূর্য দক্ষিণ দিকে ২৩° ডিগ্রী ২৮ মিনিট থেকে উত্তর দিকে মোড় নেয়। সুতরাং এই দু'টি হচ্ছে নিয়ন্ত্রণকারী পয়েন্ট যার বাইরে সূর্য যেতে পারে না এবং উদয় হতেও পারে না। এই দু'টি বাঁককে সূর্যের অয়ন বলে। পূর্বদিকের পয়েন্টসমূহের মধ্যে এগুলোকে নিয়ন্ত্রণকারী পয়েন্ট বলে। অনুরূপভাবে পশ্চিম দিকে দু'টি নিয়ন্ত্রণকারী পয়েন্ট রয়েছে। এই নিয়ন্ত্রণকারী পয়েন্টগুলো হচ্ছে দু'টি পূর্ব দিকে ও দু'টি পশ্চিম দিকের পয়েন্ট যা আয়াত নম্বর ৭ ঃ ১৩৭ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৬- إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ۝

৩৭ ঃ ৬ আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি।

আয়াত ২ ঃ ২৯ এ লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, মহাশূন্যকে সাতটি পৃথক অঞ্চল বা আকাশে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অঞ্চল বা আকাশে সূর্য ও গ্রহমণ্ডলী যথা বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল তাদের উপগ্রহ সহ অবস্থান করছে। সৌর জগতের গ্রহমণ্ডলী দু'টি সুস্পষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত–পার্থিব (পৃথিবীর প্রতিরূপ স্বরূপ) ও বৃহস্পতি গ্রহের প্রতিরূপ (Jovial) বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহসমূহ হচ্ছে

www.bjilibrary.com

পার্থিব এবং অপর পাঁচটি গ্রহ বৃহস্পতির প্রতিরূপ। এ সব পার্থিব গ্রহের ঘনত্ব মাত্র ০.৭ থেকে ১.৭ এর মধ্যে। একটি ৩.১ এ. ইউ (জ্যোতির্বিদ্যার ইউনিট) প্রশস্ত উপগ্রহাদির বন্ধনী দ্বারা এই দু'টি শ্রেণীকে পৃথক করেছে। সৌর জগতের পার্থিব অংশটি অর্থাৎ প্রথম আকাশ পৃথিবীকে ধারণ করে আছে। অতএব এটা পৃথিবীর আকাশ নামে অভিহিত। মহাশূন্যের এই অঞ্চল সূর্য, চন্দ্র ও পূর্বোল্লিখিত গ্রহসমূহ দ্বারা শোভিত করা হয়েছে। দিনের বেলায় আকাশে সূর্য প্রাধান্য বিস্তার করে এবং আকাশ পরিক্রমণ করে বলে দেখা যায়। এ সময় নানা বর্ণের সমাহার ঘটে। খুব সকালে এর যাত্রা শুরু হয় তখন এর ঊষার গোধূলি ক্ষীণ আভা থেকে ক্রমান্বয়ে এর রাজকীয় উত্থান ঘটে এবং লাল গোলকের রূপ ধারণ করে। আকাশে পরিভ্রমণ কালে সূর্য সকালে নরম আলো ছড়াতে থাকে, দুপুরে তীব্র দাবদাহের সৃষ্টি করে এবং পুনঃ তার আলোর তেজ কমতে থাকে এবং শেষে পশ্চিম দিগ্বলয়ের নিচে অস্ত যায়, সে সময় তার রাজকীয় লাল আভা বিরাজ করে। ক্রমান্বয়ে শক্তি হারিয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় এবং সান্ধ্যকালীন গোধূলির নানা ধরনের অন্ধকারের পর্দা পৃথিবীর বুকে অবস্থান নেয়। চন্দ্রেরও ক্রমান্বয় পরিবর্তন ঘটে, প্রথমে একটি কাস্তের আকার নিয়ে আকাশে উদিত হয় তারপর একটি পূর্ণ বৃত্তের আকার ধারণ করে। বুধ ও শুক্র গ্রহ কেবলমাত্র সূর্যাস্তের কিছু পরে এবং সূর্যোদয়ের কিছু আগে আকাশে দেখা যায়। অতএব প্রথম আকাশ হচ্ছে সূর্য ও পার্থিব গ্রহমণ্ডলী ধারণকারী অঞ্চল, এর চারদিকে উপগ্রহমণ্ডলীর একটি বন্ধনী দিয়ে সীমানা দেওয়া হয়েছে। সমগ্র সৌরজগত ধারণকারী অঞ্চল দ্বিতীয় আকাশ গঠন করেছে।

নক্ষত্রের বিবর্ধন সংক্রান্ত চলতি মতবাদসমূহ থেকে জানা যায় যে, নক্ষত্রমণ্ডলীর অধিকাংশই এককভাবে না হয়ে দল বা গুচ্ছাকারে গঠিত হয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রে পারিবারিক সম্বন্ধ, অথবা সামাজিক বা রাজনৈতিক কিংবা অন্য কোন সম্পর্কের কারণে পারস্পরিক নৈকট্যের সৃষ্টি হয় এবং দল গঠন করে। একইভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের তারকারাজি নিবিষ্টভাবে দলবদ্ধ থাকে। দলের মধ্যে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে তারা কম বেশী একটি ইউনিট হিসেবে একত্রে চলাফেরা করে। আমাদের ছায়াপথে প্রায় ১০,০০০ কোটি নক্ষত্র রয়েছে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে অধিকাংশ নক্ষত্র শিথিলভাবে স্থানীয় দল-উপদলে পরস্পর সংবদ্ধ থাকে। আমাদের সূর্যেরও ৩০টি নক্ষত্র সমন্বয়ে একটি স্থানীয় দল রয়েছে এবং ২০ আলোকবর্ষের সমপরিমাণ ব্যাসার্ধ নিয়ে গঠিত। এটি হলো তাদের পরিক্রমণ। সূর্যের এই স্থানীয় দলভুক্ত নক্ষত্রমণ্ডলী নিয়ে তৃতীয় আকাশ গঠিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

এরূপ স্থানীয় তারকামণ্ডলীর এ সকল স্থানীয় দলের একত্র সন্নিবেশ এবং তার সাথে একক নক্ষত্র মিলিয়ে যে ছায়াপথের সৃষ্টি হয়েছে তা চতুর্থ আকাশ গঠন করেছে। এ সকল স্থানীয় তারকাপুঞ্জের পারস্পরিক দূরত্ব ১০,০০০ আলোক বর্ষ থেকেও বেশী।

এই একই প্রক্রিয়ায় ছায়াপথমণ্ডলীরও আবার স্থানীয় দল বা পুঞ্জ রয়েছে এবং তারা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে শিথিলভাবে পরস্পর সংবদ্ধ আছে। স্থানীয় ছায়াপথমণ্ডলীর একটি দল থেকে আরেকটি দলের দূরত্ব পাঁচ লক্ষ আলোকবর্ষ থেকেও বেশী। ছায়াপথমণ্ডলীর একটি স্থানীয় দল পঞ্চম আকাশ গঠন করেছে। Milky Way এই ছায়াপথমণ্ডলীর একটি সদস্য।

ছায়াপথমণ্ডলীর এরূপ সকল স্থানীয় দলের সমন্বয়ে এক বিশাল ইউনিট গঠিত হয়েছে যাকে super galaxy নামে অভিহিত করা হয়। এই super galaxy -এর আওতাধীন ছায়াপথমণ্ডলীর স্থানীয় দলের মধ্যকার দূরত্ব ২ কোটি ৫০ লক্ষ আলোকবর্ষের সমান। এই super galaxy ষষ্ঠ আকাশ গঠন করেছে।

সকল super galaxy মিলিয়ে নিখিল বিশ্বের অবশিষ্ট অংশ গঠিত হয়েছে যাকে সপ্তম আকাশ অভিধায় অভিহিত করা যায়।

٧٦- وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۝

৩৭ ঃ ৭৬ তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে আমি উদ্ধার করেছিলাম মহা সঙ্কট থেকে।

আয়াতের এই বিষয়টি হযরত নূহ (আ)-এর সময়ের মহাপ্লাবনের প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে। সে সময়ে তিনি জাহাজ তৈরি করে তাঁর লোকদের উদ্ধার করেছিলেন। আয়াত ৭ ঃ ৬৪ তে এই প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে।

٨٢- ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۝

৩৭ ঃ ৮২ অবশিষ্ট সকলকে আমি নিমজ্জিত করেছিলাম।

এই আয়াতে নূহ (আ)-এর সময়কার মহাপ্লাবনের বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে যেখানে নৌকায় আশ্রয়প্রাপ্ত লোক ছাড়া অন্য সকলে ডুবে মারা যায়।

আয়াত ৭ ঃ ৬৪ তে মহাপ্লাবনের প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

١٤٢- فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ۝

١٤٣- فَلَوْلَآ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ۝

١٤٤- لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝

١٤٥- فَنَبَذْنَٰهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ۝

١٤٦- وَأَنۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ ۝

৩৭ ঃ ১৪২-১৪৬ পরে এক বিরাটকায় মাছ তাকে গিলে ফেলল, তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। সে যদি আল্লাহ্‌র মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা না করত, তাহলে তাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত মাছের উদরে থাকতে হত। অতঃপর আমি ইউনূসকে নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে এবং সে রুগ্ন ছিল। পরে আমি তার উপর এক লাউ গাছ উদ্‌গত করলাম।

উপরোক্ত পরপর পাঁচটি আয়াতে কিভাবে নিনেভে জাতির দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য প্রেরিত ইউনূস নবী (আ) তার জাতির লোকদের উপর ক্রোধান্বিত হয়ে তাদেরকে পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। নিনেভে ছিল ইরাকের বর্তমান আধুনিক নগরী মসূল-এর বিপরীত দিকে দজলা নদীর তীরে অবস্থিত প্রাচীন আসিরীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী। চরম হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতিতে আল্লাহ্‌র কুদরতী শাস্তির উপর নির্ভর না করে ইউনূস(আ) নিনেভে ত্যাগ করে চলে যান। বাইবেলের ব্যাখ্যাতাগণের মতে, তিনি নিনেভে থেকে ৬শ মাইল পশ্চিমে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় বন্দর জাফা-য় একটি জাহাজ নেন। তবে তার গন্তব্য দজলা নদীর কাছাকাছি কোথাও ছিল এবং তা অধিকতর সম্ভব বলে মনে করা হয়। জাহাজটি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মুখে পড়ে যায় এবং নাবিকরা ভাগ্য গণনার পর তাকে খারাপ লোক হিসেবে জাহাজের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বিশালাকার এক মৎস্য তখন তাকে গিলে ফেলে। কিন্তু, মাছের পেটের ভিতর অবস্থানকালে তিনি অনুতপ্ত হলে এবং আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন করলে মাছটি তাকে সাগরতীরে নিক্ষেপ করে। স্পষ্টত মাছের নাড়িভুঁড়ি তথা অন্ত্রাদির ভিতর অবস্থানজনিত মুসিবতের কারণে অসুস্থ অবস্থায়

www.bjilibrary.com

থাকাকালে একটি বৃক্ষ তাকে ছায়া দান করে এবং তিনি এই ক্লান্তিকর অবস্থায় স্বস্তি লাভ করতে সক্ষম হন।

এ ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দু'টি বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রদান করা যায় যথা ঃ ক. ইউনূস (আ)-কে গলাধঃকরণকারী জীবদেহ, এবং খ. তাকে সুস্থতাদানকারী সেই বৃক্ষটি যা সাগর সৈকতে ইউনূস (আ)-এর আরামের ব্যবস্থা করেছিল–এ দু'টির পরিচয় চিহ্নিত করা।

ক ঃ ৩৭ ঃ ১৪২ আয়াতে উল্লিখিত 'আলহুত' (الحوت) শব্দটির অর্থ বিশাল মৎস্য অর্থাৎ তিমি। একজন মানুষকে গলাধঃকরণ করতে হলে কোন প্রাণীকে অবশ্যই ১. যথেষ্ট বৃহদাকার হতে হবে, ২. তার খাবার চুষে খাওয়ার অভ্যাস থাকতে হবে, এবং ৩. এই বিশেষ ক্ষেত্রে সেটাকে নিনেভের নিকটবর্তী সামুদ্রিক অঞ্চলে বসবাসকারী হতে হবে। তিমি যদিও এমন এক জাতের জলজ প্রাণী যা আকারে বিশ্বের বৃহত্তম, এদের বিস্তার আর্কটিক, এন্টার্কটিক, আটলান্টিক, ভারত এবং প্রশান্ত মহাসাগরে সীমিত, যা এক্ষেত্রে তিমিকে বিতর্কিত বিষয় হিসেবে মেনে নেয়ার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয়। বিশাল আকৃতিবিশিষ্ট অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে রয়েছে হাঙ্গর এবং স্টারজিয়ন। পূর্বোক্তটির বাস মহাসাগরে এবং এটি অন্যতম ভয়ংকর এবং অত্যন্ত ধারালো চোয়ালের জন্য কুখ্যাত। এরকম একটা মাছের পক্ষে শিকারকে প্রথমে কেটে টুকরা টুকরা করে না মেরে শুধু গিলে ফেলা অত্যন্ত অসম্ভব একটা ব্যাপার। অপরদিকে, স্টারজিওন বর্তমানকালের জ্ঞানে মিঠাপানির মাছের মধ্যে বৃহত্তম; এরা সাগরে বাস করলেও ডিম ছাড়ার জন্য মিঠা পানিতে চলে আসে। এদের রয়েছে চোষক এবং দন্তবিহীন মুখ যাতে বোঝা যায় যে, বিভিন্ন ছোট ছোট প্রাণী এবং গাছপালা চোষণ করে খাওয়ার অভ্যাস এদের রয়েছে। স্টারজিয়নের বিশ রকমের মত জ্ঞাত প্রজাতি ছড়িয়ে আছে ইউরোপ, এশিয়া এবং উত্তর আমেরিকার উভয় উপকূল বরাবর।[১] রুশ স্টারজিয়ন (Acipenser huso) প্রজাতি ২৪ ফুট দীর্ঘ এবং ২ হাজার পাউন্ড (৯০০ কি. গ্রা.) ওজনের হয়ে থাকে।[২] কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণ সাগরে এদের বাস যা বিভিন্ন উপনদীর মাধ্যমে মেসোপটেমীয় নদীব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত। আশা করা যায় যে, ঐ আকারের স্টারজিয়ন ইউনূস (আ)-এর সময়কালে (খ্রি.পূ. ৮০০ সালে ছিল বলে অনুমিত) নিশ্চয়ই দজলা নদীতে বিচরণ করে থাকবে। স্টারজিয়নের অদ্ভুৎ খাদ্যাভ্যাস এবং দন্তবিহীন মুখ থেকেই ডুবন্ত ইউনূসের (আ) কোন ক্ষতি ছাড়াই এই মাছের পেটে শোষিত হওয়ার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, এ ধরনের বিশাল মাছের পেটের ভিতর পর্যাপ্ত বায়ু থাকতে হবে যাতে এর অভ্যন্তরস্থিত শিকার তার শ্বাসক্রিয়া চালিয়ে যেতে পারে। অধিকন্তু, পেটের ভিতরকার বিষাক্ত জলীয়

www.bjilibrary.com

দ্রব্যাদি হয়তো মারাত্মক অস্বস্তির সৃষ্টি করে থাকতে পারে কিংবা এমনকি অন্ন দহনও সৃষ্টি করতে পারে। এ অবস্থায় নবী ইউনূস (আ) যেহেতু দোয়া-মোনাজাত করেছিলেন এবং আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন করেছিলেন, সেহেতু ৩৭ ঃ ১৪৫ আয়াতে উল্লিখিত আল্লাহ্‌র রহমতে মাছটি তাকে উপকূলে ছুড়ে মারে।

খ. ইয়াক্‌তিন (يقطين) অর্থ মিষ্টি কুমড়া কিংবা স্কোয়াশ। এটি কিউকার-বিটাকি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত যার মধ্যে রয়েছে সকল প্রকার লাউ, তরমুজ, এবং এদের নানান সহ-গোত্রীয় সদস্য যা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলসমূহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উৎস হিসেবে গণ্য। মিষ্টি কুমড়া কিংবা স্কোয়াশ গাছ কোন বৃক্ষে জন্মে না এবং নরম কাণ্ড আঁকশি নামে এক প্রকার বিশেষ অঙ্গের সাহায্যে যে কোন কিছুর উপর ভর দিয়ে বেয়ে উঠে। এরা প্রবলভাবে বেড়ে যায় এবং দ্রুত কোন মাচা কিংবা ভাঙ্গাচোরা নির্মাণ কাঠামো ভরে তুলতে পারে এবং পর্যাপ্ত ছায়া দ্বারা কাউকে এর নিচে বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে পারে। লাউগোত্রের অন্তর্ভুক্ত গাছপালা বালুকাময়, সুনিষ্কাশিত মাটিতে খুব ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং ভূমধ্যসাগরীয় ও মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমিতে এদের দেখা যায়। বালুকাময় নদীতীরেও প্রায়শই এদের চোখে পড়ে। মজার ব্যাপার হলো যে, ১৪৬ নং আয়াতে বলা হচ্ছে যে, ইউনূস (আ) যখন অসহায়ভাবে অসুস্থ অবস্থায় শায়িত ছিল, তখন আল্লাহ্ তার উপর লাউ গোত্রীয় একটি গাছ জন্মান। বস্তুত 'আমবাত্‌না আলাইহে' (انبتنا عليه) বাক্যাংশ দ্বারা আক্ষরিক অর্থে ঠিক এ কথাটিই বুঝানো হয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Encyclopaedia Americana, Vo. 25, Americana Corporation, Danbury, Connecticut, U.S.A., p. 810, 1979.
2. Encyclopaedia Britannica, Vol. 21, Ency. Brit. London, p. 485, 1962.

www.bjilibrary.com

٣- كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ○

৩৮ ঃ ৩ এদের পূর্বে আমরা এরূপ কত জাতিকেই না ধ্বংস করেছি– যখন তারা চিৎকার করে উঠেছে কিন্তু তখন আর রক্ষা পাওয়ার সময় ছিল না।

এই বিষয়টি ৭ ঃ ৪ এবং ১৭ ঃ ১৭ আয়াত দুটির সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

٢٧- وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ
فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ○

৩৮ ঃ ২৭ আমরা আসমান ও যমিন এবং এ দুয়ের মাঝখানে যা কিছু তা অনর্থক পয়দা করি নি। এটি সেই লোকদের ধারণা যারা কুফরী করেছে। এ ধরনের কাফেরদের জন্য জাহান্নামের আগুনে ধ্বংস হওয়া অনিবার্য।

আল্লাহ্ যে কোন কিছু অনর্থক সৃষ্টি করেন নি তা ৩ ঃ ১৯১ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

٢٩- كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○

৩৮ ঃ ২৯ এটি (কুরআন) এক বহু বরকতপূর্ণ কিতাব, এটি আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ।

আল্লাহ্র আয়াতসমূহ নিয়ে ২৭ ঃ ৮৬ আয়াত সহ কয়েক জায়গায় আলোচনা করা হয়েছে।

আর জ্ঞানী লোকদের জন্য যে এই কিতাব এ বিষয়টি ২ ঃ ২৬৯ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

٣٦- فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ ○

৩৮ ঃ ৩৬ তখন আমরা বাতাসকে তার নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিলাম, তখন তার হুকুমে তা যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হতো।

এই বিষয়টি ৩৪ ঃ ১২ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

٦٦- رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ○

৩৮ ঃ ৬৬ আসমানসমূহ ও যমিনের মালিক, সেই সব জিনিসেরও মালিক যা এই দু'য়ের মধ্যে রয়েছে, তিনি মহা পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।

এ বিষয়সমূহ ৭ ঃ ৫৪, ৭ ঃ ১৮৫ আয়াত এবং পরিশিষ্ট ১, ২ ও ৩-এ আলোচনা করা হয়েছে।

٧١- اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ○

৩৮ ঃ ৭১ যখন তোমার (হে নবী) প্রভু ফেরেশতাদেরকে বললেন আমি মাটি দ্বারা একজন মানুষ সৃষ্টি করব।

মাটি থেকে মানব সৃষ্টির বিষয়টি ৭ ঃ ১২ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

٥- خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۚ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ○

৩৯ ঃ ৫ তিনি আসমানসমূহ এবং পৃথিবীকে সুষ্ঠুভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই দিনের উপর রাতকে এবং রাতের উপর দিনকে পৌঁছিয়ে থাকেন। তিনিই সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করেন– এদের প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময়ে আবর্তন করে। তিনিই কি সর্বশক্তিমান ও ক্ষমাশীল নন?

সবকিছু সঠিকভাবে সৃষ্টি করেছেন এ বিষয়টি ২৫ ঃ ২ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

দিন ও রাতের আবর্তনের বিষয়টি ৩৬ ঃ ৪০ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। চন্দ্র ও সূর্যের আবর্তনের বিষয়টি ৭ ঃ ৫৪ এবং ৩৬ ঃ ৪০ আয়াতদ্বয়ের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

١٠- قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ
وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ۚ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

৩৯ ঃ ১০ হে নবী বলুন– হে আমার বান্দারা যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের প্রভুকে ভয় কর। যে সব লোক দুনিয়ায় সৎ আচরণ করেছে

www.bjilibrary.com

তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ্র যমিন বিশাল প্রশস্ত। যারা ধৈর্য ধারণ করবে তারা বেহিসাব প্রতিফল পাবে।

কোন কোন তাফসীরকারীর মতে, এই আয়াত আবিসিনিয়ায় প্রথম হিযরতের সময় নাযিল হয়েছিল। ইসলামের প্রাথমিক কালে মক্কায় কাফেরদের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য অন্যত্র হিযরত করার কথা বলে এভাবে বলা হলো যে আল্লাহ্র দুনিয়া প্রশস্ত। অত্যাচারের ভয়ে ভীত হয়ে আল্লাহর দ্বীন পালনে অবহেলা করা যাবে না। পরবর্তীকালে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ বহু দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার হওয়ায় আল্লাহ্র এই বাণীরই প্রতিফলন হলো যে আল্লাহ্র যমিন বিশাল ও প্রশস্ত।

৩০. اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ

৩৯ ঃ ২১ **তুমি কী দেখ না, আল্লাহ্ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন। অতঃপর ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন এবং তা দ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপাদন করেন, অতঃপর তা শুকিয়ে যায় এবং তোমরা তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও। অবশেষে তিনি তা খড়কুটায় পরিণত করেন ? এতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য।**

বৃষ্টির ফোঁটা কীভাবে আসমান থেকে নিচে নেমে আসে তা ২ ঃ ২২ এবং ২ ঃ ১৬ আয়াতদ্বয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গাছপালার বৃদ্ধিতে বৃষ্টির পানির রয়েছে বিরাট প্রভাব এবং অনেক শস্য রয়েছে যেগুলো মৌসুমী বৃষ্টিপাতের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। চুইয়ে চুইয়ে মাটির ভিতরে চলে আসা পানি সংগ্রহ করেও শস্যক্ষেতে সেচ দেয়া যায়। যেমন ঃ আর্টেসিয়ান কূপের সাহায্যে, গভীর নলকূপ এবং পাহাড়ী ঝর্ণা থেকেও পানি সংগ্রহ করা যায়। মাটিতে আর্দ্রতার উপস্থিতিতে শস্য বড় হয়ে পরিপুষ্ট হয় এবং শস্য উৎপাদন করে যার প্রতিটিই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যসূচক বর্ণ দ্বারা পরিচিত হয়। শস্য উৎপাদিত হওয়ার পর একবর্ষী/বর্ষজীবী শস্যগাছের আর কোন কাজ থাকে না; কজেই, পুরো গাছটিই মরে যায়। প্রক্রিয়াটি ঘটে ক্রমান্বয়ে এবং জীবন্ত কোষসমূহ এবং তাদের গঠন-উপাদানসমূহের মৃত্যুর ফলে তা সংঘটিত হয়। সবুজ তন্তুরঞ্জক তথা পত্র হরিতের ধ্বংস সাধনের কারণে এক সময় যে গাছ ছিল সবুজ, তা হলুদ

www.bjilibrary.com

হয়ে যায়। অবিরাম পানি শোষণের কারণে জীবন্ত উদ্ভিদ কোষের অভ্যন্তরে সৃষ্ট রসস্ফীতিজনিত চাপের দ্বারা উদ্ভিদ এবং এর পাতার যে আকৃতি ও দৃঢ়তা বজায় থাকে, তা কোষের মৃত্যুতে নষ্ট হয়ে যায়। গাছ ক্রমান্বয়ে শুকিয়ে যায় এবং শেষতক ভেঙ্গে গুড়িয়ে পড়ে যায় ও মৃত্তিকার অংশে পরিণত হয়।

উপরে বর্ণিত সকল প্রাকৃতিক ঘটনাই আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতা ও দয়ার কথাই ঘোষণা করে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ এ সকল ব্যাপার নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে থাকেন। তারা যতই এসবের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করেন, ততই তারা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন করেন এবং সুগভীর কৃতজ্ঞতায় তার প্রতি সিজদাবনত হন।

٢٣- اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ
يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ ۗ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ○

৩৯ ঃ ২৩ আল্লাহ অতি উত্তম বাণী নাযিল করেছেন একটি কিতাবের আকারে যার সমস্ত অংশ সুষম এবং যাতে বার বার একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তা শুনে যারা তাদের রবকে ভয় করে তাদের চর্ম রোমাঞ্চিত হয় এবং পরে তাদের দেহ ও দিল নরম হয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণে উৎসুক হয়ে ওঠে। এ আল্লাহ্‌র হিদায়াত, এ দ্বারা তিনি যাকে চান তাকে পথ দেখান। আর যাকে আল্লাহ পথ দেখান না (যার পক্ষে আসার যোগ্য নয়) তাদের জন্য কোন হিদায়াতকারী নেই।

এই আয়াতে ভয় শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

কোন সম্ভাব্য বিপদ ঘটার আশঙ্কা থেকে ভয়ের সৃষ্টি হয়। কারো জীবনের প্রতি আশঙ্কাজনক অবস্থা থেকেই সাধারণত ভয়ের সৃষ্টি হয়। সুতরাং বাস্তব কোন বিপদের কারণ প্রত্যক্ষ করলে, ভবিষ্যতে মহাবিপদ হবার আশঙ্কার কথা শুনলে এবং ভবিষ্যতে জীবন নাশের বা মহাবিপদের কারণ হতে পারে এমন মানসিক অবস্থাতেও ভয়ের সৃষ্টি হয়। যা হোক, ভীত হলে আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় এড্রিনাল গ্রন্থিসমূহের রস অতিরিক্ত পরিমাণে নির্গত হয় (epinephrine এবং non-epinephrine) এইসব অতিরিক্ত রাসায়নিক বস্তু

(hormone) রক্তে প্রবেশ করে যার ফলে শরীরের রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, হৃৎপিন্ডের স্পন্দনের হার ও শ্বাস ক্রিয়া বৃদ্ধি (pulse) পায় এবং ত্বকের ক্ষুদ্র ধমনী (arterioles) সমূহ কুঞ্চিত হয়। এসব পরিবর্তনের ফলে ফুসফুস, মস্তিষ্ক এবং মাংসপেশিতে অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চালিত হয় যা ভীত অবস্থায় প্রয়োজন হয়।

ভীত হলে চামড়ার ক্ষুদ্র স্নায়ুতন্তুগুলোও উত্তেজিত হয় যার ফলে চামড়ার ক্ষুদ্র মাংসপেশিগুলো কুঞ্চিত হয়ে শরীরের লোমগুলো খাড়া হয়ে যায় এবং হাসের চামড়ার (goose skin) মত দেখতে হয়। চামড়ার দু'টি অংশ বহিঃত্বক (external epidermis) যা খুবই পাতলা আর অন্তঃত্বক (internal epidermis) যা চামড়ার প্রধান অংশ এবং এতেই লোমের গোড়া, রক্তবাহী শিরা, স্নায়ু, মাংস, ঘর্ম গ্রন্থি ইত্যাদি অবস্থিত। এ কথা সবাই জানে যে ভয়ে চামড়া কুঞ্চিত হয়। যার কারণ এখানে দেওয়া হলো। এছাড়া পেশির শক্তি (energy) সৃষ্টির জন্য শরীরের শর্করা অধিক ব্যবহৃত হয়। আর রক্তপাত হ্রাস করার জন্য রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির জন্য চোখের মণি বড় হয়।

শরীরের এই সমস্ত প্রতিক্রিয়ার উদ্দেশ্য হলো জীবের আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা যা পরিনামে ভয় নামে পরিচিত অবস্থার সৃষ্টি করে। ভয় পেলে ত্বকে সৃষ্ট এমন কুঞ্চনে ত্বক শক্ত হয় যাতে শারীরিক আঘাতে কম ক্ষতি করতে পারে।

যারা সত্যিকার ঈমানদার এবং পরকালে আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় করে, আল্লাহ্‌র আযাব সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতগুলো পাঠ করলে তাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হয়, তাদের ত্বক কুঞ্চিত হয় এবং হৃৎপিণ্ডের গতি বৃদ্ধি পায়। তবে ঈমানদারগণ, পরকালের পুরস্কারের আয়াতসমূহ পাঠ করলে মনে শান্তি লাভ করে, মনের ভয় কেটে যায়, বেহেশতের সুখের সুসংবাদে মন খুশিতে ভরে যায় এবং হৃদপিণ্ডের স্পন্দন স্বাভাবিক হয়ে আসে। যখন ভয় দূর হয় তখন অতিরিক্ত এড্রিনালিন ক্ষরণ বন্ধ হয়, ত্বকের কুঞ্চন দূর হয় এবং শরীরের ভয়জনিত সকল অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

মনের শান্তি বা হৃদয় বিগলিত হওয়ার বিষয়টি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার যা কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তবে আমরা সবাই জানি যে, ভয় কেটে গেলে মন শান্ত হয়, মনে খুশির ভাব সৃষ্টি হয় এবং হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্বাভাবিক হয়। ভয়ে হৃৎপিণ্ডের উপর কোন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে না, কেবল তার স্পন্দনের গতি বৃদ্ধি পায়। আর ভয় দূর হলে সেই গতি স্বাভাবিক হয়ে যায়।

তথ্যসূত্র ঃ

1. L. C. Kolb. Noyes' Modern Clinical Psychiatry, 7th edn. Oxford & IBH Publishing Co. Calcutta, p. 62, 1968.

www.bjilibrary.com

٤٢- اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

৩৯ ঃ ৪২ তিনিই আল্লাহ্ যিনি মৃত্যুর সময় রূহসমূহকে কব্জ করেন, আর যারা এখনও মরে নি তাদেরও ঘুমের সময়। পরে যাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত তাদের রূহ আটকে রাখেন আর অন্যদের রূহকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদের শরীরে ফিরিয়ে দেন। এই বিষয়ে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।

যেহেতু রূহ বা আত্মা মানুষের জ্ঞানের বাইরে তাই এ বিষয়ে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কোন আলোচনা করা সম্ভব নয়। ঘুমের সময় রূহ সাময়িকভাবে কব্জ করা হয়, এ বিষয়েও আমাদের কোন সঠিক জ্ঞান নাই। তবে ঘুম সম্পর্কে ৩০ ঃ ২৩ আয়াতের সঙ্গে এবং পরিশিষ্ট-৮ এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

٤٤- قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ۗ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

৩৯ ঃ ৪৪ বলুন (হে নবী) সমস্ত শাফায়াত তো কেবল আল্লাহ্রই এখতিয়ারভুক্ত। আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর মালিকানা তো শুধু তাঁর। পরে তাঁর দিকেই তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে।

এ বিষয়টি ৫ ঃ ১৯ আয়াতের সঙ্গে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

٦٢- اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۙ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ○

৩৯ ঃ ৬২ আল্লাহ্ প্রত্যেকটি জিনিষেরই সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সব কিছুর অভিভাবক।

এ বিষয়টি ২ ঃ ১১৭ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

٦٧- وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ۗ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

৩৯ ঃ ৬৭ তারা আল্লাহ্র যথোচিত সম্মান করে না; কিয়ামতের দিন পুরো পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে

www.bjilibrary.com

এনে করা হবে তাঁর করায়ত্ত। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাকে তাঁর শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে সবশেষে এই বিশ্বজগতকে গুটিয়ে নিয়ে পৃথিবীকে অতি ক্ষুদ্র অবয়বে সংকুচিত করে নেয়া হবে। এটা জানা কথা যে বিশ্বজগতে দুটি বিপরীতধর্মী বল কাজ করছে ঃ একটি হলো বিস্তৃতি বল (force of expansion) যার উদ্ভব হয়েছে মহাবিস্ফোরণ বা বিগ ব্যাং (big bang) এর কারণে, অপরটি হলো মহাকর্ষজনিত আকর্ষণী বল (force of attraction due to gravity)। বিস্তৃতি বল এখনো কার্যকর আছে বলেই ছায়াপথের নক্ষত্রপুঞ্জগুলো পরস্পর থেকে দূরত্ব বজায় রেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাহলে বিশ্বজগত কি চিরকাল এভাবে বিস্তৃতি ঘটিয়েই চলবে? এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

মহাকর্ষ বল বিশ্বজগতের বিস্তৃতিকে বাধা দিয়ে থাকে। ছায়াপথের ও নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে পরস্পরের আকর্ষণ তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার গতিকে কমিয়ে দেয়। এটা হচ্ছে বিশ্বের বিস্তৃতি বল এবং সুদূরপ্রসারী মহাকর্ষ বল-এর মধ্যেকার সংঘাত। যদি বিস্তৃতি বল জয়ী হয়ে যায় তবে অনাদিকাল ধরে বিরতিহীনভাবে বিশ্বজগতের বিস্তৃতি চলতেই থাকবে। অপরদিকে যদি মহাকর্ষ বল জয়লাভ করে তবে এই আকর্ষণী বল ছায়াপথের গতিশীল নক্ষত্রপুঞ্জের গতিকে শ্লথ করে দেবে এবং এক পর্যায়ে স্থবির হয়ে পড়বে। মহাকর্ষ বল পুনরায় তাদেরকে একত্রিত করে দেবে, বিশ্বজগত ক্ষুদ্রাকারে সংকুচিত হয়ে পড়বে। বিজ্ঞানীরা আজ অবধি এটা নিশ্চিতরূপে জানতে সক্ষম হননি যে দুটি বলের মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ে কোনটি বিজয়ী হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, পরিশেষে বিশ্বজগতকে গুটিয়ে আনা হবে। তাহলে বলা যায় যে মহাকর্ষ বল জয়ী হবে। সুতরাং আমরা মেনে নিতে পারি যে চূড়ান্ত পর্যায়ে মহাকর্ষ বল প্রাধান্য অর্জন করবে এবং বিশ্বজগত এক ভয়ংকর আন্তঃসংকোচনের (tremendous implosion) মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যাবে। একে বলা হয় মহাকুঞ্চন বা big crunch। এই ধারণা থেকে আমরা সেই সর্বনাশা মহাকুঞ্চন আগমনের সময় হিসাব করতে পারি। মার্কিন বিজ্ঞানী ফ্রিম্যান ডাইসন[১]-এর মতে "মহাকুঞ্চনের একশত কোটি বছর আগে সুপার গ্যালাক্সিপুঞ্জ এবং কোয়াসার (quasar)গুলো একসঙ্গে ধাবিত হয়ে তাদের মধ্যেকার শূন্য পরিসর (space) ভরে তুলবে (অর্থাৎ বিশ্বজগত তার প্রান্তভাগ থেকে সংকুচিত হতে শুরু করবে)। মহাকুঞ্চনের দশ কোটি বছর আগে প্রতিটি গ্যালাক্সির ব্যবধান ঘুচে যাবে এবং সবগুলো গ্যালাক্সি একত্রিত হয়ে যাবে। আমাদের গ্যালাক্সিতে নক্ষত্রগুলো বর্তমানে যে দূরত্বে অবস্থান করছে অনেকটা

সেরূপ দূরত্বে সমগ্র বিশ্ব তখন তারকারাজিতে ভরে যাবে। মহাশূন্য সংকুচিত হতেই থাকবে। ছায়াপথগুলো ঘনিষ্ঠ হয়ে যাবে, মহাকর্ষ বল তারকামণ্ডলীকে আরো কাছে থেকে কাছে নিয়ে আসবে। মহাকুঞ্চনের এক লক্ষ বছর পূর্বে কোন এক সময়ে তারকাগুলো এতো কাছাকাছি এসে পড়বে যে আকাশ শুধুমাত্র চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতায় পরিপূর্ণ থাকবে না, সে সাথে অসহনীয় গরম হয়ে উঠবে। এ সময়ে বিশ্বের কোন গ্রহে অবশ্যই প্রাণের অস্তিত্ব থাকবে না। মহাকুঞ্চনের মাধ্যমে বিশ্বজগত নিজে নিজে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার এক হাজার বছর পূর্বে শত শত তারকা একে অপরের সাথে ধক্কাধাক্কি করবে। অতঃপর তারা প্রত্যেকে লণ্ডভণ্ড হয়ে ধ্বংসের কৃষ্ণ গহ্বরে পতিত হবে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে একদা বিশ্বজগত-এর সকল কিছু কুঞ্চিত এক অতি ক্ষুদ্র এককে (a tiny infinitely compressed singularity) পরিণত হবে।

এভাবে শেষ দিনে বিশ্ব জগতকে গুটিয়ে এনে সীমাহীন ক্ষুদ্র অবয়বে পরিণত করা হবে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. F. Dyson, Restless Universe, Henbest and Couper George Philip, 1982.

www.bjilibrary.com

٧٥- وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ
وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৩৯ ঃ ৭৫ এবং তুমি ফিরিশতাদের দেখতে পাবে যে তারা আরশের চারপাশে ঘিরে তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর তাদের বিচার করা হবে ন্যায়ের সাথে, চারপার্শ থেকে উচ্চারিত হবে- প্রশংসা, জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র প্রাপ্য।

আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা গীত হবে অসংখ্য কারণে। আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ব জগতের প্রভু হওয়ার কারণ ছাড়াও কিছু কিছু কারণ ১ ঃ ২ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে উপস্থাপন করা হয়েছে।

١٣- هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ۚ
وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ○

৪০ ঃ ১৩ তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলি দেখান এবং আকাশ হতে প্রেরণ করেন তোমাদের জন্য জীবনোপকরণ; আল্লাহ্‌র অভিমুখী ব্যক্তিই উপদেশ গ্রহণ করে।

আকাশ থেকে জীবনোপকরণ প্রেরণের বিষয়ে ১৫ ঃ ২১ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচন করা হয়েছে।

١٨- وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ۚ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ
وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ○

৪০ ঃ ১৮ তাদেরকে সতর্ক করে দাও আসন্ন দিন সম্পর্কে, যখন দুঃখ কষ্টে তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে। সীমালংঘনকারীদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই, যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে এমন কোন সুপারিশকারীও নেই।

আকস্মিক বিপদের কারণে ভীত মানুষের হৃৎকম্প বেড়ে যেতে পারে এবং শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি হয়ে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে। এই আয়াতে কিয়ামতের দিনের ভীতিকর অবস্থার কথা প্রকাশ করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

٢١- أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ ۚ
كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ
وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ○

৪০ ঃ ২১ তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করলে দেখতো তাদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছিল। পৃথিবীতে তারা ছিল শক্তিতে ও কীর্তিতে প্রবলতর। অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন তাদের অপরাধের জন্য এবং শাস্তি হতে তাদের রক্ষা করার কেউ ছিল না।

এ বিষয়ে ২২ ঃ ৪৫ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে।

٥٧- لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○

৪০ ঃ ৫৭ মানুষ সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি তো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষের সাম্প্রতিক জ্ঞান বিষয়ে ২ ঃ ১১৭, ২ ঃ ১৬৪, ৭ ঃ ৫৪ আয়াতসমূহের ব্যাখ্যাকালে এবং পরিশিষ্ট ১ ও ২-এ আলোচনা করা হয়েছে। কাদা মাটির নির্যাস ও একটি শুক্রবিন্দু থেকে মানুষের সৃষ্টি এবং মাতৃজঠরে ভ্রূণের বিকাশ লাভ সম্পর্কিত বিষয়ে ২৩ ঃ ১২-১৪ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

সুপ্রতিষ্ঠিত মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব (Big Bang Theory) বহু প্রত্যয়গত (conceptual) সমস্যার কথা বলা যেতে পারে। এই তত্ত্ব অনুসারে আদিতে স্থান ও কালের (space, time) অস্তিত্ব ছিল না। তাহলে এ কথায় আসতে হয় যে শূন্য থেকে এই বিশ্ব জগতের উদ্ভব হয়েছে, এর তাৎপর্য কী? এই সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য সম্প্রতি তন্তু তত্ত্ব (string theory)-এর কথা বলা হচ্ছে। যা হলো মাত্রাযুক্ত বাঁক বা dimensional carve-এর অনুরূপ। এই তন্তুগুলো অতি মাত্রায় ক্ষুদ্র। তাই এগুলোকে কখনো সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা যাবে বলে আশা করা যায় না। তাহলে এটা মূলত singularity সমস্যাকে এড়ানোর জন্য একটি বিশ্বাসের বিষয় মাত্র। দ্বিতীয় যে গুরুতর সমস্যার জবাব জানা আবশ্যক তাহলো পশ্চাৎ বিকিরণ (background radiation) ৩° ডিগ্রী কেলভিন হয়ে থাকে কেন, এটা কি মহাবিস্ফোরণজনিত (big bang) isotropic-এর

www.bjilibrary.com

অবশিষ্টাংশ? একটি ত্রিমাত্রিক পরিসর সম্পন্ন সমতলের space-time (স্থান-কাল)-এ দীর্ঘকালব্যাপী isotropizing-এর অসাধারণ গুণ থাকে। এটি সমতলীয় সমস্যা (flatness problem) নামে অভিহিত। যদি কোন ব্যক্তি মহাজাগতিক সময়ের অর্থাৎ প্ল্যাংক টাইম Planck time (t=10^{43} সেঃ)-এর প্রথম অবস্থায় বিশ্বজগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করতো তাহলে সে দেখতো যে আজকের বিশ্বকে এই অবস্থায় পেতে হলে বিস্তৃতির হার 10^{57}-এর চাইতে কমে সঠিক মাত্রার সাথে সামঞ্জস্যশীলতা রক্ষা করতে হচ্ছে। বিশ্ব জগতের এই অতিমাত্রার ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ কোন জুয়াড়ীর অন্ধ চাল-এর ন্যায় নিছক কোন দুর্ঘটনা হতে পারে না। কোন জুয়াড়ী ক্যাসিনোতে প্রবেশ করেই দেখতে পেল যে একই সাথে দুটি গুটিতে ছক্কা উঠেছে। এতে সে সম্পূর্ণ ভ্রান্তিবশত ধরে নিতে পারে যে, এটি ঘটেছে তার শুভ প্রবেশের কারণে। অথচ এটা ঘটেছে সম্ভাবনা সূত্রের মহা বৈশিষ্ট্যের কারণে, অর্থাৎ এই সূত্র অনুসারে বহুবার চেষ্টা করলে স্বল্প সম্ভাবনার কাম্য ফলাফল যে কোন সময় ঘটতে পারে। তবে সাফল্যের সংখ্যা সম্ভাব্য অবস্থার চাইতে বেশী হবে না।

পরিশেষে বিজ্ঞানী ডিরাক-এর বিপুল সংখ্যক প্রাক-কল্পনার (hypothesis) কথা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক। এ সকল প্রাক-কল্পনায় দেখানো হয়েছে যে, মহাজাগতিক সময়ের শুধুমাত্র একটি সীমিত সূচনাকালে, যখন নভোমণ্ডলীয় অবস্থা অনুকূল থাকে তখন জীবন, মন ও চেতনার বিকাশ ঘটতে পারে। তাহলে জুয়াড়ীর অন্ধ চালের মতো বলতে হবে যে প্রায় শূন্য সম্ভাবনা থেকে ঘটনাটি ঘটেছে- কারণ আমরা আছি অথচ ঘটনাটি ঘটেছে আমরা থাকার জন্য।

এই বিশাল বিশ্বজগতের সৃষ্টি সম্পর্কে গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে গিয়ে মানুষ যে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে এবং কিছু কিছু অতীব জটিল সমস্যার যে এখনো সমাধান পাওয়া যায়নি, সে সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। অংক শাস্ত্রীয় জটিলতা যাই থাকুক না কেন শেষ পর্যায়ে মানুষকে একক বা singularity, তন্তু তত্ত্ব ইত্যাদি কোন একটি বিশ্বাসের কাছে এসে থামতে হয়। অপরদিকে প্রজনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টির বিষয়টি এখন সুবিদিত ডি. এন. এ (deoxyribonucleic acid) সম্পর্কিত জ্ঞান আমাদের জ্ঞানের পরিধিকে আরো বিস্তৃত করেছে। তবুও এখনো বহু কিছু সম্পর্কে জানার বাকি আছে। তবে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে গিয়ে আমরা নিশ্চিতভাবে সবচাইতে জটিল সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি।

৫৯- إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

৪০ ঃ ৫৯ কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বিশ্বাস করে না।

www.bjilibrary.com

সাধারণভাবে মানুষ মনে করে যে, দুনিয়ার জীবন চিরস্থায়ী হবে। কিন্তু এই ধারণা ভুল, অব্যাহত জীবনধারা প্রধানত নির্ভর করে সূর্য হতে সরবরাহকৃত শক্তির উপর। যাহোক এভাবে শক্তি উৎপাদন করতে গিয়ে সূর্য বিস্ময়কর হারে তার ভর হারাচ্ছে এবং ফলে একদিন তা ধ্বংস হতে বাধ্য। বিষয়টি ৭ ঃ ৫৪ আয়াত প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

٦١- اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الَّیْلَ لِتَسْكُنُوْا فِیْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ
عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْكُرُوْنَ ۝

৪০ ঃ ৬১ আল্লাহ্ই তোমাদের বিশ্রামের জন্য সৃষ্টি করেছেন রাত এবং আলোকোজ্জ্বল দিন। আল্লাহ্ তো মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

রাত যে বিশ্রাম ও শান্তির জন্য, সে সম্পর্কে ৬ ঃ ৯৬ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। আর দিনের আলো এ জন্য যে, আমরা যেন সব কিছু দেখতে পারি। এ বিষয়ে ১০ ঃ ৬৭ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে স্পষ্টতই দিন ও রাত উভয়ই আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত, এজন্য আমাদের তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

٦٢- ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ ۘ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۝

৪০ ঃ ৬২ এই তো আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক, সব কিছুর স্রষ্টা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, সুতরাং তোমরা কীভাবে বিপথগামী হচ্ছো?

আল্লাহ্ তা'আলা যে সবকিছুর স্রষ্টা সে বিষয়ে ২ ঃ ১১৭, ২ ঃ ১৬৪, ৭ ঃ ৫৪ এবং পরিশিষ্ট ১, ২ এবং ৪-এ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

٦٤- اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ
وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚۖ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

৪০ ঃ ৬৪ আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন উৎকৃষ্ট এবং তোমাদের দান করেছেন উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ; এই তো আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক! কত মহান জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্!

www.bjilibrary.com

বিশ্রামের স্থান হিসেবে পৃথিবী

এ বিষয়ে ২ ঃ ২২ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

শামিয়ানা হিসেবে আকাশ

আকাশ যে রক্ষাকারী এবং মানুষের মাথার উপর শামিয়ানার মতো উপকারী আচ্ছাদন হিসেবে কাজ করে সে সম্পর্কে ২ ঃ ২২ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষকে সুন্দর আকৃতি দান

এ বিষয়ে ১৩ ঃ ৮ আয়াত প্রসঙ্গে এবং পরিশিষ্ট ৬-এ আলোচনা করা হয়েছে।

জীবিকার সংস্থান

আকাশ থেকে জীবনোপকরণ প্রেরণ সম্পর্কে ১৫ ঃ ২১ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে।

٦٦- قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَٰتُ
مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَٰلَمِينَ ○

٦٧- هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا
ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ
وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○

৪০ ঃ ৬৬-৬৭ বল, আমার প্রতিপালকের নিকট হতে আমার নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পর তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে আহ্বান কর, তাদেরকে ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করতে।

তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে, পরে শুক্র বিন্দু হতে, তারপর আলাকা হতে, তারপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে, অতঃপর তোমরা যেন উপনীত হও যৌবনে, তারপর হও বৃদ্ধ। তোমাদের মধ্যে কারও এর

www.bjilibrary.com

পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং এটা এজন্য যে, তোমরা নির্ধারিতকাল প্রাপ্ত হও এবং যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।

আল্লাহ্‌র নিদর্শন ও জগতসমূহের প্রভু

আল্লাহ্ তা'আলা ৪০ ঃ ৬৬ আয়াতে জগতসমূহের প্রভু হিসেবে তাঁর সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহের কথা বলা হয়েছে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনসমূহ বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য সম্বলিত। এর মধ্যে কিছু কিছু নিদর্শন সম্পর্কে অন্যান্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা যে জগতসমূহের প্রভু সে সম্পর্কে ১ ঃ ২ আয়াত প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি

৪০ ঃ ৬৭ আয়াতে উল্লেখিত মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি হওয়ার কথাটি বুঝা যায় যখন দেখা যায় যে মানব দেহ যে সকল প্রধান প্রধান গঠনকারী উপাদান নিয়ে গঠিত সে সকল উপাদান মাটিতেও আছে। মাটির নমুনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে গঠনকারী উপাদানগুলো পাওয়া গেছে তা নিম্নের সারণি-১ এ দেখানো হলো।

সারণি-১, ভূ-ত্বকের রাসায়নিক গঠনের গড় হিসাব[১]

উপাদান	মাটিতে বিদ্যমান উপাদানের হার (শতকরা হিসেবে)	অক্সাইডসমূহ	মাটিতে বিদ্যমান অক্সাইডের শতকরা হার
O	৪৬.৪৬		
Si	২৭.৬১	SiO_2	৫৯.০৮
Al	৮.০৭	Al_2O_3	১৫.২৩
Fe	৫.০৬	Fe_2O_3	৩.১০
Ca	৩.৬৪	FeO	৩.৭২
Mg	২.০৭	CaO	৫.১০
Na	২.৭৫	MgO	৩.৪৫
K	২.৫৮	Na_2O	৩.৭১
Ti	০.৬২	K_2O	৩.১১
P	০.১২	TiO_2	১.০৩
Mn	০.০৯	P_2O_5	০.২৯
S	০.০৬	MnO	০.১২
Cl	০.০৫	H_2O	১.৩০

www.bjilibrary.com

মজার ব্যাপার হলো, এই একই উপাদানগুলো মানব দেহেও বিদ্যমান। যা হোক এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এ সকল উপাদান একত্রিত করলেই মানুষ বা জীবন সৃষ্টি হবে না। এ সকল উপাদান দ্বারা জীবন সৃষ্টি করা ঐশী কাজ। আধুনিক বিজ্ঞান এই কাজের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র উন্মোচন করেছে।

শুক্র বিন্দু এবং 'আলাক' থেকে সৃষ্টি

৪০ ঃ ৬৭ আয়াতে উল্লেখিত এ বিষয়টি সম্পর্কে ১৮ ঃ ৩৭, ২২ ঃ ৫ এবং ২৩ ঃ ১৩-১৪ আয়াতসমূহের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. F. W. Charke, and S. H. S. Washington, The Composition of the Earth's Crust, U. S. Geological Survey Profess. Paper 127, 1924.

www.bjilibrary.com

٦٨- هُوَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۚ فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

৪০ : ৬৮ তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান, যখন তিনি কিছু স্থির করেন তখন তিনি বলেন 'হও' এবং তা হয়ে যায়।

ইলাহী আদেশ 'হও' সম্পর্কে ৩৬ : ৮২ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

٧٩- اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝

٨٠- وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِىْ صُدُوْرِكُمْ
وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ۝

৪০ : ৭৯-৮০ আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য আনআম সৃষ্টি করেছেন। কিছুতে আরোহণ করার জন্য এবং কিছু তোমরা আহার করে থাক। এতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকার, তোমরা যা প্রয়োজনবোধ কর, এদ্বারা পূর্ণ করে থাক এবং এর উপর ও নৌযানের উপর তোমাদেরকে বহন করা হয়।

এখানে পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য যে সকল আনআম বা পশু নিয়ামত হিসেবে দিয়েছেন তা থেকে আমরা যানবাহন, মাংস ও দুধ আকারে যে সকল সুবিধা পেয়ে থাকি সে সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যান্য সুবিধা যেমন পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে ১৬ : ৫, ১৬ : ৭, ১৬ : ৮ এবং ১৬ : ৬৬ আয়াতসমূহের ব্যাখ্যাকালে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

সমুদ্রের বুকে মানষের উপকারার্থে জাহাজ চলাচল সম্পর্কে ২ : ১৬৪ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করা হয়েছে।

٨٢- اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ
كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَاَشَدَّ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِى الْاَرْضِ
فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

৪০ : ৮২ তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নি ও দেখে নি তাদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছিল? পৃথিবীতে তারা ছিল তাদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তি ও কীর্তিতে প্রবল। তারা যা করতো তা তাদের কোন কাজে আসেনি।

এ প্রসঙ্গে ৭ : ৪ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

৯- قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ۚ
ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ○
১০- وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ
سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ○
১১- ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ۚ
قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ○
১২- فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ
الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ○

৪১ ঃ ৯-১২ তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক।

তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূ-পৃষ্ঠে এবং এতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চারদিনের মধ্যে এতে ব্যবস্থা করেছেন পরিমিত খাদ্যের, যাঞ্চাকারীদের জন্য।

অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অতঃপর তিনি তাকে এবং পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়, তারা বললো আমরা আসলাম অনুগত হয়ে।

অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলকে দু'দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশে এর বিধান ব্যক্ত করলেন। এবং নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলেন প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলেন সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনা।

পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি

এই আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ২ দিনে, জীবিকার জন্য খাদ্য ৪ দিনে এবং সপ্তাকাশ ২ দিনে। এতে প্রতীয়মান হয় যে সৃষ্টির এই ঘটনাগুলো মোট ৮ দিনে সম্পন্ন হয়েছে। ৭ ঃ ৫৪ আয়াতের বক্তব্যের সাথে উপরের বর্ণনায় পরস্পর বিরোধিতা আছে বলে মনে হতে পারে।

www.bjilibrary.com

যেখানে বলা হয়েছে যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে ৬ দিনে। সুতরাং এখানে ২ দিনের গরমিল দেখা যায়। ৭ ঃ ৫৪ আয়াতের আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে 'দিন' বলতে শুধুমাত্র পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর একবার আবর্তনের সময়কে বুঝানো হয় না। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট 'দিন' বলতে কোন একটি নির্দিষ্ট ঘটনা সম্পন্ন হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময়কে বুঝানো হতে পারে। কোন একটি ঘটনার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দীর্ঘ হতে পারে, আবার অন্য ক্ষেত্রে হ্রস্ব হতে পারে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার 'দিন' আমাদের সময়ের হিসাবে ১০০০ বছর অথবা ৫০০০০ বছর হতে পারে। অধিকন্তু দুটি ঘটনা একই সাথে ঘটতে পারে। ৭ ঃ ৫৪ আয়াতের আলোচনায় বলা হয়েছে যে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে একই সাথে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নয়। সুতরাং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টির দুটি ঘটনা সম্পন্ন হয়েছে একই পর্যায়ে। ৭ ঃ ৫৪ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে উল্লেখ করা হয়েছে যে পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পর উদ্ভিদ ও পশুপাখি বর্তমান অবস্থায় এসেছে ৪টি পর্যায়ে অর্থাৎ ৪টি ভূতাত্ত্বিক পর্যায়ের মাধ্যমে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের মধ্যে পৃথিবী সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে ৪১ ঃ ৯ আয়াতে এবং আকাশমণ্ডল সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে অন্য আয়াতে অর্থাৎ ৪১ ঃ ১২ আয়াতে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে একই সময়ের দুটি পর্যায় সম্পর্কে দুটি ভিন্ন আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এই পর্যায়গুলোকে গণনা করতে হবে ২ হিসেবে, ৪ নয়। সুতরাং এই আয়াতগুলোতে কোন পরস্পর বিরোধিতা নেই।

জগতসমূহের প্রভু

১ ঃ ২ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পর্বতসমূহের দৃঢ়ভাবে অবস্থিতি

এ বিষয়ে ১৩ ঃ ৩ এবং ২১ ঃ ৩১ আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে।

পরিমিত খাদ্যের ব্যবস্থা

পরিমিত খাদ্যের ব্যবস্থা করার অর্থ হলো বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যের যোগান দেয়া যাতে মানুষ সুষম খাবার প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো যথার্থ পরিমাণে পায়, যা তার সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয়। একটি পূর্ণাঙ্গ খাবারে থাকে

www.bjilibrary.com

১৫% প্রোটিন, ৬০% কার্বোহাইড্রেট, ১৫% চর্বি এবং ১০% পানি, খনিজ এবং ভিটামিন। অনুরূপভাবে অন্যান্য প্রাণীর খাবারেও প্রয়োজনীয় উপাদান যথাযথ পরিমাণে থাকতে হয়। খাদ্যের উৎস হচ্ছে পৃথিবীর উপরিভাগে পাওয়া উদ্ভিদ ও পশু পাখি। খাদ্যের এই উৎসগুলো ৪টি ভূতাত্ত্বিক যুগের ৪টি স্তরে বিবর্তিত হয়েছে। ৭ ঃ ৫৪ আয়াতে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আকাশ ও পৃথিবী উভয়ের নিকটবর্তী হওয়া

এখানে পৃথিবীর প্রথম পর্যায় সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। ৭ ঃ ৫৪ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে এ অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যে মহাবিস্ফোরণের (big bang) পর আদি অগ্নিগোলক বিস্ফোরিত হয়ে প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন সমৃদ্ধ গ্যাস দ্রুত সম্প্রসারণ ও শীতলীকরণের মাধ্যমে এক গভীর বিকিরণ সমুদ্ররূপে আবির্ভূত হয়। প্রথমে বিকিরণের চাপ সুচারুরূপে বিস্তৃতি রক্ষা করে চলে; কিন্তু এর ফলে দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরুতে মহাকর্ষ বলের আবির্ভাব হয় এবং বস্তুগুলোকে একত্রিত করতে আরম্ভ করে। প্রোটন ও ইলেকট্রন একত্রে সন্নিবেশিত হয়ে হাইড্রোজেন নিউক্লিয়ী গঠন করে। বেশীর ভাগ হাইড্রোজেন এ্যাটমজাত বস্তু এবং কিছু হিলিয়াম একত্রে সন্নিবেশিত হয়ে পুঞ্জীভূত আকার ধারণ করে। গ্যাসের এই পুঞ্জগুলো একে অপর থেকে আলাদা হয়ে ভেসে বেড়াতে থাকে। কিন্তু মহাকাশে ভাসমান এ সকল বস্তু মহাকর্ষ বলের কারণে আশপাশের আরো বস্তুকে ঘন সন্নিবিষ্ট করে দেয় এবং আলগা ধরনের দল সৃষ্টি করে, যেমন তারকা পুঞ্জ ও গ্যালাক্সীসমূহের স্থানীয় দল এবং গ্যালাক্সীসমূহের স্থানীয় পুঞ্জ ইত্যাদি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন আকাশ সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের সৌর জগতে যেরূপ সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলো নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায় সেরূপভাবে নাক্ষত্রিক ব্যবস্থাও গঠিত হয়ে থাকে। এভাবে মহাকর্ষ বলের কারণে তথা আল্লাহ্র আদেশে পৃথিবী সূর্যের দিকে আকর্ষিত হতে থাকে এবং কাছে চলে আসে। অতএব এভাবে দু'পর্যায়ের শেষে অর্থাৎ ২ দিনে সপ্তাকাশের সৃষ্টি সম্পন্ন হয়েছে।

সপ্তাকাশ সৃষ্টি

সপ্তাকাশ সৃষ্টি সম্পর্ক ২ ঃ ২৯ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্ব জগত তার সকল অংশ তথা সাত আসমান নিয়ে সুশৃংখল ও সুসমন্বিত রূপে আছে। এই শৃংখলা ও নিখুঁত ভারসাম্য ব্যবস্থায় বিশ্ব জগতের প্রতিটি অংশের নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। বিশ্ব জগতের যে কোন অংশে বিশৃংখলা বা আদেশের প্রতি অবাধ্যতা সমগ্র বিশ্ব জগতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে।

বিগ-ব্যাং-এর এক সেকেণ্ড পরের অবস্থা সম্পর্কে লোভেল[১] মন্তব্য করেছেন যে, যদি ঐ মুহূর্তে বিশ্বজগতের কোন একটি অংশের বিস্তৃতি এক লক্ষ কোটি ভাগেরও কম হারে হতো তাহলে কয়েক মিলিয়ন বছরের মধ্যে বিশ্বজগত ধ্বংস হয়ে যেত। তিনি আরো লিখেছেন যে "অনুরূপভাবে যদি বিস্তৃতি সামান্যতম হারেও বৃদ্ধি পেত তাহলে তার বিশালত্ব এতো বেশী হতো যে মহাকর্ষ নিয়ন্ত্রিত (অর্থাৎ তারকাপুঞ্জ ও গ্যালাক্সিসমূহ) কোন ব্যবস্থা গড়ে উঠতো না।"

সৌরজগত, আমাদের গ্যালাক্সির অন্তর্ভুক্ত তারকাপুঞ্জ তথা ছায়াপথ নিয়ে পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশ গঠিত হয়েছে। এখানে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহসমূহ এবং বিভিন্ন ধরনের তারকা সন্নিবেশিত রয়েছে, এগুলো আকাশকে আলোকমালায় সুশোভিত করেছে। আকাশমণ্ডলীয় এ সকল বস্তু অত্যন্ত নিখুঁতভাবে আল্লাহ্ তা'আলার বিধান মেনে চলছে। এ বিষয়ে ৭ ঃ ৫৪ আয়াতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Lovell, Bernard, In the Centre of Immensities, Huchinson and Co. Ltd. London. pp. 122-23, 1979.

www.bjilibrary.com

١٣- فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَٰعِقَةً
مِّثْلَ صَٰعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ۝

৪১ ঃ ১৩ তবুও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল, 'আমি তো তোমাদেরকে সতর্ক করছি এক ধ্বংসকর শাস্তির, আদ ও ছামূদের শাস্তির অনুরূপ।

এই আয়াতে অবিশ্বাসের পরিণতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। অবিশ্বাসীদেরকে আদ ও ছামূদ জাতির অনুরূপ শাস্তি দেয়া হতে পারে, যে সম্পর্কে ১১ ঃ ৬০ ও ২২ ঃ ৬৫ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

١٦- فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِىٓ أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ فِى
الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْءَاخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ۝

৪১ ঃ ১৬ অতঃপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাবার জন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝা বায়ু অশুভ দিনে। পরলোকের শাস্তি তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

এই আয়াতে আদ জাতির অবাধ্যতার জন্য প্রদত্ত শাস্তির কথা বলা হয়েছে। তাদের উপর একটি শাস্তি এসেছিল ঝঞ্ঝা বায়ুর আকারে। বিভিন্ন প্রকার বায়ু সম্পর্কে ১৭ ঃ ৬৯ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

١٧- وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ
فَأَخَذَتْهُمْ صَٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

৪১ ঃ ১৭ আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে আমি তাদেরকে পথ নির্দেশ করেছিলাম কিন্তু তারা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করেছিল। অতঃপর তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আঘাত হানল তাদের কৃতকর্মের পরিণামস্বরূপ।

সায়িকাত তথা বজ্র ও বিদ্যুতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ২ ঃ ১৯ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। বিদ্যুতালোকের দ্বারা যে ক্ষতি হয় সে সম্পর্কে ১৩ ঃ ১২ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

৩৭- وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ○

৪১ ঃ ৩৭ তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত, দিন, সূর্য ও চাঁদ। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চাঁদকেও নয়, সিজদা কর আল্লাহ্‌কে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।

রাত এবং দিন যে আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শন সে সম্পর্কে ২ ঃ ১৬৪ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে। চাঁদ এবং সূর্য আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শন হওয়া সম্পর্কে ১০ ঃ ৫ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে। চন্দ্র ও সূর্যের সৃষ্টি সম্পর্কে পরিশিষ্ট-১-এ আলোচনা করা হয়েছে।

অনেক অজ্ঞ লোক চন্দ্র এবং সূর্যকে সিজদা করে অথচ আল্লাহ্ তা'আলা যিনি স্রষ্টা এবং জগতসমূহের প্রতিপালক, তিনিই একমাত্র সিজদা পাওয়ার যোগ্য।

৩৯- وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ

اِنَّ الَّذِيْۤ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৪১ ঃ ৩৯ এবং তার একটি নিদর্শন এই যে তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক, ঊষর। অতঃপর আমি এতে বারি বর্ষণ করলে তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। যিনি ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই মৃতের জীবন দানকারী। তিনি তো সব বিষয়ে জীবনদানকারী।

শুষ্ক ভূমিকে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক বারিপাতের মাধ্যমে পুনর্জীবিত করা সম্পর্কে ২ ঃ ১৬৪ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে।

৪৭- اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٰتٍ مِّنْ اَكْمَامِهَا

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ اَيْنَ شُرَكَآءِيْ ۙ

قَالُوْۤا اٰذَنّٰكَ ۙ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ ○

৪১ ঃ ৪৭ কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌তেই ন্যস্ত, তাঁর অজ্ঞাতসারে কোন ফল আবরণ হতে বের হয় না, কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তানও প্রসব করে না, যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেন, 'আমার শরীকেরা কোথায়?' তখন তারা বলবে, আমরা আপনার নিকট নিবেদন করেছি যে, এ ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না।

www.bjilibrary.com

গর্ভাশয়ে গর্ভধারণের অর্থ হলো পূর্ণাঙ্গ ডিম্বাণুর সাথে শুক্রাণুর সংমিশ্রণের মাধ্যমে ভ্রূণের জন্মলাভ এবং তা জরায়ুতে সংস্থাপিত হওয়া। এই প্রক্রিয়া এমনিভাবে ঘটে যার সঠিক সময় সম্পর্কে মানুষের কোন জ্ঞান নেই, কেবল আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। এ সম্পর্কে ৩১ ঃ ৩৪ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এমনকি সফলভাবে সন্তান প্রসব করাও আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানের অধীন। এ বিষয়ে পরিশিষ্ট-৬-এ আলোচনা করা হয়েছে।

৫৩. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ
يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ○

৪১ ঃ ৫৩ আমি তাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করব দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে ফলে তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটাই সত্য। এটা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপালক সর্ব বিষয়ে অবহিত?

এবারে প্রথমে দিগন্তের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে এবং জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে কিভাবে দিগন্তের পরিধি বিস্তৃত হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করব। সভ্যতার প্রথম থেকেই মানবজাতির নিকট আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনাবলি পর্যায়ক্রমে প্রদর্শিত হয়েছে এবং আগামী দিনেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত মনে করা হতো যে আকাশে তারকারাজি এবং সাতটি গ্রহ আছে। চন্দ্র এবং সূর্যকে দুটি গ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হতো, মনে করা হতো যে পৃথিবী গ্রহ নয় বরং তা কেন্দ্রস্থলে অনড়ভাবে স্থাপিত। তারপর জানা গেল যে সূর্য এবং চন্দ্র দুটি গ্রহ, তবে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরে। আরো জানা গেল যে বিভিন্ন ধরনের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী আছে যেমন তারকাপুঞ্জ, গ্রহসমূহ, উপগ্রহসমূহ, নেবুলা, গ্যালাক্সি ও কোয়াসারসমূহ। মানব জাতিকে আরো জানানো হলো যে বিভিন্ন ধরনের তারকা বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্টি হয়েছে। পরিশিষ্ট-১-এ দেখানো হয়েছে যে কোন তারকার ভর যদি সূর্যের তুলনায় এক দশমাংশেরও কম হয় তাহলে নিউক্লিয়ার সংযোজন (neclear fusion) তৈরি হয় না, শুধুমাত্র মহাকর্ষজনিত চাপের কারণে সৃষ্ট তাপের দ্বারা কিরণ দিয়ে থাকে। এই তাপমাত্রার একটি তারকার রং হয়ে থাকে বাদামী, তাই এরূপ তারকাকে বাদামী বামন (brown dwarf) নামে অভিহিত করা হয়। যদি কোন

তারকার ভর বেশী হয় (তবে সূর্যের তুলনায় ১.৪৪ গুণের চাইতে বেশী না হয় ক্রান্তি ভর (critical mass; Chandrasekhars limit) চন্দ্র শেখর মাত্রা) তাহলে নিউক্লীয় সংযোজন (nuclear fusion) সম্ভব এবং সেখানকার মহাকর্ষ বল তারকার বিস্তৃতি ঘটাতে চেষ্টা করে। এভাবে দীর্ঘকাল ধরে অর্থাৎ প্রায় ১২ শত কোটি বছর ধরে ভারসাম্য রক্ষা করে। এই পর্যায়ে তারকাকে বলা হয় প্রধান অনুবর্তী তারকা (sequence star)। কিন্তু পরিশেষে বিকিরণ চাপ মহাকর্ষ বল-এর উপর জয়ী হয় এবং তারকাটি বিশাল আকার ধারণ করে; তাপমাত্রা কমে গিয়ে রক্ত বর্ণ ধারণ করে। এই পর্যায়ের তারকাকে বলা হয় লাল দৈত্য তারকা (red giant star)। এভাবে বিস্তৃতি অব্যাহত থাকে এবং তারকার মধ্যে অস্থির অবস্থা চলতে থাকে। তারকাটি পর্যায়ক্রমে স্পন্দিত, বিস্তৃত এবং সংকুচিত হয়। এই পর্যায়ের তারকাকে বলা হয় স্পন্দিত তারকা (pulsating star)। অবেশেষে তারকার বহিরাবরণ পৃথক হয়ে দূরে সরে যায় এবং কেন্দ্রীয় অংশ দারুণভাবে সংকুচিত হয়ে যায়। এ সময়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং তারকাটি সাদা দেখায়। এই পর্যায়ের তারকাকে শ্বেত বামন (white dwarf) তারকা নামে অভিহিত করা হয়।

যদি তারকার ভর বেশী হয় তবে ক্রান্তি ভরের (critical mass) চাইতে বেশী না হয়, ধরা যাক তারকার ভর যদি দশগুণ বেশী হয় তাহলে মহাকাশের চাপ এতো বেশী হয় যে তখন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। এ সময় শ্বেত বামন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই ধ্বংসাত্মক ঘটনার ফলে নোভা (nova) এবং সুপার নোভা বিস্ফোরণের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে বল অবমুক্ত হয়। এই পর্যায়ে নিউট্রনের সমন্বয়ে তারকা তার মধ্যে কোর (core) বা কেন্দ্র গড়ে তুলে। এই পর্যায়ের তারকা নিউট্রন তারকা হিসেবে পরিচিত। এর থাকে $১০^{১৪}$ গ্রাম/ সি সি-এর মতো বিশাল ঘনত্ব। নিউট্রন তারকাকে পালসার বা স্পন্দনকারী তারকাও বলা হয়ে থাকে (পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য)।

এরপরও যদি কোন তারকার ভর বেশী থাকে, ধরা যাক সূর্যের চাইতে ১০০ বা ১০০০ গুণ বেশী হয় তাহলে শ্বেত বামন পর্যায়ের তারকা নিউট্রন পর্যায়ের তারকার আগেই ধ্বংস হয়ে যায় এবং বিপুল পরিমাণ নক্ষত্র কণিকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়। এগুলো সুপার নোভা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শত শত কোটি সংখ্যক সূর্যের চাইতেও বেশী ঔজ্জ্বল্যে জ্বলে উঠে। আর অবশিষ্টাংশের ঘনত্ব এতো বেশী থাকে যে মহাকর্ষ বল-এর কবজা থেকে আলো বেরিয়ে আসতে পারে না। তারকাটি সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে, যাকে বলা হয় কৃষ্ণ গহ্বর (black hole)।

www.bjilibrary.com

নক্ষত্ররাজি ছাড়াও আল্লাহ্ তা'আলা আকাশে আরো অন্যান্য জ্যোতিষ্করাজি উন্মুক্ত রেখেছেন যেগুলো এই বিশ্ব জগতের অংশ বিশেষ। এগুলো হচ্ছে গ্রহ, উপগ্রহ, নেবুলা, গ্যালাক্সি ও কোয়াসারসমূহ।

যদিও সূর্য ছাড়া অন্যান্য তারকার গ্রহসমূহ এখানে খোলা চোখে প্রত্যক্ষ করা যায়নি, তবুও কিছু কিছু তারকার চারপাশে ঘূর্ণায়মান গ্রহের উপস্থিতি সম্পর্কে জোরালো প্রমাণ পাওয়া গেছে। নেবুলা বলতে গ্যাস ও ধূলিকণার সমন্বয়ে গঠিত মেঘমালা যা নিজেদের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে। নেবুলা নাক্ষত্রিক স্পেসে (space) গ্যাস ও ধূলিকণার সমন্বয়ে মেঘমালার আকারে বিদ্যমান থাকে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে 'লাল দৈত্য নক্ষত্র' থেকে গ্যাসীয় ভর দূরে সরে যায় এবং আন্তঃবিস্ফোরণের কারণে নাক্ষত্রিক ধূলিকণা নিক্ষিপ্ত হয়ে নোভা ও সুপারনোভা বিস্ফোরণ ঘটায়। এ সকল বস্তু আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাস ও ধূলিকণার সৃষ্টি করে এবং তা থেকে গড়ে উঠে নেবুলা। নেবুলা হচ্ছে তারকা ও নাক্ষত্রিক ব্যবস্থার জন্মস্থান। গ্যালাক্সি হচ্ছে তারকারাজির পরস্পরের মধ্যে হালকা ধরনের মহাকর্ষিক বন্ধন ব্যবস্থা। গ্যালাক্সিগুলো বিপুল গতিতে একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কোয়াসার হচ্ছে বিশ্বজগতের সব চাইতে কৌতূহলোদ্দীপক ও শক্তিশালী বস্তু। দশ হাজার কোটি তারকা নিয়ে গঠিত ছায়াপথের মতো (milky way) একটি গ্যালাক্সি অপেক্ষা একটি কোয়াসার ১০০ বা ১০০০ গুণ বেশী শক্তি নির্গমন করে। এগুলো খুবই শক্তিশালী ব্যাসের (diameter) রেডিও উৎস (radio source) এবং কখনো কখনো তা এক সেকেণ্ড আর্ক (a second of arc)-এর ও কম হয়ে থাকে। এগুলো শুধু গ্যালাক্সি বহির্ভূত বস্তু হিসেবেই নয় বহু দূরের গ্যালাক্সির সাথেও তুলনীয়। কোয়াসারগুলোর অবস্থান দু'হাজার কোটি আলোকবর্ষ দূরে। তারা আলোর চেয়েও ৯০% দ্রুত গতিতে পিছু সরে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক তত্ত্বে বলা হচ্ছে যে, কোয়াসার হচ্ছে কেন্দ্রে প্রচুর সংখ্যক কৃষ্ণ গহ্বর সম্বলিত অদৃশ্য গ্যালাক্সি।

নিখিলবীক্ষণ (macroscopic) জগতের এই বিকাশের ফলে পৃথিবী থেকে বিশ্বজগতের দূরতম সীমা পর্যন্ত এ যাবত যা জানা গেছে (অর্থাৎ $১০^{২৮}$ সে. মি. দ্বারা) তা আমাদেরকে জ্ঞান জগতের চিরবর্ধিষ্ণু দিগন্তের কথা বলে প্রতি মুহূর্তে জ্ঞানের দিগন্ত বিস্তৃত হয়ে চলেছে, আর আমরা আল্লাহ্ তা'আলার নতুন নতুন নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি। বস্তুত মহাজাগতিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার বহু নিদর্শন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর প্রতিটি বস্তুরাজির গঠনের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'আলার অসীম জ্ঞান ভাণ্ডারের অংশ বিশেষ মাত্র ফুটে উঠেছে। আণুবীক্ষণিক (microscopic) জগতেও আমরা গঠন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর দেখতে পাই। প্রথম দিকে আগুন, পানি, বাতাস ও মাটিকে বস্তুর প্রাথমিক

www.bjilibrary.com

উপাদান হিসেবে মনে করা হতো। পরবর্তীতে মানুষের পর্যায়ক্রমিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে যৌগ, উপাদান, মলিকিউল, এটম, প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন, শক্তিশালী পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াসম্পন্ন অন্যান্য বস্তু কণা এবং লেপটন-এর building block বা গঠনকারী পিণ্ড পর্যন্ত এসে পৌছেছে। লেপটন গঠিত হয় ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি দ্বারা। কোয়ার্ককে মনে করা হয় প্রকৃতির building block বা গঠনকারী পিণ্ড। কোয়ার্ক দিয়ে তৈরি এ প্রশ্নের নিশ্চিত জবাব ভবিষ্যত অনুসন্ধান থেকে পাওয়া যেতে পারে। বস্তুর গঠনকারী উপাদান সম্পর্কে জানতে গিয়ে মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গঠন কাঠামো সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি দিগন্ত উন্মোচন করেছে। ফলে এই প্রক্রিয়ায় মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার নতুন নতুন নিদর্শন আবিষ্কার করতে পেরেছে। যেমন পরমাণু (atom) গঠনের ক্ষেত্রে 'তড়িৎ চুম্বকীয় বল' (electromagnetic force) ক্রিয়াশীল থাকা, দুর্বল নিউক্লীয় বল তেজস্ক্রিয়তা (redioactivity) তৈরির জন্য দায়ী হওয়া এবং অপরদিকে সবল নিউক্লীয় বল (strong nuclear force)-এর কারণে নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়নকে ধরে রাখা ইত্যাদি। তবে এ সকল বল কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে তা আজও রহস্যাবৃত। এ সকল বল কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে পদার্থ বিজ্ঞানীদের কিছুটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পারলেও এগুলো কেন কাজ করে সে ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। অন্যদিকে অবাক হওয়ার বিষয় হলো, এ সকল বল না থাকলে কোন বস্তু (জড় ও জীব) বর্তমান অবস্থায় অস্তিত্ব পেত না। মজার ব্যাপার হলো সালাম, ওয়েনবার্গ, গ্লাশো এবং অতি সম্প্রতিকালে অন্য আরো অনেকে সৃষ্টির উৎস সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে প্রকৃতির এ যাবত জানা চারটি বল (মহাকর্ষ বল ও অন্য তিনটি বল সম্পর্কে আগে উল্লেখ করা হয়েছে) কে সমন্বিতভাবে দেখতে চেয়েছেন। তাঁরা অতি বৃহৎ (মহাকাশ সম্পর্কিত তত্ত্ব) এবং অতি ক্ষুদ্র (পদার্থ বিজ্ঞানের অতি ক্ষুদ্র কণা)-এর মধ্যে বিস্ময়কর মিল খুঁজে পেয়েছেন। বৃহৎ ও ক্ষুদ্রের এই সমন্বয় (synthesis) থেকে এমন এক বিস্ময়কর ও সূক্ষ্ম কৌশল প্রকাশ পায় যে, মহান প্রভু তাঁর এক মহাপরিকল্পনার আওতায় ধারাবাহিকভাবে গাণিতিক নিয়ম অনুসারে সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন এবং তাকে রক্ষা করার ব্যবস্থাও নিয়েছেন।

আমাদের নিজেদের মধ্যে অর্থাৎ মানবদেহের মধ্যে প্রকাশিত আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শন সম্পর্কে কয়েকটি কথা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে।

গত একশত বছরে মানব দেহ সম্পর্কে যে গবেষণা সমূহ হয়েছে তাতে প্রতীয়মান হয় যে, মানব দেহও একটি ক্ষুদ্রাকারের বিশ্ব। মানবদেহের কোষগুলোকে (cells) অতিমাত্রায় উঁচুমান সম্পন্ন উৎপাদন কারখানা বলা হয়ে থাকে। আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় সকল জিনিস এখানে তৈরি করা হয়।

www.bjilibrary.com

কোষের অভ্যন্তরে সুতোর মতো ক্রমোজমের (chromosome) মধ্যে থাকে ডি.এন.এ (Deoxyribonuciie Acid) অণু। এই মলিকিউল (molecule) বা অণুকে বলা হয় জীবনের মুখ্য অণু বা master molecule। এগুলো দ্বারা গঠিত হয় জীবনে বংশগতির নীল নকশা। আমাদের বৈশিষ্ট্য (যেমন রং, উচ্চতা, বুদ্ধিমত্তা) এবং জৈবিক কর্মকাণ্ডের সকল তথ্য এখানে কোড বা সংকেত (এগুলো হচ্ছে মূলত কিছু রাসায়নিক যৌগ যেমন এডেনিন, থাইমিন, গুয়ানিন ও সাইটোসিন-এর যথাযথ সন্নিবেশ) আকারে সংরক্ষিত থাকে। সম্প্রতি ডি. এন. এ (D.N.A) অণুর কাঠামোগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে কেবল এ সকল সংকেত বুঝা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং আমাদের দেহ ব্যবস্থা কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কিত জ্ঞানের ধারাবাহিক বিকাশের মাধ্যমে নতুন এক দিগন্তের আবির্ভাব হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার সংগঠন ও পরিকল্পনার আরেকটি অকল্পনীয় নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে, যা দেখে যে কোন মানুষ ভয়ে ও বিস্ময়ে স্রষ্টার কাছে অবনত হয়ে পড়বে।

٤- لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝

৪২ ঃ ৪ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই, তিনি সমুন্নত মহান।

এ বিষয়ে ৫ ঃ ১৯, ৭ ঃ ৫৪ এবং ৭ ঃ ১৮৫ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

٩- أَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ أَوْلِيَآءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى ۡ
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৪২ ঃ ৯ কী ? এই লোকেরা তাঁকে (আল্লাহ্) বাদ দিয়ে অন্য অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে ? প্রকৃত অভিভাবক (বা ওলী) তো একমাত্র আল্লাহ্, তিনিই মৃতদের জীবিত করেন এবং তিনিই সবকিছুর উপর শক্তিশালী।

মহাবিশ্বে আল্লাহ্ই যে একমাত্র অভিভাবক এবং তিনি যে মৃত পৃথিবীকে বৃষ্টির মাধ্যমে জীবন দান করেন, এই বিষয়সমূহ ২ ঃ ১৬৪ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ্র অভিভাবকত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে ১ ঃ ১ আয়াতের সঙ্গেও আলোচনা করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

১১- فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○

৪২ ঃ ১১ (তিনিই) আকাশমণ্ডলী ও যমিন সৃষ্টিকারী। তিনিই তোমাদের স্বজাতীয়দের মধ্যে তোমাদের জন্য জুড়ি বানিয়েছেন এবং অনুরূপভাবে তিনি তোমাদের বংশ বৃদ্ধি ও বিস্তার করেন। বিশ্বলোকের কোন জিনিষই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনিই (একমাত্র সত্ত্বা) সব কিছু শুনেন ও দেখেন।

আল্লাহ্ যে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এ বিষয়টি ২ ঃ ১১৭, ২ ঃ ১৬৪, এবং ৭ ঃ ৫৪ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়টি পরিশিষ্ট ১ ও ২ তে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষ ও পশু এবং সকল জীবজন্তুর জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টির প্রসঙ্গ জীব জগতের সৃষ্টি ও বংশবৃদ্ধির বিষয়টি চিন্তাশীলদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর মধ্যে মহান আল্লাহ্র সৃষ্টি রহস্য নিয়ে গবেষণার সুযোগ রয়েছে।

জীবজগতের প্রধান দুটি অংশ হলো পুষ্টি ও বংশবিস্তার। মহান আল্লাহ্ প্রাকৃতিক জগৎ থেকে সকলের পুষ্টি সরবরাহ করেন। আর পুরুষ ও নারীর মিলনের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করেন। এ ধরনের ব্যবস্থা মানুষ ও জীবজগতে বর্তমান রয়েছে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে অযৌন বংশবৃদ্ধি হয়ে থকে যেমন ব্যাকটেরিয়া, এল্‌গি, এমিবা ও হাইডিরা ইত্যাদি।

শুধু নারী-পুরুষের অবস্থানই বংশ বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট নয় বরং যৌন মিলনের মাধ্যমে নারী ডিম্ব ও পুং শুক্রকীটের মিলনে (zygote) জাইগোট সৃষ্টি হলেই নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি সম্ভব। এই বংশবৃদ্ধির পদ্ধতির দুটি উদ্দেশ্য- (১) এর মাধ্যমে প্রতিটি প্রজাতির স্থিতি নিশ্চিত করা, এবং (২) জিন্‌সের রদবদলের মাধ্যমে উন্নত প্রজন্ম সৃষ্টি করা যেন তা বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থায় টিকে থাকার যোগ্য হতে পারে। সুতরাং পুরুষ ও স্ত্রী ভিন্ন ধরনের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

১২- لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيَقْدِرُ ۚ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

www.bjilibrary.com

৪২ ঃ ১২ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই নিকট। তিনি যার প্রতি ইচ্ছা করেন তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন অথবা সংকুচিত করেন। তিনি সববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

এই আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টির বিষয়টি রহস্যাবৃত। এ সকল রহস্যের আবরণ চূড়ান্তভাবে উন্মোচন করা একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষেই সম্ভব, যিনি একটি মহাপরিকল্পনার আওতায় সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। মানুষ তার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানসমূহ করতে গিয়ে এ সকল রহস্যময়তা দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। মানুষের বিগত দু'শ বছরের বৈজ্ঞানিক সাফল্যের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে মানুষ অনেক কিছু শিখেছে। তবে সে এটাও অনুধাবন করছে যে এখনো যা জানার বাকি আছে তার তুলনায় সে অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র জেনেছে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এমন অনেক মুহূর্ত এসেছে যখন বিজ্ঞানীগণ ভেবেছিলেন যে, যা যা জানার ছিল তার সবই তারা জেনে ফেলেছেন, কিন্তু পরবর্তীতে প্রকৃতি তার কিছু সুনির্দিষ্ট বাস্তবতা নাটকীয় উপস্থাপনের মাধ্যমে দাবী করেছে যে এ যাবতকালের সকল বৈজ্ঞানিক ধারণার পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে এরূপ ঘটনা ঘটতে দেখা যায়, যখন পদার্থ বিজ্ঞানের জগতে দু'টি বড় ধরনের বিপ্লব সংঘটিত হয়। সেগুলো হচ্ছে, কোয়ান্টাম মেকানিজমের আবির্ভাব (অর্থাৎ ক্ষুদ্র বস্তু কণার মেকানিজম) এবং আপেক্ষিক তত্ত্ব (theory of relativity)। এ দু'টি বড় ধরনের উত্তরণের ফলে মানুষ সৃষ্টি রহস্যের আরো গভীরে ডুব দিতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু সব সময়েই দেখা যায় যে কোন একটি রহস্যের সমাধান সম্ভব হলে আরো গভীরতর পর্যায়ের আরেকটি রহস্যের আবির্ভাব ঘটে। বস্তুর মৌলিক উপাদান সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাই ঘটেছে। যখনই কোন কিছুকে বস্তুর মৌলিক উপাদান ভাবা হয়েছে, পরবর্তী পর্যায়ে দেখা গেছে যে তার মধ্যেই আরো (ক্ষুদ্র) মৌলিক উপাদান নিহিত রয়েছে। এভাবে আমরা উপাদান, অণু, পরমাণু, প্রোটন, নিউট্রন, কোয়ার্ক ইত্যাদি পর্যায় অতিক্রম করেছি। যেন আমরা মহাজাগতিক (cosmic) একটি পিঁয়াজের খোসা ছাড়াতে যাচ্ছি, তার আগেই আরেকটি খোসা আবির্ভূত হচ্ছে। কিন্তু শেষ খোসাটি কোথায় সে-প্রশ্নটিই সন্ধানী মনকে দারুণভাবে নাড়া দেয়।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সৃষ্টির ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীগণ মহাকাশ বিজ্ঞান ও অণুকণা সম্পর্কীয় পদার্থ বিজ্ঞানের মধ্যে অসাধারণ সমন্বয় সাধনের উদ্যোগ নিয়েছেন। বৃহতের বিজ্ঞান তথা নিখিলের বিজ্ঞান ও ক্ষুদ্র বস্তুর বিজ্ঞানের এই মহা একত্রীকরণের প্রচেষ্টায় বাহ্যত চারটি ভিন্ন ভিন্ন বল (force) বিবেচনায় আনা হয়েছে। সেগুলো হলো

www.bjilibrary.com

সবল নিউক্লিয় বল (strong nuclear force), দুর্বল নিউক্লিয় বল (weak nuclear force), তড়িৎ চুম্বকীয় বল (electromagnetic force), এবং মহাকর্ষ বল (gravitational force)। এই প্রচেষ্টাকালে দেখা গেছে যে সময়ের শুরু সম্পর্কে অনেক অনেক বিবেচ্য বিষয়ের উদ্ভব ঘটছে। এবং এ সকল রহস্যের সমাধানের ফলে নতুন নতুন জ্ঞানের উন্মেষ ঘটছে। তবে নিশ্চয়তার সাথে এ বিষয়ে শেষ কথা বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়। চূড়ান্ত সত্য নিজে থেকে কখনো প্রকাশিত হবে কিনা সে প্রশ্ন একটি দার্শনিক সমস্যা হয়েই থেকে যাচ্ছে। আলোচ্য আয়াতে এই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সত্য ধরা ছোঁয়ার বাইরে- একমাত্র জগতসমূহের সৃষ্টিকর্তাই প্রকৃত সত্য জ্ঞাত আছেন।

٢٨- وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ
وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ۝

৪২ ঃ ২৮ লোকদের নিরাশ হয়ে যাবার পর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং স্বীয় রহমত চারদিক বিস্তৃত করে দেন। আর তিনিই একমাত্র প্রশংসাযোগ্য অভিভাবক।

বৃষ্টির বর্ষণ সম্পর্কে ২ ঃ ১৬৪ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। মানুষ নিরাশ হওয়ার পর ও বৃষ্টি বর্ষণের অর্থ হলো যে বৃষ্টি বর্ষণ কখন হবে এ বিষয়ে মানুষ সব সময় সঠিক ভবিষ্যৎ বাণী করতে সক্ষম নয়। আর বৃষ্টিপাত ঘটানো শুধু আল্লাহ্র ইচ্ছায়ই হয়– এ কথাও বুঝিয়ে দেওয়া এই আয়াতের উদ্দেশ্য।

একই বিষয়ে ৩০ ঃ ৪৮ আয়াতেও আলোচনা করা হয়েছে।

বৃষ্টি যে মানুষের প্রতি আল্লাহ্র মহা দান ও রহমত এ বিষয়ে ৭ ঃ ৫৭ আয়াতেও আলোচনা করা হয়েছে।

٢٩- وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ ۚ
وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ۝

৪২ ঃ ২৯ তাঁর (আল্লাহ্র) নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে যমিন ও আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টি, এবং জীবন্ত সৃষ্টিকুল যা তিনি এই উভয় স্থানে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তিনি যখনই চাইবেন তখনই তাদেরকে একত্রিত করতে পারেন।

www.bjilibrary.com

যমিন ও আকাশমণ্ডল সৃষ্টি সম্পর্কে ২ ঃ ১৬৪ আয়াত এবং পরিশিষ্ট ১ ও ২ তে আলোচনা করা হয়েছে। জীবজগতের বিস্তারের কথাও ২ ঃ ১৬৪ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

'আকাশমণ্ডলী ও জীবকূল ছড়ানো রয়েছে' থেকে মনে হয় পৃথিবীর বাইরের জগতের সম্ভাব্য জীবজগত ((extra-terrestrial life) সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বর্তমানে মহাশূন্যে জৈব অণু ((organic molecule) রয়েছে বলে ধারণা করতে শুরু করেছেন। বিজ্ঞানী D. Wickramasinghe হ্যালির ধূমকেতু (Halley's Comet)-তে জীবাণু রয়েছে বলে মনে করেন।[১] অসংখ্য সৌরজগত রয়েছে বলে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্ক ড্রেক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, অন্যান্য সৌর জগতেও তাদের গ্রহে কোন না কোনরূপ জীব থাকা সম্ভব।[২]

তথ্যসূত্র ঃ

1. New Scientist, 17 April, 1986.
2. Jay M. Pasachoff, Contemporary Astrophysics, W. B. Saunders, London. 1976.

www.bjilibrary.com

٣٢-وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ۝

৪২ ঃ ৩২ তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে এই জাহাজ যা সমুদ্রে চলাচল করার সময় পাহাড়ের মত মনে হয়।

জাহাজ ও তার সমুদ্রে চলাচলের বিষয়টি আয়াত ২ ঃ ১৬৪ তে আলোচনা করা হয়েছে।

٣٣-اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ؕ
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝

৪২ ঃ ৩৩ আল্লাহ্ যখন চাইবেন বাতাসকে থামিয়ে দেবেন এবং এর ফলে ওরা (জাহাজ) সমুদ্রের বুকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। যারা ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ তাদের জন্য এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্র বড় নিদর্শন।

আধুনিক কালে জাহাজ চালাবার জন্য বড় আবিষ্কার হচ্ছে কোন জাহাজের পালে বাতাস লাগার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।[১] এটা সম্ভব হয় আল্লাহ্র সৃষ্ট প্রাকৃতিক আইন Law of Parallelogram of Forces এর মাধ্যমে যা এমন মানুষ বুঝতে ও জানতে পেরেছে।

তথ্যসূত্র ঃ

1 The New Encyclopaedia Britannica, Vol. 2, p. 1978, p 1167.

www.bjilibrary.com

٤٩- لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا
وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ۝

৪২ ঃ ৪৯ আল্লাহ্ যমিন ও আকাশমণ্ডলের একমাত্র মালিক। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনিই তাঁর ইচ্ছামত কাউকে কন্যা সন্তান এবং কাউকে পুত্র সন্তান দান করেন।

যমিন ও আসমানের মালিক যে কেবল মহান আল্লাহ্ এ বিষয়ে ৫ ঃ ১৯ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

সন্তান পুত্র না কন্যা হবে এ বিষয়টি মানুষ গর্ভাধান হওয়ার বেশ কিছুদিন পরই জানতে পারে। গর্ভের ১২ সপ্তাহের পূর্বে বাহ্যিক জননেন্দ্রিয় দৃষ্টিগোচর হয় না।[১] সন্তান আরো বড় হলে এবং বাচ্চা মায়ের পেটে সুবিধাজনকভাবে অবস্থান করলে X-ray বা ultrasonography-র মারফত বাচ্চার লিঙ্গ সম্পর্কে জানা যেতে পারে। তবে সন্তান পুত্র না কন্যা, সে ব্যাপারে মানুষের কোন হাত নেই।

বাবার x বা y ক্রমোজোম ও মায়ের x ক্রমোজোমের মিলন হলেই নব-শিশুর সৃষ্টি শুরু হয়। আর এ মিলন মানুষের হাতে নয়। তবে বাবার y-chromosome পৃথক করে মায়ের x-chromosome এর সঙ্গে মানবদেহের বাইরে মিলন ঘটিয়ে ইচ্ছামত লিঙ্গের সন্তান লাভ সম্ভব হতে পারে তবে এদের মিলন ঘটানো আল্লাহ্র হাতে।

এ প্রসঙ্গে ৫৩ ঃ ৪৬ আয়াতে বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. K. L. Moore, and A. M. Azzindani, Developing Human with Islamic Additions, 3rd edn. Dar-al-Qibla, Jedddah, p. 281, 1983.

www.bjilibrary.com

٥٠- أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ
إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ○

৪২ ঃ ৫০ আর যাকে চান পুত্র ও কন্যা উভয় রকম সন্তানই দান করেন। আর যাকে চান তাকে বন্ধ্যা করে রাখেন। তিনিই সব কিছু জানেন এবং সব বিষয়ে শক্তিমান।

সন্তানের লিঙ্গের বিষয়টি ৪২ ঃ ৪৯ আয়াতের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। বাকি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ৫৩ ঃ ৪৫-৪৬ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।

সন্তান পুত্র না কন্যা হবে তা পিতা-মাতার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। অনেকে পুত্র সন্তান চায় অথচ শুধু কন্যা সন্তান লাভ করে। আবার কারো বেলায় কন্যা চাইলেও শুধু পুত্র সন্তান হয়। আবার অনেকে বহু চাওয়া সত্ত্বেও কোন সন্তানই লাভ করে না। সুতরাং এ বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র হাতে।

সমাজে নর-নারীর সংখ্যা-সাম্য খুব জরুরী যা একমাত্র মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌ই তার ব্যবস্থা করতে সক্ষম। মানুষ এ বিষয়ে পূর্ণ কর্তৃত্ব পেলে মানব জাতির বংশ পরম্পরা বাধাগ্রস্থ হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। ভারতের বহু স্থানে কন্যা সন্তান হলে তাকে আতুড় ঘরেই হত্যা করা হয় যেমন জাহেলী যুগে আরবে করা হতো। আজকাল ভারতে ultrasonography করে সন্তানের লিঙ্গ জানার পর কন্যা সন্তানকে গর্ভপাত করে নষ্ট করা হচ্ছে বলে ভারতীয় TV-তে যথেষ্ট আলোচনা হচ্ছে।

সুতরাং জন্মের পূর্বে সন্তানের লিঙ্গ জানা কখনো কল্যাণকর নয়। এই বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ভারতীয় হিন্দু সমাজের এরূপ কন্যা-বিরোধী মনোভাব খুবই নিন্দনীয় ও মানবতা-বিরোধী। ইসলাম এ ধরনের মনোবৃত্তির কঠোর বিরোধী।

١٠- الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا
لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○

৪৩ ঃ ১০ তিনিই তো তোমাদের জন্য এই যমিনকে বিছানার মত বানিয়ে দিয়েছেন এবং তাতে তোমাদের জন্য পথ তৈরি করে দিয়েছেন যেন তোমরা নিজেদের গন্তব্যস্থলে যাওয়ার পথ পেতে পার।

পৃথিবীকে বিছিয়ে দেওয়ার কথা ২ ঃ ২২ এবং ১৩ ঃ ৩ আয়াতদ্বয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

তিনি যে নানারূপ চলাচলের পথ তৈরি করেছেন এ বিষয়টিও ২০ ঃ ৫৩ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

١١- وَالَّذِيْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ ۚ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ۝

৪৩ ঃ ১১ তিনিই এক বিশেষ পরিমাণে আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন এবং তার সাহায্যে মৃত যমিনকে জীবন্ত করে তোলেন। এমনিভাবে তোমাদেরকেও একদিন যমিন থেকে বের করা হবে।

আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ ও মৃত যমিনকে তদ্বারা সজীব করার বিষয়টি ২ ঃ ১৬৪ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আর বৃষ্টির পরিমাণ কত হবে তা সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে। এ ব্যাপারেও মানুষের কোন হাত নেই।

এই আয়াতে মৃত যমিনকে জীবিত করার মাধ্যমে ক্বিয়ামতের পর বিচার দিবসে হাশরের ময়দানে মানুষের পুনরুত্থানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যা ইসলামের একটি মৌলিক আক্বিদা।

١٢- وَالَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ۝

৪৩ ঃ ১২ তিনিই সমস্ত জোড়া সৃষ্টি করেছেন আর তিনিই তোমাদের আরোহনের জন্য নৌকা ও জন্তু জানোয়ারকে বাহন বানিয়েছেন।

এই আয়াতটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এখানে সবকিছুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্ট বলা হয়েছে। মানুষ, জন্তু জানোয়ার ও গাছপালা ইত্যাদির ব্যাপারে জোড়া সৃষ্টির বিষয়টি ১৩ ঃ ৩, ৩১ ঃ ১০ এবং ৪৩ ঃ ১২ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো অজৈব বা জড় পদার্থও কি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্ট? হ্যাঁ, আজ বিজ্ঞানীরা একে সত্য বলে স্বীকার করে কিন্তু ১৯৩০ সালের প্রথম দিকে এটা জানা যায় যে, প্রকৃতির প্রতিটি বস্তু তা স্থিতিশীল বা অস্থিতিশীল আকারে থাকুক না কেন তার একটা antiparticle রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ electron, proton এবং neutron এর প্রতি অণুতে যথাক্রমে positron, anti-proton এবং anti-neutron রয়েছে, যখন একটি অণু ও তার প্রতি-অণু একত্রিত হয় এবং একে অপরকে ধ্বংস করে তখন বিস্ফোরণসহ প্রবল শক্তিসম্পন্ন তেজ বা এনার্জির সৃষ্টি হয়। এই প্রতি-অণু

www.bjilibrary.com

সম্পর্কে প্রথম ঘোষণাকারী হলেন বিজ্ঞানী P.A.M. Dirac যখন তিনি free electron সমীকরণ (equation) সমাধান করতে চেষ্টিত ছিলেন। এই সমীকরণ যা Dirac equation নামে খ্যাত, তার উদ্দেশ্য হলো- অত্যন্ত উচ্চ তেজোময় অবস্থায় অতি ক্ষুদ্র অণুর পরিণতি জানা অর্থাৎ-এর কাজ হলো quantum mechanics এবং আপেক্ষিক গতি (theory of relativity motion) র সূত্রের মিলন। ঘটনাক্রমে, বিশেষ আপেক্ষিককতাবাদ প্রযোজ্য হয় সেই সব বস্তুর উপর যেগুলো এমন গতিবেগে চলে যা আলোর গতির তুলনায় অনুপেক্ষণীয় বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। পারমাণবিক জগতের অন্যতম সূক্ষ্ম কণা হিসেবে ইলেক্ট্রন আলোক গতিবিদ্যাকে মেনে চলে এবং যেহেতু এটি সাংঘাতিক গতিবেগের সাথে চলে, সেহেতু এবং গতির বেলায়ও বিশেষ আপেক্ষিককতাবাদ প্রযোজ্য হওয়া উচিত। মুক্ত ইলেক্ট্রনের ক্ষেত্রে ডাইরাক সমীকরণের সমাধান অবশ্য একটা সমস্যার সৃষ্টি করে। ইলেক্ট্রনের শক্তির জন্য ডাইরাক একটা রাশির বর্গমূলসমূহ নিতে বাধ্য হন-যাদের একটা ধনাত্মক এবং অপরটা ঋণাত্মক। যে কোন সংখ্যার ধনাত্মক ও ঋণাত্মক মূল সকলেই বুঝেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ২৫ সংখ্যাটির বর্গমূল +৫ কিংবা -৫ যে কোনটি হতে পারে। অবশ্য সমস্যাটা ছিল যে, মুক্ত ইলেক্ট্রনের জন্যে ধনাত্মক বর্গমূল সমাধানটি সঠিক ছিল বটে, কিন্তু মুক্ত ইলেক্ট্রনের শক্তির ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনের ঋণাত্মক মান একটা সমস্যার সৃষ্টি করে। মুক্ত ইলেক্ট্রনের শক্তি সর্বদাই ধনাত্মক, তাহলে ঋণাত্মক শক্তি সমাধানটির কী অর্থ হতে পারে ? এই সমস্যাটা উতরাতে হলে ডাইরাক অস্বাভাবিক ধরনের এক কল্পনা করে নেন যে, ইলেক্ট্রনের যে সকল অবস্থায় তাদের শক্তি ঋণাত্মক হতে পারে তা সবই সুবিন্যস্ত-ঋণাত্মক শক্তি সম্বলিত ইলেক্ট্রন যা মোটেই দৃষ্টিগোচর হতে পারে না-তারা সব এক সাগরে নিমজ্জিত অবস্থায় রয়েছে। যে মুহূর্তে শক্তি বিনিয়োগ করে তাদেরকে ঐ সাগর থেকে টেনে আনা হয়, শুধু তখনই তারা ধনাত্মক শক্তি অবস্থায় চলে আসে। তখন আমরা তাদেরকে ইলেক্ট্রন হিসেবে দেখতে পাই। আর তারা যে ঋণাত্মক শক্তি সাগরের যে স্থানগুলো খালি করে চলে এসেছে সেগুলো পজিট্রন হিসেবে আবির্ভূত হয়। পজিট্রনের চার্জ সর্বদাই ধনাত্মক, যদিও ঐ চার্জের মাত্রা ইলেক্ট্রনের মতই। ইলেক্ট্রন ও পজিট্রনের মুখোমুখি সাক্ষাৎ ঘটলে তারা পরস্পর পরস্পরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে এবং বিকিরণ শক্তি আকারে আবির্ভূত হয়। একটা ইলেক্ট্রনকে mC^2 -এর ঋণাত্মক শক্তি অবস্থা (যেখানে m হচ্ছে ইলেক্ট্রনের ভর এবং C হচ্ছে আলোর গতি) থেকে mC^2-এর ধনাত্মক অবস্থায় আনতে হলে $2mC^2 = 1.1$ Mw শক্তি ব্যয় করতে হবে। বস্তুত 1.1 Mw শক্তিবিশিষ্ট (বিকিরণ কণা) ফোটনকে যুগল উৎপাদন সম্পন্ন করতে দেখা গেছে-যার একটি হচ্ছে ইলেক্ট্রন এবং অপরটি পজিট্রন।

www.bjilibrary.com

বিপরীতধর্মী চার্জ থাকার কারণে ইলেক্ট্রন ও পজিট্রনকে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রস্থ বিদ্যুৎ আলোকচ্ছটার বিপরীত বক্রতায় শনাক্ত করা যায়।

এভাবেই, ইলেক্ট্রনের ডাইরাক মতবাদ বস্তু ও প্রতিবস্তু ধারণার জন্ম দেয়। প্রতিটি বস্তুরই একটি প্রতিবস্তু থাকতে হবে। বস্তুত পরবর্তী বছরগুলোতে, ডাইরাকের মতবাদের গ্রহণযোগ্যতা-বহু স্বল্প ও দীর্ঘস্থায়ী প্রাথমিক কণার বিপরীতে প্রতিকণার উপস্থিতির প্রমাণ পরীক্ষাগারে পাওয়া গেছে। এ সকল প্রতিকণা অন্য কণার সাথে মুখোমুখি হলেই তারা পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, অজৈব জিনিস জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টির ব্যাপারটির তাৎপর্য আছে বৈকি। বস্তু নির্মাণ ফলক অর্থাৎ তথাকথিক মৌলিক কণাসমষ্টি দ্বারা গঠিত এবং এ সকল কণার রয়েছে প্রতিকণা। বস্তু যে যুগলরূপে বা জোড়ায় জোড়ায় থাকতে পারে, এখন তা সহজেই বুঝা যায়।

জাহাজে চড়ে বেড়ানোর বিষয়টি ২ ঃ ১৬৪ আয়াতের আলোচনা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গবাদি পশুর পিঠে চড়ার বিষয়টি ১৬ ঃ ৫ এবং ১৬ ঃ ৮ আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে।

١٣- لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا
سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ۝

৪৩ ঃ১৩ যাতে তোমরা তাদের পিঠে স্থির হয়ে বসতে পার এবং তোমরা স্থির হয়ে বসার পর তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং বল, 'পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না।

পশু বন্য থাকা অবস্থায় তাদের উপর আরোহণ করা সম্পর্কে ১৬ ঃ ৮ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান আয়াতে একই বিষয়বস্তু পুনরায় বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে আল্লাহ্ তা'আলা পশু সৃষ্টি করেছেন মানুষের ব্যবহারের জন্য এবং তিনি মেহেরবানী করে এগুলোকে পোষ মানানোর জ্ঞান ও কৌশল শিখিয়েছেন। এদের মধ্যে কিছু আছে তাদের পিঠে আরোহণ করার জন্য যেমন ঘোড়া ও গাধার পিঠে আরোহণ করা বেশ আরামদায়ক। কারণ তাদের পিঠ এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেন ভ্রমণের সময় আমরা আরামে বসতে পারি। এই আয়াত দ্বারা আমাদেরকে একথাই স্মরণ

www.bjilibrary.com

করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে আমাদের জীবন যাপনকে আরামদায়ক করে দেয়ায় আল্লাহ্ তা'আলার এই মহা অনুগ্রহের জন্য তাঁর প্রশংসা করা আমাদের কর্তব্য। কারণ আমরা তাঁকে ছাড়া এই আরাম ও উপকার নিজেরা অর্জন করতে পারতাম না।

٣٨- حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ○

৪৩ ঃ ৩৮ অবশেষে সে যখন আমার নিকট উপস্থিত হবে, তখন সে শয়তানকে বলবে, 'হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি দুই পূর্বদিকের ব্যবধান থাকতো' কত নিকৃষ্ট সহচর সে।

৩৭ ঃ ৫ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে বলা হয়েছে যে, দুই পূর্ব বলতে সূর্যোদয়ের স্থানসমূহের দুটি দূরতম প্রান্ত আছে- একটি উত্তরে এবং অপরটি দক্ষিণে। এই দু'টি প্রান্তকে বলা হয় অয়নান্ত (solsticial)। যথাক্রমে ২২শে জুন ও ২২শে ডিসেম্বরে মনে হয় যেন সূর্য এগুলোকে স্পর্শ করেছে। এ হিসাবে দুটি পূর্ব-এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান ৬ মাস। দুই অয়নান্ত বা দুই পূর্ব-এর কৌণিক দূরত্ব ৪৬° ৫৬ বা প্রায় ৪৭°। বৃত্তের চাপের উপর এ দুটি বিন্দুর চাপীয় দূরত্ব ro, যখন ব্যাসার্ধ r এবং কৌণিক দূরত্ব O রেডিয়াস তখন পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব প্রায় ৯৩০০০০০০ মাইল (১ ঃ ৫X১০^{৮} কি. মি.) এবং দুই পূর্ব-এর কৌণিক দূরত্ব তথা দুই অয়নান্তের কৌণিক দূরত্ব ৪৭° যা চাপের বিপরীতে কেন্দ্রীয় কোণের (radius) ২২ X ৪৭১৭ X ১৮০। সুতরাং দুই পূর্ব-বা-দুই অয়নান্তের চাপীয় দূরত্ব (arcial distance) দাঁড়ায় প্রায় ৭৪৩২০০০০ মাইল (১২৩০৯৩০০০ কি. মি.) এবং পৃথিবীর উপর এই চাপীয় দূরত্ব দাঁড়াবে ৩০০ মাইল (৫০০০ কি. মি)। পৃথিবীর পরিমাপে এই দূরত্বও বেশ বড়।

৪৩ ঃ ৩৮ আয়াতে দুটি পূর্বের দূরত্ব কথাটি একটি বাগধারা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে এর অর্থ পৃথিবীতে সর্বাধিক সম্ভব দূরত্ব।

এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য হবে একজন পাপী শয়তান থেকে বিশাল দূরত্ব কামনা করেছিল। এটা সত্যই বিস্ময়কর যে দুই অয়নান্তের চাপীয় দূরত্ব তথা দুই পূর্ব এবং দুই পশ্চিম-এর ভিত্তিতে পৃথিবীতে সর্বাধিক সম্ভব দূরত্ব সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে আরবদের নিকট অজানা ছিল।

www.bjilibrary.com

٨٥- وَتَبٰرَكَ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ
وَعِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

৪৩ ঃ ৮৫ কত মহান তিনি যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর সার্বভৌম অধিপতি। ক্বিয়ামতের জ্ঞান কেবল তাঁরই আছে এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

আল্লাহ্ তায়ালা যে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সার্বভৌম অধিপতি এ বিষয়ে ৫ঃ ১৯ আয়াতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

٧- رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۘ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ○

৪৪ ঃ ৭ যিনি আকাশমণ্ডল, পৃথিবী ও তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।

বিষয়টি ৫ ঃ ১৯ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

١٠- فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ○

৪৪ ঃ ১০ অতঃপর তুমি অপেক্ষা কর সে দিনের যেদিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ।

আমরা দেখতে পাই যে আকাশ সূর্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। 'ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ' এ কথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে সূর্য ধোঁয়ার মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে অর্থাৎ আকাশে এক ধরনের ধোঁয়ার মেঘ দেখা দেবে। আমরা জানি দুটি বিপরীতমুখী বল সূর্যের উপর কাজ করছে (১) মহাকর্ষ বল-এর কারণে আকর্ষণ বল, এবং (২) সূর্যের কেন্দ্র হাইড্রোজেন সংযোজনের (fusion) কারণে সৃষ্ট বিকিরণজনিত চাপের বিস্তৃতি বল। বর্তমানে এই দুটি বিপরীতমুখী বল ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় আছে। সূর্য অথবা অন্য কোন তারকার এরূপ অবস্থাকে বলা হয় মুখ্য দ্যোতনাকারী (main sequence)। যখন কেন্দ্রে হাইড্রোজেন (যা সূর্যের মোট ভরের শতকরা ১০ ভাগ) হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়ে যায়, এখন সূর্যের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। বিকিরণ চাপের ফলে সূর্যের উপরিভাগের বায়বীয় অংশ বিশাল আয়তনে বিস্তৃত হয় এবং আকাশের একটি বিরাট অংশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়, কিন্তু অভ্যন্তরভাগ আরো সংকুচিত হয়ে

www.bjilibrary.com

পড়ে। সূর্যের সামগ্রিক আকার বেড়ে যাওয়ায় উপরিভাগের তাপমাত্রা কমে যায় এবং সূর্য অধিকতর শীতল হয়ে যায়, ও 'লাল দৈত্যের' রূপ ধারণ করে। বিকিরণ চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে ভারসাম্য ব্যবস্থা অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। এক সময় আচ্ছাদনকারী গ্যাসের মেঘ তথা ধোঁয়া বিস্তৃত হয় এবং আবার সংকুচিত হয়। এই বিস্তৃতি এবং সংকোচণ চলে কয়েক হাজার বছর ধরে এবং সূর্য একটি স্পন্দিত তারকায় পরিণত হবে। পরিশেষে বিকিরণ চাপ জয়ী হয়। গ্যাসীয় মেঘ দূরে সরে যায় এবং সূর্যকে রেখে যায় শ্বেত বামন অবস্থায়।

٢٤- وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ ۝

৪৪ ঃ ২৪ সাগরকে স্থির (বিভক্ত অবস্থায়) থাকতে দাও, এরা এমন এক বাহিনী যারা ডুবে যাবে।

এই আয়াতে নবী মূসা (আ) কর্তৃক সাগর অতিক্রম করা এবং ফিরআউন ও তার অনুসারীদের ডুবে যাওয়ার ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ২৬ ঃ ৬৪ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

٣٧- أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ أَهْلَكْنَاهُمْ ۖ
إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۝

৪৪ ঃ ৩৭ শ্রেষ্ঠ কী ওরা, না তুব্বা সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা? আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম, অবশ্যই তারা ছিল অপরাধী।

তুব্বা ছিল ইয়েমেনের রাজাদের উপাধি, তবে যে সকল রাজা সাবা, হাদ্রামাউত এবং হিমায়র[১] এলাকা শাসন করেছিল তাদেরকেই তুব্বা নামকরণ করা হয়েছে। মনে করা হয় যে, এক সময় তাদের কর্তৃত্ব সমগ্র আরব এবং সম্ভবত পূর্ব আফ্রিকার উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু যখন তারা ক্ষমতার নেশায় উন্মত্ত হয়ে পাপাচারে লিপ্ত হলো, তখন ধীরে ধীরে তারা বিলীন হয়ে গেল। কেউ কেউ মনে করেন যে, তুব্বা একজন নবী ছিলেন এবং তার জনগণ ছিল অবিশ্বাসী।

তাদেরকে কিরূপ শাস্তি দেয়া হয়েছিল, কিংবা তারা কীভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল সে সম্পর্কে কুরআনে কোন উল্লেখ নেই।

তথ্যসূত্র ঃ

1. A. Yusuf, Ali, The Holy Quran, Translation and Commentary, The American Trust Foundation, p. 1350. 1977.

www.bjilibrary.com

٣٨- وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ○

৪৪ ঃ ৩৮ আমি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এর মধ্যে কোন কিছু ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তায়ালা কোন কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করেননি। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির পিছনে একটা গভীর উদ্দেশ্য নিহিত আছে। সে সম্পর্কে আমাদের জানা থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। এ বিষয়ে ৩ ঃ ১৯১ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে, যেখানে আল্লাহ্ তায়ালা জোর দিয়ে বলেছেন যে কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি।

٣- اِنَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ○

৪৫ ঃ ৩ নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে নিদর্শন রয়েছে মু'মিনদের জন্য।

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সকল বস্তুর (জড় ও জীব) বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনুধাবন করতে হলে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। এরূপ বিশ্লেষণ সৃষ্টিকর্তার এক মহাপরিকল্পনার কথা প্রকাশ করে এবং তাঁর ক্ষমতার কথা ঘোষণা করে তারা কত সৌভাগ্যবান যারা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর সৃষ্টির ভাষা অনুধাবন করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তায়ালার বহু নিদর্শন বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন (২ ঃ ১৬৪ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, সেখানে অন্যান্য বিষয় ছাড়াও আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে) এবং এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু নিদর্শন সম্পর্কে ২৭ঃ ৮১ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে।

٤- وَفِىْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ○

৪৫ ঃ ৪ তোমাদের সৃজনে ও জীবজন্তুর বিস্তারে নিদর্শন রয়েছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য।

মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে আগেই ১৬ ঃ ৪, ১৮ ঃ ৩৮, ২৩ ঃ ১৩ এবং ২৩ ঃ ১৪ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। জীব জন্তুর বিস্তার সম্পর্কে ২ ঃ ১৬৪ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

٥- وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِّزْقٍ

فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

৪৫ ঃ ৫ নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, আল্লাহ্ আকাশ হতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে।

রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তন

এ বিষয়ে ২ ঃ ১৬৪ এবং ১০ ঃ ৬ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে।

আকাশ হতে জীবনোপকরণ প্রেরণ

এ বিষয়ে ১৫ ঃ ২১ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে।

মৃত মাটিকে পুনর্জীবিত করণ

এ বিষয়ে ২ ঃ ১৬৪ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে।

বায়ুর পরিবর্তন

এ বিষয়ে ২ ঃ ১৬৪ এবং ৭ ঃ ৫৭ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে।

١٢- اَللّٰهُ الَّذِيْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِأَمْرِهٖ

وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

৪৫ ঃ ১২ আল্লাহ্ই সাগরকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে এতে জলযানসমূহ চলাচল করতে পারে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

এই আয়াতে যে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে সে সম্পর্কে ২ ঃ ১৬৪ এবং ১৬ ঃ ১৪ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে।

١٣- وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ

إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

www.bjilibrary.com

৪৫ ঃ ১৩ তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে দিয়েছেন আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে তো রয়েছে নিদর্শন।

এই আয়াতে উল্লেখিত বিষয়ে ৩ ঃ ১৯০-১৯১ এবং ১৬ ঃ ১২ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে।

١٦- وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ

وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

৪৫ ঃ ১৬ আমি তো বনী ইসরাঈলীদেরকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দিয়েছিলাম এবং দিয়েছিলাম শ্রেষ্ঠত্ব, বিশ্ব জগতের উপর।

বনী ইসরাঈলীদের উত্তম ও বিশুদ্ধ জীবনোপকরণ প্রদান করা সম্পর্কে ২ ঃ ৫৭ এবং ২ ঃ ৬১ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে।

٢٢- وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ

بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

৪৫ ঃ ২২ আল্লাহ্ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মানুযায়ী ফল পেতে পারে, আর তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে ২ ঃ ১৬৪ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে। সৃষ্টিসমূহ আল্লাহ্ তা'আলা কী উদ্দেশ্যে করেছেন তা ১ ঃ ১ আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে। সে আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে আল্লাহ্ তায়ালার যে কোন সৃষ্টির পিছনে রয়েছে করুণার উপাদান এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর মধ্যে যত কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার প্রত্যেকটি সৃষ্টির পিছনে রয়েছে যুক্তিসঙ্গত কারণ।

٢٦- قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৪৫ ঃ ২৬ বল আল্লাহ্ই তোমাদেরকে জীবন দান করেন ও তোমাদের মৃত্যু ঘটান। অতঃপর তোমাদেরকে ক্বিয়ামত দিবসে একত্রিত করবেন, যাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক জীবন দানের বিষয়ে ২ ঃ ২৮ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের জানা আছে যে সকল জীবিত বস্তুই মরে যাবে এবং সকল মানুষ মরণশীল।

٣- مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ۝

৪৬ ঃ ৩. আকাশমণ্ডল, পৃথিবী ও তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্টকালের জন্য সৃষ্টি করেছি। কিন্তু কাফিররা তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক সৃষ্টি করার যুক্তিসঙ্গত কারণ ৪৫ ঃ ২২ আয়াতের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ১ ঃ ১ এবং ২ ঃ ১৬৪ আয়াতের ব্যাখ্যাকালে আলোচনা করা হয়েছে। ৩ ঃ ১৯০-১৯১ আয়াতের ব্যাখ্যাকালেও এ বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে এটা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে আল্লাহ্ তায়ালার সৃষ্টি সম্পর্কে যে কেউ অনুসন্ধান করবে সেই ঘোষণা করবে যে কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি।

١٥- وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ۗ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۗ
وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ۗ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ
قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ
وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ
وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

৪৬ ঃ ১৫ আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি যেন তারা তাদের পিতা-মাতার সঙ্গে সৎ আচরণ করে। তার মাতা কত কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করে রেখেছে এবং কষ্ট স্বীকার করেই প্রসব করেছে। তার গর্ভধারণ ও দুগ্ধপান ত্যাগ করা পর্যন্ত সময় লেগেছে ত্রিশ

www.bjilibrary.com

মাস। শেষ পর্যন্ত সে যখন স্বীয় পূর্ণশক্তি অর্জন করল এবং তার চল্লিশ বছর বয়স পূর্ণ হলো তখন সে বলল ঃ ' হে আমার রব্, তুমি আমাকে তওফিক দাও, আমি যেন তোমার সেই সব নিয়ামতের শোকর আদায় করি যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যেন এমন নেক্ আমল করি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। আর আমার সন্তানকেও নেক্ বানিয়ে আমাকে শান্তি ও সুখ দাও। আমি তোমার নিকট তওবা করছি এবং আমি অবশ্যই তোমার অনুগত বান্দাহ্ (মুসলিম)দের মধ্যে শামিল আছি।

ইসলাম পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা অবশ্য কর্তব্য ঘোষণা করেছে। ১৭ ঃ ২৩-২৪ আয়াত দুটিতে এ বিষয়ে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এখানে এর জন্য একটি কারণ দেখানো হয়েছে যে মা বহু কষ্ট সহ্য করে গর্ভধারণ করে এবং বহু কষ্ট করে সন্তান প্রসব করে। যদিও প্রসব ব্যথা খুব কঠিন তবুও এই ব্যথা খুবই জরুরী কারণ এই ব্যথার ফলে যে অতিরিক্ত আভ্যন্তরিক চাপ বৃদ্ধি পায় তাতে প্রসব সম্ভব হয়।

গর্ভধারণ ও শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পান করানোর জন্য মোট ত্রিশ মাস সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা বাকারার ২৩৩ আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, 'মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পুরো দু'বছর বুকের দুধ পান করাবে।' সুতরাং ত্রিশ মাস থেকে দুই বছর বাদ দিলে গর্ভধারণের জন্য মাত্র ৬ মাস বা ২৪ সপ্তাহ বাকি থাকে। Moore এবং Azzindani[১]র মতে বেঁচে থাকতে সক্ষম এমন ভ্রূণের সর্বনিম্ন বয়স হচ্ছে ২২ সপ্তাহ এবং ওজন ৫০০ গ্রাম। কিন্তু এরূপ অপুষ্ট ভ্রূণের বেঁচে থাকা কঠিন। সুতরাং ২৪ সপ্তাহ বা ছয় মাসকাল বয়স হলে শিশুর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেশী তাতে সন্দেহ নেই। সাধারণত গর্ভকাল ৩৮ সপ্তাহ বা ২৬৬ দিন (৯.৫ চান্দ্র মাস = ৮.৭৫ সৌর মাস)। সুতরাং জীবন্ত শিশুর জন্য সময়কাল ২২ থেকে ৩৮ সপ্তাহ।[২] এই আয়াতের ভিত্তিতে হযরত আলী ইব্ন আবি তালিব (রা) বিয়ের ছয় মাস পর জন্মলাভ করা সন্তানকে বৈধ বলে ফতওয়া দিয়েছেন। এতে মনে হয় পূর্ণতাপ্রাপ্ত শিশুর জন্য ছয়মাস গর্ভ হলেও চলতে পারে।

আর একটি বিষয়ও এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে পারে। আরবী حمل শব্দটির অর্থ হলো বোঝা বহন করা, আর كرها শব্দ দ্বারা দুঃখ ও কষ্টের কথা বুঝানো হয়। গর্ভবতী মা প্রায় ১২ সপ্তাহ বা তিন মাস পর্যন্ত শিশুর কোন

www.bjilibrary.com

ওজন বা ভার বহনের কষ্ট অনুভব করে না। কারণ সেই সময় ভ্রূণের আকার মাত্র ৮৭ মি.মি (8.7 cm=3.5 inches) এবং ওজন মাত্র ৪৫ গ্রাম (0.032 পাউন্ড)।[৩] সুতরাং এই তিন মাস বা ১২ সপ্তাহ বাদ দিলে মায়ের গর্ভের বোঝা বহনের সময় তিন মাস কমে যায় যদিও পূর্ণ গর্ভকাল ৯ মাস (৬+৩) এবং শুধু বোঝা বহনের কষ্ট ৬ মাস কাল। সুতরাং দুধ পানের ২৪ মাস বাদ দিলে যে ৬ মাস থাকে তাহলো গর্ভকালের শেষ কষ্টদায়ক ৬ মাস। এই হিসাবে উপরের আয়াতের ৩০ মাসের হিসাব সঠিক বলে প্রমাণিত হয়।

তথ্যসূত্র ঃ

1. K. L. Moore, and A. M. Azzindani. The Developing Human with Islamic Additions, 3rd edn. Saunders and Dar al-=Qibla, Jeddah, Saudi Arabia, p. 95. 1983.
2. Ibid, p. 94.
3. Ibid, p. 95.

www.bjilibrary.com

۲۴- فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ ۙ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ
بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

৪৬ ঃ ২৪ পরে তারা যখন সেই আযাবকে নিজেদের উপত্যকার দিকে আসতে দেখল, তখন বলতে লাগল ঃ এটা মেঘপুঞ্জ, এটা আমাদেরকে বারিবর্ষণ করে দেবে– 'না বরং এটা সেই জিনিস যার জন্য তোমরা খুব তাড়াহুড়া করছিলে। এটা বাতাসের ঝঞ্জা তুফান যার মধ্যে রয়েছে কঠিন আযাব।

এই আয়াতে 'আদ' জাতির প্রতি আল্লাহ্‌র গযবের উল্লেখ করা হয়েছে এবং মেঘের বিষয়টি ২ ঃ ১৯ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

۱۰- أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ
دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ○

৪৭ ঃ ১০ তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে বেড়ায় নি? তা হলে তারা সেই সব লোকদের অবস্থা দেখতে পেত যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ্ তাদের সবকিছুকেই সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছেন আর কাফিরদের জন্য এমনি পরিণতিই সুনির্দিষ্ট রয়েছে।

এইসব প্রাচীন ঘটনাবলি ৩ ঃ ১৩৭, ৬ ঃ ১১ এবং ২২ ঃ ৪৬ আয়াত সমূহে আলোচনা করা হয়েছে।

۱۳- وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ ۚ
أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ○

৪৭ ঃ ১৩ ওরা তোমার যে জনপদ থেকে তোমাকে বিতাড়িত করেছে তা হতে অতি শক্তিশালী কত জনপদ ছিল আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে সাহায্য করবার কেউ ছিল না।'

আয়াত নং ৭; ৪, ৭ ঃ ৬৪, ১৭ ঃ ১৭ ও ২০ ঃ ১২৮ এ উপরোক্ত বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ؕ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ

৪৮ ঃ ৪ তিনিই মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন যেন তারা তাদের বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাস দৃঢ় করে নেয়, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়–

এখানে প্রকৃতির শক্তির প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত যা জানা গিয়েছে তা হচ্ছে বিজ্ঞানীগণ প্রকৃতির চারটি মৌলিক শক্তি আবিষ্কার করেছেন, যথা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, দুর্বল আণবিক শক্তি, তাড়িত চুম্বকীয় শক্তি এবং শক্তিশালী আণবিক শক্তি। এ সকল শক্তির ব্যাপৃতি ও মান-মাত্রা ভিন্ন যা আয়াত ১ ঃ ২ এ উল্লেখ করা হয়েছে। মহাকর্ষীয় শক্তি এই নিখিল বিশ্বে এক অতি বিস্তৃত পরিমাণ দূরত্বের উপর ক্রিয়াশীল এবং গ্রহ-উপগ্রহ পুঞ্জকে গতিশীল রেখেছে। এটা দু'টি বস্তুর ভর-এর উপর নির্ভর করে তা এ সকল বস্তুর জ্যামিতি যাই হোক না কেন। মহাকর্ষ শক্তি না থাকলে আমরা পৃথিবী গ্রহের সাথে লেগে থাকতে পারতাম না। দুর্বল আণবিক শক্তি এর কেন্দ্রীয় অংশে সক্রিয় এবং বিটা (beta) রশ্মিসমূহের ক্ষয় প্রাপ্তির জন্য দায়ী। বিটা রশ্মির এই ক্ষয়প্রাপ্তি ধারাবাহিক প্রক্রিয়াসমূহকে প্ররোচনা দেয় যার ফলে সৌর শক্তির বিকীরণ ঘটে। তাড়িত চুম্বকীয় শক্তি পরমাণু তৈরীর ক্ষেত্রে মূল কারণ বলে বিবেচিত হয় এবং তা সকল বৈদ্যুতিক ও চুম্বকীয় বস্তুকে শক্তিশালী পারমাণবিক শক্তি পরমাণুর কেন্দ্রীয় অংশগুলোকে একত্রে ধরে রাখে। যদিও মাত্রা ও শক্তির ক্ষেত্রে অতি বিশাল মাত্রায় পার্থক্য বিদ্যমান (যে বিশাল দূরত্বের উপর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কার্যকর তা শক্তিশালী পারমাণবিক শক্তির চেয়ে প্রায় $১০^{৪০}$ মাত্রায় দুর্বল। আর এই শক্তিশালী পারমাণবিক শক্তি $১০^{১৩}$ সিএমএস মাত্রার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র পদার্থসমূহকে পরস্পরের সাথে আটকে রাখে) তবুও এ সকল শক্তির স্ব স্ব আজ্ঞাধীন এলাকা বিদ্যমান। দুর্বল পারমাণবিক শক্তি ও তাড়িত চুম্বকীয় শক্তিকে সমন্বিত করার জন্য বিজ্ঞানী সালাম, ওয়েনবার্গ (Weinberg) ও গ্লাশো (Glashow)-এর সাম্প্রতিক গবেষণা একটি ও একই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ হিসেবে প্রকৃতির এ সকল শক্তির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে আরও বেশী করে অনুপ্রেরণা দান করেছে। এগুলো হচ্ছে দূর কল্পনা যে সৃষ্টির শুরুতেই এ সকল শক্তি অতি উচ্চমাত্রার ভারসাম্যমূলক শক্তির মধ্যে সংবদ্ধ ছিল এবং শীঘ্রই এই ভারসাম্যের স্বতঃস্ফূর্ত ভাঙ্গনের সাথে সাথে তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে দৃষ্টিগোচর হয়। শক্তির এই সম্মিলন সম্পর্কে সৃষ্ট ভাবধারাসমূহকে পরীক্ষার

www.bjilibrary.com

উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীগণ অতি উচ্চমাত্রায় শক্তির বেগবর্ধক যন্ত্র তৈরির জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আশা করা যায় যে, এ সকল বেগবর্ধক যন্ত্র সৃষ্টির শুরুতেই অতি উঁচু মাত্রার শক্তিসমূহের প্রারম্ভিক অবস্থাকে উদ্দীপিত করতে পারবে। কিন্তু টেভ (Tev) অঞ্চলে (১ টেভ=১০৩ বেভ) (Bev), একটি বেভ ১০৯ বিদ্যুৎ পরমাণু ভোল্ট [electron volt-ev]-এর সমান)। অতি উচ্চমাত্রায় শক্তির বেগবর্ধক যন্ত্র দ্বারা উৎপাদিত শক্তিসমূহ নিখিল বিশ্বের গোড়ার দিকের বিদ্যমান শক্তির সাথে সমকক্ষতা অর্জন করে উঠতে পারেনি। তৎসত্ত্বেও অতি ক্ষুদ্র কণিকার পদার্থবিদ্যার ক্রমান্বয় অগ্রগতি এবং ক্ষুদ্রকণার পদার্থবিদ্যার ও বিভিন্ন শক্তির পরিপূর্ণ ঐক্যসাধনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে সাথে বিজ্ঞানীগণ এই সকল মিথষ্ক্রিয়ার বহু চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন। তাঁরা কিছু পরিমাণে হলেও বুঝতে পেরেছেন কীভাবে এই মিথষ্ক্রিয়া কাজ করে। কিন্তু কেন এই মিথষ্ক্রিয়া সমূহকে চালু করা হ'ল তা চিরকাল একটা রহস্য হিসেবেই থেকে যাবে। পক্ষান্তরে, কেউ হয়ত ভেবে অবাক হন যে কীভাবে প্রকৃতির এত সব শক্তির সূত্রপাত ব্যতিরেকে পদার্থ কে বিন্যস্ত করা সম্ভবপর হয়েছে। তাই ব্যক্তি মাত্রই অতি কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার না করে পারে না যে প্রকৃতির এ সমস্ত কর্মকান্ডের মিথষ্ক্রিয়া প্রকৃতই যে শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী মহান আল্লাহ্ তা'আলা দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং একমাত্র তাঁরই এসব কিছুর পরিপূর্ণ জ্ঞান ও অবহিতি রয়েছে। এ সকল শক্তি তার সকল প্রকার শাখা প্রশাখা বিস্তারসহ যে কাজ করে তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিদর্শন। আর সকল প্রকার বিস্ময়কর জটিলতা যা এসকল শক্তির কাজের মধ্যে অন্তর্নিহিত, মু'মিনদের বিশ্বাসের সাথে যুক্ত হয়।

৭- وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○

৪৮ ঃ ৭ আল্লাহ্‌রই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

এখানে যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা আয়াত ৪৮ ঃ ৪ এ আলোচনা করা হয়েছে।

১৪- وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

৪৮ ঃ ১৪ আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর বাদশাহী, প্রভুত্ব ও প্রশাসন ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ্ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি–এ বিষয়টি ৫ ঃ ১৯ আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

---كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ
يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ ----

৪৮ ঃ ২৯ ...... (আর ইঞ্জিলে তাদের চিহ্ন এরূপ) যেন একটা বীজ, তা প্রথমে অংকুর বের করেছে, পরে তা শক্তিশালী করেছে। পরে তা মোটা শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। এর পর এটা স্বীয় কান্ডের উপর দাঁড়িয়ে যায় যাতে চাষকারীকে অবাক ও সন্তুষ্ট করা হয়....

উদ্ভিদ জগতে যে সমস্ত জৈব কর্মকান্ড দেখা যায় তার মধ্যে ক্ষুদ্র একটি বীজ থেকে অতি ক্ষুদ্র অঙ্কুর বের হওয়া, পরে সেই ক্ষুদ্র ও দুর্বল চারাগাছ ক্রমে বড় হয়ে এক বিরাট বৃক্ষে পরিণত হওয়া যখন গাছটি নিজের কান্ডের উপর সগৌরবে দাড়িয়ে থাকার ঘটনাটি আমাদের অবাক করে এবং এতে কৃষকদেরও অপার আনন্দ লাভ হয়। একটি পরিপুষ্ট বীজ উপযুক্ত পরিবেশে যেখানে থাকবে প্রয়োজনীয় তাপ, প্রচুর জলীয় পদার্থ এবং অক্সিজেন, অঙ্কুরিত হয়। বীজের ভিতরকার ঘুমন্ত ভ্রূণ বৃক্ষটি সেই পরিবেশে জেগে উঠে এবং প্রথম একটি মূল মাটিতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। পরে একটি অঙ্কুর সোজা উপরের দিকে বের হয় এবং একটি ছোট চারাগাছে পরিণত হয়। এই সময় চারাগাছটি বীজের সংরক্ষিত খাদ্যবস্তুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকে। ধীরে ধীরে সবুজ পাতা বের হয় এবং চারাগাছটি খাদ্যের ব্যাপারে স্বনির্ভর হয়ে যায়। কারণ এই পাতার সাহায্যে চারাটি তার প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। যে প্রাথমিক অঙ্কুর থেকে পাতা বের হয় সেই নবাঙ্কুর প্রথমে খুব নরম থাকে যাকে প্রাথমিক অঙ্কুর বলা হয়। পরে ধীরে সেই অঙ্কুরটি শাখা বিশিষ্ট ডালে পরিণত হয় যাতে আরো নতুন পাতা বের হয়। ফলে চারাটির আরো দৃঢ়তার প্রয়োজন হয় যেন সে ডাল ও পাতার ওজন নিতে পারে এবং মূল থেকে পাতা পর্যন্ত পানি সিঞ্চন করতে পারে ও গাছের এক অংশ থেকে অন্য অংশে খাদ্য পরিবেশন করতে সক্ষম হয়। চারাগাছটির কান্ডের দৃঢ়তা লাভ করা যে পদ্ধতিতে হয় তাকে দ্বিতীয় পর্যায়ের বৃদ্ধি বলা হয় – যার ফলে এমন কতগুলো সহকারী বস্তুর সৃষ্টি হয় যা প্রধানত মৃত অথচ শক্ত আবরণযুক্ত জীবকোষ সমষ্টি। এই পদ্ধতি গাছটির বেলায় আজীবন চালু থাকে যার ফলে গাছের কান্ডটি তার সমস্ত ডাল পালা ও পত্রাবলির ওজন বহন করার শক্তি লাভ করে। এই আয়াতে একটি ক্ষুদ্র চারা কিভাবে বিরাট মহীরুহ হয় সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যেমন ইসলামও প্রথমে নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বিরাট সভ্যতায় পরিণত হয়।

www.bjilibrary.com

-يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا
وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝

৪৯ ঃ ১৩ হে মানুষ! আমরাই তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর তোমাদেরকে জাতি ও গোষ্ঠী বানিয়ে দিয়েছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। বস্তুত আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সে যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ন্যায়বান। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত।

এক জোড়া নর-নারী থেকে মানব জাতির সৃষ্টির বিষয়টি ৪ ঃ ১ এবং ৩৯ ঃ ৬ আয়াতের সঙ্গে মানব জাতির বিভিন্ন রং আকৃতি ও জাতিতে বিভক্তির বিষয়টিও ২ ঃ ২১৩ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী ও বর্ণের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, ভৌগলিক জাতীয়তা একে অন্যের উপর প্রভাব প্রতিষ্ঠা এবং নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের মাধ্যমে কালে কালে বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন জাতির চাল-চলন, রীতি-নীতি ও দৈনন্দিন জীবন পদ্ধতির পার্থক্য, এক জাতি অন্য জাতি সম্পর্কে জানবার জন্য উৎসাহ সৃষ্টি করে। এ ছাড়া এক জাতি তার প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র ও আবাস স্থলের প্রয়োজনে নিজের এলাকার প্রসারের উদ্দেশেও অনুপ্রাণিত হয়। এমনিভাবে আপোষে বা বিরোধের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক আদান-প্রদান শুরু হয়। এই ভাবের আদান-প্রদানের কথাই আয়াতের লিতা'আরাফু (যেন তোমরা পরস্পরকে জানতে পার) শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৭-اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا
وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ۝

৫০ ঃ ৬ ওরা কী ওদের ঊর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না, আমি কীভাবে তা নির্মাণ করেছি ও তাকে সুশোভিত করেছি এবং তাতে কোন ফাটলও নেই?

আয়াত নং ২ ঃ ১১৭, ২ ঃ ১৬৪ এবং পরিশিষ্ট ১ ও ২তে আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতি দ্বারা

www.bjilibrary.com

আকাশমন্ডলীকে সজ্জিত করণের বিষয়টি রাতের আকাশের সৌন্দর্যের প্রসঙ্গে আয়াত ৩৭ ঃ ৬-এ আলোচনা করা হয়েছে। আকাশে লক্ষ কোটি নক্ষত্র দৃশ্যমান যা মিটমিট করে জ্বলে, গ্রহ-উপগ্রহ থেকে নিয়মিত আলো প্রতিঃসরিত হয় এবং আলোকিত চন্দ্র একটি চান্দ্র মাসে তার অবস্থান পরিবর্তন করে। আকাশমন্ডলীর আর একটি অঙ্গসজ্জা হচ্ছে সূর্য। দিনের বেলায় সূর্যের প্রতাপ অপরিসীম এবং আকাশমন্ডলীর অন্য সব গ্রহ, উপগ্রহকে আলো বিতরণ করে তাদেরকে উদ্ভাসিত করে। আকাশমন্ডলীর এই সৃষ্টিতে এমন কি একজন সতর্ক পর্যবেক্ষণকারীও কোন প্রকার ত্রুটি খুঁজে পাবে না। নিখিল বিশ্বের সর্বত্র সূক্ষ্ম ভারসাম্য ও সমন্বয় বিদ্যমান এবং এ বিষয়টি আয়াত ৬ ঃ ৭৩ ও ২৫ ঃ ২ এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৭- وَالْأَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا

فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ ○

৫০ ঃ ৭ ঃ আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে ও তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা এবং তাতে উদ্গত করেছি সর্বপ্রকার নয়ন প্রীতিকর উদ্ভিদ।

পৃথিবীর বিস্তার সাধনের বিষয়টি আয়াত ২ ঃ ২২ ও ১৩ ঃ ৩ এ আলোচিত হয়েছে। পৃথিবীর ভূত্বকে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা পর্বতমালার বিন্যাস সম্পর্কে ১৩ ঃ ৩ সংখ্যক আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। আর চমৎকার সব উদ্ভিদাদির উৎপাদন পৃথিবীকে করেছে সুশোভিত এবং ৬ ঃ ৯৯ সংখ্যক আয়াতে এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

৯- وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبٰرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ○

১০- وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ○

১১- رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَأَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۭ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ○

৫০ ঃ ৯-১১ আকাশ থেকে আমি বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি এবং তা দ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও পরিপক্ক শষ্যরাজি ও সমুন্নত খেজুর গাছ যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর আমার বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ ও বৃষ্টি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে, এভাবে পুনরুত্থান ঘটবে।

আকাশ থেকে বৃষ্টির বর্ষণ এবং ফল-ফসলের উৎপাদনের উপর এর উপকারী ফলাফল সম্পর্কে আয়াত ২ ঃ ২২ এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রলম্বিত খেজুরের ছড়াসহ লম্বা খেজুর গাছ ও খেজুরের উৎপাদন এবং বৃষ্টিপাতের ফলে মৃত ভূমিকে সজীব করে তোলার বিষয়টি ২ ঃ ১৬৪ সংখ্যক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

٣٦- وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ

هَلْ مِن مَّحِيصٍ ۝

৫০ ঃ ৩৬ আমি তাদের পূর্বে আরও কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি যারা ছিল তাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল, তারা দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করে ফিরত; পরে তাদের অন্য কোন আশ্রয়স্থল রইল না।

এই বিষয়টি আয়াত ৩ ঃ ১৩৭, ৬ ঃ ১১ ও ৭ ঃ ৪-এ আলোচিত হয়েছে।

٣٨- وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ۝

৫০ ঃ ৩৮ আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এদের অন্তর্বর্তী সব কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি, আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যের সব কিছুই ছয় দিনে সৃষ্টির বিষয়টি ৭ ঃ ৫৪ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

١- وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا ۝ ٢- فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا ۝

٣- فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ۝ ٤- فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ۝

৫১ ঃ ১-৪ শপথ ধূলিঝড়ের, শপথ বোঝা বহনকারী মেঘ পুঞ্জের, শপথ স্বচ্ছন্দগতির জলযানের, শপথ কর্মবন্টনকারী ফিরিশতাগণের–

অধিকাংশ তাফসীরকারকগণ ঐকমত্য পোষণ করেন যে এই আয়াতে ব্যবহৃত সর্বনাম ‘ঐগুলো’ বিভিন্ন ধরনের বাতাসের প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে। বিভিন্ন গতির উপর ভিত্তি করে বায়ুর শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে ২ ঃ ১৬৪ আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই আয়াতে বায়ুর চারটি স্বাভাবিক ধর্মের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

প্রথমত, শক্তিশালী বায়ুপ্রবাহ ও প্রবল বাত্যা প্রচন্ড গতিতে প্রবাহিত হয় এবং শুকনো ধূলিকণা, ধূলা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরকুচি প্রভৃতি বয়ে নিয়ে গিয়ে এক বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে দেয়। এভাবে বায়ুর সাহায্যে একটি পরিচ্ছন্নতার অবস্থার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত, ঊর্ধ্বমুখী ধাক্কার প্রভাবে প্রবলভাবে প্রবাহিত বায়ু বিশাল বিশাল মেঘমালাকে উপরে উঠিয়ে নেয়। এইরূপ মেঘে হাজার হাজার টন পানি থাকে। এত বিপুল পরিমাণ জলকণা যা মেঘদল গঠন করে তা কীভাবে শূন্যে বাতাসের মধ্যে ভাসমান থাকে, সে বিষয়ে আয়াত ২ ঃ ১৬৪ ও ৭ ঃ ৫৭তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তৃতীয়ত, প্রবল বাতাস বিভিন্ন দিকে মেঘপুঞ্জকে ভেসে বেড়াতে সাহায্য করে এবং বিভিন্ন গঠন বিন্যাস ও প্রকারে আল্লাহ্‌র রহমত বিতরিত হয়, যেমন, ফলবতী বা উর্বর করে এমন বাতাস (আয়াত ১৫ ঃ ২২), মৃত ভূমিকে সজীব করার জন্য বারিপাত (আয়াত ২ ঃ ১৬৪), পৃথিবীর যাবতীয় জীবিত প্রাণীর পিপাসা নিবৃত্তিকল্পে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা (আয়াত ২৫ ঃ ৪৮) উল্লেখ্য।

٧- وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۝

৫১ ঃ ৭ শপথ বহু পথ বিশিষ্ট আকাশের।

এই বিষয়টি আয়াত ২১ ঃ ৩৩-এ আলোচনা করা হয়েছে।

٢٢- وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۝

৫১ ঃ ২২ তোমাদের জীবনোপকরণের উৎস ও প্রতিশ্রুত সবকিছু আকাশে রয়েছে।

আকাশ মন্ডলীতে সমুন্নত থাকার বিষয়টি ১৫ ঃ ২১ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।

٢٨- فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۝

٢٩- فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ۝

٣٠- قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۝

৫১ ঃ ২৮-৩০ এতে তাদের সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার হ'ল। তারা বলল, 'ভীত হয়ো না।' তারপর তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল। তখন তার স্ত্রী চিৎকার করতে

www.bjilibrary.com

করতে সামনে আসল এবং গাল চাপড়িয়ে বলল, 'এই বৃদ্ধা-বন্ধ্যার সন্তান হবে?' তারা বলল, 'তোমার প্রতিপালক এরূপই বলেছেন, তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

বৃদ্ধ ইবরাহীম (আ) ও তার বন্ধ্যা স্ত্রীর সন্তান জন্মদানের বিষয়টি ইতোমধ্যে আয়াত ১১ ঃ ৭১-৭২ এ আলোচনা করা হয়েছে।

৩৩- لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ۝

৫১ ঃ ৩৩ তাদের উপর নিক্ষেপ করার জন্য মাটির শক্ত ঢিল,

লূত (আ)-এর লোকদের উপর শাস্তিদানের বিষয় নিয়ে আয়াতটি নাযিল হয় এবং এ বিষয়ে আয়াত নং ৭ ঃ ৮৪, ১১ ঃ ৮২ ও ১৫ ঃ ৭৪ এ আলোচনা করা হয়েছে।

৪১- وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ۝

৪২- مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ۝

৫১ ঃ ৪১-৪২ এবং নিদর্শন রয়েছে 'আদের ঘটনায়, যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম অকল্যাণকর বায়ু; এটা যা কিছুর উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল,

বায়ু সম্পর্কিত বিষয়টি আয়াত নং ১৭ ঃ ৬৯ এ আলোচিত হয়েছে।

৪৩- وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ۝

৪৪- فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۝

৪৫- فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ ۝

৫১ ঃ ৪৩-৪৫ আরও নিদর্শন রয়েছে ছামূদের বৃত্তান্তে, যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, 'ভোগ করে নাও স্বল্পকাল।' কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল; ফলে তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হ'ল এবং তারা তা দেখছিল। তারা উঠে দাঁড়াতে পারল না, এবং তা প্রতিরোধ করতেও পারল না।

এই আয়াত সমূহে ছামূদ জাতির উপর যে শাস্তি নেমে এসেছিল তার উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াত ১১ ঃ ৬৭তেও এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

٤٧- وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْىدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ○

৫১ ঃ ৪৭ আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী।

সৃষ্টি কৌশলের জন্য শক্তিশালী কল্পনা শক্তি ও কুশলী দক্ষতার প্রয়োজন হয়। এক লক্ষ কোটির মধ্যে যদি কোন একটি তাৎপর্যহীন বিচ্যুতি বা ক্রটি ঘটে, তাহলে সমগ্র সৃষ্টিই নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতা ও দক্ষতা ব্যতীত আকাশমন্ডলীতে অবস্থিত নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহরাজি এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে ও বিন্যাসে পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য ও প্রাণীজগত কোন কিছুরই সৃষ্টি হওয়া সম্ভব ছিলনা (দ্র. পরিশিষ্ট ১ ও ২)। এই আয়াতের দ্বিতীয়াংশ এই অর্থ সূচিত করে যে এই নিখিল বিশ্ব সম্প্রসারণশীল এবং তা পরিশিষ্ট-২ এ সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

٤٨- وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ○

৫১ ঃ ৪৮ এবং আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি, আমি তা কত সুন্দরভাবে বিছিয়ে দিয়েছি।

আয়াত নং ২ ঃ ২২ ও ১৩ ঃ ৩ এ বিষয়টির ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

٤٩- وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

৫১ ঃ ৪৯ আমি প্রত্যেক বস্তুকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

৪৩ ঃ ১২ নং আয়াতে এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

٥- وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ○

৫২ ঃ ৫ শপথ সমুন্নত আকাশের।

জানা আছে যে দু'টি ভিন্ন ধরনের শক্তি এই নিখিল বিশ্বে কর্মরত আছে, (১) মহানিনাদ (Big Bang)-এর কারণে সম্প্রসারণ শক্তি, ও (২) মহাকর্ষ শক্তি। সম্প্রসারণ শক্তি সব কিছুকেই কেন্দ্র থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়, পক্ষান্তরে মহাকর্ষ শক্তি সবকিছুকে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। এই বিশ্ব জগতে যে কোন দু'টি পদার্থ তা সে সম্প্রসারণশীল বিশ্বে হোক না কেন, পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই দু'টি পদার্থ যত বেশী কাছাকাছি আসবে ততবেশী তাদের মধ্যে মহাকর্ষ শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং বলতে গেলে সম্প্রসারণশীল বিশ্বের পৃথকীকরণ

www.bjilibrary.com

প্রভাবের বিপক্ষে এই দু'টি পদার্থের পরস্পর দৃঢ়ভাবে লেগে থাকার সম্ভাবনাই বেশী।

উদাহরণ স্বরূপ এই সম্প্রসারণশীল বিশ্ব সৌরজগতের গঠনিক উপাদান সমূহকে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে না অথবা একটি ছায়াপথের অন্তঃস্থ নক্ষত্রসমূহকে তাদের একটি থেকে অপরটিকে পৃথক করে না। মহানিনাদ (Big Bang)-এর কারণে এবং মহাকর্ষ শক্তির প্রভাবে আকাশমন্ডলীতে অবস্থিত নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ সমূহের প্রত্যেকটির উপর সম্প্রসারণশীল শক্তি কাজ করে। মহাকর্ষের কারণে যদি আকর্ষণকারী শক্তি সম্প্রসারণ শক্তির চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী হয় তাহলে আকাশমন্ডলীতে অবস্থিত ঐ সকল বস্তু পরস্পর সংযুক্ত হয়ে গুচ্ছ গঠন করে। এভাবে মহা বিশ্বের নক্ষত্রের ও ছায়াপথের পুঞ্জ গঠিত হয়। এবং যে সব পুঞ্জের উপর সম্প্রসারণ শক্তি মহাকর্ষ শক্তি থেকে বেশী শক্তিশালী হয় সেসব পুঞ্জ অপসৃত হয়। এভাবে অপসৃয়মান অনেক ছায়াপথ রয়েছে। এরূপে আকাশমন্ডলীর আমরা সাতটি স্তর পাই যারা পরস্পরের সাথে সংযুক্ত আছে এবং অপসৃত হচ্ছে। এই সাতটি স্তর হচ্ছে ঃ (১) অন্তঃস্থ গ্রহসমূহ যাদের কক্ষপথ উপগ্রহ বলয় ও সূর্যের মধ্যবর্তী অবস্থানে রয়েছে; (২) সৌরজগত; (৩) সূর্যের স্থানীয় তারকা দল; (৪) ছায়াপথস্থিত উজ্জ্বল নক্ষত্র মন্ডলী; (৫) ছায়াপথ সমূহের পুঞ্জ; (৬) মহা ছায়াপথ; এবং (৭) মহা বিশ্বের প্রান্তঃস্থ অঞ্চল। এরূপে আমরা দেখতে পাই যে একটি ঢাকনা (চাঁদোয়া) পৃথিবী থেকে উত্থিত হয়ে মহা ছায়াপথ ও মহাবিশ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।এ বিষয় গুলোই ২ ঃ ২৯ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۙ

৫২ ঃ ৬ এবং শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের–

মহাসমুদ্র/ সমুদ্র হচ্ছে বিপুল জলরাশির সমাহার। এই জলরাশি ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৭১% স্থান জুড়ে রয়েছে। এ বিশাল জলরাশি জলস্রোতের একটি সুবিন্যস্ত প্রণালী দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। মহাসাগরীয় স্রোতসমূহ তাদের স্ব স্ব অবস্থানে কমবেশী স্থায়ী। সমুদ্র তলের বায়ু ঘর্ষণ এবং মহাসাগর/ সাগরের পানির ঘনত্বের মধ্যে আনুভূমিক ও উল্লম্বের পার্থক্যের কারণে মহাসাগর/ সাগরের জলস্রোতের মধ্যে প্রবহমানতার শক্তির উদ্ভব হয়। পার্থক্যমূলক উত্তাপন ও শীতলীকরণ, অতি প্রচন্ডবেগে নিচের দিকে ধাবন এবং বাষ্পীভবন সমুদ্রতলে পানির ঘনত্বের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। কারণ, সামুদ্রিক জল স্রোতের পরিবেষ্টন বায়ুমন্ডল ও তার আচরণের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত। মহা মহাসাগরীয় জলস্রোতের পদ্ধতিসমূহ যেমন ধারণা করা হয় তেমন স্থির নয়। অভিকর্ষের বহিঃশক্তি ব্যতিরেকে সামুদ্রিক জলস্রোতের সংঘটক ও প্রভাবক হিসেবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে

www.bjilibrary.com

আনুভূমিক চাপ বিশিষ্ট নতিমাত্রার শক্তি, Coriolis শক্তি ও ঘর্ষণজনিত শক্তি। সমুদ্র পৃষ্ঠের তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে সামুদ্রিক স্রোত প্রধানত দায়ী। আর, এর ফলে বায়ুমন্ডলের উপরিস্থিত আবহাওয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে।[১]

সমুদ্রের গড় গভীরতা প্রায় ৩৭৯০ মিটার (১২৪৩০ ফুট) বলে হিসাব করা হয়েছে। সমুদ্রের সর্বোচ্চ পরিমাণ গভীরতা হচ্ছে ১০,৮৫০ মিটার (৩৫,৫৯৫ ফুট)। এই গভীরতা হিমালয় পর্বতের ৮,৮৪৮ মিটার (২৯,০২৮ ফুট) উচ্চতাকে অতিক্রম করেছে।

পৃথিবীতে বিদ্যমান বিভিন্ন সমুদ্রের অভ্যন্তরে যেখানে ব্যাপক মাত্রায় পানির চলনের ফলে স্রোতের সৃষ্টি সেখানে সমুদ্রের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রবল বাতাস পানিকে দারুণভাবে আন্দোলিত করে। আর এর ফলে সমুদ্র তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। বহুধরন ও প্রকারের সমুদ্র তরঙ্গ রয়েছে, এদের মধ্যে একটি হচ্ছে অভিকর্ষ তরঙ্গ। সমুদ্রের উপরিভাগে ধাবনশীল তরঙ্গের মধ্যে যেগুলো প্রবাহহীন তাদের মধ্যে তিন ধরনের তরঙ্গকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেমন বাতাস দ্বারা সৃষ্ট তরঙ্গ, ফুলে-ফেঁপে ওঠা উত্তাল তরঙ্গ এবং ভূকম্পনঘটিত সমুদ্র তরঙ্গ। বায়ুতাড়িত তরঙ্গ প্রবল বায়ু প্রভাবের ফলে সৃষ্ট হয়। বায়ুর গতি অনুসারে সমুদ্রের অবস্থা বর্ণনা করে বিউফোর্ট (Beaufort) একটি সারণি তৈরি করেছেন। বায়ুপ্রবাহে সৃষ্ট সমুদ্র তরঙ্গের উচ্চতা ক্রমবর্ধমান বায়ুর গতি ও মেয়াদের কারণে বৃদ্ধি পায় এবং বায়ু যে উচ্চতায় প্রবাহিত হবে তদনুসারে সর্বোচ্চ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যেরও বৃদ্ধি ঘটবে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে প্রতি সেকেন্ডে ৫ মিটার (১৬ ফুট), ১৫ মিটার (৫০ ফুট) ও ২৫ মিটার (৮০ ফুট) গতির বায়ুপ্রবাহ একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উচ্চতায় তরঙ্গকে উঠিয়ে নিতে পারে। এই উচ্চতা হবে যথাক্রমে ০.৫ মিটার (১.৬ ফুট), ৪.৫ মিটার (১৫ ফুট) ও ১২.৫ মিটার (৪১ ফুট)। আর এর অনুরূপ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হবে যথাক্রমে ১৬ মিটার (৫৩ ফুট), ১৪০ মিটার (৪৬০ ফুট) এবং ৪০০ মিটার (১৩০০ ফুট)।

বাতাসের গতি হ্রাস প্রাপ্ত হলে তরঙ্গ সৃষ্টির এলাকা থেকে তরঙ্গসমূহ-এর বিচরণ শেষ হয়। তারপর ক্রমান্বয়ে এগুলো স্ফীত হয়ে ওঠে এবং এরূপ অবস্থাকে সমুদ্র উপরিভাগের তরঙ্গ নামে অভিহিত করা হয়। এসব তরঙ্গের রয়েছে একইরকম বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ অধিকতর দীর্ঘ ও দীর্ঘতর সময় ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। তরঙ্গ স্ফীতি হাজার হাজার মাইলব্যাপী স্থান পরিভ্রমণ করতে পারে। এটা তরঙ্গ ও তরঙ্গ ফেনা দ্বারা গঠিত হয়। এই তরঙ্গ পরে উর্মিভঙ্গে পরিণত হয়, আর তরঙ্গ ফেনা সমুদ্র তীরে গিয়ে সঞ্চিত হয়।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Encyclopaedia Britannica, vol. 13, pp. 437-443, 1978.

www.bjilibrary.com

٩- يَوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ○

١٠- وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ○

৫২ ঃ ৯-১০ যেদিন আকাশ প্রবলভাবে আন্দোলিত হবে এবং পর্বত দ্রুত চলবে।

এই বিশ্বজগত চূড়ান্তভাবে ধ্বংস হওয়ার অর্থাৎ মহা-নিনাদ-এর পূর্বে প্রায় এক লক্ষ বছরের একটা সময়ে নক্ষত্ররাজি এত নিকটবর্তী হবে যে রাতের আকাশ কেবল চোখ ধাঁধান উজ্জ্বল আলোয় ভরে যাবে না তা তাপদগ্ধ গরমে পর্যবসিত হবে। এই নিখিল বিশ্বের যে কোন গ্রহের সকল জীবন্ত প্রাণীর সমাপ্তি ঘটবে। শ্বেত তাপে ভাস্বর আকাশের নিচে সমুদ্রের পানি টগবগ করে ফুটবে, তারকা রাজি এত নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে যে তাদের উত্তাপে কঠিন পাথর গলে যাবে এবং গলিত পাথর উত্তাপে ফুটতে ফুটতে প্রবাহিত হবে। গলিত পাথরের পিন্ডের মধ্যে প্রচন্ড আলোড়নের সৃষ্টি হবে, আর পর্বতসমূহ উড়ে চলে যাবে। তারকারাজির একে অপরের সাথে সংঘর্ষ হবে। এভাবে সমগ্র বিশ্বজগত এক সময়ে এক ভীতিকর আলোড়নের মধ্যে পড়বে।

١- وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ○

৫৩ ঃ ১ শপথ নক্ষত্রের, যখন তা অস্তমিত হয়।

পৃথিবীর স্বীয় অক্ষরেখার উপর ঘূর্ণনের ফলে নক্ষত্ররাজিসহ আকাশমন্ডলীর সকল গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতি পূর্ব দিকে ওঠে ও পশ্চিমে অস্ত যায় বলে প্রতীয়মান হয়। এই আয়াতে নক্ষত্র শব্দ দ্বারা একটি নির্দিষ্ট নক্ষত্রকে বুঝান হয়েছে। অনুমিত হয় যে, এখানে লুব্ধক (Sirius) নক্ষত্রের প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে। আকাশের লুব্ধক নক্ষত্রকে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়। জ্যোতির্বিদ্যায় একে Alpha Canis Majoris নামে অভিহিত করা হয়। সংগী Sirius B সহ এটি সবচেয়ে নিকটবর্তী তারকা। পৃথিবী থেকে ৮.৭ আলোক বর্ষের দূরত্বে রয়েছে এবং লুব্ধকের বলয় থেকে একটি অবরোহণ রেখার মধ্যে অবস্থিত।

٣١- وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا

وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ○

৫৩ ঃ ৩১ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই। যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি মন্দ ফল দেন এবং যারা সৎ কাজ করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার।

www.bjilibrary.com

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ্র। এ বিষয়টি আয়াত ৫ ঃ ১৯, ৭ ঃ ৫৪ ও ৭ ঃ ১৮৫তে আলোচনা করা হয়েছে।

٣٢- اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ۚ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ
هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ
فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۚ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ○

৫৩ ঃ ৩২ যারা বড় বড় গুণাহ্ এবং প্রকাশ্য ও স্পষ্ট অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে– তবে কিছু অপরাধ তাদের দ্বারা ঘটে যায়, মনে রেখো তোমাদের রবের ক্ষমাশীলতা অনেক ব্যাপক তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি তোমাদেরকে সেই সময় থেকেই জানেন যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর যখন তোমরা তোমাদের মাতৃগর্ভে ভ্রূণ অবস্থায় ছিলে। অতএব তোমরা নিজেদের পবিত্রতার দাবী করো না, প্রকৃত মুত্তাকী কে, তা তিনি ভালই জানেন।

মানুষ যে মাটি থেকে সৃষ্ট সেই বিষয়টি ২ ঃ ২৮, ৬ ঃ ২ এবং ১৮ ঃ ৩৭ আয়াত সমূহের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। মানুষের প্রাক ভ্রূণ ও ভ্রূণ কালের যাবতীয় খবর আল্লাহ্ জানেন যার উপর মানুষের কোন কর্তৃত্ব নেই। মায়ের পেটে মানব শিশুর সৃষ্টির বিবরণ ১৩ ঃ ৮ আয়াতের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

٤٣- وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى ○ ٤٤- وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا ○
٤٥- وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ○ ٤٦- مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى ○

৫৩ ঃ ৪৩-৪৬ আর তিনিই হাসিয়েছেন এবং তিনিই কাঁদিয়েছেন, আর নিশ্চয়ই তিনিই মৃত্যু দিয়েছেন এবং তিনিই জীবন দান করেছেন। আর নিশ্চয়ই তিনিই পুরুষ ও নারীর জোড়া সৃষ্টি করেছেন সেই ফোঁটাতে যা নিক্ষিপ্ত হয়।

হাসি এবং কান্না মনের অবস্থার বহিঃপ্রকাশ যাতে মানসিক দুঃখ ও কষ্টের অবস্থা বুঝা যায়। হাসি ও কান্নার অভিব্যক্তি কীভাবে হয় তা বুঝা খুবই জটিল। এ জন্য মানসিক অবস্থা ও শারীরিক কিছু কর্মকান্ডের সমন্বয়, মুখের কতক

www.bjilibrary.com

মাংসের কুঞ্চন ও প্রসারণ প্রয়োজন যার ফলে হাসির উদ্ভব হয় এবং দুঃখ ভাবের ফলে চোখের Lachrymal গ্রন্থিগুলো উত্তেজিত হয় ও অশ্রু নির্গত হয়। এ সবই আল্লাহ্ প্রদত্ত স্নায়ু ও মাংসের সমন্বিত কর্মকান্ডের (neuromuscular functions) সমষ্টি।

আল্লাহ্ যে জন্ম ও মৃত্যুর মালিক তা ৬ ঃ ৯৫ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। নর ও নারী সৃষ্টির বিষয়টি ১৬ ঃ ৪ ও ৩০ ঃ ২১ আয়াতে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এই আয়াতে আর একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে যা মাত্র কয়েক দশক পূর্বে মানুষ জানতে পেরেছে। এই আয়াত দুটির (আয়াত ৫৩ ঃ ৪৫-৪৬) প্রচলিত অর্থ এই যে নুৎফা (seminal fluid) তোমরা ছুড়ে ফেল তা থেকে জোড়ায় জোড়ায় নর-নারী সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীতে সব নর-নারী জোড়ায় জোড়ায় জন্মগ্রহণ করে না। যেহেতু ছুড়ে ফেলার কথা বলা হয়েছে তাতে শুধু পুরুষের বীর্যকে বুঝায়। আর শুধু পুরুষের বীর্যে সন্তান হয় না– তার জন্য নারীর নুৎফা বা ডিম্ব প্রয়োজন। সুতরাং পুরুষের বীর্যের মধ্যেই জোড়ায় জোড়ায় নর ও নারী রয়েছে ধরলে অর্থটা পরিষ্কার হয়।

٤٩- وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ ۝

৫৩ ঃ ৪৯ আর তিনিই 'শেয়রা' তারকার রব বা সৃষ্টিকর্তা।

এই বিষয়ে ৫৩ ঃ ১ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

٥٠- وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ۝ ٥١- وَثَمُودَا فَمَا أَبْقَىٰ ۝

٥٢- وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ۝

٥٣- وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ۝ ٥٤- فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ ۝

৫৩ ঃ ৫০-৫৪– আর তিনিই (সেই আল্লাহ্) যিনি প্রাচীন 'আদ্' জাতিকে ধ্বংস করেছেন, এবং ছামূদ জাতিকে এমনভাবে ধ্বংস করেন যে তাদের একজনকেও বাঁচিয়ে রাখেননি। আর তাদের পূর্বে নূহের জাতিকে ধ্বংস করেছেন। কারণ তারা কঠিন অত্যাচারী ও সীমালংঘনকারী দুর্বিনীত লোক ছিল। আর তিনি উপুড় হয়ে পড়ে থাকা জনবসতিসমূহকে (সোডোম ও গোমররাহ) উঠিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন যাদের উপর বিছিয়ে দিলেন সেই জিনিস যা তোমরা জান।

এই বিষয়গুলো ১১ ঃ ৬৭, ৬৮ ও ৮২ আয়াতের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝

৫৪ ঃ ১ ক্বিয়ামতের মুহূর্ত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র খন্ডিত হয়েছে।

পৃথিবী ও চাঁদ পরস্পরের সঙ্গে তাদের একে অন্যের চারিদিকে ও নিজস্ব ঘূর্ণনের সঙ্গে সম্পর্কিত। আর এই সম্পর্ক স্থির নয়– বরং সব সময় পরিবর্তিত হচ্ছে। সমুদ্রের জোয়ার ভাটা এর সঙ্গে সম্পর্কিত। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সমুদ্রের পানিকে পৃথিবী থেকে সামান্য সরিয়ে চাঁদের দিকে আকর্ষণ করে আর পৃথিবীকে চাঁদের বিপরীত দিকে পানি থেকে দূরে সরাতে চেষ্টা করে।

যদি পৃথিবী আপন অক্ষরেখা বা মেরুদন্ডের চারদিকে না ঘুরতো তবে শুধু এই পানির উচ্চতা একদিকে স্থির না থেকে বিভিন্ন এলাকায় পরিব্যাপ্ত হত। আর পানি ফুলে উঠতে এবং আবার নেমে যেতে সময় লাগে তখন পৃথিবী ও চাঁদের কল্পিত রেখা থেকে পানির উচ্চতা দূরে সরে যায়। এই পানির প্রতি চাঁদের আকর্ষণের ফলে পৃথিবীর নিজস্ব ঘূর্ণনের গতি এক শতাব্দীতে ০.০০২ সেকেন্ড হ্রাস পায়। পৃথিবীর ঘূর্ণনগতির এইভাবে শ্লথ হয়ে আসায় একটা মজার ব্যাপার ঘটে। এটা জানা যে, যে কোন বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থায়/জগতে কৌণিক গতি সংরক্ষিত/অক্ষুণ্ন থাকে। পৃথিবীর ঘূর্ণনগতি যদি জোয়ার দ্বারা বাধাগ্রস্ত করা হয়, তাহলে এর কৌণিক গতি কমে আসে। এ ক্ষতিটা পুষিয়ে নিতে হলে একে অন্য কোথাও পুনরাবির্ভূত হতে হবে। বর্তমানে এটি পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের আবর্তনপথে দেখা যায়। চাঁদের আবর্তনপথে কৌণিক গতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং চাঁদ ধীরে ধীরে পৃথিবীর বহির্দিকে পেঁচালো গতিতে পৃথিবী থেকে দূরে যাচ্ছে ততই এর আবর্তনকাল বৃদ্ধি পাচ্ছে কেপলারের সূত্রানুযায়ী। এভাবে দিন ও মাস উভয়ই দীর্ঘতর হচ্ছে, তবে দিন বাড়ছে দ্রুততর হারে। আজ থেকে পাঁচশ থেকে এক হাজার কোটি বছর পর যখন বর্তমানের ২৪ ঘন্টার দিনের স্থলে ৪৩ ঘন্টার মত দিন হবে, তখন দিন ও রাত সমান হবে। এ বিষয়টি ছাড়াও পৃথিবী–চাঁদ জগতের আরও বিবর্তন আরো বেশি গভীর চিন্তাভাবনার বিষয়। বিস্তারিত হিসাবাদি এই ইঙ্গিতই দিচ্ছে যে, চাঁদ পেঁচানো বা সর্পিল গতিতে পৃথিবীর দিকেই চলে আসবে এবং পৃথিবীর নিকটতর হতে থাকবে। পরিণতিতে চাঁদ পৃথিবীর এত কাছাকাছি চলে আসবে যে, চাঁদের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী অর্ধাংশের উপর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ টানের পার্থক্য আক্ষরিক অর্থেই চাঁদকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করবে।[১]

তথ্যসূত্র ঃ

1. J. C. Brandt, and J. P. Maron, New Horisons in Astronomy, W. H. Freeman and Company, San Fransisco, p. 427. 1972.

www.bjilibrary.com

١١- فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ۝ ١٢- وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا
فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۝ ١٣- وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ۝
١٤- تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ۝
١٥- وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ۝

৫৪ ঃ ১১-১৫ ফলে আমি প্রবল বারি বর্ষণে আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম, এবং মাটি থেকে প্রস্রবণ উৎসারিত করলাম; অতঃপর এক পরিকল্পনা অনুসারে সকল পানি মিলিত হ'ল। তখন নূহকে কাঠ ও কীলক নির্মিত এক জলযানে আরোহণ করালাম যা আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে চলত; যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল তার জন্য এটা পুরস্কার। আমি একে এক নিদর্শনরূপে রেখে দিয়েছি; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

আকাশের যে বস্তু থেকে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় এই বিষয়টি ১১ ঃ ৫৭ সংখ্যক আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোন কোন গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চল যেখানে বন ও পাহাড় আছে সেখানে কখনও কখনও বিশাল জলদ মেঘপুঞ্জ আকাশ ঢেকে ফেলে এবং কয়েক সপ্তাহ ধরে অবিরাম মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয় যেন আকাশের দরজাগুলো উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এরূপ প্রবল বৃষ্টিপাত বড় ধরনের বন্যার সৃষ্টি করে যা ব্যাপক এলাকা প্লাবিত করে প্রচুর ক্ষতি সাধন করে। এই আয়াতে নূহ (আ)-এর লোকদের শাস্তিস্বরূপ যে বন্যার সূচনা করা হয়েছিল তার প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে। এই বিষয়টি আয়াত ৭ ঃ ৬৪, ১০ ঃ ৭৩ ও ১১ ঃ ৪০-৪২ এ আলোচিত হয়েছে।

١٩- إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ ۝
٢٠- تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ ۝

৫৪ ঃ ১৯-২০ ওদের উপর আমি নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের দিনে ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করেছিলাম। উন্মূলিত খেজুরের কান্ডের ন্যায় মানুষকে তা উৎখাত করেছিল।

www.bjilibrary.com

আদ জাতির উপর যে শাস্তি নেমে এসেছিল এ দু'টি আয়াতে সে প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে এবং আয়াত নং ১১ ঃ ৬৭তে তার আলোচনা এসেছে।

٣١- إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ۝

৫৪ ঃ ৩১ আমি এক মহানাদ দ্বারা তাদেরকে আঘাত হেনেছিলাম, ফলে, তারা খোয়াড় প্রস্তুতকারীর শুষ্ক শাখা-প্রশাখার ন্যায় বিখণ্ডিত হয়ে গেল।

এ বিষয়টি পূর্বের অনেকগুলো আয়াত যেমন ৭ ঃ ৭২, ২৬ ঃ ১৩৯-এ আলোচিত হয়েছে।

٣٤- إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا
إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ۝

৫৪ ঃ ৩৪ আমি ওদের উপর পাথর বহনকারী প্রচন্ড ঝড় প্রেরণ করেছিলাম, কিন্তু লূত পরিবারের উপর নয়; তাদেরকে আমি রাতের শেষাংশে উদ্ধার করেছিলাম।

লূত (আ)-এর লোকদের যে শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল এখানে তারই প্রসঙ্গটি এসেছে। ৭ ঃ ৮৪ সংখ্যক আয়াতেও এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

٤- عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝

৫৫ ঃ ৪ তিনিই তাকে ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন।

পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র প্রাণী যাকে আল্লাহ তাঁর অসীম অনুগ্রহে কথা বলার সবচেয়ে উন্নত দক্ষতা প্রদান করেছেন। বাকশক্তির এই দান ব্যতীত মানব সভ্যতা সম্ভব ছিল না; সাহিত্য, সঙ্গীত, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, নতুন জিনিসের উদ্ভাবন ও তাদের অগ্রগতি সাধিত হ'ত না; এমন কি সংগঠিত মানব সমাজের অস্তিত্ব থাকত না।

স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের নানা ধরনের বিন্যাসের মাধ্যমে মানব কণ্ঠস্বর ভাবের প্রকাশ ঘটাতে পারে। সঙ্গীতে এ স্বর যেমন ব্যবহৃত হতে পারে তেমনি বাদ্য ও গানের বাণীর সাথে বাকশক্তির সম্মিলন ঘটতে পারে। মানুষ তার কণ্ঠস্বর

www.bjilibrary.com

উন্নয়নের দ্বারা নানান ভাষার ব্যাপক উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। সে তার চিন্তা ও কর্মের সবচেয়ে নিখুঁত বর্ণনা দিতে পারে।

মানুষের দেহ অভ্যন্তরস্থ স্বরতন্ত্রীসমূহ প্রধানত শব্দ সৃষ্টি করে। ফিতার ন্যায় দু'টি ক্ষুদ্র টিস্যু স্বর যন্ত্রের আড়াআড়ি চলে গিয়েছে। একটি ফিতা স্বরযন্ত্রের প্রবেশের প্রত্যেক পাশে প্রসারিত অবস্থায় থাকে। গলার মাংস পেশী প্রসারিত হয়ে স্বরযন্ত্রকে শিথিল করে দেয়।

আমরা যখন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করি তখন স্বরযন্ত্রকে শিথিল করি এবং এটা ইংরেজী 'V' অক্ষরের আকৃতি তৈরি করে। কথা বলার সময় সংলগ্ন মাংসপেশীসমূহ স্বরযন্ত্রকে টেনে ধরে বায়ুনলের প্রবেশ মুখকে সংকুচিত করে। তখন ফুসফুস থেকে বায়ু স্বরযন্ত্রে প্রবেশ করে এবং স্বরযন্ত্রের পাতলা অংশ স্বরতন্ত্রীসমূহ বাতাসে কেঁপে ওঠে। স্বরযন্ত্রের মধ্য দিয়ে বায়ুর অতিক্রমকালে যে কম্পনের সৃষ্টি হয় তার ফলে ধ্বনির সৃষ্টি হয়। ফুসফুস থেকে বায়ু স্বরযন্ত্রের মধ্য দিয়ে যেহেতু অতিক্রম করে তাই বায়ুনলের প্রবেশপথ খোলা-বন্ধ হওয়ার সময় স্বরতন্ত্রীসমূহ দ্রুত স্পন্দিত হয়। এভাবে তৈরি ধ্বনির উচ্চতার মাত্রা স্বরতন্ত্রীসমূহের দৈর্ঘ্য, ঘনত্ব ও কঠিন টানের উপর নির্ভর করে। স্বরতন্ত্রীর যে কঠিন টান ধ্বনির নানাপ্রকার মাত্রা তৈরি করে তা মাংশপেশীর ক্রিয়ার ফলে পরিবর্তিত হয়। একজন ব্যক্তি তার ঠোঁট, জিভ ও মুখের সাহায্যে ধ্বনি পরিবর্তন করে শব্দ তৈরি করে।[১]

স্বরযন্ত্রে ধ্বনি তৈরির ফলে যেখানে স্বরের সৃষ্টি, সেখানে বাকশক্তি হচ্ছে মুখের ও নাকের অনুরণনের সর্বোত্তম অবস্থা।[২] একটি শিশু তার মায়ের নিকট এবং পরিপার্শ্বে অন্যান্যের কাছ থেকে শুনে কথা বলতে শেখে। মানুষের বাকশক্তি তাই জ্ঞান ও সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে বিভিন্ন উন্নয়নের ধারার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. The World Book of Encyclopaedia, Field enterprises educational corporation, London, vol, 12, p. 522, 1966.
2. Encyclopaedia Britannica, vol. 17, Willium Benton, Publisher, p. 477, 1978.

www.bjilibrary.com

٥- اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ○

৫৫ ঃ ৫ সূর্য ও চন্দ্র নির্ধারিত কক্ষপথে আবর্তন করে।

এ বিষয়টি ৭ ঃ ৫৪ ও ৩৬ ঃ ৩৮-৩৯ সংখ্যক আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

٦- وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ○

৫৫ ঃ ৬ তৃণলতা ও বৃক্ষাদি তাঁরই বিধান মেনে চলে।

'নজম' শব্দটির অর্থ আকাশমন্ডলীর কোন গ্রহ, তারকা বা তারকা পুঞ্জ। অন্য অর্থ হচ্ছে তৃণলতা বা কোন ঘাস।[১] যেহেতু এই শব্দটি আশশাজার অর্থাৎ একটি বৃক্ষ-এর সাথে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই এটা ধারণা করা যুক্তিসংগত হবে যে এই নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে নজম শব্দের অর্থ হবে তৃণলতা। একটি তৃণলতা ও একটি উদ্ভিদ উভয়ই যথাক্রমে নরম কান্ড ও কাঠের প্রতীক সদৃশ এবং স্পষ্ট করে বলতে গেলে সমগ্র উদ্ভিদ জগৎ হিসেবে একে ব্যাখ্যা করা যায়। আল্লাহ্ কর্তৃক স্থিরীকৃত বিধানাবলির প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ভক্তি ভরে সিজদাবনত হওয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। উদ্ভিদরাজির মধ্যে এক বিস্ময়কর প্রাণের দৃশ্য দেখা যায় যা অতি সূক্ষ্মভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলে। সংবহন-নালিকা সংবলিত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তাদের শিকড় মাটিতে পুষ্টির উপাদান ও পানির উৎস খুঁজে পাওয়ার জন্য মাটির নিচে প্রবেশ করে। উদ্ভিদের অংকুর-উদগম হলে তা সব সময় উপরের দিকে বেড়ে ওঠে। অর্থাৎ মাটি থেকে উপরের দিকে আলো, অক্সিজেন ও কার্বনডাই অক্সাইড গ্রহণের জন্য বেড়ে উঠতে থাকে। পাতায় থাকে অসংখ্য অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র। এই ছিদ্র ও কচি বোঁটার সমতালে খোলা ও বন্ধ করার চালনা থেকে গ্যাসের প্রবেশ ও নির্গমনকে নিয়ন্ত্রণ করে। উদ্ভিদ খাদ্য তৈরিতে কার্বনডাই অক্সাইড ব্যবহার করে এবং অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। জীবন্ত প্রাণী বা উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য এই উভয় ধরনের গ্যাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আলো, রাসায়নিক দ্রব্য ও শারীরিক আঘাতের প্রতি গাছপালা নানাভাবে ও মাত্রায় সংবেদনশীলতা প্রকাশ করে এবং দক্ষতার সাথে উদ্ভাবিত নানা ধরনের কৌশল প্রয়োগ করে নিজেদের রক্ষা করে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে উদ্ভিদেরও অনুভূতি আছে এবং তাদের বেড়ে ওঠা ও ফলোৎপাদনে সঙ্গীত বা বাদ্যের প্রতি তারা অনুকূল সাড়া দেয়। প্রতিটি প্রজাতির উদ্ভিদে একটি নির্দিষ্ট ঋতুতে ফুল ফোটে এবং যথাসময়ে পরাগায়ন ও গর্ভাধানে কাজ করে। এর ফলে

www.bjilibrary.com

বীজের মধ্যে ভ্রূণের সৃষ্টি হয়। ফুলের বীজ ও ফল নির্দিষ্ট কয়েকটি মাধ্যম যেমন বায়ু, পানি, পাখি ও প্রাণী দ্বারা সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে উদ্ভিদ সঠিক সময়ে যথাযথভাবে মানিয়ে নিতে পারে যখন তার ফল ও বীজ পরিপক্ক হয়ে ওঠে। অনুকূল অবস্থায় বীজের অংকুরোদগম হয়। বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের বীজের ভিন্ন ভিন্ন সুপ্তাবস্থার সময় রয়েছে। প্রতিকূল সময় পার হওয়ার জন্য এই সুপ্তাবস্থা হচ্ছে একটি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা। এ সকল ঘটনা এবং আরও অন্যান্য বিষয় সবই আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারিত বিধানাবলির প্রতি উদ্ভিদ জগতের সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন ও আত্মসমর্পণ। অন্য কথায় উদ্ভিদ জগত আলংকারিক অর্থে ভক্তিভরে আল্লাহ্র প্রতি প্রণত হয়।

তথ্যসূত্র ঃ

1. F. Steingass, Arabic- English Dictionary, Second Cosmo Print, p. 1104, 1982. Cosmo Publications, New Delhi.

www.bjilibrary.com

٧- وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝

٨- اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيزَانِ ۝

৫৫ ঃ ৭-৮ তিনি আকাশ সমুন্নত করেছেন এবং স্থাপন করেছেন মানদন্ড। যাতে তোমরা ভারসাম্য লংঘন না কর।

আকাশকে উচ্চে সমুন্নত রাখার বিষয়টি ৫২ ঃ ৫ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। উপরের দু'টি আয়াতে উল্লেখিত ভারসাম্য শব্দটিকে আমরা যদি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করি এবং যদি প্রকৃতির ভারসাম্য অর্থে ব্যবহার করি তাহলে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ বিষয় বেরিয়ে আসে। এই বিষয়টি প্রকৃতিতে বর্তমান। আসমান-জমিনের সকল বিষয় তৎসহ আকাশের সমুন্নতি সব কিছুই পরম ভারসাম্যময় প্রক্রিয়ায় স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রকৃতির এই ভারসাম্যকে লংঘন না করার জন্য মানব জাতিকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এসব কিছুই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যদি আমরা বর্তমান কালের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় যথা পরিবেশ দূষণ নিয়ে আলোচনা করি। পরিবেশের উপাদানকে প্রধানত দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে ঃ (ক) ভৌত উপাদান, ও (খ) জীবতাত্তিক উপাদান। এখন ভৌত উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ বায়ু নিয়ে আলোচনা করা যায়। আমরা জানি যে নাইট্রোজেন (৭৮%), অক্সিজেন (২১%), কার্বনডাই অক্সাইড .০৩%) ও অন্য কয়েকটি উপাদান নিয়ে বায়ু গঠিত। বায়ুতে এ সকল উপাদানের অনুপাত রক্ষিত হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্ তা'আলা বহুসংখ্যক cycle (আবর্তনশীল পরিবর্তন ধারা) যেমন কার্বন cycle ও নাইট্রোজেন cycle-এর মাধ্যমে প্রকৃতিতে এ সকল উপাদানের অনুপাত সংরক্ষণ করেছেন। এ সকল cycle ব্যতীত জীবনের অবস্থিতি বিপন্ন হয়ে পড়ত। যে পরিবেশে পৃথিবীতে মানুষ বাস করে তা যেন তাদের অপব্যবহারের ফলে মারাত্মকভাবে পরিবর্তিত না হয় সেদিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ উদ্ভিদ জগতসহ সকল জীব অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বনডাই অক্সাইড ত্যাগ করে। তবে উদ্ভিদ দিনের বেলায় সালোক সংশ্লেষ পদ্ধতির মাধ্যমে অক্সিজেন মুক্ত করে। এখন যদি জ্বালানী চাহিদা মিটানর জন্য আমরা বাচবিচার না করে গাছ কেটে ফেলি, এবং যদি অনির্দিষ্ট সংখ্যায় মোটর যান বৃদ্ধি পায় তাহলে কার্বনডাই অক্সাইডের একটি সঞ্চয় গড়ে উঠবে যা পরিবেশকে উত্তপ্ত করে তুলবে। অধিকন্তু আমাদের বর্তমান কালের যান্ত্রিক সভ্যতার মাধ্যমে আমরা প্রতিনিয়ত বায়ুমন্ডলে কার্বনডাই অক্সাইড, মিথেইন, নাইট্রাস অক্সাইড ও সিএফসি (ক্লোরোফ্লুরো কার্বন) নামক বেশ কিছু সংখ্যক ক্ষতিকর গ্যাস নির্গত করে চলেছি। 'গ্রীন হাউস গ্যাস' নামে অভিহিত এ সকল গ্যাস সূর্যরশ্মি যখন ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগস্থ বস্তুসমূহের উপর পড়ে প্রতিসরিত

www.bjilibrary.com

হয় তখন সূর্য রশ্মি বিকিরণের দীর্ঘতর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে আটকে ফেলে। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, দীর্ঘতর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সাথে সংযুক্ত হয়ে বায়ুমন্ডলে তাপ সঞ্চিত হওয়া। এখানে একটি সতর্ক সংকেত রয়েছে যে বায়ুমন্ডলে এরূপ তাপ বৃদ্ধির ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে এবং অনেক নিচু এলাকা প্লাবিত হয়ে পড়বে। সিএফসি বায়ুমন্ডলের ওজোন স্তরের ক্ষতি করবে এবং ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করতে পারবে। যদিও তথাকথিত গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়ার পরিমাণ মাপক কোন মডেল নেই তবুও এই সতর্কবাণী সচেতন মহল কর্তৃক গুরুত্বের সাথে গৃহীত হয়েছে। অবশ্য এই ক্ষতিকর অবস্থার প্রতিবিধানের উপায় হচ্ছে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখা। সকল মানবীয় কর্মকান্ড এমনভাবে পুনর্গঠিত হওয়া দরকার যে বায়ুর পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত উপাদানসমূহের অণুমাত্র যেন পরিবর্তন না করা, কারণ জীবজগতের বাঁচার জন্য বায়ুর অতীব প্রয়োজন। পুনঃ, বায়ুমন্ডলের জীবতাত্ত্বিক উপাদান নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লক্ষ্য করা যায় যে মানুষ ও জীবমন্ডলের অন্যান্যের মধ্যে একটি অর্থবহ মিথস্ক্রিয়া বিদ্যমান। পরিবেশের মধ্যে সেগুলো হচ্ছে এক বিপুলসংখ্যক অতি ক্ষুদ্র জীব। এ সকল অতি ক্ষুদ্র দেহীর (micro- organisms) মধ্যে মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগ (৫%) রোগ সৃষ্টিকারী অর্থাৎ রোগের কারণ ঘটায়। আর অবশিষ্ট সকল অংশ আমাদের খাদ্য, ওষুধ প্রভৃতি তৈরির মত নানা প্রকার উপকারে আসে। এখন পরিবেশের মধ্যে মানুষ যদি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, তাহলে এসব অতি ক্ষুদ্র অণুজীবের কিছু কিছু সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর, এর ফলে আমরা এক অপরিবর্তনীয় ক্ষতির সম্মুখীন হব।* উপরোক্ত দু'টি আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা যে বার্তা প্রেরণ করেছেন তা হচ্ছে আল্লাহ্র সৃষ্টিতে যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য বিদ্যমান রয়েছে তা বুঝতে চেষ্টা করা এবং কোনভাবেই আমাদের তা লংঘন করা উচিত নয়। সুন্দর সমন্বয় রেখে আমাদের বাঁচা প্রয়োজন। তবে প্রকৃতিকে জয় করার নামে কোন ক্ষতিকর পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রকৃতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয় নয়।

১০- وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۝

৫৫ ঃ ১০ সৃষ্ট জীবের জন্য তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন;

পৃথিবীর সম্প্রসারণের বিষয়টি আয়াত ২ ঃ ২২ ও ১৩ ঃ ৩ এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বর্তমান আয়াতে একমাত্র সংযোজন হচ্ছে 'আনাম' শব্দটি যার অর্থ 'সৃষ্ট জীব'। পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতিকে যে অনুগ্রহ দান করেছেন এই শব্দটি তার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

* প্রকৃতির সাথে সমন্বয় ও ভারসাম্যের অসংখ্য উদাহরণের মধ্যে মাত্র দু'টি উদাহরণ উদ্ধৃত করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

١١- فِيهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۝

١٢- وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۝

৫৫ ঃ ১১-১২ এতে রয়েছে ফলমূল এবং খেজুর গাছ যার ফল আবরণযুক্ত, এবং মিষ্ট দানা ও সুগন্ধি গুল্ম।

খেজুর ফলে পরিপূর্ণ ছড়াসহ খেজুর গাছ ও নানা প্রকার ফলের সমাহারে আল্লাহ্ আমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদান করেছেন সে বিষয়টি আয়াত ৬ ঃ ৯৯ এ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

আরবী 'হাব্ব' শব্দটির অর্থ শস্য অর্থাৎ খাদ্য শস্য যা সমগ্র পৃথিবীতে মানব জাতির প্রধান খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই শস্য যখন মানুষকে খাদ্যের যোগান দেয় তখন শস্যের পাতা ও কান্ড গবাদিপশুর চমৎকার খাদ্য হিসেবে কাজে লাগে। যেমন ভুট্টা ও ধান গাছের কান্ড ও পাতা শুকিয়ে খড় তৈরি করা হয় যা গবাদিপশু আহার করে। যদিও খাদ্য শস্যের কান্ড ও পাতা কেবল মাত্র তৃণভোজী প্রাণীর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় তবুও সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অপরিপাকযোগ্য কার্বোহাইড্রেটকে অধিকতর সহজপাচ্যে পরিণত করার সাফল্য অর্জিত হয়েছে যা মানব খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারবে। এভাবে খাদ্যশস্য ও শস্যের পাতা ও কান্ড উভয়ই মানুষ ও গবাদিপশুকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আল্লাহ্র অতি বড় অনুগ্রহ।

অনেক তাফসীরকারক রাইহান (Raihan) শব্দটিকে 'সুগন্ধী- গুল্ম'১ অথবা 'মিষ্টি গন্ধযুক্ত লতাগুল্ম'২ নামে অনুবাদ করেছেন। এই ব্যাখ্যা অনুসারে দেখা যায় যে মানব জাতির জন্য আল্লাহ্র আরেকটি দান হচ্ছে ভেষজ লতা-গুল্ম; ওষুধ ও সুগন্ধি প্রস্তুতকারক শিল্পের উপর যার প্রচন্ড প্রভাব রয়েছে। এক বচনে 'রাইহান' শব্দটির আরেকটি অর্থ হচ্ছে 'পুষ্টিসাধন'।৩ মানুষ ও গবাদিপশুর খাদ্যের প্রেক্ষিতে এই শব্দটির যথার্থ প্রয়োগ হয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. M. Pickthal, The Meaning of the Glorious Quran, Kutub Khana Ishayat-ul-Islam, Delhi, p. 595.
2. A. Yusuf Ali, The Holy Quran-Translation and Commentary, American Trust Publications, USA. p. 1473, 1977.
3. F. Steingass, Arabic-English Dictionary, Kutub Khana Ishayat-ul Islam, Delhi, p. 445, 1980.

www.bjilibrary.com

১৪- خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝

৫৫ ঃ ১৪ তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির মত শুকনো মাটি থেকে।

মানুষ সৃষ্টির বিষয়টি আয়াত ৬ ঃ ২ ও ১৮ ঃ ৩৭ এ আলোচনা করা হয়েছে।

১৭- رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۝

৫৫ ঃ ১৭ তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা।

এ বিষয়টির উপর ৩৭ ঃ ৫ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

১৯- مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ۝
২০- بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ۝

৫৫ ঃ ১৯-২০ তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া যারা পরস্পর মিলিত হয়, কিন্তু ওদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল যা ওরা অতিক্রম করতে পারে না।

আয়াত ২৫ ঃ ৫৩-তে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

২২- يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۝

৫৫ ঃ ২২ উভয় দরিয়া থেকে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল।

আরবী বাক্যাংশ 'মিনহুমা' যার অর্থ 'তাদের মধ্য থেকে,' সুস্পষ্টভাবে দু'ধরনের জলাশয়ের কথা বলা হয়েছে এবং এই সূরার ১৯ ও ২০ নম্বর আয়াতে এর উল্লেখ রয়েছে। পানি হচ্ছে মুক্তা ও প্রবালের উৎপত্তিস্থল এবং তথ্য ও উপাত্ত সহকারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে এই উভয় বস্তুই পানিতে জীবন ধারণকারী অতি ক্ষুদ্র অনুজীব দ্বারা উৎপন্ন হয়। মুক্তা উৎপন্নকারী ঝিনুকের ন্যায় দ্বিপুটক বিশিষ্ট এক ধরনের প্রাণীর শক্ত খোলসের অভ্যন্তরস্থ অংশ 'পার্শ' নামক এক প্রকার পদার্থ দ্বারা তৈরি হয়। এরা Mollusca গোত্রভুক্ত। এদের শক্ত খোলসের অন্তর্গত অংশ শুক্তিপূর্ণ পরত বা স্তর নামে পরিচিত চুনের এক প্রকার স্ফটিকতুল্য

www.bjilibrary.com

কার্বোনেট-এর অসংখ্য পরত দ্বারা গঠিত। এক দানা বালুকণার ন্যায় যদি কোন বহিরাগত বস্তু খোলসের মধ্যকার পরতে স্থান করে নিতে পারে তাহলে এটা উত্তেজক হিসেবে কাজ করবে এবং শুক্তিপূর্ণ পদার্থ নিঃসরণের জন্য উদ্দীপিত করবে। এই অবস্থায় মুক্তা নামে অভিহিত এক ধরনের সুসমঞ্জস, গোলাকার উজ্জ্বল পিন্ড গঠিত হয়। মুক্তা সাধারণত সাদা অথবা নীলাভ ধূসর হয়ে থাকে। মিষ্টি পানির ঝিনুক থেকে সংগৃহীত কোন কোন মুক্তার রং কিছুটা ফ্যাকাশে লাল। রত্ন হিসেবে এগুলো খুবই মূল্যবান এবং এমন মুক্তা দিয়ে নানা প্রকার আকর্ষণীয় অলংকার তৈরি হয় যা ধনবান মহিলারা ব্যবহার করেন। Pinctada (Maleagrina) নামে প্রকৃত মুক্তা উৎপন্নকারী ঝিনুক লোহিত সাগর থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে।[১] লবণ পানিতে উৎপন্নকৃত সবচেয়ে সুন্দর মুক্তা পাওয়া যায় পারস্য উপসাগরে। বহু বছর ধরে খাঁচার মধ্যে কৃত্রিমভাবে মুক্তা উৎপাদিত হয়ে আসছে। সেক্ষেত্রে ঝিনুকের শুক্তিপূর্ণ পরতে ক্ষুদ্র বালুর কণা প্রবেশ করিয়ে দিতে হয়।

প্রবাল Coelenterata গোত্রভুক্ত একটি ক্ষুদ্র সামুদ্রিক প্রাণী। একটি চুনযুক্ত পেয়ালা আকৃতির বস্তুতে এটা স্থায়ীভাবে লেগে থাকে। প্রবাল কীট দলে দলে বাস করে এবং একে একে অপরের সাথে লেগে থাকে বলে পাথরের মত শক্ত আবরণ গড়ে তোলে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিভিন্ন প্রজাতির প্রবাল কীটের উপনিবেশসমূহ একত্রিত হয়ে সমুদ্রের মধ্যে চুনযুক্ত ridge (দু'টি ঢলের মিলিত প্রান্তরেখা) তৈরি করে। এদের গভীরতা অনেক বেশী হয় এবং এদেরকে প্রবাল প্রাচীর বলা হয়। লাল প্রবাল নামে পরিচিত Corallium গোত্রভুক্ত প্রবাল খুবই আকর্ষণীয় এবং অলংকারাদিতে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া দলে দলে বাস করা পাথরবৎ প্রবালের নানা প্রকার আকৃতি ও নকশা রয়েছে এবং এগুলো সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী বস্তু হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

তথ্যসূত্র ঃ

1. T. T. Storer, R. L. Winger, R. C. Stebbins and J. w. Nybakken, General Zoology, 5th ed. Tata Mcgraw Publishing Company Ltd. New Delhi, P. 500, 1975 (reprint 1978).

www.bjilibrary.com

٢٤- وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ

৫৫ ঃ ২৪ সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বত প্রমাণ অর্ণবপোতসমূহ তারই নিয়ন্ত্রণাধীন।

এ সম্পর্কে ২ ঃ ১৬৪নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে অতি বৃহৎ জাহাজসমূহের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব সমুদ্রগামী জাহাজ গভীর সমুদ্রে উঁচু উঁচু ঢেউ-এর মধ্য দিয়ে চলাচল করে।

٣٣- يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا ۚ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۝

৫৫ ঃ ৩৩ হে জিন ও মানুষেরা! আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা তা শক্তি ব্যতিরেকে পারবে না।

১৯৬৯ সালে মানুষ যখন প্রথম চাঁদে অবতরণ করে তখন যাদের কোন বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা নেই তারা এই আয়াতটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে চাঁদে অবতরণ প্রচেষ্টার সাফল্য নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে। এই প্রেক্ষাপটে এই আয়াতটির ভাষ্য বেশ চমকপ্রদ। বস্তুত এই সকল লোকের যদি গভীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকত তাহলে এই আয়াতে উল্লেখিত শক্তি বা ক্ষমতা বলতে তারা জ্ঞানের ক্ষমতাকে বুঝত। মহাশূন্যে উপগ্রহ প্রেরণের প্রচেষ্টা সম্ভব হত না যদি মানুষের কারিগরী প্রযুক্তি জানা না থাকত যে কীভাবে মাত্রা (প্রতি সেকেন্ডে ৭ মাইল) এড়ানর শক্তি অর্জন করতে এবং অভিকর্ষ শক্তি জয় করে এগিয়ে যেতে পারে। মহাশূন্য আবিষ্কারের ইতিহাস প্রমাণ করে যে আমেরিকার রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের উড়ন্ত যান আবিষ্কারের পূর্বে শুরুতেই এটা অকল্পনীয় ছিল যে মানুষ অভিকর্ষ শক্তিকে জয় করে মহাশূন্যে অভিযান চালাবে। কিন্তু বলবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার জ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় এবং বিগত শতাব্দীর মাত্র এক চতুর্থাংশ সময়ের মধ্যে মানুষ কারিগরী জ্ঞানের ক্ষেত্রে এতই অগ্রসর হয় যে মনুষ্যবাহী অথবা মনুষ্যহীন যান মহাকাশে প্রেরণ করতে সক্ষম হয়। এই মহাকাশ যান পৃথিবী ও আকাশমন্ডলীর প্রভাবাধীন অঞ্চল পার হয়ে যেতে সমর্থ হয়। স্পষ্টতই আল্লাহ্ ঐ সকল মানুষকে এই শক্তি (অর্থাৎ জ্ঞান ও দক্ষতা) দান করেছেন যারা তা অর্জন করার জন্য স্থির সংকল্প হয়। এই শক্তি ব্যতীত পৃথিবীর অভিকর্ষ শক্তি অতিক্রম করে মহাশূন্যে ভ্রমণ করা আদৌ সম্ভব হত না।

www.bjilibrary.com

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۝

৫৫ ঃ ৩৭ যে দিন আকাশ বিদীর্ণ হবে সেদিন তা রক্তরঙে রঞ্জিত চামড়ার রূপ ধারণ করবে।

আয়াত নং ২৫ ঃ ২৫ এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

٦٨- فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ۝

৫৫ ঃ ৬৮ সেখানে রয়েছে ফলমূল– খেজুর ও আনার,

এই আয়াতটি প্রতীকীমূলক প্রসঙ্গের অংশ হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে যেখানে বেহেশতের পর সুখের মধ্যে আল্লাহ্‌র বহুসংখ্যক অনুগ্রহের কথা ব্যক্ত হয়েছে। আমাদের পুষ্টিসাধনের জন্য ফল-ফলাদির দান রয়েছে তা ২ ঃ ২২ নং আয়তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। খেজুর ও আনার আল্লাহ্‌র দান, এটা আয়াত ৬ ঃ ৯৯ ও ১৬ ঃ ৬৭ তে আলোচিত হয়েছে।

٤- إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ۝

٥- وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝

٦- فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا ۝

৫৬ ঃ ৪-৬ যখন পৃথিবী প্রবল কম্পনে কম্পিত হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে, ফলে তা উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পর্যবসিত হবে।

ভূপৃষ্ঠের নিচে একটি নির্দিষ্ট গভীরতায় রয়েছে কঠিন ভূত্বক। ভূত্বকের নিচে প্রায় ১০০ কিঃ মিঃ পুরু একটি শীতল কঠিন পদার্থের স্তর রয়েছে, একে লিথোস্ফেয়ার বা কঠিন শিলাত্বক নাম অভিহিত করা হয়। আমাদের পৃথিবী নামে এই গ্রহের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে কঠিন শিলাত্বক (লিথোস্ফেয়ার)সহ এর ভূপৃষ্ঠ বেশ কিছু সংখ্যক শক্ত শিলাত্বকের প্লেইট (Plate)-এর মধ্যে খন্ড খন্ড অবস্থায় রয়েছে। কঠিন শিলাত্বকের নিচে ১০০ কিঃ মিঃ থেকে ২৫০ কিঃ মিঃ পুরু আরেকটি অঞ্চল রয়েছে। সেখানে অবস্থিত তরল পদার্থ উষ্ণ এবং তুলনামূলকভাবে নমনীয়, পুরু পুডিং (porridge)-এর ন্যায় আংশিকভাবে গলিত। এই স্তরকে aesthenosphere বলে। লিথোস্ফেয়ারের প্লেইটসমূহ তাপ সঞ্চালন গতি দ্বারা aesthenosphere-এ তাড়িত হয়।

www.bjilibrary.com

এখন হতে প্রায় ৭০০ কোটি বছরের মধ্যে সূর্য যখন একটি রক্তিম বর্ণের দৈত্য বিশেষ হবে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহসমূহ বুধ, শুক্র প্রভৃতিকে গ্রাস করবে এবং তারপর পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছে যাবে তখন ভূঅভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থের তাপমাত্রা অনেক বেশী বৃদ্ধি পাবে এবং aesthenosphere-এর গতি খুব দ্রুত ও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। এর ফলে lithospheric প্লেইট সমূহের একে অপরের মধ্যে দ্রুত ও প্রচন্ডভাবে সংঘর্ষের সৃষ্টি হবে। ফলস্বরূপ পৃথিবীতে প্রচন্ডভাবে এবং প্রায় অবিরাম কম্পনের সৃষ্টি হবে। সূর্যের ভীষণ উঁচু মাত্রার তাপ ভূপৃষ্টের পর্বতাদিসহ সব কিছুকেই পুড়িয়ে দেবে এবং ধূলায় পরিণত করবে। এই তাপমাত্রায় সমুদ্রের পানি টগবগ করে ফুটতে থাকবে।

৫৭- نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ○

৫৮- اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ○

৫৯- ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ○

৬০- نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ○

৫৬ ঃ ৫৭-৬০ আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাহলে তোমরা এই সত্যতা কেন স্বীকার করবে না ?

তোমরা যে শুক্র নিক্ষেপ করো, সে সম্পর্কে কি ভেবে দেখেছো ? তোমরা কি তা সৃষ্টি কর, না আমরা উহার সৃষ্টিকর্তা ? আমরাই তোমাদের মধ্যে মৃত্যুকে বন্টন ও নির্ধারণ করি, আর আমরা মোটেই অক্ষম নই।

আল্লাহ্ যে মানুষের সৃষ্টিকর্তা এ কথা সকল ধর্মেই স্বীকৃত। আজ এ কথা বৈজ্ঞানিকভবে প্রমাণিত যে পুরুষের বীর্য ও নারীর ডিম্বের মিলনেই শিশুর জন্ম সম্ভব। এখানে আল্লাহ্ নাস্তিকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন যে, মানুষের প্রক্ষিপ্ত বীর্য তার নিজের ক্ষমতায় সৃষ্ট নয় বরং এটা স্বয়ং আল্লাহ্র বিশেষ সৃষ্টি। কত মানুষের বীর্যে শুক্র কীট নেই এবং এ ব্যাপারে কারো কিছু করার নেই। আর এ কথাও অকাট্য সত্য যে, মানুষ বিজ্ঞানাগারে কোন জীবকোষ সৃষ্টি করতে সক্ষম নয়। সুতরাং শুক্রকীট তৈরি করার প্রশ্নই উঠে না।

যদিও অণ্ডকোষে শুক্রকীট তৈরি হয় এবং পথে কোন বাধার জন্য শুক্র আসতে অক্ষম হয় তবে কোন কোন ক্ষেত্রে চিকিৎসার সাহায্যে বাধা দূর করা যায়। কিন্তু শুক্রকীট তৈরি করার প্রশ্নই উঠে না।

www.bjilibrary.com

এখানে আর একটি অকাট্য সত্য বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর মালিকও স্বয়ং আল্লাহ্ই, অন্য কেউ নয়।

٦٨- أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ۝
٦٩- ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ۝
٧٠- لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَٰهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ۝

৫৬ ঃ ৬৮-৭০ তোমরা যে পানি পান কর সে সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করেছ? তোমরাই কি তা মেঘ হ'তে নামিয়ে আন, না আমি তা বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?

মেঘ থেকে সৃষ্ট বৃষ্টি পানির মূল উৎস হিসেবে কাজ করে। যে পানি আমরা পান করি এবং যা মৃত ভূমিকে সজীব করে সবই বৃষ্টি থেকে আসে। আকাশে মেঘের সৃষ্টি এবং সেখান থেকে বৃষ্টির বর্ষণ– এ সবই আয়াত ২ ঃ ১৬৪ ও ১৫ ঃ ২২-এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

উপরে ৭০নং আয়াতে ব্যবহৃত উযাযা শব্দের অর্থ তিক্ত এবং ব্যাপক অর্থে বিস্বাদ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। জল বিভাজিকার নিকটবর্তী পার্বত্য স্রোতস্বিনীর পানি পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ। কিন্তু ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে গেলে মানুষের কর্মকান্ডজনিত বর্জ্য নদীতে ফেলার জন্য এই বিশুদ্ধ পানি দূষিত হয়ে পড়ে। সাধারণত শিল্প-কলকারখানার বর্জ্য, কীটপতঙ্গ বিনাশকারী ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ অথবা নগরীর পয়ঃবর্জ্য পানির সাথে মিশে পানিকে দূষিত করে। দুর্ঘটনাবশত পারমাণবিক বর্জ্য, প্রাকৃতিক কারণ যেমন পলি মিশ্রিত হয়ে পানি পানের অযোগ্য হয়ে পড়ে এবং তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়। যে ঝর্ণার পানি এক সময় পরিষ্কার ও ঝকঝকে ছিল। তা খনি থেকে কয়লা আহরণের কোন বিশেষ পদ্ধতির কারণে নষ্ট হয়ে পড়ে। বৃষ্টির পানির দূষণ ঘটলে কোন নির্দিষ্ট অবস্থার প্রেক্ষাপটে এ্যাসিড (অম্ল) বৃষ্টির কারণ হতে পারে। জীবাশ্ম জ্বালানীর দহন, সালফাইড আকরিকে দ্রবণ বিপুল পরিমাণে সালফার অক্সাইড ও নাইট্রোজেন অক্সাইড গ্যাস নিঃসরণ করে। বায়ু মন্ডলে বৃষ্টির পানির সাথে এই গ্যাস মিশে গিয়ে অতি উঁচু মাত্রায় অম্ল সৃষ্টি করে। অম্লের এই মাত্রার পিএইচ (PH) মান ৫.৬ এর কম। উদ্ভিদ ও মাছের উপর এ্যাসিডের এই ক্ষতিকর ফলাফল ছাড়াও এ্যাসিড বৃষ্টি জলজ পরিবেশে প্রবলভাবে কার্যকর বিষাক্ত ধাতুর দ্রবণীয়তার উপর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে মানব স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক হয়ে

www.bjilibrary.com

দেখা দিতে পারে।[১] একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সীমাহীন করুণার মাধ্যমে আমাদের জন্য বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বিশুদ্ধ পানি বৃষ্টির আকারে আমাদের উপর নেমে আসে। যদি তিনি ইচ্ছা করতেন তাহলে এই বিশুদ্ধ পানি পানের অযোগ্য হয়ে যেত। তাহলে কী আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ নয়?

তথ্যসূত্র :

1. P. Raven and F. Evert, Biology of Plants, 3rd. edn. Worth Publishers Inc. New York, p. 556.

www.bjilibrary.com

٧١- أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى تُورُونَ ۝

٧٢- ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِـُٔونَ ۝

৫৬ ঃ ৭১-৭২ তোমরা যে আগুন জ্বালাও তা লক্ষ্য করে দেখেছ কী? তোমরাই কী তার বৃক্ষ সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?

অক্সিজেন ও তৎসহ অন্যান্য পদার্থের দ্রুত সংযুক্ত হওয়ার ফলে আগুনের সৃষ্টি হয় যা থেকে তাপ উৎপন্ন হয়। আগুনের সৃষ্টি হলে শিখা নামে পরিচিত ভাস্বর গ্যাস দেখতে পাওয়া যায় যা দ্যুতি সরবরাহ করে। আগুন হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে প্রাচীন ও মৌলিক অস্ত্রসমূহের অন্যতম এবং সম্ভবত সভ্যতার পথে অগ্রযাত্রায় সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করে। কৃত্রিম আলো ও তাপ ব্যতীত মানুষ সম্ভবত পশুর জগতে প্রত্যাবর্তন করত। বন্য পশু ও মানুষের শত্রুদের আক্রমণ থেকে আগুন আদিম মানুষকে রক্ষা করত। খাদ্য সামগ্রীকে তাপ প্রয়োগ করা হলে রাসায়নিক পরিবর্তন সূচিত হয় এবং তা পরিপাকে সাহায্য করে, রুচিকর গন্ধ তৈরি হয়, অতি ক্ষুদ্র অণুজীব ধ্বংস করে এবং উদ্বায়ী বিষাক্ত উপাদানকে পরিত্যাগ করে।

চকমকি পাথর আবিষ্কারের পূর্বে প্রাচীন প্রক্রিয়ায় আগুন তৈরি করা হত। দু'টি কাঠের টুকরো নিয়ে পরস্পর ঘর্ষণ করা হ'ত, এর মধ্যে একটি টুকরো লাঠির আকারের এবং অপরটি বড় যার মধ্যে একটি গর্ত থাকে। এই গর্তের মধ্যে লাঠির আকারের টুকরোটি ঢুকিয়ে ক্রমাগত পাক খাওয়ান হ'ত। এই ঘর্ষণের ফলে সৃষ্ট আগুনের ফুলকি থেকে আগুন জ্বালানর ব্যবস্থা করা হ'ত। দু'টি কাঠের টুকরো ঘর্ষণের দ্বারা আগুন তৈরির দৃশ্য আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে পৃথিবীতে প্রায় সকল শক্তির শেষ উৎস হচ্ছে সূর্য। সবুজ উদ্ভিদাদিতে সালোক সংশ্লেষের মাধ্যমে সূর্য থেকে যে শক্তি আহরিত হয় তা রাসায়নিক শক্তির আকারে পুঞ্জীভূত থাকে। এই রাসায়নিক শক্তিতে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অণু একত্রিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। এই কার্যকর শক্তি কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও কয়লা থেকে সৃষ্ট গ্যাসে যাদেরকে একত্রে জীবাশ্ম জ্বালানী বলা হয়, তা আটক অবস্থায় থাকে। এই জীবাশ্ম জ্বালানীর উৎস হচ্ছে ভূ-অভ্যন্তরে সবুজ বৃক্ষাদির জীবাশ্মকৃত দেহাবশেষ। এই জীবাশ্ম জ্বালানীতে প্রজ্জ্বলনের সৃষ্টি হলে বোতলাবৃত শক্তি প্রচন্ড আকারে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এই আয়াতে 'অগ্নি প্রজ্জ্বলনে বৃক্ষের ব্যবহার' বাক্যাংশের সংশ্লিষ্টতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। এই বাক্যাংশের সাধারণ অর্থ হতে পারে আগুন জ্বালানর কাঠ যা জ্বালানী হিসেবে গাছ থেকে আহরণ করা হয়।

গাছ থেকে আগুনের সৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়ের আরও বিস্তারিত বিবরণ আয়াত ৩৬ ঃ ৮০তে আলোচনা করা হয়েছে।

٧٥- فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُومِ ۝

৫৬ ঃ ৭৫ আমি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের শপথ করছি,

এই বিষয়টি ৫৩ ঃ ১ নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

٨٠- تَنْزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৫৬ ঃ ৮০ এটা রাব্বুল আলামীন কর্তৃক নাযিল করা (অবতীর্ণ)।

আল্লাহ্ যে সকল জগতের প্রভু এ বিষয়ে ১ ঃ ২ আয়াতের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

٢- لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৫৭ ঃ ২ পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর একমাত্র মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব কেবল তাঁরই (আল্লাহ্‌র), তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন এবং সব কিছুর উপরই তিনি শক্তিমান।

আল্লাহ্ যে আসমান যমিনের মালিক এ বিষয়ে এবং আল্লাহ্ই যে জীবন ও মৃত্যু দানকারী, এ কথা ৫ ঃ ১৯ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

٤- هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ
يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۚ
وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

৫৭ ঃ ৪ তিনিই ছয় দিনে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর 'আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা থেকে বের হয় এবং আকাশ থেকে যা কিছু নামে ও আকাশে যা কিছু ওঠে। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সাথে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তা দেখেন।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ্ তা'আলা যে ছয় দিনে অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তা ৭ ঃ ৫৪নং আয়াতে আলোচিত হয়েছে। যে সকল বস্তু ভূমিতে প্রবেশ করে এবং ভূমি থেকে যা উদগত হয়, আকাশ থেকে যা নেমে আসে এবং আকাশে যা উঠে যায়– এ সবই আয়াত ৩৪ ঃ ২ এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৫- لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

৫৭ ঃ ৫ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই, এবং আল্লাহ্‌রই দিকে সব কিছু প্রত্যাবর্তিত হবে।

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর উপর একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই সার্বভৌমত্ব বর্তমান। আয়াত ৫ ঃ ১৯ এ বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

৬- يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ
فِى الَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيْمٌ ۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

৫৭ ঃ ৬ তিনিই রাতকে প্রবেশ করান দিনের অভ্যন্তরে এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতে, এবং তিনি অন্তর্যামী।

কীভাবে রাত দিনের মধ্যে এবং দিন রাতের মধ্যে প্রবেশ করে তা আয়াত ৩ ঃ ২৭ এ আলোচিত হয়েছে।

১৭- اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝

৫৭ ঃ ১৭ জেনে রাখ, আল্লাহ্‌ই পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। আমি নিদর্শনগুলো তোমাদের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার।

মৃত্যুর পর পৃথিবীর পুনর্জীবন লাভ আয়াত ২ ঃ ১৬৪তে আলোচনা করা হয়েছে।

..... كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا
ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ۗ .....

www.bjilibrary.com

৫৭ ঃ ২০ .... তার উপমা বৃষ্টি, যার দ্বারা উৎপন্ন শস্য সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়-কুটায় পরিণত হয়।........

বৃষ্টির ফলে গাছপালার সৃষ্টি সম্পর্কে ২ ঃ ১৬৪নং আয়াতে আলোচিত হয়েছে। পরিপূর্ণভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উদ্ভিদাদি তা সে খাদ্যশস্য হোক কিংবা ফলের বাগান হোক, দেখতে সবুজ রং-এর এবং পাতায় ক্লোরোফিলের উপস্থিতির কারণে সবুজ দেখা যায়। সবুজ রং মানুষের চোখের জন্য আরামদায়ক। সবুজ গাছপালাসহ যদি প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি জন্মে তাহলে কৃষকদের জন্য তা সবচেয়ে বেশী আনন্দের হয়, যে কৃষকেরা ক্ষেতে শস্য ফলানর জন্য কঠোর কায়িক পরিশ্রম করে, জমি চাষ করে এবং ফসলের যত্ন নেয়। ক্ষেত থেকে শস্য আহরণের পর সার্বিকভাবে জন্মান খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে, এর গাছের কান্ড ও পাতা ক্ষেতে পড়ে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে পানি শূন্য হয়ে এর জীবন্ত কোষসমূহ ও ক্লোরোফিল নষ্ট হয়ে যায়। এরফলে এ সকল গাছ হলুদ বর্ণ ধারণ করে শুকিয়ে যায় এবং টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ে।

এখানে উল্লেখ করা বেশ চমকপ্রদ হবে যে পৃথিবীতে জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপনের অসারতার উপর জোর দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যে উপমার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তার যথেষ্ট বিজ্ঞানভিত্তিক গুরুত্ব রয়েছে।

٢٥- لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ
إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

৫৭ ঃ ২৫ নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে স্পষ্ট প্রমাণসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে কিতাব ও ন্যায়-নীতি দিয়েছি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি লোহাও দিয়েছি যাতে রয়েছে প্রচন্ড শক্তি ও মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ; তা এজন্য যে আল্লাহ্ প্রকাশ করে দেবেন কে প্রত্যক্ষ না করেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ শক্তিমান ও পরাক্রমশালী।

www.bjilibrary.com

৩৪ ঃ ১০ ও ৩৪ ঃ ১১ সংখ্যক আয়াত দু'টিতে ঢালাই লোহা ও ইস্পাতের শক্তির প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইস্পাত হচ্ছে লোহার একটি বিশোধিত সংকর ধাতু। এতে কার্বন ও অন্যান্য উপাদান রয়েছে এবং তরল অবস্থায় এটা তৈরি হয়। এটা বেশ কৌতুহলের ব্যাপার যে প্রতি নিউক্লিওন (nucleon)-এ আটকে থাকা শক্তি অর্থাৎ নিউক্লিয়াস থেকে একটি নিউক্লিওন পৃথক করে অসীমতার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তা সকল উপাদানের মধ্যে লোহাতে সবচেয়ে বেশী। এতে লোহার অসাধারণ স্থিতিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাই এই নিখিল বিশ্বে লোহার প্রভাবশালিতা পরিলক্ষিত হয়।

শিল্প, পরিবহন, কৃষি ও যুদ্ধ বিগ্রহের ক্ষেত্রে ইস্পাত ও ঢালাই লোহার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও নানাবিধ ব্যবহার রয়েছে। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের দৈনিক ১৫.২০ মি.গ্রা. লৌহের প্রয়োজন। ফল-ফলাদি ও শাকশব্জি গ্রহণের মাধ্যমে এই পরিমাণ লৌহ গ্রহণ করা হয়। এসবের মধ্যে লোহার যৌগিক মিশ্রণ রয়েছে। হেমোগ্লোবিনে প্রায় ৯২.৯% লোহা রয়েছে যা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অক্সিজেন বহন করে নিয়ে যায় এবং রক্তের লোহিত কণিকা তৈরিতে সাহায্য করে। এ ছাড়া শরীরের বিভিন্ন অংশে রাসায়নিক বিক্রিয়াতে কাজ করে।

٢- الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا

اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ

غَفُورٌ ○

৫৮ ঃ ২ তোমাদের মধ্যে যে সব লোক নিজেদের স্ত্রীদের সহিত 'যিহার' (মায়ের মত বলে পরিহার করে) করে (জেনে রাখ) তারা তাদের মা নয়। মা তো একমাত্র সেই, যে তাদেরকে জন্ম দিয়েছে। এই লোকেরা অতীব ঘৃণ্য ও সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে। আর আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও মার্জনাকারী।

এই আয়াতের ভিত্তিতে উল্লেখ করা যায় যে জন্ম দান করে কেবল সেই মা, অন্য কেউ নয়।

বর্তমানে জীব বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে টেস্ট-টিউব শিশুর জন্ম সম্ভব হয়েছে। এ পদ্ধতিতে যদি কোন মহিলা সন্তান উৎপাদনে সক্ষম না হয় জরায়ু বা অন্য কোন দোষের ফলে, তাহলে তার পরিপক্ক ও পরিস্ফুট ডিম্ব আর তার স্বামীর শুক্রকীট একত্র করে বিজ্ঞানাগারে টেস্ট টিউবে মিলিত করে সেটা জরায়ুতে

www.bjilibrary.com

প্রবেশ করিয়ে সন্তান উৎপাদন সম্ভব। এই ধরনের দ্বিতীয় গর্ভধারণকারী মহিলাকে 'বিকল্প মা' বলা হয়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই বিকল্প মা প্রকৃত মা হবে কী-না ?

এখানে কয়েকটি জটিল প্রশ্ন রয়েছে। এখানে এক মা কেবল তার ডিম্ব দান করেছে, আর মায়ের বিবাহিতা স্বামী তার বীর্য দান করেছে। সুতরাং বিকল্প মা শুধু গর্ভ ধারণ করার কষ্ট স্বীকার করেছে। বিকল্প মা শিশুকে দুধ পান করিয়ে আদর করে লালন-পালন করে থাকে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে অন্য পুরুষের বীর্য গর্ভে ধারণ করা যিনার সমতুল্য। এ বিষয়ে ফকীহদের পরামর্শ প্রয়োজন। তবে এভাবে সন্তান উৎপাদনের কোন প্রয়োজন নেই। গর্ভধারণের কষ্ট না করায় প্রথম মা বা ডিম্বদানকারী মা সন্তানকে গর্ভজাত সন্তানের মত ভালবাসতে পারে না। তার আদর-যত্ন পালক সন্তানের মত হবে মাত্র।

৩- خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ○

৬৪ ঃ ৩ তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সঠিক পরিমাপে ও সত্যতার ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন আর তোমাদেরকে আকৃতি দিয়েছেন এবং তোমাদের আকৃতিকে সুন্দর করেছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে (তিনিই তোমাদের শেষ গন্তব্যস্থল)।

আল্লাহ্ যে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এ বিষয়টি ৬ ঃ ৭৩ আয়াতে আলোচিত হয়েছে। এখানে মানুষের আকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই আকৃতিতে একটি সৌন্দর্য ছাড়াও কার্যকরী এবং কল্যাণময়ী পরিমাপ রয়েছে। এর সঙ্গে বিবেচ্য শরীরের বিভিন্ন অংশের সমন্বয় ও সম্মিলিত সৌন্দর্য। এ বিষয়টি ১৩ ঃ ৮ আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ۚ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ○

৬৫ ঃ ৩ আর তাকে এমন উপায়ে রিযিক দেবেন যার সম্পর্কে তার কোন ধারণা হবে না। যে আল্লাহ্র উপর ভরসা করবে তার জন্য

www.bjilibrary.com

তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তো নিজের কাজ সম্পূর্ণ করবেনই। আল্লাহ্ প্রত্যেকটি জিনিষের জন্য একটি তকদীর নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

এই আয়াতে এ কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, মানুষের রিযিক এমন পদ্ধতিতে যোগাড় হতে পারে যা সে কখনও কল্পনাও করে নাই। আমরা যদি মানুষের খাদ্য বস্তুর ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করি তবে দেখতে পাই যে, মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান লব্ধ পদ্ধতির সাহায্যে বহু নতুন নতুন ধরনের খাদ্য সামগ্রী ও প্রয়োজনীয় নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের তালিকা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বহু নতুন ধরনের খাদ্য ও পোশাক আবিষ্কৃত হয়েছে, যেমন ঃ সামুদ্রিক শৈবাল, গাছপালা এবং পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থ। অর্ধ শতাব্দীর পূর্বের কেউ এসব কল্পনাও করতে পারে নি। এসব নতুন নতুন আবিষ্কার আল কুরআনের ৩ ঃ ১৯১ আয়াতের বাস্তব প্রমাণ যেখানে বলা হয়েছে, "হে আমার প্রভু, এই সব কিছু তুমি অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি করনি।"

যদি আমরা আল্লাহ্কে একমাত্র রিযিকদাতা বলে স্বীকার করি এবং আল্লাহ্র সৃষ্ট বস্তুসমূহ নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা চালিয়ে যাই তা হলে আশা করা যায় যে, আমরা আরো অনেক নতুন নতুন খাদ্য ও নিত্য ব্যবহার্য বস্তু আবিষ্কার করতে সক্ষম হবো।

প্রত্যেকটি বস্তুর সৃষ্টিতে নির্দিষ্ট তকদীর বা সাম্য রয়েছে তা ২৫ ঃ ২ আয়াতের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

৪- وَالّٰٓـِٔىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ
وَّالّٰٓـِٔىْ لَمْ يَحِضْنَ ۗ وَاُولٰتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ
وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ○

৬৫ ঃ ৪ আর তোমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে যারা তাদের হায়েজ সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছে (অর্থাৎ ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে), তাদের ইদ্দতের ব্যাপারে তোমাদের মনে যদি কোন সন্দেহ্ থাকে তবে জেনে রাখ, তাদের ইদ্দত তিন মাস, আর এই হুকুম তাদের জন্য ও যাদের এখনও হায়েজ শুরু হয় নাই। গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের ইদ্দতের সীমা হলো তাদের সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। যে আল্লাহ্কে ভয় করে তার জন্য তিনি তার ব্যাপারে সহজ ও সুবিধাজনক ব্যবস্থা করে দেন।

২ ঃ ২২৮ আয়াতে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের পুনর্বিবাহের জন্য ইদ্দত পালনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সমস্যা হতে পারে যাদের ঋতু শুরু হয়নি, অথবা ঋতুকাল বন্ধ হওয়ার নিকটবর্তী হলে বা ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে তাদের ব্যাপারে। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য ইদ্দত তিন মাস সময় নির্ধারিত করে দিয়েছেন। পুনঃ বিবাহের পূর্বে এই সময়কাল বাধ্যতামূলকভাবে অপেক্ষা করার প্রয়োজন হলো তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সম্ভাব্য গর্ভধারণ যা তালাকের সময় প্রকাশ নাও পেতে পারে। তিন ঋতুকাল অপেক্ষা করার যৌক্তিকতা নিয়ে ২ ঃ ২২৮ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

হায়েজ শুরু না হলে, ঋতু বন্ধের পূর্বে অনিয়মিত হায়েজ হলে বা হায়েজ বন্ধ হয়ে গেলে তিন মাস অপেক্ষা করলে গর্ভধারণের বিষয়টি ধরা যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর গর্ভধারণ করলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। গর্ভধারণের পরও অস্বাভাবিক ও অনিয়মিত রক্তপাত হলেও তিন মাস অপেক্ষা করলে গর্ভ হয়েছে কিনা তা সহজেই জানা যাবে। সুতরাং এই আয়াতে তালাকের পর স্বামীর ঔরসজাত সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা দূর করার জন্য তিন হায়েজ অথবা তিন মাস অপেক্ষা করা খুবই যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞান ভিত্তিক।

..... سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ
فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ۝

৬৫ ঃ ৬ (তালাক দিলে) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে সেই স্থানে থাকতে দাও যেখানে তোমরা বসবাস করো, তা যে রকম স্থানই তোমাদের থাকনা কেন এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে জ্বালা-যন্ত্রণা দিও না। আর তারা যদি গর্ভবতী হয় তা হলে তাদের ব্যয়ভার বহন করো ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না তাদের প্রসব হয়। পরে সে যদি তোমাদের সন্তানকে স্তন্য দুধ পান করায় তবে তার পারিশ্রমিক তাকে দাও এবং এ বিষয়টি পারস্পরিক কথাবার্তার মাধ্যমে মীমাংসা করে নাও। কিন্তু তোমরা যদি একে অন্যকে অসুবিধায় ফেলতে চাও, তা হলে বাচ্চাকে অপর কোন স্ত্রীলোক স্তন্য পান করাবে।

www.bjilibrary.com

এখানে আল্লাহ্ নবজাত শিশুকে মায়ের দুধ পান করানোর উপর বিশেষ তাগিদ দিচ্ছেন। যদি বেমিল হবার ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদও হয় তা হলে মা তার সন্তানকে বুকের দুধ পান করিয়ে সে জন্য প্রাক্তন স্বামীর নিকট থেকে পারিশ্রমিক আদায় করতে পারবে। যদি ঝগড়ার ফলে মার পক্ষে দুধ পান করানো সম্ভব না হয় তাহলে দুধ মায়ের দুধ পান করাতে হবে। এতে বাচ্চাকে যেমন করেই হউক স্তনের দুধ খাওয়াতে হবে এটাই আল্লাহ্র নির্দেশ। দুধ মা হলেও দুধ স্তনের দুধই। বর্তমানে ডাক্তারী বিজ্ঞান এতদিনে আবিষ্কার করেছে যে শিশুর জন্য মাতৃদুগ্ধ অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই বৈজ্ঞানিক বিষয়টি পাক-কুরআনে প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বেই ঘোষণা করা হয়েছে। এ বিষয় ২ ঃ ২৩৩ আয়াতের আলোচনায় এসেছে।

١١- اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ
لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا ۝

৬৫ ঃ ১২ আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং পৃথিবীও, ওদের অনুরূপভাবে ওদের মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ; ফলে, তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ্ সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

সপ্ত আকাশ সৃষ্টির বিষয়টি ২ ঃ ২৯ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলোচিত হয়েছে। পৃথিবী প্রধানত তিনটি স্তরে বিভক্ত ঃ ভূত্বক, আবরণ ও কেন্দ্রস্থল। বায়ুমণ্ডল নামে একটি গ্যাসীয় ঢাকনা পৃথিবীর সাথে মাধ্যাকর্ষণীয়ভাবে সংযুক্ত এবং এটি পৃথিবীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। আবরণ আবার তিনটি উপস্তরে বিভক্ত ঃ লিথোস্ফেয়ার, এস্থেনোস্ফেয়ার এবং মেসোস্ফেয়ার। কেন্দ্রস্থলও দু'টি উপস্তরে বিভক্ত। যথা ঃ বহিঃকেন্দ্র এবং অন্তঃকেন্দ্র। কাজেই, পৃথিবী মোট সাতটি স্তরে বিভক্ত ঃ (১) বায়ুমণ্ডল, (২) ভূত্বক, (৩) লিথোস্ফেয়ার, (৪) এস্থেনোস্ফেয়ার, (৫) মেসোস্ফেয়ার, (৬) বহিঃকেন্দ্র এবং (৭) অন্তঃকেন্দ্র।

১. **বায়ুমণ্ডল** হচ্ছে পৃথিবীর সবচাইতে বহিঃস্থ স্তর। পৃথিবী পৃষ্ঠের ৫০০ কিঃমিঃ উচ্চতা পর্যন্ত এ স্তরটি বিস্তৃত। ঐ উচ্চতারও উপরে বায়ুমণ্ডলের উপাদানসমূহ এত কম যে তারা পরস্পরের সাথে সংস্পর্শ হারিয়ে ফেলে।

www.bjilibrary.com

২. **ভূত্বক** হচ্ছে পৃথিবীর বহিরাবরণী। পৃথিবীর আয়তনের মাত্র ০.৬% ভাগ নিয়ে এটি গঠিত। এর পুরুত্ব স্থানবিশেষে আলাদা হয়ে থাকে; যেমন ঃ মহাসাগরতলে মোটামুটি একই রকম ৫ কিঃমিঃ পর্যন্ত গভীরে, মহাদেশীয় পৃষ্ঠের ৩৫ কিঃ মিঃ গভীর পর্যন্ত এবং হিমালয়, আল্‌প্‌স প্রভৃতি পর্বতমালার নিচে ৮০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত গভীর।

৩. **লিথোস্ফেয়ার** হচ্ছে ভূত্বকের ঠিক নিচের স্তর। প্রায় ১০০ কিঃ মিঃ পুরু কঠিন পদার্থের একটা স্তর এটি। আমাদের এই গ্রহটির প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এ সত্যটি যে, লিথোস্ফেয়ার সহ ভূপৃষ্ঠটি বেশ কয়েকটি কঠিন লিথোস্ফেরিক ফলকে বিভক্ত। লিথোস্ফেয়ারের নিচেই রয়েছে গঠনকাঠামোগত একটা বিঘোষিত পরিবর্তন। এতে রয়েছে একটা সীমারেখা, যার নাম 'মোহো' বিরামহীনতা। এর নিচেই আবরণীর বাকি অংশ বিস্তৃত। পৃথিবীর আয়তনের ৮২% ভাগেরও অধিক স্থান জুড়ে রয়েছে এ স্তরটি।

৪. **এস্থেনোস্ফেয়ার** হচ্ছে চতুর্থ স্তর যা ১০০ কিঃ মিঃ থেকে ২৫০ কিঃ মিঃ গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অঞ্চলে আবরণী উষ্ণ, অপেক্ষাকৃত নমনীয়, পুরু এক পুডিং সাগরের মত গলিত। এটিই এসথোনোস্ফেয়ার নামে পরিচিত। গুড় সদৃশ এ স্তরটি এর উত্তল গতির দ্বারা কঠিন লিথোস্ফেরিক ফলকসমূহকে ভূগোলকের চারপাশে স্থান পরিবর্তন করতে পারে।

৫. **মেসোস্ফেয়ার** ঃ আবরণীর বাকী অংশ হচ্ছে প্রকৃতির মত পিচ যা মেসোস্ফেয়ার নামে পরিচিত।

৬. **বহিঃকেন্দ্র** ঃ বহিঃকেন্দ্র ২ হাজার একশ কিঃ মিঃ পুরু। তরল লৌহের সাথে সামান্য পরিমাণ সালফার মোশানো পদার্থ দ্বারা এ স্তরটি গঠিত।

৭. **অন্তঃকেন্দ্র** ঃ অন্তঃকেন্দ্রটির ব্যাসার্ধ ভূ-কেন্দ্রে ১ হাজার ৩৭০ কি ঃ মিঃ। অন্তঃকেন্দ্রটি সম্ভবত কঠিন, এতে রয়েছে লোহা এবং অন্যান্য ভারী পদার্থসমূহ।

এভাবে প্রতীয়মান হয় যে, চলতি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কুরআনের আয়াতে বর্ণিত বক্তব্যের সাথে একমত।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ○

www.bjilibrary.com

৬৬ ঃ ৬ হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা কর আগুন হতে যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত রয়েছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফিরিশতাগণ, যারা অমান্য করে না আল্লাহ্ যা তাদেরকে আদেশ করেন এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তা-ই করে।

জ্বালানি হিসেবে পাথর–বিষয়টি ২ ঃ ২৪ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

٣- الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۖ مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ۖ
فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ○

৬৭ ঃ ৩ যিনি সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে। দয়াময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না। আবার তাকিয়ে দেখ, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি ?

সপ্ত আসমান সৃষ্টির বিষয়টি ২ ঃ ২৯ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি জিনিস যথাযথ অনুপাতেই সৃষ্টি হয়েছে–এ বিষয়টি ৬ ঃ ৭৩ এবং ২৫ ঃ ২ আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

٥- وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ
وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ○

৬৭ ঃ ৫ আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং তাদেরকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।

নিম্নতম আসমানে সাজসজ্জা বিষয়টি ৩৭ ঃ ৬ আয়াতের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

١٥- هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا
وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ۖ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ○

৬৭ ঃ ১৫ তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ থেকে আহার্য গ্রহণ কর। পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকট।

www.bjilibrary.com

পৃথিবীর বিস্তার বিষয়টি ২০ ঃ ৫৩ আয়াতের প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক বিষয়টি ৬ ঃ ৯৯ এবং ১৬ ঃ ৬৭ আয়াতের প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

١٦- ءَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ
فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ○

৬৭ ঃ ১৬ তোমরা কী নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরকে সহ ভূমিকে ধসিয়ে দেবেন না ? আর তা আকস্মিকভাবে থর থর করে কাঁপতে থাকবে।

আল্লাহ্ মানুষকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তাদের অবাধ্যতার কারণে তাদেরকে ভূমিকম্প দ্বারা শাস্তি প্রদান করা হতে পারে। ভূমিকম্প বিষয়টি ৭ ঃ ৯১ আয়াতের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। প্রচণ্ড ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার সময় পৃথিবী প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত হয়, কখনও কখনও পৃথিবীর উপরিভাগের স্তরসমূহ ফেটে যায়; এতে গভীর খাদ সৃষ্টি হয় এবং আক্রান্ত উপরিতলের উপর যা কিছু থাকে তার সবই গলাধঃকরণ করে ফেলে।

١٧- أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا
فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ○

৬৭ ঃ ১৭ অথবা তোমরা কী নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদের উপর কংকর বর্ষণকারী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেন না ? তখন তোমরা জানতে পারবে আমার সতর্কবাণী কেমন ছিল।

আল্লাহ্ সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তাদেরকে টর্নেডো মারফত তাদের অবাধ্যতার শাস্তি দেয়া হতে পারে। ঘূর্ণিবাত্যার বিষয়টি ১৭ ঃ ৬৮ আয়াতের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। ঐ প্রসঙ্গে প্রবল বাতাস এবং ঘূর্নিবাত্যাসহ বায়ু প্রবাহের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। ঘূর্ণিবাত্যা প্রচণ্ড গতিবেগে ধেয়ে চলে। কখনও কখনও এ গতি ১৫০ কিঃ মি/ঘণ্টা অতিক্রম করে যায় যাতে গাছপালা উপড়ে গিয়ে ইমারত ধ্বংস হয়ে এবং মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ব্যাপক ধ্বংস নেমে আসে।

www.bjilibrary.com

١٩- اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ؕ

اِنَّهٗ بِكُلِّ شَیْءٍۭ بَصِیْرٌ ○

৬৭ ঃ ১৯ তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের উর্ধ্বদেশে বিহঙ্গকুলের প্রতি, যারা পক্ষ বিস্তার করে ও সংকুচিত করে ? দয়াময় আল্লাহ্ই তাদের স্থির রাখেন। তিনি সব বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

বিষয়টি ১৬ ঃ ৭৯ আয়াতের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

٢٣- قُلْ هُوَ الَّذِیْۤ اَنْشَاَكُمْ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ ؕ
قَلِیْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ○

৬৭ ঃ ২৩ বল, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমারদেরকে দিয়েছেন শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি ও অন্তঃকরণ। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

মানব শিশুর সৃষ্টি বিষয়টি ২৩ ঃ ১২-১৪ আয়াতত্রয়ের প্রসঙ্গে ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে। শ্রবণ, দর্শন এবং অনুধাবন বা উপলব্ধি করার ক্ষমতার বিষয়টি ১০ ঃ ৩১ এবং ২৩ ঃ ৭৮ আয়াতদ্বয়ের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

٢٤- قُلْ هُوَ الَّذِیْ ذَرَاَكُمْ فِی الْاَرْضِ وَ اِلَیْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

৬৭ ঃ ২৪ বল, তিনিই তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।

মানবজাতির বংশবিস্তার ঘটে দৈহিক প্রজননের মধ্য দিয়ে বিষয়টি ২৩ ঃ ১২০-১৪ আয়াতদ্বয়ের প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

٣٠- قُلْ اَرَءَیْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا

فَمَنْ یَّاْتِیْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِیْنٍ ○

৬৭ ঃ ৩০ বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কী যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায় কে তোমাদেরকে এনে দেবে প্রবহমান পানি!

www.bjilibrary.com

অনেক সময় ভূমিকম্পের ফলে ভূমিধস, ভূপাত, আলগা মাটির হিমবাহ এবং মাটিতে চিড় ও ফাটলের সৃষ্টি হয়। ভূমিকম্পকালে সংঘটিত অবস্থানও উচ্চতাগত বিভিন্ন রকম পরিবর্তনের কারণে পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে যেতে পারে যাতে ঝর্ণাধারা পরিরর্তিত হয়ে পুকুর কিংবা হ্রদে পরিণত হতে পারে। ঝর্ণা ও কূপ সমূহ প্রায়শই ভূমিকম্প দ্বারা বাধাগ্রস্ত বা বিনষ্ট হয়ে যায়।

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۝

৬৮ ঃ ১ নূন, কলমের শপথ, লেখকগণ যা লিখে তার শপথ।

এই আয়াতে কলম ও কলমের সাহায্যে লিখিত জিনিষের শপথ গ্রহণের উদ্দেশ্য হলো লেখার গুরুত্ব প্রকাশ করা। আল্লাহ্র শপথ করার উদ্দেশ্য কোন বস্তুর গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। মানুষের ইচ্ছাকৃত, কথার আক্ষরিক সঙ্কেতের নামই লিখন যা বেশ কঠিন এবং উন্নতমানের শিল্প। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ মনে করেন যে মানুষ তার জ্ঞান, বুদ্ধি এবং কর্ম ক্ষমতার সমন্বয়ে আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে লিখন ক্ষমতা অর্জন করে। সর্বপ্রথম এই লিখন ছবির আকারে প্রকাশ পায়।[১] এই লিখা আবিষ্কার মানুষের কর্ম ক্ষমতার বিরাট বিস্তৃতি ঘটাতে সাহায্য করে। কারণ এর ফলে সে তার চিন্তা ও মনের ভাবকে স্থায়ী আকারে প্রকাশ করার সুযোগ পায়। অতঃপর সময়ের আবর্তনে খুব দ্রুতগতিতে এই লিখন শিল্প উন্নত হতে হতে বর্তমানে তার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছায়। লিখন শিল্পের উদ্ভব না হলে মানব সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অভিনব উন্নতি সম্ভব হতো না। লিখিত বাণী বা বাক্য কেবল মত বিনিময়ের উত্তম মাধ্যমই নয় বরং এটা মানুষের অর্জিত জ্ঞান ও চিন্তাধারাকে ধরে রাখা এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য চিরকালের জন্য সংরক্ষিত করার পদ্ধতি।

সুতরাং মানুষ যা লিখে তার মূল্য অনেক। তাছাড়া চিঠিপত্র লেখা, রিপোর্ট তৈরি করা এবং দলিল পত্র তৈরির মাধ্যমে আমরা নতুন নতুন জ্ঞান আহরণ করতে পারি। আর লিখিত জিনিসের মাধ্যমে আমরা অনেক অজানা জিনিস জানতে পারি এবং বর্তমান ও অতীত যুগের মহান ব্যক্তিদের পরিচয় লাভ করতে পারি।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Encyclopeadia Britannica, Vol. 19, pp. 1033-1044, 1978.

www.bjilibrary.com

٤-كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ○ ٥-فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ○
٦-وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ○ ٧-سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ
سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ
نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ○ ٨-فَهَلْ تَرَىٰ لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ○ ٩-وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ
قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ ○ ١٠-فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً
رَابِيَةً ○ ١١-إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ○
١٢-لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ○

৬৯ ঃ ৪-১২ ছামূদ ও আদজাতি সেই আকস্মিকভাবে সংঘটিতব্য মহা বিপদকে অস্বীকার করেছিল। অতঃপর ছামূদ জাতি এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় ধ্বংস হয়ে গেছে। আর আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে এক ভয়াবহ তীব্র ঝড়ের আঘাতে। আল্লাহ্ তা'আলা সেই ঝঞ্ঝাকে ক্রমাগত সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত তাদের উপর জারি রেখেছিলেন। (তুমি থাকলে) দেখতে পেতে যে তারা সেখানে এমনভাবে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় উপুড় হয়ে পড়েছিল যেমন পুরোন খেজুর গাছের কান্ডসমূহ ঝড়ে ভূপাতিত থাকে।.

এখন তাদের একজনও কি তোমরা আজ বেঁচে আছে দেখতে পায় ?

আর ফেরাউন এবং তার পূর্ববর্তী লোকেরা এবং বিভিন্ন ধ্বংস-প্রাপ্ত জনপদসমূহ এরূপ মারাত্মক অপরাধই করেছিল।

এই লোকেরা তাদের রবের প্রেরিত রাসূলদেরকে মানে নি, ফলে তিনি তাদেরকে কঠোরভাবে শাস্তি দিলেন।

যখন (নূহের সময়) পানির উচ্ছ্বাসিত স্রোত সীমা লংঘন করে গেল, তখন আমরা তোমাদেরকে (মানব বংশকে) নৌকায় আরোহী বানিয়েছিলাম যেন এই ঘটনাটি তোমাদের জন্য একটি শিক্ষাপ্রদ স্মারক বানিয়ে দেই, আর এই ঘটনা শ্রবণকারী কানসমূহ তার স্মৃতিকে সংরক্ষিত করে রাখে।

www.bjilibrary.com

ছামূদ ও আদ জাতির ধ্বংসের বিবরণ ৭ ঃ ৪ এবং ১১ ঃ ৬৭ আয়াতদ্বয়ের সঙ্গে, নূহ (আ)-এর জাতির ধ্বংসের বিবরণ ৭ ঃ ৬৪ আয়াতের সঙ্গে এবং ফেরাউন ও তার জাতির ধ্বংসের কাহিনী ৭ ঃ ১৩৬ আয়াতের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

١٦- وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ۝

৬৯ ঃ ১৬ যে দিন আকাশ দীর্ণ-বিদীর্ণ হবে এবং তার বাঁধন শিথিল হয়ে যাবে।

এ বিষয়টি ২৫ ঃ ২৫ আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

٤٦- ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ۝

৬৯ ঃ ৪৬ এবং তার কণ্ঠ হৃৎপিন্ডের ধমনি ছিন্ন করে ফেলতাম।

হৃৎপিন্ডের ধমনি এয়োর্টা (Aorta) যা হৃদপিন্ডের বাম প্রকোষ্ঠ থেকে শুরু হয় এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে রক্ত সঞ্চালিত করে। এই ধমনি বিচ্ছিন্ন হলে কেউ বাঁচতে পারে না। সাধারণত দুর্ঘটনা, ছুরি বা বুলেটের আঘাত অথবা aneurysm হয়ে ফেটে গেলে এরূপ হতে পারে।

٤- تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ
كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۝

৭০ ঃ ৪ ফিরিশতা এবং রূহ আল্লাহ্‌র দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে তা পৃথিবীর পঞ্চাশ বছরের সমান।

এ বিষয়টি আয়াত ২২ ঃ ৪৭ ও ৩২ ঃ ৫ এ আলোচনা করা হয়েছে।

٩- وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝

৭০ ঃ ৯ এবং পর্বতসমূহ হবে পশমের মত,

এ সম্পর্কে আয়াত ৫৬ ঃ ৪-৬ এ আলোচিত হয়েছে।

١٤- وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ۝

৭১ ঃ ১৪ অথচ তিনিই তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে,

www.bjilibrary.com

দু'জনন কোষের মিলনের ফলে উৎপন্ন জাইগোট (zygote) থেকে মানুষের সৃষ্টি এবং বিভিন্ন ভ্রূণাবস্থিত থাকার বিষয়টি আয়াত ২৩ ঃ ১২-১৫তে হয়েছে। এই তত্ত্বে কোন কোন বিজ্ঞানী দাবী করেন যে মানুষ আদিম যুগের জীবন থেকে ক্রমান্বয়ে উচ্চতর জীবন যাপনে ক্রম বিকশিত হয়েছে।

١٥- أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۝

৭১ ঃ ১৫ তোমরা কি লক্ষ্য করনি? আল্লাহ্ কীভাবে সপ্ত স্তরে বিন্যস্ত আকাশমন্ডলী সৃষ্টি করেছেন,

এ বিষয়টি ২৩ ঃ ৮৬ সংখ্যক আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

١٦- وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۝

৭১ ঃ ১৬ এবং সেখানে চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপ রূপে;

পৃথিবীকে আলোকিত করার প্রধান আলোর উৎস হচ্ছে চাঁদ ও সূর্য। এই দু'টির মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে যে চাঁদ পৃথিবীর একটি স্বাভাবিক উপগ্রহ এবং সূর্য কিরণ প্রতিফলিত হয়ে আলো দেয়। অন্যদিকে সূর্য হচ্ছে একটি নক্ষত্র এবং তাপ-আণবিক (thermo-nuclear) প্রক্রিয়া দ্বারা নিজেই নিজের মধ্যে শক্তি উৎপন্ন করে আলো দেয়। শক্তি উৎপাদনের এই প্রক্রিয়ার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এর কেন্দ্রে প্রটোন-প্রটোনের পর্যায়ক্রমিক বিক্রিয়া (proton-proton chain reaction) । এই বিক্রিয়া সংঘটিত হয় সূর্যের কেন্দ্রের মর্মস্থলে যার ব্যাসের দৈর্ঘ চার লক্ষ কিলোমিটার এবং সূর্য পিন্ডের প্রায় ৬০% ধারণ করে। আর এই কেন্দ্রীয় অংশ সূর্যের মোট ঘনমাণের মাত্র ২%। এই কেন্দ্রীয় অংশের বাইরে অবিবর্ধিত পদার্থের একটি মোড়ক রয়েছে যার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় অংশ থেকে তাপ বিকিরণ করে। এই তাপ ভূপৃষ্ঠের প্রায় এক লক্ষ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট এলাকার উপর বিকিরিত হয় এবং তাপ সঞ্চালন শক্তি পরিবহনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়। সূর্যের মর্মস্থল থেকে উপরিভাগ পর্যন্ত তাপমাত্রা প্রায় ১৫,০০০,০০০° ডিগ্রী কিলো-ওয়াট থেকে মাত্র ৬,০০০° ডিগ্রী কিলোওয়াটে নেমে আসে। ফটোস্ফিয়ার (সূর্যের আলোকময় বহিরাবরণ, যেখান থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হয়) নামে পরিচিত সূর্যের বহিরাবরণ সূর্যের তাপসঞ্চালন এলাকা ও সৌর বায়ু মন্ডলের মধ্যে একটি সীমানা তৈরি করে। কয়েকশ' কিলোমিটার পুরু এটা একটি স্তর যেখান থেকে

সূর্যের নির্গত শক্তির বিকিরণ হয়। এই বিকিরণকৃত শক্তির একটি নির্দিষ্ট অংশ মাত্র পৃথিবী গ্রহণ করে।

পৃথিবীর একমাত্র স্বাভাবিক উপগ্রহ চাঁদের ব্যাসের পরিমাণ ৩৪৭৬ কিলোমিটার এবং পৃথিবী থেকে এর গড় দূরত্ব ৩,৮৪,৪০০ কিলোমিটার। আর পৃথিবীর চারদিকে বৃত্তাকারের কক্ষপথ গড় ২৭.৩৩২ সৌর দিবসে প্রদক্ষিণ করে। চাঁদের ঘুর্ণন সমলয় বিশিষ্ট অর্থাৎ এর অক্ষ রেখা যার চারদিকে ঘূর্ণনের কৌণিক বেগ পৃথিবীর চারদিকে পরিভ্রমণের বেগের সমান। অতএব চাঁদের সম্মুখভাগ সব সময় পৃথিবীর দিকে থাকে। চাঁদের সবচেয়ে স্পষ্ট বিষয়টি হচ্ছে চাঁদের পৃষ্ঠের আলোকিত ও দৃশ্যমান অংশের গঠন এক রাত থেকে আরেক রাতে পরিবর্তিত হয়। চন্দ্রকলার এই দৃশ্যটি দু'টি ঘটনার একটি সাধারণ ফলাফল, (১) চাঁদ নিজে দীপ্তিমান নয়, কিন্তু সূর্যের কিরণ প্রতিফলিত হওয়ার ফলে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ে; এবং (২) চাঁদ স্বীয় কক্ষপথে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে.। যেহেতু সূর্য সবসময় চাঁদের অর্ধেক পিঠকে আলোকিত করে যা একটি নির্দিষ্ট সময়ে এর মুখোমুখি হয় তাই চাঁদের কলাসমূহ পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান চান্দ্র গোলার্ধের আলোকিত অংশের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। এরূপে এটা পরিদৃষ্ট হয় যে সূর্য ও চন্দ্র দু'টি ভিন্ন ধরনের আলোর উৎস। চাঁদ শুধুমাত্র সূর্যালোককে প্রতিফলিত করে, আর সূর্য আলোক বর্তিকার ন্যায় নিজের মধ্যেই আলো উৎপন্ন করে।

١٧- وَاللّٰهُ اَنۡۢبَتَكُمۡ مِّنَ الۡاَرۡضِ نَبَاتًا ۙ

৭১ ঃ ১৭ আর তিনি তোমাদেরকে উদ্ভূত করেছেন মাটি থেকে।

একটি শব্দমূল থেকে আরবী 'আনবাত' শব্দটি আহরণ করা হয়েছে। এর অর্থ অংকুরিত হওয়া অথবা উৎপন্ন করা। গর্ভাশয়ের ফল হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং আল্লাহ্‌তা'আলা এখানে জরায়ু মধ্যস্থিত মানব শিশুর সৃষ্টির প্রসংগে উল্লেখ করেছেন। যেমন একটি গাছ ভূপৃষ্টে একটি বীজ থেকে জন্ম লাভ করে। তেমনিভাবে মানববীজ যথা ডিম্বকোষ ও শুক্রের একত্রে মিলনের ফলে জাইগোট (zygote দুই জননকোষের মিলনের ফলে উৎপন্নকৃত) গঠিত হয়।

তারপর জরায়ুতে ক্রমান্বয়ে ভ্রূণের উন্নয়ন ঘটে। উদ্ভিদ তার শিকড়ের মাধ্যমে মাটি থেকে পুষ্টি আহরণ করে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে মানব ভ্রূণ মায়ের গর্ভফুল থেকে পুষ্টি লাভ করে ধীরে ধীরে বড় হয়। আর মা ভূপৃষ্টে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রকার খাদ্য থেকে তার পুষ্টি লাভ করে। তাই একটি বীজের অংকুরোদগম ও তা থেকে একটি গাছের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া মায়ের উদরে একটি

www.bjilibrary.com

ভ্রূণের ক্রমান্বয় বৃদ্ধির সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এই আয়াতে পৃথিবীতে মানুষের জন্ম ও তার ক্রমান্বয় বৃদ্ধির বিষয়টি এসেছে এবং তা আয়াত নং ৬ ঃ ২ এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

١٩- وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۝

৭১ ঃ ১৯ এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ভূমিকে বিস্তৃত করেছেন—

আয়াত ২ ঃ ২২ ও ১৩ ঃ ৩ এ প্রসংগে ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে।

٢٠- لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۝

৭১ ঃ ২০ যাতে তোমরা প্রশস্ত পথে চলাফেরা করতে পার।

এ প্রসংগে ২০ ঃ ৫৩নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

٢٥- مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ

مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ۝

৭১ ঃ ২৫ তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং তাদেরকে অগ্নিতে দাখিল করা হয়েছিল, অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় কাকেও সাহায্যকারী পায়নি।

এই আয়াতটিতে নবী নূহ (আ)-এর সময়কার বন্যার কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে আয়াত ৭ ঃ ৫৯-৬৪তে আলোচনা করা হয়েছে।

١٤- يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ۝

৭৩ ঃ ১৪ সেই দিনে পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে।

আয়াত নং ১৮ ঃ ৪৭ এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

١٨- السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ۚ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۝

৭৩ ঃ ১৮ যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে; তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

এ বিষয়ে আয়াত ২৫ ঃ ২৫ এ আলোচনা করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

.....وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ .....

৭৩ ঃ ২০ ....এবং আল্লাহ্‌ই দিন ও রাতের পরিমাণ নির্ধারণ করেন। তিনি জানেন যে তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পার না,

আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দেশিত বিধান অনুসারে পৃথিবী স্বীয় অক্ষের উপর ২৪ ঘন্টায় একবার চক্রাকারে আবর্তন করে এবং স্বীয় কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে ৩৬৫.২৪ দিনে একবার ঘুরে আসে। স্বীয় কক্ষপথের উপর আবর্তনকালে সব সময় ২৩০.৫° ডিগ্রী কোণিক অবস্থানে থাকে। দিবা-রাত্রির পরিবর্তন এবং তাদের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে আয়াত ২ ঃ ১৬৪ ও ১০ ঃ ৬ এ আলোচনা করা হয়েছে।

বছরের বিভিন্ন সময়ে একই স্থানে দিন-রাতের স্থিতির তারতম্য হতে দেখা যায়। আবার তাদের ব্যাপ্তির প্রেক্ষিতে স্থান বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাই একজন অতি সাধারণ লোকের পক্ষে দিন-রাতের এসব পার্থক্য সম্পর্কে জানা প্রায় অসম্ভব এবং তাদের পক্ষে সঠিকভাবে নির্ধারণ করাও সম্ভবপর নয় যে একটি রাতের অর্ধেক, এক তৃতীয়াংশ বা দুই তৃতীয়াংশ কী পরিমাণ সময় নিয়ে গঠিত হয়।

٩-وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝

৭৫ ঃ ৯ যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে।

পরিশিষ্ট ১ ও আয়াত ৪৪ ঃ ১০ এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, প্রায় ৭০০ কোটি বছরের আরও একটি বর্ধিত কালব্যাপী সূর্য তার প্রধান পরিণতির উপর বর্তমান অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। সেই সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সূর্যের বহিরাংশ প্রচন্ডভাবে ফুলে উঠবে এবং একটি প্রকান্ড লাল দৈত্যের রূপ পরিগ্রহ করবে। এই পর্যায়ে সূর্যের এই স্ফীত বহিরাবরণ বুধ ও শুক্র গ্রহকে গ্রাস করবে এবং পৃথিবীর কক্ষ পথে পৌছবে। অতঃপর স্ফীত সূর্য চাঁদের কাছাকাছি চলে এসে চাঁদকে গ্রাস করবে এবং এভাবে সূর্যের সাথে চাঁদ এসে মিলিত হবে।

٣٧-أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ۝

٣٨-ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ۝

www.bjilibrary.com

৭৫ ঃ ৩৭-৩৮ সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? অতঃপর সে আলাকায় পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ্ তাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন।

নুতফাহ্ থেকে মানব শিশুর জন্মের বিষয়টি ইতোপূর্বে আয়াত ২২ ঃ ৫ ও ২৩ ঃ ১২-১৪তে আলোচনা করা হয়েছে।

٣٩- فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ ۝

৭৫ ঃ ৩৯ অতঃপর তা থেকে তিনি সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী।

পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গের সৃষ্টি সম্পর্কে ১৩ঃ৩ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

٤٠- أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۝

৭৫ ঃ ৪০ তবুও কী সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নয়?

আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত এবং জীবিতকে মৃত করেন। এ বিষয়টি আয়াত নং ৩ ঃ ২৭ এ ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

١- هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا ۝

٢- إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ
فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

৭৬ ঃ ১-২ মানুষের উপর কী কালের এমন একটা সময় অতিবাহিত হয়নি যখন সে উল্লেখযোগ্য কোন বস্তু ছিল না?

নিশ্চয়ই আমরা মানুষকে সংমিশ্রিত নুৎফা (ফোটা) থেকে সৃষ্টি করেছি যেন আমরা তাকে পরীক্ষা করতে পারি। আর এ উদ্দেশ্যে আমি তাদেরকে শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছি।

মানুষের পরিচয় কেবল শিশু হিসাবে জন্ম লাভের পর শুরু হয়। এর পূর্বে তার কোন উল্লেখ বা পরিচয় থাকে না। কিন্তু তার সৃষ্টি শুরু হয় পিতার শুক্রকীট ও মায়ের ডিম্ব এবং এ দুয়ের মিলনের ফলে ভ্রূণ সৃষ্টির সময় থেকে। অথচ এ সময় শিশুর কোন পরিচয় নেই। এমন কি প্রায় সবক্ষেত্রে তার লিঙ্গ সম্পর্কেও জানা থাকে না। সুতরাং এ কথা অতীব সত্য যে মানুষের জীবনে একটা সময় ছিল, যখন সে উল্লেখ করার মত কোন বস্তুই ছিল না। এই আয়াতের মানুষের

www.bjilibrary.com

জীবনের প্রথম সৃষ্টিকালের উল্লেখ রয়েছে যা ২৩ ঃ ১২ আয়াতের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

٢٨- نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ ۚ وَإِذَا شِئْنَا
بَدَّلْنَآ أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ۝

৭৬ ঃ ২৮ আমরাই তাদেরকে (মানুষ) সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গ্রন্থি সমূহ (জোড়া) শক্ত করে দিয়েছি। আমরা যখনই ইচ্ছা করব তখনই তাদের আকৃতি পরিবর্তন করে ফেলব।

মানুষের সৃষ্টির বিবরণ ২৩ ঃ ১২-১৫ আয়াতের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

শরীরের গ্রন্থি বা জোড়া বলতে বিভিন্ন হাড়ের সংযোজন বুঝায়। এই জোড়া সাধারণত দু'প্রকার যথা দৃঢ় বা স্থির জোড়া এবং চলমান জোড়া বা শিথিল জোড়া। স্থির জোড়া সমূহ fibrous বা cartilaginous হয়। আর চলমান জোড়া সাধারণত বিশেষ পর্দা ও পিচ্ছিল তরল পদার্থ (synovial fluid and membrane) সহ হয়। স্থির জোড়া বা গ্রন্থিসমূহ খুব শক্ত এবং সামান্য আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। সাধারণত কঠিন আঘাতে সংশ্লিষ্ট হাড় ভেঙ্গে যায়।

শিথিল জোড়ায় চার প্রকার বস্তুর প্রয়োজন হয়– গ্রন্থির দুদিকের হাড়ের প্রান্তদ্বয় এ সমস্ত হাড়প্রান্তকে ঢেকে রাখা নরম হাড় (cartilage) যাতে হাড় প্রান্তদ্বয় মসৃণ হয় আর একটি শক্ত আবরণ যাকে ক্যাপসুল বলে, যার সাহায্যে হাড় দুটিকে আটকিয়ে রাখা হয়। জোড়ার ভিতরের পর্দা থেকে এক প্রকার পিচ্ছিল পদার্থ বের হয় যার ফলে হাড় দুটি সহজে নড়াচড়া করতে পারে। এ ছাড়া জোড়ার উপর দিয়ে গ্রন্থির উপরের হাড় থেকে নিচের হাড় পর্যন্ত বিভিন্ন মাংস পিন্ড রয়েছে যা গ্রন্থিকে আরও শক্তিশালী করে।

মোট কথা কুরআনের জোড়া শক্ত করার কথাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

তথ্যসূত্র ঃ

1. W.A.R. Thomson, Black's Medical Dictionary, 33rd edn., Adar and Charles Black. London, pp. 503-504, 1981.

www.bjilibrary.com

١-وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۝ ٢-فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۝

٣-وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۝ ٤-فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۝

٥-فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۝

৭৭ ঃ ১-৫ শপথ কল্যাণ স্বরূপ প্রেরিত বায়ুর, আর প্রলয়ংকরী ঝড়ের, শপথ সঞ্চালনকারী বায়ুর, আর মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী বায়ুর, এবং তার যা মানুষের অন্তরে উপদেশ পৌছিয়ে দেয়–

প্রবল বাতাস ও ঘূর্ণিঝড়সহ বায়ুর শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে আয়াত ২ ঃ ১৬৪ ও ১৭ ঃ ৬৮ তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ৩০ ঃ ৪৮ সংখ্যক আয়াতে এও ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে আকাশের মেঘদলকে বায়ু কিভাবে বিস্তৃত করে দেয় এবং পরে পৃথক করে। উপরে একটি বার্তার বিস্তারের অর্থ হতে পারে বায়ু সংবাদের বার্তা বাহকের কাজ করতে পারে এবং আয়াত ৭ ঃ ৫৭তে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

٨-فَإِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ۝

৭৭ ঃ ৮ যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হবে–

পরিশিষ্ট-১ এ লক্ষ্য করা গিয়েছে যে বাদামী বর্ণের বামন নক্ষত্রগুলো যাদের আলো এত ক্ষীণ যে প্রায় দেখা যায় না, তাদের ব্যতীত অন্য সকল নক্ষত্র নিম্নের পর্যায়গুলোর মাধ্যমে প্রকাশ পায় ঃ প্রধান অনুবর্তিকা পর্যায়, কম্পনশীল পর্যায় ও রক্তিম দৈত্যবৎ পর্যায়। এ সকল পর্যায়ের পর প্রকাশের ধরন নক্ষত্রের পিণ্ডের উপর নির্ভর করে। যদি পিণ্ডটি 'চন্দ্রশেখরের সীমার (Chandrasekhar's Limit) মধ্যে থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত নক্ষত্রটি একটি সাদা বামনে পরিণত হয় এবং স্বীয় অভ্যন্তরস্থ আলো বিকিরণ করে। তারপর ক্রমান্বয়ে কাল বামনে রূপান্তর ঘটে। চন্দ্রশেখরের সীমার মধ্যে থেকে অধিকতর বড় পিণ্ডাকৃতির তারকাসমূহ শেষ পর্যন্ত উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি অথবা অতিমাত্রায় উজ্জ্বল নক্ষত্রমালার মধ্যে পড়ে ক্রিয়াশক্তি হারিয়ে ফেলে। এ সকল তারকা একটি স্বল্প সময়ে খুবই উজ্জ্বল হয়ে উঠে, তারপর শক্তি হারিয়ে ফেলে ক্রমান্বয়ে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর আলোকবিশিষ্ট হতে থাকে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। সুবৃহৎ পিণ্ডাকারের তারকাসমূহ শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ গহ্বরে পতিত হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। এভাবে সকল তারকা চূড়ান্তভাবে ক্ষীণালোক বিশিষ্ট হয়ে হারিয়ে যায়।

www.bjilibrary.com

٩- وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ۝

৭৭ ঃ ৯ যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে,

এই বিষয়টি আয়াত ২৫ ঃ ২৫ এ আলোচনা করা হয়েছে।

١٠- وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۝

৭৭ ঃ ১০ এবং যখন পর্বতমালা উন্মূলিত ও বিক্ষিপ্ত হবে–

এ প্রসংগে আয়াত ৫৬ ঃ ৪-৬ এ আলোচিত হয়েছে।

١٦- أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ۝

١٧- ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ۝

৭৭ ঃ ১৬-১৭ আমরা কি পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে তাদের অপরাধের জন্য ধ্বংস করি নি? এমনিভাবে পরবর্তী লোকদেরকেও তাদের মত পরিচালিত করব (ধ্বংস করব)।

এখানে অতীতের অবিশ্বাসী কাফিরদের কথা বলা হয়েছে যারা তাদের নবীদের কথা অমান্য করায় ধ্বংস হয়েছে। এখানে কোন বিশেষ জাতির উল্লেখ করা হয়নি। তবে তাদের পাপের জন্য ভূমিকম্প, ঝড়, বন্যা ইত্যাদির যাহায্যে বিভিন্ন জাতির ধ্বংসের কথা ৭ ঃ ৪, ৫৯-৬৪ এবং ১৭ ঃ ৬৮ আয়াতসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

٢٠- أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝

٢١- فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝

٢٢- إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝

٢٣- فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ۝

৭৭ ঃ ২০-২৩ আমরা কি তোমাদেরকে নাপাক ও নগণ্য পানি থেকে সৃষ্টি করি নি? তারপর তাকে একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত একটি সংরক্ষিত স্থানে আটকিয়ে রাখি নি? (মনে রেখো) আমরা যা প্রয়োজন তা করেছিলাম, এবং আমরা উত্তম ক্ষমতার অধিকারী।

www.bjilibrary.com

মানব শিশুর মায়ের গর্ভে জন্মের বিভিন্ন স্তর ও তার সৃষ্টির পূর্বের শুক্রকীট ও ডিম্বের মিশ্রণ ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ ২৩ ঃ ১২-১৪ আয়াতের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

গর্ভকালের সময় এবং তার বিভিন্নতা নিয়ে যা মানুষের ক্ষমতার বাইরে, তাও ২২ ঃ ৫ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

٢٧- وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا ○

৭৭ ঃ ২৭ আর তাতে (পৃথিবীতে) উচ্চশির পর্বতমালা গড়ে শক্ত করে বসিয়ে দিয়েছি আর তোমাদের জন্য সুমিষ্ট পানি সরবরাহ করেছি।

পৃথিবীতে কীলকের মত পাহাড় গেড়ে দেওয়ার বিষয়টি ১৩ ঃ ৩ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তার অসীম দয়ার মাধ্যমে আমাদের জন্য পানযোগ্য অফুরন্ত পানির উৎস সৃষ্টি করেছেন যা ২ ঃ ১৬৪ আয়াতের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। এই পানির দ্বিতীয় স্তরের উৎস হলো নদী, পুকুর, খাল-বিল এবং ফল্গুধারা সমূহ।

٦- أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ○

৭৮ ঃ ৬ আমি কী ভূমিকে শয্যা করিনি?

পৃথিবী একটি বিশালাকৃতির গোলাকার বস্তু, এর ব্যাসার্ধ প্রায় ৪০০০ মাইল ও ভূপৃষ্ঠের আয়তন ২০.১ কোটি বর্গমাইল। পৃথিবীর বিস্তারণের বিষয়টি আয়াত ১৩ ঃ ৩ ও ১৫ ঃ ১৯ এ আলোচনা করা হয়েছে।

٧- وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ○

৭৮ ঃ ৭ ও পর্বত সমূহকে কীলক।

এ বিষয়টি আয়াত ১৩ ঃ ৩ এ আলোচিত।

٨- وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ○

৭৮ ঃ ৮ আমি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি।

প্রাণী জগত ও উদ্ভিদ জগতে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টির বিষয়টি আয়াত ১৩ ঃ ৩ এ আলোচনা করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

۹- وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝

৭৮ ঃ ৯ তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম।

নিদ্রার বিষয়টির উপর আয়াত ৩০ ঃ ২৩ ও পরিশিষ্ট-৮ এ আলোচনা হয়েছে।

۱۲- وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝

৭৮ ঃ ১২ আর নির্মাণ করেছি তোমাদের উর্ধ্ব দেশে সুস্থিত সপ্ত আকাশ।

এ সম্পর্কে আয়াত ২ ঃ ২৯ এ আলোচনা হয়েছে।

۱۳- وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۝

৭৮ ঃ ১৩ এবং সৃষ্টি করেছি প্রোজ্জ্বল দীপ–

এটা সূর্যের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে এবং ৭ ঃ ৫৪ নং আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

۱۴- وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۝

৭৮ ঃ ১৪ এবং বর্ষণ করেছি মেঘ থেকে প্রচুর বৃষ্টি–

প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাতের প্রসঙ্গটি আয়াত ১১ ঃ ৫২তে আলোচনা করা হয়েছে।

۱۵- لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۝

۱۶- وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ۝

৭৮ ঃ ১৫-১৬ তা দ্বারা আমি উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ, ও ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্যান–

বৃষ্টির ফলে শস্য, উদ্ভিদাদির উৎপাদন এবং সাধারণভাবে সবুজ গাছপালার সৃষ্টি প্রসঙ্গটি আয়াত ৬ ঃ ৯৯তে আলোচনা হয়েছে।

۱۹- وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۝

۲۰- وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝

www.bjilibrary.com

৭৮ ঃ ১৯-২০ আকাশ উন্মুক্ত করা হবে, ফলে তা হবে দ্বারবিশিষ্ট। এবং পর্বতসমূহকে চলমান করা হবে, ফলে সেগুলো হয়ে যাবে মরীচিকা।

এ বিষয়গুলোর উপর যথাক্রমে আয়াত ৫৬ ঃ ৪-৬ এ আলোচনা হয়েছে।

٢٩- وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ۝

৭৮ ঃ ২৯ আমরা প্রত্যেকটা বিষয়ই লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলাম।

এ বিষয়টি ৩৬ ঃ ১২ আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

٣٧- رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ
لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۝

৭৮ ঃ ৩৭ সেই আসমান-যমিনের ও তার মধ্যবর্তী প্রতিটি বস্তুর মালিক যে প্রভু তাঁর নিকট থেকে, যার সামনে কারো কথা বলার সাহস নেই।

আল্লাহ্ যে আসমান-যমিন ও এ দুয়ের মধ্যবর্তী যাবতীয় জিনিষের মালিক এ কথা ৫ ঃ ১৯ এবং ৭ ঃ ১৮৫ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

٢٧- ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ۚ بَنٰهَا ۝

৭৯ ঃ ২৭ তোমাদের (মানুষের) সৃষ্টি করা কী অধিক কঠিন কাজ না আসমান সৃষ্টি করা? আল্লাহ্ই তো তা নির্মাণ করেছেন।

এ বিষয়টি ৪০ ঃ ৫৭ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

٢٨- رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ۝

৭৯ ঃ ২৮ তার ছাদ (আকাশ) যথেষ্ট উচ্চে তুলেছেন পরে তাতে সমতা দান করেছেন।

আকাশের ছাদ সম্পর্কে কী বুঝানো হয়েছে তা ২ ঃ ২২ আয়াতে সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

প্রায় ৪৫০ কোটি বছর পূর্বে এই পৃথিবী একটি ঘূর্ণায়মান অতি উত্তপ্ত গ্যাসের কুন্ডলী ছিল (আয়াত ২ ঃ ১১৭)। পরে এটা ক্রমে ক্রমে ঠান্ডা হতে থাকে এবং তরল ও শক্ত বস্তুতে পরিণত হয় যা পৃথিবীর আবরণ হিসেবে তৈরি হয়। কতগুলো গ্যাস যেমন অক্সিজেন, কার্বনডাই অক্সাইড ইত্যাদি বর্তমান পৃথিবীর বায়ুমন্ডল হিসেবে তরল ও শক্ত বস্তুর পৃথিবী থেকে আলাদা হয়ে যায় কারণ পৃথিবীর তাপে এগুলো তরল বা কঠিন বস্তুতে পরিণত হতে পারে না। যেহেতু এই গ্যাসগুলো পাতলা তাই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়া শক্তি তাদেরকে তাদের ওজন অনুযায়ী বিভিন্ন উচ্চতায় ধরে রাখে। ফলে সবচেয়ে হালকা গ্যাস সর্বোচ্চে অবস্থান করছে। এই তথাকথিত ছাদের বিধান ২ ঃ ২২ আয়াতে প্রমাণ করা হয়েছে যে কেবল আল্লাহ্ই এ সবকে নিজস্ব পরিমাপে সৃষ্টি করেছেন।

٢٩- وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحٰهَا ۝

৭৯ ঃ ২৯ তিনি রাতকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রকাশ করেছেন সূর্যালোক।

সূর্য তথা আলোর উৎস দিকচক্রবালের নিচে নেমে গেলে স্পষ্টতই ভূপৃষ্ঠে অন্ধকার নেমে আসবে এবং গাগনিক বস্তুসমূহ দ্বারা সজ্জিত নৈশ আকাশের ঐশ্বর্য ফুটে উঠবে– এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কী কারণে অসংখ্য তারকা এবং গাগনিক বস্তুনিচয় রাতের আকাশকে উজ্জ্বল করে তোলে না তা ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। ১৮২৬ সালে জার্মান বিজ্ঞানী হেইনরিখ অলবার সর্বপ্রথম এ প্রশ্ন তোলেন যে, আকাশ রাত্রিবেলা অন্ধকার থাকে কেন ? এটি অলবারের প্যারাডক্স হিসেবে পরিচিত।? সমস্যাটা অনুধাবন করার জন্য ধরা যাক, আকাশ সমপুরুত্ববিশিষ্ট অসংখ্য গোলাকার খোলসে বিভক্ত এবং সমগ্র আকাশ জুড়ে তারকার ঘনত্ব (প্রতি ইউনিট আয়তনের তারকার সংখ্যা) অপরিবর্তনীয় তথা ধ্রুবক; তাছাড়া সমস্ত তারকা সমান স্বকীয় উজ্জ্বলতা বিশিষ্ট। ধরে নেই h এমন পুরুত্ব বিশিষ্ট একটি খোলসের আয়তন হচ্ছে; 4rh তারকার ঘনত্ব যদি হয় n ,তাহলে এমন একটা খোলসের ভিতরকার তারকার সংখ্যা হবে 4nhr । এখন, প্রতীয়মান উজ্জ্বলতা দূরত্বের বিপরীত বর্গের সমান। কাজেই খোলসের ক্ষেত্রে আকাশের প্রতীয়মান ঔজ্জ্বল্য হচ্ছে ঃ $4nr^2hnkr^2$ যা 4rhnk এর সমান। খোলসের দূরত্ব r থেকে এই রাশিটি আলাদা। কাজেই দেখা যাচ্ছে, দূরের হোক আর কাছেরই হোক, প্রতিটি খোলসই আকাশে একই পরিমাণ উজ্জ্বলতা প্রদান করে থাকে। এভাবে, মহাকাশের যদি উপরে অনুমিত একরূপ বৈশিষ্ট্য থাকত, তাহলে প্রতিটি খোলস সদৃশ অঞ্চল তা যত দূরের বা কাছেরই হোক না কেন– মহাকাশে

www.bjilibrary.com

সমপরিমাণ উজ্জ্বলতা প্রদান করত। আর অসংখ্য খোলস থেকে আকাশে আগত আলোকচ্ছটাতে থাকত চোখ ধাঁধানো রকমের ঔজ্জ্বল্য।

মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ গতি দূরত্বের সাথে বেড়ে যাচ্ছে–এ সত্যটির মধ্যে রয়েছে অলবারের প্যারাডক্সের সমাধান।

আবার, ১০০ কি. মি./ সেকেণ্ড/ মেগাপারসেক কে হাব্‌ল-এর ধ্রুবক ধরে নিলে দেখা যায় যে, ৩০০০ মেগাপারসেক দূরত্বে অবস্থানকারী ছায়াপথের ক্ষেত্রে গতি সঞ্চার হবে ৩.১০ কি. মি./ সেকেণ্ড যা আলোর গতির সমান। কাজেই, এর চেয়ে অধিক দূরত্বে অবস্থানকারী ছায়াপথ কখনই দৃষ্টিগোচর হবে না। এরা আকাশের উজ্জ্বলতায় কোন অবদানও রাখতে পারে না। এ কারণে, সূর্যাস্তের পর আকাশ অন্ধকার হয়ে যায়।

তথ্যসূত্র ঃ

1. I.C. Brandt, and S.P. Maran, New Horizon of Astronomy, W.H. Freeman and Co. 1972.

www.bjilibrary.com

٣٠- وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا ۝

৭৯ ঃ ৩০ এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন।

এ বিষয়টি ২ ঃ ২২ এবং ১৩ ঃ ৩ আয়াতদ্বয়ের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

٣١- اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰهَا ۝

৭৯ ঃ ৩১ তিনি তা থেকে বহির্গত করেছেন এর পানি ও তৃণ।

মাটি থেকে পানি কিংবা আর্দ্রতা বের করে আনা এবং চারণভূমি তৈরি করা– এ দু'টো পরস্পর পরস্পরের সাথে সংযুক্ত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। উপরোক্ত আয়াতে উল্লিখিত ঘটনা দু'টি স্পষ্টতই পানি চক্রের প্রতি ইঙ্গিত করে। ভূ-গর্ভে পানি সঞ্চিত হওয়া, উদ্ভিদ কর্তৃক মূল দ্বারা বিশেষ প্রক্রিয়ায় তা বিশোষণ এবং নির্গমন আর্দ্রতার মাধ্যমে পুনরায় বায়ুমণ্ডলে চলে আসা– এ বিষয়টি২ ঃ ২২ এবং ২৫ ঃ ৫০ আয়াতদ্বয়ের আলোচনায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উত্তর আমেরিকার বৃক্ষহীন তৃণভূমির কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়। এটি একটি বিশাল তৃণভূমি। যেখানে হাজার হাজার জীবন্ত গবাদি পশু চরে বেড়ায়।

٣٢- وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا ۝

৭৯ ঃ ৩২ এবং পর্বতকে তিনি প্রোথিত করেছেন দৃঢ়ভাবে।

বিষয়টি ১৩ ঃ ৩ এবং ২১ ঃ ৩১ আয়াতদ্বয়ের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

٣٣- مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ۝

৭৯ ঃ ৩৩ এসব কিছু তোমাদের আর তোমাদের গবাদিপশুর ভোগের জন্য।

অত্র আয়াতটি ৭৯ ঃ ৩১ আয়াতের সাথে সংযুক্ত যাতে মাটি থেকে আর্দ্রতা এবং চারণভূমি উৎপাদনের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। যে বিষয়টি ঐ আয়াতের প্রসঙ্গে ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে।

মাটি থেকে আর্দ্রতা উৎপাদন করার অর্থ হ্রদের আকারে পানির উপস্থিতি। সবুজ গাছপালা-তরুলতা এবং চারণভূমির আকারে যে সকল সংশ্লিষ্ট উপকার পাওয়া যায় তা ২ ঃ ১৬৪ আয়াতের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

١٨- مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۝

١٩- مِنْ نُّطْفَةٍ ؕ

٢٠- ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ۝

৮০ ঃ ১৮-২০ তিনি একে কোন্ বস্তু হতে সৃষ্টি করেছেন ? শুক্রবিন্দু হতে; তিনি একে প্রথমে সৃষ্টি করেন এবং পরে পরিমিত বিকাশ সাধন করেন। অতঃপর এর জন্য সহজ করে দেন।

শুক্রাণু থেকে সৃষ্টি এবং সঠিক অনুপাতে গঠনাকৃতি প্রদান

মাতৃ উদরে ধাপে ধাপে মানব ভ্রূণের সৃষ্টির বিষয়টি ২৩ ঃ ১৩-১৪ আয়াতদ্বয় প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সঠিক অনুপাতে ক্রমবর্ধমান মানব ভ্রূণের বিষয়টি ৬৪ ঃ ৩ আয়াত প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

তার জন্যে পথ সুগম করা

শক্তভাবে আটকানো জরায়ু মুখ (cervix uteri) এবং স্বাভাবিকভাবে সংকীর্ণ প্রসবদ্বার যার দু'টোই হাড় পূর্ণ শ্রোণীর শক্ত বলয় দ্বারা পরিবেষ্টিত– এ রকম একটা পথে মানব শিশুর জন্ম আপাত দৃষ্টিতে এক অসম্ভব কর্ম। নিম্নবর্ণিত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ভিত্তিতে আমরা অত্র আয়াতের গভীর অর্থ খুঁজে পেতে পারি।

প্রসব তিনটি ধাপে গঠিত

১. প্রথম ধাপ চলাকালে, ডিম্বাশয় এবং আমরা যা গর্ভফুল থেকে রিলাক্সিন এক প্রকার হরমোন নিঃসৃত হয় যার কারণে শ্রোণী সন্ধি বন্ধনীগুলো আলগা হয়ে যায় এবং সারভিক্স ইউটেরি তথা জরায়ু নরম হয়ে থাকে। তার পরেই ঘটে থাকে জরায়ুর সংকোচন। জরায়ুর উপরের অংশে এটি শুরু হয়। এ অংশে থাকে সক্রিয় সংকোচন পেশীকলা যা জরায়ুর সংকীর্ণ নিষ্ক্রিয় নিম্নাংশের মধ্য দিয়ে শিশুকে ঠেলা দিতে থাকে। একই সঙ্গে প্রতিটি জরায়ু সংকোচন ক্রিয়ার পাশাপাশি শিশুর চারদিক ঘিরে থাকা ঝিল্লির ভিতর দিয়ে এক ধরনের জলীয় পদার্থ (এমনিওটিক ফ্লুইড) পানির ব্যাগের মত জরায়ুর মুখ পর্যন্ত চলাচল করে এবং শিশুর বেড়ে ওঠা ত্বরান্বিত করে। পরিশেষে, এই থলেটি ফেটে গেলে ঝিল্লিটি শিশুর বয়ে চলার জন্য একটা নরম ও পিছল তল বা জরায়ুপথ তৈরি করে।[১]

www.bjilibrary.com

২. প্রসবের ২য় ধাপে শিশুর মানস ও অবস্থানে কিছু ধারাবাহিক পরিবর্তন ঘটে যা অনিয়মিত আকারের অস্থিযুক্ত ছিদ্রের ভিতর দিয়ে শিশুর অতিক্রমণকে সহজ করে তোলে। স্বাভাবিক প্রসবে, শিশুর মাথা প্রথমে বের হয়ে আসে, তারপর আসে দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। সাধারণত মাতা নিজেও মধ্যচ্ছদা ও উদর পেশীতে স্বেচ্ছাকৃত চাপ প্রয়োগ করে থাকে গড়পড়তা শিশুর মাথার আকার ঠিক পেলভিস বা যে অস্থিপথে শিশু অতিক্রমণ করে তাতে যতটুকু ফাঁক থাকে তার সমান তার বেশী নয়। কাজেই, প্রসবকালে মাথা চাপে সংকুচিত থাকে এবং এটা সম্ভব হয় এ কারণে যে, এ সময় মাথার হাড় নরম থাকে এবং হাড়ের মাঝে থাকে 'ফন্টানেলি' (fontanelles) নামক এক ধরনের আঁশজাতীয় ফাঁকা স্থান যা জন্মকালে মাথার করোটিকে আকৃতি পরিবর্তনে সক্ষম করে তোলে। এগুলোই হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ ব্যবস্থা যা প্রসবকালে শিশু ও তার মাতার পক্ষে ন্যূনতম ক্ষতির দ্বারা শিশুর মাথাকে অতিক্রমণে সাহায্য করে।

৩. প্রসবের ৩য় ধাপ হচ্ছে গর্ভফুলের বহিরাগমন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আধ ঘন্টার মধ্যেই গর্ভফুলের বহিরাগমন সম্পন্ন হয়ে থাকে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. K.L. Moore, and A.A. Azzindani, The Developing Human., 3rd edn., W.B. Saunders Company, Philadelphia, p. 120 a. 1983.

www.bjilibrary.com

٢٦- ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۝

٢٧- فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۝

٢٨- وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ۝

٢٩- وَّزَيْتُونًا وَّنَخْلًا ۝

٣٠- وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ۝

٣١- وَّفَاكِهَةً وَّأَبًّا ۝

٣٢- مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝

৮০ ঃ ২৬-৩২ অতঃপর আমি ভূমি প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত করি; এবং তাতে আমি উৎপন্ন করি শস্য; দ্রাক্ষা, শাকসব্জি; যয়তুন, খর্জুর। বহু বৃক্ষ বিশিষ্ট উদ্যান, ফল এবং গবাদির খাদ্য এসব কিছু তোমাদের আর তোমাদের গবাদি পশুর ভোগের জন্য।

আমরা পৃথিবীকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করেছি

ভূ-পৃষ্ঠের টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া সংঘটিত হয়ে থাকে অংশত বৃষ্টির ফোঁটা এবং অংশত ভূ-ত্বকের দ্বারা কিংবা তার নিকটস্থ খনিজ দ্রব্যাদি অথবা শিলার ভৌত সংযুক্তি ও রাসায়নিক বিভক্তি এর সাথে জড়িত থাকে। পানি ও বায়ু প্রবাহ কখনও কখনও এ সব খণ্ডকে বেশ দূরে নিয়ে যায় এবং এগুলোকে এমনকি ভেঙ্গে আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে পরিণত করে। পানি কণাসমূহের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং দ্রবণীয় খনিজ পদার্থসমূহ পানিতে দ্রবীভূত হয়। এই মৃত্তিকা পানি মূলত মৃত্তিকা কণার উপরিতলে একটা ঝিল্লি হিসেবে বর্তমান থাকে এবং এই ধাপেই পানি উদ্ভিদের মূলরোম দ্বারা শোষিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে।

আর তা থেকে উৎপাদন করেন শস্যাদি

বৃষ্টির সুফলদায়ক প্রভাবে শস্যাদির উৎপাদিত হওয়া এবং ধূলির ধরার পুনরুজ্জীবিত হওয়ার বিষয়টি ২ ঃ ১৬০ আয়াতের প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আর আঙ্গুর ও সবুজ তৃণলতা এবং জয়তুন ও খেজুর

বৃষ্টি এবং এর আনুষঙ্গিক সুফলদায়ক প্রভাবে আঙ্গুর, সবুজ প্রকৃতি, জয়তুন, খেজুর ইত্যাদি উৎপাদনের বিষয়টি ২ ঃ ২২ এবং ৬ ঃ ৯৯ আয়াতদ্বয়ের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

আর পুরু বৃক্ষপত্রবিশিষ্ট বেড়া দেওয়া বাগান এবং ফলাদি ও পশু খাদ্য তোমাদের ও তোমাদের গবাদি পশুর আহারাদি

www.bjilibrary.com

মানুষ ও গবাদি পশুর আহার্য হিসেবে ফলবাগান, সবুজ প্রকৃতি ইত্যাদির বেড়ে উঠা সম্পর্কিত আলোচনার জন্য ২ ঃ ১৬৪ আয়াত প্রসঙ্গের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

١- إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝

٢- وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝

٣- وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝

কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ
খুলনা-৯২০৩
প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

৮১ ঃ ১-৩ সূর্য যখন নিষ্প্রভ হবে।
যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে।
পর্বতমালাকে যখন চলমান করা হবে।

উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলো ৫৬ ঃ ৫ এবং ৭৭ ঃ ৮ আয়াতদ্বয়ের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

٦- وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝

৮১ ঃ ৬ সমুদ্র যখন স্ফীত হবে।

আমরা জানি, সূর্যের কেন্দ্রে আণবিক বিক্রিয়া ঘটে এবং হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়। যতই বেশী বেশী হাইড্রোজেন রূপান্তরিত হতে থাকবে, তত বেশী হিলিয়াম সৃষ্টি হবে। কম্পিউটার প্রদত্ত হিসেব অনুযায়ী পরবর্তী ৫শ কোটি বছরে তেমন বড় কোন পরিবর্তন ঘটবে না।[১] সূর্য তার ক্রম বিকাশের ধারায় ধীরে ধীরে অধিকতর উজ্জ্বলতা ধারণ করবে এবং বহির্ভাগ কিছুটা বেশী উত্তপ্ত হবে। ৬শ কোটি বছরে সূর্য বেড়ে বর্তমানের চেয়ে আকাশের দ্বিগুণ হবে। সূর্য কেন্দ্রস্থ হাইড্রোজেন ব্যবহৃত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং কেন্দ্রাঞ্চলে এক হিলিয়ামকেন্দ্র সৃষ্টি হবে। সব হাইড্রোজেন নিঃশেষ হওয়ায় সূর্য কেন্দ্র আণবিক প্রজ্জ্বলন ঘটাতে পারবে না এবং হিলিয়ামের একীভবনের পক্ষে সেখানকার তাপমাত্রাও থাকবে অত্যন্ত কম। সময়ের সাথে সাথে সূর্য কেন্দ্রস্থ হিলিয়াম কেন্দ্র বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এটি বুধ ও শুক্রের পরিক্রমণ পথ গ্রাস করবে এবং পৃথিবীর পরিক্রমণের পথের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়বে। বিশাল দৈত্যাকার সূর্য আকাশের প্রায় অর্ধাংশ জুড়ে পরিব্যাপ্ত হবে এবং পৃথিবীকে আলো ও তাপ দিতে থাকবে কিন্তু পৃথিবী থাকবে প্রাণহীন। তখন পৃথিবীর সাগর-মহাসাগরগুলো তাপে ফুটতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত স্ফীত হবে ও বাষ্পাকারে উঠে যাবে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Rudolf Kippenhan, 100 Billion Suns, published by Counterpoint, London, Unwin Paperbacks, 1983.

١٥- فَلَآ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۝

١٦- الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝

৮১ ঃ ১৫-১৬ আমি শপথ করি পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্রের, যা প্রত্যাগমন করে অথবা অদৃশ্য হয়।

গ্রহসমূহ আকাশে অস্থির গতিতে চলাফেরা করে বলে মনে হয়। কখনও কখনও একটি গ্রহ, বিশেষত কোন বৃহত্তর গ্রহ (সূর্যের চারদিকে যার পরিক্রমণ পথ পৃথিবীর পরিক্রমণ পথ থেকে অধিকতর দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত), পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে চলছে বলে মনে হয়। এই গতিকে প্রত্যক্ষ গতি বলা হয়। অন্য সময়ে, গ্রহটিকে পশ্চাৎ কিংবা বিপরীত গতিতে তথা পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলছে বলে মনে হয়।

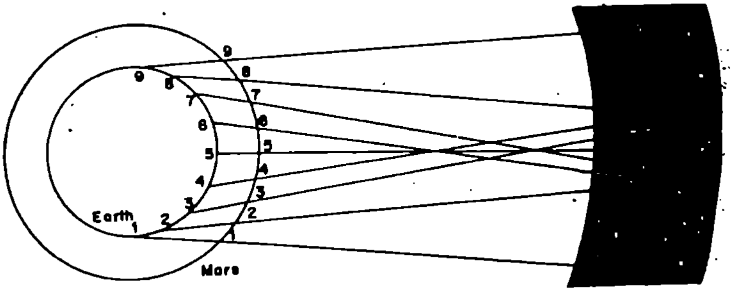

চিত্র-১৪ ঃ মঙ্গল গ্রহের বিপরীত গতি। গ্রহটির আকাশে দৃশ্যত প্রতীয়মান চলার পথ ডানদিকে দেখান হয়েছে এবং আধুনিক ব্যাখ্যা বাম দিকে দেয়া হল। নয় বারের মধ্যে প্রতিবারের জন্য পৃথিবী থেকে মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি পথ আঁকা হয়েছে যাতে তারকারাজির বিপরীতে মঙ্গলের আপাত অবস্থান দেখানো যায় (স্ট্রাকচার এণ্ড চেঞ্জ থেকে, লেখক জি এস ক্রিস্টিয়ানসেন এবং পি, এইচ গ্যারেট, ডব্লিউ এইচ সন্ডার্স এণ্ড কোং, ১৯৮০)।

www.bjilibrary.com

আবার অন্য কোন সময়ে এটি স্থির বা গতিবেগহীন অবস্থায় থাকে। কখনও বা এটি অন্য আরেকটি গ্রহ দ্বারা ঢাকাও পড়ে যায়। এটিই অকলাটেশন বা গুপ্তাবস্থা নামে পরিচিত। পৃথিবীর তুলনায় গ্রহগুলোর আপেক্ষিক গতির কারণে এ সকল ঘটনা প্রাকৃতিকভাবেই ঘটে থাকে। গ্রহের গতি বিষয়ক কেপ্‌লারের ২য় সূত্রানুযায়ী সূর্যের নিকটতর কোন গ্রহের গতিবেগ সূর্য থেকে দূরবর্তী অবস্থানে অবস্থিত গ্রহের তুলনায় অধিক। যেহেতু বৃহত্তর কোন গ্রহ পৃথিবীর তুলনায় সূর্য থেকে অধিক দূরত্বে অবস্থিত, সূর্যের চারদিকে এর গতিও কখনও পৃথিবী এগিয়ে থাকে এবং কখনও বা অন্য গ্রহটি এগিয়ে থাকে। যখন গ্রহটি এগিয়ে থাকে, পৃথিবী তার উচ্চতর গতির দ্বারা বৃহত্তর গ্রহটিকে ধরার চেষ্টা করে। যেটি তুলনামূলকভাবে স্বল্প গতিতে সামনে চলেছে। তাদের মধ্যকার দূরত্ব কমতে থাকে। তবুও বৃহত্তর গ্রহটি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে সরাসরি গতিতে পৃথিবী অপেক্ষা আগে আগে চলতে থাকে। এক পর্যায়ে পৃথিবী এবং গ্রহটি উভয়ই সূর্যের সাথে একই রেখা বরাবর চলে আসে। এ পর্যায়ে গ্রহটিকে গতিহীন ও স্থির বলে মনে হয়। এ রকম ক্ষেত্রে গ্রহটি বিপরীতে আছে বলে বলা হয়। এ অবস্থানের পর পৃথিবী ঐ গ্রহটিকে ছাড়িয়ে আগে চলে যায়। তখন তাদের মধ্যকার দূরত্ব বিপরীত দিকে তথা পূর্ব থেকে পশ্চিমে বেড়ে যাওয়া শুরু করে। গ্রহটিকে তখন মনে হয় পিছন দিকে চলে যাচ্ছে অর্থাৎ পিছু হটছে এবং এ অবস্থায় বলা হয়ে থাকে যে গ্রহটি বিপরীত গতিতে যাচ্ছে। কখনওবা দু'টি গ্রহ একই দৃষ্টিপথে চলে আসে এবং এভাবে একটি গ্রহ অপরটি দ্বারা ঢাকা পড়ে যায়। এ ঘটনাটিই গুপ্ত বা আড়াল অবস্থা হিসেবে পরিচিত।

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ গ্রহসমূহের গতির কারণে সৃষ্ট এ সকল প্রাকৃতিক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

١٧- وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۝

١٨- وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝

৮১ ঃ ১৭-১৮ শপথ নিশার যখন তার অবসান ঘটে,
আর ঊষার যখন তার আবির্ভাব ঘটে।

সূর্যাস্তের মধ্য দিয়ে রাতের শুরু আর সূর্যোদয়ের মধ্য দিয়ে রাতের সমাপ্তি। তবে, গোধূলির আবির্ভাবের সাথে সাথে রাতের অন্ধকার বিদায় নিতে থাকে। সূর্য দিগন্তের নিচে ১৮°-এর মধ্যে এসে পড়লে গোধূলি দেখা দেয়।

গোধূলি বিষয়টি ২ ঃ ১৮৭ আয়াতের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

١- إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝

৮২ ঃ ১ আকাশ যখন হবে দীর্ণ বিদীর্ণ

বিষয়টি ২৫ ঃ ২৫ আয়াতের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

٢- وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝

٣- وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝

৮২ ঃ ২-৩ যখন নক্ষত্ররাজি ঝরে পড়বে বিক্ষিপ্তভাবে। আর সমুদ্র যখন হবে উদ্বেলিত।

আমরা জানি, মহাবিশ্বের দু'টি বল ক্রিয়াশীল ঃ বিকিরণ চাপ হেতু সম্প্রসারণ বল এবং অভিকর্ষ বল। প্রথম বলটির কারণে ছায়াপথপুঞ্জ পরস্পরের নিকট থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বলটির কারণে ছায়াপথপুঞ্জ পরস্পরের প্রতি আকর্ষিত হচ্ছে। এ হচ্ছে সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের গতিবেগ আর দীর্ঘপাল্লা অভিকর্ষ বলের মধ্যকার তীব্র লড়াই। সম্প্রসারণ গতি যদি জয়ী হয় তাহলে মহাবিশ্ব অনন্তকাল ধরে সম্প্রসারিত হতেই থাকবে। কিন্তু অভিকর্ষ জয়ী হলে আকর্ষণ বল দ্রুত ধাবমান ছায়াপথপুঞ্জের গতি ধীর করে দেবে এবং এগুলোকে একেবারে গতিহীন স্থির অবস্থানে নিয়ে আসবে। তারপরও মহাকর্ষ তাদের সকলকে একত্রিত করতে থাকবে। মহাবিশ্ব এর সমগ্র বস্তু নিয়ে প্রচণ্ড একটা কেন্দ্রাতিগ সংকোচণ গতি না আসা পর্যন্ত সংকুচিত হতে থাকবে। সম্ভাব্য এই অগ্নি অন্তঃপাতকে 'মহাচূর্ণন' বলা হয়ে থাকে।

আজকের দিনের বিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, এই মহাবিপর্যয়কর ঘটনার ক্ষণ-গণনার জন্য একটা সময়সূচিও হিসেব করে বের করা যেতে পারে।[১] মহাচূর্ণনের একশ কোটি বছর পূর্বে ছায়াপথ গুচ্ছ তাদের মধ্যকার শূন্যস্থান পূর্ণ করে ফেলবে এবং একত্রে মিশে যাবে। সমগ্র মহাবিশ্ব আমাদের ছায়াপথে যে রকম ফাঁকা স্থান রেখে নক্ষত্রসমূহ ছড়িয়ে আছে মোটামুটিভাবে সে রকমভাবে ছড়িয়ে থাকা তারকারাজিতে পূর্ণ হবে। মহাচূর্ণনের দশ কোটি বছর আগে এক সময় তারকাসমূহ এত কাছাকাছি হবে যে, আকাশ শুধু যে চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল হবে তা নয়, বরং হবে তাপ দগ্ধ পীড়িত উত্তপ্ত এবং সেই সমূহ তাপে ফুটে বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. **Nigel Henbest and Heater Couper, Restless Universe, George Philip, London, 1982.**

www.bjilibrary.com

٧- الَّذِىْ خَلَقَكَ
فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ۙ

٨- فِىْٓ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۙ

৮২ ঃ ৭-৮ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাকে সুঠাম ও সুসমঞ্জস করেছেন।

যে আকৃতিতে তিনি চেয়েছেন তিনি তোমাকে গঠন করেছেন।

মানব সৃষ্টি ও তার আকার-আকৃতি দান বিষয়টি ১৩ ঃ ৮ এবং ২৩ ঃ ১২-১৫ আয়াতসমূহ এবং পরিশিষ্ট- ৫এ-ও আলোচিত হয়েছে। যথাযথ মাপ ও অনুপাত সম্পর্কে উল্লেখ করা যায় যে, বিভিন্ন অংশ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমাপ ও আকার সাধারণভাবে এত পূর্ণাঙ্গ যে, এর উপর কোন উন্নতি সাধন করা যেতে পারে না। মাথা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ, আঙ্গুল ইত্যাদির উচ্চতা, আকার তাদের যথাযথভাবে কার্য সম্পাদনের উপযোগী সঠিক মাপে রয়েছে। প্রতিটি জিনিস যথাযথ অনুপাতে সৃষ্টির বিষয়টি ২৫ ঃ ২ আয়াতের প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

١- اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۙ

৮৪ ঃ ১ যখন আকাশ দীর্ণ-বিদীর্ণ হবে।

বিষয়টি ২৫ ঃ ২৫ আয়াতের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

٣- وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۙ

৮৪ ঃ ৩ এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে।

এ দিকটি ১৩ ঃ ৩ আয়াতের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

আয়াতে যে সময়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে, তখন সূর্য পৃথিবীর অতি নিকটে চলে আসবে এবং পৃথিবী ও এর অভ্যন্তরভাগের তাপমাত্রা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যাবে; ম্যাগমার চটচটে আঠালো বৈশিষ্ট্য কমে যাবে যে কারণে ফলকসমূহ (মহাদেশীয় প্লেইট ইত্যাদি) অধিকতর প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত হবে এবং এভাবেই বিভিন্ন ফলক বহির্মুখে ছড়িয়ে ছিটকে পড়বে।

www.bjilibrary.com

١٦- فَلَآ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ○

৮৪ ঃ ১৬ আমি শপথ করি অস্তরাগের।

সূর্য থেকে আসা দৃশ্যমান আলোতে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর ভিত্তি করে সাতটি রং থাকে। উনিশ শতকে লর্ড র‍্যালে আবিষ্কার করেন যে বায়ুমণ্ডলস্থ ধূলিকণা এবং বিভিন্ন গ্যাস ভিন্ন ভিন্নভাবে আলো ছড়ায়। ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অর্থাৎ নীল রং ছড়ায় সর্বাধিক, আর দীর্ঘতর তরঙ্গসমূহ তথা লাল রং ছড়ায় সবচেয়ে কম। সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়কালে সূর্যরশ্মিকে দীর্ঘতম বায়ু পথ অতিক্রম করতে হয় যখন ক্ষুদ্রতম তরঙ্গসমূহ ছড়ায় সর্বাধিক যে কারণে আমাদের নিকট যেসকল রশ্মি পৌঁছে যায় সেগুলোতে লাল রং-এর প্রাধান্য থাকে। এ কারণেই সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়কালে দিগন্ত লাল দেখায়।

١٨- وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ○

৮৪ ঃ ১৮ এবং শপথ চন্দ্রের যখন সে পূর্ণতা লাভ করে।

আলোচ্য আয়াতে চাঁদের পূর্ণিমা স্তরের কথা বলা হয়েছে। চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ যা সূর্যের আলো প্রতিফলনের কারণে দৃশ্যমান হয়। এটি পৃথিবীর চারদিকে একবার প্রদক্ষিণ পূর্ণ করে ২৭.৩২২ দিনে। পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের গতি সমলয়পূর্ণ। অর্থাৎ চাঁদের নিজ অক্ষের চারদিকে কৌণিক গতি এর পৃথিবীর চারদিকের গতির সমান। ফলে, এটি সবসময় পৃথিবীর দিকে একই পাশ বজায় রাখে। চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে নিজ কক্ষপথে চলাকালীন সময়ে সূর্য এর পৃষ্ঠের অর্ধাংশ বিভিন্ন অবস্থানে আলোকিত করে এবং আমরা চাঁদের আলোকিত বিভিন্ন অংশ দেখতে পাই। আলোকিত দৃশ্যমান অংশের আকারকে চাঁদের কলা বলা হয়। চাঁদ যখন পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকে, তখন চন্দ্র পৃষ্ঠের যে অংশ আমাদের দিকে মুখ করে থাকে সে অংশ থাকে আলোকিত এবং তখন আমরা চাঁদকে মোটেই দেখতে পাই না। এটাই হচ্ছে গ্রহণ এবং এ কলাটি হচ্ছে নতুন চাঁদ। চাঁদ যতই তার কক্ষপথে এগিয়ে যায় ততই এর একটা সরু আলোকিত অংশ দৃশ্যমান হয় এবং আমরা আকাশে বাঁকা চাঁদ দেখতে পাই। প্রতিটি পরবর্তী রাতে আলোকিত অংশের অধিকতর ভাগ আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় এবং চন্দ্রকলা অবিরাম পরিবর্তিত হতে থাকে যতক্ষণ না চাঁদ বিপরীতে চলে যায়। অর্থাৎ এটি সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকে। এটি পূর্ণিমা নামে পরিচিত। এ অবস্থানকে চাঁদের আলোকিত অর্ধাংশের পুরোটাই পৃথিবী থেকে দেখা যায় এবং চাঁদ থাকে তার পরিপূর্ণতায়। এই পূর্ণিমা

www.bjilibrary.com

কলা চলাকালে চাঁদের প্রতীয়মান উজ্জ্বলতার ব্যাপকতার পরিমাণ থাকে ১২.৭ এবং পৃথিবীর চাঁদের এই পূর্ণিমা কলাই সর্বাধিক চন্দ্রালোক লাভ করে থাকে।

১৯- لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۝

৮৪ ঃ ১৯ তোমাদিগকে অবশ্যই স্তরে স্তরে এক অবস্থা থেকে অবস্থান্তরের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

এখানে আল্লাহ্ মানুষের জীবনের বিভিন্ন স্তরের কথা বলছেন যা পার হতেই হয়। জীবনের শুরু হয়েছে মাতৃগর্ভে ভ্রূণের আকারে প্রথমে 'নুৎফা,' পরে 'আলাকা,' পরে 'মুদগাহ,' এযাম' লাহাস, স্তর হয়ে পরিপূর্ণ মানব শিশুরূপে জন্মগ্রহণ। জন্মের পর শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য ইত্যাদি স্তর পার হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে। তবে কেউ কেউ কিন্তু সব স্তর পার হবার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে থাকে।

মৃত্যুর পরের অবস্থা সম্পর্কে বর্তমান বিজ্ঞানের কোন ধারণা নেই। শৈশব থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত মানুষ বিদ্যা শিক্ষা করে এবং জীবন ধারণের জন্য কোন কাজ বা পেশা সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে যেন প্রয়োজনীয় আয় উপার্জন করে জীবন যাপন করতে পারে। প্রাপ্ত বয়স্ক হতে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত মানুষ দুনিয়াবী কাজ কর্ম, সামাজিক কর্মকান্ড, বিবাহ, সন্তান উৎপাদন, সন্তান প্রতিপালন ও তাদেরকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান ইত্যাদিতে সময় কাটাতে হয়। তারপর মৃত্যু এসে ইহজীবনের ইতি টানে যদিও মৃত্যু যে কোন সময়ই আসতে পারে এবং তা একমাত্র আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণাধীন।

১- وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝

৮৫ ঃ ১ শপথ সুদৃঢ় দুর্গময় আকাশের রাশিমণ্ডলীর।

এ বিষয়ে ১৫ ঃ ১৬ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

৯- الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

৮৫ ঃ ৯ যিনি আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীর একমাত্র মালিক আর সেই মহান আল্লাহ্ সবকিছু দেখছেন।

এই বিষয়ে ৫ ঃ ১৯ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

ا-وَالسَّمَاۤءِ وَالطَّارِقِ ۝

٢-وَمَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ۝

٣-النَّجۡمُ الثَّاقِبُ ۝

৮৬ ঃ ১-৩ শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে যা আভির্ভূত হয় তার।

তুমি কি জান রাত্রিতে যা আবির্ভূত হয় তা কী ?

তা উজ্জ্বল নক্ষত্র ?

সূর্য, গ্রহসমূহ, চাঁদসহ উপগ্রহসমূহ, তারকামণ্ডলী, ছায়াপথস্থ উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি এবং নীহারিকা দ্বারা স্বর্গীয় বস্তুর সৃষ্টি হয়। দিনের আলোতে আমরা কেবল সূর্যকে দেখতে পারি এবং সূর্যের ঝলমলে আলোর কারণে অন্য কোন বস্তু দেখতে পারি না। রাতে সূর্যের অনুপস্থিতিতে আকাশমণ্ডলীর অন্যান্য বস্তু দেখা যায়। এ আয়াতে উল্লিখিত রাতে আবির্ভূত হয় একটি তীব্র উজ্জ্বলতা বিশিষ্ট স্বর্গীয় বস্তু। রাতের আকাশে চাঁদ সবচেয়ে উজ্জ্বলতম বস্তু। কিন্তু এর উজ্জ্বলতা কোমল ও ঠাণ্ডা এবং রাতের আকাশে দৃষ্টিদানকারীর জন্য তীব্র নয়। অন্যান্য গ্রহের মতো শুক্র সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে জল জল করে। পৃথিবী থেকে রাতে দেখলে এটি অন্য গ্রহ বা তারা অপেক্ষা উজ্জলতর মনে হয়, কারণ এটি পৃথিবীর নিকটতর এবং এটি পুরু প্রতিফলিত মেঘ দ্বারা আবৃত থাকে। পূর্ণিমায় চাঁদের উজ্জ্বলতার বিস্তার থাকে ১২.৭। উজ্জলতার দিক থেকে পরবর্তী গ্রহ হলো শুক্র। এর সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতার বিস্তার ৪.৪। এর উজ্জ্বলতা অবশ্যই তীব্র। কখনো কখনো এর উজ্জ্বলতা দেখে মনে হয় যেন আকাশে একটি টর্চ ঝুলে আছে। কখনো কখনো শুক্র গ্রহ এত বেশী উজ্জ্বল হয় যে তা ছায়া প্রদান করে এবং এমনকি দিনের বেলায়ও দেখা যায়।

শুক্র একটি নিম্নস্তর গ্রহ (অর্থাৎ এর কক্ষপথ পৃথিবীর কক্ষপথের মধ্যেই থাকে)। সুতরাং এটা চাঁদের মত বিভিন্ন পর্যায় প্রদর্শন করে এবং সব সময় সূর্যের খুব নিকটে অবস্থান করে। এটা যখন সকালে দেখা যায় তখন একে সকালের তারা বলে, অথবা সন্ধ্যা হলে সন্ধ্যা তারা বলে। এর সবচেয়ে বড় কৌণিক দূরত্ব (সূর্য হতে কৌণিক দূরত্ব) হলো ৪৭° ডিগ্রী। নিম্নস্তর গ্রহসম্মিলন (যখন গ্রহ পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে অবস্থান করে) ৭২ দিনে হয়, যা ৫৮৪ দিনে অন্তর অন্তর সংঘটিত হয়। যখন কৌণিক দূরত্ব ৩৯° ডিগ্রী হয় তখন শুক্র সবচেয়ে উজ্জ্বলতম হয়। এটা নিম্নস্তর গ্রহসম্মিলনের ৩৬ দিন পূর্বে বা পরে ঘটে থাকে। সূর্যের চারদিকে এটা ২২৫ দিনে সম্পূর্ণ ঘূর্ণন সমাপ্ত করে থাকে। এর ঘূর্ণনের দিক পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের (ইউরেনাস ছাড়া) উল্টো। এর কক্ষপথে এটা ২৪৩ দিনে ঘূর্ণন সম্পূর্ণ করে থাকে। সুতরাং শুক্রের তিথির দিন ভেনুশিয়ান বছর অপেক্ষা বড়।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Encyclopaedia Americana, vol. 28, p. 11, 1979.

www.bjilibrary.com

৫. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ○

৬. خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ○

৭. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ○

৮৬ ঃ ৫-৭ মানুষ লক্ষ্য করুক যে সে কী বস্তু দিয়ে সৃষ্ট। সে এক প্রক্ষিপ্ত পানি থেকে সৃষ্ট যা পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষের অস্থিপিঞ্জরের মধ্যস্থল থেকে নির্গত হয়।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা নুৎফার বদলে প্রক্ষিপ্ত পানির উল্লেখ করেছেন যা সৃষ্ট হয়ে পৃষ্ঠ দেশ ও বক্ষপিঞ্জরের মধ্যবর্তী স্থান থেকে নির্গত হয়। আমরা জানি যে মানুষ প্রথমে শুক্রকীট ও ডিম্বের সংযোগে মাতৃগর্ভে ভ্রূণের আকারে সৃষ্ট হয়। পুরুষের বীর্যের সঙ্গে যে শুক্রকীট সজোরে প্রক্ষিপ্ত হয়, সেই প্রক্ষিপ্ত শুক্রকীট ডিম্ব ও রক্ত ও পেটের ভিতরকার তরল পদার্থে ভাসে যেমন শুক্রকীট বীর্যে ভাসমান থাকে। সুতরাং শুক্রকীট ও ডিম্ব দুইই প্রক্ষিপ্ত তরল পদার্থে থাকে যা এই আয়াতে বলা হয়েছে প্রক্ষিপ্ত পানি।

এই দুটি তরল পদার্থ কুরআনের ভাষায় পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষ পিঞ্জরের মধ্যবর্তী স্থল অর্থাৎ পেটের ভিতর থেকে নির্গত হয়। শারীরবিদ্যা থেকে আমরা জানি যে পুরুষের শুক্র অন্ডকোষের ভিতর তৈরি হয়। পূর্ণত্ব প্রাপ্ত শুক্রকীটগুলো তখন দুটি নল দিয়ে পেটের ভিতর মূত্র থলির নিচে প্রষ্টেট গ্রন্থির পেছনে অবস্থিত দুটি থলিতে (seminal vesicles) জমা হয়। এই শুক্র থলির সঙ্গে নালির মাধ্যমে মূত্রনালির সরাসরি যোগ রয়েছে। আর নারীর ওভারি দুটিও তার তলপেটেই অবস্থিত। যখন শুক্র নির্গত হয়, অন্ডকোষ থেকে নয় বরং তলপেটের শুক্র থলি থেকে নির্গত হয়। ডিম্বও পরিস্ফুট হয়ে তলপেটেই পড়ে।

অন্ডকোষ ও ওভারিদ্বয় পেটের ভিতরে আরো উপরে মেরুদন্ডের ১০নং হাড়ের দু'পাশে প্রথম তৈরি হয়। এদের স্নায়ু, রক্তের ধমনি ও শিরা পেটের ভিতরকার সেই উপরের এলাকা থেকেই সংযুক্ত হয় এবং যখন এগুলো তলপেটে নেমে আসে, তার সঙ্গে স্নায়ু ও ধমনিও লম্বা হয়ে ওভারির বেলায় নিচে তলপেটে নেমে আসে।

সুতরাং কুরআনে বর্ণিত শুক্রকীট ও ডিম্ব দুইই পেটের ভিতরে প্রক্ষিপ্ত হয় এ কথা বৈজ্ঞানিক সত্য। ১৪০০ বৎসর পূর্বে নিরক্ষর নবী (সা)-র মুখ থেকে আল্লাহ্র ওহীতে এ সব বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে তা নিশ্চয়ই কুরআন যে আল্লাহ্র কিতাব তারই প্রমাণ দেয়।

www.bjilibrary.com

۱۱- وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجۡعِ ۝

৮৬ ঃ ১১ শপথ আসমানের যা ধারণ করে আবর্তন।

পৃথিবীর আপন কক্ষে আবর্তনের কারণে, তার ওপরের মহাকাশের সব জ্যোতিষ্কমণ্ডলী একটি মেয়াদে আবর্তিত হয় ও ঐ নির্ধারিত সময়ের মেয়াদান্তে সকল মহিমা ও বিস্ময় নিয়ে তার মূল অবস্থানে ফিরে আসে বলে মনে হয়। পৃথিবীর আবর্তন মেয়াদ একটি দিবস (আহ্নিক গতি)। তাই একটি দিনের পর গোটা মহাকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী তার সাবেক অবস্থানে ফিরে আসে। প্রায় সকল জ্যোতিষ্কই কিছু মাত্রায় আবর্তন করে বলেই প্রতিভাত হয়। তাই অন্য সকল জ্যোতিষ্ক থেকে পরিদৃশ্যমান পৃথিবীর মতো মহাকাশের অন্য সকল জ্যোতিষ্কই তাদের মূল অবস্থানে ফিরে আসে বলে মনে হয়।

۱۲- وَالۡاَرۡضِ ذَاتِ الصَّدۡعِ ۝

৮৬ ঃ ১২ এবং শপথ জমিনের যা বিদীর্ণ হয়।

পৃথিবী প্রাকৃতিকভাবে তার অন্তর উন্মোচিত, প্রকাশিত রেখেছে–গিরিখাত, ক্যানিয়ন, ভূ-ফাটল ইত্যাদির মাধ্যমে নানাভাবে। সূরা রাদ-এর ৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর সকল ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে টেকটোনিক প্লেইটের সক্রিয়তার কারণে। টেকটোনিক স্তরগুলোর মধ্যে সংঘাত দেখা দিলে স্তরগুলো ধীরে ধীরে সরতে শুরু করে। এ ধরণের সঞ্চরণশীলতার গতি বছরে হয়ে থাকে ৫ থেকে ১০ সেন্টিমিটার হারে। বিশেষত অশ্মমণ্ডলীর স্তরের নিচে উষ্ণতার অবতলীয় গতি ও অভিকর্ষের কারণে এই সঞ্চরণ ঘটে। এ সব শক্তির সংঘাতজনিত ব্যাপক ধীরগতির সঞ্চরণের ফলে ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি ও পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হয়। যদি কোনো সামুদ্রিক ভারী শিলাস্তর বা প্লেইট কোন অধিকতর প্লবনশীল মহাদেশীয় শিলাস্তরের সাথে ধাক্কা খায়, তবে শেষোক্ত শিলাস্তর ভেতরের দিকে সরে যায়। আর এভাবে ভেতরে সরে আসার পর শিলাস্তরটি নিচের দিকে নামে, উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ও পরিশেষে গলে যায়। আর এভাবে অপেক্ষাকৃত কম ঘন গলিত শিলা ভূপৃষ্ঠ অভিমুখে ওপরে উঠতে থাকে এবং এক পর্যায়ে ভূপৃষ্ঠের কোন বিদীর্ণ স্থান বা ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসে যে স্থানটি আমাদের কাছে আগ্নেয়গিরি হিসেবে পরিচিত। টেকটোনিক প্লেইট বা স্তরগুলোতে এই যে সংঘাত অনুষ্ঠিত হয় তাকে ভূতাত্ত্বিক পরিভাষায় বলা হয় নিচের দিকে খাত বা নালিকা তৈরি। আর এ প্রক্রিয়ায় সমুদ্রতলে ও তার সংলগ্ন

www.bjilibrary.com

এলাকায় ১১ কিলোমিটার পর্যন্ত পরিখা তৈরি হ⁻⁻ পারে। আর এ থেকে তৈরি হতে পারে একটি বিদারণ মুখ। এভাবে সক্রিয় ⁻ ⁻বিস্ফোরণোন্মুখ আগ্নেয়গিরির একটি মেখলা তৈরি হতে পারে। আর সে কারণেই দেখা যায়, আগ্নেয়গিরিগুলো রেখার আকারে সাধারণত মহাদেশীয় উপকূলের সমান্তরালে বিন্যস্ত। এভাবেই বস্তুত সৃষ্টি হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ণ আগ্নেয় মেখলা। আটলান্টিক মহাসাগরেরও এ ধরনের আগ্নেয় মেখলা বা আগ্নেয়গিরির সমাবেশ রয়েছে যেগুলোর অবস্থান আইসল্যান্ড, অ্যাজোর্স দ্বীপপুঞ্জ ও ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে। আগ্নেয়গিরির আরও একটি রেখাকার বিন্যাস পরিলক্ষিত হয় ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে। আগ্নেয় সক্রিয়তা সাধারণত টেকটোনিক স্তর পরিসীমাগুলোতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকলেও এর ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা যায়। বিশেষভাবে আগ্নেয় সক্রিয় স্থানগুলোর নিচেই থাকে অচল, অচেনা ভূতল থেকে উত্থিত গলিত ম্যাগমার পালক সদৃশ প্রবাহ।

পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে ভূপৃষ্ঠের ছোট আকারের বিদারণ নানাভাবে পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। যেমন, উদ্ভিদের বীজ মৃত্তিকা ভেদ করে বেরিয়ে আসে অঙ্কুরিত হয়ে। প্রস্রবণ বেরিয়ে আসে শিলা, মৃত্তিকা ভেদ করে ঝরণার আকারে, পৃথিবীর কন্দর থেকে প্রবল বেগে পানিরাশির আকারে। ভূপৃষ্ঠের নিচে কোথাও কোথাও সঞ্চিত থাকে প্রাকৃতিক গ্যাস। সে সব জায়গাতে খনন করলে, এমনকি না করলেও অনেক সময় সেই গ্যাস শিলা বা মাটির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। সে সব জায়গাতে চলে গ্যাস ও তেলের মতো প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য অনুসন্ধান। ধরণী বিদীর্ণ হওয়ার আরও একটি দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয় চরম খরা, অনাবৃষ্টির সময়ে। তখন সূর্যের প্রচণ্ড খরতাপে মাটি ফেঠে চৌচির হয়ে যায়।

٢-الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۙ

৮৭ ঃ ২ যিনি সৃষ্টি করেন ও তারপর সৃষ্টির মাঝে শৃঙ্খলা ও আনুপাতিক সুষমতা দান করেন।

আলোচ্য আয়াতটির বিষয়ে আয়াত ২৫ ঃ ২-এর আওতায় ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

٣-وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۙ

৮৭ ঃ ৩ এবং যিনি নিয়মসূত্র নির্ধারণ ও পথ নির্দেশনা দান করেছেন।

আলোচ্য আয়াতটির বিষয়ে আয়াত ৫ ঃ ১৯ ও ৭ ঃ ৫৪, ১৮৫ এবং পরিশিষ্ট-৪ এর আওতায় আলোচিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

٤-تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۝
٥-تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۝

৮৭ ঃ ৪-৫ যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন আর তারপরে সেগুলোকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন।

আয়াত ২ ঃ ১৬৪-র আওতায় বৃষ্টিপাতের পর উদ্ভিদের বিকাশের বিষয়ে ব্যাখ্যা রয়েছে। উত্তর আমেরিকার বিশাল সমতল তৃণভূমিতে লাখো গবাদি পশুর চারণ কাজ চলে। আর এই তৃণভূমির তৃণরাজির ক্রমে এক সময়ে ধূসর আবর্জনায় রূপান্তরিত হওয়ার বিষয়টি আয়াত ৬৭ ঃ ২০-এর আওতায় আলোচিত হয়েছে।

١٧-اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝

৮৮ ঃ ১৭ তবে কি তারা দৃষ্টিপাত করে না উটের দিকে, কীভাবে জীবটিকে সৃষ্টি করা হয়েছে?

এই আয়াতের মাধ্যমে উট সম্পর্কে এক কৌতুহলোদ্দীপক বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা-অনুসন্ধানের অবতারণা করা হয়েছে। উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়। কিন্তু উটের মাঝে কী এমন অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার প্রতি এই আয়াতে প্রচ্ছন্ন ইশারা রয়েছে ? বাস্তবিকপক্ষে এ আয়াতের প্রকৃত সত্যের নির্যাসটি কী হতে পারে তা জানা গেছে অতি সম্প্রতি ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শকোয়নিক ও অধ্যাপক কান্ট শিটে নিয়েলসনের উট বিষয়ক গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে। তাঁদের এ গবেষণামূলক সমীক্ষায় জানা গেছে যে, উটের নাসারন্ধ্রে আর্দ্রতা বিশোষণের জন্য এক বিশেষ ঝিল্লী স্তর রয়েছে যা শ্বাসত্যাগকালে তার সাথে আর্দ্রতা বেরিয়ে যেতে দেয় না। আর কোন পশুর দেহে এ ধরনের ঝিল্লীর অস্তিত্ব কখনও লক্ষ্য করা যায়নি। উটের নাসারন্ধ্রে এ ধরণের ঝিল্লী থাকার কারণে, অন্যান্য পশুর শ্বাসত্যাগের সাথে সাথে অনিচ্ছাকৃতভাবে যে পরিমাণ আর্দ্রতা দেহ থেকে বেরিয়ে যায় তার ৬৮ শতাংশ রক্ষা করা সম্ভব হয়।

গবেষকরা উটের নাসিকার ব্যবচ্ছেদ করে দেখেছেন সেখানে ১০০০ বর্গ সেন্টিমিটার (৪০০ বর্গ ইঞ্চি) পরিমিত জায়গা জুড়ে একাভিমুখী এক ঝিল্লীর অস্তিত্ব রয়েছে। মানুষের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর আয়তন মাত্র ১২ বর্গ সেন্টিমিটার (৪.৮ বর্গ ইঞ্চি)।

www.bjilibrary.com

উটের কুঁজে রয়েছে চর্বির সঞ্চয় যা মরুতে খাদ্যাভাবের সময় তাকে বাঁচিয়ে রাখে। কেননা চর্বি হলো খাদ্যের সঞ্চয় বিশেষ। মানবদেহের সর্বত্র চর্বি বা স্নেহজাতীয় দ্রব্য ছড়িয়ে থাকে অনেকটা ওভারকোট যেমন প্রায় গোটা শরীর ঢেকে রাখে তেমনি। চর্বির কাজও বস্তুত ওভারকোটের মতই। কিন্তু উটের চর্বি জমা থাকে একটি জায়গায়। ফলে এই প্রাণীটি ঐ চর্বি মরুভূমির প্রবল তাপমাত্রা থেকে তাকে বর্মের মত রক্ষা করার ভূমিকা পালন করে।

অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় এই যে, ১৪০০ বছরের বেশি সময় আগে আল্লাহ্ উটের দেহ গঠনের বিষয়ে যা প্রকাশ করেছেন তার সত্যতা মাত্র সম্প্রতি উটের ওপর বিশদ বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. The Encyclopaedia Americana, Vol. 5. Americana Corp. Connecticut, pp. 261-263, 1979.

www.bjilibrary.com

١٨- وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝

৮৮ ঃ ১৮ এবং আকাশের দিকে দেখুন, কিভাবে একে উর্দ্ধে স্থাপন করা হয়েছে ?

বিষয়টি ১৩ ঃ ২ আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

١٩- وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝

৮৮ ঃ ১৯ এবং পর্বতমালার দিকে দেখুন, কিভাবে একে স্থাপন করা হয়েছে?

বিষয়টি ১৩ ঃ ৩ আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

٢٠- وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝

৮৮ ঃ ২০ এবং ভূতলের দিকে, কীভাবে একে সমতল করা হয়েছে।

বিশ্ব চরাচরের এভাবে বিস্তৃত হয়ে পড়ার বিষয়টি ২ ঃ ২২ ও ১৩ ঃ ৩ আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

١- وَالْفَجْرِ ۝

৮৯ ঃ ১ শপথ উষার

দিনের সূচনা অর্থাৎ প্রত্যূষ; বিষয়টি নিয়ে ২ ঃ ১৮৭ আয়াতের আওতায় আলোচনা করা হয়েছে।

٦- أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝
٧- إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝
٨- الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝

৮৯ ঃ ৬-৮ দেখেছ কি তোমার প্রতিপালক আদ জাতির লোকদেরকে কী করেছিলেন, কী ঘটেছিল ইরাম নগরীর ভাগ্যে যে নগরে নয়নাভিরাম স্তম্ভশ্রেণীর সমতুল্য পৃথিবীর আর কোন দেশে নির্মিত হয়নি ?

www.bjilibrary.com

এই আয়াতে আদ জাতির লোকদের আল্লাহ্ যে শাস্তি প্রদান করেছিলেন তার কোন সুনির্দিষ্ট বর্ণনা দেওয়া হয়নি। এই আদ জাতির লোকদের রাজধানী ছিল ইরাম বা আরাম নগর। এই নগরে ছিল অতুল সৌধশ্রেণী। অনেকে মনে করেন ইরাম ছিল[1] আদ -এর পিতামহের নাম। আর আদ জাতির লোকজনের চেহারা ছিল উন্নত।

আদ জাতির লোকের ওপর ঐশী শাস্তির বিবরণ আয়াত ৪১ ঃ ১৫-১৭ তে দেওয়া হয়েছে।

٩- وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝

৮৯ ঃ ৯ আর ছামূদ জাতির লোকেরা যারা বিশাল শিলাখণ্ড কেটে উপত্যকা প্রদেশে গৃহ নির্মাণ করে ...

এই আয়াতে ছামূদ (সেমিটিক) জাতির লোকদের কথা বলা হয়েছে। আর বিষয়টি ১১ ঃ ৬৭ আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

٢١- كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝

৮৯ ঃ ২১ পৃথিবীকে যখন চূর্ণবিচূর্ণ করা হবে

বিষয়টি ৫৬ ঃ ৪-৬ আয়াতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

٨- أَلَمْ نَجْعَلْ لَّهُ عَيْنَيْنِ ۝

٩- وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ۝

৯০ ঃ ৮-৯ আমি কী তাকে দু চক্ষু, একটি জিহবা এবং দুটি ঠোট দেইনি ?

এই আয়াত দুটিতে আল্লাহ্ স্মরণ করিয়ে দিচেছন যে তিনি মানুষকে চক্ষু, জিহবা ও ওষ্ঠ দিয়ে কত বড় নিয়ামত দান করেছেন। চক্ষু দিয়ে মানুষ দেখে যার পদ্ধতি হল দৃষ্ট বস্তুর ছায়া চোখে পড়ে যা মস্তিষ্কের বিশেষ ক্ষমতায় মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়। এ বিষয়ে ২ ঃ ২০ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। মানুষের উন্নততর চিন্তা ও গবেষণা শক্তি মস্তিষ্কের মাধ্যমে রয়েছে বলে বাকি সকল সৃষ্ট জীব থেকে শ্রেষ্ঠ।[1]

জিহ্বার দুটি অংশ যথা–সামনের দিকের দুই-তৃতীয়াংশ এবং পেছনের এক তৃতীয়াংশ। এ দু অংশের V নমুনার সংযোগ স্থলে ৭ থেকে ১২টি বিশেষ উঁচু

www.bjilibrary.com

কোষগ্রন্থি রয়েছে যার প্রত্যেকটির চারপাশে নালার মত খাদ রয়েছে এবং দুপাশ থেকে স্বাদ গ্রন্থিগুলোর মুখ এসে মিলেছে। জিহ্বার অগ্রভাগ ও দু পাশে লাল ছোট ছোট বিশেষ কোষগ্রন্থি যার চার রকম স্বাদ রয়েছে– মিষ্টতা, লবণাক্ততা, তিক্ততা এবং অম্লতা।

জিহ্বার ব্যবহার তিন প্রকার ঃ (১) জিহ্বা খাদ্যদ্রব্য দাঁতের নীচে ঠেলে দেয় যাতে দাঁত চিবুতে সক্ষম হয় এবং যা পরে নরম ডেলা হয়ে গিলতে সহজ হয়। (২) জিহ্বা স্বাদ গ্রহণ করে থাকে এবং জিহ্বার স্পর্শ ক্ষমতাও খুব উন্নত। (৩) জিহ্বা কথা বলতে সর্বাধিক সাহায্য করে।

প্রথম দুটি কাজ সকল প্রাণীর বেলায় দেখা যায়। কিন্তু কথা বলার ক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই রয়েছে। জিহ্বা, তালু ও ঠোঁটের বিভিন্ন রকম ব্যবহারে সৃষ্ট শব্দ কথায় পরিণত হয়। তাই ঠোঁট দুটির কথাও এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। শব্দ গলার শব্দ প্রকোষ্ঠে তৈরি হয় যা মুখের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় জিহ্বা, ঠোঁট, তালুর সমন্বয়ে নানা রূপ শব্দ বা সুর তৈরি করে যার ফলে কথা ও গানের সৃষ্টি হয়।

তথ্যসূত্র ঃ

1. The New Encyclopaedia Britannica, Helen Hemingway Benton, Publisher, P. 91-116. 1978.

www.bjilibrary.com

١- وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝

৯১ ঃ ১ সূর্য ও তার উত্তাপের শপথ,

এ বিষয়টি ৭১ ঃ ১৬ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

٢- وَالْقَمَرِ إِذَا تَلٰهَا ۝

৯১ ঃ ২ চন্দ্রের শপথ যখন সে (সূর্যকে) অনুসরণ করে।

এ বিষয়টিও ৭১ ঃ ১৬ আয়াতে আলোচিত হয়েছে।

٥- وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ۝

৯১ ঃ ৫ শপথ আকাশের এবং যিনি এটি নির্মাণ করেছেন তাঁর,

এ বিষয়টি ২ ঃ ২৯ আয়াতে এবং পরিশিষ্ট–১ আলোচনা করা হয়েছে।

٦- وَالْأَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۝

৯১ ঃ ৬ আর পৃথিবী এবং যিনি একে বিছিয়ে দিয়েছেন তাঁর শপথ।

এ বিষয় দুটি ২ ঃ ১৬৪ এবং ২ ঃ ২২ ও ১৩ ঃ ৩ আয়াতসমূহের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহ যার গোলাকার পৃষ্ঠের আয়তন ২০.১ কোটি বর্গমাইল। এটা আল্লাহ্‌র এক অপূর্ব সৃষ্টি যা নিজের মেরুদন্ডের চারপাশে ঘুরে এবং সূর্যের চার পাশে নিজস্ব কক্ষ পথে পরিক্রমণ করে যার ফলে ঋতু ও দিবা-রাত্রির পরিবর্তন হয়। আরও রয়েছে চাঁদের আলো, সূর্যের আলো, বিভিন্ন রং ও সৌন্দর্য, পৃথিবীর আবহাওয়া, বায়ু প্রবাহ, মেঘমালা, বৃষ্টি ও বজ্রপাত, পাহাড় পর্বত, গাছপালা, জঙ্গল, এবং কোথায়ও সবুজের মেলা আবার কোথায়ও মরুভূমি এ সবই আল্লাহ্‌র দান। তারপর পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টি জৈব, অজৈব ও প্রাণীকুল রয়েছে আর এ সবার উপরে খিলাফত দেওয়া হয়েছে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে।

١٤- فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۖ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ

فَسَوّٰىهَا ۝

৯১ ঃ ১৪ কিন্তু তারা রাসূলকে অস্বীকার করল এবং তাকে (স্ত্রী উটকে) কেটে ফেলল। তাদের পাপের জন্য তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে একাকার করে দিলেন।

www.bjilibrary.com

ছামূদ নবীর লোকদের প্রসংগে এই আয়াতটি এসেছে। বিষয়টির উপর আয়াত ১১ ঃ ৬৭তে আলোচনা করা হয়েছে।

১৩- وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۝

৯২ ঃ ১৩ আমি তো মালিক পরলোকের ও ইহলোকের।

ইহজগতের সমাপ্তি অর্থাৎ আখিরাত সম্পর্কে আয়াত ৮২ ঃ ২, ৩এ এবং প্রারম্ভ সম্পর্কে আয়াত ২ ঃ ১৬৪ ও পরিশিষ্ট ১ ও ২ এ আলোচনা ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১- وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۝

৯৫ ঃ ১ শপথ 'তীন' ও 'যায়তূন'-এর-

Ficus carica প্রজাতির ডুমুর গাছ পশ্চিম এশিয়ার স্থানীয় একটি উদ্ভিদ। এখান থেকে এটা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর ভক্ষণযোগ্য ফলের কারণে সেখানে কমপক্ষে ৫০০০ বছর[১] ধরে এই ডুমুরের চাষ করা হয়। এর ফলে উচ্চমাত্রায় শর্করা রয়েছে (প্রায় ৬৪%), এবং এটা ক্যালসিয়াম, লৌহ ও তামা সমৃদ্ধ।[২] এই ফল উপাদেয় ও স্বাস্থ্যকর এবং কাঁচা অথবা মিছরিতে পরিণত করে খাওয়া যায়। এই ফল দিয়ে জ্যাম তৈরি, চোলাই করে মদ তৈরি কিংবা টিনজাতও করা যায়। এই ফল থেকে তৈরি সিরাপ রেচক (ওষুধ) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইসলামী শাসনামলের একেবারে গোড়ার দিকে ফলটি বাহ্যত সুপরিচিত ছিল এবং আরববাসীরা একে খাদ্য ও ওষুধ হিসেবে গ্রহণ করত। তিন থেকে পাঁচটি লতিযুক্ত বড় বড় ডুমুর পাতার গঠন বিন্যাস কিছুটা মানুষের হাতের ন্যায় এবং সম্ভবত এ কারণে প্রাচীন খ্রিষ্টীয় চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে বহিঃস্থ জননেন্দ্রীয়সমূহকে এর পাতা দিয়ে ঢেকে রাখার একটি প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।[৩]

বাইবেলে ডুমুর বৃক্ষের অনেকবার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু কুরআনে একটি শপথ হিসেবে মাত্র একবার উল্লেখিত হয়েছে এবং জলপাই, সিনাই পর্বত ও পবিত্র মক্কানগরীসহ এই আয়াতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা সম্পর্কে উদ্ধৃত হয়েছে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও নিকট প্রাচ্যে জলপাই-এর গুরুত্ব সম্পর্কে আয়াত ৬ ঃ ৯৯ এ আলোচনা হয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. G. Usher, A Dictionary of Plants used by Man. Constable and Company Ltd. London, 1974.
2. The Encyclopaeda Americana, International edition, Vol.-11, p. 193, 1979.
3. B. Brouk, Plants consumed by man, Academic press, London, 1975.

www.bjilibrary.com

٤- لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝

৯৫ ঃ ৪ আমরা মানুষকে অতীব উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছি।

এ বিষয়টি ৩ ঃ ৬ ও ৬ ঃ ২ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

١- اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ ٢- خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝
٣- اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝
٤- الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ ٥- عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

৯৬ ঃ ১-৫ পড় (হে নবী!) তোমার রবের নামসহ যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষকে ঝুলন্ত এক জমাট বাঁধা পিন্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং, পড়, তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল। যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন যা সে জানতো না।

উপরের এই পাঁচটি আয়াতই কুরআনের নাযিল করা সর্বপ্রথম অংশ যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর প্রথম নাযিল হয়।

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে কুরআনে সর্বপ্রথম জ্ঞান অর্জনের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এটা খুবই দুঃখজনক যে এতদসত্ত্বেও আজ বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ মুসলমান লিখতে ও পড়তে জানে না।

আরো লক্ষণীয় যে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে আবিষ্কৃত মানব সৃষ্টি রহস্য প্রথম নাযিল করা আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ যে রব এ বিষয় ১ ঃ ২ আয়াতের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আলাক শব্দের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব নিয়ে ২৩ ঃ ১২-১৪ আয়াত সমূহে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ যে সর্বাধিক অনুগ্রহশীল তা ১ ঃ ১ আয়াতেও আলোচনা করা হয়েছে।

এই আয়াতে কলমের উল্লেখ প্রণিধান যোগ্য। মানুষ একমাত্র প্রাণী যে কলমের ব্যবহার জানে এবং কলম জ্ঞান অর্জন ও চর্চার সহায়ক। কলমের সাহায্যে অর্থাৎ লেখার মাধ্যমে মানুষ তার লব্ধ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও আবিষ্কার এবং মানসিক চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ করে যা নিজের ও পরবর্তী বংশধরদের জন্য আমানত হিসেবে থেকে যায়। কলমের বিষয়টি ৬৮ ঃ ১ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

লেখার ফলেই আজকাল বই, পত্রিকা, রেডিও, টিভি ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রচারিত হচ্ছে।

১- إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝

২- وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝

৯৯ ঃ ১-২ পৃথিবী যখন ভীষণভাবে আন্দোলিত হবে আর পৃথিবী তার মধ্যকার সকল বোঝা বাইরে নিক্ষেপ করবে;

এই বিষয়টি ৮৬ ঃ ১২ আয়াতের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

৫- وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۝

১০১ ঃ ৫ এ পর্বতসমূহ হবে ধুনিত রংগিন পশমের মত;

আয়াত নং ৫৬ ঃ ৪-৫ এ এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

১- وَالْعَصْرِ ۝

১০৩ ঃ ১ মহাকালের শপথ,

আল্লাহ্ এখানে সময়ের নামে শপথ করছেন। সময় এমন একটি বিষয় যা বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ঔৎসুক্য জাগায়। সময় কী অসীম বা সার্বভৌম, না অন্য কোন বস্তুর উপর নির্ভরশীল? সময়ের কি কোন শুরু বা সমাপ্তি আছে?

সাধারণ মানুষ সময়কে সার্বভৌম অসীম বলে মনে করে। অর্থাৎ কেউ দ্ব্যর্থহীনভাবে সময়ের বিরতিকে দু'টি ঘটনার মধ্যবর্তীকালকে পরিমাপ করে এবং যে কেউই তার পরিমাপ করুক না কেন এই সময় একই হবে। তবে শর্ত থাকবে যে তার একটি উন্নতমানের ঘড়ি থাকতে হবে। সময় ব্যাপ্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও স্বাধীন। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে মুক্তভাবে পরিচালনরত সকল পর্যবেক্ষকগণের জন্য বিজ্ঞানের বিধানাবলি একই হওয়া বাঞ্ছনীয়, তা তাদের গতি যাই হোক না কেন।[১] আপেক্ষিক তত্ত্ব দ্বারা প্রমাণ করা যেতে পারে যে, অদ্বিতীয় সার্বভৌম সময় বলতে কিছু নেই। কিন্তু এর বিপরীতে প্রত্যেক ব্যক্তির সময় পরিমাপের নিজস্ব পন্থা রয়েছে এবং তা নির্ভর করে তিনি কোথায় আছেন এবং কিভাবে চলাচল

www.bjilibrary.com

করছেন। ব্যাপ্তি ও সময় হচ্ছে গতিশীল শক্তির পরিমাণ। যখন একটি বস্তু চলমান হয় অথবা একটি শক্তি কাজ করে তখন কেবল আপেক্ষিকভাবে বর্ণনযোগ্য অনবচ্ছেদ ব্যাপ্তিকালের বক্রতাকে প্রভাবান্বিত করে। পালাক্রমে ব্যাপ্তিকালের গঠন কাঠামো যে পথে বস্তু চলাচল করে এবং শক্তি কাজ করে, তা প্রভাবান্বিত করে। এই নিখিল বিশ্বে যা কিছু ঘটে তার দ্বারা ব্যাপ্তি ও কাল কেবলমাত্র প্রভাব বিস্তার করে না, নিজেরা প্রভাবান্বিতও হয়। ব্যাপ্তি ও কাল সম্পর্কে ধারণা ব্যতীত যেমন কেউ এই বিশ্বে ঘটনা সম্পর্কে কথা বলতে পারে না তেমনি সাধারণ আপেক্ষিকতার ক্ষেত্রে আমরা বর্তমানে যে নিখিল বিশ্বকে জানি তার সীমার বাইরের ব্যাপ্তি ও কাল সম্পর্কে আলোচনা করতে যাওয়া অর্থহীন হবে। ছায়াপথসমূহ পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং কোন এক সময়ে দূর অতীতে পার্শ্ববর্তী ছায়াপথ সমূহের মধ্যকার দূরত্বের পরিমাণ অবশ্যই শূন্য ছিল। মহানাদ (Big Bang) ঘটনার সময় যখন $t=0$ তখন নিখিল বিশ্বের ঘনত্ব ও ব্যাপ্তিকালের বক্রতা অসীম হয়ে থাকতে পারে। এরূপ একটি সন্ধিক্ষণ হচ্ছে এমন উদাহরণ যেখানে আপেক্ষিক তত্ত্ব নিজেই অচল হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থাকে একক হিসাবে অভিহিত করা হয়। বস্তুত আমাদের সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এরূপ একক অবস্থায় এসে ভেঙ্গে পড়ে, কোন কাজে খাটে না। এর অর্থ এই দাড়ায় যে এমনকি যদিও মহানাদ (Big Bang) -এর পূর্বেও আরও ঘটনা ছিল তবুও পরে কী ঘটবে তা নির্ধারণের জন্য কেউ সে সকল ঘটনাকে ব্যবহার করতে পারেনি। কারণ ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতাই মহানাদ-এ এসে অচল হয়ে পড়ত। অনুরূপভাবে যদি আমরা কেবলমাত্র জানতে পারি যে মহানাদ-এর পর থেকে কী কী ঘটে চলেছে এবং বাস্তবেও তাই হয়েছে, তাহলে পূর্বে কী ঘটেছে তা আমরা নির্ধারণ করতে পারি না। যে বিষয়টি নিয়ে আমাদের যতদূর জানার কথা তা হচ্ছে মহানাদ-এর পূর্বের ঘটনাবলির কোন পরিণতি থাকতে পারে না। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে মহানাদ থেকেই কাল-এর শুরু।

বিজ্ঞানের জগত চতুর্মাত্রিক, ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে এর তিনটি মাত্রা রয়েছে আর কালকে নিয়ে রয়েছে এক মাত্রা। ব্যাপ্তিকালের এই প্রেক্ষাপটে পদার্থবিদ্যার সূত্রসমূহ এই নিখিল বিশ্বে বিদ্যমান সৃষ্টি রহস্য সংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদের আচরণ সম্পর্কে একটি গাণিতিক বিবরণ পেশ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করে। পদার্থবিদ্যার সকল জানা সূত্র সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে তাদের গাণিতিক গঠন ব্যাপ্তি ও কাল প্রসঙ্গে একটি ভারসাম্য প্রদর্শন করে।৩ অর্থাৎ একটি সীমিত ব্যতিক্রমসহ এই সূত্রসমূহ নিজেরাই বাম ও ডান, অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে না। তবুও আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় ব্যাপ্তি ও কালের অন্তর্গত এই সকল বিষয়ের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট

www.bjilibrary.com

পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। সমগ্র পৃথিবীতে 'বাম' ও 'ডান' পদ দু'টির অর্থ অদলবদল করার জন্য যদি কোন কিছু ঘটে যায় তাহলেও কোন তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন অনুভূত হবে না। ন্যায়সম্মত মন-মানসিকতা সম্পন্ন ও সন্দেহজনক ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা এই পৃথিবীতে অসংখ্য। কিন্তু অতীত ও ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে কোন অদলবদল করা হলে তা প্রচন্ডভাবে একটি নতুন অবস্থানের সৃষ্টি করবে। এছাড়া, আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব এমন সব ঘটনা ঘটতে থাকবে। ভেঙ্গে যাওয়া Humpty Dumpty (একটি ইংরেজী ছড়ার চরিত্র) লাফ দিয়ে দেয়ালের উপর সম্পূর্ণ মেরামতকৃত অবস্থায় গিয়ে বসবে। আর তাই এটা 'কালের তীর' সম্পর্কে ধারণা হাজির করবে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. S. W. Hawking, a Brief History of Time, Bantam Press, P. 187, 1988.
2. Ibid, P. 33.
3. Jacate Narlikor, The Structure of The Universe, Oxford University Press, P. 176, 1980.

www.bjilibrary.com

٣-لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ

১১২ ঃ ৩ তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয় না।

অত্র আয়াতটি সাধারণ বুদ্ধিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অনুধাবন করা সহজ নয়, যা উদ্ভূত কিছুর ব্যাখ্যার জন্য উৎপাদক বা জন্মদাতার অস্তিত্ব দাবি করে। একটি শিশুর নিষ্পাপ, অবোধ জিজ্ঞাসা 'আমি কোথা থেকে এসেছি ?' তখনই উত্তর খুঁজে পায় যখন সে মানব প্রজননের ধারাটা বুঝতে পারে। আমরা যদি এই ধারাকে অতীতের দিকে সম্প্রসারিত করি তাহলে কী ঘটবে। আমরা দেখতে পাই আদম (আ) নামে একজন প্রারম্ভিক মানুষ আছেন যার কথা ইসলামে পরিচিত। পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত আছে যে, আল্লাহ্ আদমকে (আ) মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার ভিতরে তাঁর রূহের একটা অংশ ফুঁকে দিয়েছেন–এভাবেই তার মধ্যে দান করেছেন ঐশী গুণাবলি। শিশুর আরেকটি জিজ্ঞাসাকে তথা 'কে আল্লাহ্কে সৃষ্টি করেছেন'–সমস্যাসংকুল মনে হতে পারে কিন্তু আল্লাহ্ই এ জিজ্ঞাসার জবাব স্পষ্ট ভাষায় দিয়েছেন। তাহলো ঃ আল্লাহ্ কাউকে জন্ম দেন না এবং তিনি নিজেও জাত নহেন। ব্যাপারটি স্বাভাবিকভাবে হেঁয়ালিপূর্ণ মনে হতে পারে। এ ধরনের হেঁয়ালির অস্তিত্ব আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে।

এ সকল অগ্রগতি আমাদের বলছে যে, বড় বড় কণা ছোট ছোট কণা দ্বারা গঠিত এবং ছোট ছোট কণা আরো ক্ষুদ্রতর কণা দ্বারা গঠিত। এমনকি ক্ষুদ্রতর কণাগুলোও আবার অধিকতর ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্ম কণা দ্বারা গঠিত। এভাবে, বস্তু জগতে ক্ষুদ্রতার বিভিন্ন স্তর বা পর্যায় দেখা যায় পদার্থের গঠনে ঃ যৌগ, অণু, পরমাণু, ইলেক্ট্রন এবং নিউক্লিয়াস, প্রোটন, নিউট্রন ও কোয়ার্ক। মৌলিক কণার সন্ধানে দেখা যায়, কোয়ার্কসমূহ (খণ্ডিতভাবে চার্জকৃত কণা এবং লেপটনসমূহ ইলেক্ট্রন, নিউট্রন, নিউট্রিনো ইতাদি) বর্তমানে 'বিল্ডিং ব্লক' তথা নির্মাণ ফলক হিসেবে স্বীকৃত হয়ে থাকে যা দ্বারা মহাবিশ্বের সকল বস্তুই গঠিত। কোয়ার্কগুলো অবশ্য পরীক্ষাগারে দেখা যায়নি। বিপুল সংখ্যক পরীক্ষায় সত্য রয়েছে যা তখনি ব্যাখ্যা করা সম্ভব যখন ধরে নেয়া হয় যে, হ্যাড্রনসমূহ (শক্তিশালীভাবে ক্রিয়াকারী কণাসমূহ তথা নিউট্রন, প্রোটন, পিওন ইত্যাদি) খণ্ডিতভাবে চার্জকৃত কোয়ার্কসমূহের বিভিন্ন যৌগ দ্বারা গঠিত (যথা আপ কোয়ার্ক, ডাউন কোয়ার্ক, টপ কোয়ার্ক, বটম কোয়ার্ক) এবং কোয়ার্ক আকারে/হিসেবে হ্যাড্রোনিক বস্তু বা পদার্থের বর্ণনা টেকসই হিসেবে পাওয়া গেছে। যাহোক, বিভিন্ন কারণে, যার ভিতর আমরা যাবো না, কোয়ার্কসমূহ রয়েছে বন্দী অবস্থায় এবং এদেরকে

www.bjilibrary.com

কখনও দেখা যাবে না। হ্যাড্রোনসমূহকে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন প্রজেক্টাইল দ্বারা কঠিনভাবে আঘাত করা যায় যাতে করে কোয়ার্কসমূহ মুক্ত হয়ে যায় এবং দেখা যায়। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে যে, এভাবে এ ধরনের উচ্চ শক্তি অনেক নিউক্লিয়ার বর্জ্যের উৎপত্তি হয় এবং কোয়ার্কসমূহ দেখা যায় না। কোয়ার্কসমূহ কখনোই দেখা যাবে না, তবুও আমরা সেগুলোতে বিশ্বাস করি। যদিও আমরা কোয়ার্কসমূহ দেখি না তবুও আমরা তাদের গুণাবলিতে বিশ্বাস করি। কোয়ার্কসমূহের অদৃশ্যমানতা সাধারণ জ্ঞান দ্বারা এ ভাবে উপলব্ধি করা যায় যে- যদি ক, খ দ্বারা তৈরি হয় তবে অবশ্যই ক ভাঙ্গলে খ-কে দেখা যাবে। এরূপ যুক্তিতর্ক আমাদের সাধারণ জগতে কাজে খাটতে পারে। কিন্তু অর্ধ-আণবিক পদার্থের বেলায় সেটি গ্রহণযোগ্য হয় না। এখানে শক্তি উৎপাদক জেনারেটরের কথা বলা যেতে পারে, যা অদৃশ্যভাবে শক্তি উৎপাদন করবে, কিন্তু কখনও দেখা যাবে না। সুতরাং যদি বস্তুবিজ্ঞানে কোথা হতে প্রস্তুত হলো তা না জেনে আমরা 'ফান্ডামেন্টাল পারটিকেল' এর উপস্থিতি স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকি তবে কেন আমরা সুপ্রীম সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করবো না যিনি কোথা হতেও সৃষ্ট হননি এবং যাকে কখনও দেখাও যায় না। আমাদের প্রয়োজন তার সিফাত জানা। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ্‌র গুণাবলির উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরের উপমাটি অত্র আয়াতের একটি অংশ বুঝার জন্য একটি উপলক্ষ্য মাত্র।

দেখা যাক আল্লাহ্ কন্সেপ্টটি জেনারেটরের ভূমিকায় দেখা হলে আমাদের কোন সেন্স মোটেই তৈরি হয় কি-না। প্রথমে আমরা জেনারেটরের যান্ত্রিক দিক পরীক্ষা করি যা 'ইলিমেন্টারি পারটিকেল'-এ প্রতিফলিত হয়েছে।

যদিও বর্তমানে পদার্থবিদগণ কোয়ার্ক, যা হ্যাড্রোনিক ম্যাটার এর গঠনকারী নিয়ে বেজায় খুশী। এ কথা বলা যায় যে, কোয়ার্ক এর অভ্যন্তরীণ গঠন আছে অর্থাৎ এটা আরেক সাব-ইউনিট দ্বারা তৈরি। তাহলে এই মৌলিকতার শেষ কোথায় ? আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের এটা এক হতবুদ্ধিকর প্রশ্ন! গ্রীকদের সময় হতে মানুষ বস্তুর জেনারেটরের সিরিজ আবিষ্কার করেছে। যৌগ সকল বস্তুর জেনারেটর হলো, মৌল হলো সকল যৌগের, অণু হলো মৌলের, পরমাণু হলো অণুর, নিউক্লি এবং ইলেক্ট্রন হলো পরমাণুর, কোয়ার্ক হলো নিউক্লিয়ন্স এর এবং ভবিষ্যতে কোয়ার্কও নিজস্ব এক অভ্যন্তরীণ গঠনের অধিকারী হবে। বস্তুর জেনারেটরের সন্ধান করা একটি সৃষ্ট পিয়াজের খোসা ছাড়ানোর মত। একটি স্তর ছাড়ানোর পর আর একটি স্তর একং তারপর আর একটি, যখন সে স্তর ছাড়ানো হয় তখন আর একটি দেখা যায়-এভাবে চলতেই থাকে। প্রসঙ্গক্রমে আমরা ঐ

www.bjilibrary.com

সমস্ত কণার কথা উল্লেক করেছি যাদের উচ্চমাত্রার স্থায়িত্ব আছে। অধিকন্তু, বহুসংখ্যক কণা রয়েছে যারা খুবই ক্ষণস্থায়ী। মৌলিক কণার পরিমাণ এত বেশী হয়েছে যে, বস্তুর জেনারেটর এর কাছে তা খুব কম তাৎপর্যপূর্ণ।

যখন একটি কাঠামো আরেকটি কাঠামোর উৎপন্ন করে তখন এই জেনারেটরের সদসরা এতটা বিশাল হতে পারে যে, জেনারেটর পদার্থটিই তার তাৎপর্য হারাতে পারে। আসল ব্যাপারটা হলো যে, আমাদের বর্তমান জ্ঞানের সাথে সঙ্গতি রেখে একটা অবস্থায় এসে আমরা থেমে যাই এবং এখান থেকে বিশ্বাস করি কিছু নির্দিষ্ট কাঠামোতে কোন প্রশ্ন ছাড়াই যে কোন কাঠামো থেকে বর্তমান কাঠামোটির উদ্ভব হয়েছে এবং আলোচ্য কাঠামোটি সংযুক্তির মাধ্যমে গঠিত বা উদ্ভূত হয়। কাজেই, চূড়ান্ত সাদৃশ্যে যদি 'জেনারেটর' এবং 'জেনারেটেড' সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর সত্যি দেয়া না যায়, তাহলে আল্লাহ্‌র ওহী যে তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি–এ ব্যাপারটি নিজ সীমাবদ্ধতামণ্ডিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অগ্রগতির কোন ধাপেই আমাদেরকে হতভম্ব করা উচিত নয়। এই বক্তব্যটি থেকে এই ইশারাই গ্রহণ করা সমীচীন হবে যে, বিজ্ঞানীদের রিডাকশনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি উপযোগী হওয়া সত্ত্বেও তা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

আমাদের বাসস্থান এই মহাবিশ্বের স্থান ও সময়ের গঠন এবং আমাদের জীবদেহগত সীমাবদ্ধতা আর সেই সাথে আমাদের প্রয়োগকৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতার কারণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চূড়ান্ত সত্ত্বা আল্লাহ্‌র প্রকৃতি সম্পর্কে চূড়ান্ত সত্যটি উপলব্ধি করা সম্ভব নাও হতে পারে। আমরা শুধু আমাদের নিকট জ্ঞাত আল্লাহ্‌র কিছু গুণাবলির দ্বারাই আল্লাহ্‌কে উপলব্ধি করতে সক্ষম হতে পারি।

١- قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝

১১৩ ঃ ১ আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি উষার স্রষ্টার।

পবিত্র কুরআনের প্রায় সকল অনুবাদক 'বিরাব্বিল ফালাক'কে 'উষার প্রভু' হিসেবে অনুবাদ করেছেন।

ফালাক শব্দের মূল ধাতুর (শব্দমূল) অর্থ হচ্ছে বিচ্ছিন্ন হওয়া বা বিযুক্ত করা; একটি সংকীর্ণ অর্থে উষা হচ্ছে আলাদাভাবে আহরিত একটি অর্থ। এটা অযৌক্তিক নয় যে, উষা আরো রাতের আঁধারে প্রবেশ করে উজ্জ্বল ভোরের সৃষ্টি করে। আমাদের মতে, এই আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'ফালাক' শব্দের শব্দমূলের অর্থের সাথে ঐকমত্য পোষণ করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হবে।।

www.bjilibrary.com

বিচ্ছিন্নকরণ অথবা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করার আকাঙ্ক্ষা পোষণকারী" হিসেবে এই বাক্যাংশের অনুবাদ করাও যথোপযুক্ত হবে। এই আয়াত এরপর অধিকতর গভীর ও ব্যাপকতর তাৎপর্য নিয়ে উদ্ভূত হবে যা পরবর্তী ব্যাখ্যাতে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যা আমাদের চারদিকে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। এর অসংখ্য উদাহরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। উদ্ভিদ রাজ্যে বীজের খোসা ভেঙ্গে বীজের অঙ্কুর উদগম হয়। এ সকল বীজের মধ্যে কোন কোনটির খুবই শক্ত বহিরাবরণ রয়েছে (যেমন খেজুর, নারকেল, জলপাই, কুল ইত্যাদি)। বীজ থেকে বের হওয়া চারাগাছের শিকড় ক্রমান্বয়ে পানির অন্বেষণে মাটির গভীরে প্রবেশ করে, আর এর শিকড় মাটিকে ভেঙ্গে ফেলে নিচে চলে যায় এবং সূর্যের আলোর প্রত্যাশায় মাটির উপর মাথা উঁচু করে তোলে। যে সব প্রাণী ডিম পাড়ে তাদের ক্ষেত্রে যথাসময়ে ডিমের শক্ত খোলস ভেঙ্গে বাচ্চা বেরিয়ে আসে। অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে পুং শুক্রকীট স্ত্রী ডিম্বাশয়ে জোর করে প্রবেশের ফলে স্ত্রীর জরায়ুতে ভ্রূণের সৃষ্টি করে। জন্মগ্রহণকালে শিশু মায়ের ঝিল্লীময় থলে থেকে প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসে। জরায়ু মধ্যস্থ এই থলেতে ভ্রূণ ধীরে ধীরে বেড়ে উঠতে থাকে।

বস্তুজগতে শিলাময় পর্বত ভেঙ্গে মাটির নিচ থেকে সবেগে পানির ঝর্ণা বেরিয়ে আসে। কোন ভারী পদার্থের পরমাণু ভেঙ্গে তেজস্ক্রিয়তা উৎপন্ন হয়।

আকস্মিক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ নামে অভিহিত একটি প্রচণ্ড প্রকৃতির ভাঙ্গনের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে এবং এই বিস্ফোরণের ফলে হঠাৎ ও খুবই দ্রুত বস্তুকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলে। বর্তমানে আধুনিক নভোবস্তুবিদ্যা বিশারদগণ বিশ্বাস করেন যে, সৃষ্টির শুরুতে অতি ক্ষুদ্র, অতি ঘন, অতি উত্তপ্ত "বিশ্বের আদিযুগীয় পরমাণু" একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণের (মহানাদ –Big Bang নামে অভিহিত) মাধ্যমে সম্প্রসারিত হতে শুরু করে এবং ব্যাপ্তি, কাল, পদার্থ ও শক্তিসহ এই নিখিল বিশ্বের অভ্যুদয় ঘটায়।

কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত পদার্থের এই ভাঙ্গন এলোমেলোভাবে ঘটে না। বহু সংখ্যক শক্তির সংযুক্ত কার্যক্রমে এগুলো সংঘটিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত বিধান ও তাঁর জারীকৃত হুকুমের মধ্যে এ সকল শক্তি কাজ করে।

www.bjilibrary.com

পরিশিষ্ট-১

সৃষ্টিতত্ত্বের ক্রমবিকাশ

বিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, মহাবিশ্ব সম্পর্কে দু'টি সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ তাদের ধারণাকে প্রায় স্পষ্ট করেছে।[১] মহাবিশ্বের প্রতিটি অংশ (অর্থাৎ প্রতিটি ছায়াপথ) অন্য প্রত্যেক অংশ থেকে অপসৃত হয়ে যাচ্ছে এবং তা হচ্ছে এক অতি প্রচণ্ড গতির সাথে। যতদূরে একটি অংশ সরে যাচ্ছে ততই এর সরে যাওয়ার গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।[২] সমগ্র আকাশ ম্লান আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যা প্রত্যেক দিকে একই রকম দেখায়। আলোর এই বর্ণচ্ছটা দেখে এটাই অনুমিত হয় যে খুবই নিচু তাপমাত্রায়, প্রায় ৩° কিলোওয়াট (3°k) এর উৎপত্তি। এই দুটি পর্যবেক্ষণ একত্রে এটাই ধারণা দেয় যে মহাবিশ্বের সকল অংশ একদা পরস্পর খুব বেশী নিকটে অবস্থিত ছিল; বস্তুত পক্ষে অতি ক্ষুদ্র, অতি নিবিড়, অতি উচ্চ তাপমাত্রা যুক্ত গুচ্ছাকারে এ সকল অংশ বাঁধা ছিল। কোন এক দূর অতীতে পরস্পর সন্নিবদ্ধ মহাবিশ্ব এক ভয়াবহ বিস্ফোরণের অর্থাৎ মহানাদ (Big Bang) মাধ্যমে সম্প্রসারিত হতে শুরু করে এবং ব্যাপ্তিকালের অনবচ্ছেদ্যতা পদার্থ ও শক্তির অস্তিত্ব প্রদান করে। প্রথমে চারটি মৌলিক শক্তি যথা মহাকর্ষ শক্তি, বিদ্যুৎ চুম্বকীয় শক্তি, শক্তিশালী আণবিক শক্তি ও দুর্বল আণবিক শক্তি একত্রে সমন্বিত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। তাড়িত চুম্বকীয় তরঙ্গ দ্বারা সঞ্চারিত শক্তির চাপ একটি স্বচ্ছন্দ সম্প্রসারণ বজায় রাখে। ফলস্বরূপ প্রধানত প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন ও কিছু পরিমাণে হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম সহযোগে প্রথমে গঠিত পদার্থ গুচ্ছ বা স্তবকের আকারে গঠিত হতে শুরু করে। প্লাঙ্ক-এর সময় (Plank's time) (Big Bang-এর $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড পর)-এ অভিকর্ষ অন্য চারটি মৌলিক শক্তি থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং এ সকল পদার্থকে গুচ্ছ বা স্তবক গঠন করার জন্য আকর্ষণ করতে আরম্ভ করে। রশ্মি বিচ্ছুরণের শক্তির কারণে এ সকল গুচ্ছ পৃথক হয়ে সরে যেতে থাকে, কিন্তু স্বতন্ত্র গুচ্ছগুলো অভিকর্ষ শক্তির কারণে সংকুচিত হতে আরম্ভ করে। এসব গুচ্ছ অথবা গ্যাসীয় মেঘমালার মধ্যে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং ঘূর্ণনের এক প্রচণ্ড গতিশক্তি লাভ করে। এ সকল গতির প্রভাবের ফলে গ্যাসীয় মেঘমালা বিভিন্ন আকার ধারণ করে, যেমন সর্পিল, গোলক আকার, ক্ষুদ্র বটিকাকৃতি, উপবৃত্তাকার

www.bjilibrary.com

ইত্যাদি। এই গ্যাসীয় মেঘ দলসমূহ শেষ পর্যন্ত ছায়াপথে রূপান্তরিত হয়। প্রচণ্ড ঘূর্ণনের কারণে গ্যাসীয় মেঘদল থেকে কোন কোন গ্যাসীয় পদার্থ ছিটকে বাইরে চলে যায়। আর বাইরে নিক্ষিপ্ত এ সকল বস্তু অভিকর্ষের সাহায্যে একত্রিত হয়ে নক্ষত্রের সৃষ্টি করে। অভিকর্ষ শক্তি যেহেতু কেন্দ্রে বেশী বেশী পরিমাণে পদার্থ আকর্ষণ করে তাই প্রচণ্ড তাপ ও তার সাথে চাপ যুক্ত হয়ে এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিছুকাল পরে তাপমাত্রা এত উঁচুতে উঠে যে বস্তুটি থেকে আলো উদ্ভাসিত হতে থাকে। এই অবস্থাকে একটি নক্ষত্রের ভ্রূণ কাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যদি বস্তুটির দলা বা পিণ্ড অনেক বড় হয় তাহলে এর কেন্দ্রে তাপমাত্রা অনেক বেশী হয়। তাপমাত্রা যখন এক কোটি ডিগ্রি কিলোয়াটের সমপরিমাণ হয় তখন কেন্দ্রে পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। আর যদি নক্ষত্রের পিণ্ডটি সূর্যের পিণ্ডের চেয়ে এক দশমাংশের কম আয়তনের হয় তাহলে নক্ষত্রের পিণ্ডের কেন্দ্রে তাপমাত্রা অত উঁচুতে উঠতে পারে না যে তা পারমাণবিক একীভবন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। কেবলমাত্র মহাকর্ষীয় চাপের ফলে সৃষ্ট তাপের কারণে একটি নক্ষত্রের আলো ছড়াতে থাকে। ঐরূপ তাপমাত্রায় নক্ষত্রের রং বাদামী হয়ে যায় এবং যেহেতু নক্ষত্রটি ক্ষুদ্রাকৃতির হয় তাই একে "বাদামী বামন" (Brown dwarf) নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এরূপ স্থিতিশীল অবস্থায় ঐ সকল নক্ষত্র কোটি কোটি বছর ধরে বিদ্যমান থাকে।

নক্ষত্রপিণ্ড যদি বেশ বড় হয় এবং সূর্য পিণ্ডের ১.৪৪ গুণ ছাড়িয়ে না যায় (ক্রিটিকাল পিণ্ড-চন্দ্র শেখরের লিমিট) তাহলে প্রচুর পরিমাণ পদার্থ কেন্দ্রে জড় হয়ে তাপমাত্রা এক কোটি ডিগ্রি কিলোওয়াটে বৃদ্ধি পায়, তখন পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। তখন হাইড্রোজেন হিলিয়াম গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। হাইড্রোজেনের ৪টি পরমাণু মিলিত হয়ে একটি হিলিয়াম পরমাণু উৎপন্ন করে। যেহেতু ৪টি হাইড্রোজেন পরমাণুর রয়েছে পিণ্ডটির ০.০৩ ইউনিট যা হিলিয়ামের একটি পরমাণু থেকে বেশী, পিণ্ডের অতিরিক্ত অংশ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় যা অধিক সংখ্যক হাইড্রোজেন অণুকে হিলিয়ামে রূপান্তরকরণে এবং এর রশ্মি বিচ্ছুরণে ব্যবহৃত হয়। এই পর্যায়ে নক্ষত্রের উপর দু'টি বিপরীত শক্তি ক্রিয়াশীল হয়। মহাকর্ষীয় শক্তি একে সংকুচিত করতে চায়, আর রশ্মি বিকীরণকারী শক্তি একে সম্প্রসারণের চেষ্টা করে। দীর্ঘকাল ধরে একটি ভারসাম্য বজায় রাখা হয় এবং এ দু'টি শক্তির মধ্যে একটি সমভার অবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ অবস্থায় একটি নক্ষত্রকে "প্রধান অনুবর্তী নক্ষত্র" নামে অভিহিত করা হয়। যে নক্ষত্রের পিণ্ড তার ক্রিটিকাল পিণ্ডের (critical mass) পরিমাণ থেকে বেশী নয় তেমন একটি নক্ষত্রের এরূপ স্থিতিশীল অবস্থায় আয়ুষ্কালের ব্যাপ্তি দাড়ায় ১২০০ কোটি বছর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রশ্মি বিকীরণকারী শক্তি মহাকর্ষীয় শক্তির উপর জয়লাভ করে। নক্ষত্র এক বিশাল, বিপুল আয়তনে সম্প্রসারিত হয় এবং রক্তাভ দেখায়। এরূপ অবস্থায় একটি নক্ষত্রকে "লাল দৈত্য" নক্ষত্র বলা হয়। নক্ষত্রের মূল

www.bjilibrary.com

কেন্দ্রী অংশ প্রধানত হিলিয়াম দ্বারা গঠিত এবং এর চারদিকে একীভবনকৃত হাইড্রোজেন-এর একটি আবরণ রয়েছে। হিলিয়ামের কেন্দ্রী অংশ কার্বনে একীভূত হতে শুরু করে, আর এর ফলে অধিক পরিমাণে শক্তি মুক্ত করে দিতে থাকে। নক্ষত্রটির উপর এক ধরনের অস্থিরতা বিরাজ করে। নক্ষত্রটি যখন সম্প্রসারিত হয় তখন স্পন্দিত হতে শুরু করে এবং অনুজ্জ্বল হতে থাকে, কিন্তু পুনরায় সংকোচনের সময় উজ্জ্বল হয়ে উঠে। নক্ষত্র স্থির থাকে না অর্থাৎ একটি Cepheid চল-এর মধ্যে থাকে। এরূপ অবস্থায় একটি নক্ষত্রকে মৃদু স্পন্দনশীল তারকা নামে অভিহিত করা হয়।

যখন অধিক পরিমাণে শক্তি মুক্ত হয় তখন নক্ষত্রের বহিরাবরণ পৃথক হয়ে গিয়ে ভেসে যেতে থাকে। এ সময় নক্ষত্র পিণ্ডের কেন্দ্রীয় অংশ ছেড়ে যায় যা আকারে মারাত্মকভাবে সংকুচিত হয়ে পড়ে। এ সময় মহাকর্ষ একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। ঘনত্ব এত উঁচু মাত্রায় পৌছে যে পরমাণুর কেন্দ্রী অংশের চারদিকে অবস্থিত ইলেকট্রনের বহিরাবরণ ভেঙ্গে যায় এবং ইলেকট্রন ও পরমাণুর কেন্দ্রী অংশ পরস্পর একত্রিত হয়ে একটি বস্তু গঠন করে যাকে শ্রেণীগত মর্যাদাচ্যুত বস্তু নামে অভিহিত করা হয়। এই পর্যায়ে নক্ষত্রটিকে "শ্বেত বামন" তারকা হিসেবে পরিচিতি দেয়া হয়। Critical পিণ্ডের চেয়ে যদি নক্ষত্রের পিণ্ডের পরিমাণ কম হয়, তাহলে পারমাণবিক জ্বালানি নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং এরপর আর মিশ্রণ সম্ভব হবে না। নক্ষত্রটি তার অভ্যন্তরীণ তাপ বিকীরণ করতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে শীতল হতে থাকে ও এক সময় অনুজ্জ্বল হয়ে পড়ে। 'শ্বেত বামনের' কার্বনের কেন্দ্রী অংশে বিপুল পরিমাণ চাপের সৃষ্টি হয় এবং এরূপ অবস্থায় থাকতে থাকতে এটা একটা বড় হীরার স্ফটিকে পরিণত হয়।

যদি নক্ষত্রের পিণ্ড Critical পিণ্ডের উপরে থাকে তবে অনেক বেশী উপরে নয়, ধরা যাক সূর্যের পিণ্ডের ১০ গুণ হয় তাহলে মহাকর্ষীয় চাপ এত বেশী হবে যে তা পিণ্ডের কেন্দ্রী অংশের পক্ষে সহ্য করা খুবই কঠিন হবে। শ্বেত বামন নক্ষত্র তার ক্রিয়াশক্তি হারিয়ে ফেলে অথবা প্রচণ্ড চাপ, তাপ প্রভৃতির দরুণ অভ্যন্তর ভাগের দিকে সংকুচিত হয়। এই আকস্মিক বিপত্তিমূলক ঘটনায় এক বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত হয় যাকে নোভা (নক্ষত্র বিশেষ-এর ঔজ্জ্বল্য সহসা কিছুক্ষণের জন্য বৃদ্ধি পায়) ও সুপার নোভা বিস্ফোরণ বলে। নক্ষত্রের অভ্যন্তর ভাগের এই সংকোচন প্রচণ্ডভাবে নক্ষত্রকে চেপে রাখে এবং সবকিছুকেই কেন্দ্রের দিকে ধাক্কা দিতে থাকে। ইলেকট্রনের কেন্দ্রী অংশসমূহের বিদ্যমানতা ধ্বংস হয়ে যায়। এগুলো পরমাণুর কেন্দ্রী অংশের প্রোটনের সাথে একীভূত হয়ে নিউট্রন গঠন করে। কেন্দ্রী অংশ কার্বনের সাথে মিশ্রিত হয়ে লোহা তৈরি করে। লোহা শক্তিকে ছেড়ে দেয়ার পরিবর্তে নিজের মধ্যে আত্মঃস্থ করে নেয়। মহাকর্ষ কেন্দ্রী অংশকে আচ্ছন্ন করে ফেলে একটি অতি ঘন পারমাণবিক কেন্দ্রী অংশের মধ্যে আছড়ে পড়ে ধ্বংস করে দেয় এবং প্রচণ্ড ধাক্কাজনিত তরঙ্গকে বিমুক্ত করে।

www.bjilibrary.com

নক্ষত্রের রয়েছে কেন্দ্রী অংশ যা নিউট্রন সহযোগে গঠিত। এই পর্যায়ে নক্ষত্রকে নিউট্রন নক্ষত্র নামে আখ্যায়িত করা হয়। এর রয়েছে প্রতি সিসিতে১০^{১৪} গ্রাম-এর বিপুল পরিমাণ ঘনত্ব। ভলিউম-১ এর Cm^3 আয়তনের একটি ঘনক্ষেত্র বিশিষ্ট লুডো খেলার পাশা যদি নিউট্রন নক্ষত্র পদার্থ দ্বারা পূর্ণ করা যায় তাহলে তার যে ওজন দাঁড়াবে তা এই পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যার মোট ওজনের সমান হবে। এই নিউট্রন নক্ষত্র সমূহ এক প্রচণ্ড শক্তিশালী চুম্বকীয় ক্ষেত্রকে সাথে নিয়ে দ্রুত আবর্তন করে এবং কম্পন সৃষ্টি করে। কখনও এক সেকেণ্ডেরও কম এই কম্পনের সময় মানুষের তৈরি যন্ত্র থেকেও সঠিক সময় জ্ঞাপন করে। সুতরাং নিউট্রন নক্ষত্রকে কম্পনধারণকারী (pulsars) নামে অভিহিত করা হয়।

যদি নক্ষত্র পিণ্ডটি আরও বেশী স্ফীত হয় ধরা যাক সূর্য পিণ্ড থেকে ১০০ অথবা ১০০০ গুণ বেশী, তাহলে শ্বেত বামন নক্ষত্রটি নিউট্রন পর্যায়ের বাইরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং বিপুল পরিমাণ নাক্ষত্রিক ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে দেয়। আর এগুলো পুড়ে গিয়ে যে আলো ছড়িয়ে দেয় তা সুপার নোভা সৃষ্টিকারী শত কোটি সূর্যের আলোর চেয়ে বেশী। অবশিষ্ট অংশটি এত ঘন থাকে যে এমন কী মহাকর্ষীয় আকর্ষণের মুঠি থেকে আলো বেরিয়ে আসতে পারে না। নক্ষত্রটি কেবলমাত্র দৃষ্টির বাইরে অন্তর্হিত হয়ে যায় এবং কৃষ্ণগহ্বরের সৃষ্টি করতে পারে এবং এটা সম্ভব হয় যখন এর সংগীর কাছ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ পিণ্ড এর উপর জমা করতে পারে এবং একটি সন্ধিক্ষণকালীন অবস্থায় ধাক্কা দিতে পারে।

নক্ষত্রমণ্ডলী ব্যতীত আল্লাহ তায়ালা আকাশমণ্ডলীতে আরও অন্যান্য বস্তুসমূহ স্থাপন করেছেন যাদের সব কিছু মিলিয়ে এই বিশ্ব জগৎ গঠিত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে গ্রহমণ্ডলী, উপগ্রহ দল, নক্ষত্রপুঞ্জ, নীহারিকাসমূহ, ছায়াপথ ও কোয়াসার।

গ্রহ ও উপগ্রহসমূহ ঃ সূর্য ছাড়া গ্রহ থেকে নক্ষত্রমণ্ডলী যদিও চাক্ষুষভাবে দেখা যায় না তবুও দৃঢ় প্রমাণ রয়েছে যে কিছুসংখ্যক নক্ষত্রের নিজস্ব গ্রহ রয়েছে যারা তাদের চারদিকে আবর্তন করে চলেছে। একটি নক্ষত্র (সূর্যের ন্যায়) ও এর নক্ষত্র সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার অবশিষ্ট (সৌরজগতের ন্যায়) নাক্ষত্রিক বস্তুসমূহ সংকোচনশীল গ্যাসের একই নাক্ষত্রিক মেঘমালা থেকে গঠিত হয়েছে এবং এই নক্ষত্র জগত স্ফীত হচ্ছে ও আবর্তন করছে। সূর্যের ন্যায় নক্ষত্রেরও ভাসমান পুঞ্জপুঞ্জ ধূলারাশির মেঘ কেন্দ্রে ঘনীভূত অবস্থায় রয়েছে। নক্ষত্রসমূহ গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি ছেড়ে গিয়ে চতুর্দিকে পরিবেষ্টনকারী নাক্ষত্রিক মণ্ডলের মাধ্যমে আকাশমণ্ডলীতে ছড়িয়ে রয়েছে।

নক্ষত্র পুঞ্জ ঃ আকাশে অবস্থিত বহুসংখ্যক বিচ্ছিন্ন নক্ষত্রের বাইরেও অনেক নক্ষত্র রয়েছে যারা মহাশূন্যে স্বীয় কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে। এছাড়া জোড়া নক্ষত্র

www.bjilibrary.com

পাওয়া যায় যেমন যুগ্ম নক্ষত্র, ত্রয়ী নক্ষত্র, বেশ কয়েকটি নক্ষত্র নিয়ে গঠিত বহুবিধ নক্ষত্র ও নক্ষত্রপুঞ্জ। এই নক্ষত্র পুঞ্জে একটি পুঞ্জের এজমালি কেন্দ্রের চারদিকে আবর্তন করে এবং সে পুঞ্জটি নক্ষত্রমণ্ডলীর একটি বড় দল। এদেরকে নক্ষত্রপুঞ্জ বলে। এ সকল নক্ষত্র পুঞ্জ মহাকর্ষীয় শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এদের মধ্যে মুক্ত নক্ষত্র পুঞ্জ ও ক্ষুদ্র গোলাকার পুঞ্জও রয়েছে। একটি ক্ষুদ্র বটিকাকৃতির বৃহৎ পুঞ্জের মধ্যে ১,০০,০০০ নক্ষত্রের স্থান হতে পারে। ধরে নেয়া হয় যে এ সকল ক্ষুদ্র নক্ষত্র পুঞ্জের উৎপত্তিস্থল একই।

নীহারিকা মণ্ডলী ঃ নীহারিকা বলতে গ্যাস ও ধূলাবালি মিশ্রিত মেঘ দলকে বুঝায়। এ সকল বস্তু নক্ষত্রমণ্ডলগত মহাশূন্যে পরিদৃষ্ট হয়। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে রক্তবর্ণ দৈত্যাকৃতির নক্ষত্র থেকে গ্যাসের পিণ্ডসমূহ একত্র প্রবাহ তাড়িত হয়, নক্ষত্রের অভ্যন্তর ভাগে প্রচণ্ড চাপ ও তাপের সংকোচনের কারণে নাক্ষত্রিক আবর্জনা ছড়িয়ে পড়ে এবং এর ফলে নোভা ও সুপার নোভার সৃষ্টি হয়। এ সকল বস্তু নক্ষত্রমণ্ডলীয় গ্যাস, ধূলাবালি প্রভৃতি মিলিয়ে নীহারিকা গঠন করে। নীহারিকাই হচ্ছে নক্ষত্রমণ্ডলী ও নক্ষত্রমণ্ডলীয় জগতের জন্মস্থান।

ছায়াপথস্থিত উজ্জ্বল নক্ষত্রমণ্ডলী ঃ নক্ষত্র মণ্ডলীর একটি আলগাভাবে মহাকর্ষ শক্তি দ্বারা আবদ্ধ ব্যবস্থা ছায়াপথ নামে পরিচিত। ছায়াপথসমূহ মহাবিশ্বের অন্তর্গত ইউনিট হিসেবে স্বীকৃত। এ যাবত দশ কোটিরও বেশী সংখ্যক ছায়াপথ চিহ্নিত করা হয়েছে। ছায়াপথের আকার ও গঠন ভিন্ন ভিন্ন। আমাদের ছায়াপথের গঠন সর্পিল। এই ছায়াপথে প্রায় ১০০ কোটি নক্ষত্র রয়েছে। ছায়াপথসমূহ একে অন্যের থেকে এক প্রচণ্ড গতিতে দূরে সরে যাচ্ছে।

কোয়াসার ঃ মহাবিশ্বে কোয়াসার হচ্ছে সবচেয়ে কৌতূহল উদ্দীপক ও তেজোময় বস্তু। মিল্কিওয়ের মত ছায়াপথ যার রয়েছে দশ হাজার কোটি নক্ষত্র, তার থেকেও ১০০ থেকে ১০০০ গুণ বেশী শক্তি নির্গত করতে পারে একটি কোয়াসার। কোয়াসার কখনও কখনও বৃত্তাকার বৈদ্যুতিক আলোকচ্ছটার এক সেকেণ্ডেরও কম ব্যাস বিশিষ্ট শক্তিশালী বিকীরণ উৎস হিসেবে কাজ করে। একটি আদর্শ নমুনার কোয়াসারের সম্পূর্ণ বিকীরণ দীপ্তিময়তা একটি স্বাভাবিক সর্পিল ছায়াপথের চেয়ে ১০ লক্ষ গুণ বেশী এরূপ কোয়াসারের ব্যাস ৩০০০০ গুণেরও কম। আকাশমণ্ডলীর এ সকল বস্তু ছায়াপথ বহির্ভূত নয়। তবে তাদেরকে অতি দূরবর্তী ছায়াপথের পর্যায়ভুক্ত করতে হবে। দু'হাজার কোটি আলোক বর্ষের দূরত্বে কোয়াসার সমূহকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সকল কোয়াসার আলোর গতির ৯০% গতিতে অপসৃত হয়ে চলেছে। এ সকল তত্ত্ব হচ্ছে এই যে কোয়াসারমণ্ডলী এখনও অদৃশ্য ছায়াপথ যার কেন্দ্রে রয়েছে বিশালাকারের কৃষ্ণগহ্বর।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Year Book of Astronomy, 1983.
2. National Geographic, June, 1983.

www.bjilibrary.com

পরিশিষ্ট-২

মহাবিশ্ব সৃষ্টির আধুনিক তত্ত্ব

কীভাবে মহাবিশ্বের শুরু হয়েছে? কখন এর শুরু ? আদি প্রাচীন সভ্যতা থেকে এ সকল প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য মানুষের অনুসন্ধিৎসা জেগেছে এবং অতীতে এ বিষয়ে বহু কল্পকাহিনীর জন্ম হয়েছে। এসব প্রশ্নের উত্তরের জন্য আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অনেককে নিয়োজিত রেখেছে। মনুষ্য প্রকৃতিকে জানা দেশ, ভূমির আবিষ্কারকদের সাথে তুলনীয় হতে পারে। এই তুলনা আবিষ্কারকের চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত আকাশমণ্ডলীতে অবস্থিত গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রের মহাবিস্তারের সাথেও করা যেতে পারে। কেবল মাত্র বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান সৃষ্টির উৎস সম্বন্ধে সেই বিখ্যাত 'মহানাদ তত্ত্বে' (Big Bang theory) এই ধাঁধার ইঙ্গিত প্রদান করেছে। প্রায় ১৫ শত কোটি বছর আগে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে এই মহানাদ তত্ত্ব প্রায় নিশ্চিতভাবে কিছু ইঙ্গিত প্রকাশ করেছে।

Red Shift ঃ জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে বেশ কিছুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির কলাকৌশল এই বিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি প্রযুক্তিতে অনেক দূরের কোন নক্ষত্র বা ছায়াপথ থেকে আসা আলো দীর্ঘ সময় ধরে ধারণ করার কৌশল আয়ত্ব হয়েছে। বহু দূরবর্তী নক্ষত্র থেকে আলো ধারণের জন্য শক্তিশালী টেলিস্কোপ তৈরি করা হয়েছে যা ধারণকৃত আলো দ্বারা আলোকচিত্রের প্লেইটের উপর প্রতিচ্ছবি তৈরি করা যায়। আরেকটি পদ্ধতিতে আকাশমন্ডলীতে অবস্থিত নক্ষত্রাদি থেকে আসা আলো বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে খণ্ড বিখণ্ড করা হয় এবং এই পদ্ধতিতে বিজ্ঞানীগণ যে উপাদান অথবা অণু থেকে আলোর উৎপত্তি তা চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। আমাদের নিকট থেকে একটি নক্ষত্রের দূরে সরে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রায় সকল পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্রের পরিচিত "ডপলার প্রভাব" (Doppler effect) -এর সাহায্যে জানা যায় যে আলোর সমগ্র বর্ণচ্ছটা লাল বর্ণের অথবা দীর্ঘ তরঙ্গের প্রান্তের দিকে স্থান পরিবর্তন করে। একেই জ্যোতির্বিদ্যায় লাল বর্ণের স্থানান্তরকরণ (red shift) বলে অভিহিত করা হয়। ১৮৮৮ সালে জার্মান জ্যোতির্বিদ এইচ সি ভোগেট (H.C. Voget) প্রথম নক্ষত্রের আলোর মধ্যে red shift আবিষ্কার করেন। red shift -এর খোলামেলা ব্যাখ্যা দ্বারা আকাশমণ্ডলীতে অবস্থিত বস্তুসমূহের তাপমাত্রা, আকার, গঠন কাঠামো ও গতি সম্পর্কিত তথ্য জানা সম্ভব করেছে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে radio astronomy নামে পরিচিত একটি নতুন ও অতি শক্তিশালী পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে। এর দ্বারা জ্যোতির্বিদগণ আকাশমণ্ডলীর বহু দূরবর্তী অঞ্চলে তাদের আবিষ্কার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন। আর সে অঞ্চল

www.bjilibrary.com

এতই দূরবর্তী যে এখনও পর্যন্ত চোখ দিয়ে পর্যবেক্ষণ উপযোগী অতি শক্তিশালী টেলিস্কোপ দিয়ে সে সকল নক্ষত্রের নিকট পৌছান যায়নি। এই প্রযুক্তিতে আকাশ মণ্ডলীর বস্তুসমূহ থেকে যে বেতার সংকেত পাওয়া যায় তা বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে স্থাপিত রাডারের মাধ্যমে ধারণ করা হয়। রাডার (Radar) হচ্ছে Radio Detection and Ranging-এর আদ্যাক্ষর নিয়ে গঠিত একটি পরিভাষা। ঐশী বস্তুসমূহ থেকে গৃহীত বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের (frequencies) বেতার সংকেতের উপর ডপলার প্রভাব কাজ করে যার ফলে এ সকল সংকেতের বিশ্লেষণ আমাদেরকে বিভিন্ন বস্তুর উৎস সম্পর্কে অতি মূল্যবান তথ্য প্রদান করে। এসব হচ্ছে ক্ষুদ্র উপাদান বা অণু যা থেকে বেতার সংকেতের উৎপত্তি হয় এবং তাদের তাপমাত্রা, আকার, গঠন কাঠামো ও গতি সম্পর্কে জানা যায়।

হাবলের নিয়ম (Hubble's Law) ঃ ১৯২৯ সালে হাবল ঘোষণা করেন যে ছায়াপথসমূহ আমাদের নিকট থেকে সব দিকে সরে যাচ্ছে। একটি ছায়াপথের দূরত্ব ও এর পিছনে সরে যাওয়ার বেগ-এর মধ্যে একটি রেখাগত বৈশিষ্ট্য আছে। একটি ছায়াপথের এই সরে যাওয়ার প্রেক্ষিতে এর দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। (চিত্র-১)। একেই হাবলের নিয়ম বলা হয়। বিখ্যাত Mount Wilson astro laboratoryতে গবেষণাকালে হাবল ছায়াপথ পুঞ্জের red shift প্রত্যক্ষ করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

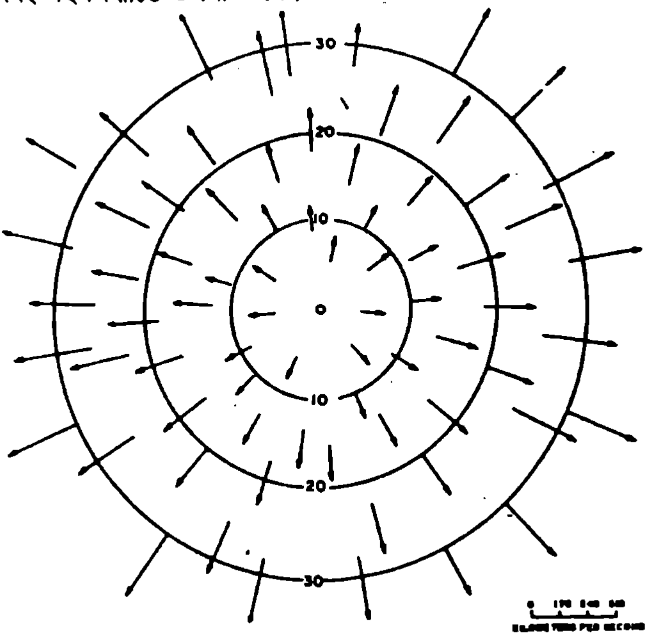

চিত্র-১ ঃ মহাবিশ্বের কেন্দ্রে একজন পর্যবেক্ষককে স্থাপন করলে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে যে এই কেন্দ্র থেকে সকল দূরবর্তী ছায়াপথ ক্রমবৃদ্ধিমান গতিবেগের সাথে দূরে সরে গিয়ে ক্রমেই দূরত্ব বৃদ্ধি করছে।

www.bjilibrary.com

'হাবলের ধ্রুবক' (Hubble's Constant) নামে পরিচিত বহু ছায়াপথের দূরত্ব ও বেগমাত্রার অনুপাতের সবচেয়ে ভাল হিসাব হচ্ছে প্রায় ৬১ ইউনিট (কিঃমিঃ/ সেকেণ্ড/ ১০ লক্ষ আলোকবর্ষ)। এই অনুপাতের বিপরীত অবস্থাকে হাবলের কাল (hubble's time) ধরা হয়। এই কাল হচ্ছে কোন একটি ছায়াপথকে বর্তমান গতিবেগে তার বর্তমান অবস্থানে পৌঁছানর জন্য যে সময় অতিবাহিত হয়, অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে যখন মহানাদের (Big Bang) ঘটনা ঘটে তখন থেকে নিরুপিত সময় হচ্ছে 'হাবলের কাল।' তদনুসারে ১৫শত কোটি বছর পূর্বে কোন সূর্য, নক্ষত্র, ছায়াপথ ছিল না অর্থাৎ তখন কোন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অস্তিত্ব ছিল না।

মহানাদ (The Big Bang) ঃ হাবলের অসাধারণ আবিষ্কার যে এই মহাবিশ্ব সব দিকেই সম্প্রসারিত হচ্ছে-এর চৌদ্দ বছর আগে ১৯১৫ সালে আলবার্ট আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত 'আপেক্ষিক তত্ত্ব' উপস্থাপন করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে পুঞ্জের বা পিণ্ডসমূহের মহাকর্ষীয় প্রভাব মহাশূন্যে ছড়িয়ে রয়েছে এবং যথাসময়ে চলাচল করে। এই প্রভাব চতুর্মাত্রিক ব্যাপ্তি-কাল-অনবচ্ছেদ বস্তুর বক্রতার পরিমাণের সমান। ইউক্লিডের জ্যামিতি অনুসারে ভূপৃষ্ঠকে সমতল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত আইনস্টাইনের ব্যাপ্তি-কাল-অনবচ্ছেদতার তত্ত্ব অনুযায়ী আর কার্যকর নেই। সমান্তরাল রেখা সম্পর্কে ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ হচ্ছে যে একটি সমতলের উপর একটি নির্দিষ্ট সরল রেখার সাথে কেবল মাত্র একটি সমান্তরাল রেখা যদি সরল রেখার কোন বিন্দুর, যা সরল রেখার উপরে অবস্থিত নয়, মধ্য দিয়ে টানা যায় তাহলে অইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে তা উল্টিয়ে ফেলা হয়, উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে একটি না-ধর্মী বক্রতলের উপর ধরাকৃতি (geodesics) নামে অভিহিত বহুসংখ্যক সরল রেখা কোন একটি নির্দিষ্ট ধরাকৃতির উপরে অবস্থিত না হয়ে অন্য কোন বিন্দুর মধ্য দিয়ে টানা যায় এবং তা কখনও ধরাকারকে আড়াআড়িভাবে ছেদ করবে না। ত্রিভুজের সকল কোণের সমষ্টি ১৮০° ডিগ্রি এই ইউক্লিডীয় উপপাদ্য একটি বক্রতলের উপর আর কার্যকর নেই। প্রাসঙ্গিক গাণিতিক সমীকরণ বিশ্লেষণ করে আইনস্টাইন ১৯১৭ সালে বর্তুলাকার বিশ্ব তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। এই মডেলে বা তত্ত্বে স্থানাঙ্ক বক্রভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যেমন ভূ-পৃষ্ঠের উপর অক্ষাংশ বা দ্রাঘিমাংশ স্থাপন করা হয়েছে এবং সময়ের অক্ষরেখা সোজা সরল পথে চলে গিয়েছে। আইনস্টাইন উদ্ভাবিত বিশ্ব স্থির, এর মধ্যস্থিত ছায়াপথ সমূহকে সবলে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে এবং এরা একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে না। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে আলেকজাণ্ডার এ ফ্রিডম্যান (Alexander A. Friedmann) নামে একজন রুশীয় পদার্থবিদ আবিষ্কার করেন যে

আইনস্টাইনের স্থির বিশ্বের তত্ত্বে একটি ভুল রয়েছে, এটি হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় শূন্য দ্বারা বিভক্তিকরণ। আইনস্টাইনের সমীকরণের সম্ভাব্য সমাধান হিসাবে তিনি দু'টি অস্থিতিশীল মডেল প্রণয়ন করেন। এর একটি হচ্ছে কালের সাথে নিখিল বিশ্বের সম্প্রসারণ ঘটছে এবং অন্যটিতে সংকোচন হচ্ছে। সে সময়ে কেউই এই ঐতিহাসিক তত্ত্বীয় ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি কোন দৃষ্টি দেননি।

এভাবে ফ্রিডম্যান ও হাবল একটি সম্প্রসারণশীল বিশ্ব তত্ত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। শীগ্‌গির বেলজীয় জ্যোতির্বিদ জর্জেস লেমাইতের (Georges Lemaitre) প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে আমাদের এই বিশ্ব অতি উঁচু মাত্রার একত্রে ঠেসে থাকা এবং অতি মাত্রার তাপীয় অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করেছে। এরূপ অবস্থাকে 'বিশ্বের আদিযুগীয় পরমাণু' নামে অভিহিত করা হয়। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ অর্থাৎ মহানাদ (Big Bang) দ্বারা সংঘটিত অতি উচ্চমাত্রার উত্তপ্ত (১০^{১৩} ডিগ্রি কিলোয়াট), অতি ঘন ও অতি ক্ষুদ্রাকৃতির বিশ্বের আদিযুগীয় পরমাণুর সম্প্রসারণের সাথে সাথে মহাবিশ্বের সৃষ্টি শুরু হয়েছে।

স্থির অবস্থা তত্ত্ব (The Steady State Theory) ঃ ১৯৪৮ সালে ৩ জন ব্রিটিশ তাত্ত্বিক হারমান বণ্ডি (Hermann Bondi), টমাস গোল্ড (Thomas Gold) ও ফ্রেড হয়েল (Fred Hoyle) এই নিখিল বিশ্ব সৃষ্টির বিকল্প তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। বিশ্বের স্থির অবস্থা তত্ত্বে হাবলের নিয়মকে অবিকল রেখে এই বিশ্ব ক্রমাগত সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে, কিন্তু বিশ্বের শুরুর (t=o) অথবা সমাপ্তির কোন উদাহরণ নেই। দার্শনিকভাবে 'কোন শুরু বা কোন সমাপ্তি নেই' তত্ত্ব বেশ আকর্ষণীয়। গাণিতিকভাবে এই মহাবিশ্ব পদার্থের ক্রমাগত সৃষ্টির ফলে উদ্ভূত হয়েছে কারণ, মহাবিশ্ব এক অবিরাম ঘনত্ব বজায় রেখে সম্প্রসারিত হচ্ছে। পদার্থের ক্রমাগত সৃষ্টির দ্বারা পদার্থ ও শক্তির সংরক্ষণ বিধানের লংঘনকে নেতিবাচক শক্তির বিচ্ছুরণের একটি ভাণ্ডারের কল্পনা দ্বারা প্রতিরোধ করা হয়েছে, এই ব্যবস্থাকে G-field বলা হয়।

৩° কিলোওয়াট পশ্চাদস্থানের বিচ্ছুরণ ও মহানাদ তত্ত্বের নিশ্চিত প্রমাণ ঃ ১৯৪৬ সালে জর্জ গ্যামো একটি মহানাদের (Big Bang) ফলে সংঘটিত আদিযুগীয় বিস্ফোরিত পরমাণুর কেন্দ্রগত অংশের তাপমাত্রা নির্ধারণ এবং এর ফলাফল আবিষ্কারের সাহসিকতা প্রদর্শন করেন। তাপমাত্রা নির্ধারণের বিস্তারিত বিষয়বস্তু বেশ চিত্তাকর্ষক। এটা খুবই বিস্ময়কর যে এত দীর্ঘকাল পূর্বে কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে কী পরিমাণ নির্ভরতার সাথে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। বিশ্বের আদিযুগীয় পরমাণুকে একটি অদ্ভুত উঁচু ঘনমাত্রায় একত্রে সংবদ্ধ করা হয়েছিল। এক ভয়াবহ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের পর মহাবিশ্ব শীতল হতে শুরু করে। জর্জ গ্যামো (George Gamow) ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে উত্তপ্ত যুগে

www.bjilibrary.com

স্থিতিশীল রশ্মি বিচ্ছুরণ শীতল হয়ে পড়ে। পশ্চাদভূমির বিচ্ছুরণ হিসেবে এমনকি বর্তমান কালেও তা দৃষ্টিগোচর হয়। এই বিচ্ছুরণ বেতারের অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যথা প্রায় ২ মি. মি. পর্যন্ত উঠে এবং এর অনুরূপ ৩° ডিগ্রি কিলোওয়াট তাপমাত্রার কালো রশ্মি বিচ্ছুরণ হয়। ১৯৬৫ সালে আমেরিকার বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরীজ-এর দু'জন পদার্থবিদ আর্নো পেনজিয়াস (Arno Penzias) ও রবার্ট উইলসন (Robert Wilson) ৩° ডিগ্রি কিলোওয়াট তাপমাত্রার পশ্চাদভূমির বিচ্ছুরণ আবিষ্কার করে এক যুগান্তকারী ঘটনার জন্ম দেন। আর এই বিচ্ছুরণ ছিল মহানাদের (Big Bang) অবশিষ্ট যৎসামান্য পরিমাণ অংশ মাত্র। এই আবিষ্কার "স্থির অবস্থা তত্ত্বের" (The Steady State Theory) এবং প্রতিষ্ঠিত মহানাদ তত্ত্বের উপর ছিল এক চরম আঘাত।

ছায়াপথ পুঞ্জ, নক্ষত্রমণ্ডলী ও গ্রহ-উপগ্রহের উৎপত্তি ঃ মহানাদের ফলে ছায়াপথ পুঞ্জ, নক্ষত্রমণ্ডলী ও গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। কালের শুরুতে যা ছিড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল তাই এখন একটি সংগঠিত পদ্ধতির আকার পরিগ্রহ করেছে। বর্তমান কালে বিজ্ঞানীগণ বিশ্বাস করেন যে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের পর এক সেকেণ্ডের মধ্যে তাপমাত্রা ১০^{১০} ডিগ্রি কিলোওয়াটে নেমে আসে। এই অবস্থায় মহাবিশ্ব কেবলমাত্র অযৌগিক পদার্থ যেমন প্রোটন, ইলেক্ট্রন, নিউট্রিনো ও এর বিপরীত পদার্থ ধারণ করে। ১০০ সেকেন্ড পরে তাপমাত্রার আরও পতন হয় এবং ১০^{৯} ডিগ্রি কিলোওয়াটে এসে দাঁড়ায়। প্রোটন ও নিউট্রন এই তাপমাত্রায় একত্রিত হয়। হালকা উপাদানের কেন্দ্রী অংশ যেমন হাইড্রোজেনের আইসোটোপ হিলিয়াম ও লিথিয়াম গঠিত হয়। হাইড্রোজেনের একটি আইসোটোপ ডিউটেরোন হচ্ছে প্রথম পারমাণবিক একত্রীভবন, এতে প্রোটন ও নিউট্রন থাকে। তারপর ২টি প্রোটন ও ১টি নিউট্রন একত্রিত হয়ে একটি হিলিয়াম আইসোটোপের কেন্দ্রী অংশ গঠন করতে পারে। এই প্রক্রিয়া প্রায় ১০০০ সেকেণ্ড পর্যন্ত চলতে থাকে এবং তাপমাত্রা ১০^{৮} ডিগ্রি কিলোওয়াটে নেমে এলে এই প্রক্রিয়ার বিরতি ঘটে। এত নিচু তাপমাত্রায় পারমাণবিক বিকিরণ সম্ভব হয় না। এই পর্যায়ে মহাবিশ্বে ফোটন, প্রোটন, নিউটিনো, ইলেকট্রন ও হিলিয়ামের কেন্দ্রী অংশ বিরাজ করে। পারমাণবিক সংশ্লেষণে সকল নিউট্রন নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং মহাবিশ্বের ঘন পিণ্ডের ২৫% থেকে ৩০% হিলিয়ামের কেন্দ্রী অংশে রূপান্তরিত হয়।

www.bjilibrary.com

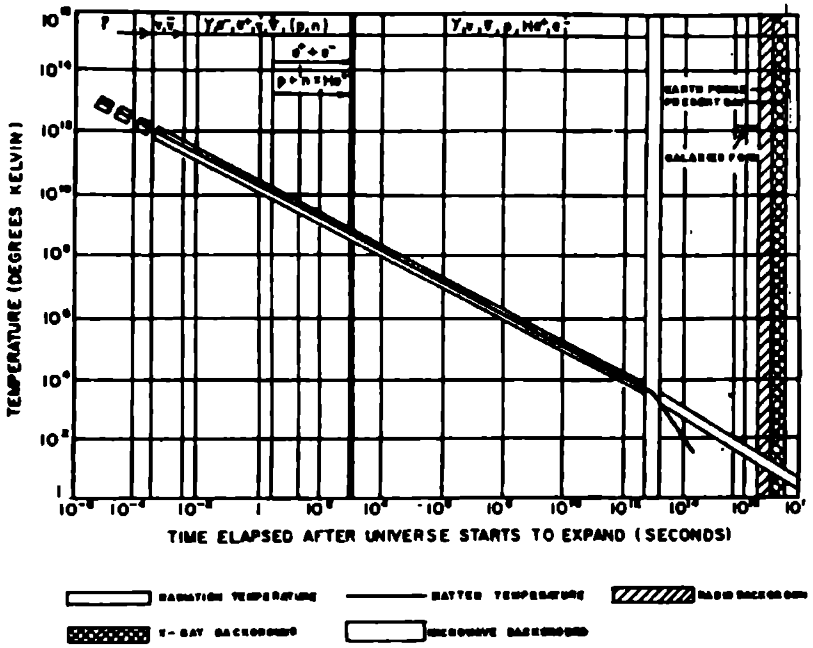

চিত্র-২

চিত্র ২ ঃ মহানাদ (Big Bang)-এর পর পদার্থের সৃষ্টির একটি সরল চিত্র।

পরবর্তী ১০ লক্ষ বছরে মহাবিশ্ব যেমন সম্প্রসারিত হয় তেমনি শীতল হতে থাকে এবং এই প্রক্রিয়া তাপমাত্রা ৩০০০° কিলোওয়াটে নেমে আসা পর্যন্ত চলতে থাকে। এ সময় প্রোটন ইলেকট্রনকে ধরে ফেলে হাইড্রোজেন পরমাণু গঠন করে। এই পর্যায়কালে কেবলমাত্র হালকা উপাদান গঠিত এবং অভিকর্ষ শক্তি দ্বারা পদার্থ ক্রমোন্নতিমূলকভাবে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে প্রথমে ছায়াপথ পুঞ্জে এবং শেষে বর্তমানে পরিদৃষ্ট ছায়াপথ ধরনের বস্তুসমূহে এই ক্রিয়া চলতে থাকে। (চিত্র-৩)। মহাকর্ষীয় অস্থিরতা তত্ত্বের সমস্যা হচ্ছে এটা ব্যাখ্যা করতে পারে না কেন ছায়াপথ পুঞ্জ পাক খেয়ে খেয়ে ঘোরে এবং কোথা থেকে কৌণিক ভরবেগের সৃষ্টি হয়। বিকল্প তত্ত্বের সবশেষ বিশ্লেষণে বিশ্ব জগত সৃষ্টি সংক্রান্ত একটি অপরিহার্য আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে যা এই নিখিল বিশ্বের উদ্ভব কালে বিদ্যমান ছিল। যাহোক, এই চিত্রটি এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়।

নক্ষত্রমণ্ডলী ঃ একটি নক্ষত্রের মধ্যকার বিভিন্ন পর্যায়ের অনুক্রম পরিশিষ্ট-১-এ বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। হালকা মৌলিক পদার্থের গঠন সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। পারমাণবিক সংশ্লেষণ তত্ত্ব প্রমাণ করে যে সাধারণ নক্ষত্রের অভ্যন্তর ভাগ ভারী পদার্থ দ্বারা গঠিত।

www.bjilibrary.com

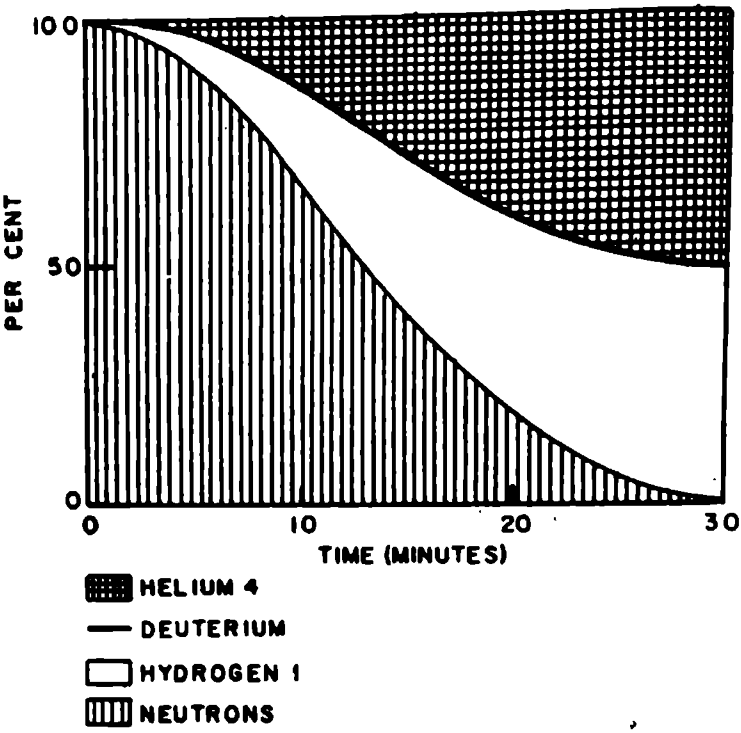

চিত্র-৩

মহানাদের (Big Bang) পর প্রথম ৩০ মিনিটে তাপীয় পারমাণবিক প্রতিক্রিয়ার ফলে কিছুসংখ্যক প্রাথমিক পরমাণুর কেন্দ্রী অংশ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর সৃষ্টি হয়।

বর্তমানে এটা ধারণা করা হয় যে নক্ষত্রমণ্ডলগত মহাশূন্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্যাসীয় মেঘমালা ও মহাজাগতিক ধূলিকণা থেকে ঘনীভবন প্রক্রিয়া সূর্য ও গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। ছায়াপথ পুঞ্জের গঠন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার শত শত কোটি বছর পর প্রায় ৫০০ কোটি বছর পূর্বে ক্ষুদ্রাকারের গ্যাসীয় মেঘমালা ও ধূলিকণা ঘনীভূত হওয়ার প্রাক্কালে শুরু থেকেই পাক খেয়ে ঘুরতে থাকে। আর যত বেশী ঘনীভূত হয় ততই এর পাক খেয়ে ঘোরার গতি বৃদ্ধি পায়। কৌণিক ভরবেগের অক্ষুণ্ণতার কারণে এটা ঘটে। সম্ভবত বস্তুর বলয়সমূহ সৌর নীহারিকা (সৌরজগত বহির্ভূত ধূলিকণা ও গ্যাস) কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে যায়, কারণ এটা এর কেন্দ্রের দিকে সংকুচিত হতে থাকে। ঘূর্ণনরত সৌর নীহারিকার কেন্দ্রীয় অংশ protosun গঠনের জন্য সংকুচিত হয় এবং অবশেষে নিজেই সূর্য হওয়ার জন্য আরও পরে

www.bjilibrary.com

গিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আরও বেশী মহাকর্ষীয় পতনের ফলে সৌর নীহারিকার বহির্বলয়সমূহ গ্রহ-উপগ্রহের জন্ম দেয়। সূর্য তখন এতই বৃহদায়তনের ছিল যে মহাকর্ষীয় সংকোচন থেকে সংগৃহীত তাপ শক্তি থেকে সে তার কেন্দ্রকে উত্তপ্ত করতে যথেষ্ট ছিল। আর এই তাপশক্তি সূর্যের অভ্যন্তরে পারমাণবিক একীভবন প্রতিক্রিয়ার সূচনা করে যা থেকে তাপের বিকীরণ ও আলোর বিকাশ ঘটে এবং বর্তমানে আমরা যেমন আমাদের নিজস্ব সূর্য থেকে তাপ ও আলো গ্রহণ করছি। গ্রহ, উপগ্রহ এমন কোন বৃহদায়তন বিশিষ্ট নয় যা পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য প্রচণ্ডভাবে তাপের সৃষ্টি করতে পারে।

বিশ্ব জগতের ভবিষ্যৎ ঃ মূল প্রশ্নটি হচ্ছে এই বিশ্বজগত কী চিরকাল এক অনন্তের দিকে ক্রমাগত সম্প্রসারিত হতে থাকবে অথবা যদি অভিকর্ষ যথেষ্ট শক্তিশালী হয়, তাহলে সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া ক্রমান্বয়ে থেমে যাবে এবং সংকোচন শুরু হবে। এই শেষের সম্ভাব্যতা অনেক কম্পনের জন্ম দিতে পারে অথবা ফ্রিডম্যানের জ্যামিতিতে একটি কম্পনশীল বিশ্বের সৃষ্টি হতে পারে। সকল সাম্প্রতিক পরীক্ষামূলক গবেষণা হতে দেখা যায় যে এই মহাবিশ্ব এর সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া বন্ধ করবে না। যাহোক তবু শেষ উত্তর আমাদের কারুরই জানা নেই।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Gamow, G. The Evolutionary Universe, Scientific American, Sept. 1956.
2. Gamow, G. The Creation of the Universe, Viking, 1952.
3. Webstar, A. The Cosmic Background Radiation, Scientific American, Aug. 1970.
4. Weinberg, S. Gravitation and Cosmology, Wiley, 1972.
5. Gott III. J.R. Gunn, J. E. Schramm DIN. and Tinsley, B. M. Will the Universe Expand Forever? Scientific American, March, 1976.
6. Pasachoff, Jay M. Contemporary Astrophysics, W. B. Saunders Co. London, 1977.

www.bjilibrary.com

পরিশিষ্ট-৩

এইড্‌স্ Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)

১৯৭৯-৮১ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ডাক্তার মাইকেল গটলিয়েভ তিন জন সমকামী পুরুষ রোগীর মধ্যে কিছু নতুন ধরনের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করেন। এরা ফুসফুসে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত ছিল যার কারণ ছিল নিওমোসিষ্টিস্ কেয়ারিনিস (Pneumocystis Carenis Pneumonia= PCP) নামক রোগ জীবাণু যা সাধারণত সুস্থ লোককে আক্রমণ করে না। কোন রোগে দুর্বল হয়ে গেলে এই জীবাণু আক্রমণ করতে পারে। ডাঃ গটলিয়েভ হঠাৎ ভাবলেন যে তিনি হয়তো এমন কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করছেন যা চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইতিহাস সৃষ্টি করবে। তবে তখনও তিনি এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি। পরে ১৯৮১ সালের জুন মাসে তিনি এই রোগের বিবরণ যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে (Centre for Disease Control= CDC) পাঠিয়ে দেন। এরমধ্যে ডাঃ গটলিয়েভ তার চতুর্থ রোগী হাতে পেলেন এবং পরীক্ষা করে দেখলেন যে এদের সবার শরীরের রোগ প্রতিরোধক হেলপার টি-সেল (Helper T-Cell) প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে।

CDC এই রোগের নাম দেয় Acquired Immune Deficiency Syndrome বা AIDS[১]। তাদের এই নতুন নামে হাসপাতালে আরও ৫ জন ইতিপূর্বে সুস্থ সমকামীর ফুসফুসে নতুন ধরনের রোগ পাওয়া যায় গটলিয়েভ যার নাম দেন PCP (Pneumocystis Carenis Pneumonia)। পরে ১৯৮১ সালেই নিউইয়র্ক ও ক্যালিফোর্নিয়ায় ২৬ জন সমকামী হঠাৎ Kaposi's Sarcoma রোগে আক্রান্ত হয় এবং এদের ৮ জন এক বছরের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করে। এই রোগ সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী কোন কোন ভূমধ্যসাগর পারের দেশবাসী এবং ইয়াহুদীদের মধ্যে ৬০ বছরের বেশী বয়স্কদের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু এই সব সমকামীদের বয়স ছিল মাত্র ২০ থেকে ৪০ বছর যাদের পূর্ব পুরুষদের কেউই ভূমধ্যসাগর এলাকাবাসী ছিল না অথবা তাদের এমন কোন রোগের ইতিহাস ছিল না যার ফলে তাদের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে। এমনিভাবে যুবকদের মধ্যে PCP বা Kaposi's Sarcoma দেখা দেওয়াকেই AIDS রোগের প্রধান লক্ষণ হিসাবে নির্ধারিত হয়।

www.bjilibrary.com

CDC কর্তৃক প্রদত্ত এবং WHO সমর্থিত AIDS রোগের সংজ্ঞা

এটা বিশ্বাসজনকভাবে নির্ণীত রোগ যাতে শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা মোটামুটি হ্রাস পেয়েছে বলে পাওয়া যায় (যেমন PCP, Kaposi's Sarcoma, candidiasis etc)। অথচ যার এমন কোন প্রমাণিত কারণ পাওয়া যায় না যার ফলে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে।

এইড্স্-এর সংক্রামক প্রকৃতি (Epidemiology)

যুক্তরাষ্ট্রে হঠাৎ এইড্স্ রোগের প্রকাশ এবং দ্রুত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি গোটা পশ্চিমা জগতে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। এই রোগ খুব মারাত্মক বলে প্রমাণিত হয়। কারণ, গত তিন বছরে শতকরা ৮৫% রোগী মৃত্যুবরণ করে। গোটা যুক্তরাষ্ট্রে এই রোগীর সংখ্যা ১৯৮১ সালের পূর্বে ছিল ৬৪, আর ১৯৮৫ সালের জুলাই মাসে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ১২,০৬৭ তে যার অর্ধেকই ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। ১৯৮৮ সালের এপ্রিল মাসে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রে এই রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ৫৪,০০০।

যুক্তরাজ্যে এই সংখ্যা যথাক্রমে ১,২৪১ এবং ১২২৭ যার অর্ধেক মারা গিয়েছে। যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপীয় ১৭টি দেশে এই রোগীর সংখ্যা ৯৪০ থেকে বহু হাজারে উপনীত হয় ১৯৮৮ সালের এপ্রিল মাসে।[২]

ইউরোপ ও আমেরিকার বেশির ভাগ উন্নত দেশেই এইডস ধরা পড়েছে। মধ্য এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় এক বিরাট সংখ্যক এইডস রোগীর সন্ধান পাওয়া গেছে। ফ্রি সেক্সের কারণে মুসলিম কালো আফ্রিকার জাতিগুলোর মধ্যে এইডস ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে-বিশেষ করে জিম্বাবুয়ে যেখানে ৫০%-৬০% লোক এইডস-এ আক্রান্ত।

এ পর্যন্ত এশিয়া মহাদেশে এই রোগের সংখ্যা খুব কম। তবে যাদের এই রোগ হয়েছে তাদের সবার মধ্যে পাশ্চাত্য দেশসমূহের সম্ভাব্য কারণসমূহ পাওয়া গেছে। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশে খুব অল্পসংখ্যক রোগী এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

কাদের এইড্স্ রোগ হতে পারে ?

নিম্নেবর্ণিত ব্যক্তিদের মধ্যে এইড্স্ রোগের সংক্রমণ হতে পারে ঃ

(১) **সমকামী ও দ্বিলিঙ্গগামী পুরুষ ঃ** এ পর্যন্ত ৯০-৯৫% এইড্স্ রোগীই পুরুষ যাদের ৭৫% সমকামী অথবা বহুগামী। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে মোট সমকামীর সংখ্যা যথাক্রমে ১ কোটি ২০ লক্ষ এবং ৯৬ লক্ষ বলে জানা যায় (অজানা সংখ্যা আরও বেশী)। সুতরাং এইসব দেশে অদূর ভবিষ্যতে এই রোগের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।

www.bjilibrary.com

যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৯০ জন সমকামী পুরুষের বয়স ২০-৪৯ বছর এবং এদের মধ্যে সব জাতীয় লোকই রয়েছে। সমকামীরা পুরুষ সমকামীদের সঙ্গে গুহ্যদ্বার দিয়ে যৌন সঙ্গম করার সময় (sodomy) বীর্য ও রক্তের মাধ্যমে এইড্‌স্ রোগে আক্রান্ত হয়। এদের কেউ কেউ বহু সমকামী (বৎসরে ৫০ জন নতুন সমকামী বা তারও বেশী) অথবা নিত্য বা অনিত্য সাথীদের সঙ্গে মৈথুনে অভ্যস্থ। এইড্‌স্ আক্রান্ত সমকামীদের এইড্‌স্‌মুক্ত সমকামীর তুলনায় অনেক বেশী যৌন সাথী থাকে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে এইড্‌স্ রোগীদের শতকরা ৫০ জনের প্রতিমাসে ১০ বা ততোধিক যৌনসঙ্গী ছিল এবং যৌন সাথীর সংখ্যা বছরে ১ থেকে ১০০০ পর্যন্ত ছিল।[৩]

পুরুষের বৃহদন্ত্রে (rectum) অন্য ব্যক্তির বীর্যপাত হলে তা বিজাতীয় (foreign) বা ভিন্ন এন্টিজেন (antigen) হিসেবে কাজ করে এবং এর ফলে বীর্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির রক্তে এর এন্টিবডি (antibody) তৈরি হয়। এসব এন্টিবডিগুলো auto-antibody জাতীয় বলে সেই ব্যক্তির নিজস্ব জীবকোষকেও প্রভাবিত করে বিশেষ করে T-lymphocytes সমূহকে। এর শেষ পরিণতি হলো শরীরের রোগ প্রতিরোধ শক্তির হ্রাস। এই অবস্থা ইঁদুরে পরীক্ষা করেও পাওয়া গেছে। সমকামী পুরুষের বৃহদন্ত্রে বারবার ভিন্ন ব্যক্তির বীর্যের সংস্পর্শের ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়, এই পরিবর্তন এইড্‌স রোগীর বেলায় সত্য।[৪]

(২) **ইনজেকশানের মাধ্যমে নেশার ওষুধ গ্রহণ করা ঃ** যুক্তরাষ্ট্রের সমকামী ছাড়া এইড্‌স্ রোগীদের (পুরুষ ও নারী উভয় ক্ষেত্রে) প্রায় শতকরা ৬০% জনই এ ধরনের নেশাকর ওষুধ ইনজেকশান নিয়ে তাকে। সমকামী পুরুষদের মধ্যেও এই বদ অভ্যাস খুব বেশি। সাধারণত হেরোইন ও কোকেন এই উদ্দেশ্যে বেশি ব্যবহৃত হয়। এই সব নেশাকর বস্তু নিজেদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করে। কিন্তু একই সুচ একাধিক ব্যক্তির ব্যবহারের ফলে বিশেষ করে ইনজেকশানের জন্য নেশাকারী দল বেঁধে হাজির হলে একই সুচ অনেকে ব্যবহার করে থাকে। তার ফলে হেপাটাইটিস B ভাইরাসের মত এইড্‌স্ ভাইরাসও বিস্তার লাভ করে। নেশাকারীদের মধ্যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম এইড্‌স্ ভাইরাসের এন্টিবডি পাওয়া যায় যেমন যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৮৭ জন, স্পেনে শতকরা ৩৭ এবং যুক্তরাজ্যে মাত্র ১.৫% জনে।[৫] একটি আশ্চর্য ব্যাপার এই যে এইড্‌স্ রোগীর শতকরা ৮০ জনের রক্তে হেপাটাইটিস B ভাইরাসের এন্টিবডি রয়েছে- যা তাদের পূর্বের বা বর্তমান রোগের কারণে ঘটেছে। আবার যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৯০ জন হেপাটাইটিস B রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা তিনটি এইড্‌স্ রোগের সম্ভাবনাপূর্ণ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত যেমন, সমকামী, সুচ দিয়ে নেশাকারী, এবং হিমোফিলিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তি।

www.bjilibrary.com

(৩) **হিমোফিলিয়া রোগী (Haemophiliacs) :** এইসব রোগীরা রক্ত জমাট বাঁধার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় দুটি জিনিসের factor VIII ও IX স্বল্পতার শিকার যা জন্মগতভাবেই এসেছে। ফলে খুব সামান্য কেটে গেলেও এরা দীর্ঘ সময় রক্ত ক্ষরণের সমস্যায় ভোগে যাতে তাদের রক্ত শূন্যতা দেখা দেয়। জন্মগত এই দোষ কেবল পুরুষদের মধ্যেই পাওয়া যায়– যদিও মেয়েরা এই দূষিত 'জিন' বহন করতে সক্ষম। স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য এই সব রোগীদের প্রায়ই স্বল্প রক্তজমাটকারী বস্তুর ইনজেকশান নিতে হয়। Factor VIII এর অভাবই বেশী দেখা যায় যাকে Haemophilia A আর factor IX এর স্বল্পতাকে Haemophilia B বলা হয় (এর অপর নাম Christmas Disease)। ইনজেকশান দেওয়ার জিনিসগুলো বিশেষভাবে ঠান্ডা করে সংরক্ষিত করা হয়। Factor VIII প্রায় ২০ জনের রক্ত থেকে আর factor IX প্রায় ২০০০-৫০০০ রক্তদাতা থেকে সংগৃহীত হয়। ফলে একজন হিমোফিলিয়া রোগী প্রতি বৎসর হাজার হাজার লোকের রক্তের সংস্পর্শে আসে। তাই অন্যান্য রক্ত গ্রহণকারীর তুলনায় (যারা মাত্র কয়েকজন রক্ত দানকারীর রক্তের সংস্পর্শে আসে) হিমোফিলিয়ার রোগীদের এইড্‌স্ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী। তাই এখন হিমোফিলিয়ার চিকিৎসা ক্ষেত্রে এইড্‌স্ হওয়ার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বড় আশঙ্কা। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৮৫ সালের এপ্রিল মাসে ২০,০০০ হিমোফিলিয়ার রোগীর মধ্যে ৭১ জনের (৬ জন শিশুসহ) এইড্‌স্ রোগ ধরা পড়ে।[৬]

(৪) **অন্যের রক্ত গ্রহণকারী :** রক্ত জমাটকারী বস্তু ছাড়াও সরাসরি সম্পূর্ণ রক্ত, রক্তের জলীয় অংশ, প্ল্যাটিলেট কণিকা এবং শ্বেত কণিকা চিকিৎসার প্রয়োজনে রোগীর দেহে শিরার মাধ্যমে দেওয়া হয়। এর মাধ্যমেও এইড্‌স্ রোগ বিস্তার লাভ করতে পারে। যদিও এর মাধ্যমে এইড্‌স্ বিস্তার খুব কম তবুও হৃৎপিন্ডের অপারেশন, কিডনি সংযোজন ও লিউকেমিয়া রোগীদেরকে বহুবার রক্তদান করতে হয় (প্রায় ৫০ বার) বলে এদের বেলায় এইড্‌স্ হওয়ার সম্ভাবনা দু একবার রক্তগ্রহণকারীর তুলনায় অনেক বেশী।

(৫) **এইড্‌স্ রোগীর যৌন সঙ্গী :** সমকামী নয় এমন পুরুষ বা নারী এইড্‌স্ রোগীর সঙ্গে যৌন মিলনে লিপ্ত হলে এইড্‌স্ হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে এইড্‌স্ রোগীদের মহিলা যৌন সাথীদের মধ্যে মাত্র শতকরা ৬ জনের এই রোগ হয়েছে। তবে মহিলাদেরও পশ্চাদদ্বার দিয়ে যৌন সঙ্গমের সম্ভাবনাও বাদ দেওয়া যায় না। যুক্তরাষ্ট্রে এমন ৪১ জন মহিলা এইড্‌স্ রোগী পাওয়া গেছে যারা এইড্‌স্-এর সম্ভাবনাযুক্ত লোকদের সঙ্গে সঙ্গমের কথা অস্বীকার করে। তবে তাদের সবাই গত পাঁচ বছরে প্রায় ১০০ বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গম করেছে বলে

www.bjilibrary.com

স্বীকার করেছে। সুতরাং পতিতারা এইড্‌স্ রোগের ডিপো হিসেবে কাজ করতে পারে। বর্তমানে মধ্য ও পশ্চিম (যেসব দেশে মুসলিম সংখ্যা নগন্য) আফ্রিকার পতিতাদের মাধ্যমে এইড্‌স্ রোগ দ্রুত প্রসার লাভ করছে। এইসব দেশে বিয়ের বাইরে যৌন মিলন খুব সহজ ও সমাজ স্বীকৃত। সুতরাং যৌন রোগ বিস্তারের জন্য ও সব দেশে পতিতাই একমাত্র মাধ্যম নয়।

(৬) শিশুদের এইড্‌স্ : এইড্‌স্ ভাইরাস মায়ের প্লাসেন্টার মাধ্যমে বা বুকের দুধের মাধ্যমে শিশুর দেহে প্রবেশ করতে পারে।

১১৪ জন শিশু রোগীর ১১৩ জনের বয়স এক বৎসরের কম এবং তাদের শতকরা ৭২% জনের বাবা বা মায়ের একজন বা উভয়ে হয় এইড্‌স্ রোগী অথবা যদের এইড্‌স্ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী সেই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। শিশুদের বেলায় অর্ধেক রোগীর এইড্‌স্ কম মারাত্মক, আর বাকী অর্ধেক পুরোদস্তুর এইড্‌স্ রোগী।

বর্তমানে হেইতি, জায়ার, জাম্বিয়া, উগান্ডা, রুয়ান্ডা ও অন্যান্য বিষুব রেখার পার্শ্ববর্তী আফ্রিকান দেশসমূহে এইড্‌স্ রোগী বেশ পাওয়া যাচ্ছে। এই সব এলাকায় এইড্‌স্ রোগ হওয়া খুবই অর্থবহ, কারণ এই এলাকায় স্থানীয়ভাবে (endemic) Kaposi's Sarcoma খুব বেশী (জায়ারেও শতকরা ১৩ জন)। সম্প্রতি এক রিপোর্টে দেখা গেছে যে, জায়ারের শতকরা ৩৬ জন শিশুদের রক্তে এইড্‌স্ ভাইরাসের প্রতিরোধক এন্টিবডি রয়েছে। তা ছাড়া সম্প্রতি প্রায় ১৪০০০ হেইতিবাসী (প্রাক্তন সাগরবাসীদের বংশধর) জায়ার ভ্রমণে যায় এবং হয়তো তাদের মাধ্যমেই এইড্‌স্ রোগ সে দেশে সংক্রমিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, নর-নারীর যৌন মিলনের (সমকামী নয়) মাধ্যমেই আফ্রিকায় এইড্‌স্ ছড়াচ্ছে। এর সপক্ষে প্রমাণ হলো যে সেসব দেশে নর ও নারী এইড্‌স্ রোগীর অনুপাত ১ : ১ আর শতকরা ৮০% জন পতিতার রক্তে (বড় বড় শহরে) এইড্‌স্ ভাইরাসের এন্টিবডি পাওয়া গেছে। ঘানা ও আইভরি কোষ্টে উভয় লিঙ্গে এই রোগ বিস্তার লাভ করছে।

এইড্‌স্ রোগের লক্ষণাদি :

১। অনেকদিন ধরে দুর্বলতা অনুভব করা অথচ এর কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

২। শরীরের বিভিন্ন অংশের লিমফ্ গ্রন্থিগুলো বড় হয়ে যায়, যেমন ঘাড়ের ও গলার দুপাশে, , স্কন্ধে, বগলে, কনুইয়ের পাশে, কুচকিতে এবং পায়ের পেছন দিকে হয় এবং শরীরের অন্তত দু'জায়গায় প্রায় তিন মাস পর্যন্ত বড় থাকে এর কোন কারণ পাওয়া যায় না তবে এতে এইড্‌স্ হওয়ারই সম্ভাবনা। অণুবীক্ষণ

www.bjilibrary.com

যন্ত্রের সাহায্যের এই গ্রন্থিগুলোতে কোন নির্দিষ্ট রোগ ধরা পড়ে না (benign reactive hyperplasia)।

(৩) দু'মাসের মধ্যে দশ পাউন্ডের বেশী ওজনহ্রাস পাওয়া।

(৪) বহু সপ্তাহ ধরে জ্বরে ভোগা যা ডাক্তার কর্তৃক অজানা কারণে জ্বর বলে (pyrexia of unknown origin= puo) ডায়াগনোসিস করা। এই সমস্ত জ্বরের রোগীদের মধ্যে যক্ষার জীবাণু ছাড়াও Atypical mycobacteria cytomegalo-virus এবং অন্যান্য জীবাণু হতে পারে সে গুলো সাধারণত রোগ সৃষ্টি করে না।

(৫) রাতে প্রচুর ঘাম হয় যার ফলে ঘুম নষ্ট হওয়া।

(৬) মুখে ও খাদ্যনালীর ফাংগাস (candida) নামক জীবাণুর আক্রমণ এবং স্থায়ী পেটের গোলমাল (Gay Bowel Syndrome বা সমকামীদের পেটের অসুখ)।

(৭) Kaposi's Sarcoma, Lymphoma এবং মুখ ও গুহ্যদ্বারের ক্যান্সার।

(৮) স্নায়ুঘটিত রোগ যেমন অলসতা, হতাশভাব (Depression) এবং এমন কি সবকিছু ভুলে যাওয়া (denentia)।

(৯) নিউমোনিয়া এবং PCP (Pneumocystis carinii) কর্তৃক ফুসফুসের রোগ। এদের রোগ সৃষ্টির সময়কাল জানা নাই, তবে ৬ থেকে ৭২ মাস পর্যন্তও হতে পারে।

আমেরিকার মেরিল্যান্ডস্থ বেথেস্ডা ন্যাশনাল ক্যান্সার ইন্সটিটিউটে ডঃ রবার্ট গ্যালোর দ্বারা এক বছর পর ১৯৮৪ সালের মে মাসে এইচ টি এল ভি-৩ ভাইরাসটি শনাক্তকৃত হয়। আরো পরে, ডঃ লেভী সানফ্রান্সিসকোতে এইডস-সম্পর্কিত ভাইরাস (এআরভি) নামে আরেকটি অনুরূপ ভাইরাস বের করেন। এ তিনটি ভাইরাসের সবগুলোই সম্ভবত একই ভাইরাস, কেননা ধাতুর বিশুদ্ধতা পরীক্ষা, জেনেটিক কোড এবং ইলেক্ট্রন মাইক্রোসকোপিক এপিয়ারেন্সে এগুলোকে পৃথক করে দেখা যায় না। এলএভি (LAV) এবং এইচ আই ভি (HIV)-র প্রথম আবিষ্কারককে যথাযথ সম্মান দেখানোর জন্যে এইডস (AIDS) ভাইরাসকে বর্তমানে এইচটি এল ভি-৩/এলএভি ভাইরাস নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এ আর ভি ভাইরাসটি এইচটি এল ভি-৩ ভাইরাসের মত একই মনে হয়। অধুনা, 'হু' (WHO) এইডস ভাইরাসের নাম দিয়েছে এইচআইভি (হিউম্যান ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস)।[৭]

এইচএলভি-৩ এলএভি-র প্রতিষেধক চিহ্নিত করা গেছে ৯৭% রোগীর ক্ষেত্রে, ৬০% সমকামীদের ক্ষেত্রে, ৪২% ভাগ.এইডস কিংবা পিজিএল সংশ্রব

www.bjilibrary.com

রোগীর ক্ষেত্রে, এবং ৩৪% অত্যধিক রক্তক্ষরণ প্রবণ রোগীদের ক্ষেত্রে যারা রক্ত জমাট বাঁধার ব্যবস্থার গ্রহণাধীন রয়েছে। এইচ টি এলভি-৩ ভাইরাসটি এইডস রোগী, এইডস বহনকারী শিশু, শিশু এইডস রোগীর মাতা, এবং ডাক্তারীবিদ্যাগত স্বাভাবিক সমকামীদের মধ্যে উচ্চ হারে পাওয়া গেছে। ঝুঁকিপূর্ণ দলের বাইরের কোন রোগীর মধ্যে এইচটি এলভি- সংক্রমণের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এইচ টি এল ভি-৩ এর প্রতিষেধক আবিষ্কার

আমেরিকার এবোটস এবং যুক্তরাজ্যের ওয়েলকাম ডায়াগনস্টিকস এইচ টি এল ভি-৩ এর প্রতিষেধক আবিষ্কারের এনজাইম ইমিউনো পরীক্ষা কৌশলের উদ্ভাবন করে। কৌশলটি ইলাইসা পদ্ধতি নামে পরিচিত। মনে রাখতে হবে যে, এইচটি এল ভি-৩ এর প্রতিষেধকের উপস্থিতি এইডস-এর কোন ডায়াগনোসিস নয়। সেরো পজিটিভ নমুনাসমূহ ওয়েস্টার্ন ব্লট টেকনিক (একটি ইমিউনো ইলেক্ট্রোফোরেটিক পদ্ধতি) দ্বারা পুনঃপরীক্ষিত হতে হবে। আবার, নেতিবাচক কোন ফলাফল এইচটিএলভি-৩ দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কিংবা সংক্রমণের সম্ভাবনাকে বাতিল করে না। পজিটিভ পরীক্ষা শুধুমাত্র এতটুকুই ইঙ্গিত দেয় যে, রোগী এইচটিএলভি-৩ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার মুখে ছিল। বাংলাদেশে ১৯৯০ সালের পূর্ব পর্যন্ত কোন পজিটিভ ঘটনা শনাক্ত করা হয়নি।

এইড্স্ রোগ হওয়ার পদ্ধতি pathogenesis :

যে কোন রোগ জীবাণু দেহের বিশেষ জীবকোষ (macrophage cells) চিনে ফেলে এবং রক্তের T-cell গুলোকে সাবধান করে দেয়। তখন T-cell গুলো কাজ শুরু করে এবং বিভিন্ন রকম T-cell এ রূপান্তরিত হয় ও সংখ্যা বৃদ্ধি করে-যার একটি হল সাহায্যকারী T-cell। এই সাহায্যকারী T-cell (Helper T-cell) শরীরের লিম্ফোসাইট সমূহের B-cell গুলোকে উত্তেজিত করে যার ফলে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং বাইরের রোগ জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য এন্টি বডি তৈরি করে। এইড্স্ ভাইরাস এই T-cell গুলোকেই আক্রমণ করে সেই cell গুলোকে এইড্স্ ভাইরাস তৈরি করতে বাধ্য করে। এমনিভাবে আরো Helper T-cell আক্রান্ত হয়। যার ফলে সাহায্যকারী T-cell হ্রাস পায় এবং B-cell কর্তৃক এন্টিবডি তৈরি বাধাপ্রাপ্ত হয়। Helper T-cell কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য T-cell যেমন আক্রান্ত জীবাণুর কোষ ধ্বংসকারী (cytotoxic) এবং শক্তিহ্রাসকারী (suppressor) T-cell গুলোও হ্রাস পায়। এর সঙ্গে সঙ্গে lymphokines তৈরিও হ্রাস পায় যা শরীরের রোগ প্রতিরোধকারী বিভিন্ন শ্বেত কণিকার কর্মক্ষমতা খর্ব করে। এর শেষ ফলই হলো শরীরের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতার অভাব।

www.bjilibrary.com

সবশেষে বলা যায় যে AIDS এক দুরারোগ্য ব্যধি যা অস্বাভাবিক ও অবৈধ যৌন সঙ্গমের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে।

সুতরাং এইড্স্ রোগ প্রতিরোধের সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হলো বিবাহিত না হয়ে এবং বিবাহের পর অবৈধ যৌন সঙ্গম সম্পূর্ণ পরিহার করা। এ ব্যাপারে ইসলামী যৌন নীতিই একমাত্র নির্ভরযোগ্য। আধুনিক বিশ্বের বেপরদার ফলে উদ্ভূত যৌন উচ্ছৃঙ্খলা বন্ধ না হলে শত চেষ্টা করলেও এমনকি এর ওষুধ আবিষ্কার হলেও এইড্স্ রোগ প্রতিরোধ করা যাবে না।

তথ্যসূত্র ঃ

1. V. G. Daniels, AIDS, MTP Press Ltd. 1st edn . p. 1, 1985.
2. M. Marmor, A. E. Friedman-Kein, et al., Risk factors for Kanosis sarcoma in homosexual men, Lancet, p. 1083, 1985.
3. V. G. Daniels, AIDS, MTP Press Ltd. 1st edn. p. 16, 1985.
4. Ibid, p. 48.
5. Ibid, p. 18.
6. M. G. Muazzam, AIDS in Bangladesh, Bangladesh J, path. Vol. pp. 48-59, 1986.
7. WHO Weekly Epidem, Rec. 61. p. 229-236, 1986.
8. Ibn'Majah, Kitabul Fitan, Al-Hadis No, 4019, vol. 2. p. 1332.

www.bjilibrary.com

পরিশিষ্ট-৪

অর্ধ পারমাণবিক পদার্থ (Subatomic Particles)

বিতর্ক লেগেই আছে এবং এ বিষয়ে অনুসন্ধানও অব্যাহত আছে। এ্যাটমোস (Atmos), এর অর্থ অবিভাজ্য, এবং এক সময় মনে করা হতো যে, পরমাণু হচ্ছে পদার্থের চূড়ান্ত অবিভাজ্য গঠনকর উপাদান। ১৯১১ সালে বিজ্ঞানী আর্নেস্ট রাদারফোর্ড প্রমাণ করেন যে, পরমাণুর একটি অতি ক্ষুদ্র ঘন নিউক্লিয়াস রয়েছে যার চারদিকে ইলেকট্রনের একটি বলয় ঘিরে আছে। পরবর্তীকালে এই মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, নিউক্লিয়াস নিজেই ধনাত্মক গুণ বিশিষ্ট প্রোটন ও নিউট্রন নিয়ে গঠিত। ১৯৫৭ সালের মধ্যেই ৩০টি তথাকথিত অতি ক্ষুদ্র মৌলিক উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায় এবং খুব শীঘ্রই এরূপ উপাদানের সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে যায়। অতি ক্ষুদ্র এ সকল উপাদানের এরূপ সংখ্যাবৃদ্ধি প্রশ্নের জন্ম দেয় যে এ সকল উপাদানকে আদৌ মৌলিক বলে উল্লেখিত হবে কিনা।১ এ সকল অর্ধপারমাণবিক উপাদানসমূহকে এখন এই নামে অভিহিত করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচনা করা হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পারমাণবিক উপাদানের একটি সুসংগঠিত ও সুন্দর জগতের জন্য পদার্থবিদদের নিরলস অনুসন্ধান প্রচেষ্টা অর্ধপারমাণবিক পর্যায়ে গিয়ে ঝুঁকির মধ্যে নিপতিত হয়। যাহোক, এই অবস্থা বিগত দশকে বিস্ময়করভাবে পরিবর্তিত হয়।

পদার্থবিদগণ এ সকল অর্ধপারমাণবিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থের মধ্যে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ আবিষ্কার করেন। এ সকল উপাদানকে তারা যে ধরনের শক্তি অনুভব করে সে অনুযায়ী বড় বড় দলে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। পদার্থের মধ্যকার যাবতীয় মিথস্ক্রিয়ার জন্য ৪টি মৌলিক শক্তি দায়ী, এরা হচ্ছে মহাকর্ষীয় শক্তি, তাড়িত চুম্বকীয় শক্তি, সবল শক্তি ও দুর্বল শক্তি। মহাকর্ষীয় শক্তি সকল পদার্থের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং এটা অতি সন্নিকটবর্তী অবস্থান থেকে অসীম পর্যন্ত ক্রিয়াশীল হয়। তবে অন্যান্য শক্তির তুলনায় এই

www.bjilibrary.com

শক্তি উপেক্ষণীয়ভাবে ক্ষুদ্র। অন্যান্য শক্তি অর্ধপারমাণবিক ঘটনাবলির সাথে জড়িত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পিণ্ডের মধ্যে স্থিত এবং এটা সবল শক্তির প্রায় $১০^{-৫৯}$ গুণ শক্তিশালী। তাড়িত চুম্বকীয় শক্তিরও রয়েছে অসীম মাত্রা, কিন্তু এটা শুধুমাত্র তড়িৎ অথবা বিদ্যুৎ পরিবাহীর উপর ক্রিয়া করে। পারমাণবিক শক্তির চেয়ে তাড়িত চুম্বকীয় শক্তি ১৩৭ গুণ দুর্বল। দু'টি ক্ষুদ্র পদার্থ পরস্পর একটি ফোটন অথবা একাধিক ফোটন অদলবদলের মাধ্যমে তাড়িত চুম্বকীয়ভাবে মিথস্ক্রিয়া করে। ফোটন এমন একটি উপাদান যার কোন পিণ্ড নেই, নেই কোন বিদ্যুৎ শক্তির সঞ্চার এবং এটা সবল অথবা দুর্বল শক্তির কোনটাতেই মিথস্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। নিউট্রন ও প্রোটন শক্তিশালী, স্বল্প দূরত্বের (প্রায় $১০^{-১৩}$ সে. মি.) পারমাণবিক শক্তির মধ্য দিয়ে পারস্পরিক ক্রিয়া করে বলে জানা গিয়েছে। পারমাণবিক নিউক্লিয়ি-এর মধ্যে এ সকল পদার্থের আবেষ্টনকারী বলয়ের জন্য এরূপ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। দু'টি নিউক্লিয়ন (প্রোটন ও নিউট্রন) স্বীয় বৈশিষ্ট্য অদল বদল করে মিথস্ক্রিয়া সম্পন্ন করে। সবল মিথস্ক্রিয়ার শক্তির চেয়ে দুর্বল মিথস্ক্রিয়ার শক্তির পরিমাণ ১/১০০ ট্রিলিয়ন $১০^{-১৪}$ গুণ কম এবং কারোর জানা মতে তা কোন কিছুকে বেঁধে রাখতে পারে না। অনেক শক্তিশালী মিথস্ক্রিয়াশীল পদার্থের ক্ষয় বা পতনকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং কিছু তেজস্ক্রিয় নিউক্লিই ধ্বংসের জন্য দায়ী।[২]

যে সকল পদার্থ সবল শক্তি অনুভব করে তাদেরকে হ্যাড্রোন বলে। এই হ্যাড্রোন আবার ব্যারিয়োন ও মেসোন নামে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ব্যারিয়োনের মধ্যে প্রোটন, নিউট্রন ও তাদের বিপক্ষীয় পদার্থ রয়েছে। পাইয়োন ও কায়োন নামের পদার্থ মেসোন শ্রেণীভুক্ত। এখন পর্যন্ত সর্বমোট ১০০ এর অধিক হ্যাড্রোন পাওয়া গিয়েছে এবং তাদের অধিকাংশই অপৃথকীকৃত ও অস্থিতিশীল। যে সব ক্ষুদ্র পদার্থ সবল শক্তিকে অনুভব করে না কিন্তু দুর্বল শক্তিতে সাড়া দেয় তাদেরকে লেপটন বলে। লেপটনের সংখ্যা শুধুমাত্র ৪টি। যথা ঃ ইলেক্ট্রন ও তার নিউট্রিন এবং মুয়োন ও তার নিউট্রিনো, এবং তাও ও জাউ এবং তাদের নিউট্রিনো ও তাদের বিরুদ্ধ ক্ষুদ্র পদার্থ। নিচে সারণি-১ এ অর্ধ-আণবিক পদার্থের একটি তালিকা দেয়া হয়েছে। এসব পদার্থের মিথস্ক্রিয়ার ধরন অনুসারে তাদেরকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।[৩]

www.bjilibrary.com

সারণি-১ ঃ Present Status of Particle Physics

Interaction	Participating Particles	Carrier	Theory
strong	Quarks : u. d. c. s. (i), b	gluon	quantum chromodynamics (QCD)
electroweak	quarks (listed above) and leptons : e, vμ μ, v_μ T, v_1	photon, and intermediate bosons : W+, Z°	SU (2) X U (1) (including quantum electrodynamics (QED)
gravity	everyone and everything	gravitation	general relativity

সারণি-২ ঃ The Names and Properties of the Quarks

Quark	u	d	s	c	b	t
mass charge/e	- 10McV	5 MeV	100 MeV	2 GeV	5 GeV ?	
Q_q	2/3	-1/3	-1/3	2/3	-1/3	2/3
species (color)	3	3	3	3	3	3
interaction strength				strong at -1 GeV energy, but becomes 0 as energy approches α		

পদার্থের চূড়ান্ত গঠনকর উপাদানের সন্ধান প্রচেষ্টা ১০০ এর বেশী সংখ্যক অর্ধপারমাণবিক অতি ক্ষুদ্র পদার্থ দৃশ্যপটে আনতে সক্ষম হয়েছে। হ্যাড্রোনের বিপুল সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির বিজ্ঞানী Marry Gell-Mann ও জর্জ Zweig আলাদাভাবে ১৯৬৩ সালে quark hypothesis এর প্রবর্তন করেন। এটা এখন ধারণা করা হয় যে, quarks ও antiquarks সরলভাবে মিথস্ক্রিয়াকারী সকল পদার্থের গঠনকর উপাদান। মিথস্ক্রিয়াকারী পদার্থসমূহ হচ্ছে প্রোটন, নিউট্রন, পাইয়োন, কায়োন এবং আরও অনেক (সারণী-২)। পরীক্ষামূলক প্রমাণ নির্দেশ করে যে, প্রোটন ও নিউট্রনের একটি অভ্যন্তরীণ গঠন কাঠামো রয়েছে। অদ্যাবধি কোয়ার্ক একটি প্রকৃত অবিমিশ্র উপাদান তা কোয়ার্কের ইঙ্গিত থেকে বুঝা যায়। বিন্দু পিণ্ডের ন্যায় তাদের আচরণে প্রকাশ পায় যে, তাদের কোন অভ্যন্তরীণ গঠন

www.bjilibrary.com

কাঠামো নেই। এগুলো এমন পদার্থ যা দু'টি কোয়ার্কের মধ্যে বদল করা হয় এবং একই সাথে তারা সংবদ্ধ থাকে।৪ ১৯৭৯ সালে এরূপ পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পদার্থে গ্লুয়োন এর অবস্থিতি রয়েছে।

ইলেকট্রন, মুয়োন, নিউট্রিওন ও তাও মিলে লেপটনস নামে পদার্থের একটি পরিবার গঠিত হয়। সর্বোচ্চ পরিমাণ শক্তি বর্ধনের সাথে সাথে যত কঠিন পরীক্ষাই হোক না কেন এ সকল পদার্থ কণার কোন অভ্যন্তরীণ গঠন কাঠামো আদৌ নেই। Steven Weinberg মত প্রকাশ করেন যে, w+, w- এবং Z0 হচ্ছে তিনটি উপাদান যা দুর্বল শক্তির কাজ করে।৫ পক্ষান্তরে সবল পারমাণবিক শক্তি gluons থেকে উদ্ভূত হয় যা রংয়ের পরিবর্তন ঘটায় (কোয়ার্কের একটি বৈশিষ্ট্য), দুর্বল পারমাণবিক শক্তি রুচিকর সুগন্ধ (আরেকটি বৈশিষ্ট্য) পরিবর্তন করে এবং সম্পাদিত হয় কোয়ার্কের w উপাদানের মাধ্যমে। দুর্বল শক্তি হচ্ছে বর্ণান্ধ।

এ সকল শক্তিকে একত্রিত করার প্রচেষ্টায় Salam ও Weinberg প্রমাণ করেন যে, তাড়িত-চুম্বকীয় শক্তি ও দুর্বল শক্তির মিথষ্ক্রিয়া তাড়িত দুর্বল শক্তি হিসেবে পরিচিত একটি একক শক্তির ভিন্ন ভিন্ন বহিঃপ্রকাশ। এই শক্তির বাহক হচ্ছে ফোটোনস ও মধ্যস্থ বোসোনস (w+, w-3Z0)

সর্বশেষে, আমরা দেখতে পাই এই মহাবিশ্বের সব কিছুই এই দুই ধরনের উপাদান থেকে গঠিত ঃ লেপটন ও কোয়ার্কস। তাই পদার্থের চূড়ান্ত গঠনকর উপাদানের এই যে অন্বেষণ তা সম্ভবত সফল হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। পদার্থের এই দু'টি faullies রং, গন্ধ ও spins এর মধ্যে এক সুগভীর সৌন্দর্যময় সামঞ্জস্য প্রদর্শন করে। বাস্তবিকই এমন অর্ধপারমাণবিক পদার্থেও সব কিছুই অতি উঁচু মাত্রায় সংগঠিত, ভারসাম্যপূর্ণ ও সুন্দর যা স্রষ্টা কর্তৃক পূর্ব নির্দেশিত।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Sidney D. Drell, Scientific American, June, 1975
2. Geoffrey F, Chew, Murry Gell-Mann and Arthar H, Rosenfeld, Scientific American, Feb, 1964.
3. Sidney D. Drell, Scientific American, June, 1975.
   Lee, T.D. Symmetries, Asymmetries and the World of Particles, Union of Washington Press, p. 45, 1988.
4. Sheldon Glashow, Scientific American, Oct, 1975.
5. Steven Weinberg, Scientific American, Oct, 1974.

www.bjilibrary.com

পরিশিষ্ট-৫

চান্দ্র অবস্থান

ক্রমিক নং	আরবী নাম		ভারতীয় নাম
১.	الشرطن	শারতান	অশ্বিনী
২.	البطين	বুতাইন	ভরনী
৩.	الثريا	ছুরাইয়া	কৃত্তিকা
৪.	الذبران	আদ-দারবান	রোহিণী
৫.	الهقعة	আল-হেকা	মৃগ শিরা
৬.	الهنعة	আল-হেনা	আরদ্রা
৭.	الزراع	আজ-জেরা	পুনর্বসু
৮.	النثرة	আন-নেতরাহ	পুশ্য
৯.	الطرفه	আত-তারফা	আশলেশা
১০.	الجبهة	আজ-জাবহা	মঘা
১১.	الزبرة	আজ-জাবরা	পূর্ব ফাল্গুনী
১২.	الصفرة	আল-সেফরা	উত্তর ফাল্গুনী
১৩.	العواء	আল-আওয়া	হস্ত
১৪.	الصماك	আস-সেমাক	চিত্রা
১৫.	الغفر	আল-গাফর	স্বার্তি
১৬.	البنى	আল-জুবানা	বিশাখা
১৭.	الاكيل	আল-ইকলিল	অনুরাধা
১৮.	القلب	আল-কালব	জ্যেষ্ঠ
১৯.	الشولة	আশ-শাওলা	মূলা
২০.	النعام	আল-নায়ায়েম	পূর্বাশা
২১.	البلدة	আল-বালদা	উত্তরাস্বদেশ
২২.	سعد الجبيح	সাদুল জাবিহ	অধিজিত
২৩.	سعد البلع	সাদু'ল বালা	শ্রাবনা
২৪.	سعد السود	সাদু'ল সাউদ	ধনিষ্ঠা
২৫.	سعد الاخبيه	সাদু'ল আখবিয়া	শতাবিষা
২৬.	فرغا الدلوا	ফারগাদ দালওয়া	পূর্ব ভাদ্রপদ
২৭.	فرغ الدلو المؤخر	ফারগোদ দালওয়া আল-মুআখার	উত্তর ভাদ্রপদ
২৮.	الرثا	আর-রিশা	রেবতি

পরিশিষ্ট-৬

জন্মগত শারীরিক ত্রুটি ও তার কারণ

জন্মের অব্যবহিত পরই প্রায় শতকরা ২০ জন নবজাত শিশু প্রাণ ত্যাগ করে কোন না কোন জন্মগত শারীরিক ত্রুটির জন্য।

নবজাত শিশুর জন্মগত শারীরিক ত্রুটি তিন প্রকার ঃ

(ক) জীব কোষের মৌলিক দোষের জন্য (Genetic defects) ;

(খ) পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে; ও

(গ) উভয় প্রকার কারণে যাকে বহু কারণ বিশিষ্ট জন্মগত দোষ বলা হয়।

(ক) Genetic বা জীব কোষের মৌলিক ত্রুটিজনিত জন্মগত শারীরিক ত্রুটি ঃ

নবজাত শিশুর প্রতি ২০০ জনের মধ্যে ১ জনের chromosome এর দোষ পাওয়া যায়। এই দোষ তিন প্রকার ঃ (১) ক্রোমোজমের সংখ্যাতে ত্রুটি; (2) chromosome এর গঠনে দোষ। এসব দোষ লিঙ্গ সংক্রান্ত অথবা antisomar অথবা উভয় প্রকার হতে পারে। এই দোষের মূল কারণ জীবকোষের ভিতরে, বাইরে বা যুক্ত কোষের জৈব-রাসায়নিক ত্রুটি বা অন্য কোন কারণ২; (৩) বিশেষ কারণে দোষযুক্ত জিন সমূহের (mutant genes) ত্রুটির ফলে।

(১) ক্রোমোজোমের সংখ্যাগত ত্রুটি

জীবকোষের বিভক্তির সময় ক্রমোজোমের বিভক্তির বেলায় যদি এদের নির্দিষ্ট স্থান থেকে বিচ্যুত হয় তা হলে প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক সংখ্যায় ত্রুটি দেখা দেয়। কোন সময় জোড়া নষ্ট হয় বা একটি অন্যটির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়।

সাধারণত ক্রোমোজোমগুলো জোড়ায় জোড়ায় থাকে যাকে Homologues বলে। একজন পুরুষ মানুষের জীবকোষে ২২ জোড়া ক্রোমোজোম এবং একটি X ও একটি Y ক্রোমোজোম অর্থাৎ ২২ + XY এবং একজন মহিলার ২২ জোড়া ক্রোমোজোম অর্থাৎ ২২ + XX থাকে। এই ধরনের জোড়ায় কোন ব্যতিক্রম হলে অর্থাৎ ৪৬টি chromosome বা ২৩ জোড়া এর কম বা বেশী হলে সংখ্যাগত ব্যতিক্রম জনিত জন্মগত ত্রুটি দেখা দেবে। যেমন Turner's Syndrome, Down's Syndrome এবং Klinefelter Syndrome

www.bjilibrary.com

জাতীয় দোষ। এইসব ক্রটির ফলে শিশুর মানসিক ক্রটি দেখা দেয় এবং বিভিন্ন শারীরিক ও কার্যগত ক্রটিও দেখা দিতে পারে। কোন কোন সময় অতিরিক্ত ক্রোমোজোমের জোড়া জীবকোষে জমা হলে গর্ভপাত হতে পারে।

(২) আকৃতিগত ক্রটি

বিভিন্ন কারণে ক্রোমোজোম ভেঙ্গে গেলে এরূপ ক্রটি দেখা দেয়- যেমন বিশেষ আলোক রশ্মির বিকিরণ (radiation), কোন ওষুধ বা ভাইরাস জাতীয় জীবাণুর আক্রমণ।[৩] আকৃতিগত ক্রটি বিভিন্ন প্রকার হতে পারে যেমন translocation (এক স্থানে 'জিন' অন্য স্থানে সংযুক্ত হলে), deletion (জিনের সংখ্যা কম হলে), duplication (একই জিন দ্বিগুণ হলে) এবং inversion (জিনের অবস্থানের ক্রটি)।(৪) এর ফলে মানসিক ক্ষমতা হ্রাস, জন্মগত হৃৎপিন্ডের ক্রটি এবং Down's Syndrome হতে পারে।

(৩) জিনের প্রকৃতিগত ক্রটি (mutation)

জিনের প্রকৃতিগত ক্রটির ফলে প্রায় ১০-১৫% জন্মগত দোষ এ জন্যে হয়ে থাকে। এই দোষ উপরের দুটির তুলনায় অনেক কম। যদিও অনেক জিনের প্রকৃতিগত পরিবর্তন (mutation) হয় তবে এদের খুব কমই জন্মগত ক্রটির কারণে হয়। এই ধরনের ক্রটির ফলে achondroplasia বা শারীরিক গঠনের নানা ক্রটি, polydactyly (অতিরিক্ত আঙ্গুল) বা অতিরিক্ত আঙ্গুলের গিরা হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে বংশগত জিনের/সুপ্ত জিনের প্রভাবে এড্রিনাল গ্রন্থির দোষ হতে পারে যাতে সেই গ্রন্থি বেশী কর্মক্ষম (hyperplasia) হয়ে যৌন অঙ্গের বিকৃতি ঘটাতে পারে। কেবল একই ধরনের জিনসহ বাবা, মা হলে সুপ্ত জিন কর্মক্ষম হতে পারে নতুবা এই সুপ্ততা ধরা পড়ে না।[৫]

(খ) পারিপার্শ্বিক কারণে জন্মগত ক্রটি : ভ্রূণের গ্রন্থিগুলো (organs) বিভিন্ন ক্রটি সৃষ্টিকারী বস্তুর প্রভাবে সহজেই প্রভাবান্বিত হয়। বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে জীবকোষের বিভক্তির বেলায়। যে সকল বস্তু ভ্রূণকে সহজে প্রভাবিত করে সেগুলো হলো–alkaloids, মদ, হরমোন, antibiotics, জৈব পারদ, ঘুমের ওষুধ, L. S. D. বিভিন্ন রোগ জীবাণু যেমন জার্মান হাম, সিফিলিস রোগের জীবাণু, আলোক রশ্মি (radiation) এবং মুখে গৃহীত জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি ইত্যাদি।[৬] এ ছাড়া জরায়ুর বিশেষ আকৃতিগত দোষও জন্মগত ক্রটি আনতে পারে।[৭]

তথ্যসূত্র :

1. D. H. Carr., Heredity and Embryo, J. Science London, 6, 75, 1970.

www.bjilibrary.com

2. Keith L. Moore, and A. M. A. Azzindani, The Developing Human, 3rd edn. W. B. Saunders Co. p. 140. 1983,

3. M., Bartalson, and T. A. Baromki, Medical Cytogenetics. The William and Wilkins Co, Baltimor, 1967.

4. W. R. Breg, Autosomal abnormalities in endocrine and genetic diseases of childhood and adolescence ed. by L. I. Gardner, 2nd edn. W. B. Saunders Co. Philadelphia, p. 730-762, 1975.

5. V. C. Vaughan, R. J., Mckay, and R. E. Behrman, Nelson Textbook of Paediatrics, 11th edn. W. B. Saunders Co., Philadelphia, 1979.

6. T. V. N. Perraud, Teratogenesis, Experimental Aspects and Clinical Implications, Jena Gustav Fischer Verlag, 1979.

7. P. M. Dunn. Congenital Postural Deformatics, Brit. Med. J. 1976. p. 71.

www.bjilibrary.com

পরিশিষ্ট-৭

মানব জন্ম রহস্য আবিষ্কারের ইতিহাস

চিরকালই মানুষ মানব জন্ম পদ্ধতি সম্পর্কে কৌতূহলী। জন্ম সংক্রান্ত প্রাচীন কালের অধিকাংশ মতবাদ হাস্যকর এবং অবান্তর, তবুও সেগুলো পড়ে দেখা উচিত। আমাদের বর্তমানের বিরাট জ্ঞান ভান্ডারের সমষ্টি এবং জৈববিজ্ঞানের উন্নতির যুগে এ কথা আমাদের ধারণায় আসবে না যে প্রাচীনকালে এ বিষয়টি তাদের কাছে কত রহস্যময় ছিল।[১]

প্রাথমিক যুগের মানুষ যৌনাঙ্গ ও শিশুর জন্ম সম্বন্ধে নানারূপ কুসংস্কার ও অদ্ভুত চিন্তার শিকার ছিল। এর ফলে যৌনাঙ্গ পূজার পদ্ধতিও চালু হয়েছে এবং এ নিয়ে বহু তর্ক বিতর্ক হয়ে গেছে।[২] আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেও পুরুষ ও নারী যৌনাঙ্গের পূজা করা হচ্ছে ভারতের বিরাট জনসংখ্যা কর্তৃক। প্রাচীন মিশরীয়রা নারীর যৌনাঙ্গকে কাপুরুষতার প্রতীক মনে করতো[৩]। পুরাতন বাইবেলে psalm লেখক বলছেন, 'আমাকে পাপের মাধ্যমে আমার মা আমাকে গর্ভে ধারণ করেছে।' (Psalm-Li5)

পুরুষ ও নারীর বীজের সংমিশ্রণের ফলে সন্তান উৎপাদন হয় সে সম্পর্কে প্রাচীন তৌরাত পন্থীদের কিছুটা ধারণা ছিল। তারা তাদের নবীদের মাধ্যমে এটাও জানতো যে আল্লাহ জীবন ফুঁকে দেন। কিন্তু তাদের ধারণা যে পুরুষের সাদা বীর্য শরীরের সাদা বস্তুসমূহ যেমন, হাড়, মগজ, চক্ষু ও দাঁত আর মেয়েদের লাল বীর্য (ঋতুস্রাব) গোশ্‌ত, চামড়া, আঙ্গুল, নখ ইত্যাদি সৃষ্টি করে– এসবই ছিল মারাত্মক ভুল। চিকিৎসা বিজ্ঞানে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন করেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের পিতা হিপোক্রেটিস (৪০০ খ্রি. পূ.)। তাঁর ধারণা ছিল যে পুরুষের বীর্যে বহু ক্ষুদ্র জীব রয়েছে যা সত্যিই খুব চমৎকার আন্দাজ ছিল। প্লেটোও এই ধরনের ক্ষুদ্র জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন।

এরিষ্টোটল (৩৫০ খ্রি. পূ.) বিশ্বাস করতেন যে, পুরুষ ও নারীর বিশেষ বস্তুর সংমিশ্রণে নব শিশুর জন্মলাভ হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রথম মানুষ পৃথিবীর বুক থেকে বের হয়েছে। তার আরও ধারণা ছিল যে মা সন্তানের দেহের যন্ত্রপাতি দান করে, আর পুরুষের বীর্য মানুষের রূপ ধারণ করতে সাহায্য করে।[২]

গ্যালেন (২০০ খ্রি.) বিশ্বাস করতেন যে, পুরুষ ও নারীর আলাদা আলাদা বীর্য রয়েছে যার মিলনে নবশিশুর জন্ম হয়। তাঁর ধারণা মূলত ঠিকই ছিল। তবে তিনি মনে করতেন যে যকৃত ও হৃৎপিন্ড মায়ের রক্ত থেকে আর মগজ বাবার

www.bjilibrary.com

বীর্য থেকে তৈরী। তিনিই আবিষ্কার করেন যে পুরুষের অন্ডকোষের মত নারীর স্ত্রী অন্ডকোষ বা ওভারী রয়েছে এবং তিনি এটাও সঠিক সিদ্ধান্ত করেন যে নারীর অন্ডকোষ থেকে নারী বীর্যপাত করে। এই ধারণা সত্যিই বিস্ময়কর। মনে হয় অণুবীক্ষণ যন্ত্র থাকলে তিনি শুক্রকীট ও ডিম্ব আবিষ্কার করে ফেলতেন। তবে গ্যালেন মাতৃগর্ভে জ্রূণের ধীরে ধীরে বড় হওয়ার ব্যাপারে কিছুই বলেন নি। তার মতামত ১৫ শতাব্দী পর্যন্ত জারী ছিল। তবে সবই অপ্রমাণিত মতবাদ মাত্র।

বিজ্ঞানী ফেব্রিসিয়াস (১৬০৪ খ্রি.) সর্বপ্রথম জ্রূণ তত্ত্বের উপর পুস্তক প্রকাশ করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ de Formatione Ovi at Pulli নামক গ্রন্থে তিনি ছবিসহ ডিম থেকে মুরগীর ছানা উৎপাদনের বিবরণ প্রদর্শন করেন। ১৬২১ সালে তিনি আরো ঘোষণা করেন যে শুক্র সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম এবং দূর থেকেও ডিম্বকে গর্ভদান করতে পারে। অতঃপর ১৬৫১ সালে হারভে, তার শিক্ষক পাদুয়ার ফেব্রিসিয়াসের মতবাদকে আরোও উন্নত করে এই নতুন মতবাদের নাম দেয় Aura seminalis. তিনি বলেন, স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ে বীর্য স্থাপনের পর তা মোটেই জরায়ুতে প্রবেশ করে না। কারণ যৌন মিলনের পর জরায়ুর ভিতরে এমন কিছুই পাওয়া যায় না যা যৌন মিলনের পূর্বে ছিল না।[৪] তার ধারণা শুক্র একটি বাষ্প উত্থিত করে (aura) যা জরায়ুকে উত্তেজিত (কর্মক্ষম) করে। যার ফলে পাখীর ডিম্ব এবং মানুষের জরায়ুতে সন্তান উৎপন্ন হয়। এমনিভাবে ফেব্রিসিয়াসের চিন্তাধারাকে হার্ভে ভুল পথে নিয়ে যায় এবং গ্যালেনের সঠিক ধারণাকে বর্জন করে।

১৬৭৪ সালে নিকোলাস মেইলব্রাঞ্চ Encasement theory নামে এক নতুন মতবাদ প্রচার করেন। তার মতে মা-হাওয়ার ডিম্ব কোষে গোটা মানবজাতির কিয়ামত পর্যন্ত সকল প্রজন্মের সমসংখ্যক ডিম্ব ছিল এবং এক প্রজন্মের পর মহিলাদের ডিম্ব কোষে একটি ডিম্ব কমে যায়। একজন হিসাব করে বলেন যে ২০ কোটি প্রজন্মের পর মহিলাদের ডিম্ব কোষে কোন ডিম্ব থাকবে না এবং মানব জাতির অস্তিত্ব শেষ হয়ে যাবে। এই মতবাদে ডিম্বকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে নিকোলাসের সমর্থকদেরকে Ovists বা ডিম্ব সমর্থক বলা হতো। তারা আরো মনে করতো যে ডিম্বে একটি পূর্ণাঙ্গ মানবশিশু খুব ক্ষুদ্র আকারে অবস্থান করে। অল্প কিছুদিন পর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারক ওলন্দাজ টেকনিশিয়ান Luewenhoek তার যন্ত্রে বীর্যের মধ্যে জীবিত শুক্রকীট (sperm) দেখতে পেয়ে ভাবলেন যে এগুলো ক্ষুদ্র প্রাণী। তাই লিউয়েন হোয়েক ঘোষণা করলেন যে 'সন্তান কেবল পিতার' আর জরায়ুর কাজ হলো পাক ঘর বা তাপ প্রদানকারী স্থান বিশেষ- a receptabulum seminis, অর্থাৎ পুরুষের বীর্য গ্রহণকারী পাত্র মাত্র। এই মতবাদের অনুসারীদেরকে বলা হতো Spermatists বা শুক্রকীট সমর্থক। তাদের এসব কল্পনা এতদূর সম্প্রসারিত হলো যে ১৬৯৯ সালে বিখ্যাত মন্টপিলার একাডেমী অফ সায়েন্সের সেক্রেটারী

www.bjilibrary.com

Francois Plantades মানুষের শুক্রকীটের এক ছবি প্রকাশ করে তার নাম দেন ক্ষুদ্র মানব শিশু (homunculus)। এরা ঘোষণা করলো যে তারা শুক্রকীটের মাথায় একটি পূর্ণাঙ্গ মানব শিশু দেখতে পয়েছে (ছবি-৪) যা মোটেই সত্য নয়। ইলেকট্রনিক অণুবীবক্ষণ যন্ত্রে দেখা একটি পূর্ণাঙ্গ শুক্রকীটের ছবিতে মানব শিশুর মস্তিষ্কের কোন সামান্যতম নিদর্শনও দেখা যায় না (ছবি-৫)।

আর এক ওলন্দাজ বিজ্ঞানী De Graaf ১৬৭২ সালে সর্বপ্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণীর ডিম্ব বা ovum আবিষ্কার করেন এবং তিনি জরায়ু এবং তার সংশ্লিষ্ট নালি (fallopian tube) তে সেই ডিম্ব দেখতে পান। De Graafএর এই চমৎকার আবিষ্কারের পরও প্রায় আরো এক শতাব্দী পর্যন্ত ডিম্ব ও শুক্রকীট সমর্থকদের (১৬৯৮-১৭৫০ খ্রি.) পিতা-মাতা উভয়ের মিলনে সন্তান উৎপন্ন হয় এ মতবাদ প্রচার করেন।

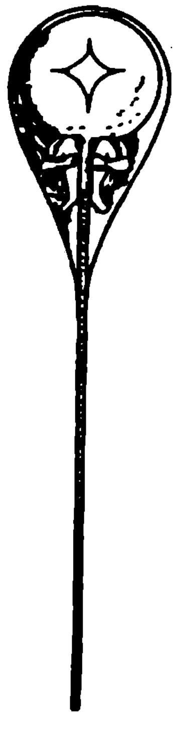

চিত্র ঃ ৪

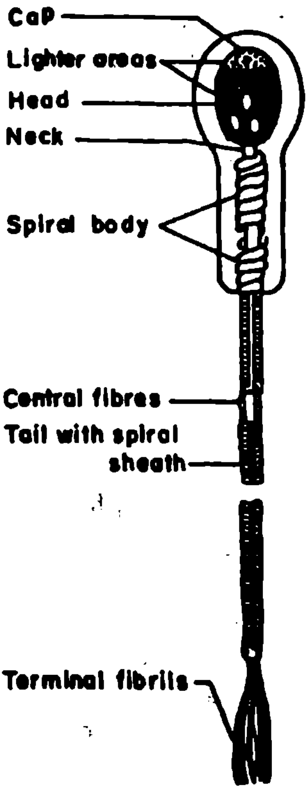

চিত্র ঃ ৫

১৭৫০ সালে নিডহ্যাম নামক এক রসায়নবিদ স্বতঃস্ফূর্ত প্রজনন (spontaneons generation) নামে এক নতুন মতবাদ প্রচার করেন। কিন্তু ১৭৮৬ সালে ইতালিয়ান বিজ্ঞানী স্পেলানজানী এই মতবাদ ভুল প্রমাণিত করেন। ১৭৭৪ সালে উইলিয়াম হান্টার তার পুস্তকে 'গর্ভাবস্থায় জরায়ুর এনাটমি' সর্বপ্রথম জরায়ুতে অবস্থানরত মানব শিশুর প্রকৃত রূপ বিশ্ববাসীকে জানাতে সক্ষম হন। শ্লেইডেন এবং শোয়ান (Schleiden and Schwann) ১৮৩৯ সালে শরীর গঠনে জীব কোষের অবদান প্রমাণ করেন এবং এর মাধ্যমে histology এবং embryology (ভ্রূণতত্ত্ব) বিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৮৪৪ সালে বিশফ (Bischoff) ঋতু স্রাবের সঙ্গে ওভারির ডিম্ব স্ফুটনের সম্পর্ক আবিষ্কার করেন। বেরি (Barry) ১৮৩৮ সালে শুক্রকীট কর্তৃক ডিম্বাণুর গর্ভ হওয়ার পদ্ধতি প্রকাশ করেন।[১] কিন্তু ১৮৫০ সালে লাইবিগ (Leibig) মানব শিশুর জন্ম রসায়ন প্রক্রিয়ার মতবাদ পেশ করে ভ্রূণতত্ত্বকে অনেক পিছিয়ে দেন।[৪] ১৮৫৬ সালে লুই পাস্তুর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জন্ম রহস্যের গবেষণাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

এ পর্যন্ত ভ্রূণ তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক গবেষণা জন্তু জানোয়ারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। উইলহেলম হিস (Wilhelm His) ১৮৮০ সালে মানবীয় জৈববস্তুর উপর গবেষণা চালান এবং লাইবিগের রসায়ন মতবাদ সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়। মানব ভ্রূণের উপর গবেষণা চালানো হয় মাত্র ১৯৪১ সালে।[৪]

মানব সৃষ্টির জন্ম রহস্যের পূর্ণ জ্ঞান মানুষ জানতে পেরেছে ১৯ শতাব্দীতে। কুরআনে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে পুরুষ ও নারীর সংমিশ্রিত নুৎফার বা ফোটা থেকেই নব শিশুর জন্ম হয় (আয়াত ৭৬ ঃ ২) এবং জরায়ুতে ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভ্রূণের বিবরণও দেওয়া হয়েছে (আয়াত ২২ ঃ ৫ এবং ২৩ ঃ ১২-১৪)।

এ কথা সত্য যে অনেক সময় মানব সৃষ্টির পদ্ধতি সম্পর্কে মানুষের নিজস্ব জ্ঞানের সঙ্গে কুরআনের জ্ঞানের মতভেদ হবার সুযোগ ঘটেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, কুরআনের কথাই প্রকৃত সত্য। এমনিভাবে এখনও যে সব বিষয়ে কুরআনের সঙ্গে মানুষের বিজ্ঞানের মিল নেই সেখানেও কুরআনের কথাই অকাট্য সত্য বলে মেনে নিতে হবে। হয় তো ভবিষ্যতে মানুষ তার সত্যতা জানতে পারবে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. M.G. Muzzam, History of the mechanism of reproduction and the revelation in the Holy Quran, Pak, J. Sc. Vol. 14, No. 6, p. 281-298, 1962.

www.bjilibrary.com

2. R. J., Mehta, Scientific curiosities of Love-life and Marriage, 11th edn. Bombay, 1960, India.

3. Herodotus, History Book II Cary Translation.

4. C.L. Evans, Principles of Human Physiology. 12th edn (1956): Churchill, London.

5. K. L. Moore, and A. M. A. Azzindani. The Developing Human with Islamic Additions, 3rd edn. Saunders & Dar Al-quibla, Jeddah, p., 120, 1983.

www.bjilibrary.com

পরিশিষ্ট-৮

নিদ্রা

নিদ্রা হচ্ছে শরীরের বিশেষ করে স্নায়বিক তন্ত্রের সাময়িক বিশ্রামের অবস্থা। সারা দিনের কর্মকাণ্ডের পর এই নিদ্রা আমাদেরকে পুনঃ কর্মক্ষম করে তোলে, তাই এটা বিশ্রাম ও শক্তি সঞ্চয় করে যার ফলে দুর্বলতা দূর হয়। এর প্রতিফলন ঘটে শরীরের মাংসপেশীসমূহের কুঞ্চন হ্রাস, সচেতনতা হ্রাস এবং রাসায়নিক ও জৈবিক কর্মকাণ্ডের হ্রাসের মাধ্যমে। নিদ্রা শারীরিক শক্তি পুনরুদ্ধার করে। কারণ যদি কেউ জোর করে সজাগ থাকে তা হলে কিছুক্ষণ পর সহজেই ঘুম এসে যায়, আর এটা যে শক্তি সঞ্চয় করে তার প্রমাণ নিদ্রার পর কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি।[১]

নিদ্রা এমন একটি অবস্থা যার ফলে গোটা শরীর ও তার স্নায়বিক তন্ত্রে শক্তি পুনরুদ্ধার হয়। মস্তিষ্কই নিদ্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই নিদ্রায় সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয় মস্তিষ্ক।"[২]

নিদ্রার গভীরতার স্তর ভেদে ঘুমন্ত ব্যক্তির জ্ঞান লোপ পায়। যদিও একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি মুখের উপর মশা মাছি বসলে হাত দিয়ে তাড়িয়ে দেয় তবুও এ সম্পর্কে সে ওয়াকেবহাল নয় এবং এ কাজের কথা তার স্মরণও থাকে না। শরীরের জৈব ও রাসায়নিক ক্রিয়া যে হ্রাস পায় তার প্রমাণ ঘুমন্ত ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডের গতি, রক্তচাপ, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি এবং পাকস্থলীর হজম ক্ষমতার (metabolism) হ্রাস।[১]

কেন নিদ্রা হয় তার কয়েকটি মতবাদ রয়েছে ঃ

(ক) মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন হ্রাস পায় বলে এটা কতটুকু সত্য তা বলা মুশকিল, কারণ নিদ্রার সময় মস্তিষ্কের মোট রক্ত সঞ্চালন কমবেশী হয় না। হতে পারে যে, মস্তিষ্কের কোন বিশেষ অংশে (সম্ভবত মধ্যাংশ) রক্ত সঞ্চালন হ্রাস পায় এবং ঘুমের সময় মস্তিষ্কের সেই অংশটি প্রভাবান্বিত হয়।

(খ) স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে অক্সিজেনের স্বল্পতা-দিনে ও রাতে অক্সিজেন গ্রহণ এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগের পরিমাণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় যা এখানে দেখানো হলো ঃ

www.bjilibrary.com

	অক্সিজেন গ্রহণ	কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ
দিন (কর্মকাল)	৬৭.০%	৫৮.০%
রাত (নিদ্রাকাল)	৩৩.০%	৪২.০%

সুতরাং নিদ্রার সময় অক্সিজেন গ্রহণ এবং Co_2 ত্যাগের পরিমাণ হ্রাস পায়। এটা সর্বজনবিদিত যে, অতিরিক্ত CO_2 অস্বস্তি ও অজ্ঞানতার কারণ। কিন্তু এই মতবাদ আজও প্রমাণিত নয় এই জন্য যে দিবসে কাজ করে শ্রান্ত না হলেও কেন ঘুম হয় আবার কেন কোন কো ব্যক্তি দিবসের যে কোন সময় ইচ্ছা করলেই ঘুমাতে পারে।

(গ) এই মতবাদ অনুযায়ী ঐচ্ছিক বা অনৈচ্ছিক সকল অনুভূতির সঙ্গে মস্তিষ্কের জীবকোষগুলোর রাসায়নিক ক্রিয়া দায়ী যার ফলে মনে কাজের ইচ্ছার সৃষ্টি হয়।

যখন বাইরের উত্তেজনা থাকে না–যেমন চোখ বন্ধ করে বা মনকে ঘুমের জন্য তৈরি করে নিলে, তখন আর মনে কর্মোন্মাদনা হয় না এবং মানসিক শান্তি বিরাজ করে।২ এরূপ ধারণা করা হয় যে, জাগ্রত অবস্থায় মস্তিষ্কে নিদ্রা আনয়নকারী বস্তু সঞ্চিত হয় এবং পরে এর ফলে নিদ্রা এসে যায়। লিনডসলে-এর মতে "নিদ্রার কোন মতবাদই পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। রাসায়নিক মতবাদগুলো হলো, দূষিত বস্তু (toxins)-র বৃদ্ধি, অতিরিক্ত Co_2, স্বল্প O_2 অথবা নিদ্রা-উদ্দীপক (hypnotoxin) টক্সিন সৃষ্টি। মস্তিষ্কের বিশেষ এলাকায় (সম্ভবত diencephalon) সজাগ থাকার কেন্দ্র রয়েছে যার উপর ক্রমাগত উত্তেজক অনুভূতি আক্রমণ করে যা কাজকর্ম ও মাংসের কুঞ্চন দ্বারা ঘটে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই কেন্দ্র কর্মক্ষম থাকে ততক্ষণ মানুষ সজাগ থাকে। পরে যখন বিশ্রাম নেয় এবং মাংস কুঞ্চন দূর হয় তখন উত্তেজক আক্রমণ হ্রাস পায়; অন্ধকার ও শান্ত পরিবেশে স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা আরো হ্রাস পায়। যখন মস্তিষ্কের সেই কেন্দ্রের কর্মক্ষমতা বিশেষ মানের নিচে নেমে আসে তখনই নিদ্রা আসে।

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, কোন মতবাদই নিদ্রার প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নয়। এ বিষয়ে আরো গবেষণা প্রয়োজন।

ঘুমের দুটি স্তর রয়েছে যা একাধিকবার ঘোরাফেরা করে–এগুলো হলো NREM বা Non Rapid Eye Movement ধীরে চক্ষু ঘূর্ণন বা স্বাভাবিক ঘুম আর REM (দ্রুত চক্ষু ঘূর্ণন) বা অস্বাভাবিক (paradoxical) ঘুম। মানুষ নিদ্রা গেলে সরাসরি স্বাভাবিক নিদ্রায় চলে যায়, যা প্রায় এক ঘন্টা স্থায়ী হয়। এরপর দ্রুত চক্ষু ঘূর্ণন সহ অস্বাভাবিক নিদ্রা চলে আসে যা ২ থেকে ১৫ মিনিট চালু থাকে। এরপর আবার স্বাভাবিক নিদ্রা চলে আসে। সাধারণত বয়স্কদের

www.bjilibrary.com

ঘুমের প্রায় তিন চতুর্থাংশই স্বাভাবিক নিদ্রা, আর নবজাত শিশুর বেলায় এর পরিমাণ প্রায় অর্ধেক।

"যখন নিদ্রা আসে তখন সাধারণত চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত থাকে। আলোয় জ্ঞান শীঘ্র লোপ পায় যদি চোখ খোলা থাকে তবুও চোখের মণি ছোট হয় যা সজাগ হলে বেশ বড় হয়ে যায়। একমাত্র স্পর্শ অনুভূতি বিশেষ নষ্ট হয় না। তাই সামান্য স্পর্শে গভীর ঘুমও ভেঙ্গে যায়। ঘুমে সর্বপ্রথম ইচ্ছা শক্তি লোপ পায়। আর ঘুম থেকে জাগার পর সবচেয়ে শেষে ফিরে আসে স্মরণশক্তি ও কল্পনাশক্তি যা সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী। মস্তিষ্কের যে অংশ শরীরের নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করে তা দেরীতে লোপ পায়। তবে বুদ্ধিবৃত্তি ও বিশেষ জ্ঞানগুলোর পূর্বেই সেই ক্ষমতা ফিরে আসে।[২]

মস্তিষ্ক ও শরীরের বিভিন্ন অংশ নিদ্রায় বিশ্রাম লাভ করে। কোন কোন অংশ যেমন হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস এবং মস্তিষ্কের প্রধান কর্মকেন্দ্র (vital centres) গুলো মোটেই বিশ্রাম নেয় না।[২]

নিদ্রার প্রয়োজন বয়সের সঙ্গে ব্যতিক্রম হয়। বয়স্কদের দৈনিক ৫-৮ ঘন্টা বা কিছু বেশী নিদ্রার প্রয়োজন। যুবা বয়সে মানুষ সহজেই ঘুমিয়ে যায়, কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ঘুম সহজে হয় না অথবা হলেও ভাঙ্গা ভাঙ্গা বা কম গভীর হয়। বয়োবৃদ্ধদের নিদ্রার প্রয়োজন কম, আর শিশুদের প্রয়োজন বেশী।

ইলেকট্রিক কৌশলের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, মানুষের ঘুমের বিভিন্ন স্তর ও পরিমাপ রয়েছে। জাগ্রত লোকের মস্তিষ্কের ইলেকট্রিক প্রতিফলন তন্দ্রায় আলাদা রকম হয়, তারপর আসল ঘুমের প্রতিফলন ভিন্ন হতে দেখা যায়।

দেখা গেছে যে, বেশির ভাগ লোক ঘুমে নড়াচড়া করে, সম্ভবত রক্ত সঞ্চালনের ত্রুটির ফলে মাংসের উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণত একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি প্রায় ২০-৩০ বার শরীরের অবস্থান পরিবর্তন করে, গড়ে প্রতি ৭ মিনিটে একবার। সুতরাং এজন্য বিছানা বড় হওয়া উত্তম।

তথ্যসূত্র ঃ

1. D. B. Lindsley, Sleep. Colliers Encyclopaedia. Vol. 17, P. F. Colliers & Sons. Corp. New York. p. 639, 1956.

2. W. A. R. Thompson, Black's Medical Dictionary, 33rd edn. Adams and Charles Black, London, pp. 806-808, 1981.

ইফাবা—২০০৩-২০০৪ (উ) /অঃ সঃ/৪৩৬৫—৩২৫০

www.bjilibrary.com

আল-কুরআনে বিজ্ঞান

Scientific Indications in the Holy Quran

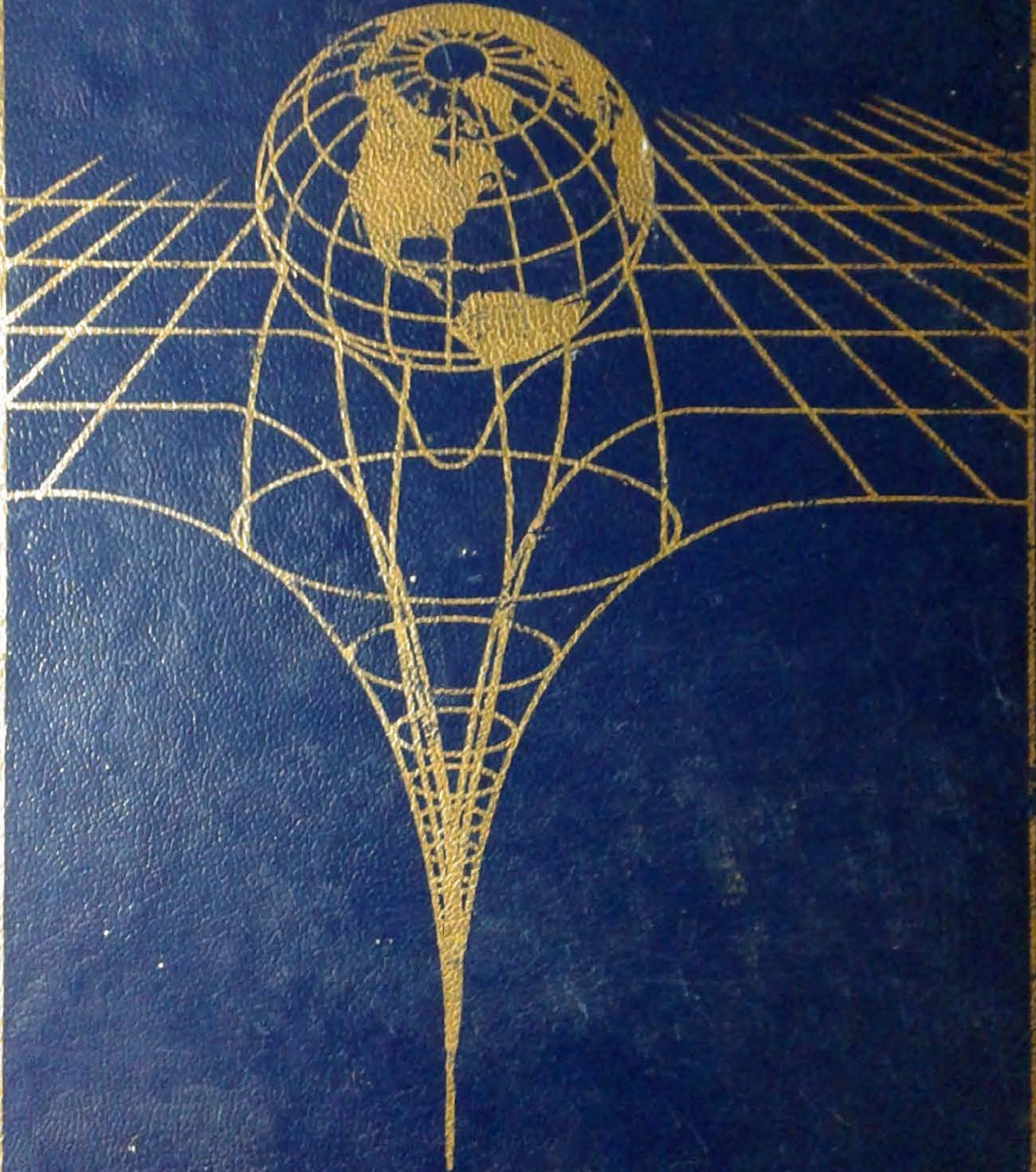

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.bjlibrary.com